NOT TO BE LENT OUT

তারাশঙ্কর-রচনাবলী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

একবিংশ খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, (৩৩০০), ১৩৬৫

উপদেষ্টা পরিষদ :

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ডক্টর সুকুমার সেন

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ডঃ রথীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক :

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রীসুমথনাথ ঘোষ : শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে এস. এন
রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ শশী প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
হইতে অশোককুমার ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত

প্রারম্ভ

এ আখ্যায়িকা বা আখ্যানের নাম শতাব্দীর মৃত্যু হতে পারে কিনা বলতে পারি না। আমার আখ্যানের যারা প্রথম শ্রোতা, এ নাম তাদেরই দেওয়া। আমার ইচ্ছে ছিল নাম দি —"একটি বিচিত্র জীবন"। ওরা তর্ক তুলেছিল। বৈচিত্র্য কোন্ জীবনে ?

সে সব তর্কের কথা থাক। ওদের কথা মেনে নিয়ে শতাব্দীর মৃত্যু নামটি স্বীকার করে নিয়ে প্রথম পৃষ্ঠাখানি নূতন করে লিখে ওই নাম শিরোনামায় লিখলাম। তা', নামটি মন্দ হয় নি। শুনতে ভালই লাগবে।

শতাব্দীর মৃত্যু অর্থে ঊনবিংশ শতাব্দী বা বিংশ শতাব্দীর অবসান বা ছেদ নিশ্চয় নয়। অথবা পুরো একশো বছরের কোনো এক বৈচিত্র্যময় জীবন-ধ্যান-ধারণার পরিসমাপ্তিও নয়। নিছক একটি ঘটনা-জীবনের কথা। বৈচিত্র্যময় লোকটি জন্মেছিলেন প্রায় ছিয়ানব্বই বছর আগে ; ১৮৭২ সালে ; মারা গেছেন তিরাশি বছর বয়সে অর্থাৎ ১৯৫৫ সালে। তারপরও এই সতের বছর লোকটির বিচিত্র জীবনকাহিনী ও কথা লোকেরা গল্পের মতো বলেছে। অবশ্য ধীরে ধীরে লোকে ভুলেই আসছিল—হঠাৎ সেই সব গল্প ও কাহিনী যেন শিশিতে সঞ্চিত কর্পূরের মতো উপে গেল। অথবা তাকে কবর দেওয়া হল।

কি ভাবে হল সে কথাটা সবশেষে বলাই উচিত ; সেইটেই স্বাভাবিক। আরম্ভ করছি নায়কের তিন বছর বয়স থেকে। এবং আরম্ভ করছি চিরাচরিত প্রথানুযায়ী। স্থান কাল ও পাত্র এই বিবিধ বিস্তারকে পটভূমিতে রেখেই আরম্ভ করব।

স্থান হুগলী জেলার একটি ছোট গ্রাম। কাল পূর্বেই বলে রেখেছি—নায়কের বয়স তখন তিন বৎসর আট মাস—প্রায় চার ; ১৮৭২ সালে তার জন্ম—সুতরাং ১৮৭৬ সাল। একালের বাংলাদেশের ইতিহাস বাঙালীর অত্যন্ত সুপরিচিত কাল। যদি বলি তখন বিগত এক দীর্ঘায়ু বৃদ্ধ জরাজীর্ণ কালের সদ্যমৃত্যু ঘটেছে এবং ওই কালের বৃদ্ধা পত্নী এক নূতন কিশোর কালকে নাবালক পুত্র হিসেবে অবলম্বন করে সমস্ত বাংলাদেশের বাঙালী সমাজরূপী যজমানকে ধরে রেখেছেন—নূতন মন্ত্র নূতন তন্ত্র মতে সংসারযজ্ঞ সবে প্রজ্বলিত করেছেন তা' হলে অন্যায় বলা হবে না। তখনু সতীদাহ প্রথা উঠে গেছে, বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তিত হয়েছে—প্রচলিত হয় নি। ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইংরিজী শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। শুধু ছেলেরা নয় মেয়েরাও দু'চারজন লেখাপড়া শিখছে। ব্রাহ্মসমাজের মেয়েরা সবাই লেখাপড়া শেখে। বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত তখন দেহ রেখেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন বিদ্যমান। বঙ্কিমচন্দ্র যুবক। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস নতুন স্বাদ এনেছে ; বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার দীপ্তিতে বাঙালীচিত্ত চকিত হয়ে উঠেছে। দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণি পরমা জননী ভবতারিণীদেবীকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন —তাঁর মহিমার আকর্ষণে হুগলী জেলার কামারপুকুর থেকে এক আশ্চর্য ব্রাহ্মণসন্তানের আবির্ভাব হয়েছে—তাঁর নাম রামকৃষ্ণ পরমহংস। ইংরিজীনবিসেরা তাঁকে পাগল বা জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন দেখলেও সাধারণ বাঙালী সমাজ তাঁর মধ্যে এক মহাআবির্ভাবকে প্রত্যক্ষ করেছে, অনুভব করেছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সকল জনের দ্বারা অভিনন্দিত জন। তাঁর ঘরে তখন রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হয়েছেন—তাঁর বয়স তখন পনের। সিমুলিয়ার দত্তবাড়ির ছেলে নরেন্দ্রনাথের বয়স তখন চৌদ্দ—তখনও তিনি বিবেকানন্দ হন নি। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের বাগ্মীতায় বাংলার আকাশে তখন ধ্বনি তুলেছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ব্রাহ্ম বিবাহ আইনও পাস করিয়েছেন তিনি।

যদি বলি বাংলাদেশের নতুন কালে সেটা প্রথম প্রহর—অনেক পাখির মেলা আকাশে, তাদের কলধ্বনি বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে তা' হলে বেশী বলা হবে না।

জাতীয় কংগ্রেসের তখনও পত্তন হয় নি। কিন্তু বাংলাদেশের স্বপ্ন তখন যেন অনেক জনে রাষ্ট্রজীবনের আভাস আবছা-আবছা দেখছেন বা দেখেছেন মনে হচ্ছে।

এই কালে হুগলী জেলার ওই ছোট গ্রামখানি গোবিন্দপুরের অবস্থা কল্পনা করতে হলে বলব—শীতান্তে পুষ্করিণীকে কল্পনা করুন। নিস্তরঙ্গ জলতল। নিস্তব্ধ পারিপার্শ্বিক। হঠাৎ কোনো একটা কোকিল কোনো কাক বা অন্য পাখির তাড়া খেয়ে খুব দ্রুত কুহু-কুহু ডাক ডেকে উড়ে চলে গেল। একই সঙ্গে খানিকটা দূরে বসতির মধ্যে আহার সংগ্রহে ব্যস্ত কাকগুলির মধ্যে হঠাৎ ঝগড়া বেধে গেল। তাদের ঝগড়া করা কোলাহল থেকে বোঝা গেল এ ঘটনা। তারপর পুকুরের জলের তলা থেকে একটা মাছ জল নাড়া দিয়ে উঠল কোনো কারণে। ঠিক এই সময়ে দক্ষিণ পাড়ে পুকুরের জলের উপর ঝুঁকে পড়া শজনে গাছটার একটা ডালের উপর থেকে সজোরে ছোঁড়া একটা ঢেলার মতো সোজা সবেগে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল একটা মাছরাঙা পাখি।

থাক উপমা দিয়ে লেখা বাড়াব না। এককথায় হুগলী জেলার ওই গ্রামটিতে তখনও নূতন কালের সাড়া এবং নাড়া যতখানি আসা উচিত তাই এসেছে। বরং কিছু কমই এসেছে বলতে হবে। গ্রামের ঘর পঁয়ত্রিশ গৃহস্থের বাস। তার মধ্যে তিন ঘর ব্রাহ্মণ; সদগোপ পনের ঘর, বাকী ষোল সতের ঘর বাগদী বাউরী সম্প্রদায়ভুক্ত। এদের মধ্যে কেউই ইংরিজী শেখে নি। বাইরে গিয়ে কেউই চাকরি করে নি। একটি মাত্র ব্যক্তি গ্রাম থেকে অকস্মাৎ ক'বছর—?—বছর পাঁচেক আগে স্ত্রীকে নিয়ে চলে গিয়েছে কলকাতা কিন্তু সে আর ফেরে নি।

বছর পাঁচেক আগে একটা ঢিল পড়েছিল শান্ত নিস্তরঙ্গ পুষ্করিণীর জলে, তার ফলে যে তরঙ্গবৃত্তগুলি উঠেছিল সেগুলি পরের পর, পরের পর পুকুরের পাড়ে ধাক্কা খেয়ে আবার পুকুরের কেন্দ্রে ফিরে যেতে চেষ্টা করেও পারে নি, কারণ প্রকৃতির তা' নিয়ম নয়; প্রকৃতির নিয়মে সে-চাঞ্চল্য সে-ঢেউ পুকুরের জলের নিস্তরঙ্গতার মধ্যেই শান্ত হয়ে বিলীন হয়ে গেছে।

ঘটনাটি এই: আমাদের আখ্যায়িকার যে নায়ক—যার বয়স আখ্যায়িকা আরম্ভের কালে মাত্র তিন, তারও জন্মের দু বছর আগে অর্থাৎ এখন থেকে পাঁচ বৎসর পূর্বে এই গ্রামেরই এক নবীন যুবক এক-বস্ত্রে গৃহত্যাগ করেছিল। কিছুটা ভুল হল। তার জমিজমা ভূসম্পত্তি যা ছিল, তা' সমস্ত বিক্রি করে দিয়ে কয়েক শত টাকা সম্বল করে চলে গিয়েছিল ধন-সম্পত্তি অর্জন করে ধনী হবে বলে। সে-কালে এত দুঃসাহসিকতা নেহাত ছোটখাটো দুঃসাহসিকতা ছিল না। অঋণী অপ্রবাসী হয়ে শাকান্নে জীবনধারণেই ছিল যে কালের পরম সুখ সে কালে পিতৃভূমের পৈতৃক কয়েক বিঘা জমি এবং আমবাগান ও পুকুরের অংশ বিক্রি করে অকূলে ভেসে পড়া তো সহজ কথা নয়।

গঙ্গাধর ভট্টাচার্য এবং জটাধর ভট্টাচার্য এই গ্রামের দুই ব্রাহ্মণসন্তান; পেশা চাষবাস এবং যজমানবর্গের পৌরোহিত্য ও গুরুগিরি। দুই ভাই পিতৃমাতৃহীন হয়েছিল অকালে। বড়ভাই গঙ্গাধর তখন সবে ব্যাকরণের আদ্য মধ্য অন্ত তিন পরীক্ষা পাস করে স্মৃতি পড়ছে। ছোট জটাধর তখন বালক—ব্যাকরণের শব্দ ধাতু বিশেষ্য বিশেষণ বিভক্তি প্রভৃতিতে বন্ধুর পথে বার বার পা পিছলে পড়ে হাত পা কোমর পিঠ ছড়ছে এবং মধ্যে মধ্যে মাথা নেড়ে জানাচ্ছে এ তার দ্বারা হবে না; এবং সুযোগ পেলেই পালিয়ে যাচ্ছে। বড়ভাই গঙ্গাধর বাল্যকাল থেকেই গম্ভীর অথচ মৃদু স্বভাবের মিষ্ট প্রকৃতির মানুষ। তাঁর বিবাহও তখন হয়েছে। পত্নীর বয়স সবে এগারো কি বারো। জটাধরের বয়স দশ।

পরমসহিষ্ণু গঙ্গাধর সমস্ত সংসারের দায় দায়িত্ব অত্যন্ত সহজভাবে মাথায় তুলে নিলেন। জমিজেরাত ভাগচাষেই চাষ হত। বাড়িতে লক্ষ্মীজনার্দন শিলা নারায়ণের নিত্যসেবা ছিল। সে সবই যথাযথ নিয়মে চলতে লাগল; সংসারের রান্নার কাজ সংসারের কাজ অনায়াসে বারো বছরের পত্নীর কাঁধে তুলে দিলেন। যজমান শিষ্যদের ক্রিয়াকর্ম সেবা নিজে নিলেন—নিত্যপূজা তো নিজে করতেনই। এসবের সঙ্গে তিনি তাঁর শাস্ত্রাধ্যয়নও বজায় রাখলেন।

এমনই ভাবে পাঁচ বছর চলার পর অকস্মাৎ একদা জটাধর গৃহত্যাগ করলে। সকালবেলা তার বিছানায় একখানা পত্র পাওয়া গেল।

"শ্রীচরণাম্বজেষু—

প্রণাম শতকোটী নিবেদনপূর্বক নিবেদনমিদং—দাদা মহাশয়, এই সংস্কৃত পাঠ এবং শাস্ত্রাদি পড়াশোনা মদীয় তুল্য নির্বোধের দ্বারা হইবেক না। কোনো মতেই ইহা আমি আয়ত্ত করিতে পারিলাম না। তদ্ব্যতীত সংসারের এই দৈন্যদশা—সকলজনের নিকট হাতজোড় করিয়া থাকা ইহাও আমার পোষাইবে না। এই কারণে আমি লক্ষ্মীলাভের আশায় গৃহত্যাগ করিয়া যাইতেছি। লক্ষ্মীজনার্দনের দেবোত্তরের জমি বাদ দিয়া আমাদের বক্রী পৈতৃক জমি—কুড়ি বিঘার অর্ধাংশ দশ বিঘা আমি রতনপুরের গোপেশ্বর বণিকের নিকট তিনশত টাকায় বিক্রয় করিলাম এবং পাথরঘাটার আমবাগানের অর্ধেক অংশ একশত টাকায় উক্ত গ্রামের কায়স্থদের নিকট বিক্রয় করিলাম।"

আরও কয়েকটি ছত্রে জ্যেষ্ঠের শ্রীচরণে বহুবার মার্জনা ভিক্ষা করা ছিল এবং পরিশেষে জটাধর লিখেছিল আশ্চর্য একটি শব্দ, সেই শব্দটি যে কি করে তার মনে এসেছিল বা কলমের মুখে যুগিয়েছিল তা গঙ্গাধরের মতো পণ্ডিতজনও ভেবে ঠিক হদিস পান নি। লিখেছিল—"অমার্জনীয় অপরাধে অপরাধী সেবকাধম জটাধর।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন গঙ্গাধর।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার চিঠিখানা খুলে পড়েছিলেন। প্রথমেই সম্বোধনে 'শ্রীচরণাম্বজেষু' শব্দটিতে দৃষ্টি রেখে বিচিত্র হেসে বলেছিলেন—ভালই করেছে। শব্দটার ম-বয়ে যুক্তাক্ষরটির নিচে উ বা ঊ যাই লিখে থাক সেটাকে কেটেকুটে হিজিবিজি করে অকারান্ত করে ছেড়ে দিয়েছে। কথায় বলে "হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ জ্ঞান নেই।" এ 'হ্রস্ব উ দীর্ঘ ঊ।' সুতরাং বিদ্যাচর্চার পথ ছেড়ে জটাধর ভালই করেছে। তবে জটাধর চতুর। বানান ভুলের দায় এড়িয়ে যাবার একটা হিজিবিজিওয়ালা পথ বের করেছে অনায়াসে।

স্ত্রী নয়নতারা পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তুমি কিছু জানতে না?

—কি? নয়নতারা স্বামীসোহাগিনী ছিলেন এবং দেবরটিকে কনিষ্ঠ সহোদরের মতো স্নেহ করতেন। এবং বারো বছর বয়সে এ সংসারের গৃহিণী হয়ে অল্প বয়সে গিন্নীবান্নীও হয়ে উঠেছিলেন সতের বছর বয়সে।

—এই জটাধরের এই মতলবের কথা? এ তো একদিনে হয় নি। মনে মনে অনেক দিন ধরে এর বীজ বপন করে তাতে জলসিঞ্চন করেছে—বীজ থেকে অঙ্কুর হয়েছে—আজ তা'—

বাধা দিয়ে নয়নতারা বলেছিলেন—আজ তা' ফলবতী হয়েছে। তোমার কথা নয়, বাক্য—একদিকে কটমট অন্যদিকে সহজে শেষ হয় না। তা' বাপু তোমার ওই বীজের কথা অঙ্কুরের কথা জানতাম কিন্তু বৃক্ষ বা পুষ্পের কথা জানতাম না।···কথা দেখ না। জানলে আর তোমাকে বলতাম না? তোমার ছোটভাই আমার যে ছেলের অধিক। বারো বছর বয়সে ঠাকরুন চলে গেলেন—আমি না-বিইয়ে 'গোপালের মা' হলাম। দুরন্ত ছেলে—তার শতেক

কুকর্ম ঢেকেছি তোমার কাছে। বাগদীপাড়ায় বাউরীপাড়ায় আধেক ভাগে ছাগল কিনে পালতে দিয়ে ছিল; ছাগলের বাচ্চা বিক্রি করে পয়সা করত। সেই টাকা নিয়ে সুদে ধার দিত। সুদ আদায় করত। টাকা জমাত। আমাকে বলত—দাদাকে বলো না। বলত—পয়সা না হলে বউদি সংসারে বেঁচে সুখ আছে? আমার ও নরঃ নরৌ নরাঃ ভাল লাগে না, বলত—আমি দেখো বড় হয়ে কলকাতা যাব—ব্যবসা করব সেখানে; এই গোপালগঞ্জের চাটুজ্জেদের মতো রামচন্দ্রপুরের মুখুজ্জে বাঁড়ুজ্জেদের মতো বড়লোক আমাকে হতেই হবে। জান তো ওরাও খুব পণ্ডিতের বংশ কুলীনের বংশ। ওদেরই একটা বাড়ি—তারা সেই পুরনো গুরুগিরি করেই খায়—তাদের আর দুঃখ যত না হোক দুর্দশার আর শেষ নেই। পেটের ভাত কি পয়সা-কড়ির খুব অভাব নেই কিন্তু—কি দুর্দশা। বউদি, দুর্গন্ধে বমি হয়ে আসে এমনই গন্ধওলা কেটের কাপড়, ছেঁড়া গিঁটদেওয়া, পরে বসে থাকে; চালকলার পুঁটলি বেঁধে বেড়ায়—আমি ছিছি করে মরি! আমি শুনতাম। বলতাম—ব্যবসাও তো সোজা নয়; তুমি পারবে? সে বলত—ঠিক পারব। তুমি দেখো। আমি বলতাম—আমি খুব খুশী হব। এই জানতাম। তা' ও সত্যি করে চলে যাবে তা' কি জানতাম?

এ ঘটনা ১৮৭০ সালের। হ্যাঁ, মূলেই ভুল হয়ে গেছে—গ্রামের নাম বলা হয় নি।

হ্যাঁ। গ্রামের নাম গোবিন্দপুর।

সেদিন গ্রামে একটি তরঙ্গ উঠেছিল। যেন একটি জলচারী মাছ বর্ষার সময় একদা ভরা পুকুরের মোহনায় লাফ দিয়ে উঠে মোহনার বাঁধ লঙ্ঘন করে বাইরে নালা ধরে যে জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে সেই স্রোতের মধ্যে পড়ে খলবল করে সামনে ছুটল। বাংলাদেশ তখন বানের জলে ভরেছে। বান এসেছে ইয়োরোপ থেকে। এদেশের পুকুর দীঘি খাল বিলের চারিধারে থইথই করছে। সেই থইথই বানের জলে ভাসল একই মাছ। পুকুরের অবশিষ্ট জলচারীরা ওই তরঙ্গে দোল খেতে খেতে পরস্পরকে সাবধান করে বলেছিল—খবরদার, খবরদার! এবম্বিধ কাজ যেন কেউ না করে।

কল্পনা করেছিল কিছুদিন যেতে না যেতে জটাধর অবশ্যই ফিরে আসবে। এবং ফিরে আসবে ছিন্ন বস্ত্রে কঙ্কালসার দেহ নিয়ে।

পাশের গ্রামের বৈদান্তিক পণ্ডিত কৃষ্ণচরণ বেদান্তশাস্ত্রীর টোল ছিল, তিনি গঙ্গাধরকে তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণার জন্য স্নেহ করতেন। তিনি বলেছিলেন—একদা প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করে উঠে বাইরে যাবার জন্য দ্বার উন্মোচন করবামাত্র তোমার কনিষ্ঠকে তুমি দেখতে পাবে গঙ্গাধর। সমস্ত শেষ করে হাড়চামড়াসার করে ফিরে এসেছে। অবশ্য—। অবশ্য—। থেমে গিয়েছিলেন আর কিছু বলেন নি। তবে এ কথা আমরা জানি যে গঙ্গাধর নিয়ত লক্ষ্মীজনার্দনের কাছে জটাধরের মঙ্গল কামনা করেছেন—এবং নয়নতারা মধ্যে মধ্যে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন—তাঁর স্বামীর সামান্যতম ত্রুটিতে বলেছেন—তোমরা এমনই বট। একটা মানুষ সে যতই করুক তার কি হল না হল এ তোমরা ভাববে না। তোমার এই আচরণ আর তোমার সেই ভাই! গিয়ে নিরুদ্দেশ! কোনো একটা খবর দিলে না। আর তুমি? বড়-ভাই হয়ে একটা খোঁজ করলে না! গঙ্গাধর বলতেন—কোথায় খোঁজ করব? কার কাছে খোঁজ করব? যা করবার উনি করবেন।

এমনই ধরনের তরঙ্গবুত্তগুলি উঠে উঠে একদা শান্ত হয়ে গেল।

অতঃপর তিন বৎসর পর ১৮৭২ সালে জন্ম হল এই আখ্যায়িকার নায়কের। তাতে কোনো তরঙ্গবৃত্তের সৃষ্টি হয় নি। শুধু পিতামাতার হৃদয়ে অনেক কল্পনাতরঙ্গবৃত্তের সৃষ্টি হয়েছিল। তবে হয়েছিল এই যে, জটাধরকে নিয়ে চিন্তাভাবনার তরঙ্গ যেন একেবারে

স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এমন সময় একদা ; ১৮৭৬ সালে একদা আবার একটি তরঙ্গ উঠল। সেদিন একখানি খামে লেখা পত্র এলো গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের নামে। জটাধরের সংবাদ বহন করে নিয়ে এলো। জটাধরই পত্র লিখেছে—সে জীবিত আছে, ভালো আছে ; এই চার বৎসর সে বাংলাদেশের বহুস্থানে ভ্রমণ করেছে, কর্মসূত্রে ভ্রমণ। সে চাকরি নিয়েছিল মহাজনী নৌকা করে যারা ব্যবসা করে তাদেরই একজনের কাছে। ঢাকা নারায়ণগঞ্জ গোয়ালন্দ চট্টগ্রাম অবধি ঘুরেছে। এতদিন সে নিত্যই ভেবেছে পত্র লিখবে কিন্তু ভয়ে লিখতে পারে নি। এখন সে উক্ত চাকরি পরিত্যাগ করে মাসখানেক হয় নিজে স্বাধীনভাবে কলকাতায় ব্যবসার পত্তন করেছে। অবশ্য সামান্যই সে ব্যবসায়। আজ সে দাদার এবং বউদির শ্রীচরণে অসংখ্য প্রণাম সহ এই সংবাদ নিবেদন করছে। দাদা বউদিদি যেন তাকে আশীর্বাদ করেন, সে যেন ব্যবসায়ে লক্ষ্মীলাভ করতঃ সার্থক হতে পারে।

ভট্টাচার্যদের বাড়িতে তরঙ্গ উঠেছিল কিন্তু গ্রামে সে তরঙ্গ ছড়ায় নি। নয়নতারা পত্র পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন।—এমন অকৃতজ্ঞ, দু-পয়সার খামে পত্র ! একবার এসে দেখা দিয়ে যেতে পারলে না। মনে করলে ভাগ চাইবে দাদা বউদি ?

স্বামীকে বলেছিলেন—উত্তর দিতে পাবে না।

গঙ্গাধর বলেছিলেন—তা' কি হয় !

—হয়। হতে হবে। নাহয় লিখে দাও তোর বউদিদির খুব অসুখ !

তা লেখেন নি গঙ্গাধর। গঙ্গাধর তাকে আশীর্বাদ জানিয়ে পত্র লিখেছিলেন। লিখেছিলেন জটাধরের সংবাদে তাঁরা খুব খুশীহয়েছেন।

এরপর কিন্তু আর কোনো চিঠি আসে নি। জটাধর আর কোনো উত্তর দেয় নি।

আরও এক বৎসর পর। ১৮৭৩ সালে একদা।

নির্জন ছায়াঘেরা পুষ্করিণী-সমাচ্ছন্ন এই গ্রামটির নিস্তরঙ্গ-বক্ষে সেদিন বাহির থেকে কোনো তরঙ্গ উঠতে দেখা গেল না। বলা যায় সেদিন একটি বীজ নিক্ষিপ্ত হলই এ গ্রামটির বুকে। বললাম বটে কিন্তু উপমা দিয়ে ঠিক মিলিয়ে নেওয়া যাবে না। বলা উচিত জলতলে জন্ম নিল জলচর মাছেদের ডিম থেকে আশ্চর্য একটি মাছ ! অন্য মাছেদের সঙ্গে জন্মকালে তার কোনো পার্থক্য বোঝা গেল না, অন্য জলচর মাছেরাও তার মধ্যে কোনো অসাধারণত্ব দেখলে না ; জলতলের উপরে নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গতা এতটুকু বিঘ্নিত হল না কিন্তু তার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে সুপ্ত ছিল এক বিস্ময়কর বৃহৎ—সে সংবাদ অন্য কেউ জানুক বা না জানুক জানতেন এ গ্রামের বিধাতাপুরুষ এতে কোনো সন্দেহ নেই। সেদিন জন্মেছিলেন এই কাহিনীর নায়ক।

এতকাল পরে—অর্থাৎ ১৮৭২ সাল আর এই ১৯৬৯ সাল—হিসেবমতে প্রায় একশো বছর হবে, এই শতাব্দী কাল পরে গ্রামটির সর্বত্র অনুসন্ধান করে যখন নিশ্চিত হয়েছি যে ওই ১৮৭২ সালের ওই দিনটি গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের বাড়ির মাটির কোঠাঘরে নিচের তলার অন্ধকার ছোটঘরখানিতে নয়নতারা যখন সন্তান প্রসব করেছিলেন তখন গভীর রাত্রি ; তখন কেউ শাঁখ বাজায় নি ; কারণ বাজাবার মতো মেয়েছেলে বাড়িতে আর কেউ ছিল না। বাইরে চৌকো লণ্ঠনে কেরোসিনের ডিবে জ্বালিয়ে বসে ছিলেন শুধু গঙ্গাধর ভটচাজ। তিনি তখন ঘুমে কাতর। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে শিশুটি খুব বেশী চিৎকার করেও কোনো অসাধারণত্বের আভাস দেয় নি ; আর দশটা শিশুর মতোই খানিকটা কেঁদেছিল। এই কান্নার শব্দ শুনে গঙ্গাধর গোবিন্দ স্মরণ করে কয়েক বারই ডেকেছিলেন—জয় গোবিন্দ, জয়

গোবিন্দ, জয় গোবিন্দ! এবং হাতের আঙুলে পৈতে জড়িয়ে নিয়ে দুই হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করেছিলেন গোবিন্দকে।

তারপর তিনি প্রশ্ন করেছিলেন—ওরে ও নুটনী—কি হল রে? ছেলে না মেয়ে?

নুটনী ওরফে নোটনবালা বেশ একটু ঝংকার দিয়েই বলেছিল—চান করাবার জন্যে নতুন গামলা বার করে দাও ঠাকুর!

গঙ্গাধর পরম আশ্বাসভরে বলেছিলেন—জয় গোবিন্দ! বাঁচলাম! অর্থাৎ মেয়ে হয় নি—এই সৌভাগ্য তাঁকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলে। নুটনী যখন সন্তানকে ধোয়া মোছা করবার জন্য মাটির পাত্রের পরিবর্তে ধাতুপাত্র গামলা চেয়েছে তখন সন্তান যে পুত্র-সন্তান তাতে সন্দেহ নেই।

নুটনী বলেছিল—কেন ঠাকুর, মেয়ে হলে কি হত? বউঠাকরুনের এতটা বয়সে কোঁক ফলল এতেও তোমার ছেলে মেয়ের বিচার? এই তো পেরথম—মাত্তর একটা—তার আবার ছেলে মেয়ে কি?

যাক। কথা আরও অনেক হয়েছিল! "কথা না লতা"! অর্থাৎ কথা বা আলোচনা লতার মতো পল্লব মেলে বাড়তে থাকে; কোন্ দিকে তার গতি—মুহূর্তে মুহূর্তে কতটা সে বাড়ে সে হিসাব বিধাতাও দিতে পারেন না। তা' ছাড়া এ তো কেউ বলে নি। সেই রাত্রির এই কথাগুলি আমার অর্থাৎ লেখকের কল্পনাপ্রসূত। সত্য কি ঘটেছিল তা' বলবার আজ আর কেউ নেই। কল্পনা করতে করতে গ্রাম থেকে বের হবার মুখে রাস্তার তে-মাথায় (এক মাথা গেছে রেলস্টেশনে, অন্য দুই মাথা উত্তর দক্ষিণ দুই দিকে গ্রামাঞ্চলের দিকে প্রসারিত), অন্তত দেড়শো দুশো বছর বয়সী এক বটগাছের তলে এসে হঠাৎ কি মনে হল গাছটাকেই বললাম—তুমি বলতে পার?

মনে হয়েছিল গাছের পাতার খসখসানির মধ্যে যেন শুনতে পেয়েছিলাম—আমি পারি না তবে এ গাঁয়ের বিধাতাপুরুষ পারেন।

—বিধাতাপুরুষ?

—হ্যাঁ গো, যে বুড়ো আঁতুড়ঘরে মানুষের কপালে ভাগ্য লেখে সেই বুড়ো।

—সে কোথায় থাকে?

গাছটা বলেছিল—আমি এই গাছ—এই আমার ডালপালার মধ্যেই বুড়ো থাকে।

সেই বিধাতা বলেছিল—হ্যাঁ তা' পারি বই কি বলতে!

প্রশ্ন করেছিলাম—দয়া করে আমাকে বলবেন?

বৃদ্ধ হেসে বলেছিল—বলব বই কি। আজকাল তো আমাকে কেউ আমলই দেয় না। আমার অস্তিত্বকেই স্বীকার করে না। তুমি যখন স্বীকার করছ আমাকে তখন বলতে হবে বই কি!

বৃদ্ধ বলেছিল—দেখ সে রাত্রে সমস্ত গ্রামটা নিস্তব্ধ ছিল। লোকে খুব ঘুমিয়েছিল। আমিও ঘুমুচ্ছিলাম। কে যেন ডেকে বলেছিল—বিধাতা, গঙ্গাধরের একটি পুত্রসন্তান হল। ছ দিন পর ষষ্ঠীপুজোর দিন তুমি গিয়ে ওর কপালে তোমার কলম দিয়ে লিখে দিয়ে এস। ছ দিনের দিন গিয়ে লিখেও এসেছিলাম। কিন্তু কি লিখেছিলাম তা' বুঝতে পারি নি। আজ এতকাল পরে, তার জীবনে যা ঘটেছে তাই সন্ধান করে করে জেনেছ; সাজিয়ে গুছিয়ে আজ তুমিই বলতে পার আমি সেদিন কি লিখেছিলাম।

তার মানে আমার কল্পনায় সৃষ্টি করা ওই বিধাতা বুড়োও ঠিক আমার মতই সে রাত্রির ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানেন না—বলতেও পারেন না। আন্দাজ করে বলতেও পারেন সে রাত্রে কিছুই এমন ঘটে নি। লোকে যথাবিধি ঘুমিয়েছিল।

গ্রামের মাটিকে প্রশ্ন করেও উত্তর মেলে নি।

মাটি, বোবা মাটি।

থাক।

গ্রামখানিতে; গ্রামখানির নাম গোবিন্দপুর; সে রাত্রে গোবিন্দপুরে কোনে স্পন্দন সে অনুভব করে নি। সে রাত্রে কেন এর তিন বৎসর আট মাস পর পর্যন্ত ছেলেটি সম্পর্কে কেউ কোনো কথা বলে নি।

তিন বৎসর আট মাস পর একদিন সেই নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া জটাধর ফিরে এলো গ্রামে এবং সে-ই একটি ঘোষণা করল উচ্চ কণ্ঠে—এ ছেলের জন্ম সাক্ষাৎ দেবতার অংশে। কোন্ দেবতার অংশে তা' বলতে সে পারে না তবে কোনোও না কোনো দেবতার অংশে যে জন্ম তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এ ছেলেটির বয়স তখন ওই তিন বৎসর আট মাস।

নধরকান্তি গৌরবর্ণ আয়তচোখ খাঁড়ার মতো নাক ছেলেটি, একটু হ্যাবলা ভ্যাবলা রকম-সকম; সেই ১৮৭৬ সালের শেষের দিকে—প্রায় কার্তিক মাস তখন, সেই কালে দিগম্বর বেশে, ভট্টাচার্যবাড়ির লক্ষ্মীজনার্দন শিলা নারায়ণ আর রাধাগোবিন্দজীর খড়ো ঘরের বারান্দায় হাত জোড় করে চুপ করে বসেছিল।

সুদীর্ঘকাল পর ঠিক সেই সময় জটাধর দুখানা গরুর গাড়ি বোঝাই জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিল।

গৃহত্যাগ করেছিল সে ১৮৭০ সালে ফিরল ১৮৭৬ সালে। এই ছ বৎসরে সে কলকাতায় যাকে বলে পাঁচজনের একজন হয়ে বসেছে। বাড়ির জন্যে জায়গা কিনেছে। একখানা তৈরী বাড়িও কিনেছে। মস্ত ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। জটাধরের চেহারাতে জলুস ধরেছে। ভটচাজবাড়িতে সন্তানদের রূপ বংশানুক্রমিক সম্পদ। জটাধর নাম হলেও জটাধর কোনো জটাধারীর মতো ধূসর মলিন ছিল না কোনো কালেই; এখন সে ছোট-বড় চুল ছেঁটে (ছোট বড় বা ছ আনা দশ আনা চুল ছাঁটাই তখন সবে উঠছে) বাঁদিকে সিঁথি কেটে চুল ফিরিয়ে শক্তকফ শার্ট গায়ে তার উপর ওয়েস্টকোট চাঁড়য়ে—পায়ে হুড বার্নিশ চীনে-বাড়ির পাশে স্প্রিং দেওয়া জুতো পরে কিছু একটা সুবাস ছড়িয়ে গোবিন্দপুরকে চঞ্চল করে দিয়ে নিজেদের বাড়ি ঢুকেছিল। গ্রামের প্রবেশপথ থেকেই তার পিছনে ছেলেপুলের দল জুটে গিয়েছিল।

লক্ষ্মীপ্যাঁচার পিছনে কাকের দলের মতো বললে অন্যায় বলা হবে না। প্রবীণেরাও সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কিন্তু চেহারাটা পোশাকে জলুসে এমনই তাদের সঙ্গে পৃথক বর্ণ পৃথক গোত্র পৃথক জাতির মানুষ হয়ে গিয়েছিল যে, তারা ইচ্ছে থাকলেও তাদের গ্রামের নিজস্ব খাস এলাকার মধ্যেও পল্লীগ্রামের একচেটিয়া অধিকারের প্রশ্নও তাকে করতে পারে নি।

প্রশ্ন করতে পারে নি—"মহাশয়ের নিবাস? মহাশয়ের নাম? কোথায় যাওয়া হবে?" অথবা সমাদর দেখিয়ে বলতে পারে নি—একবার তামাক ইচ্ছে করবেন কি?

এই সত্যটুকু জটাধর বুঝতে পেরেছিল। এবং সে ইচ্ছাপূর্বক নিজের গাম্ভীর্যকে আরও গুরুভার ও থমথমে করে তুলে মনে মনে কৌতুক অনুভব করতে করতেই ভটচাজবাড়ির খামারবাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হয়েছিল।

১৮৭৬ সালের যজমানসেবী শিষ্যসেবকসেবী ভটচাজ ব্রাহ্মণের বাড়ি। সামনের একটা চত্বরে আগে টোল ছিল—সে সব উঠে গেছে—ঘরদোর পড়ে গেছে। কেবল চারিপাশে একটা ভাঙা পাঁচিলের ঘের রয়েছে। সদর রাস্তা থেকে বাঁদিকে উত্তরমুখে সেই ভাঙা পাঁচিলের ঘেরের মধ্যে গাড়ি দুটো ঢুকেছিল।

বাঁদিকে উত্তরমুখে ওই উঠানে ঢুকে আবার বাঁদিকে পাঁচিলের বেষ্টনীর মধ্যে মূল বাড়িটা। পূর্বমুখী লক্ষ্মীজনার্দন এবং রাধাগোবিন্দের খড়ো মন্দির। কোণাকুনি করে দক্ষিণদ্বারী মাটির কোঠাঘর, আবার তার সঙ্গে কোণা করে ভাঙাচোরা রান্নাঘর; দূরে আর একখানা ঘর—গোয়ালঘর, উঠানে তিনটি গাই দুটি বাছুর দাঁড়িতে বাঁধা ছিল। উঠানে দাঁড়িয়ে ছিল গোষ্ঠবালা বাগদীবউ। এ বাড়ির উঠান নিকুবার বাসন মাজবার এঁটোকাঁটা কুড়োবার ওই গরুর সেবা করবার ঝি গোষ্ঠবালা। পুরনো লোক; গঙ্গাধর জটাধরের মায়ের থেকেও বয়সে বড়, গঙ্গাধর জটাধরকে সে কোলেপিঠে করেছে এককালে; এবং বউঠাকরুন ছেলেদের উপর বিরক্ত হয়ে রেগে উঠে মারতে এলে গোষ্ঠবালা দুই হাত মেলে ছেলেদের আড়াল করত।

বলত—আমাকে মার দুঘা। হেই বউঠাকরুন—!

আবার কখনও কখনও সেও রাগ করে বলত—তুই তো আচ্ছা মারহাট্টা মা। ওই কচি পিঠে পাঁচ পাঁচটা আঙুলের দাগ উঠিয়ে দিলি!

সেই গোষ্ঠবালা কিন্তু তাকে দেখবামাত্র চিনেছিল। বলে উঠেছিল—তুই জটা—আমাদের জটাধর! আমার জটাবাবা!

জটাধর হেসে বলেছিল—তুই তো আমাকে ঠিক চিনেছিস বাগদীবউ!

সে বলেছিল—হ্যাঁ বাবা! তাই না চেনে! তুই যখন জন্মালি তখন আমার শাউড়ী পাটকাম করত। আমি আসতাম যেতাম। তা' বাদে শাউড়ী মরল—আমি কাজে ঢুকলাম—তখন তুই অমুনিটি। ঠিক ওই অমুনিটি!

সে দেখিয়ে দিয়েছিল ঠাকুরঘরের পাশে ছোট ফুলবাগানটির ভিতর একটি খুব বৃহদাকারের তোড়ার মতো চেহারার সেই পুরনো কামিনী গাছটির তলায় বসে ছিল এই কাহিনীর নায়ক তিন বছর কয়েক মাস বয়সের দিগম্বর এক বালক। কামিনীগাছতলায় তার জীবনের সমারোহ সে গড়ে তুলেছে। একটা ঠাকুরবাড়ি বা একটা তীর্থাঙ্গন গড়ে তুলেছে।

ওই কামিনীগাছতলাটি ভটচাজবাড়ির অনেককালের একজন। গাছটি শোনা যায় গঙ্গাধর জটাধরের পিতামহ লাগিয়েছিলেন। এবং গাছটি আশ্চর্যভাবে একটি ছাতা বা একটি সুন্দর করে বাঁধা তোড়ার মতো আকার নিয়েছিল। যার জন্য গাছটির ছত্রচ্ছায়ার টানে গঙ্গাধরের বাপ খুড়ো ওইখানে খেলাঘরের ঠাকুরঘর পাততেন এবং তাঁদের পর ছেলেবেলায় গঙ্গাধর জটাধরও সেই পাতা ঠাকুরঘর নতুন করে সাজিয়ে খেলা করত। টিন বাজাত, পুজো করত। দোলের সময় রঙ খেলত, ঝুলনের সময় গাছের ডালে খেলনার ঝুলনা বাঁধত। রাসের সময় নিজেরাই মাটির পুতুল গড়ে রাসমঞ্চ সাজাত; আবার কালীপুজোর পর কচুডাঁটা শালুকডাঁটা তুলে এনে ঠাকুরের সামনে বলিদান দিত। বৈশাখ মাসে গাজনের পর ঠাকুর মাথায় করে ভরণও খেলত। জটাধরকে গোষ্ঠবালা দেখিয়েছিল সেই কামিনীতলায় খেলার ঠাকুরমন্দিরের সামনে বসে ছিল এক দিগম্বর বালক।

জটাধরের বুঝতে দেরি হয় নি সে কে? তবুও সে জিজ্ঞাসা করেছিল—দাদার ছেলে?

বাগদীবউ বলেছিল—হ্যাঁ মন্মথ। অর্থাৎ মন্মথ।

দাদার ছেলে হয়েছে এ সংবাদ সে পেয়েছিল—অন্নপ্রাশনের সময়ও সে পত্র পেয়েছিল। কিন্তু সে যায় নি।

আসতে তার বাধা হয়েছিল। তার কৃতকর্মের জন্যই বাধা। তখনও কৌলীন্যপ্রথার প্রবল প্রতাপ। জাতিকুলের সম্মান সবার উপরে। বাস্তব বুদ্ধিতে প্রখর জটাধর কুলভঙ্গ করে বেশ হাজার কয়েক টাকাওলা বাড়িওলা কোনো এক শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করে তার বিষয়আশয় সব কিছুরই মালিক হয়ে বসেছে। খবরটা চেপেই রেখেছিল। তবুও সে মনের গোপন অপরাধবোধের জন্য দাদার সামনে আসতে সাহস করে নি। বউকে

কলকাতায় রেখে একলা একলাও আসতে পারে নি। এবার এসেছে বাধ্য হয়ে, দাদার জরুরী চিঠি পেয়ে। না এসে উপায় ছিল না। ছেলেটির চেহারা সত্যই ছিল দেবশিশুর মতো।

আয়ত চোখ টিকালো নাক ধবধবে রঙ। কিন্তু ছেলেটি ছিল একটা ভ্যাবলা ভ্যাবলা রকমের ; দেখেই বোঝা যেত যে, এ-ছেলে বোকাসোকা ভালমানুষ ছেলে। একটু নাড়লে চাড়লেই লোকে বুঝতে পারত ছেলেটি বুদ্ধিহীন। জটাধর এগিয়ে গিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল—তুমি কে গো বাবু ?

ছেলেটি ভ্যালভ্যাল করে তার দিকে বড় বড় চোখ দুটি মেলে তাকিয়ে ছিল। বোকা অর্থহীন দৃষ্টি।

জটাধর আবার ডেকেছিল—বাবু !

ছেলেটি এবার কথা বলেছিল। কি যে তার মনে হয়েছিল তা' কে বলবে ? সে কথা সেও বলতে পারে না ; সে বলেছিল—কুকুর—ঠাকুর। ওই !—বাবাঃ !

কিছুটা দূরে বাড়ির উচ্ছিষ্টভোজী কুকুরটা শুয়ে ছিল—সেটার দিকে আঙুল দেখিয়ে দিয়েছিল। কথাটার যে কি অর্থ তা নির্ণয় করা সহজ নয়। কুকুরটাও সামনে—পাশে ঠাকুরঘরে ঠাকুরও ছিলেন। সুতরাং এইটে ঠাকুর ওইটে কুকুর এও হতে পারে আবার কুকুর কামড়াবে ঠাকুর মারবে বা শাস্তি দেবে এও হতে পারে ; কারণ বাবাঃ বলে সে ভয় প্রকাশ করেছে।

জটাধর কিন্তু অন্য মানে করেছিল ; অনায়াসে একমুহূর্তে সিদ্ধান্ত করে ছিল যে ছেলেটির নিশ্চয় দেব অংশে জন্ম ; অন্যথায় সে এমন অনায়াসে কুকুরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন প্রসুপ্ত ঠাকুরকে আবিষ্কার করলে কি করে ! তার মনে পড়ে গিয়েছিল মহাভারতের মহাপ্রস্থানের পথে যে কুকুরটি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গ নিয়েছিল তার কথা।

এর পর জটাধর তার সামনে একটি নতুন পয়সা এবং একটা আধুলি মেলে ধরেছিল—তাতেও সে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিল। সে অর্থাৎ ওই ছেলেটি পয়সাটিই নিয়েছিল আধুলিটি নেয় নি। তবে আধুলিটি যে পুরনো ছিল চকচকে নতুন ছিল না সে নিয়ে জটাধর কোনো গুরুত্বই আরোপ করে নি।

ইতিমধ্যে ঘাট থেকে স্নান সেরে ফিরেছিল নয়নতারা। সে দেবরের এই শহুরে সংস্করণ চেহারা দেখে প্রথমটাতে ও মা গোঃ বলে পিছন ফিরে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। জটাধর হা হা শব্দে হেসে উঠেছিল ; গোষ্ঠবালাও খিলখিল হাসি হেসে ভেঙে পড়েছিল। নয়নতারা বলেছিল—মর মর মর ! হাসিস কেন লা মুখপুড়ী ? লোকটাকে বেরিয়ে—।

'যেতে বল' আর মুখ থেকে বের হয় নি। জটাধর বলেছিল—ও বউদি এ যে আমি গো। জটাই। তার সঙ্গে সঙ্গেই গোষ্ঠবালা বলেছিল—ওমা চিনতে লারছ ? ও যে দেওর তোমার।

নয়নতারাও ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিল—তুমি ! তুমি আমার 'জটম'।

নয়নতারা বারো বছরে বাড়ির গিন্নী হয়েছিল—শাশুড়ী মারা গিছলেন। তখন জটাইয়ের বয়স ছিল আটেরও কম। নয়নতারা তাকে 'জটম' বলে ডাকত।

এমনই আনন্দমুখর সময়ের মধ্যে এসে পেঁছিছিল গঙ্গাধর। ভোরে স্নান সেরে গ্রামান্তরে যজমান বাড়ির কাজ সেরে বাড়ি এসেছিল কাঁধে ভোজ্য দ্রব্যের সামগ্রীর একটি পোঁটলা চাপিয়ে নিয়ে।

গঙ্গাধর বলেছিল—জটাধর !

—হ্যাঁ দাদা। বলে সে প্রণাম করতে গিয়েছিল।

গঙ্গাধর পিছিয়ে গিছল। বলেছিল—ঠাকুরের পুজো হয় নি এখনও। পথের কাপড় ছাড় চান কর।

ইতিমধ্যে গোষ্ঠবালা চিৎকার করে উঠেছিল—ও মা ছেলের কাণ্ড দেখ!

এ—হে—হে—হে!

নয়নতারা গভীর আক্ষেপে হাত জোড় করে আকাশের দিকে মুখ তুলে বলেছিল—হে গোবিন্দ হে জনার্দন—সন্তান হয় নি হয় নি—সে এক ছিল। দিলে যদি তবে এ কি দিলে!

গঙ্গাধর ছেলের দিকে তাকিয়ে আক্ষেপ করেই বলে উঠেছিল—হায় রে আমার কপাল!

জটাধর অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল ভাইপোর দিকে।

ব্যাপারটা আর কিছু নয়। ওই কুকুরটা এসে ওই শিশুটির কাছে দাঁড়িয়ে পরমসমাদরের সঙ্গে তার মুখ চাটছে এবং ছেলেটি একহাতে কুকুরটির গলা ধরেছে অন্য হাতে সদ্যসন্তানবতী সরমা জননীর স্তনবৃন্তটি খুঁটছে। আশেপাশে বাচ্চা কটাও এসে জমেছে ঘুরছে।

জটাধরের ধারণা যেন ধোঁয়া কুয়াশা সমস্ত কিছুর অস্পষ্টতা বিদীর্ণ করে দিনের আলোয় আলোকিত হয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সে বলেছিল—এ ছেলে তোমার মহাপুরুষ দাদা। এ ঘরে থাকবে না। শংকর বুদ্ধের মতো গৌরাঙ্গদেবের মতো, দেখো তুমি—

মধ্যপথে বাধা দিয়ে নয়নতারা বলে উঠেছিল—ল্যালা-হাবা—ঠাকুরপো ওটা একটা—! কি বলব তোমাকে—! হায় হায় হায়!

গঙ্গাধর বলেছিল—ওর কোষ্ঠী আমি বিচার করে দেখেছি রে। ও জড়বুদ্ধি অক্ষম লোক হবে জটাধর!

জটাধর স্বীকার করে নি। সে বলেছিল—দেখো তুমি। ও হবে মহাপুরুষ। সন্ন্যাসী। পরমহংস টরমহংসের মতো ঈশ্বরজানিত মানুষ!

গঙ্গাধর হেসেছিল। অবজ্ঞার হাসি এবং সেই সঙ্গে মর্মান্তিক বেদনার হাসিও বটে।

জটাধর হতবাক হয়ে গিয়েছিল।

কথাটায় এইখানেই একরকম ছেদ পড়ে গিয়েছিল সেদিন। নয়নতারা তাড়াতাড়ি জলের ঘড়াটা দাওয়ার উপর নামিয়ে রেখে সেই ভিজে কাপড়েই ছেলের হাত ধরে তুলে প্রায় ঝুলিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল পুকুরঘাটে। নয়নতারা চলে যেতেই গঙ্গাধর ভাইকে একলা পেয়ে বলেছিল—চিঠি পেয়েই তো এসেছিস?

—হ্যাঁ। পেয়েছি চিঠি। চিঠি না পেলে আসব কোন্ সাহসে?

—তুই ঠাকুরের অংশ বিক্রি করবি? সত্যি?

—না। ও তুমি মিথ্যে শুনেছ।

—চিঠি লেখে নি ওরা?

—লিখেছিল। উত্তর দিই নি।

—লোক যায় নি?

—তাও গিয়েছিল।

—কি বলেছিস? বলিস নি, ভেবে দেখি?

—তা বলেছি। তার মানে ওদের মুখ বন্ধ করে রেখেছি। আমার কুল ভেঙে বিয়ে করার কথা গাঁয়ে চাকলায় রটিয়ে দিয়ে ভটচাজবাড়ির মাথা হেঁট করবে—হয়তো তোমাকেও ছোট করবে। এইজন্যে—।

গঙ্গাধর বললে—কিন্তু তাই বা করলি কেন? বংশমর্যাদা কুল টাকার জন্যে জলাঞ্জলি দিলি। সাতপুরুষকে নিরয়গামী করলি! তুই তো ব্যবসাতে ভালই রোজগার করেছিস!

জটাধর মাথা হেঁট করেছিল।

ঠিক এই সময়েই নয়নতারা কেচে কুচে পবিত্র এবং পরিশুদ্ধ করে ছেলেকে কোলে নিয়ে বাড়ি ঢুকে বলেছিল—তারপর! ঠাকুরপো এত সব জিনিসপত্তর তুমি এনেছ কেন? ঐশ্বর্য

দেখাতে এনেছ—?

এ যেন নয়নতারা অকস্মাৎ মানুষী মূর্তি ছেড়ে নাগিনী মূর্তিতে ফণা তুলে দাঁড়াল।

জটাধর নয়নতারার এই মূর্তির স্বরূপকে ভালো করেই জানে। এককালে তাকে নিয়েই এই মূর্তি ধরে নয়নতারা শাসনোদ্যত গঙ্গাধরের সামনে এসে দাঁড়াত। জটাধর শিউরে উঠে বললে—বউদি—কি বলছ—বউদি—

গঙ্গাধরও শংকিত হয়েছিল—সেও বলেছিল—বড়বউ!

নয়নতারা স্বামীকে ধমক দিয়ে বলেছিল—চুপ কর তুমি! তুমি বুঝবে না আমি কি বলছি। ও বুঝেছে, আমি কি বলছি!

এর জবাবে গঙ্গাধর বলেছিল—তার উত্তর আমি তোমাকে দিচ্ছি, তুমি মেলা বকবক করো না, লোক হাসবে।

কথা কেড়ে নিয়ে নয়নতারা বলেছিল—তোমরা ভাইয়ে ভাইয়ে লোক হাসাবে আর লোক হাসবে না কেন?

এবার গঙ্গাধর একটু শক্ত কণ্ঠস্বরে বলেছিল—না, লোক হাসাতে ও আসে নি। ঠাকুরের অংশ বিক্রি ও করে নি, করবে না। চক্রবর্তীরা দালান করে ঠাকুরকে নিয়ে গিয়ে ছ'মাস রাখবে এ ওদের গুজব—ওরা করেছে—জটা কথা দেয় নি।

একটু আড়ালের কথা বোধ করি বলার প্রয়োজন আছে।

গোবিন্দপুরে চক্রবর্তীদের সচ্ছল অবস্থা অনেক দিন থেকেই। পরিবারটির বিষয় ব্যবস্থার কাটা খাতটি মোটামুটি একপুরুষ বেশ কানায় কানায় ভর্তি হয়ে প্রবাহিত রয়েছে। উপস্থিত তাতে যেন জোর ধরেছে। জোয়ারের জলই হোক আর বৃষ্টির জলই হোক খাতটির কানা ছাপিয়ে ছাপিয়ে উঠছে। এটা ওটা সেটা পাঁচটা কীর্তিও করেছে চক্রবর্তীরা। একটা মজা পুকুর কাটিয়েছে—কুয়ো তৈরি করিয়েছে—একটা ফলের বাগান করেছে। বৃক্ষ প্রতিষ্ঠাও করেছে। এখন ইচ্ছে ঘরে ভগবানের অধিষ্ঠান হয়। না থাকলে অসুবিধে হয়। সারা গ্রামে ভগবান অর্থাৎ শালগ্রাম শিলা নারায়ণ বলতে ওই ভটচাজবাড়িতে লক্ষ্মীজনার্দন। আর গোবিন্দ বিগ্রহ সেও ওদের বাড়িতে। পর্বেপার্বণে বাড়ির ক্রিয়াকর্মে ঠাকুর নিয়ে মুশকিলে পড়তে হয়। সে এখন ভটচাজবাড়ি যাও নেমন্তন্ন কর, সারাটা পথ অর্থাৎ ভটচাজবাড়ি থেকে চক্রবর্তীবাড়ি পর্যন্ত ঝাটপাট দাও গঙ্গাজল ছড়াও তখন ঠাকুর আসবেন, তাও আসবেন গঙ্গাধর ঠাকুরের সময়মতো। নতুন ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করায় অনেক বিপদ আছে ভয় আছে। বিগ্রহ বা শিলা নারায়ণ এনে প্রতিষ্ঠা করলেই হয় না—সে-ঠাকুর কেমন সহনশীল হবেন, সেইটে হল সব থেকে বড় কথা। কোথাকার রঘুরাম শালগ্রাম নারায়ণ সম্পর্কে একটা ছড়া চলিত আছে—

"বাবা রঘুরাম, সামান্য অপরাধে ভিটেতে ঘুঘু চরান!"

গর্ব আছে এক ব্রাহ্মণ শালগ্রাম শিলা এনেছিল জেলেনীর মাছের ডালা থেকে। ঠাকুর তার গোটা বংশটাকেই মানবজন্ম থেকে মুক্ত করে বৈকুণ্ঠবাসী করে ছেড়েছিল।

তাই জানাশোনা বেশ শিষ্টশান্ত অল্পে সন্তুষ্ট এই ভটচাজবাড়ির লক্ষ্মীজনার্দন এবং গোবিন্দের কিছু অংশ তারা কিনতে চায় অনেক দিন থেকে। গঙ্গাধর জটাধরের পিতার আমলে বুড়ো চক্রবর্তী বলেছিল ঠাকুরের পাকা দালান করে দেবে, পুজোপার্বণে অনেক উৎসব করবে—তার সব খরচ ওরা করবে। দেবোত্তর করে জমিজেরাত দেবে—তার অর্ধেক অংশের মালিকানিও দেবে ভটচাজদের। এ ছাড়াও দশ বিঘে ব্রহ্মত্র নিষ্কর জমি দেবে ভটচাজদের। কিন্তু গঙ্গাধরের বাপ তা' দেন নি। গঙ্গাধরদের আমলেও একবার কথা

উঠেছিল। উঠেছিল যখন তখন ভটচাজদের খানিকটা ডামাডোল চলছে। বাবা মা অল্পদিন আড়াআড়ি মারা গেছে। গঙ্গাধরের বয়স তখন আঠারো উনিশ, জটাধরের আট (মধ্যের তিনটি ছেলেমেয়ে ছিল না)—বাড়িতে বউ নয়নতারার বয়স বারো। কিন্তু গঙ্গাধর ঠাকুরের অংশ চক্রবর্তীদের দেন নি।

তারপর এতকাল পর আবার একবার তারা উঠে পড়ে লেগেছে। জটাধর ঘর থেকে চলে গিয়ে অবস্থা ফিরিয়ে একজন 'মারচেণ্ট' হয়ে বসেও যখন দেশে এলো না তখন তারা তার কাছে গিয়ে প্রস্তাব দিয়েছে—ঠাকুরের ওই অর্ধেক অংশ তুমি আমাদের বিক্রি কর—আমরা তোমাকে এক হাজার টাকা দাম দেব এবং তোমাদের যে পৈতৃক দেবোত্তর জমি আছে তারও দাম আলাদা দেব, সেও পাঁচ বিঘের দাম হিসেবে আড়াইশো টাকা হবে। এ ছাড়াও অন্য প্রস্তাব দিয়েছে তারা। জটাধর যে এক শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণ-কন্যাকে বিবাহ করেছে তাও তারা জানে, বলেছে—আর যদি এই হয় যে, জটাধর এই বিয়ে করেছে বলে দাদার হাতে লাঞ্ছনার ভয়ে পতিত হবার ভয়ে গ্রামে আসতে পারছে না তাহলে তারা কথা দিচ্ছে যে জটাধর এখানে এসে বাড়িঘর করুক বসবাস করুক—চক্রবর্তীরা জটাধরের সঙ্গে থাকবে; কোনো লাঞ্ছনা হতে দেবে না। সেক্ষেত্রে তারা ঠাকুরের অংশ চায় চার আনা; চার আনা জটাধরেরই থাকবে।

ঘটনাটা এই।

এই কথাবার্তার একটা গুজগুজে ফুসফুস ধ্বনি প্রতিধ্বনি বা সাড়া ইশারা গ্রামটায় কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। গঙ্গাধরও শুনেছিল নয়নতারাও শুনেছিল কিন্তু কেউ কাউকে বলে নি—সযত্নে চেপে রেখেছিল।

গঙ্গাধর অবশেষে পত্র লিখেছিল জটাধরকে।

পরম কল্যাণনিলয়েষু,

অশেষ মঙ্গল কামনা ও অসংখ্য আশীর্বাদপূর্বক তোমার জ্ঞাতার্থে তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি। আজ ছয় বৎসরাধিক তুমি গৃহত্যাগ করিয়া বিদেশে বসবাসী হইয়াছ; তিন চার বৎসর পূর্বে একখানি মাত্র পত্রযোগে জ্ঞাত করাইয়াছিলে যে বহুস্থানে কর্মসূত্রে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে কলিকাতা নগরে ব্যবসাবাণিজ্য করিতেছ ভালই আছ। গৃহে আইস নাই। এক্ষণে শুনিতেছি তুমি আরও বহুতর উন্নতি করিয়াছ। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইহা আমাদের গৃহদেবতা প্রভু লক্ষ্মী-জনার্দন ও শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউয়ের অনুগ্রহ তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি সংবাদ পাইতেছি যে তুমি সেই গৃহদেবতার সেবাইত স্বত্বের তোমার আট আনা রকম বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছ। ইহা হইলে আমি বিষপানপূর্বক অথবা গলদেশে রজ্জু-সহযোগে প্রাণ বিসর্জন দিব। আমি তোমার দেবোত্তরের অর্ধেক অংশমত জমির দাম দিতে প্রস্তুত আছি। তুমি এক সপ্তাহর মধ্যে আসিয়া সমস্ত ব্যবস্থা না করিলে সপ্তাহান্তে আমি সংকল্পমত কর্ম করিব জানিবে।

নয়নতারা পত্র লেখে নি শুধু গোবিন্দের চরণে মাথা কুটেছে আর মনে মনে জটাধরকে নিষ্ঠুর কঠোর তিরস্কার করেছে।

জটাধর দাদার পত্র পেয়ে না এসে পারে নি। সে ছুটে এসেছে। সপ্তাহ শেষ হবার এক দিন আগেই এসেছে।

তার সঙ্গে এ কথাও সত্য যে চিঠি পাবার পর এই কয়দিন জাগ্রত অবস্থায় মনের মধ্যে সে যেন নিষ্ঠুর রাগে রাগান্বিতা কঠিন তিরস্কারকারিণী বউদির সম্মুখীন হয়েছে—এবং রাত্রে

ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন দেখেছে—বউদি তাকে যাচ্ছেতাই বলে বকছেন আর সে নিতান্ত নিরীহের মতো হাত জোড় করে বলছে—মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে—আমি তোমার পা ছুঁয়ে বলতে পারি এ মিথ্যে।

নয়নতারা ঝংকার দিয়ে উঠেছিল—বলেছিল—মিথ্যে! শঠ কোথাকার প্রবঞ্চক কোথাকার! মুখখানা করেছে দেখ না! যেন ভাজা মাছ উলটে খেতে জানে না! নে—এই পা এগিয়ে দিচ্ছি। বল হাত দিয়ে বল—তুই লুকিয়ে বিয়ে করেছিস এ কথা মিথ্যে! বল—আমি তোর মায়ের তুল্য। বারোবছরের মেয়ে আমি—ঠাকরুন আমাকে বলেছিল—বউমা জটাকে তোমার হাতে দিলাম—ওকে দেখো। বল—বিয়ে করিস নি! বল—

জটাধর বলেছিল—বিয়ে আমি করেছি বউদি! না তো বলছি না! বলছি দোষ হয়েছে।

—কেন করলি? টাকার লোভে?

—না বউদি। টাকার লোভ নয়। তোমার পা ছুঁয়ে বলতে পারি।

—তবে?

নতমুখে জটাধর বলেছিল—ওদের বাড়ির পাশেই দোকান করেছিলাম। শূদ্রদের পুজো করে বাপ—মেয়েটা ডাগর হয়েও আইবুড়ো হয়ে ছিল। ওদের বাড়ি ভালো ইন্দারা ছিল—জল নিতাম। দেখা হত। আমার দোকানেই জিনিস নিত। ওর বাপের সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল। তারপর—হয়ে গেল!

—খবর দিস নি কেন?

—সাহস হয় নি। ভেবেছিলাম বিয়ে করতে দেবে না।

—বলি হ্যাঁরে, বাড়ি ছেড়ে পালাবার সময় তোকে আমি আশীর্বাদ করি নি? বলি নি?—জটম আমি তোকে আশীর্বাদ করছি—তুই যা; কলকাতায় বা দেশবিদেশে চলে যা। এ বামুনপণ্ডিতি তোর হবে না। এ ধাত তোর নয়। তাতে মঙ্গল হবে ভালো হবে! বলি নি?

—বলেছিলে।

—তবে? ওরে ছুঁচো, কি করে ভাবলি বিয়ে হতে দেব না—

গঙ্গাধর এতক্ষণে কথা বলেছিল। আশ্চর্য গম্ভীর এবং ধীর সঙ্গে সঙ্গে অলঙ্ঘনীয় সে কণ্ঠস্বর, বলেছিল—ও ঠিকই বুঝেছিল বড়বউ—বিয়ে আমি হতে দিতাম না। সে তুমি দিতে চাইলেও না। দিতাম না, হত না।

একমুহূর্তে একঘর আলো এবং ঘরভরা উত্তাপ যেন একই সঙ্গে অন্ধকার ও হিমার্ত হয়ে গিয়েছিল। জটাধর শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল সে কণ্ঠস্বরে। নয়নতারাও চকিত হয়ে স্বামীর দিকে ফিরে তাকিয়েছিল।

নয়নতারা স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলেছিল—তা তুমি পারতে। সব পার তুমি।

কথা শেষ করে সে আর দাঁড়ায় নি, রান্নাশালের দিকে চলে গিয়েছিল। গঙ্গাধর ঘটনাকে গ্রাহ্য করে নি, সে শান্ত এবং শীতল কণ্ঠেই বলেছিল—দেখ তুই ঠাকুরের কাছে বিষয় চেয়েছিলি আশয় চেয়েছিলি টাকাকড়ি সোনা রুপো চেয়েছিলি তুই তা পেয়েছিস—আরও পাবি। এই তো তোর বয়স একুশ পার হয়ে বাইশ শুরু হয়েছে। জীবনের সবটাই পড়ে। আমি ঠাকুরকে নিয়েই আছি। সে ঠাকুর তুই বেচে দিস নে।

—তোমার সামনে দিব্যি গেলে বলেছি দাদা—

—বলেছিস কিন্তু সামনে সারা জীবন তো তোর পড়ে রয়েছে। কলকাতার বাড়িতে

আস্তাবল হবে ঘোড়া থাকবে ছেলেমেয়ে হবে—মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাইকে ঘর জামাই রাখবি। ইচ্ছে তোর তখন হবে—বাড়িতে ঠাকুরবাড়ি করি নাটমন্দির করি, ঠাকুর এনে রাখি। হয়তো আমি থাকব না তখন—তখন—।

এইখানে থেমে গিয়েছিল গঙ্গাধর। তারপর হেসে বলেছিল—থাকলেই বা কি—তুই কলকাতা থেকে হুকুম দিবি—

—দাদা তুমি বড় নিষ্ঠুর! পাথর তুমি—

—না রে জটাই, আমি সত্যি কথা বলছি। তার উপর আমার ভাবনা ওই ছেলেটাকে নিয়ে। ছেলেটাকে তো দেখলি। ওর কোষ্ঠি বিচার করে আমি দেখেছি রে। বড় খারাপ কোষ্ঠি রে বড় খারাপ। ভিখিরীর অধম হবে রে। আমি ওরই জন্যে দেবসেবাটুকু চাচ্ছি তোর কাছে। পাকা দেবোত্তর করে দেব। বিক্রি করতে পারবে না। সেবা করবে, খাবে। যজমান রাখাও হবে পেটও চলবে। বুঝলি!

জটাধর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল—ওকে তুমি আমাকে দেবে দাদা? আমি ওকে পড়াব। দেখব কি হয়!

—না রে। প্রথম সন্তান আমার। ওকে এক ভগবান ছাড়া আর কারুর কাছে দিতে আমি পারব না। আমার কাছছাড়া ওকে আমি করব না। একটু হেসে আবার বলেছিল—এই তো আবারও কেউ একজন আসছে। তারপরও আছে। প্রথম সন্তান হল না হল না করে বাইশ বছরে সন্তান হয়েছে। এই আবার এখন নাও—।

কথাটা ঘুরে গেল। জটাধর বললে—বউদির শরীর এবার বড় খারাপ দেখলাম।

—হ্যাঁ। ঘুষঘুষে জ্বর হয়, পা ফুলছে, অম্বল হয়। কবরেজ পাঁচন দিয়েছে বড়ি দিয়েছে—ধরছে কই?

সেবার লক্ষ্মীজনার্দন ঠাকুর এবং রাধাগোবিন্দ যুগল বিগ্রহের সেবাইত স্বত্বের আট আনা রকম যার অধিকারী ছিল জটাধর ভট্টাচার্য সেই আট আনা রকম সেবাইত স্বত্ব জটাধর ভট্টাচার্য তার ভাইপো মন্মথ ভট্টাচার্যকে দান করে গ্রাম থেকে চলে গিয়েছিল।

এইখানেই উপাখ্যান বা আখ্যায়িকার উপক্রমণিকার শেষ। আখ্যায়িকার আরম্ভ হল আরও আট বৎসর পর। তখন নয়নতারা বিগত হয়েছে। গঙ্গাধর প্রায় তেমনিটিই আছে। সব থেকে আশ্চর্য পরিবর্তন ওই ছেলেটির। তাকে আর চেনাই যায় না।

প্রথম পর্ব

১

এইবার আখ্যায়িকার আরম্ভ। উপক্রমণিকা ওই ১৮৭৬ সালের আট বছর পর। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে—১২৯১ বঙ্গাব্দে। বড়দিনের সময়। পৌষ মাস। জটাধর আবার এলো গোবিন্দপুরে। অতর্কিতে আসে নি এবার, এবার খবর দিয়েই এসেছে। এবং সস্ত্রীক এসেছে। এবার দাদার চিঠি পেয়ে আসে নি, এবার এসেছে নিজের তাগিদে; লক্ষ্মীর ভাগ নিতে এসেছে। জটাধরের পূর্বস্ত্রী কলকাতার বাড়িতে গোবিন্দপুরের ভটচাজবাড়ির বংশলক্ষ্মীর ভাগ নিয়ে গিয়ে কলকাতায় লক্ষ্মী পাতবেন। এই পৌষ সংক্রান্তির সময়েই পৌষলক্ষ্মীর অর্চনা হয় বাংলাদেশ জুড়ে, এই সময়েই এ বাড়ির লক্ষ্মীর হাঁড়ি থেকে কড়ি শাঁখ কাঠের পেঁচা এবং নতুন ধানের আঁটি নিয়ে যাবে কলকাতায়। কলকাতায় জটাধরের এখন সম্পদ সৌভাগ্যের শেষ নেই। ধুলোর মুঠো তার হাতের মধ্যে সোনার মুঠোয় পরিণত হয়ে যায়। বড়বাজারে তার মস্ত গদি, পোস্তায় তার ফলাও কারবার। সে সবের বিস্তৃত বিবরণ থাক। মোটকথা জটাধরের তখন লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার; প্রকাণ্ড বাড়ি জেলেটোলায় মধু রায় লেনে; তিনটে ঘোড়া, জুড়ির জন্য একজোড়া দুটো আর কম্পাসে টানে একটা; সেটা খাস ওয়েলার জাতের। জটাধরের সব আছে নেই কেবল সন্তান। বিবাহ সে করেছে প্রায় বারো বছর; বউ ছিল ডাগর মেয়ে; জটাধর তার বউদির কাছেই বলেছিল ডাগর মেয়েটির সঙ্গে প্রায় ভালবাসা করেই বিয়ে হয়েছিল; বয়স ছিল তেরো বছরের শেষ সীমানায়; বারো বছরের কৃষ্ণভামিনী ছোটবউ এখন পঁচিশ বছর ছাড়াই ছাড়াই করছে—এর মধ্যে চার-চারবার সন্তান ধারণ করেও সন্তানের মা হতে পারে নি; তিনটে ভ্রূণ অবস্থাতেই নষ্ট হয়েছে, একটা ভূমিষ্ঠ হয়েছিল মৃত অবস্থায়। কার্তিক পুজো করেছে; মানতও দেওয়া হয়েছে অনেক। কালীঘাট, তারকেশ্বর, বৈদ্যনাথধাম—এমন কি গোয়াড়ী কেষ্টনগরে পাঁচুঠাকুর পর্যন্ত মানত করে মাদুলি করা হয়েছে। অবশেষে কৃষ্ণভামিনীর এক বুড়ী পিসী তারকেশ্বরে ধরনাও দিয়ে এসেছে। কিন্তু ফল কিছু হয় নি।

এমত সময় হঠাৎ একদা কৃষ্ণভামিনীর মনে হয়েছে যে ভট্টাচার্যবাড়ির বংশলক্ষ্মীকে অবহেলা করা হয়েছে এবং বংশদেবতাকে বেচে দেওয়া হয়েছে যেখানে, সেখানে বংশ থাকে কেমন করে। তাই লক্ষ্মী নিতে এসেছে সে নিজে। নারায়ণ শিলার অনেক হাঙ্গামা—অনেক আচার-আচরণ ও থাক। ওই ঠাকুরটি নিয়ে গঙ্গাধর করে খাচ্ছেন—তা' তিনি করে খান।

গঙ্গাধরের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে লক্ষ্মীর ভাগ চাইবারও সাহস জটাধরের নেই কিন্তু তার আছে। একটা দুর্বলতা ছিল, তার বাপ ছিল শূদ্রযাজক, শুধু শূদ্রযাজকই নয় সোনাগাছি রামবাগান অঞ্চলেও তার যজমান ছিল অনেক; কিন্তু সে দুর্বলতাও এবার দূর হয়েছে।

গোবিন্দপুর থেকে তিন মাইল দূরে ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম রামচন্দ্রপুর, এখানকার মুখুজ্জে বাঁড়ুজ্জেরা কলকাতায় গিয়েছে অনেক দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যে ওকালতিতে চাকরিতে কলকাতাতেই তারা গণ্যমান্য ব্যক্তি। ঘাড় চেঁচে চুল ছাঁটে—মোম দিয়ে গোঁপের ডগা পাকায়, কোট পাতলুন কামিজ ওয়েস্টকোট পরে, চুরোট খায় অনেকে; তারা বছরে দেশে আসে একবার, ওই বড়দিনের সময়। পুজোর সময় যায় কাশী পুরী মধুপুর, কেউ কেউ পাহাড়েও যায়; তখন দেশে আসা হয় না; আসে বড়দিনের সময়। ২৩শে ডিসেম্বর

থেকে একেবারে ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত নাগাড়ে ন দিন ছুটি—এই সময় কলকাতা থেকে কাপ কড়াইশুঁটি পাঁপর মিষ্টি কেক বিস্কুট প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য বাস্কেট বোঝাই করে নিয়ে আসে। অনেকটা পিকনিকের মন নিয়েই আসে। কিন্তু পিকনিকে একটা ছাড়াছাড়া ভাব আছে। সেটা কাটাবার জন্যই বড়দিনে ওই খ্রীষ্টজন্মদিন ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে বারোয়ারি কালীপুজোর ব্যবস্থা হয়েছে। কলকাতার যাত্রা আসে, খ্যামটানাচের দল আসে, রোশন-চৌকি বাজনা আসে কলকাতা থেকে। রামচন্দ্রপুর গ্রামখানা পাকাবাড়ির গ্রাম। অধিকাংশই পাকা দোতলা বাড়ি—কয়েকখানা বাড়ি বেশ পুরনো। সে সব বাড়িতে পাকা নাটমন্দির এবং ঠাকুরদালান আছে—পঙ্কের কাজ আছে, রঙিন কাচ বসানো নকশা আছে। তাদের বাড়িগুলি ভরে উঠেছে—নিজেদের কলকাতা-প্রবাসী আপনজনেরা এসেছে, তার সঙ্গে এসেছে কুটুম্ব স্বজন বন্ধুবান্ধব। এই রামচন্দ্রপুরের মুখুজ্জেবাড়ির সেজতরফের জয়রামবাবুর নেম-তন্ন পেয়ে তবে স্ত্রীকে নিয়ে এসেছে জটাধর। জয়রাম মুখুজ্জেদের কলকাতায় জাহাজ খালাস বোঝাইয়ের কারবার আছে এবং জাহাজের মাল সরবরাহও করে থাকে মুখুজ্জেরা। তাদের টাকা ধার দেয় জটাধর এবং মাল সরবরাহের ব্যাপারে কিছু কিছু মালও যোগান দেয়। নেমতন্ন সেই সূত্রে। মাল সরবরাহের ফর্দের মধ্যে পঞ্চমকারকে অতিক্রম করে অনেক বেশী মকার আছে—মরিচ মসলা ময়দা মদ মুর্গী মাটন মাছ প্রভৃতি ম অক্ষর গোড়ায় দিয়ে খাদ্য-দ্রব্যের তো অভাব নেই, এবং এর অনেকগুলিই আমাদের ধর্মমতে অস্পৃশ্য নিষিদ্ধ বস্তু। তবে তাঁরা তা' ছোঁয়াছুঁয়ি নিজেরা করেন না। আলাপ এবং ঘনিষ্ঠতা যখন এই সূত্রে তখন জটাধরের শ্বশুরের যত দোষই থাক তা কোনোক্রমেই জটাধরের স্ত্রীকে এবং জটাধরকে স্পর্শ করে নি। তারাও বিনা দ্বিধায় বিনা সংশয়ে এসেছিল রামচন্দ্রপুর; সেখানে বড়দিনে কালীপুজো শেষ করে যাত্রাগান শুনে খ্যামটানাচ দেখে গরুর গাড়ি করে গ্রামে এলো।

গ্রামেও তখন কিছু পরিবর্তন হয়েছে। রাস্তাটার কিছু উন্নতি হয়েছে। যে সব জায়গা-গুলোয় বর্ষায় কাদা হত সে সব স্থানগুলোতে রামচন্দ্রপুরের চাটুজ্জেদের পুরনো ভাঙা বাড়ির খোয়া এনে ফেলা হয়েছে; দু'পাশে নয়ানজুলি বা জলনিকাশী নালা কাটা হয়েছে; পথে একটা নালা ছিল সেটার উপর একটা সাঁকোও তৈরি হয়েছে। চক্রবর্তীদের কাঁচাবাড়ি ভেঙে পাকা একতলা দালান হয়েছে। সামনে খামারবাড়িতে ঠাকুরঘরও হয়েছে; কিন্তু সেখানে শালগ্রামের বা পাথরের বিগ্রহের নিত্যসেবা বসায় নি, সেখানে কার্তিক মাসে প্রতিমা গড়ে জগদ্ধাত্রী পুজো হয় এবং মাঘ মাসে হয় সরস্বতী পুজো। আর বারো মাস সেখানে একটি পাঠশালা বসে। পণ্ডিতি করে মাঝেরপাড়ার অধিকারী উপাধিধারী বামুনবাড়ির বুড়ো অধিকারী; এতকাল সে করত জমিদারী সেরেস্তায় আদায়পত্রের কাজ।

ভটচাজবাড়িতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

প্রথম হল নয়নতারা নেই। বিগত হয়েছে। আট বছর আগে জটাধর যখন এসেছিল তখন সে অন্তর্বত্নী ছিল; শরীরও খারাপ ছিল। পাঠকদের মনে পড়বে গঙ্গাধর বলেছিল—কবিরাজের ওষুধের আর অসুখে যেন কোনো ক্রিয়াই হচ্ছে না। সেই অসুস্থ অবস্থায় আর একটি সন্তান প্রসব করেও আরও মাসকয়েক জ্বর এবং তার সঙ্গে পেটের অসুখে ভুগে কোনো মতে সেরে উঠেছিল। তারপর আবার সন্তান এসেছিল গর্ভে। সেই সন্তানকে প্রসব করতে গিয়ে আর বাঁচে নি। সন্তান প্রসূতি দুই একসঙ্গে গেছে। সেও হল আজ পাঁচ বছরের কথা।

দ্বিতীয়, ওই ছোট ছেলেটি। মন্মথের ছোট—প্রমথ, দ্বিতীয় সন্তান নয়নতারার; জটাধর ওকে দেখে নি। রুগ্‌ণ তীক্ষ্ণমেজাজী—অহরহ কাঁদে আর চিৎকার করে।

ভটচাজবংশের রূপ আছে একথা আগেই বলেছি। যারা ভটচাজদের চোখে দেখেছে তাদের আর বলতে হয় না। গঙ্গাধরের চেহারা, লোকে বলে মহাদেবের মতো। গৌরকান্তি দীর্ঘকায় মেদবর্জিত শক্তসমর্থ দেহ—আয়ত চোখ, প্রসন্ন হাসি, মাথায় একমাথা ঘন কালো চুল, প্রশস্ত বুকের ওপর ক্ষারে কাচা বা মাজা সাদা ধবধবে মোটা পৈতের গোছা এবং তুলসীর মালা নিয়ে মানুষটি সত্যই কোনো এক উদাসী গরীব দেবতাকেই মনে করিয়ে দেয়। আগের থেকে গঙ্গাধরেরও বেশ একটু পরিবর্তন হয়েছে; চেহারায় ঈষৎ স্থূলতা এসেছে, প্রসন্নতা আরও বেড়েছে, মাথায় ব্রহ্মতালুর পিছনে ছোট একটি টাক দেখা দিয়েছে। কিন্তু কোনোটাই অবস্থার সচ্ছলতার জন্য নয়, দুটোই বয়স বাড়ার জন্য—এর সাক্ষী গ্রামবাসী প্রতিটি জনে। গ্রামের চক্রবর্তীরা এখন আশাঙ্কিত হয়েছেন যে কোনোদিন না কোনোদিন প্রভু লক্ষ্মীজনার্দন এবং গোবিন্দজীউ তাঁদের বাড়িতে পদার্পণ করবেনই করবেন।

সর্বশেষ পরিবর্তন এবং বোধ করি সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর পরিবর্তন গঙ্গাধরের সেই বড় ছেলের। সেই বড় ছেলে বলা ঠিক হল না, কারণ ওই ছেলেটিই আমাদের নায়ক। সে এখন আর সেই নির্বোধ ন্যালা-খ্যাপা ভাবের ছেলে নয়, এ ছেলে সম্পূর্ণ পৃথক, শুধু একটু বেশী স্থির; একটি এমন বয়সের ছেলের যতখানি চঞ্চল হওয়া উচিত তা' সে আদৌ নয়। দোষের মধ্যে দৃষ্টিতে তার যেন পলক পড়ে না, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কখনও মনে হয় কথার অর্থ বুঝতে পারছে না—কখনও মনে হয় ছেলেটা অবাক হয়ে দেখছে, কখনও মনে হয় ওর মধ্যে ভয়ের কিছু আছে—তাই যেন ওর দৃষ্টির মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। গোবিন্দপুরের ভটচাজবাড়ির রূপ যেন ছেলেটার অঙ্গে নতুন একটা ধারা পেয়েছে; মহিমা বললেই ভালো হয় কিন্তু মহিমা শব্দটার মানেটাও ভারী ভারী, দামটাও বেশী বেশী। মা নয়নতারার জন্যে ছেলেটির রঙ একটু শ্যামলা কিন্তু তপ্তকাঞ্চন বর্ণ বা ধবধবে ফরসা রঙ থেকে মনোহারী তাতে সন্দেহ নেই। আর নাকটি ডগার দিকে একটু মোটা, গড়নটাও ধারালো খাঁড়ার মতো নয়, একটু অতি ঈষৎ বাঁকানো ভঙ্গিও আছে গড়নে কিন্তু নাকের এই গড়নের জন্যই চোখ দুটি হয়েছে বড় বড় এবং তাতে এনে দিয়েছে একটু ঢলঢলে ভাব। শরীরের গড়নেও মন্মথ যেন বয়সের অনুপাতে বেশী লম্বা।

এ যেন সে-ছেলেই নয়। শান্ত স্থির—বয়সের অনুপাতে গম্ভীর—যেন খানিকটা বিষণ্ণ; মাথা ন্যাড়া; এই মাসখানেক আগে তার পৈতে হয়েছে। গেরুয়া রঙানো কাপড় পরা ভটচাজবাড়ির মন্মথকে দেখে গ্রামের সবাই বলেছে—এমন ব্রহ্মচারী বাপু হাজার ছেলের মধ্যেও একজনকেও মানায় না। আহা-হা! সাক্ষাৎ সেকালের ঋষিপুত্তুর মুনিকুমার।

রামচন্দ্রপুর থেকে গরুর গাড়ি করেই এলো জটাধর। সেকালে যানবাহনের মধ্যে গরুর গাড়িই প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। সবে দেশে রেল পড়ছে; হাওড়া থেকে বর্ধমান হয়ে লুপ লাইন হয়েছে—এদিকে রানীগঞ্জ পর্যন্ত গিয়েছে কয়লার টানে—এবং মিউটিনির পর দ্রুত থেকে দ্রুততর বেগে এগিয়ে চলছে—তবুও তখন পর্যন্ত দূরদূরান্তে যেতে লোকে নদীপথ ধরত; নৌকা ছিল সব থেকে ভালো যান, আর দেশের মধ্যে ছিল গরুর গাড়ি এবং পালকি। গরুর গাড়ি মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত সকলেই ব্যবহার করত। পালকি ছিল বড়লোকের যান। প্রত্যেক সম্পত্তি ও সম্পদবান লোকের দেউড়ির মাথায় বা পাশে পালকি থাকত, একখানা দুখানা বা চারখানা। বাঁধা বেহারা মাইনে পেত। হুকুমমাত্র পালকি কাঁধে উঠে দাঁড়াত। কলকাতায় তখন পালকির রেওয়াজ খুব।

রামচন্দ্রপুরের মুখুজ্জেদের বাঁড়ুজ্জেদের প্রায় বাড়ি বাড়ি পালকি বেহারা বাঁধা আছে। জয়রামবাবুর বাড়িতে দুখানা পালকি বলতে গেলে বারো মাস বসেই থাকে; জয়রাম-

বাবু জটাধরকে বলেও ছিল—ভটচাজ্জিবাবু, বউমা সঙ্গে রয়েছে—পালকি করে যাও। পালকি তো রয়েছে।

জটাধর বলেছিল—না মুখুজ্জেমশায়। মাপ করবেন আমাকে। একটু থেমে থেকে বলে-ছিল—ওরে বাপরে! পালকি করে—! দাদার সামনে মুখ তুলব কি করে?

কৃষ্ণভামিনীর বাপ শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণ ছিল বলে এবং কসবী বাঈজীর বাড়িতে তাদের সত্যনারায়ণ কার্তিকপুজো ও সরস্বতীপুজোর সঙ্গে, দশকর্মের যে দু'চারটে কর্মে তাদের অধিকার আছে সেই কর্মগুলো করাতো বলে তাদের মেজাজ যতই ছোট হোক, হোক, তবুও পালকি চড়ে হুম হুম শব্দ ছড়িয়ে গোবিন্দপুরের ভটচাজবাড়িতে গোবিন্দজী লক্ষ্মীজনার্দন সেই সঙ্গে গরীব ভাশুরের সামনে নামবে কি করে? মা গো এ সে কল্পনাও করতে পারে নি। কৃষ্ণভামিনী জিভ কেটে বলেছিল—মা গো! তাই হয়! না, না, না! সে হবে না!

তিনটে নায়ে যেন ধাক্কাধাক্কি লাগিয়ে প্রায় আর্তনাদ করে বেরিয়ে এসেছিল।

গরুর গাড়িতেই তারা এসেছিল। তবে গরু গাড়ি টাপর সবই সুন্দর এবং চমৎকার। জয়রাম মুখুজ্জের একজন হিন্দুস্থানী বরকন্দাজ হলুদ রঙের চাদরে পাকড়ি বেঁধে সঙ্গে এসেছিল।

খবর আগে থেকে দেওয়া ছিল। শীতকালের অপরাহ্নবেলা। পশ্চিম আকাশে লালচে রঙ ধরে আসছে। মাঠের পথে ধানবোঝাই গরুর গাড়িগুলি গ্রামের মুখে সে দিনের মতো শেষ ক্ষেপ নিয়ে ঘরে ফিরছে। চাকায় ওঠা ধুলোয় লালচে দিগন্তের ছটা বাজছে। আকাশে ঝাঁকবন্দী সরালী হাঁস পাখা মেলে দিয়েছে। বাগদীপাড়ার পথের ধারে কানীর পুকুরের ঘাটে দাঁড়িয়ে বাগদীদের মেয়েরা হাঁসদের ঘর ফেরাবার জন্যে ডাকছে এবং কটা ছোট মেয়ে পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে একসঙ্গে সুর করে চিৎকার করছে—থালা—থালা—থালা। এমনি সময় গাড়িখানা গ্রামে ঢুকল। এবং একপাল কৌতুহলী ছেলেমেয়ে পিছনে নিয়ে এসে উঠল ভটচাজদের খামারবাড়িতে।

পাঁচিল ভাঙা খামারবাড়ি; কাটা ধান তুলে পালুই বেঁধে রাখা হয়েছে। কতকগুলো ছাগল দুটো গরুর বাছুর তার থেকে টান মেরে ধানসুদ্ধ খড় বের করবার চেষ্টা করছে। বাড়ি ঢুকবার দরজায় গঙ্গাধর হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে চণ্ডিকাস্তুতি আবৃত্তি করছিল—।

দেবী! প্রপন্নার্তিহারে! প্রসীদ প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী! পাহি বিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবি! চরাচরস্য॥

... ...

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা বিশ্বস্য বীজং
পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি! সমস্তমেতৎ ত্বং বৈ প্রসন্না
ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥

সুন্দর গম্ভীর কণ্ঠস্বর বিশুদ্ধ উচ্চারণ, তার সঙ্গে অন্তরের বিশ্বাসের আবেগস্পর্শে স্তোত্রটি যেন সত্যকারের সঞ্জীবনে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। গাড়ির ভিতর থেকেই কৃষ্ণভামিনী যেন একটি ভয়-মিশানো বিস্ময়ে খানিকটা অভিভূত এবং রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল।

গাড়িখানার জোয়াল তুলে ধরে গরু দুটোকে সরিয়ে গাড়িখানা নামাচ্ছিল গাড়িটার গাড়োয়ান। জটাধর সেই অবস্থাতেই স্ত্রীর গায়ে হাত দিয়ে বললে—দাদা!

কৃষ্ণভামিনী তার সামনে তার হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললে—দেখ না আমার রোঁয়াগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে! কি সুন্দর বল তো!

গাড়িখানা নামল। টাপরের মুখের পর্দাটা খুলে দিলে গাড়োয়ান। কৃষ্ণভামিনী সসম্ভ্রমে

মাথার ঘোমটাটা টেনে গলার কাছ পর্যন্তই নামিয়ে দিলে; জটাধর শশব্যস্ত হয়ে আলোয়ানখানা তুলে কাঁধে ফেলে প্রায় হুমড়ি খেয়ে নেমে পড়ল। এবং উপরে উঠে এসে জুতো খুলে দাদাকে প্রণাম করতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বললে—পায়ে হাত দোব? ছোঁব? গঙ্গাধর বাকি স্তোত্রটুকু আবৃত্তি করলেন—

'বিদ্যা সমস্তাস্তব দেবি! ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ
সকলা জগৎসু
ত্বয়েকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ কা তে স্তুতি স্তব্যপরা
পরোক্তিঃ ॥
সর্বভূতা যদা দেবি স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বংস্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্ত পরমোক্তয়ঃ।'

ছেদ টেনে গঙ্গাধর বললে—ছোঁবে বইকি। পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছি—তুমি বলছ ছোঁবে কিনা!

জটাধর হাঁটু ভেঙে পায়ের গোড়ায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে। তখন তার পিছনে কৃষ্ণভামিনী এসে দাঁড়িয়েছে। তার দিকে তাকিয়ে গঙ্গাধর বললে—এস মা এস। নিজের বাড়ি—তোমার সত্যকারের শ্বশুরালয়। সাত পুরুষের ভিটে। এই প্রথম আসছ। কেউ নেই যে শাঁখটা বাজায়! ওরে প্রমথ! প্রমথ! প্রমথ রে!

অবিকল গঙ্গাধরের প্রতিমূর্তি সাত বছরের প্রমথ এসে দাঁড়াল। পরনে লালপেড়ে দেনো কাপড় গায়ে একটা খাটো কামিজ—তার উপর একটা দোলাই—প্রমথ খুড়ো খুড়ীকে দেখে বাপের দিকে ফিরে বললে—কি?

—প্রণাম কর। কাকাবাবু তোর। উনি কাকীমা।

প্রণাম সে করলে কিন্তু একটা উত্তাপ অথবা বিরক্তি যেন গোপন রইল না।

কাকাকে প্রণাম করতেই কাকা তাকে কোলে টানতে গেল। গঙ্গাধর বললে—ওকে রেখেই বড় বউ—। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

জটাধর বললে—সে তো দেখলেই চেনা যায়। কিন্তু—

প্রমথ তার হাতের বাঁধন ছাড়িয়ে সরে গেল। জটাধর বললে—আমি তোমার কাকা হই বাবা।

প্রমথ উত্তর দিলে না—আরো সরে গেল। ততক্ষণে কৃষ্ণভামিনী প্রণাম করবার জন্যে গলায় কাপড় দিয়েছে। গঙ্গাধর বললে—দাঁড়াও মা! একটু দাঁড়াও। প্রমথ যা তো বাবা পুজোর ঘরে একপাশে শাঁখটা আছে নিয়ে আয় তো! কাপড় ছাড়বি কিন্তু!

প্রমথ উত্তর দিলে—আমার শীত করবে। আমি পারব না গায়ের কাপড় খুলতে।

জটাধর বলে উঠল—থাক থাক দাদা। থাক। কি হবে শাঁখ?

—না রে! তাহলে বরং আমি—। অঃই। এই হয়েছে—ওই মন্মথ এসে পড়েছে।

মন্মথ?! স্বাভাবিক আকর্ষণ ও কৌতূহলে মুখ ফেরালে জটাধর। আট বছর আগের সেই বিহ্বল ভাবের সেই সাড়ে তিন বছরের ছেলেটিকে মনে পড়ল যে বাড়ির ভিতর উঠোনে বাগানের দিকটায় বসেছিল এবং বাড়ির এঁটোকাটায় অনুগত কুকুরীটা যার মুখ চাটছিল সেই ছেলেটিকে। মনে পড়ছিল এতটুকু ভয় ছিল না—ঘৃণা ছিল না এক বিন্দু—সব থেকে বড় কথা অসুবিধাবোধ অস্বস্তিবোধ যা মানুষের ছেলের অত্যন্ত বেশী তাও তার ছিল না। মনে পড়ল দাদা বলেছিল—কি রকম, হাবাগোবা ন্যালা-খ্যাপা ধরনের। মনে পড়ল ছেলেটা পরমানন্দে সন্তানবতী কুকুরীটার ঝুলে পড়া স্তনবৃন্ত খুঁটছিল।

জটাধর অবাক হয়ে গিয়েছিল বারো বছরের মন্মথকে দেখে।

এ ছেলে কি সেই ছেলে ? আকারে অবয়বে মিলিয়ে নিলে নিশ্চয় মেলে—কিন্তু সাড়ে তিন বছরের ছেলের স্মৃতির ছবির সঙ্গে বারো বছরের ছেলেকে মেলানো তো সহজ নয়। তবু মেলে। কিন্তু ভাবে বা ভঙ্গিতে আচরণে ইঙ্গিতে একেবারে মেলে না। ছিলহিলে লম্বা হয়ে উঠতে শুরু করেছে। শৈশবের বাল্যের পুরন্ত গোলালো মুখে লম্বা টান ধরেছে। গায়ের ঈষৎচাপা ফরসা রঙে যেন শান-পালিশের চিকণতা ধরতে শুরু করেছে। লম্বা ছেলেটি এসে তার আয়ত ঢলঢলে চোখের পক্ষে অশোভন এক স্থির দৃষ্টিতে জটাধরদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

জটাধর অস্বস্তি বোধ করেই প্রশ্ন করলে—এই আমার মোনাবাবা ? এঁ্যা ?—

গঙ্গাধর একটু হেসে বললে—হঁ্যা মম্মথ। এবার মাইনর বৃত্তি পরীক্ষা দিয়েছে, তারই ফল জানতে গিয়েছিল। সেই জন্যেই তো মাকে ডাকছিলাম আর বলছিলাম—প্রসীদ ! প্রসীদ !

তারপরেই কণ্ঠস্বরের সুর পালটে ছেলেকে বললে—কাকাকে কাকীমাকে প্রণাম কর ! কি খবর পেলি বল !

নিষ্পলক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েই মম্মথ বললে—আগে ঠাকুরকে প্রণাম করব।—একটি অতিক্ষীণ স্মিত বঙ্কিম হাস্যরেখা দুটি ঠোঁটের প্রান্তে ফুটে উঠল ; গালে একটি টোল পড়ল। বললে, যেন একটু লজ্জিত হয়েই বললে—মাস্টারমশায় বললেন বৃত্তি পেয়েছি, মাসে চার টাকা বৃত্তি পাব, জেলাতে থার্ড হয়েছি।

—ঠাকুরঘরে ঢুকে শাঁখটা নিয়ে আসবি, খুড়ীমা তোর প্রথম বাড়ি এলেন, শাঁখ বাজাতে হবে। এস ঘরে এস, ঠাকুরঘরে প্রণাম কর ততক্ষণ।

প্রমথকে কাছে টেনে নিয়ে কোলে নিতে চাইলে কৃষ্ণভামিনী। প্রমথ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললে—না।

সন্ধ্যাবেলা সংসারের রান্নার পাট নিয়ে বসল যখন এই ছেলে তখন জটাধরের বিস্ময় এবং লজ্জার আর সীমা রইল না। তার চেয়েও বেশী লজ্জা পেলে কৃষ্ণভামিনী। কলকাতায় তার জন্ম ; বাপের একমাত্র মেয়ে ; স্বামীর ঘরেও সে একলা ঘরের ঘরনী—ভাগীদারাদি নিয়ে ঘর করা তার অভ্যেস নেই ; তবে চাকরবাকর চরাতে জানে—সে-ষে-সে, সেও লজ্জায় মরে গেল যখনই এই ছেলে তাদের জন্যে রান্না করতে বসল। কৃষ্ণভামিনী এগিয়ে এসে বললে—সর, তুই সরে যা, তোর বাপ খুড়োর কাছে যা। রান্না আমি করছি।

মম্মথ তার সেই গম্ভীর ভাবেই বললে—কেন খুড়ী ? রাত্রে রান্না তো আমিই করি !

কৃষ্ণভামিনী বলেছিল—তা করিস ; সে তোর বাপ খায়, কিন্তু আমি তা খেতে পারব না। সর আমি রাঁধব।

উনোনে ভাতের জল চাপিয়ে দিয়ে বাটনা বাটতে বসেছিল মম্মথ। সে বললে—দাঁড়াও —বাবাকে জিজ্ঞেস করে আসি খুড়ীমা।

গঙ্গাধর এবং জটাধরের মধ্যে তখন মম্মথের কথাই হচ্ছিল। জটাধর দাদাকে সেই আট বছর আগের কথা মনে করিয়ে দিয়ে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিল—তুমি কি কোষ্ঠী গণেছিলে দাদা ? আমার স্পষ্ট মনে আছে তুমি বলেছিলে—কোষ্ঠী বিচার করে দেখেছি আমি ও ন্যালাখ্যাপা হাবাগোবা অক্ষম গোছের একটা জরদগব কিছু হবে। ওরই জন্যে আমি ঠাকুরটি চাচ্ছি বেশী করে। ধরে পেড়ে পুজোপদ্ধতিটা শিখিয়ে দিয়ে যাব, ওতেই কোনোক্রমে করে-কর্মে খাবে।

গঙ্গাধর সন্ধ্যারতি সেরে ঠাকুরঘরের দাওয়ায় বসেছিল অনেকটা যেন চিন্তাগ্রস্ত হয়ে। তারই মধ্যে মুখে একটু হাসি টেনে এনে বলেছিল—গণনায় আমার ভুল হয় নি জটাধর।

গণেছিলাম আমি ঠিক।

—তাহলে—

—দেখ্—বলে গেল গঙ্গাধর—ওর কোষ্ঠীতে গণেছিলাম আট বছর সাত আট মাসে ওর মাতৃরিষ্টি যোগ আছে—প্রবল যোগ, তা ফলে গেছে ; নয়নতারা মারা গেল ঠিক ওই সময়। তারপর গণেছিলাম ওর কঠিন ব্যাধি হবে, মরে গেলেও যেতে পারে এমনি ব্যাধি ; তা ওর হয়েছিল। পাঁচ বছর বয়সে, এই ছোট প্রমথটাকে নিয়ে বড়বউ একেবারে যমের সঙ্গে লড়াই করছে, বুকে চেপে ধরে বসে আছে এমনি ব্যাপার ; মন্মথ আরও যেন হাবা হয়ে গেল। তারপর হল অসুখ। একদিন দিনে শুয়েছিল ওই ঘরের দাওয়ায় ; বিকেল হয়ে গেল, উঠল না ; তখন আমি গায়ে হাত দিয়ে ডাকতে গিয়ে দেখলাম গায়ে প্রচণ্ড উত্তাপ। সে যেন ধান দিলে খই হয়। এদিকে কোনো সাড়া নেই হুঁশ নেই। বিড়বিড় করে আপনমনে বকছে। অজ্ঞান অবস্থায় প্রলাপ বকছিল। কবরেজ ডাকলাম! বাঁচবে সে ভরসা কবরেজরাও করে নি। কিন্তু বাঁচল। বাঁচল তো এই হল। অঘটন ঘটল। হাবা বা বোকা আর রইল না। তার বদলে আশ্চর্য বুদ্ধি খুলল ; আর এক রকম মানুষ হয়ে গেল।

অবাক হয়ে শুনছিল জটাধর।

গঙ্গাধর বললে—ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র ন চ বিদ্যা ন চ পৌরুষং যেমন সত্যি জটাধর, তেমনি বা তার থেকেও বেশী সত্যি হল কি জানিস? সে হল অহেতুক কৃপা। ও কৃপা যে কে করে, কেন করে তা কোনো শাস্ত্রে নাই ভাই। জ্যোতিষ দর্শন বেদ বেদান্ত কেউ বলতে পারে না রে। কেউ কেউ বলে—কোনো আত্মা এসে অজ্ঞান অবস্থায় ওর দেহ দখল করেছে। নিজের বাসনা তৃপ্ত হয় নি—পূর্ণ করে নেবে। তা আমি বিশ্বাস করি না। আমার বিশ্বাস ও সেই অহেতুক কৃপা পেয়েছে। দেখ না—পড়াতে লাগলাম, ব্যাকরণকৌমুদী প্রথম ভাগ শেষ করেছিল আট মাসে। তোতাপাখির মতো শুনলেই মুখস্থ। ব্যাকরণকৌমুদী দ্বিতীয় ভাগ পড়ালাম—পুজো অর্চনা শেখালাম। পৈতে দিয়ে দীক্ষা দেব তারপর নাহয় দিয়ে আসব ত্রিবেণীতে রামরাম স্মৃতিরত্ন মশায়ের পায়ের তলায়। ত্রিবেণীতে সরস্বতী দিবারাত্রি প্রত্যক্ষ। এমন মেধা—। তা—হল না। উপনয়ন হল না ; ন বছরে উপনয়নের সব ঠিক, হঠাৎ বড়বউ মারা গেল। এক বৎসর গেল ওর কালাশৌচ। ওদিকে দেখি ও গোপনে গোপনে ইংরাজী পড়ছে। ইংরাজী পড়তে ইচ্ছাও প্রবল। পাঁচজনেও বললে। তাই দিলাম রায়মহাশয়দের মাইনর স্কুলে ভর্তি করে। এ বছর উপনয়ন দিলাম—এই অগ্রহায়ণেই দিয়েছি। এই ওরও মাইনর পরীক্ষা হয়ে গেল—এবার যা হয় করব।

মন্মথ এমনই সময় এসে দাঁড়াল।

গঙ্গাধর প্রশ্ন করলে—কি রে মন্মথ—

—খুড়ীমা বলছেন উনি রান্না করবেন। আমাকে রান্না করতে দিচ্ছেন না।

জটাধর ব্যস্ত হয়ে উঠল। সে ভাবছিল কৃষ্ণভামিনীর ছোঁয়ানাড়ার জন্য গোটা হেঁশেলটাই ফেলতে হবে না তো! পণ্ডিতবংশের ছেলে হয়েও পণ্ডিত সে নয়, বিধান নিয়ে বিচার করবার মতো বিদ্যে তার নেই—কিন্তু সে জানে তো তার দাদার মতো ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের কড়াকড়ির ধারের কথা ভারের কথা! সে বলে উঠল—আমি যাই। আমি—আমি—।

সে অর্থাৎ তার আমি যে কি করবে বা করতে যাচ্ছে তা সে বলতে গিয়েও খুঁজে পেলে না। মীমাংসা করে দিল গঙ্গাধর। বললে—তা বেশ তো রে জটাধর বউমাই রান্না করুন। কলকাতার বউমার হাতের রান্না খেয়ে দেখি।

জটাধর উৎসাহিত হয়ে উঠে বলেছিল—ছোটবউয়ের হাতে তুমি খাবে দাদা? বল কি রান্না করবে?

গঙ্গাধর হেসে জবাব দিয়েছিল—আমি তো রাত্তিরে দুধ মিষ্টান্ন তার সঙ্গে দুটো একটা রম্ভা, আমের সময় হলে আমের চাকা ছাড়া হেঁশেলের রান্না খাই না জটাধর। তুই ভুলে গেলি ?

—না দাদা, তুমি তখন লুচিটুচি মানে পক্কান্ন খেতে—

—হ্যাঁ হ্যাঁ। বড়বউয়ের মৃত্যুর পর তাও ছেড়েছি। তা বউমা রান্না করুন—তুই বউমা মন্মথ প্রমথ আনন্দ করে খা। বাগদীবউ ওদের পাড়ায় বলে রেখেছিল—খুব ভালো মাগুরমাছ যোগাড় করেছে। মন্মথ মাছ রান্না করে ভালো। মাছটা তো ওই রান্না করে। বউমা অবশ্য নিশ্চয়ই আরো অনেক ভালো রান্না করে। একে মেয়েছেলে তার উপর কলকাতার রান্না বলে কথা। তা দেখিস যেন পেঁয়াজটা ঢোকাস না হেঁশেলে !

এমন ক্ষেত্রে সনাতন পন্থায় কৃষ্ণভামিনী সেকেলে টেলিগ্রাফ বা টেলিপ্রিন্টার যাই বলা যাক সেই দরজার শিকল সংকেতে জটাধরকে ডাক দিয়েছিল—শুনে যাও !

দরজার শিকলটা বেশ কথা বলার মতো খুটখুট, খুটখুট, খুট খুট খুট খুট শব্দ করে বেজে উঠেছিল। গঙ্গাধর হেসে বলেছিল—বউমা ডাকছেন রে জটাই—দেখ।

বউমা অন্য কিছু বলে নি, বলেছিল, বেশ, দুধ কলা মিষ্টির সঙ্গে কমলালেবু দেব আর চারখানা লুচিও ভেজে দেব—উনি খাবেন। উনি না খেলে আমিও খাব না। বুঝব উনি আমার হাতে খাবেন না।

গঙ্গাধর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল—তা খাব। ব্রাহ্মণসন্তান হয়ে জটাধর জাহাজের মাল খালাস মাল বোঝাই ব্যবসার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছে। তাতে যদি জটাই আমার কাছে আসে অচ্ছুত না হয় তাহলে তুমি হবে কেন বউমা। তুমি তো বামুনের মেয়ে—আমার ঘরের লক্ষ্মীর ভাগ তোমার মাথায় আমাকে তুলে দিতে হবে। খাব। তুমি বলছ—খাব।

দেখতে দেখতে কৃষ্ণভামিনী রান্নাঘরের দাওয়ার উপর বেশ জমিয়ে তুলে আসর পেতে বসেছিল। ঝুড়ি খুলে কপি মটরশুঁটি বেশ ভালো আলু বের করে কুটনো কাটতে বসেছিল। জটাধর কলকাতা থেকে আনা নতুন হেরিকেনটা জেবলে দিয়েছিল। দেশে তখন কেরোসিন ঢুকেছে ; লণ্ঠনে না জ্বললেও ডিবে-'লম্পো'তে জ্বলে। জটাধর লণ্ঠনটা জ্বালতে জ্বালতে বলেছিল—জানিস বাবা মন্মথ ?

মন্মথ গায়ে একখানা দুসুতী মোটা চাদর দিয়ে নিবিষ্টচিত্তে খুড়োর লণ্ঠন জ্বালা দেখছিল। সে বললে—বলুন কাকাবাবু !

জটাধর বলেছিল—তুই আমাকে কাকাবাবু বলিস কেন ?

—আপনি তো বাবুই। কত টাকা আপনার। বাবা বলেন—লোকে বলে—

—কি বলে ?

—ওই বলে। যা বললাম। জটাধরবাবু মস্ত লোক—অনেক টাকা। রামচন্দ্রপুরের জয়রাম মুখুজ্জে টাকা নেয় তার কাছে—

অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে এবং মিষ্ট স্বরে কথাগুলি বলে যাচ্ছিল মন্মথ।

—দাদা কি বলেন—ওই কথাই বলেন ? জটাধর অত্যন্ত মৃদু স্বরে ব্যগ্রতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে।

মন্মথ বললে—বাবা ঠিক তা বলেন না। বলেন—তা ভালো। ভালো বইকি। এক মায়ের দুই মেয়ে; শ্রীসম্পদ ধন ধান্যের দেবী লক্ষ্মী আর বেদ বেদান্ত উপনিষদ জ্ঞানতপস্যার দেবী সরস্বতী ; আমরা ব্রাহ্মণেরা ওই বেদ বেদান্তের ঠাকরুনটিকে নিয়েই কারবার করি। তা জটাই বড়ঠাকরুনটিকে ধরেছে প্রসন্ন করেছে; ভালোই করেছে। তবে বড়ঠাকরুনের প্রসাদে

যে অমৃত নেই। যেনাহং নামৃতস্যাম্ তেনাহং কিম্ কুর্যাম। একটু থেমে বললে—জানেন কাকা—

—জানেন নয়, জানো বল।

মন্মথ ও ধার দিয়েই গেল না। জানেন এবং কাকাবাবু শব্দ দুটি পরিষ্কার বাদ দিয়ে এবার সে সোজাসুজি বলে গেল—আমাকে মাঝে মাঝে বাবা জিজ্ঞাসা করে। জিজ্ঞাসা করে—হ্যাঁরে মন্মথ, তোর কি মত বল দেখি। মৃদু হাসি ফুটে উঠেছিল তার ঠোঁটের রেখায় রেখায়।

জটাধর প্রশ্ন করেছিল—তুই কি বলিস ?

—কি বলব ? বলি—তাই ঠিক। ঠিক বলেছ তুমি। কিন্তু—

—কিন্তু কি ?

মিষ্টি মিষ্টি হেসে মন্মথ বলেছিল—ঈশপের গল্প আছে ইংরিজীতে—একটা গল্প আছে—এক শেয়াল অনেক উঁচুতে আঙুরের থোকা দেখে বলেছিল—আঙুর টক।

—তোর তাই মনে হয় মন্মথ ?

মন্মথ চমকে উঠেছিল। কাকার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তার নিজস্ব সেই বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছিল মন্মথ। তারপর বলেছিল—ভাবতে কষ্ট হয় কাকা কিন্তু তাই তো সত্যি। বল না, বাবা যে এই ঠাকুর আর ধর্ম নিয়ে পড়ে আছে তার—

জটাধর বলেছিল—তার কি দাম তা বড় হলে বুঝবি মন্মথ। দাদার কাছে আমি দাঁড়ালে আমার কি মনে হয় জানিস ?

মন্মথ চুপ করে রইল—কি মনে হয় সে কথা জটাধরও আর বলে কথা বাড়ালে না—মন্মথও সে কথা শুনতে চাইলে না। ফলে আশ্চর্য রকমের একটি নিস্তব্ধতার সৃষ্টি হল। আশ্চর্য বলছি এই জন্যে যে দুইজনেই বিচিত্রভাবে বিষন্ন হয়ে পড়েছে মনে মনে।

এতক্ষণ কথা যে হচ্ছিল সে হচ্ছিল ওই নতুন লণ্ঠনটা জ্বালতে জ্বালতে। কিন্তু কথাবার্তার মধ্যে কখন যে জটাধরের হাত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সে খেয়াল তার ছিল না। এবার হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে আলোটা জ্বালতে তৎপর হয়ে উঠল। পকেট থেকে দেশলাই বের করে জেবলে লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে, নিজেই তারিফ করে জটাধর বললে—বাঃ সুন্দর আলো হয়েছে। তারপরই বললে—আলোটা কিন্তু তোর জন্যে, তোর পড়বার আলো হল এটা।' এখন তো পিদীমের আল্লোয় পড়িস। এনেছি।

—হুঁ। ছোট্ট একটি হুঁ বলেই চুপ করে গেল মন্মথ।

ওদিক থেকে প্রমথ ছুটে এলো আলোটা দেখে। 'আলো আলো' বলে উল্লসিত চিৎকার করতে করতেই এলো। যদি বলি পতঙ্গের মতো তো ভুল হবে না।

সে এসে আলোটার দিকে হাত বাড়িয়ে বললে—দাও। বাগদীদিদি মাগুরমাছ কাটবে। ও আলোটায় দেখতে পাচ্ছে না। সে আলোটা নিয়ে চলে গেল।

জটাধর বললে—কলকাতায় গ্যাসের আলো হয়েছে রাস্তায়। দিনের মতো আলো হয়। জানিস—।

উত্তর দিল না মন্মথ। আবার প্রকট হয়ে উঠল সেই বিষন্ন স্তব্ধতা। ওদিক থেকে আর একটা লণ্ঠন হাতে এদিকের বারান্দায় মোড় ফিরল কৃষ্ণভামিনী, বললে—কি হচ্ছে খুড়ো ভাইপোতে ? এমন চুপচাপ বসে ?

চকিত হয়ে উঠল জটাধর। হঠাৎ তার যেন মনে হল যে কথাটা সে ধরতে পারছিল না সেটা কৃষ্ণভামিনী ধরিয়ে দিয়ে গেল। মনে হল মন্মথ যেন কিছু বলবে অথচ বলতে পারছে না। ঠিক সেই কারণেই কথা বলতে বলতে মাঝখানে সব কথা এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে হারিয়ে গেছে। কৃষ্ণভামিনীর কথার জবাবে অপ্রতিভের মতই একটু হাসলে জটাধর।

কৃষ্ণভামিনী আর ও নিয়ে প্রশ্ন করল না। বললে—তোমাদের আলো কি হল ?

—ওটা প্রমথ নিয়ে গেল—মাছ কুটছে বাগদীবউ।

কৃষ্ণভামিনী বললে—এই লণ্ঠনটা আট বছর আগে এনেছিলে—কেমন আছে দেখ! একেবারে নতুন। আবার একটা আনলে। মিছে আনলে—জ্বালেই না কেউ—।

বলতে বলতেই চলে গেল সে ঘরের ভিতর। আবার স্তব্ধ এবং অন্ধকার হয় গেল সব। এরই মধ্যে জটাধর হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল—মন্মথ !

—উ ! সে তাকিয়ে ছিল আকাশের দিকে। বোধ করি হারানো কথা খুঁজছিল তারার আলোয়।

জটাধর বললে—কিছু বলছিস না যে রে !

—কি বলব কাকা ?

—কিছু বল। যা হোক কিছু।

—হ্যাঁ কাকা।

—কি রে ?

—আমাকে তুমি কলকাতা নিয়ে যাবে ?

—কলকাতা ? যাবি তুই ? চল দেখে আসবি—সব দেখাব তোকে ; কত দেখবার জিনিস আছে—হাবড়ার পুল, টাঁকশাল, লাটসাহেবের বাড়ি, চিড়িয়াখানা, মুজিয়ম, সাহেব মেম, জাহাজ, বড় বড় ঘোড়ার গাড়ি, ট্রাম—।

—না কাকা—।

দ্বিতীয়বার চমকে উঠল জটাধর।—না ? অবাক হয়ে ভাইপোর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। এবং আবার প্রশ্ন করেছিল—যাবি না বলছিস কেন ?

—না। মানে, কলকাতার ইস্কুলে আমি পড়ব ! ওসব দেখবার জন্যে আমি যাব না।

—পড়বি ? কলকাতার ইস্কুলে ?

—হ্যাঁ !

জটাধর আবেগবশে ভাইপোকে বুকে চেপে ধরলে। এবং ডাকলে—ওগো ! শুনছ ! শোন !

—কি ?—বেরিয়ে এলো কৃষ্ণভামিনী।

—মন্মথ কলকাতায় যাবে, পড়বে সেখানে। ভালো হবে না ?

কি জানি কেন, মুহূর্তে কৃষ্ণভামিনীর মনে হল মন্মথ নিজে তাদের বাড়িতে গিয়ে থাকতে চাচ্ছে—সম্ভবত এর হেতুতে আছে এ বাড়ির গোবিন্দ এবং জনার্দনঠাকুরটির দয়া। গোবিন্দ এবং জনার্দনকে বাদ দিয়ে তারা যে-সম্পদ যে-বিষয় যে বাড়ি তৈরি করেছে সেখানে ভোগ করবার জন্যে গোপালের আবির্ভাব হয়নি। মন্মথ এলেই তার গোপাল ঠিক পিছন পিছন এসে বাড়ি ঢুকবে। সে ব্যগ্রতাভরে বললে—তুই যাবি ? মন্মথ ? সত্যি তুই যাবি ?

মন্মথ নীরব হয়ে রইল। কোনো উত্তর বের হল না তার মুখ থেকে।

কৃষ্ণভামিনী বলে উঠল—এমন ভাগ্যি আমার হবে ? তুই যাবি ?

মন্মথ এবার কুণ্ঠিতভাবে বলেছিল—সে আমি কি করে বলব খুড়ীমা ! বাবা যদি 'না' বলে ?

জটাধর বললে—আমি বলব দাদাকে ? তুই মন ঠিক করে নে ! বল আমাকে।

কৃষ্ণভামিনী বলেছিল—না। আমি বলব বটঠাকুরকে।

পরদিন সকালে।

বুক পর্যন্ত ঘোমটা টেনে ছোট ভাসুরপো প্রমথের হাত ধরে কৃষ্ণভামিনী ভাসুরের সামনে এসে দাঁড়াল। গঙ্গাধর ঠাকুরের ঘর মার্জনা সেরে ফুল তুলে একপাশে রেখেছে। মন্মথ দাওয়ার উপর বই খুলে বসে আছে। তার দৃষ্টি যেন চিন্তাকুল। কাল সে কাকাকে বলে ফেলেছে সে কলকাতায় পড়তে যেতে চায়। এখানে সে বৃত্তি পেয়েছে এম-ই পরীক্ষায়। এখান থেকে তিন মাইল দূরে গ্রামের ইস্কুলে পড়েছে। হেঁটে গিয়েছে হেঁটে এসেছে। হেডমাস্টার তাকে শেষ বছরটা তাঁর কাছে থাকতে বলেছিলেন। কিন্তু সে থাকে নি। বাবার কষ্ট হবে বলেই থাকে নি। স্কুলে যাওয়ার আগে সে স্নান-সন্ধ্যা সেরে ঠাকুরের ভোগ রান্না সেরে ফেলত। বাবা পূজা সেরে ভোগ দিতেন; সে সেই প্রসাদ খেয়ে ইস্কুল দৌড়ুতো। প্রমথ অবশ্য এখন একটু বড় হয়েছে ডাটো হয়েছে; সেও এখন অনেক পারে। অনেক যোগান দেয়। এইভাবে ইস্কুল করতে গিয়ে প্রতিদিনই তার দেরি হয়েছে—কোনো দিন পনের মিনিট কোনো দিন দশ মিনিট। এই কারণেই হেডমাস্টার তাকে তাঁর বাসায় থেকে পড়তে বলেছিলেন শেষ বছরটা। বলেছিলেন—ইংরিজীটা একটু পোক্ত করে নাও মন্মথ—তুমি জেলাতে তো ফার্স্ট হবেই—সারা দেশেও একটা স্ট্যান্ড করতে পারবে। সে নিজেও তা জানত। ইংরিজীতে তার খামতি। তবুও সে বাবার জন্যে তা পারে নি। মন চায় নি! কিন্তু এবার—।

এবার স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্নটা এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত অসহিষ্ণুর মতো বলছে—হ্যাঁ কি না বল! আমার আর সময় নেই। ত্রিবেণীতে গঙ্গার ঘাটে নৌকোগুলো যাত্রী নিয়ে যায় আসে—তারা হাঁকে—এই ছেড়ে যায়, এই ছেড়ে যায়। কালনা গুপ্তিপাড়া। ছাড়লো ছাড়লো। তারা কিন্তু তবু দাঁড়ায়। তার মতো দ্বিধাগ্রস্তকে দেখলে বার বার বলে—এস ঠাকুর এস। কাজ থাকে তো একটু নাহয় দাঁড়াব গো। সেরে এস কাজ।

আবার হুগলীতে রেলগাড়ি দেখেছে। সে গাড়ি সময় হলেই ঘণ্টা আর বাঁশী বাজলেই সিটি মেরে হুস্ হুস্ শব্দে ধোঁয়া উগরে ছেড়ে দেয়। মাঠের মধ্যে কতজনকে পোঁটলা হাতে দাঁড়াও গো! দাঁড়াও গো! বলে চিৎকার করতে করতে ছুটতে দেখেছে কিন্তু গাড়ি ছাড়লে আর থামে না।

এবার যেন প্রশ্নটা রেলগাড়ির মতো তার সামনে দাঁড়িয়েছে।

সে ভাবছে—এম-ই পরীক্ষা হয়ে গেল এবার পড়তে হলে হাই ইংলিশ স্কুলে পড়তে হবে। হুগলী শ্রীরামপুর যেতে হবে। বাড়ি থেকে হবে না।

বাড়িতে থাকতে হলে আবার সংস্কৃত পড়তে হবে। তাও কয়েক বছর। ব্যাকরণটা শেষ করা চলবে, তারপর কাব্য বা দর্শন বা স্মৃতি যে শাস্ত্রই পড়তে হোক যেতে হবে স্থানান্তরে। নবদ্বীপ কাশী বা ভাটপাড়া যেখানে হোক।

এমনই মনের সামনে প্রশ্নটা ঠিক হুগলী স্টেশনে দাঁড়ানো রেলগাড়ির মতো বলছে—হ্যাঁ কি না শীগ্‌গির বল।

ভাবতে ভাবতে মন সকল ভাবনা হারিয়ে ফেলে দুটো আকর্ষণের মধ্যে অসহায়ের মতো উদাস অথবা সকরুণ দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। টেনে নিক—যে দিকের জোর বেশী সেই দিক তাকে টেনে নিক।

কৃষ্ণভামিনী ভাসুরের সামনে ঘোমটাটা একটু বাড়িয়ে দিয়েই হাত জোড় করে দাঁড়াল। গঙ্গাধর বললে—এখন তো নয় মা, লক্ষ্মীর কড়ি ধান ঝাঁপি সে দেব যাবার দিন। ভোরে স্নান করবে; সেদিন উপোস করে থাকবে স্বামী-স্ত্রীতে। জটাধর আমাকে বিশে পৌষ যাবার কথা বলেছিল। দিনটা ভালো, বারেও বুধবার। এ বাড়ি থেকে লক্ষ্মী ভাগ করে

নেবে—শনি মঙ্গলবার ভালো নয়, বৃহস্পতিবার লক্ষ্মী ভাগ করাও উচিত হবে না। এ ভিটেও তো তোমাদের। বিশে বুধবার এখান থেকে ভাগ করে নেবে—কলকাতার বাড়িতে বৃহস্পতিবার মাকে সিংহাসনে বসাবে সেই ভালো হবে। কথা বলছিল গঙ্গাধর পাশের দিকে তাকিয়ে। মানে ভাসুর এবং ভাদ্রবউ পূব এবং পশ্চিম মুখো হয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল —কিন্তু গঙ্গাধর পাশের দিকে উত্তর আকাশের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কথা বলছিল। বাড়ির লক্ষ্মী ভাগ হচ্ছে। গোবিন্দপুরের ভটচাজবাড়ির মা-লক্ষ্মী, তিনি রাজকন্যাও নন রাজলক্ষ্মীও নন। নেহাতই কৃষ্ণগোবিন্দের সুদামা সখার পত্নীর মতো স্বভাবে ব্রাহ্মণী মহিমায় কল্যাণী অঙ্গসৌরভে চন্দনগন্ধময়ী রূপগৌরবে মধুর কোমলা এক লক্ষ্মী; ধ্যান করতে গেলে শঙ্খ-সিন্দূরচর্চিতা, সদ্যস্নাতা, এলোকেশী, লালপেড়ে শাড়ি পরা এক ব্রাহ্মণকন্যা বা বধূকে মনে পড়ে। সেই তাঁকে এই গোবরমাটি নিকানো উঠোন খামারবাড়ি থেকে কলকাতার পাকা-বাড়িতে নিয়ে যাবে। স্বাভাবিক ভাবেই বুকের মধ্যে খানিকটা আবেগ যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। সেই আবেগ প্রকাশকে দমন করবার জন্যেই গঙ্গাধর এমনি ভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। এমন তন্ময় হয়ে তাকিয়ে ছিল যে ভ্রাতৃবধূটি যে তার কথার মধ্যে বার বার ঘোমটাঢাকা মুখ নিয়ে ঘন ঘন ঘাড় নেড়ে নেড়ে না না জানাচ্ছে তা সে লক্ষ্য করে নি। প্রমথও খুড়ীমার ঘাড় নাড়া দেখে নি—সে বাবার ওই উদাস ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকা মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিল এবং কথা শুনছিল।

লক্ষ্য করেছিল বাগদীবউ। বাগদীবউকে সঙ্গে করেই এনেছিল কৃষ্ণভামিনী। সে বললে—ও গঙ্গাবাবা তুমি তো বকেই যাচ্ছ গো—এদিকে যে বউমা বসোয়ার মতো না না না করে ঘাড় নেড়েই যাচ্ছে। তুমি তো তা দেখছ না!

বসোয়া হল পাঁচটা পা-ওয়ালা এঁড়ে গরু। চারটে স্বাভাবিক পা ছাড়াও আর একটা নড়বড়ে ছোট পা তাদের থাকে। তাদের কড়ির মালা পরিয়ে লাল সালু দিয়ে পিঠ ঢেকে দিয়ে হিন্দুস্থানীরা বিশেষ করে বৈদ্যনাথের আশপাশের লোকেরা ঘণ্টা শাঁখ বাজিয়ে গৃহস্থের বাড়ি নিয়ে বেড়ায়। বলে সাক্ষাৎ মহাদেবের বৃষভের মামাতো বা মাসতুতো বা খুড়তুতো ভাইয়ের বংশের কেউ। এ ষাঁড় সর্বজ্ঞ—ভূত ভবিষ্যৎ সবই ক্ষুরদর্পণে। যা বলবে তৎক্ষণাৎ তার উত্তর দেবে। ষাঁড়টা ক্রমাগত ঘাড় নাড়ে। অধিকাংশ সময়েই 'না'-এর ভঙ্গিতে। কখনও কখনও হাঁ বলে। কৃষ্ণভামিনী ক্রমাগত 'না' 'না' 'না' জানাচ্ছিল ঘাড় নেড়ে। তাই ওই উপমাটি প্রয়োগ না করে পারলে না বাগদীবউ।

বাগদীবউয়ের কথা শুনে হুঁশ হল গঙ্গাধরের। উত্তর দিগন্তে নিবদ্ধ তার উদাস দৃষ্টি নামিয়ে সে বাগদীবউয়ের দিকে ফিরিয়ে বলল—এঁ্যা। বউমা কি করছেন? না করছেন?

—হ্যাঁ। বসোয়ার মতো ঘাড় নেড়েই যাচ্ছে যে গো!

সুযোগ পেয়ে ইতিমধ্যেই হেঁট হয়ে প্রমথের কানে ফিসফিস করে কথা বলে দিল কৃষ্ণভামিনী।

প্রমথ বললে—কাকীমা ওসব লক্ষ্মীর কথা বলছে না।

—বলছেন না? তবে কি বলছেন রে?

আবার ফিসফিস করে প্রমথকে কথা বললে কৃষ্ণভামিনী; প্রমথ বললে—কাকীমা দাদার কথা বলছে বাবা।

—দাদার কথা? তোর দাদার কথা? মন্মথর কথা?

—হ্যাঁ।

—কি করেছে মন্মথ? কোথায় সে? সে তো—

—কিছু করে নি। তার পড়ার কথা বলছে।

—পড়ার কথা !

—হ্যাঁ। কাকীমা বলছে—মাইনর পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছে—ইংরিজী পড়লে খুব ভালো হবে। কাকীমা বলছে—

কি বলছে সে আর প্রমথকে বলতে হল না, ঘোমটার ভিতর থেকে বাল্যবয়সে মাতৃহীনা কলকাতার শূদ্র যজমানদের পুরোহিত কন্যা এবার নিজেই মৃদুস্বরে বললে—না বললে আমি শুনব না। আমি হত্যে দেব আপনার চরণতলে।

স্তব্ধ হয়ে গেল গঙ্গাধর।

কাল রাত্রেই সে মনে মনে স্থির করেছিল যে মন্মথকে সে সংস্কৃতই পড়াবে। জিজ্ঞাসাও করেছিল মন্মথকে—কি রে কি করবি? হুগলীতে ইংরিজী স্কুলে ভর্তি হবি না আমার কাছে ব্যাকরণ শেষ করে দর্শন-টর্শন পড়বি?

মন্মথ কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল। গঙ্গাধর আবার ডেকেছিল—ঘুমুলি নাকি? মন্মথ?

—না।

—তবে?

—উঁ!

—কি বলছিস?

—কি বলব?

—কি পড়বি?

—তুমি যা বলবে।

অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে গঙ্গাধর বলেছিল—সংস্কৃতই পড়।

—বেশ।

কথাগুলি মনে পড়ে গেল গঙ্গাধরের। গঙ্গাধর সে কথা কয়টিকেই স্রোতে ভেসে যাওয়া মানুষের হাত বাড়িয়ে সামনে-পাওয়া কয়েকটা কাঠের টুকরোকে চেপে ধরার মতো চেপে ধরলে। বললে—মন্মথ কি যাবে? সংস্কৃত পড়তে চায় বোধ হয়।

আবার ঘাড় নড়ে উঠল কৃষ্ণভামিনীর।

সেটা এবার প্রমথর চোখ এড়াল না এবং সে তার মর্মার্থ মুহূর্তে বুঝে নিয়ে বললে—না বাবা। দাদা বলেছে।

—বলেছে? চমকে উঠল গঙ্গাধর।

—হ্যাঁ। কাল সন্ধ্যেবেলা।

—মন্মথ! ডাকলে গঙ্গাধর। মন্মথ এসে দাঁড়াল।

—তুই কলকাতা পড়তে যাবি বলেছিস?

মৃদুস্বরে মন্মথ বললে—হুঁ। চোখ নত করে, পায়ের আঙুল দিয়ে মাটির উপর দাগ কাটতে কাটতে বললে।

—আমাকে যে কাল রাত্রে বললি—

চুপ করে রইল মন্মথ।

গঙ্গাধরও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আবার সে আকাশের দিকে তাকালে। ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে মনে হল একটা প্রবলতর শক্তির স্রোতকে সে স্পষ্ট অনুভব করছে। টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

গঙ্গাধর বললে—তাই যাবে। তোমাদের সঙ্গেই যাবে। এখনই তো ভর্তি হতে হবে।

সেইদিন—মধ্যরাত্রি তখন।

গঙ্গাধর তখনও চুপ করে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে নতুন আলোয়ানখানি গায়ে দিয়ে বসে ছিল। মাটির মূর্তির মতো। সারাটা দিন অন্তরের মধ্যে তার যেন ভাদ্র-আশ্বিনের অমাবস্যার ষাঁড়াষাঁড়ির বানের মতো জোয়ার এসেছে—আবার ভাটির টানে গঙ্গার বুকের পাঁক বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু বাইরে কেউ তা বুঝতে পারে নি। কেউ বুঝতে পারে নি নয়, একজন পেরেছিল, মন্মথ পেরেছিল—সেই জন্যেই বোধ করি সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে বাপের কাছ থেকে। অন্য অন্য দিন রাত্রি প্রথম প্রহরের শেয়াল ডাকলেই পড়াশোনা শেষ করে সে এসে বাবার পাশের বিছানাটিতে শুয়ে পড়ে। বাবার বিছানার একধারে প্রমথ শুয়ে থাকে। গঙ্গাধর নিজে গ্রন্থপাঠ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ বের হয়েছে—তার খুব সমাদর দেশের সমাজে—মধ্যেমাঝে তাও পড়ে থাকে গঙ্গাধর। আশ্চর্য স্বাদ আছে তার মধ্যে। সমস্ত মাটি জল বাতাস যেন মদির হয়ে ওঠে। আজ আর কোনো গ্রন্থই পড়ে নি। চুপ করে বসে আছে। আর অনুভব করছে প্রবল আকর্ষণে সব চলেছে, সব চলেছে, সব চলেছে সামনের দিকে। জোয়ার আসে—জোয়ার ঠেলে পিছিয়ে দেয়—কিন্তু আবার ভাটির টান পড়ে, চলে চলে চলে।

এই সময় মন্মথ এলো। ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল।

বাবা বললে—আয়।

কাছে বসল মন্মথ। গঙ্গাধর টেনে নিলে তাকে কাছে। তারপর বললে—যেতে ইচ্ছে—তা কাল রাত্রে আমাকে তো বললি নে!

একটু চুপ করে থেকে মন্মথ বললে—তুমি যে বললে—সংস্কৃতই পড়। আমি বললাম—বেশ। কলকাতা যাবার কথা সন্ধ্যেবেলা বলেছিলাম কাকার কাছে। কামীমা দাঁড়িয়ে ছিলেন কাছে।

—সংস্কৃত তোর ভালো লাগে না? ব্যাকরণ তো তুই খুব ভালো বুঝিস রে।

উত্তর দিল না মন্মথ।

ব্যাপারটা বুঝতে কষ্ট হল না গঙ্গাধরের। উত্তর দেবে না। দিতে চায় না মন্মথ। ইংরিজী তার আরও ভালো লাগে, এ কথাটা মন্মথ বলতে পারছে না চাচ্ছে না!

একটি দীর্ঘনিশ্বাস এবং একটুকরো হাসি দুইই একসঙ্গে ফেললে এবং হাসলে গঙ্গাধর। তারপর বললে—তাই যা!

বেশ একটুক্ষণ। এরপর চুপ করে রইল পিতাপুত্র দুজনেই। কিছুক্ষণ পর বাপ বললে—তাই যা। ইংরিজীই পড়। তবে—।

কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে উঠল। গঙ্গাধর উনবিংশ শতাব্দীর একজন যজমানসেবী ব্রাহ্মণ—তার স্বর্গ মর্ত পাতাল এবং ইহলোক ও পরলোক বিশ্বাস অনুযায়ী বললে—পৃথিবীতে মৃত্যুপতি যম জীবনের সম্মুখে আয়ু পুত্র পৌত্র গো হস্তী অশ্ব স্বর্ণ রাজ্য অপ্সরা প্রভৃতির ভোগ সমারোহ সাজিয়ে রেখে দিয়েছে, এর বিনিময়ে জীবন নিজেকে মৃত্যুর কাছে আত্ম-সমর্পণ করে। মানুষ মরে। ইংরিজীই হোক সংস্কৃতই হোক, বিদ্যা বিদ্যা। বিদ্যা তুমি অত্যন্ত সহজে আয়ত্ত করতে পারবে আমি জানি। তুমি যেন বিদ্যাবলে ওগুলোর লোভকে অতিক্রম করতে পার এই আশীর্বাদ করি। জানি না ফলবে কিনা।

আরও একটু স্তব্ধ থেকে আবার বললে—তাই যাও। পড়, ইংরিজীই পড়।

বিশে পৌষ বুধবার জটাধর লক্ষ্মীর ভাগ নিয়ে এবং সেই সঙ্গে ভাইপো মন্মথকে নিয়ে কলকাতা রওনা হল। রওনা হল নৌকো করে। কৃষ্ণভামিনী লক্ষ্মীর ঝাঁপি কোলে

করে পালকিতে চাপল। এসে নামল গঙ্গার ঘাটে। সেখান থেকে নৌকো।

মন্মথর জীবন চলতে আরম্ভ করলে।

গোবিন্দপুরের মাঠের নালা বেয়ে বড় নালায় পড়ে ঘুরতে ফিরতে এসে মিশল গঙ্গায়। গঙ্গায় জোয়ার ভাটা খেলে।

নৌকোর উপরে বসেই জটাধর ফর্দ করছিল লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উৎসবের এবং সমারোহের। পুজোর ফর্দ তৈরির জন্য ডাকে চিঠি দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে আগেই। সে ফর্দ করবে কলকাতার ভটচাজ্জি মশায়। বাবু জটাধরের পুরোহিত ভটচাজ্জি। জিনিসপত্র কিনবে সংগ্রহ করবে জটাধরের গদির গোমস্তাবাবু। জটাধর ফর্দ করছিল নিমন্ত্রিত জনেদের।

মন্মথ চুপ করে বসে ছিল।

সে যেন স্পষ্ট দেখছিল তাকে কে সামনে টেনে নিয়ে চলেছে। গঙ্গার দুই ধার বিচিত্র। গ্রাম শহর, মন্দির গির্জা মসজিদ, কোম্পানিদের কুঠিবাড়ি, বাঁধানো ঘাট ; চন্দননগর হুগলী শ্রীরামপুর পিছনে চলে যেতে লাগল।

পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন। মাস ছিল ঊনত্রিশ দিনে। সে দিন সুতরাং আটাশে। সংক্রান্তির আগের দিন সারা বাংলার গ্রাম জুড়ে ধান্যলক্ষ্মীর পুজো। গ্রামের ঘরে ঘরে। পিঠা হবে সরুচাকলি হবে পুলি হবে। এক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে লক্ষ্মীর পুজা হবে।

শুধু গ্রামেই নয় শহরেও হবে। তবে শহরে সেই ১২৯১ সালেই ধনীদের বাড়িতে কোজাগরীতে অর্থাৎ শরৎকালের পূর্ণিমাতে লক্ষ্মী পুজোর ব্যবস্থা ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছে। কোজাগরী লক্ষ্মী আর জগদ্ধাত্রী পুজো। জগদ্ধাত্রী পুজো পত্তন করেছিলেন কৃষ্ণনগরের মহারাজা নদীয়ার অধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। বাংলাদেশের জমিদার সম্পত্তিবানেরা তাঁর অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু কোজাগরীর পত্তন হয়েছিল নাকি আরও আগের কালে। মুরশিদাবাদে জগৎশেঠের মা নাকি এ পুজোর পত্তন করেছিলেন—অর্থাৎ কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোর। তার অনুকরণে সেকালে কলকাতায় অধিকাংশ ধনীদের বাড়িতেই এ পুজো হত। পৌষ মাসে পিঠের ধুম ছিল কিন্তু লক্ষ্মী পেতে লক্ষ্মী পুজোর রেওয়াজ বড় একটা ছিল না। গ্রামের থেকে যারা চলে এসেছে তাদের সম্পত্তি আছে দেশে—তারা গ্রামে লক্ষ্মী পুজোর ব্যবস্থা বজায় রেখেছে পুরুত পুজক গোমস্তা নায়েব মারফত কিন্তু শহরে পুজো করে না।

জে ভটচাজ কোম্পানির জে ভটচাজ সেই পুজো করলে সেবার খুব ঘটা করে। জে ভটচাজ—জটাধর ভটচাজ! কলকাতায় সে আলাদা মানুষ। অনেকদিন থেকেই তার সাধ তার বাড়িতে সে একটি উৎসব পুজোর পত্তন করে, কিন্তু এই মহানগরীতে বড় বড় ধনীদের বাড়িতে পুজা-অর্চনার উৎসব উপলক্ষগুলি এমনভাবে ব্যবস্থা হয়ে আছে যে সেখানে বা সে সময়ে ওই সব উৎসবের ছড়াছড়ির মধ্যে মাথা গলাতে সাহস হয় না। ছেলেপুলে থাকলে বা এই সব উপলক্ষ ভাগ্যই হোক আর ভগবানই হোন যুগিয়ে দেন কিন্তু সে ভাগ্যে সে বঞ্চিত। তাই গ্রাম থেকে লক্ষ্মীর ভাগ নিয়ে এসে পৌষ মাসের সংক্রান্তির আগের দিন বেশ একটু সমারোহ করে পুজো করছে। নেমন্তন্ন হয়েছে সে প্রায় ঢালাও করে। পত্র ছাপিয়ে ফর্দ করে নেমন্তন্ন পত্র পাঠানো হয়েছে। সেকালে কলকাতায় নাপিতের চল ছিল। নাপিত বিলি করেছে এক দফা, কর্মচারীরা আর এক দফা, জটাধর নিজে আরও এক দফা। ওই রামচন্দ্রপুরের জয়রাম মুখুজ্জে মশায় একজন।

হরেকরকম পুলি পিঠে সরুচাকলি রসের পিঠে করবার জন্য লোক আনানো হয়েছে। তার সঙ্গে রাত্রে লুচি তরকারি মিষ্টান্ন ফলফুলুরির ঢালাও ব্যবস্থা। আলাদা করে একটা

ঘরে বিশেষ ব্যবস্থা সে চেয়ার টেবিল সাজিয়ে করা হয়েছে। সেখানে পেলেটি জাতীয় একটা নতুন নামী হোটেলের বয় বাবুর্চিরা সব ভার নিয়েছে।

এ ছাড়া ঢপকীর্তনের ব্যবস্থা হয়েছে। সে-সময় সদ্য যুবতী পান্না দাসী নামে মেয়ের কীর্তনগানের খ্যাতি লোকের মুখে-মুখে ফিরছে—সে পান্না কীর্তনওয়ালীর ঢপের গানের বায়না হয়েছে। সে হবে আজ সন্ধ্যাবেলা এবং আসছে কাল সন্ধ্যাবেলা খেমটা নাচও হবে। সে-সবই কিন্তু পরের কথা। ২৮শের অর্থাৎ সেদিনের সকালের কথা বলছি।

২৮শে সকালে ভাঁড়ার ও রান্নাশালের ব্যবস্থা এ সব লোকজনেরা করছে। বাড়িতে মেরাপ বাঁধা ইত্যাদির কাজ ভাড়াটে লোকে করেছে। বাড়ির ভিতরে হচ্ছে পুজোর আয়োজন। কৃষ্ণভামিনী ভোরবেলা গঙ্গাস্নান সেরে এসে বামনঠাকরুন পাঁচুর মাকে এবং আরও দু'জন পড়শী বামুন মেয়ে নিয়ে আয়োজন করছে। বানারসী কাপড় পরে সারা অঙ্গে ভূষিতা হয়ে লক্ষ্মী পাতলে কৃষ্ণভামিনী।

গোবিন্দপুর থেকে আনা হয়েছিল একটি ছোট 'সিন্দুরেপেছে'র মধ্যে গোটাকয়েক সমুদ্রের কড়ি এবং একটা বেতের পাই—অর্থাৎ মাপের আধসেরা ছোট টুকরি করে এক পাই ধান, আর তার সঙ্গে ছিল একটা রঙচটা কাঠের পেঁচা মানে লক্ষ্মীর বাহন। তার সঙ্গে মেশানো হল একরাশ সামুদ্রিক রত্নরাজি; মানে কড়ি শামুক শাঁখ; একটা মস্ত রুপোর ঘড়া ভর্তি সামুদ্রিক রত্ন। একখানা মস্ত বড় রুপোর পরাতের উপর এই রত্ন ঢেলে একটি গোলাকার স্তূপ করে তার মাঝখানে ওই সামান্য এবং স্বল্প সামগ্রী কটিকে রাখা হল, যেন গ্রামের সুন্দরী মেয়ে হঠাৎ একদিন রাজকন্যা হলেন। একটি সুন্দর পিতলের লক্ষ্মীমূর্তিকে টকটকে রাঙা পাটের বা রেশমের শাড়ি পরিয়ে বসানোও হল। তারপর সামনে দুই দিকে দুই বিক্রমশালী পেঁচাকে, যারা নাকি নারায়ণের গরুড়ের সঙ্গেও পাল্লা দিতে পারে, তাদের বসানো হল। তাদের পাশে থাকল গোবিন্দপুর থেকে আনা পেঁচাটি।

প্রায় অসীম ধৈর্যের সঙ্গে নিপুণ হাতে এই লক্ষ্মী পাতলে কৃষ্ণভামিনী এবং এমনই সুন্দর হল দেখতে যে যারা ছিল তারা একবাক্যে বললে—মা সাক্ষাৎ এসে আসনে বসেছেন। কি শোভা দেখেছ?

ধূপ জ্বলছে ধুনো জ্বলছে—দুটো বড় বড় পিতলের দীপগাছায় ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। তার থেকেও বড় দুটো প্রদীপ জ্বলছে কাঠের দীপগাছার মাথায়।

কৃষ্ণভামিনী লক্ষ্মী পেতে শেষ করে নিজেই নিপুণ জিহ্বায় উলু দিয়ে গড় হয়ে প্রণত হল—সঙ্গে সঙ্গে দশ-বারোটা ঝিউড়ী মেয়ে উলুধ্বনি দিয়ে আনন্দকলধ্বনি তুলে দিলে।

উলু-উলু-উলু-উলু-উলু-উলু-উলু-উলু—তার আর শেষ নেই। কৃষ্ণভামিনীই চীৎকার করে বললে—মরণ, সবাই উলু দিতে লাগলি ছুঁড়ীরা। শাঁখ বাজা। আর অনন্তকাল ধরে উলু দিবি নাকি।

পাড়ার দশ-বারোজন মেয়েকে নেমন্তন্ন দিয়ে আনানো হয়েছে। তারা গঙ্গায় চান করে এসেছে, নতুন ডুরে কাপড় পরেছে (কৃষ্ণভামিনীই পরিয়েছে), শাঁখও রয়েছে তাদের হাতে।

কৃষ্ণভামিনীর কথায় এবার শাঁখ বাজতে লাগল। কৃষ্ণভামিনী একজন ঝিকে বললে —কর্তাকে ডাক না বিন্দী! বল্ প্রণাম করে যাক।

লক্ষ্মীর ঘরের ঠিক সামনের বারান্দাটুকু পুজোর ঘরের দালানের মতো—সেই দালানে বসে ভটচাজমশায় পুজোর আয়োজন নিজে দেখেশুনে শেষ করে নিচ্ছিলেন। ভট্টাচার্য-মশায় নেহাত ভটচাজ বামুন অর্থাৎ কেবলমাত্র পুরোহিতবৃত্তিসর্বস্ব ব্রাহ্মণ নন; পাণ্ডিত্য খুব বেশী না হলেও পণ্ডিত মানুষ। অর্থাৎ সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের একজন পণ্ডিত। কিছু বাছা বাছা ঘরের শিষ্য যজমান আছে যাদের কাজকর্ম করে দেন। গোপীনাথ শাস্ত্রীর

সঙ্গে কৃষ্ণভামিনীর মাতৃকুলের কিছু সম্পর্ক ছিল। সে সম্পর্কটা কৃষ্ণভামিনীর বাপের আমলে প্রায় মুছেই গিয়েছিল। কৃষ্ণভামিনীর বিবাহের পর কৃষ্ণভামিনী জটাধরকে সঙ্গে নিয়ে শাস্ত্রীমশায়ের বাড়ি গিয়ে তাঁকে পরিতুষ্ট করে এবং কয়েকটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে তাঁর কাছে দীক্ষামন্ত্র পেয়েছে। সেই শাস্ত্রীমশায় দালানে একখানা গালিচার আসনে বসে পৈতে গ্রন্থি দিয়ে নিচ্ছেন ; লক্ষ্মী পাতা হয়ে গেল, এইবার তিনি পুজোয় বসবেন। সামনে পুজোর জন্যে কাপড় গামছা সাজানো রয়েছে ; পরাতে নৈবেদ্য সাজানো রয়েছে। নৈবেদ্য সাজাচ্ছে ভট্টাচার্যমশায়ের ছেলে রাধাশ্যাম। বারো তেরো বছর বয়স ছেলেটির। বেশ গোপাল গোপাল চেহারা। ভটচাজ গোপীনাথ শাস্ত্রীর সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ং জটাধর। সে এ সবই জানে। ভটচাজ বাড়ির ছেলে সে—ব্যাকরণ ও সংস্কৃত ভাষায় তার যতই অপারঙ্গমতা থাক এই লৌকিক বা লোকাচার সম্মত পুজো পার্বণের কানুন সে দিব্য জানে। লক্ষ্মী পুজো ষষ্ঠী পুজো প্রভৃতি পুজো সে নিজেও এককালে করেছে। কিন্তু কৃষ্ণভামিনীর সামনে সে তা বলতে ভরসাও করে না এবং বলতেও চায় না। কৃষ্ণভামিনী ধমক দেবে এবং বোধ করি কলকাতার সমাজে ও আসরে তার পৌরহিত্যবৃত্তিধারী বামুন পরিচয়টাও সবার সামনে বেরিয়ে পড়ে এটাও সে চায় না।

সে জিজ্ঞাসা করলে—সব ঠিক আছে তো ?

ভট্টাচার্য শাস্ত্রী বললেন—ঠিক মানে ? ভেবে পাচ্ছি না এ সব নিয়ে করব কি ? এত আয়োজন ?

—লাগিয়ে দিন। মায়ের চরণে দিন জড়ো করে।

শাস্ত্রী হেসে বললেন—পুজো তা তাইই গো। তোমাদের তো অজানা নয় !

কৃষ্ণভামিনী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মাথার ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে দাঁড়াল। ভঙ্গিটা একটু যেন প্রশ্নের ভঙ্গি—কি ? কি নাই ?

গোপীনাথ বললেন—সব আছে, বেশী আছে। তাই প্রশ্ন করব কি ? জটাধর একটু শাস্ত্রবহির্ভূত কাজ করেছে। লক্ষ্মীর অর্চনায় খরচ বেশী করে ফেলেছে। জান তো ওই মা-টির অর্চনা করতে হলে কৃপণ হতে হয়।

জটাধর বললে—সব ওর বরাত মামাবাবু—

সম্পর্কে গোপী শাস্ত্রী কৃষ্ণভামিনীর মামা হন।

গোপী শাস্ত্রী হাসলেন। কৃষ্ণভামিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—তা হলে কিছু বলব না। ওর বাবার যজমানেরা সকলে এ সব পুজো-আর্চার ব্যাপারে মুক্তহস্ত ছিল।

কৃষ্ণভামিনী কথার মাঝখানে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল, বললে—আচ্ছা তোমার আক্কেলটা কি বল দিকি ? লক্ষ্মী পাতা হয়ে গেল, শাঁখগুলো বাজল থামল, মেয়েগুলো উলু দিলে প্রণাম করলে, আমি প্রণাম করলাম আর তুমি ঘরের কর্তা তুমি মাথা নোয়ালে না ?

আসলে সে প্রসঙ্গটা চাপা দিলে, তার বাপের যজমানদের প্রসঙ্গ। চাপাও পড়ল। জটাধর তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণত হল।

কৃষ্ণভামিনী এবার একটু চকিত হয়ে উঠল।—মন্মথ কই ? মন্মথ ?—কণ্ঠস্বর উচ্চ করে ডাকলে—মন্মথ !

ঘরের ভিতর থেকে পাচিকা বামুন মেয়ে পাঁচুর মা বললে—ওগো মা, মন্মথ বোধ হয় নিচে গিয়ে থাকবে। ওই ম্যারাপট্যারাপ বাঁধা হচ্ছে।

চাকর নন্দ ছিল ওপাশের বারান্দায়—সে বললে—মন্মথবাবু ছাদে উঠেছে।

—ছাদে ?

—হ্যাঁ। আমি রাস্তা ধরে আসছিলুম দেখলুম ছাদের আলসে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে

কেউ। গেরুয়া কাপড়—ন্যাড়া মাথা—খোকাবাবুই হবে।

কৃষ্ণভামিনী গোপীনাথের ছেলে রাধাশ্যামকে বললে—যা তো ভাই—গিয়ে ডেকে আন তো! ছাদে আছে। আমার ভাসুরপো—সদ্য পৈতে হয়েছে। যা, বল গিয়ে খুড়ীমা ডাকছে। লক্ষ্মী পাতা হয়েছে প্রণাম করবে এস।

গোপী শাস্ত্রী বললেন—যা, ডেকে আন!

কৃষ্ণভামিনীকে বললেন—তোমার ভাসুরপো? গঙ্গাধরের পুত্র? কলকাতা এসেছে। গঙ্গাধরের পণ্ডিত হিসেবে নাম আছে। ছেলেটি কেমন?

আমাদের শতাব্দীর নায়ক মন্মথ ছাদেই ছিল। মধু রায় লেনের জে ভটচাজ্জির বাড়ির দোতলার ছাদে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে ছিল পশ্চিম আকাশের দিকে। শীতের সকাল—গাঢ় শীত, শীতটা ক'দিনে খুব কনকনে হয়ে উঠেছে। গঙ্গাসাগরের শীত। চারিপাশে একটা কুয়াশাচ্ছন্নতা ক্রমশ যেন গাঢ় হয়ে উঠছে। সূর্যকে দেখা যায় না। গঙ্গাও দেখা যায় না সে কুয়াশার জন্য নয়, মধু রায় লেনের বাড়ির পশ্চিম দিকে গঙ্গার ধার পর্যন্ত বসতি বসতি আর বসতি, অজস্র খোলার চালের বসতি, তারই মধ্যে বড় ছোট মাঝারি অজস্র পাকা বাড়ি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাতেই আড়াল পড়েছে গঙ্গার স্রোতোধারা। তবু মন্মথ মনে মনে গঙ্গার স্রোতকে দেখছিল। সেই কালনা থেকে ত্রিবেণী হয়ে চন্দননগর হুগলী চুঁচড়ো শ্রীরামপুর হয়ে সেই যে এসেছে, এসে এখানে জগন্নাথ ঘাটে নৌকো লাগিয়ে নেমে এ বাড়িতে উঠেছে—সেই যে ছবি সেই ছবি তার মনে পড়ছিল এবং ভাবছিল দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ গঙ্গাসাগর পর্যন্ত গঙ্গার ধারা ধরে কতটা যাবে কি দেখবে তারই কথা। কথাগুলো খুব স্পষ্ট ছিল না তার মনে তবে কথাটা এই তাতে কোন ভুল নেই। উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত এই গঙ্গার স্রোতের ছবি মধ্যে মধ্যে কেটে গিয়ে গঙ্গাসাগরযাত্রী বিচিত্র দেখতে নাগা সন্ন্যাসীর দল বা গুজরাতী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যাত্রিণীর দল, অথবা এমনই তরো অন্য কোন ছবির মধ্যে ঢাকা পড়লেও কিছুক্ষণের মধ্যেই সরে যাচ্ছিল। এরই মধ্যে গঙ্গাসাগরযাত্রী নৌকোগুলোকে তফাত যাও তফাত যাও—হুঁশিয়ার—হট যাও বলে বিলেত থেকে সব বিলিতী জাহাজ আসছে। স্টীমশিপ। জগন্নাথ ঘাটে নামবার পথে কয়েকখানাই স্টীমার সে দেখেছে। সেগুলো ছোট।

ঠিক এমনি সময়ে রাধাশ্যাম এসে দাঁড়াল।

রাধাশ্যাম ভট্টাচার্য পণ্ডিত ঘরের ছেলে, তা হলেও সে ইংরিজী স্কুলে পড়ে, তার গায়ে শহরের কড়া ছাপ না থাকলেও কিছুটা আছে। মন্মথ পাড়াগাঁয়ের ছেলে, তার উপর মাথা ন্যাড়া পরনে গেরুয়া কাপড়—তার গায়ে পাড়াগাঁয়ের ছাপ নিশ্চয় আছে কিন্তু সে ছাপ তাকে মলিন করতে পারে নি—এবং ছেলেটি সংকুচিতও নয়।

রাধাশ্যাম বললে—তুমি বুঝি মন্মথ?

মন্মথ ঘাড় নেড়েই জানালে—হ্যাঁ।

—তোমার পৈতে হয়েছে, নয়?

মন্মথ হেসে ফেললে। বাঁ হাতে গেরুয়া কাপড়খানাকে একটু সামলে নিলে অকারণে এবং ঠিক তেমনি অকারণেই ডান হাতের তালুখানা ন্যাড়া মাথার উপর বুলিয়ে নিলে। এক মাস সাত দিন হল পৈতে হওয়া। এরই মধ্যে বেশ চুল বেরিয়ে গেছে। রাধাশ্যাম লজ্জিত হল নিজের কাছে। সে লজ্জা ঢাকতে গিয়ে আপনা থেকে যে প্রশ্নটি বেরিয়ে এলো সেটি গোপীনাথ শাস্ত্রীর পুত্রের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক—সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করে বসল—রোজ সন্ধ্যে কর? সন্ধ্যের মন্তর জান?

মন্মথ ক্রমান্বয়ে হাঁ-এর ভঙ্গিতে বেশ হাসি-হাসি মুখেই ঘাড় নেড়ে যাচ্ছিল।

আজ সকালে সন্ধ্যে করেছ ?

মন্মথ ঘাড় নেড়ে দিলে। রাধাশ্যামের প্রশ্ন ফুরিয়ে গেল।

মন্মথ এবার বললে—তুমি কে ? তোমার নাম কি ?

—আমি রাধাশ্যাম। শ্রীরাধাশ্যাম দেবশর্মা ভট্টাচার্য।

—কি পড় তুমি ?

—সংস্কৃত কলেজিয়েটে পড়ি।

—সংস্কৃত কলেজিয়েটে ?

—হ্যাঁ। আমার বাবা সেখানকার পণ্ডিত তো !

—ও ! তুমি কোন্ ক্লাসে পড় ?

—পড়ি ফিফ্‌থ ক্লাসে। কিন্তু বাড়িতে বাবার কাছে সংস্কৃত পড়ি অনেক এগিয়ে। ব্যাকরণ পড়ি।

—বাবার কাছে ? তোমার বাবার কাছে ?

—হ্যাঁ। বললাম না বাবা আমার সংস্কৃত কলেজিয়েটে পণ্ডিত।

—আমিও বাবার কাছে সংস্কৃত পড়তাম। আমার বাবাও খুব বড় না হলেও পণ্ডিত মানুষ। আমিও বাবার কাছে ব্যাকরণ পড়তাম আর মাইনর স্কুলে পড়তাম—

—কোন্ ব্যাকরণ পড় তুমি ?

—মুগ্ধবোধ। তুমি ?

—সিদ্ধান্ত কৌমুদী পড়ান বাবা।

—তুমি—তুমি তোমার বাবাকে বলে দেবে আমি ভর্তি হব তোমাদের ইস্কুলে। আমি মাইনর পরীক্ষা দিয়ে চার টাকা বৃত্তি পেয়েছি।

—তাহলে ? তা হলে তুমি তো হিন্দু ইস্কুলে পড়তে পার।

—হিন্দু ইস্কু—ল !

—হ্যাঁ হিন্দু ইস্কুল। এ দেশের সব থেকে ভালো ইস্কুল—নামকরা ইস্কুল। চল না, বাবাকে এক্ষুণি বল।

—তোমার বাবা এসেছেন ?

—হ্যাঁ। তিনিই তো লক্ষ্মীপুজো করছেন। তোমার কাকার কাকীমার তো গুরু তিনি।

ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই ডাক পড়তে লাগল—মন্মথ মন্মথ—মনু রে !

ডাকছিল জটাধর। জটাধরের স্বভাবই ওই, উত্তরের প্রতীক্ষা না করে ডেকেই যাবে ডেকেই যাবে এবং যাকে ডাকছে তাকে সামনে না পাওয়া পর্যন্ত থামবে না। তার উপর কৃষ্ণভামিনী তাড়া দিলে তার হাত বা দেহ মন এমন কাঁপে যে, জীবনের কর্মদক্ষতার যে সূচটি জীবনকে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই সূচটির ছিদ্রপথে তার জীবনের সুতোটি কিছুতেই প্রবেশ করতে পারে না—ক্রমাগতই ফসকে ফসকে যায়। জীবনে যে লোকটা খালি হাতে পায়ে বেরিয়ে এত বড় প্রতিষ্ঠা গড়ে তুলেছে সে যেন নগণ্য হয়ে যায়।

মন্মথ সাড়া দিয়ে বললে—যাই কাকাবাবু। যাই।

জটাধর তবু ডাকছে—মনু রে !

মন্মথ ও রাধাশ্যাম ছাদ থেকে নেমে এলো। সিঁড়ির মাঝপথে দেখা হল জটাধরের সঙ্গে।

মন্মথ বললে—এই আমরা যাচ্ছিলাম কাকাবাবু—

—তোর খুড়ীমা খুঁজছে তোকে। বলছে কোথাও গেল না তো ? কলকাতা শহর !

পথ হারালো না তো ?

—না কাকাবাবু, পথ আমি হারাবো না। জানো আমি ঠিক চলে যেতে পারি গোবিন্দপুর—

—তা পারবি বই কি ! আমার ভাইপো তো তুই। আমি যখন পালিয়ে এসেছিলাম তখন—। বলব—তোকে বলব সে গল্প একদিন।

মন্মথ বললে—কাকাবাবু রাধাশ্যাম বলছিল—

—রাধাশ্যামের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তোর ?

—হ্যাঁ। ও বলছিল—

—ও তোর কে হয় জানিস ? কে হয় ? রাধাশ্যাম তুমি বলতে পার ? রাধাশ্যাম আশ্চর্য হয়ে বললে—কে হবে ? আমার কে হয় ?

—এই দেখ শাস্ত্রীমশায় হলেন আমার মামাশ্বশুর আবার গুরু। কৃষ্ণভামিনীর মামা —তারও গুরু। তুমি হলে আমার শালা—কৃষ্ণভামিনীর মামাতো ভাই আবার গুরুভাই। মন্মথ আমার ভাইপো। বড়দার ছেলে। কৃষ্ণভামিনী মন্মথর হল খুড়ীমা—আপন খুড়ীমা। আমাদের পাড়াগাঁয়ে বলে সোদরখুড়ীমা। সে তোমার মায়েরই তুল্য। তা হলে কি হল দেখ ! আমার ছেলে থাকলে তুমি তার মামা হতে। হতে না ?

রাধাশ্যামকে স্বীকার করতে হল যে জটাধরের ছেলে থাকলে তাকে তার মামা হতে হত এবং সেই হেতু সে মন্মথর মামা হয়।

—মনু বাবা তুমি প্রণাম কর রাধাশ্যামকে। আর এই দেখ, প্রণাম কর, দাদু, শাস্ত্রীমশাই —শ্রীযুক্ত গোপীনাথ শাস্ত্রী—মস্ত পণ্ডিত, আমার আর তোমার খুড়ীমার দীক্ষাগুরু তার ওপর তোমার খুড়ীমার মামা হন সম্পর্কে। সংস্কৃত কলেজে পড়ান। প্রফেসর। প্রণাম কর। গুরুদেব এটি হল আমার ভাইপো। মন্মথ—মন্মথনাথ ভট্টাচার্য—আমার দাদার বড় ছেলে।

মন্মথ তার সেই বিচিত্র নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে শাস্ত্রীমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। ওটা ওর স্বভাব। কেন এমনভাবে তাকিয়ে থাকে, কি দেখে, তা ও জানে না। তবু ও নতুন মানুষকে এমনিভাবে দেখে, দেখে নেয়।

কৃষ্ণভামিনী এগিয়ে এসে বললে—প্রণাম কর বাবা মনুধন।

কৃষ্ণভামিনী এরই মধ্যে ওকে মনুধন করে ফেলেছে। তার সন্তান-বঞ্চিত জীবন তার কাছে অসুখে অশান্তিতে শূন্যতায় অসহনীয় হয়ে উঠেছিল।

সন্তান হয়েছে, মরেছে, মৃত সন্তানই হয়েছে বেশী—দুটি, একটি তিন চার মাস ভ্রূণ অবস্থাতেই নষ্ট হয়ে হয়েছে, একটি বেঁচে ছিল এক সপ্তাহ। এর একটা দুরন্ত দুঃখ আছে। প্রচণ্ড দুঃখ। শোক। তার উপর ভাবনা ছিল কৃষ্ণভামিনীর। ভাবনাটা ছিল সেকাল অনুযায়ী ভাবনা। ভাবনা ছিল সতীনের। জটাধর কৃতী মানুষ। তার হাতে ধুলোর মুঠো সোনার মুঠো হয়, সে তা চোখে দেখেছে। একবার ঘোড়ার দানার জন্যে ছোলা সাপ্লাইয়ের অর্ডার পেয়েছিল হার্ট কোম্পানির আস্তাবল থেকে। গোটা বছরের ছোলার অর্ডার। ভালো ছোলা কিনে তার সঙ্গে মিশেল দেবার জন্য এক গোলা পোকাখাওয়া ছোলা কিনেছিল সে। পেয়েছিল খুব সস্তা দরে। টাকা মিটিয়ে দিয়ে গোলা ভেঙে নৌকোয় বোঝাই করবার সময় দেখা গিয়েছিল অবাক কাণ্ড। ছ হাত উঁচু গোলাটার উপরের হাত দেড়েক ঠাঁইয়ের ছোলা পোকায় প্রায় 'ঝুস' করে দিয়েই শেষ। তারপর সাড়ে চার হাত গোলার ছোলা একেবারে প্রায় টাটকা তাজা থেকে গিয়েছিল। সেবার একটা সওদায় জটাধরের লাভ হয়েছিল প্রায় দশ হাজার টাকা। যে-মানুষের ভাগ্য এমন সে-মানুষের কাছে কলকাতার

মধু রায় লেনের খানিকটা জমি আর খানিকটা বসতি এবং হাজার পাঁচেক টাকার দাম আর কতটুকু। এ মানুষ যদি কোনোদিন বলে ছেলেপুলে হল না, হল যদি থাকল না এখন এই সব ধনদৌলত আমার খাবে কে? হবে কি? তা হলে কোন্ কথা বলে তার ভাবনাটাকে ঘুরিয়ে দেবে বা কোন্ দৃষ্টান্ত দিয়ে বলবে—নাই বা বাঁচল ছেলে! বা কি হবে ছেলে নিয়ে?

এতেই মধ্যে মধ্যে জটাধর বলে—ভেবো না। কপালে থাকলে হবে। সে বুড়ো বয়সেই হবে! দৃষ্টান্ত দিয়ে বলে—ওই দেখ দেববাবুদের কর্তার কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি। সে নাকি নবাব সিরাজউদ্দৌলার তোষাখানার সোনা রুপো হীরে জহরতের ভাগ পেয়েছিল। কিন্তু কত্তার ছেলে নেই। বিয়ে করলে একের পর এক। তাতেও কিছু না। শেষে ভাইপোকে পুষ্যি নিলে। মজার কথা কি জান, ঠিক তার পরই তার ছেলে হল ছোটগিন্নীর গর্ভে। শেষে সম্পত্তি নিয়ে মামলা। ছেলে বলে—আমি ঔরসজাত ছেলে যখন হয়েছি তখন পুষ্যিপুত্র পাবে কেন? পুষ্যিপুত্র বলে—আমাকে তো দলিল রেজিস্ট্রী করে পুষ্যিপুত্র নিয়ে লিখে দিয়েছে যে কর্তার মৃত্যুর পর আমি শ্রাদ্ধ করব—তার ওয়ারিস হব! সে-মামলা প্রিভি কাউন্সিল গিছল। তা বুঝে দেখ নসীবের খেলটা। একটা দুটো তিনটে করে ছটাতে হল না ছেলে—সাত নম্বর বিয়ে করলে সঙ্গে সঙ্গে পুষ্যিপুত্রও নিলে। বাস অমনি ছেলেও হল।

কৃষ্ণভামিনী মুখে কোনো কথা বলে না। কিন্তু স্বামীর দিকে চেয়ে ভাবে সেও কি একটার পর একটা বিয়ে করে যাবে?

গোবিন্দপুর থেকে মন্মথকে সঙ্গে করে আনবার সময় কৃষ্ণভামিনীর মনে একটা আশা উঁকি মেরেছিল; সেটা হল এই যে মন্মথকে যদি ভালবাসে জটাধর তা হলে—। তা হলে হয়তো—! তাই এই ক'দিনেই মন্মথকে সে প্রাণ দিয়ে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করেছে।

মামা গোপীনাথ শাস্ত্রীর কাছে মন্মথকে, পিঠে হাত দিয়ে এনে বললে—এই মন্মথ গুরুদেব। আমার ভাসুরপো। ভারী ভালো ছেলে—খুব ভালো ছেলে। প্রণাম কর বাবা।

গোপীনাথ মন্মথর সেই বিচিত্র দৃষ্টির সামনে কেমন যেন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলেন, তিনি বললেন—এ তো চমৎকার ছেলে মা ভামিনী! সুলক্ষণযুক্ত ছেলে। সুন্দর বালক।

জটাধরের মনে পড়ে গেল দাদার কথা।—আমি রাশিচক্র বিচার করে দেখেছি জটাধর, ও নির্বোধ হবে। আরও অনেক বলেছিল দাদা। সে সব মনে নেই। সে বললে—ওর রাশিচক্রটা একবার বিচার করে দেখতে হবে বাবা আপনাকে।

—তা দেখব।

—বাবা। রাধাশ্যাম ফাঁক পেয়ে তার মাথা গলিয়ে দিলে এরই মাঝখানে,—বাবা।

—কি?

—ও এবার মাইনরে বৃত্তি পেয়েছে হুগলী জেলা থেকে। আমাকে বলছিল আমাদের ইস্কুলে পড়বে। ওকে হিন্দু ইস্কুলে ভর্তি করে দিন না!

—তুমি মাইনরে বৃত্তি পেয়েছ? তাই তো হে তুমি তো শুধু সুন্দরই নও তুমি উজ্জ্বল ছেলে।

—মাইনরে পড়তে পড়তেই ও সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়েছে; ওর বাবার কাছে পড়ত। মন্মথ মুগ্ধবোধ পড়ে—

কৃষ্ণভামিনী এগিয়ে এসে বললে—প্রণাম কর মন্মথ। এখনও অবধি তুমি সেই দাঁড়িয়েই আছ, প্রণাম কর নি।

মন্মথ প্রণাম করলে শাস্ত্রীমশাইকে।

প্রণাম করতে গিয়ে কিন্তু আকস্মিকভাবে একটা প্রশ্ন যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল মনের মধ্যে।—কেন প্রণাম করব ?

প্রণাম করতে করতে মনে হল পায়ের উপর খুব জোরে মাথা ঠুকে দিলে কি হয় ? কিন্তু তার কিছুই কাজে দাঁড়াল না। যথানিয়মে প্রণাম করেই সে উঠে দাঁড়াল।

সারা দিন ধরে উৎসব আর সমারোহ লেগে রইল সেদিন। পুজো ভোগের পর নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ ভদ্র শূদ্রদের খাওয়াদাওয়া। সে দীয়তাং ভুজ্যতাং ব্যাপার করেছিল জটাধরবাবু। জটাধর ভটচাজ ঘর থেকে পালিয়ে দেশান্তর ঘুরে কলকাতায় এসে মুদীটুদী জাতীয় ব্যবসাদার হয়েছিল। তারপর পনের ষোল বছরে সে হয়েছে জে. ভটচাজ কোম্পানির মালিক। নানান ধরনের ব্যবসা তার। সুদী কারবার এখন ব্যাঙ্কিংএ দাঁড়িয়েছে, জে. ভটচাজ এখন ব্যাঙ্কার। তার বাড়িতে এই প্রথম কাজ।

বাইরে ব্যান্ড বাজনা থেকে টেবিলে চেয়ারে খাওয়ার ব্যবস্থা পর্যন্ত খুঁত কোথাও কিছু রাখে নি জটাধরবাবু। পিঠে পুলি পায়েস প্রভৃতি তো আছেই। তার সঙ্গে কেক প্যাস্ট্রি চপ কাটলেটও আছে।

দুপুরে পুজো ভোগ শেষ হতেই আরম্ভ হল খাওয়াদাওয়া। ছাদের উপরে দেশী নিমন্ত্রিতেরা খাচ্ছে। নিচে বাড়ির পাশে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে বিলিতী খাওয়ার ব্যবস্থা। লোকজনেরাও বিলিতী! বেশী নয়। দশ পনের জন হবে। তার সঙ্গে দেশী সাহেবরা আছে।

বাইরে আছে রাজ্যের ভিক্ষুক। কানা খোঁড়া বোবা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত থেকে দিব্যি সবল সুস্থ ভিখিরী পর্যন্ত। কেউ কেঁদে চাইছে, কেউ সবিনয়ে চাইছে, কেউ কেউ বা চোখ রাঙাচ্ছে। তাদের মধ্যে গেরুয়াধারী চিমটেধারী এবং জটাধারীই বেশী। গঙ্গাসাগর যেতে যেতে যাদের যাওয়া ঘটে ওঠে নি তারা এইভাবে কলকাতায় কোথায় উৎসববাড়ি আছে ঠিক খুঁজে বের করে এসে হাজির হয়েছে।

এরই মধ্যে রাধাশ্যামের সঙ্গে মন্মথ পথে বেরিয়ে পড়ল। এ ক'দিন দিনে একবার করে সে কাকার সঙ্গে বেরিয়েছে, সে বেরিয়েছে গাড়ি করে। এবং সে বের হওয়ার দিগন্ত কাকার কাজের ম্যাপের সীমারেখার মধ্যে ঘেরা। একদিন আপিস পাড়া দেখে এসেছে। দু দিন সিমলের বাজারে গেছে। ক'দিন কাকীমার সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে গেছে। গঙ্গাস্নান করে কপালে ছাপ নিয়ে ফিরে এসেছে। আজ বের হল পায়ে হেঁটে রাধাশ্যামের সঙ্গে।

কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে প্রথমে হেদুয়ার দিকে—তারপর হেদুয়া থেকে দক্ষিণমুখে একেবারে কলেজ স্ট্রীট হিন্দু ইস্কুল গোলদীঘি এবং গোলদীঘির সামনে অনেকগুলো লম্বা এবং চওড়া সিঁড়ির মাথায় চাতালের উপর বিরাট মোটা গোল থাম-ওয়ালা সেনেট হল পর্যন্ত। তার পাশে হেয়ার ইস্কুল। প্রেসিডেন্সী কলেজ। হিন্দু ইস্কুলের পূর্বদিকে সংস্কৃত কলেজ।

রাধাশ্যাম বললে—এইবার বাড়ি চল।

—না। চল না আরও যাই। এখনও তো বেলা রয়েছে।

মেডিকেল কলেজ এলাকা পার হয়ে বউবাজার পর্যন্ত গিয়ে রাধাশ্যাম বললে—আর না।

—না। চল না আরও সামনে।

—সামনে কোথায় ?

—বলছিলে না চৌরঙ্গী ধর্মতলায় সব একেবারে সাহেবী এলাকা। তার ওপর এখন বড়দিন—নিউ ঈয়ারস্ ডের বাজার এখনও চলছে; চল দেখে আসি।

তাই তারা গেল। শুধু চৌরঙ্গী পর্যন্তই নয় একেবারে ইডেন গার্ডেনস্এর ওদিকে

জাহাজ জেটী পর্যন্ত।

বাড়ি যখন ফিরল তখন মন্মথ কলকাতাকে যেন জেনে ফেলেছে চিনে ফেলেছে। ভারী ভালো লাগল তার কলকাতাকে।

বাড়ির দোরে দাঁড়িয়ে তখন জটাধর বেশ খানিকটা হইচই বাধিয়ে তুলেছে। ওদিকে কৃষ্ণভামিনীও উৎকণ্ঠিত হয়েছে। গোপীনাথ শাস্ত্রী বিব্রত বোধ করছেন। কারণ মন্মথকে সঙ্গে নিয়ে গেছে তাঁরই ছেলে রাধাশ্যাম। বিপদ হবার কোনো কারণ নেই কিন্তু আকস্মিক দুর্ঘটনা অ্যাকসিডেণ্ট অকারণেই ঘটে।

মনে মনে তিনি 'আপদউদ্ধার' মন্ত্র পাঠ করছিলেন।

এমন সময় তারা ফিরল।

হল হইচই খানিকটা। সে খানিকটা তিরস্কার হলেও আজকের মতো দিনে উৎকণ্ঠা অবসানে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার আরাম ও আনন্দের জন্য তা কটু হয়ে উঠল না। সকলেই বাঁচল।

সব থেকে বেশী স্বস্তির আনন্দ হল শাস্ত্রীর। নিজের ছেলের হাত ধরে তিনি বললেন—পল্লীগ্রাম থেকে এসেছে মন্মথ তাকে নিয়ে তুমি এই কলকাতা শহরে—

বাধা দিয়ে রাধাশ্যাম বললে—ওরে বাপরে! ওর ভয়ানক বুদ্ধি। সব চিনে ফেলেছে এক দিনে।

শাস্ত্রী মন্মথের দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমার জন্য আমি বলব হিন্দু ইস্কুলের হেডমাস্টার মশায়কে। কেমন?

মন্মথ হাসলে। ওদিকে তখন কীর্তনের আসর বসে গেছে। গান বেশ জমেও উঠছে। মানুষের মনকে টানছে। শাস্ত্রীমশায় পিছন ফিরলেন—বৃত্তি পেয়েছ তুমি, কোনো ভাবনা নেই।

রাধাশ্যাম বলতে গেল—ও তোমার কাছে—

কথা তার শেষ হল না। শাস্ত্রী তাকে বললেন—চল বাড়ি চল এখন। সব হবে।

টেনেই নিয়ে গেলেন তিনি ছেলেকে। মন্মথ আসরে গিয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গেই যেন জীবনের ভাবনা চিন্তা এমন কি সমস্ত অস্তিত্ব পর্যন্ত আশ্চর্য আনন্দলোকে ডুবে গেল। গ্যাসের আলো জ্বলছে। দুধের রংয়ের মতো একটি শুভ্রতা আছে গ্যাসের আলোর মধ্যে। ঝলমল করছে আসরটা। মাথার উপর বহুরঙে রঙিন দামী সামিয়ানা—তেমনি আসর। তার উপর রূপসী কীর্তনওয়ালীর মধুঢালা কণ্ঠস্বর। সর্বাঙ্গ তার গহনার সোনার ছটায় ঝকমক করছে।

কীর্তন ভাঙল যখন তখন অনেক রাত্রি। বোধ করি রাত্রি বারোটা। বিছানায় শুয়েও মন্মথর ঘুম এলো না। সে আলোয়ানখানা গায়ে দিয়ে চলে গেল ছাদের উপর। সেই সকালবেলার ঠাঁইটিতে সেই আলসেতে ভর দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ভাবতে চাইছে সে বাবার কথা প্রমথর কথা কিন্তু ভাবতে পারছে না। মনে আসছে না। সেনেট হাউস মেডিকেল কলেজ ধর্মতলার চাঁদনী বাজার চৌরঙ্গীতে বড়দিনের আসরের জের—জাহাজঘাটায় বড় বড় জাহাজ, যেগুলো হাওড়ার পুল পার হয়ে জগন্নাথ ঘাট থেকে কালনার দিকে যায় না সেই বিরাটায়তন জাহাজগুলো—তারই মধ্যে বিচিত্র ভাবে এই কীর্তনের আসর—ওই কীর্তনওয়ালীর রূপ তার আভরণের ছটা পরের পর পরের পর এসে পিছনকে আড়াল করে দাঁড়াচ্ছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এলো সে।

কলকাতার কোনো লক্ষপতি বা কোটিপতি—হয়তো লাহাবাবুদের নয়তো মল্লিক বাড়িতে

পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দে দুটো বাজল তখন। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে সে দেখল বাবা পুজোর দাওয়ায় চুপ করে বসে আছেন।

পরের দিন মকর সংক্রান্তি, পৌষ মাসের শেষ দিন। কলকাতার পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা রাস্তাগুলো একেবারে লোকে লোকারণ্য। মকর সংক্রান্তির গঙ্গা স্নান। রাস্তাগুলোর দুপাশে মেলা বসেছে। গঙ্গার ঘাটে পাঁপরভাজা এবং বেগুনী ফুলুরির সমারোহ। তার সঙ্গে কলা।

একনজর দেখে এলো মন্মথ। ওই খুড়ীর সঙ্গে গিয়েছিল। সঙ্গে দুজন দারোয়ান গিছল। খুড়ো জটাধর এ সবে যায় না। লক্ষ্মীপুজোটুজো মানে তবে গঙ্গাচান ঠিক মানে না। মহালয়ার দিনে গঙ্গাস্নানে একদিন যায় কিন্তু ফিরে এসে সাবান মেখে কলের জলে চান করে তবে স্বস্তি হয় তার।

সে কথা থাক।

সেদিন সারাদিন প্রতীক্ষা করে রইল মন্মথ কিন্তু রাধাশ্যাম এলো না। সেদিন মকর সংক্রান্তির জন্য ইস্কুল (সেকালে) বন্ধ। বেড়াবার খুব সুযোগ ছিল এবং ইচ্ছেও ছিল। ইচ্ছে ছিল ইডেন গার্ডেনসের ওদিক থেকে গড়ের মাঠ এবং এদিকে জগন্নাথ ঘাট পর্যন্ত ওই গঙ্গাসাগর-যেতে-না-পাওয়া সন্ন্যাসী ও যাত্রীদের সে দেখে আসবে। এত রকম যাত্রীও আছে! এই কলকাতায় ওই জাহাজঘাটে ওই মানোয়ারী গোরা আর এই সন্ন্যাসীদের দেখে তার মনের একটা আশ্চর্যরকম চেহারা হয়ে উঠেছিল। কি কুৎসিত কি কদাকার আর কি বর্বর এই সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসীবেশী চোর বা ভণ্ডগুলো! কিন্তু সে হল না। সারা দিনের মধ্যে শাস্ত্রী বা রাধাশ্যাম কেউ এলো না। ওদিকে গত কালকের পুজোর দরুন নৈবেদ্যগুলি কাপড় গামছা অন্নথালি ইত্যাদি যে সব সামগ্রীগুলি পুজোয় দেওয়া হয়েছে তা সবই পোঁটলাবাঁধা হয়ে পড়ে রয়েছে—তাও নিতে এলো না কেউ। জটাধর কৃষ্ণভামিনী ভাবছিল লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবে সেগুলি। মন্মথ সারা দিনটা রাধাশ্যামের প্রতীক্ষা করে মনে মনে তেঁতো হয়ে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে তেতেও উঠেছে। সারাটা জীবনে সে কারুর উপর তেতে উঠবার সুযোগ পায় নি। সেখানে ভটচাজবাড়ির মাতৃহীন ছেলে ছিল সে; ক্রোশখানেক কি পাঁচপো পথ হেঁটে এম. ই. ইস্কুলে যেতো। ইস্কুলে গরীবের ঘরের ভালো ছেলে ছিল; বাবা গঙ্গাধর ভটচাজ বার বার সাবধান করতেন; এবং কোনো দিক থেকেই অগ্নিসংযোগের সম্ভাবনা থাকলে বা আগুন লাগলে সঙ্গে সঙ্গে শান্তিজল ছিটিয়ে নিভিয়ে দিতেন। এখানে এসে এই সবাই রাজার আজব শহর বা আপনহাতে-সবাই-সাড়ে-তিন-হাত মাপের শহর এই কলকাতায় কাকা জে. ভট্টাচার্জির বাড়িতে এসে রাধাশ্যামের মতো অনুগত একটি বন্ধু পাওয়ামাত্র অতিস্বাভাবিক নিয়মে তেতে উঠেছে সে। কলকাতায় বালাম চালের ভাত, সন্ধ্যেবেলার বাতাস আর কলের জলের একটা নাকি নাম আছে। চেহারা পালটায় মেজাজ পালটায় বদহজম রোগে ধরে।

বিকেলবেলা—বেলা তখন গড়িয়ে ছেড়ে শেষ হয়ে এসেছে—প্রায় পাঁচটা তখন। তখন শাস্ত্রীমশাই এলেন। কোথায় একটি ক্রিয়া ছিল সেই ক্রিয়া সেরে পথে পথে আসছেন। আর রাধাশ্যামের উদরের গোলমাল হয়েছে—কাল বোধহয় পিঠে খেয়েছে বেশী। ব্যস্ত হয়ে উঠল কৃষ্ণভামিনী এবং জটাধর দুজনেই। —খবর দিলে তো আমরাই গাড়ি করে পেঁৗছে দিতাম ওগুলি।

হেসে শাস্ত্রী বললেন সে জন্য আমি ঠিক আসিনি। আমি এসেছি তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রটির জন্য। বালকটি বড় মেধাবী। বুঝেছ! সব থেকে ভালো লাগল কি জান? ভালো লাগল—ও ইংরাজী পড়বে কিন্তু সংস্কৃতকে ছাড়বে না। তার সঙ্গে সংস্কৃতও রাখতে চায়। রাধাশ্যামকে বলেছে আমি যদি ওকে সংস্কৃত পড়াই! ও নাকি ওর পিতার কাছে ব্যাকরণ পড়ছিল। ওই ওরই জন্য এসেছি বুঝেছ! ওকে ডাক তো বাবা। কাল এ সব কথা তো শুনি নি।

মন্মথকে শাস্ত্রী বললেন—দেখ সম্পর্কে তো তুমি আমার নাতি হলে ভাই। তার চেয়ে ভালো লাগছে তুমি আমার কাছে সংস্কৃত পড়তে চেয়েছ। আমার ছাত্র হবে আমি তোমার শিক্ষাগুরু হব।

সেই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মন্মথ।

শাস্ত্রী তার কাঁধে হাত রেখে বললেন—তুমি দেখছি অকুতোভয়! হাসলেন।

মন্মথ জিজ্ঞাসা করলে—এ্যাঁ?

—তোমার চাউনি বড় তীব্র এবং তীক্ষ্ণ। কি খোঁজ?

মন্মথ ঠিক যেন বুঝতে পারলে না। বললে—কিছু তো খুঁজি না।

—আচ্ছা। শোন কাল বাদ দিয়ে পরশু তুমি হিন্দু ইস্কুলে যাবে ভর্তির জন্য। কাল বিদ্যারম্ভের দিন নয়, দিনটা ঠিক শুভও নয়। পরশু বারেও গুরুবার। বিদ্যারম্ভে গুরুবার শ্রেষ্ঠ। হ্যাঁ। একটা পরীক্ষা নেবেন হেডমাস্টার মশায়। সেইটেতে হবে যেমন ফল তারই উপর নির্ভর করবে। আর দেখ সেখানে হেডমাস্টার মশায়ের মুখের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থেকো না। কেমন?

কৃষ্ণভামিনী মন্মথর পিঠে আদর করে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে—পাড়াগাঁ থেকে এসেছে তো—এখানকার সবেতেই একটু অবাক লাগে বোধহয়।

—আর ব্যাকরণ তোমাকে আমি পড়াব।

—প্রণাম কর। বললে কৃষ্ণভামিনী।

হাঁটু গেড়ে বসে ভূমিষ্ঠ হয়ে মাথা নোয়ালে মন্মথ।

মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে শাস্ত্রী বললেন—তোমার হবে। আর হবে নাই বা কেন। বাবা যে ভগবানের সেবা আর শাস্ত্রচর্চা নিয়েই আছেন। যে যেমন কুলে জাত মানসগঠনও তেমনি হয়। আচ্ছা। পরশু। জটাধর পরশু ওকে সঙ্গে নিয়ে তুমিই যেয়ো। কেমন?

২রা মাঘ বৃহস্পতিবার—সেবারের পঞ্জিকায় বিদ্যারম্ভের চিহ্নিত শুভ দিন। সকালে গঙ্গাস্নান করিয়ে দেবতাস্থানে প্রণাম করিয়ে দই ভাত খাইয়ে কৃষ্ণভামিনী আশীর্বাদী নির্মাল্য জামার পকেটে গুঁজে দিয়ে মন্মথকে পাঠিয়ে দিলে হিন্দু ইস্কুলে।

সঙ্গে জটাধর গেল। কম্পাস মানে একঘোড়ায় টানা পালকি গাড়িটায় চড়বার সময় জটাধর তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে। মন্মথর মুখখানা থমথম করছে।

জটাধর জিজ্ঞাসা করলে—কি রে মনু, ভয় করছে না তো?

মন্মথ আরও খানিকটা গম্ভীর হয়ে গেল—বললে—না। তারপর বারকয়েক না-এর ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে দিলে।

কৃষ্ণভামিনী এসে বললে—হ্যাঁরে মনে মনে বাবাকে প্রণাম করেছিস তো? লক্ষ্মী-জনার্দন ঠাকুরকে?

মন্মথ বললে—হ্যাঁ। বলেও সে আর একবার প্রণাম করলে।

আশ্চর্য ! কিছুতেই আজ সকাল থেকে গোবিন্দপুরের বাড়ি লক্ষ্মীজনার্দন ঠাকুর তার বাবা কাউকেই যেন সামনে এনে দাঁড় করাতে পারছে না সে। গত পরশু দেখা কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে কলেজ স্ট্রীটে গোলদীঘির উত্তর পাড়ে হিন্দু ইস্কুলের বড় বাড়িটাই তার সমস্ত মনের দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

গোপীনাথ শাস্ত্রী বলে রেখেছিলেন, তাই হেডমাস্টারের ঘরে খবর দিতেই সঙ্গে সঙ্গেই ডাক পড়ল তাদের। পথে নয়, ইস্কুলে পৌছে ভিতরে ঢুকে কিন্তু ভয় পেয়েছিল মন্মথ। বড় বড় গোল থামওয়ালা প্রকাণ্ড বাড়িখানা বাইরে থেকে যা দেখাচ্ছিল তা কিছুই নয়। ভিতরে সে গম্ভীর গভীর। সারা বাড়িটা জুড়ে একটা চাপা গুঞ্জন উঠছে। তকমা-আঁটা পাগড়ী-পরা দারোয়ান রয়েছে। দরজাগুলি প্রকাণ্ড বড় বড়। যত লম্বা তত চওড়া। বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনে হল দরজার ভিতরে যেন একটা বিরাট পুরী রয়েছে।

বুকের ভিতরটা তার গুরগুর করে উঠল যেন। মনে হল সে কিছুই জানে না। কিছুই শেখে নি। যা শিখেছে তাতে এখানকার কোন প্রশ্নের জবাবই সে দিতে পারবে না।

আরদালী অফিস রুম থেকে বেরিয়ে এসে বললে—ভিতর যাইয়ে।

ঘরে ঢুকে আরও অবাক হয়ে গেল সে।

প্রকাণ্ড বড় একখানা ঘর। চারিদিকের দেওয়াল ঘেঁষে সারি সারি চকচকে বার্নিশ করা আলমারি; তাতে ঝকঝকে মলাটের রাশি রাশি বই। বই বই বই আর বই।

একজায়গায় খানিকটা জায়গা ফাঁকা। সেখানে প্রকাণ্ড বড় একখানা ম্যাপ টাঙানো রয়েছে। ইণ্ডিয়ার ম্যাপ। ভারতবর্ষের মানচিত্র। ঘরের মাঝখানে কালো বনাত মোড়া মস্ত একখানা টেবিল। সেই টেবিলের একদিকে বসে রয়েছেন শ্যামবর্ণ দীর্ঘকায় হেডমাস্টার। সুপুরুষ কিন্তু গম্ভীর মানুষ। পরনে কালো আলপাকার চাপকান। গলায় সাদা শক্ত কলার। মাথায় মাথাজোড়া টাক। দাড়ি গোঁফে মানুষটিকে তাঁর গাম্ভীর্য সত্ত্বেও একটি অসাধারণ প্রসন্নতা দিয়েছে।

আজ এই ১৯৬৯ সালে একটি শতাব্দীর মৃত্যুশয্যার পাশে বসে সেই মানুষটিকে মনে করে অনায়াসে বলতে পারি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মিল আছে—রাষ্ট্রনেতা সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর মিল আছে—সে যুগটা দাড়ি গোঁফের যুগ ছিল। কালো চাপকান সাদা শক্ত কলার শক্ত কফওয়ালা কামিজ সাদা জিনের পেন্টালুন সে যুগের আপিসের পোশাক ছিল।

তাঁর সামনে টেবিলের এপাশে ইস্কুলের হেডক্লার্ক বসে ছিল। সে চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বললে—বসুন।

হেডমাস্টার মুখ তুললেন এবার। মন্মথর দিকে তাকিয়ে দেখলেন। মন্মথও সেই স্থির দৃষ্টিতে তাকালে তাঁর দিকে। পরক্ষণেই চোখ নামালে। মনে পড়ে গেল গোপীনাথ শাস্ত্রীর উপদেশ।

সে চোখ নামিয়ে হেঁট হয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করলে। হেডমাস্টার বললেন —বাঃ—you are a bright boy. তুমি স্কলারশিপ পেয়েছ M.E. পরীক্ষায়।

জটাধর বললে—জেলায় থার্ড হয়েছে—

—শুনেছি। শাস্ত্রীমশায় আমাকে বলেছেন। নিঃসন্দেহে আপনার ভাইপো ভালো ছেলে। বৃত্তি পেয়েছে, তা হলেও আমরা ওকে পরীক্ষা করে নেব। পরীক্ষা কি আজই দেবে? শাস্ত্রীমশায় তাই বলছিলেন আমাকে।—কি? পরীক্ষা দিতে পারবে আজ?

ঘাড় নাড়লে মন্মথ—হ্যাঁ।

—কোনো রকম ভয় হচ্ছে না তো ?

সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। হ্যাঁ বা না কোন্‌টা বলবে যেন বুঝতে পারছে না।

হেডমাস্টার হেসে বললেন—কোনো ভয় নেই। নাও বসে যাও পরীক্ষায়। আমি সব তৈরি করে রেখেছি। নাও প্রথম শ্রুতিলেখন নাও দেখি—। ওহে কাগজ পেন্সিল দাও।

"কুবলয়পুরে ধনপতি সদাগর নামে এক সঙ্গতিপন্ন বণিক ছিলেন। তিনি ধনপতি নাম্নী নিজ কন্যার, গৌরীকালে গৌরী দত্ত নামক এক ধনাঢ্য বণিকের সহিত বিবাহ দিলেন। কিয়ৎকাল পরে ধনবতীর এক কন্যা জন্মিল। গৌরী দত্ত কন্যার নাম মোহিনী রাখিলেন। কালক্রমে, তিনি লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে, তদীয় জ্ঞাতিবর্গ, ধনবতীকে অসহায়িনী দেখিয়া তাহার সর্বস্ব অপহরণ করিল। সে নিতান্ত দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া কন্যা লইয়া এক তমিস্রা রজনীতে পিত্রালয়ে প্রস্থান করিল।"

মন্মথ বইখানা চিনতে পেরেছে। চেনার আনন্দ সে গোপন করতে পারলে না। আপনমনে বলে উঠল—বেতাল পঞ্চবিংশতি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

মাস্টার মশায়ের মুখ উজ্জল হয়ে উঠল। তিনি শুনতে পেয়েছেন তার কথা। জিজ্ঞাসা করলেন—পড়েছ তুমি ?

মন্মথ ঘাড় নেড়ে বলে—হ্যাঁ।

প্রসন্ন হেসে মাস্টার মশায় বললেন—ওইটেকেই ইংরিজী করতে হবে। পারবে ?

মন্মথ জানে না সে পারবে কিনা। তবু সে বললে—হ্যাঁ।

—তাহলে এই অঙ্ক কটা নাও। নিয়ে ঐ টেবিলে গিয়ে করে নিয়ে এস।

জটাধরকে বললেন—আপনি বাইরে ওয়েটিং রুমে গিয়ে বসুন।

জটাধর বাইরে গিয়ে বসল। কিছুক্ষণ বসল কিছুক্ষণ পায়চারি করলে গোটা তিন চার বার্ডশাই খেলে, একবার বাইরে গিয়ে কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথে দাঁড়াল। খানিকক্ষণ ট্রাম দেখলে। ট্রামের ঘোড়াগুলো বড় বড় খাঁটি ওয়েলার। তেমনি শিক্ষিত। ঘোড়ার উপর জটাধরের ভারী শখ। ট্রামটা চলে গেলে সে গোলদীঘিতে ঢুকল। একটুক্ষণ বেড়ালে। তারপর ঘড়ি দেখলে। কিন্তু কাঁটা যেন নড়ছিল না।

যখন নড়ল, আধ ঘণ্টা হল তখন সে এসে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলে মন্মথ হেড-মাস্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি প্রশ্ন করে যাচ্ছেন তাকে।

—তোমার সঙ্গে যিনি এসেছেন তিনি তোমার কাকা হন, এ্যাঁ ?

—হ্যাঁ।

—তোমার বাবা কি করেন ?

—দেশে থাকেন—জমিজমা আছে ঠাকুরসেবা আছে। শিষ্যসেবক আছে। পড়াশোনা করেন।

—কি পড়েন ?

—শাস্ত্র।

—কাকা তো নানান ব্যবসা করেন ? খুব উন্নতি করেছেন শুনলাম।

—হ্যাঁ।

—তুমি ওখানেই থাকবে তো ?

—হ্যাঁ। ওখানেই থাকব।

—ইংরিজীতে তুমি কাঁচা। কাকাকে বলবে একজন প্রাইভেট টিউটর দিতে। দেবেন না ?

হেডমাস্টার মশায় ইচ্ছে করেই প্রশ্নটি করেছিলেন। প্রশ্নটি করে তিনি মম্মথের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মম্মথ চুপ করে রইল। কোনো উত্তর বোধ করি দিতে পারলে না। কাকাকে এ-কথা সে বলতে পারবে কি না তা সে জানে না। হেডমাস্টার বললেন—যাক। আমি বলে দেব তোমাদের ক্লাস টীচারকে তিনি একটু জোর দেবেন। কেমন ?

মম্মথ একটু বিষণ্ণ হেসে যেন কৃতার্থ হয়ে গেল।

হেডমাস্টার কথাটা ঘুরিয়ে দিলেন—তোমরা ক' ভাই বোন ?

—আমরা দুই ভাই।

—তুমি— ?

—আমি বড়।

—বাড়িতে আর কে আছে ?

—আর কেউ নেই।

—মা—

—মা নেই। মারা গেছেন।

—হুঁ।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন মাস্টার মশাই। শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন—তারপর বললেন—লেখাপড়া শিখে কি হবে তুমি ?

—কি হব ?

—হ্যাঁ। কি হবে ? কি করবে ?

মম্মথ বললে—লেখাপড়া শিখে বাবার কাছে বাড়ি চলে যাব। বাবা যা করেন তাই করব।

—তাই কি—? ঠাকুরসেবা ? শাস্ত্র পড়া ? যজমানের কাজ করা ?

—হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ।

—ভালো লাগবে ?

—হ্যাঁ।

হেসে হেডমাস্টার বললেন—বাঃ ! তাহলে খুব খুশী হব। যাও তোমার কাকাকে ডাক—তোমাকে ভর্তি করে নিই। শাস্ত্রীমশায় বলেছেন বিদ্যারম্ভের জন্য আজ দিন খুব ভালো। তোমার কাকাকে ডাক।

জটাধর নিজেই দরজা খুলে ঘরে ঢুকল—এই যে স্যার।

ভর্তি করে নিয়ে হেডমাস্টার নিজেই উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—চল। তোমাকে ক্লাসে দিয়ে আসি। স্কুলের কেরানী তিনজনের দুজন কাজ করছিল, হেড ক্লার্ক চশমাটা কপালের উপর তুলে রেখে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। চালসের চশমা পরে দূরের জিনিস ঠিক দেখা যায় না। তাই এইভাবে কপালের উপর তুলে রেখেছে ; বাইফোকাল চশমা তখনও খুব চলৎ ছিল না। সে বললে—আমি নিয়ে যাই স্যার—

—না, আমিই যাব। তুমি বইয়ের লিস্ট করে রাখ। এস। বলে মম্মথকে ডাকলেন তিনি।

অফিস রুম থেকে হলে বের হতেই গুঞ্জনধ্বনি প্রবলতর হয়ে উঠল। ছেলেরা পড়ছে।

মম্মথ দেখছিল বাড়িখানার ছাদ কত উঁচুতে। হুগলী চুঁচড়াতেও সে দেখেছে এমন উঁচু-উঁচু বাড়ি কিন্তু সে বাইরে থেকে। ভিতরে ঢোকে নি।

হেডমাস্টারের জুতোর মসমস শব্দ শোনা যাচ্ছিল। যত যাচ্ছিলেন ততই দুই পাশের

ক্লাসগুলি যেন চুপচাপ হয়ে যাচ্ছিল।

ফোর্থ ক্লাসে এসে ঢুকলেন হেডমাস্টার মশাই। তখন এম. ই. পাশ করে এণ্ট্রান্স কোর্সের প্রথম ক্লাস ছিল ফোর্থ ক্লাস। লম্বা একখানা ঘরে ক্লাস। ক্লাসে অনেক ছেলে। একখানা ছোট চৌকির উপর টেবিল চেয়ার রেখে মাস্টার মশাই তার উপর বসেছেন। সামনে মাঝখানে একটা পথ রেখে দুদিকে পরের পর সারি সারি বেঞ্চ। বেঞ্চের সামনে হাই বেঞ্চ।

হেডমাস্টারকে দেখে ক্লাস টীচার একেবারে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে যেন খানিকটা চমকে উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে সব ছেলেরা।

হেডমাস্টার বললেন—ভালোই হয়েছে আপনি আছেন ক্লাসে। এই ছেলেটি ভর্তি হল আজ। আমি পরীক্ষা মোটামুটি করেছি। এম. ই. পরীক্ষায় বৃত্তি পাওয়া ছেলেও বটে। তবে ইংরিজীতে কাঁচা। ওকে একটু দেখবেন। Look here—ইনিই হলেন তোমাদের ক্লাস টীচার। ইংরিজী পড়ান।

মন্মথ মাস্টার মশায়কে প্রণাম করতে এগিয়ে গেল। চেহারাখানি অত্যন্ত ধারালো। সুন্দর গৌরবর্ণ, টিকালো নাক, চোখদুটি টানা লম্বা—একটু নীলাভ, চুলগুলিতে একটু পিঙ্গলাভা। চেহারাখানাকে সব থেকে ধারালো করে তুলেছে তাঁর ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি-গোঁফ। গায়ে গলাবন্ধ কোট, পরনে থান কাপড়, চুলগুলি ছোট করে ছাঁটা—মানুষটিকে দেখে ভালো লাগে শ্রদ্ধা হয়।

মাস্টার মশাই মন্মথকে বললেন—না। নমস্কার কর। প্রণাম না। কিন্তু তখন মন্মথ হাত মাস্টারের পায়ের দিকে বাড়িয়ে ফেলেছে। হেডমাস্টার তার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন—That's all right! আমাদের দেশে গুরুকে প্রণামই করার নিয়ম। তবে দেখ—এই যে কাল, একালেরও বটে আবার এই স্কুলেরও বটে নিয়ম হল নমস্কারই ভালো।

মন্মথ দেখলে ক্লাসসুদ্ধ ছেলে যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। গুঞ্জন নাই—হেডমাস্টার থাকার জন্য করতে সাহস করছে না তবে সব ছেলেই নড়ছে চড়ছে—এ ওর দিকে ও এর দিকে তাকাচ্ছে।

হেডমাস্টার বললেন—বসবে কোথায়? একটু নজরের সামনেই জায়গা করে দেবেন। তুমি কিন্তু পরিশ্রম করে পড়বে। ইন্টেলিজেন্ট অ্যান্ড ডিলিজেন্ড দুই হতে হবে।

হেডমাস্টার চলে গেলেন।

ক্লাস টীচার ক্লাসের দিকে তাকিয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সামনের বাঁদিকের বেঞ্চে-বসা দুটি ছেলের দিকে লক্ষ্য করে বললেন—সত্য অ্যান্ড বিভূতি তোমরাই ওকে তোমাদের মাঝখানে বসতে দাও। সেই ভালো। ছেলেটি খুব ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে। তা'ছাড়া একেবারে পাড়াগাঁ থেকে আসছে।

পিছনে তখন গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে।—ও বাবাঃ একেবারে সামনের বেঞ্চে। মুখপাতের কই!

—হ্যাঁ। ঝাঁকার নয়।

—দুই মুখপাতের কইমাছের শক্ত কানকোর খোঁচা খাবে!

সাইলেন্স! বয়েজ!—হ্যাঁ। কি নাম তোমার? বস ওইখানে—ওই সামনের বেঞ্চে দুজনের মধ্যে। হ্যাঁ।

ফার্স্ট বেঞ্চের ছেলেদুটি একটু একটু সরে গিয়ে তাকে বসতে দিলে। মন্মথ তাদের একবার দেখে নিলে। বাঁপাশের ছেলেটি খুব ফরসা দেখতেও সুন্দর—বেশ গোলগাল তার সঙ্গে হাঁপালো চেহারা। বেশ একটু বড় ছেলে মনে হয়। তার পরনের পোশাক বেশ দামী। গায়ের গরম কাপড়খানা আলোয়ান নয়, শাল। বেশ কারুকার্য করা। পরনের ধুতিখানা

শান্তিপুরের ধুতি এবং কোঁচাটি চাকরের হাতে পাট করে ভাঁজে ভাঁজে বসানো আর পায়ের দিকের পাড়ের অংশটা হাত দিয়ে কুঁচিয়ে ফুল তৈরি করা। গায়ের পোশাক থেকে সুবাস বের হচ্ছে। চুলও বেশ বাহার করে আঁচড়ানো। বেশ একটি দামী সম্ভ্রান্ত ঘরের ছাপ আছে সর্বাঙ্গে। বাঁদিকে বেঞ্চে সে প্রথম বসে আছে—বোধহয় ফার্স্ট বয় ক্লাসে। এ পাশের ছেলেটির রং একটু কালো—দেখতেও যেন একটু শক্ত গোছের মানুষ। পোশাক-পরিচ্ছদ তার খেলো নয় তবে দামী কিছু নয়, তবে চমৎকার পরিচ্ছন্নতা আছে, আরও সুন্দর কিছু আছে যা দেখলে বলতে ইচ্ছে করে—বাঃ! কিন্তু সেটা যে কি এবং ছেলেটির সারা চেহারায় কোন্‌খানে আছে তা ঠিক ধরা যায় না।

টীচার বললেন—এ হল বিভূতি আর ও হল সত্য। তোমার নাম কি তুমি বল?

—মন্মথনাথ ভট্টাচার্য।

—নতুন পৈতে হয়েছে? না? মাথা ন্যাড়া করেছ!

—হ্যাঁ স্যার!

—সন্ধ্যাআহ্নিক করো? গায়ত্রী মুখস্থ করেছ?

—হ্যাঁ স্যার। আমাদের বাড়িতে ঠাকুর আছেন। বাবা ঠাকুর পুজো করেন।

—আই সী। আমি অবশ্য ক্রীশ্চান ধর্মাবলম্বী—আমার গ্র্যান্ডফাদার বিকেম এ ক্রীস্টান। ইউ সী, সে হল পঞ্চাশ বছর আগের কথা। জান, তারপর তিনি একজন ধর্মপ্রচারকও হয়েছিলেন। রেভারেন্ড ব্যানার্জীর খুব প্রিয় ছিলেন তিনি। হিন্দুরা তাঁকে খুব কষ্ট দিয়েছিল। অত্যন্ত কষ্ট! অনেক অত্যাচার করেছিল। আমার বাবা সেই রাগে বাংলা পর্যন্ত বলতেন না। হিন্দুদের কোনো কিছুকেই ভালো মনে করতেন না। আমি কিন্তু তা ঠিক মনে করি না। তোমাদের পৌত্তলিকতা নিশ্চয় সমর্থন করি না কিন্তু সংস্কৃত আমি পড়েছি এবং ভালবাসি। ইয়ু ইয়ু ইয়ু বয়—হু ইজ দ্যাট—ইয়ু!

কোনো একটা ছেলে জোর গলা ঝেড়ে যেন একটা সাড়া দিয়ে কথায় বাধা দিতে চেষ্টা করেছে। মাস্টার তাকে দেখতে পান নি, আন্দাজেই ইয়ু ইয়ু বলে আঙুল বাড়াতে চেষ্টা করেছেন। ছেলেরা আশ্চর্য চতুর—তারা এটা ধরতে পেরেছে এবং কেউই মুখ বিবর্ণ করে বা মাস্টারের চোখে চোখ মিলিয়ে তাকায় নি। তাকালেই মাস্টার বলতেন—ইয়ু স্ট্যান্ড আপ—। ইয়েস—ইয়ু।

মাস্টারমশাই বললেন—ভেরী ব্যাড—দ্যাট্‌স্‌ ভে—রী ব্যাড মাই বয়েজ। ওয়েল আর যেন না-হয়। এখন যা বলছিলাম—। হ্যাঁ তুমি সন্ধ্যা কর—খুব ভালো। করে যেয়ো। ছেড়ো না। আচ্ছা—তারপর—তুমি বৃত্তি পেয়েছ? হুগলী ডিস্ট্রিক্ট থেকে। গুড। বলতে বলতে ঘণ্টা বেজে গেল।

ঘণ্টা বলতে মাত্র পিরিয়ড শেষ হওয়ার ঘণ্টা নয়, এটা তার সঙ্গে টিফিনের ঘণ্টাও বটে। মাস্টার মশায় উঠলেন—কয়েকখানা বই নিয়ে একটা দপ্তর গোছের বাঁহাতে বুকের কাছে ধরে ভাঁজকরা আলোয়ানখানা চেয়ারের পিঠের ঠ্যাসানের মাথা থেকে তুলে নিয়ে বললেন—বিভূতি তোমাকে একটা কথা বলি। তুমি মনে রেখো ও গ্রাম থেকে আসছে এবং ছেলেটি শান্তশিষ্ট। প্লিজ বি ফ্রেন্ডস্‌। এঁ্যা?

বিভূতি বললে—না স্যার আমরা অসভ্য নই।

—ভালো কথা। দ্যাট্‌স গুড। কিন্তু খুব বেশী সভ্য হতে চেয়ো না। কেমন?

স্কুলের টিফিনের ঘণ্টা সে গ্রামে দেখেছে, কিন্তু এখানকার সে কলরোল, কলরোল একটা ভালো কথা হল, হুল্লোড় এবং হুড়োহুড়ি মন্মথের কল্পনাতীত।

মাস্টার মশায়রা চলে যেতে-না-যেতে ছেলেরা হইচই করে বাইরে চলে যাচ্ছিল।

মন্মথ ভাবছিল সেও বাইরে গিয়ে কাকার সঙ্গে দেখা করবে। কাকা যদি বলে স্কুলে থাকতে স্কুলের ছুটি হলে বাড়ি যেতে তা' হলে তাই করবে। না-হয় আজ কাকার সঙ্গে ফিরে যাবে। তার ইচ্ছে, থেকে ইস্কুল শেষ করে বাড়ি ফেরে। রাস্তা সে ঠিক চিনে যেতে পারবে। রাস্তা সোজা। একেবারে উত্তরমুখ করলে ঠিক গিয়ে উঠবে। কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট থেকে বাঁদিকে ভেঙে যেতে হবে। সে তার ঠিক চেনা আছে। হঠাৎ পিছন থেকে কেউ ডাকলে শোন—ওহে ও—কি বলব তোমাকে—? মন্মথ ফিরে তাকালে; কথা বলছে বিভূতি—সেই সাজপোশাক-করা বাবু ছেলেটি। সে একটু সতর্ক এবং সংযত হয়েই বললে—আমাকে বলছ?

—আর কাকে? কি নাম বললে তোমার? মনোমতো।

—না আমার নাম মন্মথ।

—ওই হলো। মন্মথ কার না মনোমতো বল! মন্মথ মানে জান তো! মন্মথ হাসলে একটু।

ছেলেটি অর্থাৎ বিভূতি হাত নেড়ে নিচুগলায় গান ধরে দিলে এর উত্তরে—সাধিলাম এতো! তবু হলেম না তোর মনেরই মতো! সাধিলাম—। গান জান তুমি? গান?

পিছন থেকে কেউ যেন ঠিক তালের মাথায় মন্মথর মাথায় একটি মৃদু চাঁটি মেরে বলে উঠল—আহা-হা!

মন্মথ একটু সরে গেল। এবং কণ্ঠস্বর বেশ একটু শক্ত করে নিয়ে বললে—আমি মন্মথ-ও নই মনোমতোও নই। আমি মন্মথনাথ। মন্মথনাথ হলেন শিব যিনি মন্মথকে শাসন করেছিলেন।

বিভূতি যেন একটু চমকে উঠে বললে—বা রে, পাখি তো ভালো কথা বলে।

এবার সত্য বলে ছেলেটি এগিয়ে এসে মন্মথর পাশে দাঁড়িয়ে বিভূতিকে বললে—বড়লোক বাড়ির ছেলে তুমি—কথা তুমি খুব ভালো বল। কিন্তু তা' বলে পাখি নও তুমি। ও-ও নয়। কলকাতার সেই পুরনো বাড়ির ভাঙা বাক্সে রাখা পচা কথাগুলো আর বলো না।

—তুইও বড় ব্রেহ্ম গন্ধ ছড়াচ্ছিস সত্য।

—মাস্টার মশাই কি বলে গেলেন যাবার সময়!

—কি?

—খুব বেশী সভ্য হতে বারণ করে গেলেন না!

—কেন রে? খুব বেশী সভ্যতা কি এমন ছড়ালুম বল তো? এই ভাই মন্মথ তুমিই বল তো?

মুহূর্তে ছেলেটা পালটে গেল। বললে—এই মন্মথ সত্যি বলবে তো ভাই, তুমি রাগ করেছ আমার কথায়? আমরা এক্লাসে পড়ি—আমরা ঠাট্টা তামাশা করব না? সত্য ব্রাহ্ম—ওদের সবেতেই ছুত্‌ লাগে। শালার মতো মিষ্টি গালও ওদের কাছে ভাল্‌গার—তুমি তো ব্রহ্ম নও—সবেতেই পরম পিতার—

কে একটি ছেলে পিছনের দলের মধ্যে থেকে বলে উঠল—পিতা পিতরৌ পিতরঃ—

আর একজন বেশ আড়াল থেকে বলে উঠল—অহো পিতার কৃপায় দাড়ি গজায় ভাল্লুকে খায় শাঁখআলু। পিতা আমার পরম দয়ালু।

—কে র‍্যা? ওটা কে? ঋষি বুঝি? ধমক দিলে বিভূতিই। দলটা সঙ্গে সঙ্গে চুপ হয়ে গেল। তারপরই বিভূতি বললে—সত্য আমি মাফ চাচ্ছি ভাই। এগুলো একে—বা—রে বাঁদর! একেবা—রে এবং নির্ভেজাল—। I am sorry. বিশ্বাস কর ভাই—

বিভূতি সত্যর হাত চেপে ধরলে।

সত্যর মুখখানা থমথমে এবং রাঙা হয়ে উঠেছিল। হয়তো বা কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সে প্রতিবাদে ফেটে পড়ত কিন্তু সেই মুহূর্তটি আসবার আগেই বিভূতি তার কাছে মাফ চেয়েছে। এবং সে মাফ চাওয়ার মধ্যে কোনো কপটতা ছিল না।

সত্য বললে—থাক; আমি বিশ্বাস করছি। কিন্তু ক্লাসে এইভাবে দল পাকিয়ে খুব ভালো করছ না তুমি। তুমি বড়ঘরের ছেলে—তোমাদের অনেক টাকা—

—সত্য! সত্য! প্লিজ! প্লিজ!

সত্য থামল না, বললে—নিজে তুমি পড়াশুনোয় ভালো ছেলে। ক্লাসের ফার্স্ট বয়, তুমি কেন দল পাকাও তা' আমি বুঝতে পারি না!

—ব্যস্ করো রাজা, ব্যস করো! ক্ষ্যামা দ্যাও ঠাকুর মশাই! আচ্ছা এই সব এসো। চলে এসো।

হুড়মুড় করে ছেলের দল বেরিয়ে চলে গেল। দাঁড়িয়ে রইল মাত্র জন ছয়েক ছেলে, তার মধ্যে একদিকে জমে দাঁড়িয়ে ছিল চারজন। আর ক্লাসের ফার্স্ট বেঞ্চের সামনে দুজন। একজন সত্য অন্যজন মন্মথ।

মন্মথ প্রশ্ন করলে—ওরা কোথায় গেল এমন দল বেঁধে?

—দল বেঁধে দল পাকাতেই গেল। টিফিনের সময় ওরা অভদ্র গল্প করে। বার্ডশাই খাওয়ার আবার একটা দল আছে। তা' ছাড়া যাদের টিফিন আসে তারা টিফিন খায়।

—ও! তারপরই মন্মথ প্রশ্ন করলে—বিভূতিরা বুঝি খুব বড়লোক?

—খুব বড়লোক। লোকে ওদের রাজা বলে। বাড়িটাকে বলে রাজবাড়ি। ওরা হল কালীপ্রসন্ন সিংহীদের জ্ঞাতি। বিভূতি পড়াতেও ভালো ছেলে। এবারও ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে উঠেছে।

—বিভূতি বার্ডশাই খায়?

—বাড়িতে গড়গড়ায় তামাক খায়। লম্বা লম্বা বাবরি চুল দেখলে না? ওদের বাড়িকে রাজবাড়ি বলে তো এখন। আগে শুধু সিংহী বাড়ি বলত। এখন ওর বাবা টাকার চোটা কারবার করে ফেঁপে উঠেছে। বাড়িতে এখন নবাবী আমলের চাল। কথা ফুরিয়ে গেল। বিভূতি সম্পর্কে আর কোন্ কথা জিজ্ঞাসা করবে? অথচ হাজার প্রশ্ন মনে রয়েছে যেন। হঠাৎ কথা সে খুঁজে পেল।—তোমার নাম তো সত্য?

—হ্যাঁ, সত্যপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—তোমরা তো ব্রাহ্মণ তবে বিভূতি ব্রাহ্ম বললে কেন?

—আমরা এখন ব্রাহ্ম। আমার বাবা ব্রাহ্ম হয়েছিলেন। বেদান্ত উপনিষদ পড়ে তবে বাবা ব্রাহ্ম হয়েছিলেন। ব্রাহ্মধর্মই ভারতবর্ষের আসল ধর্ম।

—তোমার বাবা কি করেন?

—হাইকোর্টের উকীল আমার বাবা।

গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে মন্মথ তার আপাদমস্তক একবার তাকিয়ে দেখে নিলে। সত্যর চেহারাও সুন্দর। রঙটা শ্যামবর্ণ, তাও উজ্জ্বল শ্যাম, তবে বিভূতির মতো টকটকে গৌরবর্ণ নয়, না-হলে বিভূতি থেকে যেন দেখতে ভালই লাগে। আশ্চর্য একটি পরিচ্ছন্ন মার্জনা আছে। পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার, খুব ঝলমলে ঝকমকে নয়, দামীও নয় কিন্তু ভারী সুন্দর লাগছে দেখতে।

সত্য এবার প্রশ্ন করলে—তোমার বাবা কি করেন?

—মাস্টারমশায়কে বললাম তো বাবা ঠাকুর পুজো করেন।

—সে তো যাদের ঠাকুর আছে তাদের অনেকে করে। তা' ছাড়া কি করেন?

—ওই, লোকেদের বাড়িতেও প্জোটুজো করান—শিষ্যটিষ্য আছেন—

—ও।

—আমরা বড়লোক নই খুব গরীব। বাবা কিন্তু খুব ধার্মিকও বটেন পণ্ডিতও বটেন।

—ও।

—দেবতাতেও খুব বিশ্বাস করেন।

—আমরা শুধু ভগবানে বিশ্বাস করি। শুধু ব্রহ্মে।

এবার মন্মথ বললে—ও। বাবা বলেন তাঁর মামার বাড়ির গাঁয়ে যোগাদ্যা দেবী আছেন—একান্ন মহাপীঠের এক মহাপীঠ; সেখানে মা নাকি মানুষের চেহারা ধরে শাঁখারীর কাছে শাঁখা পরেছিলেন।

তারপরই হঠাৎ বললে—তোমার পৈতে আছে?

—পৈতে? না। তবে অনেক ব্রাহ্ম পৈতে রাখেন।

বলতে বলতে বাইরে থেকে ছেলেদের একটা দল ফিরে এলো। তাদের দেখে মন্মথ বললে—যাঃ—কাকা হয়তো দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে। আমি ভাই দেখে আসি। টিফিন শেষ হয়ে যাবে এক্ষুণি।

সত্য বললে—চল আমিও যাব। আমার টিফিন নিয়ে চাকরে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্লাস থেকে বের হয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বললে—ওই সব গল্প তোমরা কি করে বিশ্বাস কর?

থমকে দাঁড়িয়ে মন্মথ বললে—কেন?

—ঈশ্বরের শাঁখা পরতে সাধ হবে কেন?

মন্মথ ফট্‌ করে বললে—সাধ হলে দোষ কি হয়? সাধ হবে না কেন?

—ঈশ্বর শাঁখা পরবে?

—পরলে ক্ষতি কি হয় ব'লো?

বলবার আগেই তারা বাইরে এসে পড়েছিল; বারান্দায় একজন বেয়ারার পোশাক পরা বেয়ারা সত্যর খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এক গ্লাস দুধ আর একটা কৌটোয় মিষ্টি ও তার সঙ্গে জল।

মন্মথ বললে—আচ্ছা, আমি কাকাকে দেখে আসি—

—দাঁড়াও।

—কেন?

—সামান্য কিছু খাও না আমার সঙ্গে।

মন্মথ বিব্রত হয়ে গেল যেন। বিব্রতভাবে সত্যর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সত্য বললে—নাও।

—আমার যে খেতে নেই ভাই!

—খেতে নেই? কেন?

সত্যর মুখ টকটকে রাঙা হয়ে উঠল।

—আমার তো এই সেদিন পৈতে হয়েছে। এখনও দু'মাস হয় নি। এখন অন্তত এক বছর বাইরে কোথাও খেতে নেই, তারপরে যখন তখন খেতে নেই। হাত পা না ধুয়ে কাপড় না ছেড়ে খেতে নেই—

সত্যর টকটকে রাঙা মুখখানা আবার স্বাভাবিক হয়ে এলো। সে বললে—কিন্তু সারাটা দিন সেই দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত ইস্কুল—তুমি এতক্ষণ না-খেয়ে থাকবে, তোমার

কষ্ট হবে না ?

—কষ্ট ! নাঃ। একটু হাসলে মন্মথ। সে হাসি যাকে বলে নিছক-হাসি তাই। কোনো মানে মনে করে হাসে নি। কারণ এই কষ্ট তো হয় নি কোনোদিন তার। তারপর বললে—আমি যে ইস্কুলে পড়তাম আমাদের গ্রাম গোবিন্দপুর থেকে সে তোমার এক ক্রোশ—দুই মাইলের কাছাকাছি। আমার তো মা নেই ; আমি সকালে উঠে স্নান করে আগে রান্নার যোগাড়যন্ত্র করতাম আর পড়তাম। বাবা পুজো করতে করতে রান্না চাপাতেন। নামাতেন। ভোগ দিতেন। আমি নটার আগে স্কুলে যেতাম। চারটেতে ছুটি হত—দিব্য হৈহৈ করতে করতে বাড়ি আসতাম। এসে মুড়ি গুড় নয়তো চিঁড়ে কলা নিয়ে খেতাম। কিছু কষ্ট হত না। আর পৈতে হওয়ার পর থেকে তো আমিই রাঁধতাম।

সত্য অবাক হয়ে শুনছিল। সে বললে—তুমি রান্না করতে ? রাঁধতে জান ?

—হ্যাঁ। নিরিমিষ রান্না আমি খুব ভালো রাঁধতে পারি। মাছটাছ ভালো পারি না। আমাদের ওখানে পোষমাসে পোষলা হয়, জান, মাঠে গিয়ে উনোন পেতে রান্না করে খাওয়া, সে ভারী আমোদ হয়।

সত্য বললে—আমরাও এখানে করি। আমরা বলি পিক্‌নিক। চড়িভাতি। নৌকো করে গঙ্গায় গঙ্গায় গিয়ে নির্জন চর দেখে সেখানে চড়িভাতি করি। সত্যই খুব আমোদ হয়। ফড়িং প্রজাপতি ধরা সে খুব আমোদ হয়। গানবাজনা হয়। এবার তো এই সেদিন করে এলাম পিক্‌নিক কামারহাটির একটু ওপাশে। এবারের মাংসের কালিয়া যা হয়েছিল—ফার্স্ট ক্লাস। তুমি মাংস রান্না জান ?

মন্মথ একটু চুপ করে থেকে বললে—না। আমরা তো বৈষ্ণবমন্ত্র উপাসক। বাড়িতে শালগ্রাম আছেন রাধাবল্লভ যুগল বিগ্রহ আছেন—আমাদের বাড়িতে মাংস ঢোকেই না। মাছ ঢোকে তবে এক হেঁশেলে নয়, মাছ খাই আমরা ছোটরা মানে আমি আর আমার ভাই, বাবা খান না। সেও আলাদা রান্না হয়, সব শেষে হয়, বাইরের উনোনে হয়। আমাদের পোষলাতেও ঠাকুর মানে শালগ্রাম যান মাঠে।

সত্য কেমন হয়ে গেল শুনতে শুনতে। নির্বাক হয়ে কোনো চিন্তায় যেন ভোর হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। তারা চলতে চলতে কথা বলছিল, হঠাৎ সত্য থেমে দাঁড়িয়েও গেল। মন্মথ বিস্মিতভাবেই প্রশ্ন করলে—কি ?

অর্থাৎ একটা কিছু ঘটেছে সেটা মন্মথ খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করেই প্রশ্ন করলে—কি ? কি হল, দাঁড়ালে কেন ?

সত্য বললে—চল গাছতলায় গিয়ে বসি। আজ শীতটা কম মনে হচ্ছে। রোদ্দুর যেন চড়া লাগছে।

গাছতলার দিকে অগ্রসর হতে-হতে সত্য বললে—তোমরা কিন্তু বড্ড বেশী পৌত্তলিক। সবতাতেই তোমরা ঠাকুর ঈশ্বর টেনে আন।

মন্মথ অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—কেন ? কি ক্ষতি হল তাতে বল।

সত্য বললে—ঈশ্বর পাথরের নুড়িও নন পুতুলও নন।

মন্মথ এর জবাব খুঁজে পেলে না। সত্যই তো ঈশ্বর তো পাথরের নুড়ি নন—আবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়—কিন্তু বাবা তো বলেন লক্ষ্মীজনার্দন ঠাকুরের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন !

সত্য বললে—এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরি করেছেন যিনি তিনি ওই পাথরের নুড়ি ? না একটা পুতুল ?

হঠাৎ মন্মথর মনে পড়ে গেল তার বাবা একদিন তর্ক করেছিলেন তাদের ইস্কুলের সেকেণ্ড স্যারের সঙ্গে। সেকেণ্ডে স্যার ঠিক এই কথা বলেছিলেন। তার বাবা বলে-

ছিলেন। —মাস্টারমশাই, যে পারে সে এক বিন্দু জলের মধ্যে সিন্ধু দেখতে পায়। একটা প্রদীপের মুখে সলতে দিয়ে তেল দিয়ে আলো জ্বালে। আলোর শিখাটা তো মাটির পিদিম নয়—সে হল সেই সাক্ষাৎ অগ্নি। কিন্তু সে বলবার আগেই একটা আঙুল গোলদীঘির দক্ষিণ পাড়ের দিকে বাড়িয়ে সত্য বললে—ওঃ খুব বার্ডশাই ওড়াচ্ছে। ধোঁয়া উঠছে দেখ না!

দক্ষিণ পাড়ের পূর্ব-দক্ষিণ কোণের কাছে একটা ছায়াঘন বটগাছ ছিল তখন। তার তলাটার চেহারা 'ছায়াঘন' শব্দ দিয়েও ঠিক স্পষ্ট হয় না, খানিকটা অন্ধকার অন্ধকার ভাব—সেই অন্ধকারের গায়ে অথবা মধ্যে নীলাভ ধোঁয়ার সরু সাপের মতো আঁকাবাঁকা রেখা এবং খানিকটা পুঞ্জ-পুঞ্জ কুণ্ডলী ভেসে বেড়াচ্ছিল। ওই অন্ধকার ছায়াচ্ছন্নতার গায়ে সে-রেখা এবং কুণ্ডলীগুলি বেশ স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল।

মন্মথ বললে—বার্ডশাই খাচ্ছে? কারা খাচ্ছে?

—সব রাজা জমিদারদের বাড়ির ছেলেরা পাণ্ডা। আমাদের বিভূতিরা। আর তার সঙ্গে আছে তাদের মোসাহেবেরা। এই সব রাজা জমিদারদের বাড়িতে বাবা কাকারাই তামাক খাবার ব্যবস্থা করে দেয়। গড়গড়া সটকা কিনে দেয়। চাকর রেখে দেয়। বার্ডশাই কেনার টাকা বরাদ্দ হয়। শুধু তামাক? মদও খায়। আগে তো আবার একদল সায়েব হবার জন্যে মদ খেতো বার্ডশাই খেতো। জান, গোলদীঘিতে শুনেছি মদ বেচতো দোকানীরা—ছেলেরা কিনে খেতো। ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়ে এসব বন্ধ হয়েছে।

ঢং ঢং ঢন-ন-ন শব্দে স্কুলের ঘণ্টা বাজল। আবার ক্লাস আরম্ভ হবে। টিফিনের অবকাশে ছাড়াপাওয়া ছেলের দল কোনো একটা পুকুরের বাঁধভাঙা জলের মতো চারিপাশে ছড়িয়ে পড়েছিল—আবার যেন একটা পাম্পের টানে জলটাকে টেনে নিয়ে ভাঙনের মুখটা বন্ধ করে দেওয়া হল। এরই মধ্যে দুটো চারটে ছেলে কি দশ বিশটা ছেলে নিশ্চয় বেরিয়ে পালিয়েছে; কতক গেছে গড়ের মাঠের দিকে। শীতকাল; বড়দিনের জের চলছে। সার্কাসের তাঁবু দেখতে গেছে, সাহেব মেমদের ভিড় দেখতে গেছে। চাঁদনীতে বড়দিনের বাজার আছে; আরও কত কি আছে। সোসাইটী আছে অর্থাৎ মিউজিয়াম, আরও কিছুদূর গেলেই চিড়িয়াখানা। গঙ্গায় মানোয়ারী জাহাজ। তা যাক; বাকীরা এসে আবার ঘরে ঢুকে আপন আপন জায়গায় বসল। ক্লাস রুমে ঢুকবার আগে মন্মথ একটু বিব্রতভাবে বারান্দায় দাঁড়াল। কাকার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসেও কাকার সঙ্গে দেখা করতে সে যায় নি, সে সত্যর সঙ্গেই কথা বলতে বলতে ওই গাছতলায় বসে সারা টিফিন আওয়ারটা কাটিয়ে দিয়েছে—কাকার সঙ্গে দেখা করার কথা মনেই হয় নি।

সত্য বললে—কি হল?

—কাকার সঙ্গে দেখা করা হল না। কাকা হয়তো আপিসে না হয় ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে—

—চল না, দেখে আসি। আমি সঙ্গে যাই চল।

তা' যেতে হল না, কাকা আপিস রুম থেকে বেরিয়ে এলো সেই মুহূর্তেই। এবং মন্মথকে দেখে হেসে বললে—মোনা বাবা, তোর সব হয়ে গেল। এই তোর বইয়ের লিস্টি। তা কি করবি? আজ আমার সঙ্গে বাড়ি যাবি? না—চারটের সময় ছুটি হলে যাবি? গাড়ি পাঠাব?

মন্মথ হেসে বললে—ছুটির পরই যাব কাকা। গাড়িও পাঠাতে হবে না। দিব্যি উত্তর-মুখে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাব। বাঁদিকে ভাঙবার মোড়টাও চিনে রেখেছি। একটা পানের দোকান আছে—তার পাশে ভালো মিষ্টির দোকান। আমি চিনি।

তুই তো খুব বাহাদুর রে মোনা বাবা। তা'আমার ভাইপো তো! সাবাস বাবামণি। এই তো চাই।

চলে গেল জটাধর। মন্মথ সত্যর সঙ্গে ক্লাসে ফিরে গেল।

প্রথম বিভূতি তারপর সে তারপর সত্য। বিভূতির দামী গরম জামা শাল থেকে সত্যই বার্ডশাইয়ের গন্ধ বের হচ্ছিল। শুধু বার্ডশাইয়ের গন্ধ নয় তার সঙ্গে দামী আতরের গন্ধ মিশে বিচিত্র গন্ধ মনে হচ্ছিল। মন্মথ বার দুই তিন টেনে টেনে নিশ্বাস নিয়ে যেন সেই গন্ধ ভালো করে শুঁকে দেখল।

বিভূতি অত্যন্ত চালাক— মন্মথর এই টেনে টেনে নিশ্বাস নেওয়া সে ঠিক টের পেয়েছিল। মন্মথ যখন সত্যর দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় বা ভাষায় বলছিল—ঠিক বলেছ বিভূতি বার্ডশাই খেয়েছে তখন সে মন্মথর দিকে তাকিয়ে মিটমিটি হাসছিল। মন্মথ সত্যর দিক থেকে মুখ ফেরাতেই বইয়ের আড়াল দিয়ে ফিক করে হেসে মৃদুস্বরে বললে—কি? গন্ধটা চমৎকার না?

মন্মথর ভুরুদুটি কুঁচকে উঠল।

বিভূতি বললে—খাবে? রোজ খাওয়াব আমি।

মন্মথ বললে—না।

বিভূতি বলল—তা' হলে এমন করে টেনে টেনে শুঁকছ কেন? হে ব্রাহ্মণপুত্র ঘ্রাণেন অর্ধভোজনং—ঘ্রাণ নিলে অর্ধেক খাওয়া হয়ে যায়, জান না? জিজ্ঞেস কর না সত্যকে।

—বিভূতি!

—Yes sir! উঠে দাঁড়াল বিভূতি!

—বোর্ডে যাও।

—বোর্ড মানে ব্ল্যাক বোর্ড।

—লেখো,—If two straight lines intersect, the vertically opposite angles are equal.

মন্মথ খুব বিস্মিত হল। বিভূতির হাতের লেখা তো খুব সুন্দর। না। খুব সুন্দর বললেও সব বলা হল না, ভারী সুন্দর, হ্যাঁ ভারী সুন্দর; এবং মাস্টারমশাই জ্যামিতির যে উপপাদ্যটি বলে গেলেন তাও তার মুখস্থ। সে খসখস করে লিখে গেল—কোনো ভুলই করলে না বলতে গেলে। সে শেষ করে চক হাতে থামতেই মাস্টার বললেন—হ্যাভ উই ফিনিশড্?

—ইয়েস স্যার—

গম্ভীরভাবে স্যার বললেন—কাট দি হেড অব টি; দি ফার্স্ট টি, টি অব দি ওয়ার্ড টু। ইয়েস—। নাও বয়েজ, লেখো—আপন-আপন খাতায় লেখো। দেখাদেখি করবে না।

খাতা টেনে বের করার একটা খসখস শব্দ হল—তারপর গোটা ক্লাসটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। সব ছেলে বসে গেছে জ্যামিতির থিয়োরেম কষতে। বিব্রত হল শুধু মন্মথ। তার আজ খাতা পেন্সিল বই কিছুই নেই। সে কি করবে বুঝতে না পেরে উঠে দাঁড়াল।

স্যার তার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন—ইয়েস! হোয়াট ইজ ইট? তারপরই বললেন—আই সী—ইউ আর দি নিউ বয় হু হ্যাজ টেকেন অ্যাডমিশন টুডে! ইজ ইট নট?

—হ্যাঁ স্যার।

—হ্যাঁ স্যার? সে—ইয়েস স্যার।

—আমার খাতা পেন্সিল নেই স্যার।—আজ আনি নি—

—স্পীক ইন ইংলিশ মাই বয় স্পীক ইন ইংলিশ—

—আমি স্যার—

—ইন ইংলিশ প্লিজ—

—আই স্যার, মানে—উইক ইন ইংলিশ—মানে ইংরিজীতে কথা বলতে পারি না স্যার—

ক্লাসের ছেলেরা হেসে উঠল।

অঙ্কের স্যার খুব কড়া স্যার। মাথায় খাটো করে ছাঁটা চুল—সেগুলো খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠে থাকে—মুখে একমুখ দাড়ি গোঁফ—রঙ ফরসা, নাক টেপা, চোখদুটো গোল; তিনি ইচ্ছে করেই ছেলেদের কাছে ভয়ের মানুষ হবার জন্যই সে গোল চোখদুটিকে পাকিয়ে পাকিয়ে কথা বলেন। তিনি হুংকার দিয়ে উঠলেন—সাইলেন্স!

তারপরই সকলকে বিস্মিত করে দিয়ে বললেন—আমি খুব খুশি হয়েছি তুমি সবার সামনে সত্য কথা বলেছ। হ্যাঁ! ইংরিজীতে তুমি একটু কাঁচা।

সে খুব কিছু নয়। দু তিন মাসেই ঠিক হয়ে যাবে। অঙ্কে খুব ভালো টেস্ট দিয়েছ। মাইনরে জ্যামিতি পড়েছ—এই থিয়োরেমটা বোর্ডে কষতে পারবে? বাংলাতে। ইংরিজীতে পারবে না জানি আমি।

—হ্যাঁ, পারব স্যার!

—ভেরী ওয়েল। ওয়েট। সব খাতা টেবিলে আসুক, তারপর তুমি গিয়ে কষবে! বস এখন।

ক্লাসের ছেলেদের খাতা দেবার সময় হল—স্যার ডাকলেন—টাইম ইজ আপ। বন্ধ কর লেখা। না। আনতে হবে না। তোমরা নিজেরা কাছে রাখ। এখন এই মন্মথ ব্ল্যাক বোর্ডে থিয়োরেম কষে যাবে—ইউ ফলো হিম। এ্যাঁ? নাও মন্মথ গো টু দি বোর্ড।

মন্মথ বোর্ডের নিচে গিয়ে দাঁড়াল। চক হাতে নিয়ে একবার সে ক্লাসের দিকে আপনা থেকেই যেন তাকালে—গোটা ক্লাসের ছেলেরা তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে তাকানোর মধ্যে যেন একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ রয়েছে। বিভূতির চোখে ব্যঙ্গ রয়েছে। শুধু সত্যর চোখে যেন এসব কিছু নেই।

—আরম্ভ করো—।

মন্মথ আরম্ভ করলে—"দুইটি সরলরেখা পরস্পরকে ছেদ করিলে বিপরীত কোণগুলি পরস্পর সমান হয়।"

—এখন ক খ এবং গ ঘ দুটি সরল রেখা—

—গুড। কিন্তু ক খ'র বদলে A B বল অ্যান্ড গ ঘ'র বদলে C D বল। A B এবং C D সরল রেখা দুটি একটি বিন্দুতে সে O বিন্দুকে পরস্পরকে কাট করেছে।

হঠাৎ হেসে ফেললেন টীচার স্যার। বললেন—দেখ মন্মথ তুমি গ্রাম থেকে আসছ এবং ভটচাজবাড়ির ছেলে। তোমার বাবা পুরোহিতের কাজ করেন গুরুগিরি করেন। ইংরিজী ফোড়ং দিয়ে তুমি আরম্ভ কর। আগাগোড়া ইংরিজী সে হবে পেলেটির বাড়ির ইংরিজী খানার মতো। বুঝেছ! কায়দা করা যাবে না। নিরিমিষ থেকে আমিষ অভ্যেস কর ওই আমিষ দিয়ে সাঁতলে নিয়ে। বুঝেছ আমি তাই করেছিলাম। আমিও গোঁসাইবাড়ির ছেলে হে। ছেলেবেলা ভাবতাম এই টিকি রেখে তিলক এঁকে কণ্ঠি পরে শিষ্যবাড়ি ঘুরে বেড়াব। কৃষ্ণনাম করব আর কাঁদব। কিন্তু ইংরিজী শিখে ব্যাস সব বদলে গেল হে—আমি অঙ্কের মাস্টার হয়েছি। বলেই প্রায় অট্টহাস্য করে উঠলেন। হা-হা-হা-হা—।

ছেলেরাও হাসতে লাগল।

হঠাৎ মাস্টার স্যার থেমে গম্ভীর হয়ে গেলেন। সে গম্ভীর একেবারে শুকনো একটা

গাছের গুঁড়ির মতো গম্ভীর। তাঁর গোল চোখ দুটো পর্যন্ত একবারও পাকালেন না—স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বোর্ডের দিকে।

—গো অন—।

—A B এবং C D দুটি সরল রেখা—

—Say straight lines—

—A B and C D দুটি straight lines O বিন্দুতে ছেদ করে—

—Yes that's right—go on.

বোর্ডের দিকে তাকিয়ে কোণদুটিকে দেখে নিয়ে মন্মথ বললে—AOC, BOD and AOD, BOC দুটি, দুটি বিপরীত কোণের সৃষ্টি করেছে।

—Good—go on. আচ্ছা—কোণের ইংরিজী কি?

—Angle.

—বিপরীত ইংরিজী কি?

—Opposite.

—সম্মুখবর্তী বিপরীতের—এখানে, এখানে কি বলবে?

বিভূতির লেখার দিকে তাকিয়ে মন্মথ বললে—Vertically opposite.

—Very good—very good—go on.

সমস্ত থিয়োরেমটা কষে সে যখন শেষ করলে তখন সে সেই মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহেও ঘেমে উঠেছে। সে ঘাম পরিমাণে এমন যে তার ভিতরের নতুন গেঞ্জিটা ভিজে গেছে।

অঙ্কের স্যার অনেকগুলো 'ভেরী গুড' বললেন 'ওয়েল ডান' বললেন, তারপর চেয়ার থেকে উঠে বোর্ডের কাছে দাঁড়ালেন। মন্মথর হাত থেকে চকটা নিয়ে পাশে মোটা মোটা হরফে লিখে দিলেন ১৪৪। তারপর বিভূতিকে বললেন—বিভূতি এবার সাবধান হে। তোমার এক পাশে একা সত্য ছিল। এবার মিস্টার ভটাচারিয়া এলো। সত্যকে তুমি অঙ্কের জোরে মার। এবার তোমাকে অঙ্কে মারবার লোক এসেছে। বেঞ্চে ফিরে এসে বসতেই ডানপাশ থেকে সত্য বললে—ওয়েল ডান মাই ফ্রেন্ড—ভেরী ভেরী ওয়েল ডান। অঙ্কের স্যার কাউকে এত প্রশংসা করেন না হে!

—এই এই—।

বাঁপাশ থেকে ডাকছিল বিভূতি! সে তার দিকে তাকাতেই বললে—ফিসফিস করে বললে—তোমার মাথার ওই টিকিটি আমি কেটে নেব।

হতভম্ব হয়ে গেল মন্মথ। কেন? টিকি কেটে নেবে কেন? কিন্তু সে প্রতিবাদ তার মুখ দিয়ে বের হল না! সত্য জিজ্ঞাসা করলে—কি বললে?

—বললে—তোমার মাথার টিকিটি কেটে নেব।

ঠিক এই মুহূর্তটিতেই অঙ্কের পিরিয়ড শেষ হল।

অঙ্কের পর ইতিহাসের ক্লাস। অঙ্কের স্যার চলে যেতেই বিভূতি মুখের ঢাকা বইখানা সরিয়ে সোজা বললে—টিকি তোমার আর রইল না মনোমতো।

উত্তেজিত হয়ে উঠল মন্মথ, বললে—কে কাটবে? তুমি?

বিভূতি হাসতে হাসতে বললে—হয় আমি নয় সত্য।

—বিভূতি! সত্য প্রতিবাদ করে উঠল।

বিভূতি বললে—ভয় দেখিয়ো না বিধুবদন—বিভূতি ওতে ভয় খায় না।

—আমি মন্মথর টিকি কাটব কেন বলছ?

—বেশ করছি। তুমি ব্রাহ্মসমাজের লোক—তোমাদের সঙ্গে মিশলে মন্মথর টিকি কাটা

যাবেই। সে তুমি নিজে কাঁইচি দিয়ে কাটো কি মন্মথ নিজেই কাটুক কি কোনো পরামানিককে দিয়ে কাটাক যাই করেই হোক কাটা যাবেই। সেটা তোমারই কাটা হবে। আর আমার চ্যালেঞ্জ রইল—ও যদি আমাকে অঙ্কে হারাতে না পারে তবে আমি ওর টিকি কাটবই।

বিভূতির দলে অনেক ছেলে। বড়লোকের ছেলে সে। দু হাতে খরচ করে। ছেলেদের বার্ডশাই খাওয়ায় মিষ্টি খাওয়ায়। সেই তার দলের সমস্ত ছেলে হেসে উঠল।

কে বললে—চুপ।

কেউ চাপা সিটি দিলে।

চাপা সাড়া উঠল—স্যার! স্যার!

একটি সুন্দর সুপরিচ্ছন্ন এবং সুবেশও বটে তরুণ মাস্টার এসে ক্লাসে ঢুকলেন।

সত্য চুপিচুপি বললে—খুব ভালো পড়ান হিস্ট্রি স্যার। খু—ব ভালো।

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল মন্মথ। স্যার একেবারে প্রথম সারির বাঁদিকের প্রথম ছেলে বিভূতি থেকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে রাখলেন মন্মথর মুখের উপর। তীক্ষ্নদৃষ্টিতে দেখে নিয়ে বললেন—তুমি দেখছি নতুন।

মন্মথ উঠে দাঁড়াল।

—কি নাম?

শ্রীমন্মথনাথ ভট্টাচার্য—

—হুঁ। মন্মথনাথ ভট্টাচার্য! হুঁ—কিন্তু ওইখানে মানে সেকেণ্ড প্লেসে কে বসালে তোমাকে?

সত্য বললে—হেডমাস্টার মশায় নিজে এসেছিলেন। তিনিই বললেন—তুমি এইখানে বস।

I see. ভালো—। Now boys, কাল তোমাদের বলেছি ভারতবর্ষের পুরনো কালের কথা। ভারতবর্ষের বেদ আছে পুরাণ আছে তন্ত্র আছে মন্ত্র আছে মহাকাব্য আছে কিন্তু তার কোনো ইতিহাস নেই। ভারতবর্ষের ইহকাল আছে পরকাল আছে অতীতকাল নেই বলব না তবে অতীতকালকে এঁটো মাটির পাত্রের মতো আমরা প্রতিদিনই ফেলে দিয়েছি জঞ্জালের স্তূপে। তাই বা কেন, প্রত্যেক বর্তমান মুহূর্তটিকে আমরা পরের মুহূর্তে জঞ্জালের স্তূপে কি অতীত কালসমুদ্রে হারিয়ে দি, ডুবিয়ে দি, এবং অপেক্ষা করি কোনো ভবিষ্যৎ কালের জন্য নয়, অপেক্ষা করি পরকালের জন্য। স্বর্গের জন্য বা নরকের জন্য। আমাদের কাছে দেবতা আছে অসুর আছে দৈত্য আছে স্বর্গ আছে নরক আছে পাতাল আছে। কিন্তু মানুষ মিথ্যা, জীবন অনিত্য, সুখ অলীক। আমাদের কাছে শাস্ত্র আছে শাসন আছে দুঃখভোগ আছে মৃত্যু আছে। তাই আমাদের ইতিহাস নেই।

পুরানো ভারতবর্ষে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল তিন লোক।

স্বর্গলোকে আবার ব্রহ্মলোক বিষ্ণুলোক শিবলোক নিয়ে তেত্রিশ কোটি লোক আছে। মর্ত্যলোকে আমরা আছি। কিন্তু মর্ত্যলোক অসত্য!

ইতিহাসের যে ভারতবর্ষ সে কিন্তু তা নয়। মাটির দেশ ভারতবর্ষ এ কথা সত্য হয়েও সত্য নয়। সে-ভারতবর্ষ ওই পুরাণ শাস্ত্রের যে মর্ত্যলোক সে মর্ত্যলোকের সীমানাভুক্ত নয়। তার উর্ধ্বে স্বর্গ নেই অধোতে পাতাল বা রসাতল নেই, অজানা গভীর অন্ধকার নরক নেই। এ ভারতের উত্তরে হিমালয় ওই কাশ্মীর থেকে ব্রহ্মদেশের মাথা পর্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণে মহাসাগরের মধ্যে বঙ্গোপসাগর ভারত মহাসাগর পশ্চিমে আরবসাগর হিন্দুকুশ পর্বতমালা আফগানিস্তান পারস্য—বুঝতে পারছ? কাল তোমাদের ম্যাপ এঁকে দেখিয়ে দিয়েছিলাম।

—ভুলে গেছ তোমরা ?

—না স্যার। সর্বাগ্রে বিভূতি উঠে দাঁড়াল।

অতি সুন্দর হেসে মাস্টারমশাই বললেন—মনে আছে ?

—আছে স্যার।

—আর কার মনে আছে ?

সত্য উঠে দাঁড়াল—তার সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন দাঁড়াল।

—বলতে পার ?

—পারি স্যার।

—বল। প্রথম বিভূতি। Now begin.

বিভূতি বলতে লাগল—আমাদের ভারতবর্ষের যে রূপটি পুরাতন কাল থেকে পাই সে ভারতবর্ষে কাশী গয়া প্রয়াগ অমরনাথ রামেশ্বরম্ প্রভৃতি তীর্থস্থলগুলি হাজার হাজার বছর ধরে বেঁচে রয়েছে। ধ্বংস হয়ে গেছে কতবার, যতবার ধ্বংস হয়েছে ততবার মেরামত হয়েছে ততবার নূতন করে গড়েছে। পুরাণের দেবতাগুলি পাথরের বিগ্রহ হয়ে বেঁচে রয়েছে। তার কাহিনী রয়েছে পুরাণে কাব্যে। কিন্তু অজাতশত্রুর রাজধানী হারিয়ে গেছে, অশোকের পাটলীপুত্র মাটির তলায় চাপা পড়েছে। সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজধানী থানেশ্বর কান্যকুব্জের ঠিক কোথায় তা আমরা জানি না। তাকে আমরা আবিষ্কার করতে পারি নি। শুধু ভারতবর্ষের অসংখ্য স্থানে অসংখ্য শিলালিপির মধ্যে বিচ্ছিন্ন টুকরো টুকরো ইতিহাস ছড়ানো রয়েছে।

—Now stop. বিভূতি তুমি ভালোই বলেছ। Good. এখন, সত্য—!

—Yes sir.—

—বল তো কোন্ এমন একটি নাম ভুল করেছে বিভূতি, যার উল্লেখ না করলে ভারতবর্ষের ইতিহাস শুরুই হবে না।

—গৌতম বুদ্ধ!

—Good! Very good!

—কোথায় জন্মেছিলেন গৌতম বুদ্ধ ?

—কপিলাবাস্তু।

—সে কোথায় ?

—উত্তরে বিহারে। সেখানে একটি অশোকস্তম্ভ পাওয়া গেছে। শিলালিপিতে লেখা আছে লুম্বিনী উদ্যানে তিনি জন্মেছিলেন।

বিচিত্র এই মাস্টারমশাইটি ; আশ্চর্য মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে নিজে ধরে নিয়ে বললেন—এই শিলালিপিই হল ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রধান এবং প্রথম উপাদান। এবং গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব থেকেই তার সৃষ্টি। বুদ্ধের বাণী উৎকীর্ণ করে দিতেন পাহাড়ের গায়ে গায়ে, লোকশিক্ষার জন্য, সেই সঙ্গে তার নিচে লিখে দেওয়া হত রাজার নাম এবং তাঁর বাবার নাম ও বংশের নাম, তার সঙ্গে থাকত সাল সন। অনেক রাজা রাজ্য জয় করে শিলার গায়ে খুদে লিখে রাখতেন তাঁর দেশজয়ের কথা। আচ্ছা আর কি উপাদান আছে ইতিহাসের ?

—ট্রাভলারস্ অ্যাকাউণ্টস্ স্যার।

—ভেরী গুড সত্যপ্রসাদ। ঠিক বলেছ তুমি—ট্রাভলারস্ অ্যাকাউণ্টস। এদেশে নানা দেশান্তর থেকে দেশভ্রমণকারী আসতেন—

—ফা হিয়েন, হুয়েন সাং—

—ইয়েস। আরও আছেন। চীন কম্বোডিয়া শ্যাম বোর্নিয়ো সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ

সে কালে মহাসমাদরে বৌদ্ধধর্মকে গ্রহণ করেছিল এবং ভগবান তথাগতকেই পরিত্রাতা বলে মেনে নিয়েছিল ; সেই তথাগতের জন্মস্থানে যাঁরা তীর্থভ্রমণে আসতেন, তাঁরাই তাঁদের ভ্রমণ-কাহিনী লিখে গেছেন। তার মধ্য থেকেই পেয়েছি আমরা আমাদের ইতিহাস। তারপর আরম্ভ হল মুসলমানের রাজত্ব।

—স্যার ! বিভূতি উঠে দাঁড়াল। এর মধ্যে কয়েকবারই সে উঠবার উপক্রম করেছে কিন্তু স্যার যেহেতু নিজে বলে যাচ্ছিলেন, সেই হেতু সে উঠে দাঁড়িয়ে স্যারের কথায় বাধা দিতে সাহস করে নি। এবার কিন্তু আর ধৈর্য রাখতে পারলে না। যেন অনেকটা বিদ্রোহ করে উঠে দাঁড়ানোর মতো উঠে দাঁড়াল—স্যার।

স্যার তার মুখের দিকে তাকালেন—তাঁর ভুরু দুটি কুঁচকে উঠল—কিন্তু পরমুহূর্তেই একটু হেসে কপালের কোঁচকানো রেখাগুলি সুমসৃণভাবে সংবরণ করে নিয়ে বললেন—বল !

—স্যার, সত্যর দুটো তিনটে বড় ভুল হয়ে গেল। মানে বললে না। বলতে ভুলে গেল।

—ভুলে গেল ? বল তুমি কি ভুলে গেল !

—আলেকজেণ্ডারের ভারত আক্রমণের কথা। মহারাজ পুরুর কথা। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের কথা। তা' ছাড়া মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণের কথা।

—ভালো বলেছ চমৎকার বলেছ। নিশ্চয় ভুল। তবে সত্যের ভুলের মধ্যে আমার অংশ আছে। আমি ব্যাপারটা ছোট করে মুসলমান রাজত্বে আনবার জন্য খানিকটা টেনে এনেছি। না-হলে আরও অনেক নাম আছে—মহারাজ বিক্রমাদিত্য আছেন, গুপ্ত সম্রাটেরা আছেন—অনেক আছেন। বস তুমি। আচ্ছা এবার শোন, মুসলমান রাজত্বেই প্রথম পত্তন হল ইতিহাসের। ইতিহাসের স্রোতে বেয়ে এলো মুসলমানেরা। তারা দেশ জয় করলেই শুধু নয়—তাদের সুলতান বাদশাহেরা আত্মজীবনী লিখে গেছেন—তাঁদের সভার বড় বড় ওমরাহ এবং বিদ্বানেরা ইতিহাস লিখে গেছেন। বড় বড় মুসলমান পর্যটকেরা এসে বিবরণ রেখেছেন। দেশের হিন্দুরা তাঁরা হেরেছেন—যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেছেন, এবং যদিও কেউ দেখে নি তবুও আমরা শুনে আসছি তাঁরা রথে চড়ে স্বর্গে গেছেন। এই যে আশ্চর্য বীরত্বের সঙ্গে প্রাণ দেওয়া তারও কোনো বিবরণ তাঁরা আমাদের জন্যে রেখে যান নি। অবশ্য রাজস্থানে চারণ কবিরা কিছু গান রেখে গেছেন। তাতে জহরব্রতের কথা পাই রাজপুত বীরত্বের কথা পাই। স্বর্গের সিঁড়ির দিক থেকে প্রথম চোখ ফেরালেন ছত্রপতি শিবাজী। তিনিই সার্থকভাবে জীবনকে এবং তার নিজের জীবনের সঙ্গে মারাঠাদের ইতিহাসের রথের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। কিন্তু তাতেও পুরো ইতিহাসের মধ্যস্রোতে আমরা নিজেদের যুক্ত করতে পারি নি। যুক্ত হলাম ইউরোপের জাতিগুলি যখন তাদের কঠিন বাস্তবতাবোধ নিয়ে ইংরেজদের স্টীম শিপের পিছনে গাধাবোটের যাত্রীর মতো চলতে শুরু করেছিল। রাজা রামমোহন রায় প্রথম ক্যাপ্টেন আমাদের। বুঝেছ। তিনিই ডাক দিলেন।—'চড়ো এই বোটে চড়ো। চোখে দেখো—বাষ্পে জাহাজ চলে। চোখে দেখো—কামানের গোলা কেমন জোরে ছোড়া যায়। এগুলো মিথ্যে নয়। মিথ্যে ওই 'সতীদাহ'—নির্দোষ অসহায় মেয়েদের হাতে পায়ে বেঁধে চিতায় ফেলে পুড়িয়ে মারে—চিৎকার করে তারা কাঁদে কিন্তু কেউ শুনতে পায় না—দশ বিশটা ঢাক বাজিয়ে সে কান্না ঢেকে দেয়। গঙ্গাসাগরে গিয়ে মানত শোধ করতে ছেলে ভাসিয়ে দিয়ে আসে।' রাজা রামমোহন একজন জায়েণ্ট—বিরাট বলশালী লোক। তিনি সত্যকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে এইসব প্রথা তুলে দিতে চাইলেন। কিন্তু তবু এদেশের লোক বিশ্বাস করলে না। তারা সেই বিশ্বাস আঁকড়েই পড়ে রইল, সে বিশ্বাস হল এই যে, যে সতী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যায় সে দিব্যদেহ ধারণ করে স্বর্গে যায়, রথ নেমে আসে স্বর্গবাদ্য বাজে—আরও—।

—তুমি তো গ্রাম থেকে এসেছ সদ্য-সদ্য—মাথায় তোমার মস্ত টিকি—উপাধি তোমার ভট্টাচার্য—বাবা তো তোমার পূজার্চনা নিয়েই থাকেন ; তুমি কি বল ? এ্যাঁ—। মন্মথনাথ ! তোমার নাম তো মন্মথ ?

—হ্যাঁ স্যার !

—তুমি কি বল ? তুমি কি বিশ্বাস কর স্বামীর সঙ্গে পুড়ে মরলে মেয়েরা স্বর্গে যায় দিব্যদেহ ধারণ করে ? এ্যাঁ ?

চুপ করে রইল মন্মথ। তার মনে সতীমাহাত্ম্যে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা আগ্নেয়গিরির বুকের আগুনের মতো আপনার উত্তাপে দীপ্যমান হয়ে থাকল—তার মুখ যেন বন্ধ হয়ে গেছে মনে হল। কোনো কথা বলতে সে সাহস করলে না।

মাস্টার বললেন—চুপ করে রইলে মন্মথ ?

এবার সে বললে—আমি জানি না স্যার।

—কি জান না ?

—স্বর্গে যায় কিনা।

—ভেরী ক্লেভার। হি ইজ ভেরী ক্লেভার। কিছুতেই মিথ্যে বলবে না।

ছেলেরা হেসে উঠল। মৃদু হাসি অবশ্য। মাস্টার তাতেও বললেন—চুপ চুপ। হাসি নয়।

মন্মথ বললে—বাবার কাছে শুনেছি স্যার হ্যালিডে সাহেব নামে এক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুরকে দেখিয়ে এক সতী তাঁর নিজের আঙুল প্রদীপের আগুনে পুড়িয়েছিলেন—একটু কষ্টের চিহ্ন কেউ দেখে নি—আঙুলের মাংস মোমবাতির মোমের মতো গলে গলে পড়েছিল, আর সেই সতী স্থিরদৃষ্টিতে সাহেবের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

—তিনি তোমাদের কে হতেন ?

—কেউ না স্যার।

—আচ্ছা। তা' হলে রথ আসা দেখে নি কেন কেউ ? পঞ্চশঙ্খের বাজনা শোনে নি কেন কেউ ?

—তা' জানি না।

—তা' হলে জান কি ?

চুপ করে রইল মন্মথ। এরও উত্তর সে জানে না।

—কিছুদিন যাক, ইতিহাস পড়, রেলগাড়ি চড়, স্টীমার চড় জানতে পারবে। জীবনের মানচিত্র থেকে স্বর্গ মুছে যাবে রসাতল নরক মুছে যাবে—থাকবে তুমি আর এই মাটি। দিস ইজ হিস্ট্রি। এই যে কাল এ কাল হল ষোল আনা ইতিহাসের কাল।

—নাও বয়েজ ! ওপেন ইওর বুক্‌স। ইতিহাসের বই খোল। অ্যান্ড—এতক্ষণ যা বললাম তা' মনে গেঁথে রাখ—তাকে বোঝো, বিশ্বাস কর। পরীক্ষার খাতায় লিখো না। পরীক্ষার উত্তরের জন্য নয় এসব। আচ্ছা—পেজ ফিফ্‌টিন—।

—The Aryans.

—আর্যেরা সেণ্ট্রাল এশিয়া থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গিরিপথ ধরে পঞ্চনদী ও সিন্ধুনদের দেশ পাঞ্জাবে এসে বসতি স্থাপন করলেন। পঞ্চ অপ পঞ্চাপ থেকে পাঞ্জাব।

—তুমি দাঁড়িয়ে কেন মন্মথ ? তুমি বস।

মন্মথ অত্যন্ত অসহায়ের মতোই বসে পড়ল।

হঠাৎ মাস্টারমশাই থেমে গিয়ে মন্মথর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন—তুমি যে গল্প বললে সেটা হয়তো একটু গল্প হয়ে গেছে নইলে ঘটনাটা সত্য। হ্যালিডে সাহেব এ ঘটনার কথা নিজে রেকর্ড করে গেছেন। গল্প এইটুকু যে তাঁর সহ্য করা যেমন সত্য তেমনি সত্য

আগুনে আঙুল পুড়ে যন্ত্রণার কথা। আই অ্যাম গ্ল্যাড দ্যাট ইউ হ্যাড দি কারেজ টু ন্যারেট দি স্টোরী হিয়ার।

ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল—হিস্ট্রির পিরিয়ড শেষ হল। হিস্ট্রি স্যার চলে গেলেন। মন্মথ বসে রইল অভিভূতের মতো। এই মাস্টারটি সত্যই যেন তাকে টেনে এনে কোনো নদীর জলের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছেন। সে ডুবছে জল খাচ্ছে আবার উঠছে। কে তাকে বাঁচাবে? তীর অনেক দূরে। সেখানে বাবার মতো কেউ যেন একবুক জলে দাঁড়িয়ে আহ্নিক করছেন। কিন্তু ঘাট থেকে এগিয়ে আসবার শক্তি তাঁর নেই। তেমন সাঁতার তিনি জানেন না। সেও পারবে না এই স্রোত কেটে ঘাটের কাছে যেতে। সে ডুবছে উঠছে ভেসে চলছে।

—এ স্যারটি আমাদের ভেতরে ভেতরে পাঁড় ব্রাহ্ম। সত্যর উপর খুব টান। বিভূতি কথা বললে বাঁদিকের কানে।

তার কোনো উত্তর দিল না মন্মথ।

সত্য বললে ডান কানে—বিভূতিকে প্রাইভেট পড়ান স্যার।

অবাক হয়ে গেল মন্মথ।

শেষ ঘণ্টা ছিল ড্রয়িং। ছেলেরা ছবি আঁকলে, সে বসে রইল চুপ করে। মনে হতে লাগল সব যেন গোলমাল হয়ে গেছে। যা শিখেছিল কিছুই মনে নেই। কোনো কিছু ভাববার কোনো শক্তি নেই তার। সারা মনটা কেমন হয়ে গেছে।

ছুটির পর সে ভাবছিল কার সঙ্গে বাড়ি ফিরবে। রাস্তা তার মনে আছে। এই ক'দিনেই সব সে চিনে ফেলেছে; কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে উত্তরমুখে হাঁটলে হেদুয়ার কাছে গিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে পশ্চিম দিকে, যে রাস্তাটার ধারে বেথুন কলেজ সেই রাস্তা ধরে কিছু দূর গিয়ে তাদের মধু রায় লেন। উত্তর দক্ষিণে লম্বা। একমাথা বিডন স্ট্রীটে একমাথা বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটে গিয়ে মিশেছে। কিন্তু কেউ একজন সঙ্গী পেলে যেন ভালো হত। বড় একা অসহায় দুর্বল মনে হচ্ছে তার। সত্যই সে পাড়াগাঁয়ের বোকা লোক। এখানকার লোকেরা অনেক বেশী জানে—অনেক চতুর।

হঠাৎ রাধাশ্যাম এসে তাদের পাশে দাঁড়াল। তাদের পুরোহিত মশায়ের ছেলে রাধাশ্যাম। কলকাতায় তার প্রথম বন্ধু।

—আমি তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

উত্তরমুখে চলতে চলতে রাধাশ্যাম বললে—জান আমাদের স্কুলে তুমি ভর্তি হলে খুব ভালো হত। কেন যে ওখানে গেলে! যত সব সায়েবী কাণ্ড ওখানে—।

এই মুহূর্তে সেও তাই ভাবছিল। হঠাৎ চোখে পড়ল অনেক লোক জমেছে—অনেক ঘরের ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে একজায়গায়।

—এতো লোক? রাধাশ্যাম!

চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে রাধাশ্যাম বললে—ব্রাহ্মমন্দির কিছু আছে! তার পরই বললে—হ্যাঁ-হ্যাঁ! ও! ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন মারা গেছেন—আজ এখানে তারই সভা হচ্ছে। ওটা ব্রাহ্মমন্দির।

কাছাকাছি এসে নিজেই দাঁড়িয়ে গেল রাধাশ্যাম। মন্মথও দাঁড়াল। লোকগুলি সব আশ্চর্য পরিচ্ছন্ন। এমন পরিচ্ছন্নতা এমন মার্জনা কল্পনাতেও তৈরি করতে পারে নি মন্মথ! আরও আশ্চর্য—অনেক মেয়েরা রয়েছেন। সব বড় বড় ঘরের মেয়ে যেন। না তাদের চেয়েও বেশী। তাদের থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক। অনেক সুন্দর দেখতে। তেমনি সুন্দর বেশভূষা! গহনার ঝলমলানি নেই, তবু বড় সুন্দর মনে হচ্ছে। এতখানি ঘোমটা দেয় নি তবু লজ্জাহীনা মনে হয় না। কত সহজ কত স্বচ্ছন্দ! মুগ্ধ হয়ে গেল মন্মথ।

রাধাশ্যাম বললে—ওই যে শিবনাথ শাস্ত্রী। ওই যে—! দাড়ি-গোঁফওয়ালা—ওই যে ফটকের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—কথা বলছেন—। ওই উনি—।

—উনি বুঝি খুব বড় লোক—

—বড় লোক! রাধাশ্যাম যেন হিংস্র হয়ে উঠল।—হিন্দুদের উপর ভীষণ রাগ। গোঁড়া ব্রাহ্ম! মস্ত বড় পণ্ডিত বংশের ছেলে! আমার বাবা বলেন ওঁর বাবা মস্ত পণ্ডিত। বিদ্যাসাগর উপাধি। হরানন্দ বিদ্যাসাগর মশায় এসবের জন্য ছেলেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন বাড়ি থেকে। মামাও মস্ত পণ্ডিত—দ্বারকা বিদ্যেভূষণ। নিজেও পড়েছে অনেক। তারপর ব্রাহ্ম হয়েছে! কাউকে মানে না, ভয়ানক চীজ। কেশব সেনের সঙ্গে ঝগড়া করেছে, দেবেন ঠাকুরের সঙ্গে ঝগড়া করেছে—

হঠাৎ উত্তর দিক থেকে পথের উপর লোকেরা সব চঞ্চল হয়ে উঠল। দূর থেকে শোনা যাচ্ছে—হট যাও। হট যাও। একখানা গাড়ির কোচবাক্সে সাজপোশাকপরা কোচম্যানকে দেখা যাচ্ছে। গাড়ি একখানা নয় দুখানা একখানার পিছনে আর একখানা।

লোকেরা সব সরে যাচ্ছে দুধারে। ক্রমে সামনেটা সব ফাঁক হয়ে গেল। দুখানা গাড়ি মন্থর গতিতে অনেকটা যেন নৌকার মতো ছন্দে ও চালে এসে থামল বাড়িটার সামনে।

রাধাশ্যাম বললে—জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির গাড়ি। ও বাবা! এ যে দেবেন ঠাকুর নিজে। আর ও কে? ও! বড় ছেলে দ্বিজেন ঠাকুর। ঠাকুরবাড়ির বড় বাবু। কি ব্যাপার?

মন্মথ তাকিয়ে ছিল ওই আশ্চর্য রূপবান এবং মহিমান্বিত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সৌম্যদর্শন মানুষ দুটির দিকে। জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর তাঁর বড় ছেলে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িকে লোকে বলে রাজবাড়ি। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবা ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর—লোকে বলত—সে লোকেরা শুধু এদেশের না ও-দেশেরও মানে ইংলণ্ডেরও, বলত প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। কি রূপ! আর কি মহিমা মানুষ দুটির!

রাধাশ্যাম পাশের একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলে—কি হচ্ছে মশায় আজ?

লোকটি সামনের ওই সব বিশিষ্ট মহামহিমদর্শন মানুষগুলির দিক থেকে দৃষ্টি না ফিরিয়েই বললে—সভা হবে।

—সভা? কিসের সভা? ব্রাহ্মদের কোনো কিছু বুঝি?

—ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন মারা গেছেন জান তো? তারই জন্যে এখানে আজ প্রার্থনা সভা হবে। তোমরা তো ইস্কুলের ছোকরা হে! এ সব খবর রাখ না?

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন!

মন্মথর মনের ভিতরটা আলোড়িত হয়ে উঠল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নাম সে গ্রামে বসেই শুনেছে। গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা গাল দেয়, অন্য অন্য সাধারণ লোকে নাম শুনেই বলে—ও বাবা! বিস্ময় ও শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য অন্য কোনো শব্দ তারা খুঁজে পায় না। তাদের এম-ই স্কুলের হেডমাস্টার মশায় বলতেন ঈশ্বর-জানিত পুরুষ! তাঁর দলের সব ব্রাহ্মরা তাঁর পায়ে পড়ে পা ধরে কাঁদত—নিজেদের অন্যায়ের কথা অকপটে বলত। বিশ্বাস করত তাতেই তাদের পাপের ক্ষয় হয়ে যাবে। আশ্চর্য বক্তৃতা করতেন। সে বক্তৃতা শুনে দলে দলে ছেলেরা ব্রাহ্ম হয়েছে। তাঁর বক্তৃতা শুনে ইংলণ্ডেও নাকি লোকে ধন্য ধন্য করেছে। স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়া নাকি তাঁকে নিজের প্যালেসে নেমন্তন্ন করেছিলেন। নিজের ফটো দিয়েছিলেন। অনেক খাতির করেছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও তাঁর

বাড়িতে আসতেন। ওই অক্ষয়কুমার দত্ত আসছে। ওঃই—। ওই যে রোগা মতো, বেশ এক জোড়া খেজুরকাঠির মতো সোজা গোঁফ ; ওই যে মাথার সামনের দিকটায় অল্পসল্প টাক ! ওই যে হে—। হাঁ ওই। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ; চারুপাঠ বই লিখেছে।

—চারুপাঠ লিখেছেন যে অক্ষয়কুমার দত্ত—তিনি—উনি ?! উঃ—!

—হ্যাঁ। উনি—

—ওঃ আজ যে কার মুখ দেখে সকাল হয়েছিল রাধাশ্যাম—

কথাটা তার শেষ হল না। দক্ষিণ দিক থেকে একটা হৈহৈ গোলমাল ওখানকার ওই বড় বড় মানুষগুলির মহিমার ঐশ্বর্যের কয়েক ফোঁটা চিনি বা গুড়ের চারিদিকে পিঁপড়ের মতো জমায়েত শ্রদ্ধা ও বিস্ময়-বিমুগ্ধ অপেক্ষমাণ মানুষগুলিকে উড়ে আসা বোলতা বা টিকটিকির মতো তেড়ে এসে ছত্রভঙ্গ করে দিল।

রাধাশ্যাম মন্মথর হাত ধরে টেনে বললে—পালিয়ে এস।

মন্মথ এখনও শহরকে চেনে না। গ্রামের সরল ছেলে। রাত্রে ডাকাতকে ভয় করে কিন্তু দিনের আলোর মধ্যে এমন এমন সব অনেক মানুষের মধ্যেও এমনভাবে ওই ধরনের হইচই ঘটতে পারে বলে ধারণা করতে পারে না। কিন্তু রাধাশ্যাম চতুর। সে তাকে টানলে—কি দরকার হাঙ্গামার মধ্যে থেকে !

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঘরের ছেলে—ফলত শহরের বাসিন্দে। শহরের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিশেষণই হল নিরীহ। অনেকে তার থেকেও এগিয়ে গিয়ে বলে—গো-বেচারা মানুষ। এবং রাধাশ্যাম সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রথম ভাগ শেষ করবার আগেই যে সব সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করেছে তার মধ্যে 'যঃ পলায়তি স জীবতি' বাক্যটি প্রথম শিখেছে। তার সঙ্গে আর একটি বাক্যও শিখেছে—গো ব্রাহ্মণ বিরলে শুচি। শুধু শুচি কেন নিরাপদও বটে।

—চোরবাগান বসতিতে একটা খুন হয়ে গেল। একটা লোক না, ওরে বাপরে, এই এত বড় একখানা রক্তমাখা ছোরা হাতে ঘোরাতে ঘোরাতে অলিগলির মধ্যে দিয়ে চলে গেল।

—একটা মেয়েকে খুন করেছে।

—তাই তো ! তা' ছাড়া আর কে খুন হবে !

দুজন লোক তাদের সঙ্গেই দৌড়ুচ্ছিল। তারাই বলাবলি করছিল নিজেদের মধ্যে। মন্মথ বিস্মিত হয়ে তাকালে রাধাশ্যামের দিকে। রাধাশ্যাম বললে—কলকাতা জায়গাটা, জানো, যত ভালো তত খারাপ। খুন জখম—এ বাদ গেল এমন দিন বোধহয় নেই। দাঁড়াও এবার। অনেকদূর এসে পড়েছি।

সামনেই হেদুয়া পুকুর। ওপাশে বেথুন কলেজ। এখান থেকেই বাঁদিকে পশ্চিমমুখে ভাঙলেই কিছুদূর গিয়েই তাদের বাড়ি পাবে। কিন্তু এদিকটা বড় ঘিঞ্জি। গলিগুলো খুব এঁদো। হেদুয়ার ওমাথায় বীডন স্ট্রীট। বীডন স্ট্রীট ধরে পশ্চিমমুখে ভেঙে সাতুবাবু লাতুবাবুদের বাড়ির কাছ বরাবর গিয়ে দক্ষিণমুখে ভাঙলে রাস্তাটা ভালো। খানিকটা বেশী ঘুর হবে—কিন্তু তা হোক। ওই হইচই-এর পর এবং দিনের বেলা একটা লোক একটা মেয়েকে খুন করে ছোরা ঘুরিয়ে গলি গলি ছুটে চলে গেল এই খবরটা শুনে ওই পথটাই ধরলে রাধাশ্যাম। বললে—না ভাই। এই পথে নানান গলিঘুঁচি আর বসতিও তো আছে। তোমার কাকা কাকীমা আমাকেই তো দুষবেন কোনো কিছু ঘটলে। চল—সামনে চল। আর দাঁড়িয়ো না।

ওদিকে জনস্রোত আবার তখন ওমুখে ফিরেছে। গুণ্ডার ভয়ের ধাক্কাটা বোধ করি কাটিয়ে উঠেছে। মন্মথ বললে—ওই তো সব আবার ফিরল। চল না আমরাও যাই। বড্ড

বড় মানুষদের সব দেখা হয়ে যাবে !

—সে আমি সব দেখাব তোমাকে। আমি প্রায় সকলকে চিনি। কিন্তু আজ না। সে কোনো এক ছুটির দিন। বুঝলে।

—আচ্ছা—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যেসাগর মশায় আসবেন না ওখানে ?

—তা' কে জানে ? বিদ্যেসাগর তো ব্রাহ্মদের বাড়া। আমার এক ঠাকুরদা আছেন —বাবার কাকা ; বুড়ো খুব পণ্ডিত। বলে—ওই সব থেকে বেশী সর্বনাশ করছে জাতধর্মের। বাবা তো সংস্কৃত কলেজে চাকরি করে—মুখে কিছু বলে না—কিন্তু বাবার মত তাই। তুমিই বল না—বিধবার বিয়ে হলে জাত থাকবে ?

এ-কথা মন্মথ তার বাবার মুখেও শুনেছে। এবং বিধবারা যদি বিধবা না-থেকে একাদশী না-করে নিরামিষ না-খেয়ে থানকাপড় না-পরে আবার বিয়ে করে ঘরসংসার করে তাহলে তারও যেন মনে হয় একটা অত্যন্ত অন্যায় কিছু হয়ে যাবে—একটা কোনো ভয়ানক অমঙ্গল ঘটবার কারণ হবে। কথাটা মনে হলেই তাদের পাশের গাঁয়ের সরকারদের বিধবা মেয়ে হরিমতীর ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার কথা মনে পড়ে। হরিমতীর বাপ পতিত হয়ে শেষ পর্যন্ত ভিটেমাটি বেচে দিয়ে চলে গেল কোথায়। লোকে বলে কলকাতা কিংবা শ্রীরামপুরে এসেছে। হরিমতীর একটা চারবছরের ছেলে ছিল—সেটাকে হরিমতী ফেলে পালিয়েছিল—তারপর হরিমতীর বাপও ফেলে চলে গেল। ছেলেটা কেঁদে কেঁদে ফিরত দোরে দোরে। শুয়ে থাকত এর ওর দাওয়ায়। শেষ পর্যন্ত সেটাকে সাপে কেটেছিল। তবু মন্মথর যেন মনে হয় বিধবাদের বিয়ে খারাপ নয়। এম-ই স্কুলের হেডমাস্টারও তাই বলতেন।

চুপ করেই দুজন পথ হাঁটছিল।

রাধাশ্যাম মনে মনে অনুভব করছিল যে, সে যেন এই পাড়াগাঁয়ের ছেলেটির মনের ঠিক নাগাল পাচ্ছে না। যেন ওকে ধরে বেঁকিয়ে আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে আনতে পারছে না। ও-ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে, সেও তাই। কিন্তু তার বাপ কলকাতা শহরের লোক এবং সংস্কৃত কলেজিয়েটের পণ্ডিত। সেদিক থেকে এ ছেলেটার মতামত তার থেকেও গোঁড়া হওয়া উচিত। কিন্তু ছেলেটা যেন তা' নয়। ছেলেটা কিছুতেই খুব অবাক হয়ে যায় না।

হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে রাধাশ্যাম বললে—দেখবে তুমি বিদ্যেসাগরকে ?

—দেখাবে ?

—দেখাব। আজ বেলা পড়ে গেছে নইলে নিয়ে যেতাম বাদুড়বাগানে একেবারে বিদ্যেসাগরের বাড়িতে। হয়তো একটা ইয়া হুঁকো হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে। ঠিক মনে হত একজন উড়িয়া ঠাকুর-টাকুর কেউ হবে। দেখতে লোকটা কিছু ভালো না। জানো ? একটা মজার গল্প ?

—কি গল্প ?

—গল্প নয় সত্যি কথা। এক বুড়ী হুগলী জেলার একটা গাঁয়ে দাঁড়িয়ে ছিল রোদ মাথায় করে পথের ধারে। বিদ্যেসাগর আসবেন তাঁকে দেখবে। তাঁকে দেখে বলেছিল—ও মা গো ! গায় মোটা চাদর পায়ে চটিউড়িয়া বামুনের মতো চুল, এই বিদ্যেসাগর। এই দেখতে সেই সকাল থেকে ঠায় রোদ মাথায় করে দাঁড়িয়ে আছি !

রাধাশ্যামের বাবা গোপীনাথ শাস্ত্রী দেখতে সু-পুরুষ এবং সৌম্যদর্শন মানুষ। মন্মথ আর রাধাশ্যাম ততক্ষণে বীডন স্ট্রীটে এসে পড়েছিল। রাধাশ্যাম বললে—এখান থেকে—একলা। না—চল তোমাকে পেঁছে দিয়ে আসি।

মন্মথ বললে—তুমি যাও আমি যেতে পারব। সাতুবাবু লাতুবাবুদের বাড়িটা ঠিক চিনতে পারব।

—উঁ-হু! মন্মথকে সম্পূর্ণরূপে তার উপর ভরসা না-করিয়ে রাধাশ্যামের শান্তি নেই। সে বললে—তোমার কাকীমা বাবার কাছে লোক পাঠিয়ে ছিলেন। আমাদের ইস্কুল তোমাদের ইস্কুল তো পাশাপাশি। তা' রাধাশ্যাম, মানে আমি যেন তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আসি। বাবা বলে দিলেন—রাধেশ্যাম তুই দেখিস বাবা। আমি আবার যজমান বাড়ি হয়ে বাড়ি ফিরব। চল।

মন্মথর একটা প্রসন্ন শান্ত সহ্যগুণ আছে। সেটা সে জন্মের সঙ্গে নিয়েই জন্মেছে, মায়ের মৃত্যুর পর সেই সহ্যশক্তি আয়তনে গভীরতায় আরও অনেক বড় হয়েছে। তাকে যেন বড় একটা দহের মতো বেশী রকম স্থির এবং শান্ত দেখায়। কিন্তু কয়েক পা নামলেই গভীরতা সম্পর্কে একটা বোধ জাগে এবং ভয় দেখায়।

কিছুটাক পথ মধু রায় লেন ধরে এগিয়েই রাধাশ্যাম সেই ভয়টা যেন হঠাৎ অনুভব করলে। এবং হঠাৎ বললে—রাগ করছ না তো—

মন্মথ বললে—না তো!

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ পথ চলে বললে—আমি তোমাকে সব বড় বড় লোকদের বাড়ি দেখিয়ে আনব। আমি সব চিনি—শোভাবাজারের রাজবাড়ি রাজা রামমোহন রায়ের বাড়ি জোড়াসাঁকোর বাড়ি প্রিন্স দ্বারকানাথের বাড়ি ঠনঠনেতে ঘোষদের বাড়ি মল্লিক বাড়ি লাহা বাড়ি—সাতুবাবু লাতুবাবুদের বাড়ি তো সামনে; তারপর হাটখোলার দত্ত বাড়ি কলুটোলার মতি শীল বাবুদের বাড়ি রামবাগানের দত্ত কুমোরটুলির সরকার বড়বাজারের বসাক শেঠ এদের বাড়ি—এদের নাড়িনক্ষত্র পর্যন্ত জানি। বাবার সঙ্গে গিয়েছি যে। স—ব চিনি আমি।—বলেই চলেছিল সে বলেই চলেছিল।

মন্মথ কিন্তু কথা বলছিল না। তার এ সব শুনতে ভালোই লাগছিল না সেই মুহূর্তে। তার মন যেন এরই মধ্যে কখন সেই তার গোবিন্দপুর গাঁয়ের পথে যাবার জন্যে মুখ ফিরিয়েছে। মনে পড়ছে সে তার এম-ই স্কুল থেকে বিস্তীর্ণ মাঠের পথ ধরে বাড়ি ফিরত; এখন শীতকাল—মাঠের ধান প্রায় সব উঠে গিয়েছে। তবুও দু'একখানা ধানবোঝাই গাড়ির চাকার ধুলো উঠে হাওয়ায় ভাসছে, পাটে বসা সূর্যের লাল আলোয় ধোঁয়ার মতো ভাসন্ত ধুলোয় লালচে রঙ ধরিয়েছে। মাথার উপর দিয়ে সরালিহাঁস বালিহাঁসের দল পাখা মেলে উড়েছে এতক্ষণে রাত্রির চরাটের জন্য। দিনের আলোয় ওরা বিলে ভেসে থাকে—বিলের পাঁক থেকে গুগলি ছোট মাছ পোকামাকড় ধরে খায়—সন্ধ্যাবেলা পাখা মেলে আকাশে উঠে উড়ে গিয়ে একটা অঞ্চলের পাকা ধান ভরা মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সারা রাত্রি ধরে ধান খেয়ে ভোরবেলা আবার আকাশে পাখা মেলে ফিরবে। মধ্যে মাঝে বড় বড় বাগান—আমের বাগান, কাঁঠাল বাগানও আছে তবে কম। মধ্যে মাঝে পথের পাশেই বড় শিরীষ জাম বকুলের গাছ। সে গাছে উঠেছে কাঁটাভরা কুঁচের লতা সেই ঝোপের মধ্যে অজস্র শালিক পাখি কিঁচিরমিচির শব্দ তুলে অন্তহীন কলহে মেতে থাকে। ইস্কুল থেকে যত দূর চলত দু'পাশেই এই কলহ। মধ্যে মধ্যে কখনও কোনো গাছ থেকে হঠাৎ একটা কোকিল চকিত কুহু কুহু কুহু কুহু ডাক তুলে উড়ে চলে যায়। পিছনে কাক তাড়া করে। ওই শালিকদের ডাকের একটা ছড়া শিখেছিল মন্মথ।

—রি কট কট কেকর কেকর—

শিখিয়েছিল তাকে ইস্কুলের গ্রামের ষষ্ঠীরাম মুখুজ্জে।—রি কট কট কেকর কেকর ধোকর মোকর কেকর কেকর ক্লি ক্লি ক্লিং ক্লিং কিঁচি কিঁচি কিঁচি—।

শালিকদের ঝগড়া শুনত আর মন্মথও এই ছড়াটা সমানে আওড়াতে আওড়াতে চলত। সামনে লালচে রোদের আলোর মধ্যে ধুলোর গুঁড়ো ভাসত। সেই ধুলোর সঙ্গে আরও এক

দফা ধুলো মিশিয়ে দিয়ে পথের ধারের ঝোপ থেকে ছুটে বেরিয়ে আসত একটা কি জোড়া শেয়াল, ছুটে এপার থেকে রাস্তার ওপারের জঙ্গলে ঢুকে যেত অথবা পাশের ধানকাটা মাঠের উপর দিয়ে চলে যেত।

মাঠ শেষ হত, পথ গ্রামে ঢুকত। গ্রামের শেষ দিকের পাড়া। ছোট ছোট ঘর। হিন্দুর গ্রাম হলে এগুলি অচ্ছুতদের পাড়া। শুধু অচ্ছুত নয়, অচ্ছুতও বটে গরীবও বটে। মুসলমানদের গ্রাম হলে এগুলি শুধু গরীবদের ঘর। তবে শেখেরা গরীব হলেও তাদের পাড়া ঘরদোর অচ্ছুত গরীব হিন্দুদের পাড়া ঘরের চেয়ে পরিষ্কার এবং ছিমছাম।

চারিপাশে শজনের গাছ নাজনের গাছ। রাঙচিতের বেড়া। দুটো চারটে খেজুর গাছ। উঠানে দুটো একটা আম কাঁঠাল। কাঁঠাল গাছগুলিতে শীতের সময় খড়ের ঘের পরিয়ে দিয়েছে। মসলন্দপুরের শেখেদের বেড়ায় খুব ভালো কুলের গাছ আছে। মিয়াদের দলিজার সামনে আছে নারকেলকুলের গাছ।

শেখপাড়ার কুকুরগুলো ভারী তেজী। শেখেদের বাড়ির বহুড়ীগুলিকে ঠিক যেন শেখেদের মেয়ে বউ বলে চেনা যায়। এদের পেটোপেড়ে চুল বাঁধার মধ্যে—হাতের চুড়ি কাঁকণি খাড়ুর মধ্যে ওই পরিচয়টা ফুটে ওঠে। কি সুন্দর খেজুর চাটাই বোনে ওরা! শুধু চাটাই নয় কাপড়ে কাপড় বসিয়ে রঙিন কন্তা দিয়ে সেলাই করে নকশী তুলে কাঁথা সেলাই করে—তার কি বাহার! খেজুর পাতা এখন অজস্র। এখন খেজুর পাতা কেটে ফেলে দেয় গাছ-কামানদারেরা, মানে যারা খেজুর গাছের গলা কামিয়ে খেজুরের রস নামায়। এই সন্ধ্যে হব-হব সময়ে কামানদারেরা হাঁড়ির বোঝা নিয়ে বেরিয়েছে গাছের গলায় ওই হাঁড়ি বেঁধে দেবার জন্যে।

মন্মথদের খামারবাড়িতে দুটো খেজুর গাছ আছে। সে দুটো কামিয়ে দেয় বাগদী বউয়ের ছেলে। মধ্যে মধ্যে তাতে হাঁড়ি টাঙাতো মন্মথ নিজে। জিরেন কাটের রস যেদিন নামত সেদিন মন্মথ বাড়ির ভিতর থেকে হাঁড়ি নিয়ে টাঙিয়ে দিত। পরের দিন সে-রস তার বাবাও খেতেন। তার বাবা এখন খামারবাড়িতে দাঁড়িয়ে কাটা-ধানের পাঁজা সাজিয়ে পালুই বাঁধা দেখছেন; বাড়ির গাই-গরুগুলিকে ডাবা ভরে খড় কেটে দেওয়া হয়েছে—ভিজানো খইল, কুঁড়ো দিয়ে মাখিয়ে দিয়েছে; গরুগুলি হাঁই হাঁই করে গোগ্রাসে গিলছে। বাবার বাঁহাত তাদের পিঠের উপর সস্নেহে বুলিয়ে চলে বেড়াচ্ছে। ছোট কচি বাছুরটা হঠাৎ লেজটা পিঠের উপর তুলে তড়বড় করে ছুটে বেড়াচ্ছে।

পুকুরটার চারিপাশে সব ওই খেটেখাওয়া মানুষদের মেয়েরা হাঁসদের ডাকছে—আ তি তি তি তি। কোর কোর কোর।

কেউ ছাগলদের ডাকছে। আ আ—অ রু রু রু—রু—আ। আ আ। গাই বাছুরকে ডাকছে—হাম্ বা।

বাছুর সাড়া দিচ্ছে—ব্যা। এ্যাম্ ব্যা।

কখন একসময় সেই সময়টা—এসে পড়ত যে সময় একসঙ্গে কাক কোকিল শালিক সড়ক সব গলায় গলা মিশিয়ে কলরব করে ডেকে উঠে বলত—সূর্য ডুবছে সূর্য ডুবছে সূর্য ডুবছে। বামুন কায়স্থ সদগোপবাড়ির ঝিউড়ী মেয়েদের সেঁজুতি ব্রতের মনধরা মনে পড়ে—থালা থালা থালা। বাটি বাটি বাটি। কাস্তে কাস্তে কাস্তে। সূর্য ডুবলেই বলে—তোমার মন ধরলাম, তোমার মন ধরলাম, ধরলাম, তোমার মন ধরলাম।

তারপর আকাশে তারা গোনা—একতারা নাড়া খাড়া। দুই তারা কাপাসের খাড়া। তিন তারা ঘোর মোর। চার তারা কাঁঠালের কোর। সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে শেয়ালেরা ডেকে উঠছে—হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া। হুয়া হুয়া হুয়া।

সে ছবি মনে করতে গিয়েও মনে করতে পারছে না মন্মথ। কিছুতেই না। তার কানের কাছে রাধাশ্যাম অনর্গল কথা বলে চলেছে। এখানকার কথা।

সে আজ ওই ব্রাহ্মমন্দিরের সামনে অনেক গাড়ি অনেক বড় বড় মানুষ—যাদের পোশাক সুন্দর, যারা চেহারায় সুন্দর তাদের দেখে এবং তাদের পরিচয় শুনে বলেছিল বিদ্যাসাগর মশায়কে দেখবে। হুগলী মেদিনীপুর জেলা পাশাপাশি। মেদিনীপুরের এই আশ্চর্য মানুষটিকে দেখতে সাধ তার অনেক দিনের, খুব ছেলেবেলা থেকেই। বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগে তাঁর চেহারা ছাপা হয়, সে তা' দেখেছে। সে দেখে তার ভালো লাগে নি। মনে হয়েছিল—দূর—এই বিদ্যেসাগর। তাই একবার সে দেখবে বলে মনে করে আছে অনেক দিন থেকে। সেই কথাটি বলে ফেলে আজ ফ্যাসাদে পড়েছে। রাধাশ্যাম যত সব বড়লোক আছে কলকাতায় তাদের নাম করে চলেছে।

কেশব সেন মারা গেছেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাগবাজারের শিশির ঘোষ-টোষ এদের সকলদের সঙ্গেই ওর বাবার জানাশোনা আছে; সবাই চেনেন পণ্ডিতমশাইকে! এমন কি দক্ষিণেশ্বরের সিদ্ধপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব পর্যন্ত পণ্ডিতমশাইকে ভালবাসেন। রাধাশ্যামও এঁদের সকলকে দেখেছে। পরমহংসদেব নাকি রাধাশ্যামকে বলেছেন—তুই ছেলেটা কে রে? এ্যাঁ? ও পণ্ডিত তোর ছেলে নাকি রে? বা বা বা রে। বা বা।

রাধাশ্যাম আনন্দে উল্লাসে হেসে যেন ভেঙে পড়তে চাইলে। বিরক্ত হয়ে উঠল মন্মথ। পণ্ডিতমশাইটি এমন ভালো আর এই রাধাশ্যাম এমন অসহ্য। অথচ বলবার কিছু নেই। কিছু যেন পাচ্ছে না খুঁজে। সেতো কোনো খারাপ কথা বলছে না। ঠিক যেন শীতের দিনে সুঁওসুঁওয়ালা মোটা গরম কাপড়ের মতো তাকে জড়িয়ে নিয়ে চেপে ধরেছে।

বাঁচল সে বাড়ির সামনে এসে। বাড়ির সামনেই মধু রায়ের লেন দ-এর মতো একটা বাঁকে পাক দিয়ে মোড় ফিরেছে। এই দ-এর ঠিক মাঝের ডাঁটির খাঁজের উপড় জটাধরবাবুর বাড়ি। এর জন্যে বাড়ির সামনের ছোট বাগানটার ফটকে এবং উপরের বারান্দায় দাঁড়ালে সামনেটা পুরো দেখা যায়। সেই বারান্দার উপর থেকে মন্মথর খুড়ীমার খাস-ঝি সে-এক বিচিত্র ধরনের কণ্ঠে এবং বিচিত্রতর ধরনের ভঙ্গিতে বলে উঠল—ওই এয়েচে গো ওই এয়েচে। গুণ্ডা নচ্ছারে ছুরি ছোরা মারে নি, পাড়াগাঁর হ্যাবলাভ্যাবলা সাদাসিদে গোপাল পথ হারায় নি, কাবুলেতে ভুলিয়ে, নে যায় নি—দিব্যি হেলতে দুলতে দুলতে ছেলে তোমাদের এয়েচে। সঙ্গে ভশ্চাযি্যি মশায়ের টাটু ঘোড়া আছে—ও কি পথ হারায় না যায় কোথায়? ওই দেখ এয়েচে। দপ করে গ্যাসের আলোটা জেবলে দেছে আর আমার চোখে পড়েছে। ওই দেখ নাড়া মাথা, কদমফুলি চুল—ওঃই—ওঃ—ই।

রাস্তার গ্যাসের আলোটা সত্যিই জবলল প্রায় সেই মুহূর্তে। জটাধরবাবুর বাড়ির সামনেই একটা গ্যাসের আলোর পোস্ট আছে।

একটু নীলচে ধবধবে জ্যোৎস্নার মতো সাদা আলো ছড়িয়ে পড়েছে ঠাঁইটায়। কলকাতায় এই আলোটা ভারী ভালো লেগেছে মন্মথর। ভারী সুন্দর। নীলাভ সাদা—ঠিক জ্যোৎস্নার মতো। গ্যাসের আলো। মন্মথর গ্রামের এম-ই ইস্কুলের হেডমাস্টার মশায়ের বিধবা মেয়ে চারু—ডাকনাম নেড়ী—স্কুলের সেক্রেটারীর বোনের সঙ্গে গ্যাসের আলো পাতিয়েছে। শুনতে ভারী ভালো লাগত। দেখতে গ্যাসের আলো আরও ভালো।

—মন্মথ!

ওপরের বারান্দা থেকে কৃষ্ণভামিনীর ক্লান্ত কিন্তু বেশ একটু বিরক্তিভরা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—। মন্মথ!

চমকে উঠল মন্মথ। রাধাশ্যাম বললে—আমি পালাচ্ছি। উনি আজ রেগে গেছেন।

সে পাশ কাটাতে চেষ্টা করলে। কিন্তু কৃষ্ণভামিনীর চোখ এড়ানো সহজ নয়। সে বললে—পালিয়ো না রাধাশ্যাম। দাঁড়াও। কোথায় ছিলে তোমরা বল তো? বাবু দারোয়ানকে রেখে আসতে চেয়েছিলেন তোমার বাবার কাছে। সে ওকে নিয়ে আসত। তুমি ফিরিয়ে দিয়েছ। বলেছ তুমি নিয়ে যাবে তারপর বাস্—ইস্কুলের ছুটি হয়েছে কখন, সাড়েপাঁচটা বেজে গেছে, ওকে নিয়ে তুমি কোন্ রাস্তায় রাস্তায় বেড়াচ্ছিলে? পথে শুনলাম ঠনঠনের ওখানে গুণ্ডারা নাকি ছোরা ঘুরোতে ঘুরোতে বেরিয়ে এসেছিল লোকেদের তাড়া করে! তুমি না হয় কলকাতার ছেলে—এখানেই জন্ম—এখানেই তোমাদের বাস কিন্তু ও তো পাড়াগাঁয়ের ছেলে। তাছাড়া ওর বাবার কাছ থেকে আমি দায় পুরে নিয়ে এসেছি।

রাধাশ্যাম সে তোড়ের মুখে প্রায় বনের মুখে খড়ের আঁটির মতো ভেসে যাবার মতো অসহায় হয়ে পড়েছিল, তবু কোনোরকমে পাশ কাটিয়ে পালিয়ে গিয়ে বাঁচল বলে মনে হল। হনহন করে চলে যেতে চাইলে সে। কিন্তু কৃষ্ণভামিনীর চরিত্র সেকালের খাঁটি বড়ঘরের গিন্নীর চরিত্র। সে গম্ভীর কণ্ঠে হাঁকলে—শোন, যেয়ো না শোন। নইলে এক্ষুণি লোক পাঠাব আমি তোমার বাবার কাছে। তিনি না এসে থাকলে তোমার মাকে বলতে বলে দেব যে, তুমি আমার কথা না শুনে চলে এসেছ।

এরপর দাঁড়াতে হল রাধাশ্যামকে।

কৃষ্ণভামিনী বললে—দুজনে একসঙ্গে আসছ, মুখ হাত ধোও, এখানে জল খাও, তারপর যাবে।

সুন্দর করে সাজানো শ্বেতপাথরের রেকাবি করে কাটাফল আর মিষ্টি। এখন শীত-কাল কিন্তু তাতে কি—কলকাতা শহর বলে কথা, এখানে নাকি টাকায় বাঘের দুধ মেলে। থালায় সাজানো ছিল খেজুর পেস্তা বাদাম থেকে কমলালেবু শাঁখআলু কলা আঙুর পেঁপে এবং তার সঙ্গে দু'তিনটে বিলিতী ফল। আর মিষ্টি। খাইয়ে রাধাশ্যামকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে কৃষ্ণভামিনী বললে—মনুসোনা আজ কিন্তু খুব ভাবিয়েছ আমাকে। খুব ভাবিয়েছ।

মন্মথ বললে—কেন খুড়ীমা বেশী দেরি তো হয় নি। আর ভয়েরই বা আছে কি বল? ওই যে ছোরা ঘোরানোর কথা না, ওটা কি হয়েছিল আমরা দেখি নি, তবে হুজুগটা বেশী—

—না। গম্ভীরভাবে কৃষ্ণভামিনী বললে—না। তুমি এই কলকাতা শহরকে জান না বাবা। এ হল ইংরেজদের শহর। সাত সমুদ্দুর পারের ঢেউ এখানে আসে। বাইরে যত চকচকে ভিতরে তত ভয়ানক। আমি এই শহরের মেয়ে। আমার বাবাও পুরুতগিরি করতেন। বুঝেছ। তোমার কাকা এই সব ভয়ানক আটঘাট দেখেছে। অনেক ঘাটে জলও খেয়েছে। 'তুমি জানো না—এখানে একধরনের ছেলেধরা আছে—তারা এই সব নধর দেখতে শুনতে ভালো ছেলে ধরে নিয়ে যায়। ভুলিয়ে নিয়ে যায় তারপর কি খাইয়ে দেয়—তখন সব ভুলে যায় সে। তারপর ক্রীতদাস করেও বেচে। আবার বেশ নরম নরম গড়ন যাদের তাদের বেশ ভালো মেওয়া ফল ঘিমাংস খাইয়ে মোটা-সোটা করে একদিন একটা কড়িতে কি লোহার হুকে পায়ে বেঁধে মাথা নিচু করে ঝুলিয়ে দেয়। আর নিচে দাউদাউ আগুন জেলে কড়াই চাপিয়ে দেয়। তারপর একসময় ভটকরে মাথার খুলি ফেটে গিয়ে সেই মাথার ঘি গায়ের চর্বি কড়াতে পড়তে থাকে। তার সঙ্গে নানান রকম মেওয়া ঘিউ মিষ্টি মিশিয়ে পোস্টাই হালুয়া তৈরি করে। সে জিনিস চালান যায় সেই একবারে নাকি আরব পারস্যে সেই বাগদাদ বসোরা রুম টুম পর্যন্ত।'*

---

*হুতোম প্যাঁচার নক্সা

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মন্মথ তার খুড়ীমার মুখের দিকে।

কৃষ্ণভামিনী সস্নেহে হেসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে—এ মিথ্যে জুজু-বুড়ীর ভয় নয় বাবা। খুব সত্যি কথা। তোমার কাকা তো এখন দেখছ দশজনের একজন হয়েছেন। বড় বড় সমাজে ঘোরেন। দারোগা পুলিশরাও সব বন্ধুর মতো। তাঁরা এ সব কথা তাঁকে বলেছেন। তোমার কাকা আমাকে বার বার করে বলে দিয়েছেন—শোন ভামিনী সব একদিক আর মনুবাবা একদিক। বুঝেছ? দাদার কাছ থেকে আমরা দুজনে দায় পুরে আমাদের জনার্দন আর গোবিন্দের কাছে শপথ করে এখানে এনেছি। আমাদের ছেলেপুলে নাই। যদি হয় হবে, কিন্তু মনুবাবাই আমাদের পিন্ডের আধার। এখন তো মনে করতে হবে ওই আমাদের সব। তা' বুঝে আমি দেখেছি। তাই মেনেও নিয়েছি। আমার সতীনেও কাজ নেই পুষ্যিতেও কাজ নেই। তার থেকে তুমিই আমাদের সন্তান সেই ভালো। যদি তোমার পয়ে আমার ছেলে হয় তখন দুই ছেলে হবে।

শুনতে শুনতে ভারী ভালো লাগছিল মন্মথর! আজ আবার অনেক দিন পর মন্মথর মনে পড়ে গেল নিজের মাকে। তার মা কিন্তু এই ঢঙের কথা বলতে পারতেন না। না। মা তার বড় শক্ত মানুষ ছিলেন। খুড়ীমা আহ্লাদে গদগদ মানুষ। বেশ সুন্দর করে সুখের কথা বলে।

মা এবং খুড়ীমায়ে তফাত অনেক। তবু মনে পড়ল আজ মাকে। তার মা ছিলেন ভটচাজবাড়ির বউ। রাধাগোবিন্দ লক্ষ্মীজনার্দনের পুজো করেন যিনি তাঁর বাড়ির গিন্নী তাঁর স্ত্রী। খুড়ীমা তা নয়, শোনা যায় পুরুত বামুনের কন্যা কিন্তু তাহলেও সে আর তা নেই। সে জটাধর ভটচাজ না জে. ডি. ভটচাজের স্ত্রী। হাতে মোটা অনন্ত—নিচের হাতে আটগাছা করে বরফি কাটা সোনার চুড়ি। কোমরে ষাট ভরির বিছেহার ছিল—সেটা ভেঙে এবার আশি ভরি দিয়ে গড়ানো হবে। এখন কোমরে রয়েছে একগাছা গোটহার। নাকে নাক-চাবিতে একখানা কমল হীরে ঝকঝক করে সাদা আগুনের একটা টুকরোর মতো। তবু আজ মনে হচ্ছে খুড়ীমা আর তার মা এই দুই জায়ে দেখা না হয়ে থাকলেও মনে মনে কত ভাব ছিল, কত মিল ছিল।

কৃষ্ণভামিনী বলেই চলেছিল—এই দেখ, আমি বলেছি বাবুকে—বাবু বিধাতা পুরুষ যিনি তিনি তো শরীর ধরে এসে সামনে দাঁড়িয়ে তোমাকে বলবেন না—জটাধর তোমাকে আমি সন্তুষ্ট হয়ে যে এই সব দিয়েছি তা' এই করবার জন্যে এই করবার জন্যে। এই কর, এই কর, এই কর! বুঝে নিতে হবে। তোমাকে বুদ্ধি পরে বুঝে নিতে হবে। তুমি ছিলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঘরের ছেলে—কানে ফুঁ দিয়ে শাঁখে ফুঁ দিয়ে বাপ পিতাম'র শিষ্য-যজমান চরিয়ে খেতে। তোমার দাদাও তাই করেছেন—আজও করছেন। তিনি মান্যির লোক—তাঁর সম্পর্কে কোনো কথা আমি বলব না। ছোটমুখে বড় কথা হবে। আমার বাবার কথা ধর। তাঁর কথা বলি। দেখ তিনিও পুরুতগিরি করতেন। অবিশ্যি শুদ্র ভদ্দর যজমানের বাছবিচার ছিল না। কসবী বেশ্যা পাড়াতেও কাজ করতেন। নিজেদের সমাজে পতিত ছিলেন একরকম। পয়সা করেছিলেন। আমি একটি মেয়ে। বাবা বলতেন—ছেলে হলে পড়াতাম। লেখাপড়া শিখিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যিতে লাগিয়ে দিতাম। সায়েব কোম্পানির বড় বড় মুচ্ছুদ্দী দালালদের সঙ্গে আলাপ ছিল। ওইসব বাবুদের বাঁধা বাঈটাইদের বার বেরতো করাতেন; খাতির করত তারা। তাদের ধরলে ছেলেকে দিব্যি ভালো কাজে লাগিয়ে দিতেন। কিন্তু এ তো বেটী। এর কি করবেন? এই তোমার কাকাকে দেখলেন। দেখ বিধেতার কৌশলটা বোঝ যোগসাজশটা দেখ। পবিত্র পণ্ডিত বংশের ছেলে—সেই ছেলে লেখাপড়া শিখলে না, ব্যাকরণ মাথায় ঢুকল না। বাড়ি থেকে পালিয়ে শালগেরামের সেবা ছেড়ে

কোশাকুশি ফেলে দিয়ে দাঁড়িপাল্লা হাতে নিয়ে বাড়ি থেকে পালাল। কি? না—বামুনের মান গেছে; বামনামীর কদর নাই; লোকে লোভী বলে, ভণ্ড বলে, বড়লোকের বাড়িতে ভিখিরীর অধম অবস্থা। মান নাই ধনও নাই—কি হবে ঐ করে। ও কি আর নিজের বুদ্ধিতে গেছিল বাবা। গেছিল বিধেতার হুকুমে। বিধেতার ইচ্ছে হল তোমাদের ভটচাজ বংশকে তুলব। তাই এই মতি দিয়ে তোমার কাকাকে পাঠালেন ভুবনের হাটে। আর আমার বাবার বংশকেও তুলবেন। তাই ওর সঙ্গে আমাকে মেলালেন। দেখ—রহস্যটা দেখ। টাকা হল পয়সা হল। হল অনেক—আরও হবে। বুঝেছ। আমি জানি আমি বলছি তোমাকে, বলছি তোমার কাকামশায়ের আরও অনেক হবে। কিন্তু হল কি জানো? হয়েও তো সাধ মিটল না। সেই যে ধন ফেলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল—সেই বিদ্যে—তার জন্যে আপসোস! লোকে বলে ফটাধরবাবু বলে নাকি পণ্ডিত বংশের ছেলে। দূর দূর! মুখ্যু! তোমার কাকার ভারী আপসোস! সে আপসোস আমারও বটে বাবা হ্যাঁ। আমারও বটে। শুধু টাকা পয়সার খাতিরে মন ওঠে না বাবা। বিদ্যে চাই। বুঝেছ। টাকা আর বিদ্যে এই দুটো হলে তবে তো। নারায়ণের বাঁয়ে লক্ষ্মী ডানে সরস্বতী। দু'পাশে দুজন। না হলে হবে কেন? তবে তো সুখ তবে তো খাতির। ওই দেখ না জোড়াসাঁকোর রাজা ঠাকুরমশায়দের বাড়ির দিকে তাকিয়ে। যত ধন তত বিদ্যে তত মান। ওই ওদের বংশের প্রথম জন কলকাতায় এসেছিল—ওই তো ব্রাহ্মণের কুলকর্ম'ই করাতেন। তারপর হল পয়সা। তারপর হল বিদ্যে। তোমাদের বংশের পয়সা হল—বিদ্যে চাই। কিন্তু সে বিদ্যে শিখবে কে? আমার কোঁক ফলল না। একটা ছেলে তো হল না। তখন আজ তোমার কাছে লুকোব না—পুষ্যিপুত্তুর নেবার কথাও ভেবেছিলাম। কিন্তু এক গাছের বাকল অন্য গাছে লাগে না। রাজা নবকৃষ্ণ দেবের পুষ্যিপুত্তুর নিয়ে তারপর ছেলে হল। নিয়ে মামলা হল। লক্ষ টাকা খরচ। এমন সময় সেবার তোমার বাবার চিঠি এলো। তোমার কাকা সেবার দেশে গেলেন; ভয় ভয়েই গেলেন—গিয়ে ফিরে এসে বললেন—ভামিনী হয়েছে। দাদার ছেলে যা দেখে এলাম। ওই ছেলেকে না-হয় নিজের ছেলের মতো মানুষ করব। টাকা পয়সা আমি করে যাই—ও ছেলে বিদ্যেতে দিগ্‌গজ হবে।

জান বাবা, তোমাদের বাড়িতে গেলাম—তোমাকে দেখলাম—দেখেই মনে হল আমার এই বাঁজা বুকে যেন দুধ আসছে। আর তুমি যখন বললে—কাকামশাই আমাকে কলকাতা নিয়ে যাবে—আমি পড়ব! ইংরিজী পড়ব। তখন আমার কানে কানে যেন তোমাদের বাড়ির ঠাকুরটি বলে দিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ তাই কর। তাই কর। বিধাতার ইচ্ছে। বুঝলে।

অবাক হয়ে শুনছিল মন্মথ।

দেবতাতে তার বিশ্বাস কতখানি সে কে বলবে। তবে তাদের বাড়ির লক্ষ্মীজনার্দন এবং রাধাগোবিন্দকে সে খুব ভালবাসে। অন্য দেবতা কথা বলেন বললে সংশয়ে কপাল কুঁচকে ওঠে কিন্তু তাদের বাড়ির ঠাকুর তার খুড়ীমাকে যে কথা বলেছেন বললে তার খুড়ীমা তাতে তার অবিশ্বাস হল না।

সে পড়বে—ইংরিজী পড়বে—সংস্কৃতও পড়বে। সে শুনেছে সংস্কৃত ভাষাতে যে জ্ঞান আছে সে জ্ঞানের তুল্য জ্ঞান কোনো ভাষাতে নেই।

কৃষ্ণভামিনী কিন্তু তখনও থামে নি।

সে বলেই চলেছে—তুমি পড়। মন দিয়ে পড়। তবে মনে রেখো তুমিও বামুন পণ্ডিত বাড়ির ছেলে, রাধাশ্যামও তাই। কিন্তু তুমি ফটাধরবাবুর ভাইপো। ফটাধরবাবু এখন দশজনের একজন হয়ে উঠেছেন। বুঝেছ? তোমাকেও সেইভাবে চলতে হবে বাবা আমার সোনামণি। বুঝেছ? তোমার কাকাকে আমি বলেছি—তোমার একটা বুহাম গাড়ি আছে

—আপিস যাও, নেমন্তন্নে যাও—বেশ। এতদিন আমার তোমার গাড়ি নিয়েটিয়েই চলেছে। এবার মনুসোনাও এলো, এবার আর একখানা ব্রুহাম নয়তো একখানা বঘগীমের বগি গাড়ি কেনো। ঘোড়াটা শান্তশিষ্ট ঘোড়া হবে। মনু ইস্কুল যাবে—আসবে, আমি গঙ্গা চানে গেলাম মদনমোহনতলা গেলাম কালীঘাট গেলাম। ঠনঠনেতে মায়ের থানে গেলাম কি দক্ষিণেশ্বর গেলাম। তুমিও স্বাধীন আমিও স্বাধীন। বুঝেছ না বাবা! তুমিই বল না আমারই বা নিজের বলতে গাড়ি থাকবে না কেন? আমি তো তোমার কি বলে ওই কুলীন-কন্যে নই। আমি আমার বাপের বিষয়-আশয় টাকাকড়ি সব নিয়ে তবে এসেছি এ বাড়িতে।

একটু দম নিয়ে থেমে আবার আরম্ভ করলে—বামুনের ছেলে ব্যবসায় পয়সা করে এমন মেজাজ হলে আমার হবে না কেন? দেখ না, একেবারে এক মিলিটারী ঘোড়া কিনেছে। কি দুর্ধর্ষ ঘোড়া রে বাবা! ঘোড়ার লাগাম ধরে ওই শোন ঘোড়ার সঙ্গে কথা বলছে শোন। ওয়েলার ঘোড়া! ওরা কথা খুব বোঝে।

নিচে সত্যই জটাধরবাবু তার ব্রুহামে জোতা নতুন ওয়েলার ঘোড়ার লাগাম ধরে তার ঘাড়ে গলায় চাপড় দিয়ে হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে টেনে বের করছে।

খুড়ীমা বললে—যাও বাবা নিজের ঘরে যাও। দেখ একটা কাচের আলমারি দেওয়া হয়েছে তোমার ঘরে। একটা টেবিল দুখানা চেয়ার। বই রাখবে পড়বে চেয়ার টেবিলে। হ্যাঁ? আচ্ছা আমি যাই, তোমার কাকা এখন বেরুলেন। গানের মজলিসে যাবেন। মল্লিকদের বাগানবাড়িতে নাকি বড় ওস্তাদের গান হবে। ওঁকে নেমন্তন্ন করেছে। গানে তোমার কাকার খুব ঝোঁক! নিজে বাজাতে পারে খুব ভালো।

জান? খুব একজন নামী পাখোয়াজী।—হ্যাঁ।

চলে গেল ভামিনী।

মন্মথ চলল নিজের ঘরের দিকে।

ঘরখানাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ ঘেঁষে মস্ত বড় একখানা পালঙ্ক খাট—উপরে কাঠের কার্নিসের মতো ছত্রি দেওয়া। তাতে সুন্দর নেটের মশারি টাঙানো। এক দেওয়াল ঘেঁষে সুন্দর কাচের একটা আলমারি। মাঝখানে চেয়ার টেবিল। টেবিলটা মার্বেলটপ, তিনখানা চেয়ার। ছাদ থেকে ঝুলছে টানা পাখা। দেওয়ালে সুন্দর কখানা ছবি। কালীর ছবি রাধাকৃষ্ণের ছবি দুর্গার ছবি। কুইন ভিক্টোরিয়ার ছবি। দুখানা বেশ বড় সুন্দর গিল্টি করা ফ্রেমে বাঁধানো একটি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। এদেশের কোনো দৃশ্য নয়। কোনোও দেশেরই ঠিক বলা চলে না কারণ দুখানাই সমুদ্রের বুকের ছবি। একখানাতে একখানা জাহাজ রয়েছে—ঝড়ের মুখে পড়েছে জাহাজখানা। কাপ্তেন হাত বাড়িয়ে কোনোও হুকুম দিচ্ছে। অন্যখানা শুধু সমুদ্রের ছবি—সমুদ্রে সূর্যোদয়।

মার্বেলটপ টেবিলটার উপর চাঁশবশবাতি একটা স্ট্যাণ্ডিং ল্যাম্প বা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছিল। সুন্দর আলোটি। ঝকঝকে রুপোর মতো নিকেল করা স্ট্যাণ্ডে সুন্দর লম্বা ফানুস। তার উপর সাদা শেড। বিলিতী জুয়েল মার্কা স্ট্যাণ্ডিং ল্যাম্প। এত সুন্দর সাদা আলো হয়েছে যে ঠিক যেন দিনের আলোর মতই ঝলমল করছে। একেবারে নিচের মহলের চাকর হরিধন এসে ঘরে ঢুকল। সে একটা বইয়ের প্যাকেট নামিয়ে দিলে টেবিলের উপর। বেশ বড়সড় প্যাকেট একটি। বললে ম্যানেজারবাবু পাঠিয়ে দিলেন। বাবু হুজুর ফর্দ দিছিলেন; সেই মতে সব বইই পাওয়া গেছে—ওই কি দুখানা যেন পাওয়া যায় নি। সে আবার আনায়ে দেবেন।

প্যাকেট খুলে অত্যন্ত খুশী হয়ে উঠল মন্মথ। ফোর্থ ক্লাসের সব বইগুলি আছে। দুখানা কি নেই বললে। কোন্ দু'খানা? ও! দুখানা মানে বই।

ব্ল্যাকিজ ইন্ডিয়ান রীডার, ইংলিশ গ্রামার—জুনিয়র কোর্স, ব্যাকরণ কৌমুদী প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, অ্যালজেবরা, এরিথমেটিক্স, ইউক্লিডস্ জিওমেট্রি ফোর পার্টস্, হিস্ট্রি জিওগ্রাফী অ্যাটলাস। নাই কেবল দুখানা মানে বই। সে না থাক।

কাকার প্রতি কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা ভালবাসার পরিমাণটা যেন মাথা তোলা বিন্ধ্য পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে উঠতে লাগল।

সে শ্রদ্ধা ভক্তি ভালাবাসা শুধু তার কাকার প্রতিই নয়, তার ওই কাকীমার প্রতিও বটে। ওই যে পতিত বা সমাজে নিচু মর্যাদার ব্রাহ্মণটির এই কন্যাটি, মনে মেজাজে দিলে সে রাজকন্যা রাজরানীর থেকে একবিন্দু খাটো নয়। কাকা তার যাই হয়ে থাকুক তার মূলে যে ওই কাকীমা তাতে আর কারুর কোনো সংশয় নেই।

বইগুলো ওলটাতে লাগল সে।

মনে পড়ল বিভূতিকে এবং সত্যকে।

প্রাণাধিকেষু—

অপার অশেষ সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনাপূর্বক লিখিতমিদং—সর্বপ্রকার আশা ও আনন্দের ভরসাস্থল শ্রীমান মন্মথকুমার বাবাজীবন অত্রপত্রমধ্যে আমাদের ভবনস্থ এবং তৎসহ গ্রামস্থ দেবী ও দেবতাদের নির্মাল্য বিল্বপত্র ও তুলসীপত্র প্রাপ্ত হইবা এবং মদীয় অন্তর উজাড় করা আশীর্বাদ গ্রহণ করিবা।

তোমার পত্র যথাসময়ে প্রাপ্ত হইয়াছি এবং বারংবার পাঠ করিয়া গভীর পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি বহুজনকেও পাঠ করিয়া শুনাইয়াছি। তোমার হস্তাক্ষর এবং পত্রের ভাব এবং ভাষা অতি উত্তম হইয়াছে। এ কথা সকলেই একবাক্যে বলিয়া গেলেন। কেবল চক্রবর্তীদের সেজ জন বলিল—হিন্দু ইস্কুলের ইংরাজী ছাপ পড়িয়াছে—"অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্বক" লিখে নাই—পরিবর্তে হাঁটু গাড়িয়া কি হেঁট হইয়া পায়ে হাত ঠেকাইয়া কপালে স্পর্শ লইয়াছে—লিখিয়াছে "সভক্তি প্রণতিপূর্বক নিবেদনমিদং—।" তাহাও অবশ্য নিজেদের বাটীতে বলিয়াছে। যাই হোক তুমি কোনো প্রকারে চঞ্চল হইবা না—আমি সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছি।

অদ্যাবধি এক বৎসর সাত মাস বারো দিন হইল তুমি গৃহ হইতে গমন করিয়াছ, এই কালের মধ্যে আমি অহরহই তোমার মুখমণ্ডল হৃদয়ে চিন্তা করিয়া থাকি, শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দন ও রাধাবল্লভেরশ্রীচরণযুগলতলে তাহাকে স্থাপন করিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিত রহিয়াছি। কলিকাতা বাটীতে পৌঁছিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলে—তাহার উত্তর আমি দিয়াছিলাম। ইহাই তোমার দ্বিতীয় পত্র। তোমার এবম্বিধ পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়া আমার হৃদয় মন পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

শ্রীমান্ জটাধর আমার প্রাণাধিক কনিষ্ঠ—আমার প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি। এবং বধূমাতাও সাতিশয় শ্রদ্ধাশীলা গুণবতী বধূমাতা। তাঁহাদের নিকট তোমাকে রাখিয়া আমি নিশ্চিন্তই থাকি। জটাধর আমাকে নিয়মিতভাবে পত্র দিয়া থাকে। উত্তর দিতে বিলম্ব আমার পক্ষ হইতে হয় কিন্তু তাহাতেই আমরা উভয় পক্ষই

পরিতুষ্ট ; জটাধর তোমার সকল সংবাদ দিয়া থাকে এবং আমি জানি সে কখনও এমন কোনো কর্ম করিতে দিবে না যাহাতে তোমার অমঙ্গল ঘটে বা আমাদের অর্থাৎ তোমার বংশের পিতা পিতৃব্য বা পিতামহ প্রপিতামহদের সুনামে কোনো প্রকার নিন্দা স্পর্শ করিতে পারে। আমি ইহাও চাহি না যে তুমি আমাকে পৃথক ভাবে পত্রাদি লিখ যাহা হইতে খুড়ামহাশয় ও খুড়ীমাতা ঠাকুরানীর মনে হইতে পারে যে তুমি পত্র লিখ তোমার ওখানে দুঃখ-কষ্ট যাহা হয় তাহাই জ্ঞাত করিবার জন্য। তুমি তেমত পুত্র নহ, তেমত মতি তোমার নহে। তথাপি সাবধান হওয়া ভালো। সংসারে প্রবাদবাক্য আছে—'মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ, ; মতিভ্রম বশত জননী সীতা দেবীর মতো মহীয়সী নারী লক্ষ্মণকে অন্যায় ও তীব্র নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়া স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়া লঙ্কাকাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সন্দেহ ভূমণ্ডলে প্রাণিগণের বিশেষ করিয়া মানবজীবনে কুটিলতম বিষ, ভুজঙ্গম বিশেষ অপেক্ষাও ইহা ভয়ানক। আমি তাহার অবকাশই দিতে চাহি না।

তোমার খুড়ামহাশয় আমাকে বার বার লিখিয়া থাকেন যে তোমার মেধা তোমার বিদ্যা বুদ্ধি সাতিশয় তীক্ষ্ন, বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহোদয়েরা তোমাকে মেধাবী ছাত্র বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইংরাজী ভাষার যোগ্য ব্যুৎপত্তি লাভ সম্ভবপর হইলে সহপাঠিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনীয় হইতে পারিবে—এ কথাও জটাধর লিখিয়াছে। একজন শিক্ষক বাটী আসিয়া ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিয়া যাইবেন—এইরূপ ব্যবস্থাও সে করিবে এমত আভাস দিয়াছে। এ সমস্ত জ্ঞাত হইয়া চক্ষে অশ্রু উদ্গত হইল, বক্ষ হর্ষোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইল। তোমার পরলোকগত মাতৃদেবীকে স্মরণ করিলাম। মনে মনে কহিলাম—তুমি রত্নগর্ভা ছিলে বলিয়াই এমত হইয়াছে। গভীর মনঃসংযোগ সহকারে ইংরাজীতে পাঠ লইবে। দেবভাষা সংস্কৃত আমাদের বংশের আয়ত্ত ভাষা। বংশানুক্রমে ইহার চর্চা আমরা করিতেছি। ইংরাজীতেও চেষ্টা করিলে অবশ্যই পারিবে। একটি কার্য করিবে —মনে মনে ব্যাণ্ডেল গির্জার চূড়া স্মরণ করিবে এবং মেরীমাতা ও তাঁহার ক্রোড়স্থ শিশু যীশুকে নিত্য স্মরণ ও প্রণাম করিবে। তুমি নিশ্চয় জান যে, এই গির্জা-ঘরখানি বাদশাহ আকবর শাহেরও পূর্বকাল হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে। এবং মাতা মেরীর যে ছবি ওই গির্জায় আছে তাহা বহুকাল পূর্বে জলমগ্ন হইয়াছিল ; এবং একখানি ছবি জলে ডুবিয়া ধ্বংস হইবার কথা সেই ছবি একদা রাত্রে গঙ্গার জোয়ারের মাথায় উঠিয়া যেন আরোহণ করিয়া পুনরায় এই গির্জায় আগমন করিয়াছেন। এবং এই গির্জার পাদরীকে বাদশাহ জাহাঙ্গীরশাহ হস্তিপদতলে নিক্ষেপ করিলেও সেই হস্তী বাদশাহের বা মাহুতের আজ্ঞামত তাঁহাকে হত্যা করে নাই তৎপরিবর্তে শুণ্ডদ্বারা তাঁহাকে সযত্নে কুড়াইয়া তুলিয়া নিরাপদ স্থানে স্থাপন করিয়াছিল। এই মেরীমাতা যীশুর জননী—আমাদের গণেশ জননীর মতো বা যশোমতীর মতো। ইংরাজী ভাষা খ্রীষ্টধর্মালম্বীদের ভাষা, যাহারা ইংরাজী পড়ে তাহারা প্রত্যেকেই মেরীমাতাকে ভক্তি করে। আমি অত্রসহ মেরীমাতার গির্জার উঠানের কিছু পরিমাণ রজঃ তোমাকে পাঠালাম। ইহা সযত্নে রক্ষা করিবে এবং নিত্য একবার করিয়া কপালে ঠেকাইয়া লইবে। ইংরাজীতে তুমি ব্যুৎপত্তি লাভ করিলে আমার গোপন মনোবেদনা অপনীত হইবে।

তোমার পত্র সকলে শুনিতে আসিয়াছিলেন। জটাধরের পত্রের কথাও সকলে অবগত আছে। বাগদী বউ এবং প্রমথের জন্য পত্রের কোনো কথাই গ্রামে কাহারও

অগোচর থাকে না। অহংকার করিতে নাই—আত্মপ্রশংসা পাপ ইহা বার বার বলা সত্ত্বেও তাহারা ও তত্ত্ব বুঝে না, বড়গলা করিয়া বলিয়া বেড়ায়। তাহাতে লজ্জাই হয়; ভগবানের নিকট মার্জনাও ভিক্ষা করি কিন্তু চক্রবর্তীরা এই লইয়া যখন ব্যঙ্গ করে তখন মনঃকষ্ট ভোগ করি। চক্রবর্তীরা সাহেবদিগের আপিসে ব্যবসায় সূত্রে যায় আসে—ইদানীং পয়সাতেও বাড়িতেছে—সেই হেতু তাহারা বলে 'অনুস্বারং নহেং বিসর্গংও নহে'; উদোর পিণ্ডং বুদোর ঘাড়ের বিদ্যা নহে। ইহা সাহেবী বিদ্যা। অদৃষ্টদোষে এবং কালমাহাত্ম্যে এ সকলই শ্রবণ করিতে হয় এবং সহ্যও করিতে হয়। মধ্যে মধ্যে উহাদিগের কথাই সত্য বলিয়া মনে হয়। এতকাল স্বধর্মে নিষ্ঠার সহিত অধিষ্ঠিত থাকিয়া কি হইল? আজ লোকচক্ষে সমাজের সর্বস্তরে কেবল মাত্র 'পুরুতঠাকুর' মশায় বলিয়া আতপ চাল কলা কচু প্রভৃতির প্রাপক বলিয়া গণ্য হইলাম। হুগলী চুঁচুড়া চন্দননগরে সায়েবদিগের কুঠির সরকারগুলা ইংরাজী বুলি শিখিয়া অনর্গল আওড়াইয়া হাটে বাজারে প্রবল প্রতিপত্তি জারি করিতেছে—মোটা মোটা টাকা উপার্জন করিয়া সম্পত্তি ক্রয় করিতেছে—দেশে গণমান্য হইতেছে। এ বৎসর আমাদের চক্রবর্তীরা শুনিতেছি একটা বড় জোত খরিদ করিবে।…গঞ্জের বাবুরা জাহাজে অস্পৃশ্য মাংস সরবরাহ করিয়া লক্ষপতি হইয়া গেল। ওদিকে খানাকুলে অন্তঃপাতী রাধানগরের রায় বংশের পুত্র রাজা রামমোহন সতীদাহ প্রথা নিবারণ করিয়া অমর হইয়াছেন শুনিতেছি। অথচ চুঁচুড়ার গঙ্গাচরণ সরকারের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সেই সাক্ষাৎ ভগবতী মাহাত্ম্য পূর্ণ অলৌকিক সেই সহমরণের বৃত্তান্তসমুদয় আজ লোকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছে। তেমত কোনো উজ্জ্বল সতী মহিমা অতীত কালেও অতি স্বল্প কয়েকটিই মাত্র অনুষ্ঠিত হইয়াছে—তাহার অধিক নয়। অবশ্য এই ঘোর কলিকালে ধর্ম স্বয়ং সূর্যদেব যেমতি নিজ হইতেই দিবান্তে অস্তগমন করেন তেমতি অমোঘ নিয়মে হীনপ্রভ হইয়া অস্তমিত হইতে চলিতেছেন। দেবস্থলগুলি কলুষিত। দেবস্থলের পাণ্ডা মহান্ত পুরোহিতেরা দেবতাকেই সম্মুখে শিখণ্ডীর মতো স্থাপন করিয়া পাপাচার করিতেছেন। এত বড় দেবতাস্থল সাক্ষাৎ কৈলাসতুল্য ধাম তারকেশ্বর, সেখানে এইতো এখনও ৫০ বৎসর হয় নাই—সেখানে মাধবগিরিকুমরুল গ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ ৺নীলকমল মুখোপাধ্যায়ের বিবাহিতা কন্যা এলোকেশীর সতীত্বনাশ করিল। তাহাতে দেবতার ক্রোধের কোনো প্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হইতে কেহ দেখিল না। এলোকেশীর স্বামী তাহাকে ওই পাপাশয় মহান্তের হাত হইতে রক্ষা করিতে কোনো পথ না-পাইয়া অবশেষে হত্যা করিয়া পরিত্রাণ দিল। মহান্ত সতীর সতীত্ব নাশ করিয়া অল্প কয় বৎসর জেল খাটিল। আবার ফিরিয়া মহান্তের গদি পাইল। ওদিকে নিজের স্ত্রীকে রাক্ষসের মতো এই লোকটার হাত হইতে রক্ষা করিতে উপায়ান্তর না দেখিয়া স্ত্রীকে হত্যা করিল বলিয়া নবীনের দীপান্তর হইল। শত শত লোকের দরখাস্তেও কিছু হইল না।

এ সকলই কালমাহাত্ম্য। এই কালমাহাত্ম্যকে অনেককাল উপেক্ষা করিয়াছি আমরা। গোবিন্দপুরের ভট্টাচার্য বংশ কখনও যজন যাজন টোলে দেবভাষার অধ্যাপনা দেবসেবা স্মৃতি শ্রুতি ন্যায় চর্চাকে উপেক্ষা করে নাই। আমার পিতামহের মাতুলেরা ভালো ফারসী আরবী শিখিয়া কানুনগো হইয়াছিলেন, থাকিতেন হুগলীর ফৌজদার কাছারীতে। ফৌজদার মহারাজা নন্দকুমারের তিনি

খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি আমার পিতামহকে ফৌজদার সেরেস্তায় নকল-নবীশের কার্য দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাহা আমার পিতামহ লয়েন নাই। তাঁহার অর্থাৎ পিতামহের মাসতুত ভাই বলাগড়ের সন্নিকটস্থ চাটুজ্জে বংশের সন্তান তিনি সেই চাকুরী লয়েন এবং সেই চাকুরী হইতে ক্রমে ক্রমে রাজা নন্দকুমারের উন্নতির সঙ্গে নিজের অদৃষ্ট ফিরাইয়া লইয়াছিলেন। এখন তো তিনি একজন বড় তালুকদারে পরিণত হইয়াছেন। তাঁহাদের বংশধরেরা সেই অবধি শহরের কাছে কাছে আছেন। বাদশাহী নবাবী আমলে ফারসী আরবী উর্দু শিখিয়াছিলেন—এক্ষণে কোম্পানির আমলে তাঁদের বংশধরেরা ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করিয়া চাকুরীর ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অতি সহজেই প্রতিষ্ঠা এবং ভূমি সম্পত্তি অর্জন করিয়া দেশে সমাজে গণ্যমান্য হইতেছেন। পরলোকে স্বর্গে অবশ্যই ভক্তি, নিষ্ঠা ও কুলধর্ম পালনের জন্য ভগবান্ পিতা পিতামহগণকে উচ্চলোকে স্থান দিয়াছেন কিন্তু ইহলোকে তাঁহারা বড়ই সসংকোচে এবং সাচ্ছল্য-রহিত অবস্থায় জীবনাতিপাত করিয়া গিয়াছেন। আমার মাতাঠাকুরানীর একখানি বালুচরের শাড়ি ছিল। শাড়িখানি বিবাহের সময় আমার মাতামহের একজন শিষ্য দিয়াছিলেন। সেই শাড়িখানি তাঁহার একবার বাটীতে চোরে সিঁদ কাটিয়া অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। আমার বয়স তখন পাঁচ বৎসর। মাতাঠাকুরানীর বয়ঃক্রম তখন কুড়ির অধিক হইবে না। তিনি সারা দিনরাত্রি ক্রন্দন করিয়াছিলেন। এবং পরবর্তী কালে প্রতিবৎসর পূজার সময় সপ্তমী প্রভাতে কাপড় ছাড়িবার সময় তিনি ক্রন্দন করিতেন। আমার বাবা তাঁহাকে আর একখানি বালুচরের শাড়ি কিনিয়া দিতে সক্ষম হয়েন নাই। আমার বিবাহের সময় তাঁহার ইচ্ছা ছিল পুত্রবধূকে বালুচরের শাড়ি দিয়া বরণ করেন। কিন্তু তাহা হয় নাই। আমিও তাঁহার সাধ পূর্ণ করিতে পারি নাই।

তুমি সংশয় প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছ তুমি কলকাতা বাটীতে ব্রাহ্মণের আচার আচরণসমূহ যথাবিধি পালন করিতে পারিতেছ না এবং তোমাদের ইংরাজী শিক্ষক মহোদয় তোমাকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছেন—"সংস্কৃতপড়া বংশের জিহ্বায় ইংরাজী উচ্চারণ শুদ্ধ হয় না—এজন্য তোমাকে ইংলন্ডের কোনো নদীর জল তিন মাস নিত্য পান করিতে হইবে।" তাহা বলুন। তাহার জন্য নিরুৎসাহ হইবা না। বোপদেবের দৃষ্টান্ত স্মরণে রাখিয়া সযত্নে পাঠাভ্যাস করিবা। যদি আদৌ কলিকাতা না-যাইতে তাহা হইলে কথা ছিল, যাহা হইত তাহা হইত। কিন্তু যখন গিয়াছ তখন হইল না বলিয়া ফেরা চলিবে না। জটাধরই পথ সুগম করিয়া দিয়াছে। সে সংস্কৃত জানিত না। বাংলাও শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারিত না। সে বাণিজ্য ব্যপদেশে দিব্য ইংরাজী বলিয়া থাকে এবং লেখে। সুতরাং তুমি পারিবে না ইহা কোনোমতেই হইতে পারে না। তোমাকে পারিতেই হইবে। না-পারিলে তোমার ইহকাল গেল—আমার ইহকাল পরকাল দুইই যাইবেক। গোবিন্দপুরের ভট্টাচার্যদের পূর্বপুরুষেরা পরলোকে আধোগামী হইবেন। অনেকদিন যাবৎ ইহার সমুদয় বৃত্তান্ত তোমাকে ও জটাধরকে জানাইব মনস্থ করিয়াও তোমাদিগকে জানাই নাই। অদ্যও জটাধরকে জানাইতে সংকোচ বোধ হেতু জানাইলাম না।

জটাধরের সঙ্গে তুমি কলকাতা যাইবার পূর্বে সেদিন রাত্রে তোমাকে কতকগুলি কথা বলিয়াছিলাম—তাহা তোমার অবশ্যই মনে আছে। আচরণে বা কর্তব্য

পালনে তাহা কার্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়া থাক বা না-থাক, বিস্মৃত হইবে এমত হইতে পারে না। প্রমথ আমার পাশে ঘুমাইতেছিল, তুমি আমার কোলের কাছে বসিয়া ছিলে। আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম কঠোপনিষদের যম নচিকেতা উপাখ্যানের কথা; বলিয়াছিলাম—কলিকাতায় অন্ন বস্ত্র বিলাসবিভ্রমস্বর্ণ রৌপ্য মণি মাণিক্য তৎসহ দেবকন্যাতুল্য রমণীকুলের উপচার উপঢৌকন সাজানো আছে ইহাই সর্বলোকে বলিয়া থাকে। ইহার দ্বারা ইহলোক কয়েক দিবসের জন্য উজ্জ্বল ও সমারোহপূর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু বিত্ত খাদ্য নারীর দ্বারা জীবন ধন্য হয় না। ইহা মনে রাখিয়ো। নচিকেতা সেই প্রলোভন জয় করিয়া অমৃতের অধিকারী হইয়াছিলেন। তুমি তাই করিয়ো। প্রমথ ঘুমায় নাই, সে কথাটা চোখ বুজিয়া সব শুনিয়াছিল। এবং তুমি চলিয়া যাইবার কয়েক মাসের মধ্যেই গ্রামে সকলের নিকট প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছে। সব জড়াইয়া জট পাকাইয়া একটা বৃহদাকার লজ্জার বোঝা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লোকে বলিতেছে, জটাধর ব্যবসা করিতে গিয়াছে—সে কলিকাতায় মুৎসুদ্দীদের হটাইয়া দিয়া বড় মুৎসুদ্দী হইবে। কলিকাতার সুবর্ণ বণিকদের মধ্যে প্রধানদের সঙ্গে নাকি ইতিমধ্যেই দহরম মহরম হইয়াছে। লাহা-রাজবাড়ি, মল্লিক-রাজবাড়িতে তাহার খাতির। কেহ কেহ বলে জটাধরের জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে নাকি জরি ও সাচ্চার কাজ করা জুতা পরিয়া গানের মজলিসে নিমন্ত্রণ রাখিতে হয়।

তোমার সম্পর্কে ইতিমধ্যেই লোক বলিতেছে—আমি তোমাকে বিদ্যাসাগর করিবার জন্য কলিকাতা পাঠাইয়াছি। তুমি দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর হইবে। কেহ বলিতেছে বিদ্যাসাগর পুরাতন হইয়া গিয়াছে—তুমি একালে তাহা অপেক্ষাও বড় দিগ্‌গজ হইবে। কেহ বলিতেছে জটাধর তোমাকে বিলাত পাঠাইবে।

কেবল মাত্র তোমার জিহ্বায় ইংরাজী উচ্চারণ বিশুদ্ধ হইতেছে না বলিয়াই মুশকিল হইয়াছে। তোমাদের ক্লাসের ইংরাজী শিক্ষক তোমাকে এই লইয়া পরিহাস করিয়াছেন—এই কথাটা এ অঞ্চলময় লোকে বলাবলি করে ও মুখ টিপিয়া হাসে ইহা সহ্য করিতে আমার কষ্ট হয়। সেই কারণেই আমার ইচ্ছা তুমি ইংরাজী শিক্ষা করিয়া একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি হও। উকীল হও ডাক্তার হও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হও। বিলাত যাও বলিতে আজও পারি না, ভবিষ্যতেও পারিব বলিয়া মনে হয় না। জাতি বাঁচাইয়া তুমি গোবিন্দপুরের ভট্টাচার্য বংশের মুখ এমন উজ্জ্বল কর যাহাতে ওই শফরী তুল্য চক্রবর্তীগণ—যাহাদের কোনো কুলগৌরব নাই, যাহারা পূর্বে শূদ্রযাজক এবং একধরনের ভিক্ষাজীবী ছিল তাহাদের লম্ফঝম্পাদি সব চুপ হইয়া যায়।

পরিশেষে জানাই যে তোমাদের বাগদী মাসী আজ মাসাধিক কাল কঠিন ব্যায়রামে পড়িয়াছে। সেই কালো পুরাতন কম্পজ্বর যাহার ইংরাজী নাম ম্যালেরিয়া, তাহাতেই সে অনেকদিনই ভুগিতেছে—আজ দেড় বৎসর কঠিনভাবে চাপিয়া ধরিয়াছে। পেটে পেটজোড়া প্লীহা হইয়াছে; যকৃতের গোলমাল হইতেছে। হাত পায়ের বর্ণ শণের মতো হইয়াছে। পনের দিন অন্তর জ্বর হয়। আমাদের এ অঞ্চলটাই এ জ্বরে ছাইয়া গেল। যাহাদের সঙ্গতি আছে তাহারাই গ্রাম ছাড়িয়া শহরে চলিতেছে। যাহার যেমন অবস্থা। ভালো অবস্থা যাহার তাহারা ছুটিতেছে কলিকাতায়। মাঝারি অবস্থার লোকেরা চুঁচুড়া হুগলী চন্দননগর শ্রীরামপুর অঞ্চলে যাইতেছে। আমাদের গ্রামের পাঁচ সাত ঘর এইরূপভাবে

গ্রাম ছাড়িবার ব্যবস্থা করিয়াছে। চুঁচুড়া হুগলীর আদালতে উকীল মোক্তারের টন্ডীগিরি করে কায়স্থদের গোপেশ্বর কৃষ্ণলাল—হুগলীর বাজারে দালালি করে সদ্‌গোপদের গোপাল ঘোষ; মাহিষ্যদের প্রেমলাল ধাড়া ধান চালের কোহালী করিত চন্দননগরে; সকালে নৌকায় রওনা হইয়া যাইত—সন্ধ্যায় নৌকাতেই বা রেলগাড়িতে বা পদব্রজে বাড়ি ফিরিত; তাহারা এক্ষণে শহরে বাসা করিতেছে। ইহারা ছাড়াও চাষীবাসী মোটা গৃহস্থেরাও শহরে যাইতেছে। মুখুজ্জেদের দুটি ছেলে এবার মাইনর পাস করিয়াছে—তাহাদের মহসীন কলেজের ইস্কুলে ভর্তি করিয়া ওখানে বাসা করিয়াছে। আমাদের বাড়িতে আমি শিউলী গাছের পাতার রস ও মকরধ্বজ খাইয়া কোনো রকমে নিজেকে খাড়া রাখিয়াছি। প্রমথকে নিয়মে রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পারি না। সে অনিয়ম করে, জ্বর হইলে অনিয়ম বাড়ে, অম্বল খাইতে বারণ—সে তেঁতুল ও নুন লুকাইয়া রাখে ও খায়। আমড়া খায়। ছোলা ভাজা মটর ভাজা তেল লংকা মুড়ি খাওয়ার পরিমাণ বাড়ে। মুড়ি খাইলে প্লীহা বাড়ে বলিলেও তাহা সে শোনে না। ডাক্তারের একমাত্র ঔষধ কুনিয়ান, তাহা খাইয়া সমস্ত শরীর তিক্ত হইয়া গেল। পাচড়া খোস চুলকানিতেও ভুগিতেছে। ইহাই দেশের অবস্থা। ঘরে ঘরেই জ্বর তবে গরীবগুণার দুর্ভোগের আর শেষ নাই। কবিরাজী কেহ খায় না। উহাতে বিশ্বাস নাই।

তোমাদের বাগদী মাসীর বড় নাতনীটা দুইটা ছেলে লইয়া গত বৎসর বিধবা হইয়াছিল, এ বৎসর দুইটা ছেলেই গেল। মেয়েটা এক্ষণে প্রায় পাগল হইয়াছে; বাগদী বউয়ের বড় ছেলে হরিশ ফুলিয়াছে। কবিরাজ বলিয়াছে শোথ। বাগদী বউ ভুগিয়া ভুগিয়া এই কংকালে পরিণত হইয়াছে। মনে হইতেছে এবার আর পার হইবে না। এই তো ভাদ্র মাসের প্রথম। পাট কাটিয়া জলে জাগান দেওয়া শুরু হইয়াছে। ঝাঁকে ঝাঁকে মশাও জন্মিয়াছে। সকালবেলা মানুষের মাথার উপরে ঝাঁকবন্দী মশা ওড়ে। কিছুদিন মধ্যেই জ্বর আরম্ভ হইবে। কার্তিক অগ্রহায়ণে যে কি অবস্থা হইবে তাহা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিতেছি। ইহার মধ্যে পূজার সময় জটাধর ও বধূমাতা পশ্চিম অঞ্চলে মধুপুরে শরীর সারাইতে যাইবেন, তোমাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছেন—ইহা আমার কাছে উত্তম প্রস্তাব বলিয়াই মনে হইল। তুমি ইহাতে স্পষ্টভাবেই 'কিন্তু' করিয়াছ; তাহার কারণও বুঝিলাম। গত বৎসর পূজার সময় তুমি বাটী আইস নাই, খুড়া-খুড়ীর সঙ্গে পুরীধামে গিয়াছিলে—এবারও আসিবে না ইহা তোমার নিজের নিকট কেমন-কেমন লাগিতেছে। লাগিবারই কথা। কিন্তু গোটা দেশ জুড়িয়াই এখন এমত রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লোকেদের বিশ্বাস দুর্বল হইয়াছে। আর লোকেদেরই বা দোষ কি বল? এই ম্যালেরিয়া মহামারীর মধ্যে জগজ্জননীর পূজার আয়োজন করেই বা কে আর করেই বা কিদিয়া? আশ্বিন মাস আসিতেআসিতে দেশের অবস্থা ভয়ংকর হইয়া উঠিবে। ইহার মধ্যেই ঘরে ঘরে রোগশয্যা পড়িতেছে। কাঁথা কম্বল চাপা দিয়া প্রবল কম্পজ্বর আসিতেছে। মাসখানেকের মধ্যেই লোক মরিতে শুরু হইবে। এ বাড়িতে কেহ মরিবে বা ও বাড়িতে কাহারও মরিবার পূর্বে হিক্কা উঠিবে। কাহারও বাড়িতে শ্রাদ্ধ হইবে; অশৌচ চলিতেছে। কাহারও ঘরে শ্রাদ্ধ সদ্য শেষ হইয়াছে, এমত হইবে। এমত সময় গ্রামে পূজা উঠিয়া যাইতেছে। বড়লোকেরা, কেহ লোক মারফত পূজা করাইতেছেন, কেহ শহরে নূতন বাটীতে পূজা উঠাইয়া লইয়া যাইতেছেন, ইঁহারা দু'চারজন মাত্র; অধিকাংশেরাই

উঠাইয়া দিতেছেন। দেবতা কৃপা না-করিলে দেবভক্তিই বা মানুষ কোথা হইতে অর্জন করিবে?

পূর্ব পূর্ব কালে এ পূজার মহিমা ছিল অপার। গরীবের বাড়ি পূজা হইলে গোটা গ্রামে বা তিন চারখানা গ্রামের লোক আয়োজন করিয়া বহিয়া আনিয়া পূজা করাইয়া প্রসাদ পাইত। যাহার আছে তাহারা ভাণ্ডার খুলিয়া দিত। দেশান্তর হইতে গৃহস্বামী ছুটিয়া আসিত এই জগজ্জননীর পূজার জন্য। তুমি সম্ভবতঃ জান না, নবাবী আমলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাকী রাজস্বের জন্য নবাবের বন্দীশালায় আটক হইয়াছিলেন। কোনো উপায় নাই, উদ্ধারকর্তা বলিয়াও কাহাকেও মনে করিতে পারেন না; মনে পড়িল শুধু মাকে। বিশ্বেশ্বরী জগদম্বা ছাড়া কে রক্ষা করিতে পারে! অবশেষে মুক্তি পাইলেন। সময়টা শরৎকালে অম্বিকার্চনার শুক্লপক্ষে। পিতৃপক্ষের অমাবস্যা অন্তে আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ সবে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। মহারাজ আকাশের দিকে চাহিয়া চাঁদ দেখেন আর হিসাব করেন—আজ তৃতীয়া পরদিন চতুর্থী। মহারাজ দ্রুতগামী ছিপ লইয়া রওনা হইলেন কৃষ্ণনগরে; সপ্তমী ভোরে পঁহুছিতেই হইবে। মায়ের পূজা করিবেন। ঘাটে ঘট পূর্ণ করা হইতে বিসর্জন অবধি উপস্থিত থাকিবেন। কিন্তু প্রভাতে একখানি গ্রামের ঘাটে বাদ্যভাণ্ড এবং লোকজন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন উক্ত দিবসই শ্রীশ্রীদুর্গা-সপ্তমী—তাহারা ঘট ভরিতেছে। বড়ই নিরাশ হইলেন মহারাজ; মনে মনে ক্রন্দন করিয়া কহিলেন—কোন্ অপরাধে পূজা লইলে না মা! স্বপ্নাদেশ হইল—কার্তিক মাসে শুক্লানবমীতে জগদ্ধাত্রীরূপে তোমার পূজা লইব। মহারাজ নবদ্বীপের পণ্ডিতদের একত্রিত করিয়া জগদ্ধাত্রী পূজা করিলেন। ইহা হইতেই এ অঞ্চলে এত জগদ্ধাত্রী পূজার সমারোহ। চন্দননগরে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় জগদ্ধাত্রী মাতার পূজার প্রবর্তন করেন। এই সব কারণে শারদীয়া দশভুজা পূজা উৎসাহহীন হইয়াছে। জগদ্ধাত্রী পূজাতেও সমারোহ আছে—ভক্তি ইত্যাদি নাই। এককথায় সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই; সে বিশ্বাস ভক্তিও নাই, মাও আসেন নাই। সুতরাং এই পূজার সময় আশ্বিন মাসে তুমি জটাধরের ও বধূমাতার সঙ্গে মধুপুর মোকাম গমন করিলে ভালোই করিবে বলিয়া মনে করি।

জটাধরের সঙ্গে ইতিপূর্বেই আমার পত্রযোগে এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যাত্রার পূর্বেই প্রমথকেও কলিকাতায় পাঠাইয়া দিব; সে আজ ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর এই ম্যালেরিয়া রোগে নিরন্তর ভুগিয়াই চলিয়াছে। কুনিয়ান সেবন করিয়া করিয়া তাহার চেহারা অত্যন্ত রুক্ষ হইয়াছে, পেটে পেটজোড়া প্লীহা হইয়াছে, মাথার চুল উঠিয়া গিয়াছে, চিকিৎসকেরা বলিতেছেন—সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ঔষধ হইল বায়ু পরিবর্তন। বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চলে মধুপুর বৈদ্যনাথ প্রভৃতি অঞ্চলের জলবায়ু খুবই ভালো। এই জলবায়ুই এ রোগের শ্রেষ্ঠ উপকারক ঔষধ। প্রমথ এক্ষণে আমার পক্ষে সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে বালক, শৈশবে মাতৃহারা; আমিই তাহাকে কোলেপিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছি—আর ওই বাগদী বউ। আমার নিকট থাকিলে সে কোনোমতেই এ-কালের উপযুক্ত মানুষ হইতে পারিবে না, ইহা নিশ্চিত কিন্তু সেও আমাকে ছাড়িয়া থাকিবে না, আমিও তাহাকে ছাড়া থাকিতে পারি না। অন্যথায় জটাধরের কাছেই তাহাকে দিয়া আসিতাম। ইহার উপর বাগদী বউ আমাকে ভয়

দেখাইয়া থাকে, সে বলে—তোমার স্বর্গগতা মাতা মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়া বাগদী বউকে বলেন—যেন কদাপি প্রমথকে ছোটবধূমাতার নিকট পাঠানো না-হয়। পাঠাইলে সে বাঁচিবে না, মরিয়া ছোটবধূমাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। তিনি নাকি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—প্রমথ তাঁহার গর্ভে জন্মিয়া মাতৃস্তন্য এবং মাতৃক্রোড় ও স্নেহ পায় নাই; সেজন্য ছোটবধূমাতার স্নেহ এবং যত্ন পাইলে সে তাহার গর্ভে জন্মিতে ইচ্ছা করিবে। করিলেই তাহা হইবে। কারণ প্রমথের নাকি দেব অংশে জন্ম। বাগদী বধূকে বিশ্বাস ঠিক করিতে পারি না কিন্তু অবিশ্বাসও করিতে পারি না। সেই হেতুই মনস্থির করিতে পারিতেছি না। অন্যথায় তাহাকেও স্থানান্তরে পাঠানো উচিত। সুতরাং পূজার সময়ে আমার নিকট আসিবার সংকল্প করিয়ো না। আমিও ব্যস্ত থাকিব। পূজার পূর্বে একবার শিশ্যবাটী গমন পর্ব আছে। তাহার পর পূজায় ব্রতী হইয়া পূজার কয়েক দিন যজমান গৃহে আটকাইয়া থাকিব। প্রমথকে আমি সঙ্গে লইয়া যাই। পূর্বে তুমিও যাইতে; এখন আর কি তুমি সেই যজমান বাটীতে গিয়া বাবুদের ছেলেদের মধ্যে হংসমধ্যে বকের মতো থাকিতে পারিবে? এ সময় তোমার না আসাই ভালো।

দেশে আসিবার পক্ষে বড়দিনই প্রশস্ত সময়। আপিস কাছারী বিদ্যালয় প্রভৃতি একসঙ্গে দশ বারো দিন বন্ধ থাকিবেক। ধানপান উঠিবে। বিদেশে যাঁহারা থাকেন তাঁহারা সকলেই প্রায় এই সময়েই আসেন। পৌষ মাস হইলেও বারোয়ারি কালী পূজার চলন প্রায় প্রচলিতই হইয়া গিয়াছে। বহু উৎসবাদিও হয়। তোমাদের পরীক্ষাদিও শুনিয়াছি ঠিক তৎপূর্বেই অগ্রহায়ণ মাসে শেষ হইয়া যায়; অধ্যয়নাদির খুব একটা বড় চাড় চিন্তা থাকে না। আর এক আছে জগদ্ধাত্রী পূজার উপলক্ষ্য। এই পূজার কথা আগেই লিখিয়াছি। তুমিও জান তুমিও দেখিয়াছ। আমার সঙ্গে, যজমানদের পূজাবাড়িও সে কালে গিয়াছ। সে সময় বিপুল ধুমধাম হয়। কিন্তু ওই দুই দিনের পূজা। তখন আবার তোমাদের পড়া আছে। আর এক আসিতে পার গ্রীষ্মের সময় গরমের ছুটিতে। তখন অবশ্য তোমাদের ছুটি থাকে শুনিয়াছি এক মাসেরও অধিক কাল। দেশেও ফল-সম্ভার পাকিতে থাকে। আমাদের বাড়ির পিছনের যে খাস-বেলের বীজ-হইতে জন্মানো গাছটাকে তোমার মা যত্ন করিয়া পুঁতিয়াছিল সেই গাছটায় অতি উত্তম দুর্লভ জাতের সাতটি ফল জন্মিয়াছিল। তাহার চারটিই দিয়াছি বিভিন্ন দেবস্থলে। বাবা তারকেশ্বরের নিকট আমি নিজে গিয়াছিলাম—১লা বৈশাখ বাবার মাথায় চড়াইয়া আসিয়াছি। চুঁচুড়ায় ষাঁড়েশ্বরকে একটি দিয়াছি। অরণ্যষষ্ঠীর দিন চুঁচুড়া ধরমপুরে মহিষমর্দিনী মায়ের পূজায় একটি দিয়াছি। একটি দিয়াছি গ্রামের বুড়াকে, চড়কের দিন। বাকি তিনটিতে গোবিন্দ ও জনার্দনের বৈশাখী শীতলে শরবত করিয়া প্রসাদ বিতরণ করিয়াছি। গাছের যাহা অবস্থা এবং যাহা গুটি দেখিতেছি তাহাতে মনে হইতেছে আগামী বৈশাখে অন্ততঃ ত্রিশ চল্লিশটি বেল হইবে এবং এবার জাতেও বড় হইবে। তখন গাছে আম থাকিবে, জ্যৈষ্ঠে জাম পাকিবে; লিচুর ও জামরুলের গাছেও ফল পাকে তখন। সে-সব দিক দিয়া গরমের কালই আসিবার পক্ষে প্রশস্ত সময়। ম্যালেরিয়াও জব্দ থাকে। ভয় শুধু ওলাউঠা মহামারীর। বৈশাখ হইতে পর্বে পার্বণে এক একটা গঙ্গাস্নানের পর্ব আসে আর গাঙের ঘাটে হাজারে হাজারে স্নানার্থী আসিয়া তেলেভাজা

বেগুনী ফুলুরী পাঁপর পাকা পচা আম কাঁঠাল প্রভৃতি ফলগুলো খাইয়া ওলা ধরাইয়া বাড়ি ফিরিয়া খড়ের ঘরের গ্রামে আগুন ধরাইয়া দেওয়ার মতো রোগটাকে ছড়াইয়া দেয়। এবার আমাদের গ্রামে আঠারোজন মারা গিয়াছে। এবার রোগটা আনিয়াছিল ওই চক্রবর্তীরা। চক্রবর্তী বাড়ির সেজ ভাইয়ের দুই ছেলের গতবার উপনয়ন হইয়াছিল—এবার ছেলেদের লইয়া দণ্ডী ভাসাইবার জন্য গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল। সেই সময়েই পড়িয়াছিল দশহরা। খুব ধুমধাম করিয়া প্রায় বাড়ি-সুদ্ধ লোক নৌকা করিয়া চুঁচুড়া গিয়াছিল। দশহরায় স্নান দণ্ডী ভাসানো ষাঁড়েশ্বরে জল দেওন প্রভৃতির জন্য প্রায় গোটা বাড়িটাই গিয়াছিল—পাড়ারও দু'চারজন গিয়াছিল। ছেলে দুইটার ভিক্ষামায়েরাও গিয়াছিল। পাশের গ্রাম চক দইপাড়ার কায়স্থবাড়ির বিধবা মেয়েরা ছেলেদের মুখ দেখিয়াছে—তাহারাই সব খরচপত্র করিয়াছে। শুনিয়াছি ভিক্ষেমায়েরা সঙ্গের লোকদের পণ দরুনে আম এবং গোটা গোটা কাঁঠাল কিনিয়া দিয়াছিল। ফলে তৃতীয় দিনেই চক্রবর্তীদের বিধবা পাচিকার প্রথম ব্যাধি হয়। তৎপর ওখান হইতে গ্রামে আসিতে আসিতে একজন চাকর পড়ে। বাড়িতে আসিয়া এক এক করিয়া সাতজনের ব্যায়রাম হয়। কোনোক্রমে তিনজন সারিয়া উঠিয়াছে। বাকী চারজন গিয়াছে। গোটা গ্রামে অতঃপর ব্যাধি ছড়াইয়া প্রায় পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন জন রোগাক্রান্ত হয়। তাহার মধ্যে আটাশজন মারা গিয়াছে। চক দইপাড়ার কায়স্থবাড়ির মেয়ে ছেলেদের ভিক্ষা-মায়েদের একজন মারা গিয়াছে। সর্বাপেক্ষা দুঃখের কথা চক্রবর্তীদের ছোট ছেলের দ্বিতীয়পক্ষের বউটি মারা গেল।

আজ সাত দিন ধরিয়া তোমাকে অত্র পত্রখানি লিখিতেছি। কিছু কিছু করিয়া লিখিতে লিখিতে এত বড় পত্র হইয়া গেল। আজ দেশ হইতে গিয়াছ দেড় বৎসরের উপর—এক বৎসর সাত মাস উনিশ দিন। লিখিয়া যেন লেখা শেষ হয় না। যাহা হউক অদ্য শেষ করিব এবং ভায়াজীবন জটাধরের সরকার মহাশয়ের হাতে দিব। সরকার নিজে স্বচক্ষে রাধাপুরের গোলাণ্ডীদের জমিজেরাত তদারক করিয়া দেখিল। অন্য কাহারও কাছে কোনো রূপে দায়বন্ধ আছে কিনা তৎ-সমুদয়ও তদন্ত করিয়া সন্তুষ্ট হইল। সেও এই জমি খরিদ করার পক্ষেই অভিমত প্রকাশ করিল। জটাধর এই সম্পত্তি রাধাবিনোদজিউ এবং লক্ষ্মীজনার্দনের নামেই কিনিতে চায়। আমি বুঝিতে পারিতেছি না ইহাতে আমার কি করা উচিত! কারণ বহুকাল পূর্বে সে যখন দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় তখন তাহার অংশের জমি দেবত্র সমেত বিক্রি করিয়াছিল। আমি আপত্তি করি নাই। দেবসেবা একক আমি চালাইয়াছি। পরে চক্রবর্তীরা আমাদের ঠাকুরের অংশ কিনিবার চেষ্টা করিলে, জটাধর পাছে তাহাদের বিক্রয় করে এই আশঙ্কায় আমিই জটাধরের কাছে লিখাইয়া লই। এখন আবার সে সম্পত্তি কিনিলে এবং সম্পত্তি দেবতাকে অর্পণ করিলে সেই অগ্রের অবস্থাই আসিবে। এ কালটা নূতন কাল। এ একটা দুর্বোধ্য কাল জটিল কাল। আমার মতো সেকেলে মনুষ্যেরা এ কালকে বুঝিতে পারে না। জটাধর আমাপেক্ষা মাত্র কয়েক বৎসরের ছোট—তথাপি সে এই নতুন কালের লোক; তাহার এই সম্পত্তি-ক্রয় ইত্যাদি দেবভক্তি হেতু নয়, অত্র স্থানীয় সমাজে ও অঞ্চলে পূজাপার্বণে সমারোহাদি করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জনই তাহার উদ্দেশ্য, ইহা বিশেষ স্পষ্ট। তাহার সরকারও বলিতেছিল—বাবুর ইচ্ছা এই যে এখানে সম্পত্তি কিনিয়া দেবত্র করিয়া দিয়া তাহার আয়ে ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করা

দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা এবং আমার মত থাকিলে একটি বালিকা পাঠশালা স্থাপনেও তাহার আগ্রহ আছে। অবশ্য টোল আমাদের আছে। তাহাও থাকিবে। এই লইয়া ক্রমান্বয়েই নানাকথা ভাবিতেছি এবং লিখিতেছি আজ। আবার পত্র আসিল, তাহাতে দেখিতেছি জটাধর পূজাতে মধুপুর যাত্রা স্থগিত রাখিয়া বায়ুপরিবর্তন ও দেশভ্রমণের নিমিত্ত বারাণসী কাশীধাম যাইবার মনস্থ করিয়াছে। তোমাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছে। প্রমথকেও পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে। সরকারকেও কলিকাতা ফিরিবার জন্য পত্র দিয়াছে। সে আগামী কল্য কলিকাতা বাটী রওয়ানা হইবেক। সেই হেতু আমিও এই পত্র এই খানেই শেষ করিয়া দিতেছি। পত্রখানি তুমি পাঠ করিবে। মনে মনে ভালো করিয়া বুঝিয়া দেখিবে।

আমার উপর রাগ বা অভিমান করিবে না। আমি এখানে বসিয়া স্পষ্ট অনুভব করিতেছি যে আমাদের আমল আমাদের কাল সম্পূর্ণরূপে শেষ হইল—আমরা বিগত হইয়াছি বা হইতেছি। হয়তো সূর্যাস্তের পর দিবাশেষের অবশিষ্ট কিছুক্ষণের আলোকাভাসের মতো বেলা ঝিকিমিকি করিতেছে। ভাবনা আমার প্রমথর জন্য। তা' আমি আর ভাবিয়া কি করিব? যিনি সব করাইতেছেন—সর্বময় যিনি তিনি যাহা করাইবেন তাহাই হইবে। আমি শুধু বুকে বেদনা অনুভব করি। সত্যসত্যই বেদনা হয়। আমি নিজের নাড়ী দেখিয়াছি। ইহা বায়ুর চাপ। অত্যধিক উৎকণ্ঠা এবং আনুষঙ্গিক অশান্তি তৎসহ উপবাসাদির আধিক্য হইতে ইহা ঘটিয়া থাকে। তুমি সাবধানে থাকিবে। জটাধর তোমার পিতৃব্য, আমার সহোদর, তথাপি সে ভিন্ন ধাতের মানুষ। একালের উপযুক্ত করিয়া ভগবান্ তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং সেও স্বেচ্ছায় তোমাকে একালের মতো করিয়া গড়িয়া তুলিবার ভার লইয়াছে; তাহার অবাধ্য হইবে না। আবার তাহার সমাদরে আপ্যায়নে তাহার মতোটিও হইবে না। উপনয়ন ও ব্রহ্মদীক্ষা দিবার সময় তোমাকে যাহা দিবার তাহা আমি দিয়াছি। এবং একথা আমি বিশেষ করিয়াই জ্ঞাত আছি যে আমার দীক্ষা অপাত্রে বা মলিনপাত্রে ন্যস্ত হয় নাই।

পত্র এইখানেই শেষ করিলাম—সরকারের হস্তে অর্পণ করিব। তাহাকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করাইয়া লইব, সে পড়িবে না—অন্য কাহাকেও পড়িতে দিবে না। তোমার হস্তে অর্পণ করিবে। তুমি মনোযোগ সহকারে সমস্ত পাঠ করিয়া পত্রখানি ছিন্ন করিয়া গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিবা। লিখিতামিতি পুঃ—প্রমথকে কাশী পাঠাইতে পারিব বলিয়া মনে করিতেছি না। তাহাকে ছাড়িয়া আমিও থাকিতে পারি না—সেও পারে না।

অশেষ শুভানুধ্যায়ী
সদাসর্বদা আশীর্বাদপরায়ণ
শ্রীগঙ্গাধর দেবশর্মা (ভট্টাচার্য)

পত্রখানা মন্মথ পড়ছিল আরও মাস কয়েক পর। মাস কেন বছরের কাছাকাছি। ভাদ্র মাসে লেখা চিঠি—চৈত্র মাসে চিঠিখানা গঙ্গাধর নিজেই মন্মথর হাতে তুলে দিলে। একটু অপ্রতিভ হাসি হেসে ছেলের হাতে চিঠিখানা দিয়ে বললে—গেল ভাদ্দর মাসে জটাধরের সরকার মশাইটি এসেছিলেন যখন তখন তোকে লিখেছিলাম তোর সেই চিঠিখানা পেয়ে। সেই যে পুজোর সময় গেলবার আসা হয় নি, কাকা কাকীমার সঙ্গে পুরী গিছলি—আবার এবার কাশী যাবি বাড়ি আসবি না আমার সঙ্গে দেখা হবে না—এইসব জন্যে খুব লজ্জা করে খুব অপরাধ বোধ করে চিঠিখানা লিখেছিলি। সাত দিন জটাধরের সরকার এখানে ছিল—আমি সাত দিন ধরে লিখেছিলাম। রোজ রাত্রে জিজ্ঞাসা করতাম—সরকার মশায় কাজের কতদূর হল? শেষ হল? সরকার রোজই বলত—কালকের দিনটা লাগবে। আজকে আর শেষ করতে পারলাম না। সরজমিনে মাঠে ঘুরে জমির পরতাল করা—তারপর সন্ধ্যের পর দলিলদস্তাবেজ দেখা। মধ্যে মধ্যে চুঁচড়ো যাওয়া—কাজ কি কম বড়কর্তা! আমি বলতাম—বেশ। বলে ইতিটা কেটে দিতাম। দিয়ে পরদিন আবার লিখতাম। যা মনে হত। বুঝলি! সাতদিন পর সরকার বললে—কাল যাব। আমি খুব ভালো করে কাগজ কেটে ময়দার আটা তৈরি করে খাম করে তাতে বন্ধ করে ভাবলাম সরকারকে দিই। বলব—তুমি বাপু চিঠিখানি মনুর হাতেই দিয়ো। কিন্তু শেষকালটায় তা আর পারলাম না, মনে হল লোকটি যদিই চিঠিখানি পড়ে এবং জটাধরকে দেয়। তাহলে জটাধর কি ভাববে? নাই কিছু, কোনো বিরুদ্ধ কথাই লিখি নাই, কোনো অন্যায়ও ভাবি নাই—তবু মনে হল যেন হাহুতাশই করলাম। মনে হল জটাধর ভাববে—যা হয়েছে যা হচ্ছে—জটাধর যা করেছে করছে তা নিয়ে আমি অখুশী আছি, এসবে আমার আনন্দ হয় না—এই আর কি!

অবাক হয়ে শুনছিল মন্মথ। গঙ্গাধর একটু হেসে বললে—নে। ধর। চিঠিখানা পড়িস। চিঠিখানা সরকারকে দিই নি, আবার ছিঁড়েও ফেলি নি। কেন ফেলি নি তাও মনে করতে পারছি না। রেখে দিয়েছিলাম জটাধরের পাঠানো কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের ভিতরে। ও বইখানা খুব নাড়ি না চাড়ি না আমি। মন চায় না। জানিস তো কালীপ্রসন্ন সিংহ আমাদের এখানকার লোক! জনাই বাকসার—বাকসার দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের বাড়ির ছেলে। খুব নাম খুব কীর্তি। গোটা কলকাতা তোলপাড় করেছে। নিজেও লিখেছে অনেক। হুতোমের নকসা-টকসার শুনেছি অনেক নাম অনেক দাম। ইংরিজীতে পণ্ডিত সংস্কৃতেও খুব অনুরাগ। কিন্তু বামুনের টিকি টাকা দিয়ে কিনে দেওয়ালে পেরেক পুঁতে ঝুলিয়ে রাখেন কেন? বামুনদের অনেক দোষ। আমরা গরীব আমাদের ছোট নজর—অনেক দোষ আছে। মানি—তাই বলে—। তাই বলে টাকা দিয়ে টিকি কিনে সেই টিকি কেটে নিয়ে দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখে কি আর হল বল?—তা—!

চুপ করে গেল গঙ্গাধর।

মন্মথর মনে ভেসে উঠল জোড়া সাঁকোতে কালীপ্রসন্ন সিংহ মশায়দের বিশাল বাড়িখানার সামনেটা। সেই ফটক সেই বাগান, সেই বিশাল পাথর দিয়ে বাঁধানো উঠোনটার মাঝখানে সেই পাথরের ফোয়ারাটা ফটকের দুই পাশে সঙিনলাগানো বন্দুকধারী সিপাহীর পোশাকপরা দারোয়ান!

সে দেখে এসেছে। সে চেনে। সে জানে। এই দু বছরের মধ্যে সে তো কম দেখে নি কম চেনে নি কলকাতাকে। রাধাশ্যাম তাকে চিনিয়েছে, ইস্কুলের বন্ধুদের মধ্যে সত্য চিনিয়েছে, বিভূতি চিনিয়েছে, তাদের ক্লাসের ইংরিজীর মাস্টারমশাই চিনিয়েছেন, তার কাকা

তাকে চিনিয়েছেন আর তাকে চিনিয়েছেন পণ্ডিতমশাই—রাধাশ্যামের বাবা।

আরও একজন আছেন—তিনি হেডমাস্টার মশায়। সে নিজেও হেঁটে হেঁটে ঘুরে ঘুরে এই আশ্চর্য কলকাতাকে এবং কলকাতার মানুষদের চিনেছে।

কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ি তাদের বাড়ি থেকে কাছেই। বছরে কয়েক বারই জোড়াসাঁকোর সিংহীবাড়িতে যাত্রাগান হয়, বাঈজী খ্যামটাদের মুজরো হয়, তাদের বাড়িতেও নেমন্তন্ন হয়। সে গেছে। কালীপ্রসন্ন সিংহ মারা গেছেন অনেকদিন। প্রায় তেরো চোদ্দ বছর হবে। কিন্তু মানুষটির নামে এখনও কলকাতা শতমুখে মুখর হয়ে আছে।

হেডমাস্টার প্রায় বলেন 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র কথা।

ইংরিজীর মাস্টারমশাই বলেন মাইকেল মধুসূদন দত্তকে অভিনন্দন দেওয়ার কথা। রুপোর পানপাত্র ডিকেণ্টার তৈরী করিয়ে মানপত্রখানি তারই সঙ্গে দিয়েছিলেন। হাসতে হাসতে বলেন—রৌপ্যপানপাত্রের সঙ্গে পানীয়ও কয়েক বোতল ছিল অত্যন্ত দুর্লভ সামগ্রী। You understand my boys—

তার কাকার কাছে শুনেছে সে কালীপ্রসন্ন সিংহের মেজাজের কথা। কিন্তু এই বামুনের টিকি কেনার কথা শোনে নি। বিবরণটা তাই বাবাকে জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছে হল তার। প্রশ্নটা জিভের ডগায় এলো কিন্তু জিজ্ঞাসা করবার সুযোগ হল না। বাবা বললে—প্রমথর চতুর্থীর দিনে ঘাটে বেনা পাতার সময় বললাম—শ্মশানে চিতাবহ্নিতে তোমাকে আজ তিন দিন হল বিসর্জন দিয়েছি আমরা আত্মীয় বন্ধু স্বজন সকল জনেই। তুমি নিরাশ্রয় নিরালম্ব বায়ুভুক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ।

একটু থেমে আত্মসংবরণ করে নিয়ে কিছুক্ষণ পর বললে—মন্ত্রগুলি তো ভালো। এমন মন্ত্র তো হয় না। মনটা উদাস হয়েছিল তাই মহাভারত খানা সেদিন টেনে নিয়ে পড়ব ভাবলাম। বইখানা ওলটাতেই সেই রেখে দেওয়া চিঠিখানা বেরিয়ে পড়ল। সেই দিন থেকে ভাবছি তোকে দেব, কি, দেব না! তারপর কাজকর্ম গেল; তোরা সকলে বিদেশে; কাজকর্ম চুকে গেল। চিঠিখানা আর ভুললাম না রে। যত্ন করে রেখে দিয়েছি। আঠা খুলে বার বার পড়ে দেখেছি, ঠিকই আছে। ওতেই তোদের সব কথার উত্তর আছে। পড়ে দেখিস! যাচ্ছিস দিদিমার কাছে পথে পড়িস। চিঠিখানা তোরই জন্যে লেখা। আচ্ছা—। বলে চলে গেল গঙ্গাধর।

•

আগেই বলেছি, সময়টা চৈত্র মাস; মন্মথ এখান থেকে কলকাতা যাওয়ার প্রায় দু বছর তিন মাস পর। তখন সকালবেলা। গোবিন্দপুরের ভট্টাচার্যদের বাড়িতে বেশ একটা উৎসব সমারোহের মতো উদ্যোগ আয়োজন দেখা যাচ্ছে বাড়ীর সংলগ্ন একটি পতিত জমি পরিষ্কার করে তার উপর শামিয়ানা টাঙানো হচ্ছে। বাঁশগুলি রঙিন কাগজ দিয়ে মোড়া হচ্ছে। তিনটে শামিয়ানা জড়ো করা রয়েছে—তার মধ্যে একটা শামিয়ানা একেবারে আনকোরা নতুন। দুটো পুরনো। শতরঞ্জ দুটো গাদার থাক করা রয়েছে তার পাশেই; এখানেও সেই নতুন পুরনো। এক জায়গায় চারখানা নতুন শতরঞ্জ এবং পাশেই পুরনো শতরঞ্জ ছ সাতখানা। নতুন শামিয়ানা নতুন শতরঞ্জ জটাধর কিনেছে। জটাধর এখানে অর্থাৎ তার স্বগ্রামে একটা কিছু করতে চায়। করবে ইচ্ছা অনেক কিছু। এই তার প্রারম্ভ। এখানে তার সরকার ভাদ্রমাসে এসেছিল একটা সম্পত্তি কিনবার জন্য। সম্পত্তি জমিদারি নয়,—আবাদী জমি, খুব ভালো পঞ্চাশ বিঘে ধানী জমি, একটা বাগান সমেত পুকুর, তা' ছাড়া তিন চারটে পুকুরের অংশ বিক্রি করছিল একেবারে লাগাও গ্রামের একজন জোতদার সদগোপ, খবর পেয়ে জটাধর সমস্ত কিনেছে 'চৈত্তীকালী জটাধর জননী'র নামে।

অনেক দিন থেকেই কল্পনা ছিল জটাধরের। কিন্তু বাধা হচ্ছিল নানারকম। পুজোর সময় উৎসবের পুজোর একটা প্রশস্ত কাল। কিন্তু অসুবিধে অনেক। এখন যেন ওই পুজোর সময় স্থানান্তরে যাওয়াটা বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জলকাদার ঝড়জলের সময়; জরে জ্বালায় আমাশয়ে ম্যালেরিয়ায় কে কার মুখে জল দেয়। দুর্গা পুজো কালী পুজো জগদ্ধাত্রী পুজো—এ পুজোগুলির সবগুলির বেলাতেই এই প্রশ্ন। এ সব ছাড়াও ছুটির প্রশ্ন আছে। গ্রামে না-হয় ছুটি নিয়ে বালাই নেই কিন্তু পুজো আসলে যার বা যাদের তাদের যে সকলকেই নির্ভর করতে হয় কলকাতার আপিসের ওপর। ধান চাল বিক্রি করে নমোনমঃ করে পুজো সারা যায়—বাঁশী কাঁসি বাজানো যায় না, নূপুরেও ধ্বনি ওঠে না। তাই অনেক গ্রামে বড়দিনের সময় জয় মা বলে কালীমায়ের পুজো করা হয়। তান্ত্রিক পুজো—কোনো কিছু বাধাবিঘ্ন নেই। জয় মা বলে যা চালাবে তাই চলবে। তান্ত্রিক মতে কারণ সংযুক্ত ভোগ দেওয়া চলবে আবার বৈষ্ণব মতে মাষকলাই ছিটিয়ে মা সভক্তবলি দিয়ে পাঁঠা বলি বাদ দিলেও চলবে। চলবে কেন তাই চলছে এখন বহু গ্রামেই। তাই বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পরামর্শ করে গুড ফ্রাইডের সময় এই জটাধর জননীর পুজা আনবার মনস্থ করেছে। তারই শামিয়ানা খাটানো হচ্ছে; কালী পুজো হবে, যাত্রাগান হবে দুদিন, ঢপ কীর্তন হবে একদিন। বাড়ির খামার-বাড়ির সংলগ্ন এই পতিত জায়গাটা ছিল ভটচাজদেরই ভাগ্নেদের একজনের। সে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। সেই জায়গাটা চড়া দামে কিনে এইখানেই হচ্ছে মায়ের পুজোর আটন। এবারে উত্তর প্রান্তে একটি পাকা বেদী গাঁথা হয়েছে, সেই বেদীর উপর বসবেন প্রতিমা। পুজার পর বেদীর চারিপাশে থাম গেঁথে ছাদ করা হবে। হয়তো ঘর হবে। বেদীর উপর মার্বেল বসবে। কৃষ্ণভামিনীর ইচ্ছে মার্বেল বসানো। গঙ্গাধর বলেছিলেন—কেন মা। মা আসবেন, আমরা মাটির বেদী তৈরি করে গোবর মাটি গুলে নিকিয়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে মাকে ডাকি—এস মা; মা আসেন বসেন। বছরের মধ্যে তো একটা দিন।

কৃষ্ণভামিনীর তা মনঃপুত হয় নি।

মাথার ঘোমটাটা অকারণে একটু টেনে বাড়িয়ে দিয়ে বলছে—না—না—না। এ বাড়ি এ বংশ কত বড় ভক্তিমানের বংশ। না—না। মার্বেল না-হলে সে আমার পছন্দ হবে না মার্বেল ভিন্ন মানাবে না।

ঘোমটা টেনে বাড়ালেও গলা তার উচ্চ হয়ে উঠেছিল। আর মার্বেলের উপর লেখা হবে—মায়ের অভয় চরণে চিরশান্তিতে নিদ্রিত প্রমথনাথ দেবশর্মা। জন্ম এত সাল—মৃত্যু এই সাল।

এই কয়েক মাসের মধ্যে অর্থাৎ ভাদ্র মাসে গঙ্গাধর যখন চিঠিখানা লিখেছিলেন তখন প্রমথ ছিল। কিন্তু পুজার সময় থেকে গোটা কার্তিক এবং অগ্রহায়ণের কয়টা দিন ম্যালেরিয়া যেন কলেরা বসন্তের চেয়েও ভয়ংকর হয়ে উঠল। প্রবল জ্বর—একবার দুবার তিন বারের বার অজ্ঞান হয়ে যায়, ঘন্টা কয়েক অজ্ঞান হয়ে থাকে তারপর সব শেষ হয়ে যায়—এমনই একটা রোগের ধারা বল ধারা, গতি বল গতি এলো কিছু দিনের জন্য এবং মাস দেড়েকের মধ্যে এক গোবিন্দপুরেই একশোর কাছাকাছি লোকের জীবন নিয়ে চলে গেল। সেই সময়টা এসেছিল পুজোর আগে। পুজো ছিল ২৬শে আশ্বিন; আশ্বিনের শেষ সপ্তাহ থেকে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলেছিল এই মহামারী। প্রমথ মারা গেছে এই অগ্রহায়ণে। তার কয়েকদিন আগেই মারা গেছে বাগদী বউ। সন্ধ্যাবেলার শুরু থেকেই প্রলাপ বকা শুরু হয়েছিল। এত বড় প্রকাণ্ড বাড়িখানার মধ্যে মৃত্যুপথযাত্রী ছেলেটির শিয়রে একলা একটি বড় পিতলের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন গঙ্গাধর। তারপর পাশের বাড়ির চন্দ্রানন চাটু-

জ্জের বড়ী দিদিকে ডেকে প্রমথর পাশে বসিয়ে রেখে ঠাকুরদের আরতি শীতল শয়ান সেরে ভগবানের আশীর্বাদ মাথা হাত প্রমথর মাথায় বুলিয়ে দিয়ে বলেছিলেন— প্রমথ কাল জ্বর ছেড়ে যাবে। বুঝলি। কাল নিশ্চয় ছাড়বে। বলে দিলাম ঠাকুরকে—দেখ ঠাকুর প্রমথর জ্বর কালও যদি না-ছাড়ে তাহলে কিন্তু আমি নাচার—আমি আর পারব না পুজো করতে। তুমি নিজের ব্যবস্থা নিজে ক'রো। কাল নিশ্চয় জ্বর ছাড়বে বলে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর চাটুজ্জেদের দিদিকে বিদায় দিয়ে নিজে দু'মুঠো মুড়ি খেয়ে নিয়ে বসেছিলেন ছেলের শিয়রে। হঠাৎ রাত্রি দুপুরে ধড়মড় করে উঠে বসেছিল প্রমথ।

—যাই যাই যাই!

গঙ্গাধরের তন্দ্রা এসেছিল—তন্দ্রার মধ্যে ঘাড় ত'ার ঝুঁকে পড়েছিল ; চমকে উঠেছিলেন, তন্দ্রা ছুটে গিছল, বিহ্বলতার মধ্যেও প্রমথকে তিনি জাপটে জড়িয়ে ধরেছিলেন—প্রমথ প্রমথ!

—বাগদী মা—মা। বাগদী মা!

—কি বলছিস? প্রমথ! ওরে আমি বাবা, প্রমথ!

প্রমথ আর বাবাকে চিনতে পারে নি। এলিয়ে পড়েছিল ; বিড়বিড় করে বকতে বকতে যেন ক্লান্ত হয়ে ভেঙে বা এলিয়ে পড়েছিল বিছানার উপর। এরপর যে কখন তাঁর অগোচরে প্রমথর জীবনের প্রদীপখানা তেল সলতে ফুরিয়ে খটখটে পিলসুজ থেকে উলটে পড়ার মত বিছানা থেকে আধেকখানা তক্তাপোশের অনাবৃত তক্তার উপর গিয়ে পড়েছিল তা গঙ্গাধর জানতে পারেন নি।

শবদাহ করতে পরের দিন প্রায় সারাটা দিনই গিয়েছিল।

ঘরে ঘরে জ্বর! শ্মশানে কে যাবে? এবং গ্রামে সেদিন শব একটি নয় আরও দুটি। একটি আঁতুড়ের শিশু—অপরটি বৃদ্ধা। তিনজনেই ব্রাহ্মণের শব।

শেষ পর্যন্ত বহু কষ্টেই শেষ হয়েছিল শ্মশানের কাজ।

গঙ্গাধর চিঠি একখানা দিয়েছিলেন কাশীতে কিন্তু তাতে বারবার লিখেছিলেন "কদাপি তত্র হইতে আমার নিকট আসিবার চেষ্টা করিবা না। মনে হইতেছে দেশে আর কেহ বাঁচিবে না। তদুপরি চাটুজ্জেদিদি বলিতেছে—সেদিন রাত্রে সে স্পষ্ট বাগদী বউ এবং তোমার গর্ভধারিণীকে বাড়ির জানালার ধারে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছে। সে নাকি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল— 'কে গো? কে দাঁড়াইয়া ওখানে?' সে নাকি বলিয়াছে— 'আমি ঠাকুরঝি। আমাকে চিনিতেছ না? আমার বড় কষ্ট। একলা থাকিতে পারি না। তাই প্রমথকে লইতে আসিয়াছি।' সুতরাং আসিও না। আমি যাহা হয় করিতেছি।"

ওরা কাশী থেকে ফিরে এসে এই নতুন ব্যবস্থা করেছে।

জটাধর এখানে সম্পত্তি কিনবে। কয়েক শত চাষের জমি, বাগান পুকুর, সম্ভবপর হলে তালুকদারি বা পত্তনীদারিতে দু চারখানা গ্রাম।

সম্পত্তি হবে 'জটাধর জননী' দক্ষিণা কালিকার নামে। আয় থেকে শুধু পুজোই নয় এ অঞ্চলের লোকেদের হিত কল্যাণও যথাসাধ্য করা হবে।

গ্রামে একটা পাঠশালা আছে, ভট্টাচার্যদের টোল অনেকদিনের পুরনো। এবার ইউ. পি. ইস্কুল হবে—একটা দাতব্য চিকিৎসালয় হবে—আর বালিকা বিদ্যালয়। অবশ্য দাদা মত দিলে তবেই।

গঙ্গাধর হেসেছেন।

আমার মত অমত আবার কিসের? ও যা হবার তা আপনিই হয় জটাধর—মালিক মহাকাল। খণ্ডকালেরা তার ভৈরব, তিনি বলেন—এটাকে ভাঙো—তারা ভাঙে। বলেন—

নতুন পড়ো। আমার পড়ে। তা যখন বলছ তোমরা তখন হোক। মত আমি দিলাম। আমার পক্ষেও ভালো হল। অবলম্বন হল। প্রমথটাও মরে গেল। মন্মথ বাইরে ; ঘরে লক্ষ্মীজনার্দন রাধাবিনোদ—ওরা ভগবান হোক আর যাই হোক—ওরা কথা কয় না, বোবা-কালা—বুঝেছ। তা' এই সব নিয়ে কাটবে ভালো। না হলে—আমাদের তো দেশ। আজ আট বছর বড়বউ মরেছে—আট বছর আমার শাশুড়ী ধরে আছেন—তাঁর বোনের মেয়ে আছে পর পর চারটে, একটাকে বিয়ে কর। বেটাছেলে কুলীন। গাঁয়ের সবাই তাই বলে। আমি অনেক কষ্টে প্রমথকে নিয়ে এড়িয়ে ছিলাম। এবার তো ছাড়বে না। এ ভালো হল। এই নিয়ে কাটাবো।

মন্মথ জটাধর জননী কালীমায়ের পুজোতে এসে তার মাতামহীকে এ বাড়িতে আনতে যাচ্ছে। নৌকোতে যাবে নৌকোতে আসবে। পথ খুব বেশী নয় সামান্যই—তবে গঙ্গার ঘাট থেকে মাইল দুই পথ গরুর গাড়িতে যেতে হবে। মন্মথর বাবা তার হাতে চিঠিখানা দিয়ে বললেন—পড়ে দেখিস। তারপর গঙ্গার জলে ছিঁড়ে ফেলে দিস।

নৌকোখানা চলেছিল ভাটির টানে। চৈত্রমাস, গঙ্গার বুকে নৌকোর উপর আনন্দ-প্রবাহের মতো একটি শান্ত স্নিগ্ধ আবহাওয়ায় দেহ মন জুড়িয়ে যাচ্ছিল।

দেহ গেলেও মন যেন ঠিক যায় নি। মনের মধ্যে জমে থাকা লজ্জা সংকোচ বেদনা অপরাধবোধ আবার প্রচ্ছন্ন বিরক্তি সব একসঙ্গে একটা অস্বস্তিকর অনুভূতির সৃষ্টি করেছিল। যেন বিছানায় সূক্ষ্ম কতকগুলো বালি ধুলো ছড়িয়ে থাকার মতো ; চাদরের গায়ে অতিসূক্ষ্ম শুঙ্গ বিঁধে থাকার মতো মনের সর্বাঙ্গে অহরহ অস্বস্তির সৃষ্টি করছিল।

না-করে তো তার উপায় নেই। তার বাপের মতো স্নেহময় বাপকে—গোবিন্দপুরের রাধাবিনোদভক্ত গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের মতো মানুষকে সে এই দু বছর সাত মাস একরকম ভুলেই থেকেছে। না, আস্তে আস্তে দিনে দিনে একটু একটু করে তাঁর স্নেহের আস্বাদন তার জিভের কাছে স্বাদ হারিয়েছে এবং তারও যে মমত্ববোধ তাঁর প্রতি তাও অসাড় হয়ে গিয়েছে। সে জানে এবং সে এই সময়ের সর্বক্ষণই জানত যে তার বাবা ঈশ্বরের কাছে ঠাকুরদের কাছে অহরহ তার জন্য মঙ্গল কামনা করেছেন। এবং নিত্যই তার কাছ থেকে একখানি পত্র প্রত্যাশা করেছেন।

সেও প্রতিদিন রাত্রে ঘুমোবার সময় সংকল্প করত কাল নিশ্চয় সে তার বাবাকে পত্র লিখবে ; পোস্টকার্ডও তার কাছে আছে ; কিছু কাল (কত দিন ঠিক মনে নেই) কাকাই তাকে পোস্টকার্ড দিয়ে বলেছিলেন—"মানুবাবা, দাদাকে একখানি পত্র লেখ তো মাণিক। লেখ—কাকা পত্র দিতে পারেন নি—আপনি পত্র না-পেয়ে ভাবছেন বলে আমি লিখছি। আমরা সবাই ভালো আছি। কোনো চিন্তা করিবেন না।" পোস্টকার্ডখানা ভাগ্যে সে লেখে নি ; কারণ আধঘণ্টা পরেই জটাধর এসে বলেছিল—"না না মনু ; ও চিঠি দেওয়া হবে না। দাদা ভাববে জটাই আমাকে হেলা করে লিখতে পারে নি ; ছেলেটাকে বলেছে লিখে দে। না না। ও হবে না। চিঠিটা ফেরত দাও আমাকে।"

চিঠি লেখা হয় নি সুতরাং পোস্টকার্ডখানা ফেরত দেওয়া হয় নি। পোস্টকার্ডখানা আজ প্রায় এক বছর কি তারও বেশী দিন হল লিখব লিখব করেও লেখবার সময় পায় নি। না—তাও সত্য নয়। সময় ছিল বই কি—অনেক সময় ছিল। লেখা হয়ে ওঠে নি। সেই পোস্টকার্ড থেকেই গেছে তার কাছে।

রাত্রে বিছানায় শুলেই মনে পড়েছে বাবাকে, প্রমথকে, বলরামী বাঁটিকে, গ্রামের লোকদের। না, প্রথম মনে পড়ত গোবিন্দের ঠাকুরকে রাধাবিনোদকে। লক্ষ্মীজনার্দনের শালগ্রাম শিলা—ওকে

মনে করত কিন্তু তাতে মনে কিছু হত না। ক্যালকাটাকে মনে করতেই একে একে বাঁধন থেকে খুলে করে সকলকে মনে পড়ত। প্রথম প্রথম গাছপালা পশুপক্ষী পর্যন্ত মনে পড়ত; সরস্বতী পুজোর সময় যবের শীষ ভরা ক্ষেত ছোলা গম ভরা মাঠ মনে পড়েছে; বাড়ির উঠানে আমগাছের মুকুলের কথা মনে হয়েছে। বাড়িতে সে গাঁদা ফুলের গাছ লাগাত; প্রমথ যত্ন করত; বাগদী বউ জল দিত। সে সব ফুলের কথা মনে পড়েছিল প্রথমবার। সেবার থেকে কাকা বাড়িতে সরস্বতী পুজো এনেছেন। পুজো ভালই হয়। রাধাশ্যামের বাবা পণ্ডিতমশায় ভালো পুজো করেন মিত্তির রাজবাড়িতে, মানে তার সহপাঠী বিভূতিদের বাড়িতে। তাঁর দেওয়া পুরোহিত বেশ ভালো পণ্ডিত, পুজো ভালই করান। তবু বার বার মনে পড়েছিল বাবাকে, প্রমথকে, পাড়ার ছেলেদের, গ্রামের সব প্রতিমাগুলিকে। চক্রবর্তী বাড়ির শেতল মিস্ত্রীর হাতের গড়া মা সরস্বতী কটমট করে গোল চোখ মেলে তাকান। ও পাড়ার কায়স্থরা—উপাধি সরকার—তাদের বাড়ির সরস্বতী গড়ে যোগী মিস্ত্রী। যোগীর গড়া সরস্বতী মায়ের যেন ঘুম পেয়েই আছে, পদ্মের উপর পায়ে পা দিয়ে ঈষৎ হেলে দাঁড়িয়ে আছেন—চোখ দুটি ঢুলুঢুলু করছে—বুজলেই হল; ঝুপ করে পড়ে যাবেন ঘুম এসে গিয়ে। তাদের বাড়ির সরস্বতী মতি মিস্ত্রীর। মতির হাতের ঠাকুরের মুখ খুব ভালো হয় কিন্তু শরীরের গড়ন যেন বেশী বেশী গোলগোল নাদুসনুদুস, একটু লম্বাপলা—অল্প রোগা-রোগা হলেই ভালো লাগে।

এসব মনে পড়ত। এবং পরদিন সকালে চিঠি লিখব সংকল্প করত। কিন্তু ভোরবেলা উঠে মুখ হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে প্রাতঃসন্ধ্যা সেরে সে সংকল্পের কথা ভুলে যেত, মনে পড়ত দু'খানা মুখ। বিভূতির এবং সত্যপ্রসাদের। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ত সোনালী কটা রঙের ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি গোঁফওয়ালা, ক্লাস টীচার, রমেশ গোস্বামীর কথা। তাদের ক্লাসের ইংরিজীর মাস্টার। এবং তার সঙ্গে তিনিই হলেন তাদের ক্লাস টীচার। কৌতুকোজ্জল কটা চোখ, ফ্রেঞ্চছাঁট দাড়ি গোঁফ, মাথার চুলগুলি ছোট করে ছাঁটা। পাকা মজবুত চারহাত লম্বা বাঁশের লাঠির মতো শক্ত-পোক্ত সোজা মানুষ। তেমনি সোজা পদক্ষেপ। সামনের দাঁত দুটি ঈষৎ উঁচু। ক্লাসে ঢুকেই রোল কল করে তাকে ডাকবেন—প্যাণ্ডিট! তারপর বলবেন—ভো ভো পণ্ডিতঃ!

সে উঠে দাঁড়িয়ে বলবে—ইয়েস স্যার!

—বল তো, এল এম এন ও পি কিউ আর। বল।

মুখ নামিয়েই সে বলে যেত। দারুণ লজ্জা বোধ করত কিন্তু কি করবে? গোস্বামী স্যার অত্যন্ত কঠিন লোক। মফস্বল গ্রামের ছেলে, তার উচ্চারণে একটু য-ফলা আকারান্ত টান ছিল, সে বলত—'এ্যাল, এ্যাম, এ্যান, ও, পি, কিউ'। প্রথম দিনই ধরা পড়েছিল স্যারের কানে সেই অবধি তিনি এই শব্দগুলো ওকে উচ্চারণ করতে বলেন। এবং তাকেই একটু বেশী পড়া ধরেন। তার সঙ্গে প্রত্যেক দিনই দুটো একটা সংস্কৃত শ্লোক বলে তার ব্যাখ্যা করেন। তার মধ্যে তাকে জড়িয়ে কিছু রসিকতার চেষ্টা থাকে। প্রায়ই বলেন—পণ্ডিত, 'ওঁ' শন্নো আপো ধন্বন্যাঃ শমু নঃ সন্তু নূপ্যাঃ। শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমু নঃ সন্তু কূপ্যা।' প্রাতঃ প্রভাতে নিয়মিত চলছে তো? সে চুপ করে থাকে। গোস্বামী স্যার হাসেন। বলেন—রাগ করছ না তো পণ্ডিত? রাগ ক'রো না। আমরা তো আগে খুব গোঁড়া হিন্দু ছিলাম। জানো? সাতপুরুষ কি চোদ্দপুরুষ কত পুরুষ ঠিক বলতে পারব না, তবে সাত-পুরুষের কম নয়—আর শাস্ত্র মানলে বলতে হবে যাবজ্জন্ম নিরামিষাশী—নিরামিষ মানে পেঁয়াজ রসুন ছোঁয়াচহীন নিরামিষ খেয়েছি। তিনকুল কেটেছি—কণ্ঠী পরেছি। বুঝেছ! আমার ঠাকুরদা সেই বয়সের ছেলে—খুব তেজস্বান; হাঁক বলতে নস্তু

বরে' বলে না? ভাই করত। গেছলেন গঙ্গাসাগর; বুঝেছ? সাগর-সঙ্গমে স্নানও করেছিলেন—কামনাও করেছিলেন; যা হিন্দুরা করে; মোক্ষ। কিন্তু অদৃষ্টের ফেরই বলো আর যাই বলো ফেরার পথে মোক্ষ হতে হতে আর হল না। মোক্ষ দেবার জন্য বিধাতা নৌকাডুবি ঘটালেন কিন্তু মোক্ষলাভ হল না। ভেসে যেতে বা ডুবে যেতে যেতে বাঁচলেন। এক মিশনারী সাহেবের নৌকোর দাঁড়ি মাঝিরা টেনে তুললে নৌকোয়। তখন অচেতন। তারপর জ্বর। দিন পনের বা কুড়ি দিন ভুগে যখন ভালো হলেন তখন দেখলেন তিনি মিশনারীদের আশ্রয়ে। ব্যাস কাঁদতে লাগলেন। রেভারেন্ড সাহেবের বৃদ্ধা মেমসাহেব বলে—কাডো কেনো বোয়! কি হইয়েছে বোলো! দর্দ মালুম হোছে? তবিয়ৎ কুছ খারাপ? গুরুগিরিকরা বামুনের ছেলে হাপুস-নয়নে কেঁদে বলে—আমার জাত গেল।

পাদরী সাহেব বললে—বেশ হইল। টুমি কৃশ্চান হইলে। হিণ্ডুর স্বর্গ হেভেন উ ভালো আছে না। ব্যাড প্লেস। হামাডের হেভেন বহুট ভালো। হামাডের ইংলণ্ডে পাঠাইয়া ডিব; টুমি হামাডের ইহলোক ডেখিয়া আসিবে—কেমন আচ্ছা ডেস হামাডের দেখবে। হামাডের পরলোক হেভেন—উ তো আর বহুৎ ভালো আছে। ঘাবড়াও মৎ। কাঁদো মৎ। কেঁদে ফলও ছিল না। সুতরাং You understand—my grandfather became a Christian. বুঝেছ পণ্ডিট এবং আমার ঠাকুরদার অদৃষ্ট ফিরল কৃশ্চান হয়ে। ওই রেভারেণ্ডের কাছে ইংরিজী শিখে ভালো চাকরি পেয়েছিলেন—হাইকোর্টে ইণ্টারপ্রিটার হয়েছিলেন। শেষ বয়েসে ভেবেছিলেন চার্চের কাজ করবেন। চেষ্টাও করেছিলেন কিন্তু তা হয় নি। ওই সেই ছেলেবেলার ওই 'ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ' প্রভৃতি মন্ত্রগুলো মনের মধ্যে ভিড় করত। আমার ঠাকুরদা লোকটি ছিলেন খাঁটী। এ পারফেক্ট জেণ্টলম্যান, এ ম্যান অব সেইণ্টলী ক্যারেকটার, এ ট্রু অনেস্ট ম্যান। অলসো এ লাকি ম্যান। অন্তত আমার বিচারে। গোসাঞীবাড়ির ছেলে—দিব্যি নতুন কালে ইংরেজদের আমলে গুরুগিরির ভণ্ডামি থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন—বাড়ি বাড়ি ঘুরে বাৎসরিক প্রণামী আদায় করার দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে দিব্যি চোগাচাপকান পরে হাইকোর্টের জাজদের ডায়াসের নিচে বসে থাকতেন। তখনকার দিনে টানাপাখা পুলারের টানায় পাখার হাওয়া খেতেন—মোটা মাইনে পেতেন—অ্যাণ্ড খাতিরও ছিল মোটামুটি। তবে ট্র্যাজেডি কি জান—বাইবেল পড়ে চার্চে নিয়মিত গিয়েও ওই 'শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ'—'মীশমনীশমশেষ গুণম্' ভুলতে পারেন নি। তার উপর ভদ্রলোকের লাইফের একটা বড় ফ্যাক্টার হলেন ওঁর যিনি গৃহিণী। তিনি হলেন বনেদী কৃশ্চান বংশের কন্যা। ধর্মে কৃশ্চান হলে কি হবে জাতে বদ্যি এবং একসময় সাধক রামপ্রসাদের বংশের জ্ঞাতি ছিলেন একথা তাঁরা ভোলেন নি। তবে মায়ের বাবা ছিলেন একেবারে খাঁটী বিদ্রোহী। বলতে গেলে ডিরোজিয়ো স্কুলের পাগলা হাওয়াটার খানিকটা, অবশেষ বলতে পার, দৈবক্রমে তাঁর বাপের ঘরে বোতলবন্দী হয়ে আটকানো ছিল। প্রচুর মদ্য পান করতেন—সকল প্রকার দেবার্চনা ও ধর্মবিশ্বাসকে গাল দিতেন—কিছু মানতেন না। মধ্যে মধ্যে মদ্যপান করে এমন ভায়লেণ্ট হতেন যে বাসনকোসন ভাঙতেন। বারণ শোনা দূরের কথা মারধর করতেন। এহেন মানুষটি নাকি শান্ত হত একমাত্র ওই ফিরিঙ্গিকালীর পুজোর ফুলের স্পর্শে। আমার ঠাকুমার মা ঠিক দুপুরবেলা চুপি-চুপি ফিরিঙ্গিকালীতলায় গিয়ে কিছু প্রণামী দিয়ে পুষ্প নিয়ে আসতেন। মোক্ষ সুযোগমতো মন্ত্রপূত হত্তীর মতো স্বামীর কপালে ঠেকিয়ে দিতেন। শোনা যায় দশ মিনিট পরেই হোক আর আধঘণ্টা এক ঘণ্টা পরেই হোক তিনি ঘুমিয়ে যেতেন। আমার ঠাকুমা তখন কুমারী কন্যা—তিনি দেখেছেন স্বচক্ষে। সুতরাং জাগ্রতী মহিমা কালী জয়কালী কপালিনীতে জোরালো অনুরাগ, অত্যধিক বিশ্বাসও ছিল। এহেন বৈদ্যকন্যাটি ওই গোস্বামী কৃশ্চানের

সঙ্গে মিলিত হয়ে সোনার সঙ্গে সোহাগার মতো মিলিত হয়েছিলেন। পরস্পরের সঙ্গে মিলিত জীবনে হৃদয় খুলে পরস্পরকে দেখিয়েছিলেন দে বাইবেলের নিচেই একজনের আছে গীতা অন্যজনের আছে চণ্ডী। কিন্তু গোল বাধাল তাঁদের পুত্র কন্যা। পুত্র একটি কন্যা দুটি। তারা হল কিন্তু একেবারে উল্টো।

তারা গোল বাধালে ওই কালীমূর্তি নিয়েই। ওই কালো ন্যাংটো মাটির পুতুলকে কেন পুজো কর তুমি ? কেন আমাদের পুজো করতে বলবে ?

বিদ্রোহ করেছিলেন আমার বাবাই প্রথম। ছেলেবেলা থেকে যে ছেলে মায়ের সঙ্গে মা কালীকে প্রণাম করেছে সে হঠাৎ ওই কথা যেদিন বলেছিল সেদিন আকাশ থেকে পড়ে অসীম শূন্যলোকে খাট থেকে ঘুমের ঘোরে পড়ে যাওয়ার মতো পড়ে গিয়েছেন—সর্বাঙ্গ ভয়ে শিরশির করে উঠেছিল—ভাগ্যে কোনো মাটির পৃথিবীতে আছড়ে পড়েন নি, পড়লে—পড়ে হাড়গোড় ভেঙে ছাতু হয়ে যেতেন। আর্তস্বরে চিৎকার করে স্বামীকে ডেকেছিলেন তিনি।

মা বুঝিয়েছিলেন—ওরে বলতে নেই, এও সেই হোলি মাদার—দি ইটার্নাল মাদার।

হেসে বলেছিল—নো। স্কুলে হিন্দুর ছেলেরা পর্যন্ত আমাদের ঠাট্টা করে। কৃশ্চানরা ছিলেন বলে। একটা নেকেড ব্ল্যাক নিগার উয়োম্যান কখনও ইটারন্যাল মাদার হয় না। রেজাল্ট ওয়াজ, ইউ সি, তাঁরা জিতেছিলেন—মানে আমার ফাদার এবং আমার আন্টরা। অ্যান্ড আবু বেন আদেমের মতো তাঁরা ক্রমে বৃদ্ধিও পেয়েছেন। আমার ঠাকুরদা 'শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ' এবং ঠাকুমায়ের রামপ্রসাদী গান—এর সবই শেষ। কেবল, আমার ওল্ড গ্র্যান্ডমা—ছেলেবেলা আমাকে মানুষ করেছিলেন, কারণ আমার মা আমার দু'বছর বয়সেই মারা যান, তাঁর কাছ থেকে ওগুলোর কিছু কিছু ঢেউ আমার গায়ে লেগেছে। তা আমি স্বীকার করি। তার জন্যে লজ্জা দেয় অনেকে। দিতে চেষ্টা করে। আমি পাইনে। কারণ এর একটা মূল্য আমি আগেই পেয়েছি ঠাকুমার কাছে। ঠাকুমা হ্যাড সাম মানি, ঠাকুমার হাজার পাঁচেক টাকা ছিল ; মাই গ্র্যান্ড ওল্ড লেডি ওয়াজ কাইন্ড এনাফ টু মি, আমাকে উইল করে টাকাটা দিয়ে গেছলেন। তার সঙ্গে খান পাঁচেক ছবি ছিল তাঁর, একখানা ঠাকুরদা-ঠাকুমার একসঙ্গে, একখানা ক্রুশবিদ্ধ ক্রায়েস্টের, একখানা মাদার মেরী অ্যান্ড হার চাইল্ড, একখানা কাঁটার মুকুট পরা ঈশ্বরের পুত্রের, একখানা বা শেষখানা ঠাকুমায়ের ছোট্ট একখানি কালীঘাটের কালীমার ছবি। আমি রেখেছি সব। বিশ্বাস আমি কিছুতেই করি না, তবে মানতে হয় ধর্মে আমি কৃশ্চান, জাতে আমি ইন্ডিয়ান—এবং সংস্কৃত ও ইংরিজী দুই ভাষাকেই আমি খু—ব ভালবাসি। কিন্তু 'শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ'—জয়ন্তী মঙ্গলা কালী—যথা যথা ধর্মস্য এ সব টিকল না টেকানো গেল না। মিথ্যে বলব না, I tried but I have failed.

তুমিও ফেল করবে হে পণ্ডিট। তুমিও ফেল করবে। অ্যান্ড আই উইশ তুমি ফেল কর ওখানে। কারণ তাহলেই অ্যান্ড তাহলেই তুমি ইংরিজীতে বিভূতি এবং সত্যপ্রসাদকে হারাতে পারবে। এবং আমি ফোরটেল করতে পারি—তোমার হাত না-দেখেই আমি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি যে সংস্কৃত তোমার ওন মাদার হলেও তুমি তোমার ফাদারের ভেরী বিলাভেড ইয়ং সেকেন্ড ওয়াইফ তোমার স্টেপমাদার ইংরিজীকেই তুমি বেশী ভালবাসবে। খুব বেশী দিন না। অল্পদিনের মধ্যেই তুমি তোমার ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিকের ঝুলিটিকে এবং মন্ত্রতন্ত্রের মালাকে শিকারী মালা অ্যান্ড ঝোলা করে শিকেয় তুলে রাখবে। তোমার টিকি ? পণ্ডিট তোমার টিকিটি কতখানি 'শীর্ণ' হয়েছে ? চমৎকার বেমালুম মিশিয়ে নিয়েছ তো !

করে। তবে তার সঙ্গে একটা কল্পরাজ্য থাকে। তাই সে কেমন—কল্পরাজ্য শুধু নয় আকাঙ্ক্ষাও আছে এর সঙ্গে। ঠিক যেন শরতের দিনে একখানা সাদা পাল খাটিয়ে যেন। সে মুখ নিচু করে ক্ষীণ একটু হাসি ঠোঁটের রেখায় চেপে ধরে বসে থাকে। অন্য ছেলেরা অবশ্য মুচকি মুচকি হাসে, মধ্যে মধ্যে খিলখিল করেও হাসে।

স্যার বলেন—ও—। নো নো নো। নট সো লাইটলি।

রাগ করে বিভূতি। তাদের বাড়িতে হিন্দুধর্মের কড়া নিয়ম প্রচলিত। তাদের বাড়িতে হিন্দুদের সব পুজো প্রচলিত আছে। বিগ্রহসেবা আছে; রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ আছে আবার অষ্টধাতুর তৈরি মহিষমর্দিনী দশভুজা মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত আছে, নিত্য সেবা হয়। এ ছাড়া মাটির প্রতিমা গড়ে যত পুজোর বিধি আছে পঞ্জিকায় তারও অধিকাংশই হয়ে থাকে।

ওদের বাড়িতে ঠাকুর আসেন মধ্যে মধ্যে। ঠাকুর হলেন দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেব—রামকৃষ্ণদেব।

লোকে বলে বিশ্বাস করে—রামকৃষ্ণদেব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন—সিদ্ধপুরুষ; মা ভবতারিণীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় দেখাশুনো কথাবার্তা হয়। শুধু নিজেই দেখেন নি তাঁর সব থেকে প্রিয় শিষ্য সিমলের দত্তদের বাড়ির বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নরেন দত্তকেও নাকি দেখিয়েছেন মাকে—দত্তদের এখন ভাঙটা অবস্থা তাই নরেন দত্তকে ঠাকুর বলেছিলেন—মায়ের সঙ্গে তোর দেখা করিয়ে দিচ্ছি—তুই মায়ের কাছে অষ্টসিদ্ধি চেয়ে নে। নে না।

নরেন দত্ত মাকে দেখেছেন কিন্তু অষ্টসিদ্ধি চান নি, চাইতে পারেন নি। লোকে বলছে মায়ের ইচ্ছে। আমাদের শাস্ত্রের বিধান। ম্লেচ্ছদের এই বাড়াবাড়ি এই নাচানাচি এ রোধ করতে হবে তো! সেই কারণেই ঠাকুর এসেছেন। ঠাকুর কাজ করাচ্ছেন তাঁর ভক্তদের দিয়ে।

শুনে শুনে গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল তার সে ঠাকুরকে দেখবে—তাঁকে প্রণাম করবে—তাঁর আশীর্বাদ চাইবে। যদি নিরালা পায় তবে বলবে—ঠাকুর অষ্টসিদ্ধি কাকে বলে জানি না তা চাইও না! মাকে দেখতেও আমি বোধহয় পারব না। 'মহামেঘ-প্রভাং শ্যামাং মুক্তকেশীং দিগম্বরীম্'। সে কি সাধারণ কথা! তুমি মায়ের কৃপা পাইয়ে দিয়ো—আমি যেন বিদ্বান হই—খুব বড় বিদ্বান। আর খুব বড় চাকরি করি যেন। না। চাকরি না, মস্ত উকিল। না, মস্ত ডাক্তার। না, মস্ত বিজিনেসম্যান। মতি শীলের মতো। লাহাদের মতো।

বলতে বলতে হারিয়ে গিয়েছে সে নিজের মনের কামনার ভিড়ের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত বলেছে মনে মনেই বলেছে—আমি যা হলে ভালো হয় তাই যেন হই।

এই বিভূতিদের বাড়িতেই দেখেছে সে পরমহংসদেবকে।

বিভূতিদের বাড়িতে পরমহংসদেব আসেন, লোকে এই কথাটাই বেশী করে বলে কিন্তু এইটেই একমাত্র কথা নয়, ওদের বাড়িতে হিন্দুদের নানান মিটিং হয়। কোথায় হিন্দুধর্মের কোনো ক্ষতি হচ্ছে—কোথায় কৃশ্চান ব্রাহ্ম বা মুসলমানদের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটছে তা নিয়েও আলোচনা হয়। মধ্যে মধ্যে পণ্ডিত সজ্জনেরা আসেন, বড় বড় ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাড়ির মাতব্বরেরা আসেন। বিভূতির বাবার নাম হরিহর মিত্তির, মস্ত দাপটের লোক। নানান উপাধি আছে। কিন্তু কোনোটাই সরকারী খেতাব নয়। সে রাজা খেতাবও নয়। বিভূতিদের বাড়িতে এবং বাইরেও অনেকে বলে এ খেতাব সরকারী না-হলেও লোকে দিয়েছে; অনেকে বলে—এ খেতাব কেন সব খেতাবই ওরা নিজেরা নিয়েছে। হরিহর মিত্তির নাকি [illegible]। এ সব খেতাব দিয়েছে নবদ্বীপের এক পণ্ডিত মহাসভা। সে পণ্ডিত সভাটাই হয় বিভূতির বাবা রাজা হরিহর মিত্রের পয়সায়। এ ছাড়াও শাস্ত্রজ্ঞানের জন্য বিদ্যাবারিধি উপাধিও নাকি পণ্ডিতেরা তাঁকে দিয়েছে।

[illegible] সত্যপ্রসাদকে কথাটা জিজ্ঞাসা করেছিল। সত্যপ্রসাদ প্রশ্নটা শুনে তার দিকে

কলকাতার শুরু অভিজাতহিন্দু স্যার ; তারপরই খুব গম্ভীর হয়ে বলেছিল—ছেলেরা তাদের তো একটা পরিচয় আছে। তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করো না ওদের। ওরাই প্রশ্নের উত্তর পারে।

হরিহর মিত্তিরদের যে গুষ্টি গোষ্ঠীর মধ্যে অনেক অর্থশালী ব্যক্তি আছেন। তাঁরা নানান সভাসমিতির পৃষ্ঠপোষক। অনেক দানধ্যান আছে। সকালবেলা থেকে বাড়ির দরজায় ভিড় লেগে থাকে ভিখিরীর। অনেক বেলায় চাল আর পয়সা নিয়ে বাবুদের জয়ধ্বনি দিয়ে চলে যায়। বাড়ি থেকে অল্প কিছু দূর গিয়ে তারা সুর পাল্টে গাল দিতে শুরু করে।

এই মিত্তির বাড়ির ছেলে। রাজা দিগম্বর মিত্তিরদের দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি বংশ। ওরাও রাজা খেতাব নিয়েছে। সেই বাড়ির ছেলে বিভূতি গোস্বামী স্যারের এই সব কথা সহ্য করতে পারে না। সে বলে, নিজে কৃশ্চান তাই এইভাবে হিন্দুধর্মকে অপমান করে। রমেশ স্যার মন্মথকে টিকির কথা তুলে ঠাট্টার সুরেই বলেছিলেন—তাই তো হে এরই মধ্যেই তো তুমি তোমার সেই পৈতের সময়ের শুরুণ্টু টিকিটিকে বেশ ম্যানেজ করে চুলের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছ। টিকি একটি ওয়াণ্ডারফুল ট্রেড মার্ক। টিকিতে বাঁধা একটি ফুল দেখলেই বুঝবে এ ব্রাহ্মিন ইজ কামিং।

মন্মথ অভ্যাসমতো মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে অপ্রতিভের মতো হাসছিল, ছেলেরা খিলখিল করে হেসেছিল, শুধু দেবব্রত গম্ভীর হয়ে থাকতে চেষ্টা করেছিল, আর বিভূতি মুখ চোখ লাল করে প্রতিবাদ করে উঠেছিল।—আই প্রটেস্ট। আই প্রটেস্ট ইট্।

এইভাবে রমেশ গোস্বামী স্যারকে প্রটেস্ট করার ক্ষমতা ওই মিত্তির বাড়ির ছেলে বিভূতি ছাড়া আর কারুর করার সাহসও হত না। শক্তিও হত না।

গোস্বামী স্যার হেসে বলছিলেন—কিসের প্রটেস্ট হে মিত্তির প্রিন্স ? এ্যাঁ—? কি আমি বললাম যে প্রটেস্ট করবে তার তুমি ?

—আপনি টিকির কথা তুলে হিন্দুদের অপমান করেছেন !

—নো স্যার। আমি টিকির কথা তুলে বলেছি টিকি উইথ ফুল হল বামুন পণ্ডিতদের ট্রেড মার্ক। দেখলেই চেনা যায় পুরুতঠাকুর আসছে। অ্যাণ্ড কে কেমন বামুন তা বোঝা যায় ওই টিকি থেকেই। শুধু টিকি নয় পৈতেও অমনো। 'টিকি অ্যাণ্ড পৈতে মোটা বামুন গোটা'। বলে না ? অ্যাম আই নট রাইট বয়েজ ?

কতকগুলি ছেলে উচ্ছৃঙ্খল উল্লাসে প্রায় ভেঙে পড়ে হেসে উঠেছিল হি-হি করে। কয়েকজন চিৎকারও করে উঠেছিল—ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। রাইট। পারফেক্টলি রাইট।

বিমল বলে একটি ছেলে, বিমল দাশ, মন্মথর কাকার মতো তারাও ব্যবসাদার। তবে অনেক বড়।, ওকে জাহাজ এসে লাগলে বিমলদের বাপ খুড়োদের কোম্পানি সরালির মাল খালাস করে দেয় আবার এখানকার মাল বোঝাই করে দেয় ; তাছাড়া জাহাজের খালাসী যারা তাদের খোরাকচোরাকও ঠিকেতে জাহাজে যোগান দেয়। তার মধ্যে মাংস মদ মাছ এসবও আছে। সে ছেলেটি বলেছিল—আমি জানি স্যার আমি জানি। আমাদের বাড়িতে সরকার আছে দশ বারোজন—তার মধ্যে দু'জন বামুন আছে একজন আছে বদ্যি আর একজন আছে কায়স্থ। তারা জাহাজে যখন যায় তখন এইসব কারণায় টিকি লুকোয় যে দুরকম লো থাকে যা যে লোকটার মাথায় টিকি আছে। তা ছাড়া স্যার ওরা পৈতে মাথায় জড়িয়ে বাঁধার সময় বিছানার বালিশের তলায় রেখে দিয়ে যায়। তক থেকে ফিরে এসে হাতমুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে গলায় পরে। আমাদের বাড়ির ডাক্তার বলে সরকার মশায়দের উচিত মাথার পেছনে হল শিকেয়ী মাথা পেতে তেড়ন। শিকার না-হওয়া পর্যন্ত কেউ আমাদের

পারবে না ও জিনের কথা। শিকার হয়ে গেলেই ওর রাখে গোবিন্দ বলে মাথায় টিকিতে গিট বেঁধে মালা পৈতে ঝেড়ে গলায় পরে নেয়।

রমেশ গোস্বামী স্যার বলেছিলেন—ইউ সিট ডাউন। ইয়েস ইয়েস—ইউ সিট ডাউন আই সে। সিট ডাউন। মাই বয়েজ নাউ লুক টু ইয়োর বুকস্। লেট মি রিমাইন্ড ইউ—"লেখাপড়া করে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই।" পড়। তুমিই প্যাণ্ডিট স্ট্যাণ্ড আপ। —হুঁস। দেখ হিন্দুদের যেমন টিকি মালা পৈতে আছে—We Christians আমাদেরও তেমনি আলখাল্লা আছে—হিন্দুদের মিথ্যে গাল দেওয়া আছে। জান তো এক পাদরী বিছিতি গাছ নিয়ে কি বিপদে পড়েছিল? সে আর একদিন বলব। এখন পড়। লেখাপড়া করে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই। আবার রিমাইন্ড করে দিচ্ছি।

এর ঠিক দু'দিন পর হেডমাস্টার তাকে ডেকেছিলেন।

হেডমাস্টার তার কাছে যত শ্রদ্ধার পাত্র তত ভয়ের মানুষ। ক্লার্ক এসে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। দাড়ি গোঁফের একটা গাম্ভীর্য আছে—সেই গাম্ভীর্যের ওপরেও যেন আরও খানিকটা গাম্ভীর্যের ছাপ পড়েছিল সেদিন।

মন্মথ এসে দাঁড়িয়ে নত হয়ে তাঁকে নমস্কার করতেই তিনি তার দিকে তাকিয়েছিলেন—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভুরু দুটি কুঁচকে উঠেছিল। মন্মথর বুকখানা ভয়ে ধক্‌ধক্ করে লাফাতে শুরু করেছিল।

হেডমাস্টার মশায় ক্লার্ককে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে তাকে প্রশ্ন করেছিলেন—কাল তুমি বিভূতিদের বাড়ি গিছলে?

—না স্যার।

—যাও নি?

—আজ্ঞে না স্যার।

—ও। তবে যে হরিহর মিত্তির লিখেছেন—আমার পুত্র বিভূতি মিত্র এবং ওই ক্লাসের মন্মথনাথ ভট্টাচার্য নামক একটি ছাত্রের কাছে অবগত হইলাম—

মন্মথ বলেছিল—আমি ওদের বাড়ি যাই নি স্যার—আমার কাকাকে বিভূতির বাবা ডেকে পাঠিয়েছিলেন; কাকা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ক্লাসে আমাদের English-এর স্যার কি বলেছিলেন।

—কি বলেছিলেন বল তো আমাকে?

মন্মথ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে খানিকটা বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল। বুঝতে পারে নি কি বলবে কতটুকু বলবে।

—তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি বল। কি গালাগাল করেছিলেন হিন্দুদের?

—গালাগাল?

—হ্যাঁ।

—উনি স্যার খুব হাসিয়ে হাসিয়ে কথা বলেন। আর যার যা দোষ সব দেখিয়ে দেন। আমার 'এ্যাম এ্যাল এ্যান' উচ্চারণ নিয়ে স্যার আমাকে রোজ এসে বলেন—কে-এল-এম-এন-পি-কিউ। করেকশন করে দেন—সেই সূত্রে সংস্কৃত ভাষা নিয়েও কথা বলেন। আমাকে তাই বলেছিলেন—পণ্ডিত তুমি বলেছ লেখাপড়া শিখে দেশের গ্রামে ফিরে গিয়ে শাস্ত্রপাঠ করবে আর ঠাকুরদের পুজো করবে বলে যে মনে করে আছ সেটা তোমার হবে না। তুমি ইংরিজীর এমকে এ্যাম বল এখন কিন্তু পরে তা বলবে না। সংস্কৃতের চেয়ে ইংরিজীই ভালো শিখবে—আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি। তখন সংস্কৃত বিদ্যে তোমার প্রায় ওই মালা পৈতের

মতো করে দাঁড়াবে। উনি স্যার কুন্তলসেনরও খুব ঠাট্টা করেন। ও'র ঠাকুরদাদা ঠাকুরমা যা কালীকে মানতেন প্রণাম করতেন সেই সব কথা খুব হাসিয়ে হাসিয়ে বলেন।

ঠিক এইসময় 'গুড মর্নিং স্যার—আমাকে ডেকেছেন ?' বলে অফিস রুমে ঢুকেছিলেন রমেশ গোস্বামী স্যার। তাঁকে দেখে স্যার বলেছিলেন—প্যান্ডিট ? ইউ আর হিয়ার ? —তার পরেই গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন—আই সি !

—পড়। একখানা চিঠি তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন হেডমাস্টারমশায়। এবং নিজে আপিসঘরের বড় জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিলেন বাইরের আকাশের দিকে। নিষ্পলক দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছুকে যেন আবিষ্কার করতে চাচ্ছিলেন।

কলকাতার আকাশ তখনও নীল ছিল। এত ধুলো ধোঁয়ার আস্তরণ ছিল না। শুধু অনেক চিল উড়ছিল পাক দিয়ে দিয়ে। একটা কোণ ঘেঁষে উড়ছিল কতকগুলো শকুনি। সেইগুলোকেও তিনি ঠিক দেখছিলেন না। আকাশের নীল ও অসীম বিস্তারের মধ্যে ওই কালো কালো বিন্দুর মতো পাখিগুলোর দিকে তাকিয়ে তিনি কিছু ভাবছিলেন।

মন্মথ অবাক বা নির্বাক হয়ে শঙ্কিত চিত্তে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল। অনুমান করতে পারছিল না কি ঘটবে বা ঘটতে চলেছে। এই সমস্তটার মধ্যে অপরাধ কার কতটা তা ঠিক সে জানে না।

রমেশ গোস্বামী চিঠিখানা হেডমাস্টারের হাতে ফিরে দিয়ে বললেন—এ কি বলছে ?

—ও হরিহর মিত্তিরের কাছে যায় নি। মিত্তিরের লোক ওদের বাড়িতে এসে জিজ্ঞাসা করে গেছে—

—অ্যান্ড হি হ্যাজ—

—ওয়েট। হেসে হেডমাস্টার বললেন—তুমি যদি এতখানি তীক্ষ্ন না-হতে রমেশ ! আমি তোমার শিক্ষক। এত করেও তোমাকে শোধরাতে পারিনি।

একটু থেমে মন্মথর দিকে তাকিয়ে আবার বললেন—ভটচাজ কোনো অভিযোগ করে নি। আমি বরং আশ্চর্য হয়েছি রমেশ যে এই পাড়াগাঁয়ের গোঁড়া কোনো ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছেলে তোমার জিহ্বার স্পর্শ অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং খাঁটী সত্য অর্থেই নিতে পেরেছে। ওকে আমি মনে মনে বাহাদুরি দিয়েছি যে তোমার করকরে জিভের লেহনে দেহের চামড়া উঠে যায় নি। শার্পনেস অব ইয়োর টাঙ্ ইজ ওয়েল-নোন্ টু মি। আই অ্যাম ইয়োর টিচার। আই নো ! ওর উপর অবিচার তুমি ক'রো না। অথবা ওকে গণ্ডার কুম্ভীরও ভেবো না।

রমেশ মাস্টার খুশী হয়ে উঠেছিলেন এবং তার কাছে এসে তার পিঠে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন—প্যাণ্ডিট ! আই অ্যাম সো গ্ল্যাড ! সো ভেরী গ্ল্যাড ! ধন্যবাদ দিয়ে সে গ্ল্যাডনেসকে বোঝানো যাবে না ! তুমি নতুন যুগের মানুষ। নিউ সেঞ্চুরী—প্যাণ্ডিট। এ গ্রেট সেঞ্চুরী। এই তো তার সবে আরম্ভ। গ্রেট নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী। ঘুম ভেঙে জেগে ওঠার যুগ এটা মন্মথ। শুধু জেগে ওঠারও নয় চলারও যুগ এটা। বিভূতিদের যুগ নয় তোমার বাবারও যুগ নয় কাকারও নয়। এটা তোমার আমার যুগ। অ্যাণ্ড ইউ নো—আমরা কি করব ? হোয়াট ইজ আওয়ার মিশন ?

হেডমাস্টার মশায় অকস্মাৎ যেন সচকিত হয়ে বলে উঠলেন—রমেশ তোমার ক্লাসে যাও। অনেকক্ষণ সময় চলে গেছে।

রমেশ গোস্বামী চলে গেলেন।

হেডমাস্টার মন্মথকে বললেন—আমি খুব খুশী হয়েছি—তুমি সত্য কথা বলেছ। এবং আমি আরও খুশী হয়েছি—তুমি পড়তে এসেছ পড়া নিয়ে রয়েছ। গোঁড়াদের সঙ্গে একদলের লোকদের ঝগড়ার মধ্যে জড়িয়ে পড় নি। এই শ্রেণী মনোভাবকে বজায় রেখে চলো—

তোমার কাকা এখন নতুন বড়লোক হচ্ছেন—ওঁদের বাড়িতে থাকবে—একটু সাবধানে থেকো। তেমনি আবার একটু সাবধানে থেকো তোমাদের রমেশ স্যারের ইনফ্লুয়েন্স থেকে। এমন মানুষ হয় না। কিন্তু বড্ড বেশী নতুন কাল নতুন কাল বাতিক!

হঠাৎ হেসে বললেন—তোমার হাত দেখেন নি কোনো দিন?

—দেখেছেন দু'তিন দিন।

—বলেন নি তোমার হাত খুব ভালো? আশ্চর্য ভাগ্যের যোগ? আমাকে বলেছেন।

মন্মথ চুপ করে রইল।

—বলেন নি—ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ওঁর যুদ্ধ? বলেছেন?

মাস্টার মশায় কথার জের টেনেই চলছিলেন।

ভয় লাগল মন্মথর। সে চুপ করে রইল। মনে পড়ে গেল এই উগ্র গৌরবর্ণ রমেশ স্যারের সেই সব ভয়ংকর কথা। মাস্টারমশায় একদিন তাকে ওই গোলদীঘির পাড়ে বেঞ্চির উপর পাশে বসিয়ে টিফিনের সময় পুরো টিফিন আওয়ারটি বুঝিয়েছিলেন—নতুন সেঞ্চুরীর সকাল হয়েছে, এই সেঞ্চুরীতে একটা ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়েছে। যুদ্ধ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। এই সেঞ্চুরীতে বহু শতাব্দীর বৃদ্ধ ঈশ্বর মারা যাবেন, হয়তো বুড়ো হয়ে একেবারে শেষ পরমায়ু ক্ষণটুকু বেঁচে নিয়ে মরে যাবেন। অথবা এই গ্রেট ওয়ারের শেষে হেভেনের ফটক ভেঙে মানুষেরা ঢুকবে আর ঈশ্বর হার্ট ফেল করে মারা যাবেন।

এত ভয় পেয়েছিল মন্মথ। রাত্রে ঘুমুতে পারে নি পাঁচ সাত দিন।

শেষ পর্যন্ত রাধাশ্যামকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিল। রামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করে এসেছিল; বিবেকানন্দকে দেখে এসেছিল। রাখাল মহারাজকে দেখেছিল। তাতে খানিকটা যেন শান্তি ফিরে পেয়েছে।

শান্তি এতেও হয় নি। কি করে মন্মথর দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার কথা শুনে রমেশ স্যার অট্টহাস্য করে বলেছিলেন—ঈশ্বরের শেষ সেনাপতি এদেশে হলেন মা কালী। কিন্তু তাও টিকবে না।

রাধাশ্যাম তাকে বলেছিল, অবশ্য সব কথা রাধাশ্যামকে সে বলে নি, তবুও যতটুকু শুনেছিল রাধাশ্যাম ততটুকু শুনে তার বাবার কাছে নিয়ে গিয়েছিল মন্মথকে। তিনি তার হাত দেখে বলেছিলেন—তুমি বাবা কৃতী পুরুষ হবে। খুব কৃতী পুরুষ। তোমার কাকা আজ যা করেছেন যা হয়েছেন তা থেকে অনেক বড় হবে। তোমাদের ওই পাগলা কৃশ্চান মাস্টারটি খুব গুণী লোক বাবা। তবে কি জান? ওর সাধনা তিন জন্মের সাধনা। এবং এই যে নতুন যুগ তারও ওই তিন জন্মের সাধনা। মেতো না। এতে মেতো না। শুধু নিজের কাজ পড়া তাই পড়ে যাও। ওসব ভাববে বড় হয়ে!

•

চিঠিখানা পাশে পড়ে ছিল। মন্মথ নৌকার ছইয়ের ভিতর বসে কথাগুলি ভাবছিল। তার কাকা গোবিন্দপুরে চৈত্রমাসে 'জটাধর জননী' নাম দিয়ে কালী পুজোর প্রতিষ্ঠা করছেন। শুনেছে এর পর অষ্টধাতুর অন্নপূর্ণা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবে। তার আগে সম্পত্তি কিনবে অনেক। অনেক সম্পত্তি। তবে ব্যাপার খুব সোজা নয়। এ কালে প্রায়ই তিন চারখানা গ্রাম অন্তর অন্তর এক এক ঘর বড়লোক গড়ে উঠেছে। সকলেই চাইছে বড় হতে বড়লোক হতে!

নৌকাখানা ঘাটে লাগল। নৌকা থেকে নামল মন্মথ। নামল সে নিজেদের গ্রামের ঘাটে। তার মাতামহীকে আনতে গিয়েছিল গতকাল; সেখানে পেঁাছেছিল বিকেলবেলা। মাতামহী তাকে খুব সমাদর করে কাছে বসিয়ে সেই শুরু থেকেই আরম্ভ করেছিলেন—'তার

বাবার বিয়ের কথা।'

তার মা যখন মারা যান তখন দিদিমা বাবাকে বিয়ে করতে বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন—মন্মথ প্রমথ গণেশ কার্তিক দুই ছেলে। আবার বিয়ে কেন? কিন্তু সেই দিদিমারই ছোটবোনের এক মেয়ে এই ক'বছরে বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠেছে; বর জুটছে না; তাই দিদিমা ধরেছে বোনঝির সঙ্গে মৃতদার জামাতার বিয়ে হোক এবং সম্পর্কটা নতুন করে ঝালাই হোক। প্রস্তাব শুনেই সে চমকে উঠেছিল। অবশ্য পুরুষের বিশেষ করে অবস্থাপন্ন লোকের এবং কুলীনদের দুটো তিনটে চারটে বিয়ে একেবারে ডালভাতের মতো সহজ এবং সাধারণ কথা। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য কুলীন ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, শিষ্যসেবক আছে, লাখেরাজ কিছু আছে। তার তো স্ত্রী থাকতেই আরও দু'একটা বিয়ে করা স্বাভাবিক। তা সে করে নি। তারপর স্ত্রী মারা গেছে—দুই ছেলে ছিল, তার একজন গেছে, এখন সংসারে একা। তার উপর ওই এক বংশধর। একলার সংসারে কে রান্না করে কে তেল পিদিম করে সন্ধ্যে জ্বালে। এতদিন চলেছে চলেছে—এখন বয়স এগুচ্ছে—চল্লিশ পার হয়ে বিয়াল্লিশ হল। চোখে চালশে ধরেছে। দেশে ম্যালেরিয়া জ্বরজ্বালা। তার উপর এক ছেলে ছেলে নয়। গেল তো বংশের বাতি নিভিয়ে গেল। সুতরাং—

তা ছাড়াও অন্য মেয়ে হলে হত। বলা চলতো—না। এ হয় না। হবে না। কিন্তু এ যে স্ত্রীর মাসতুত বোন। এ তো একরকম বিধির নির্দেশ।

এই ধরনের বাগবিস্তারের মধ্যে খেই হারিয়ে ফেলেছিল মন্মথ। দিদিমা ধরেছিলেন—"তুই উপযুক্ত পুত্র। বাপের বিয়ে দিয়ে তুই সুপুত্রের কাজ কর ভাই। তোর নামে দেশে ধন্য ধন্য পড়ে যাক।"

জালে আবদ্ধ জন্তুর মতো অবস্থা হয়েছিল মন্মথর। কি বলবে ভেবে পায় নি। কি করে বাড়ি থেকে বেরুবে ভেবে পায় নি। এরই মধ্যে ঠিক সন্ধ্যের সময় ওই মাঝিদের একজন খানিকটা নুনের জন্য এসেছিল বাড়িতে। সেই সুযোগে মন্মথ বিছানায় বালিশ শুইয়ে চাদর ঢাকা দিয়ে চুপিসাড়ে বেরিয়ে গঙ্গার ঘাটে এসে নৌকোয় উঠে বসে বলেছিল—"মাঝি নৌকো ছাড়ো। আমি দশ টাকা বকশিশ করব তোমাদের। আমি খুব জরুরী কাজ ভুলে এসেছি।" কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে জরুরী কাজটার গলায় একটা পাঁচহাজার টাকার থলি ঝুলিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল—"মাঝি আমি বিছানার গাদার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকার একটা তোড়া রেখে ভুলে গিয়েছিলাম, সেই অবস্থায় চলে এসেছি। এখুনি ফের। আমি বিশ টাকা বকশিশ করব। আর প্রত্যেককে এক একখানা নতুন কাপড়।"

তখন সবে ভাটির টান পড়তে শুরু করেছে। আসতে হবে চন্দননগরের কাছাকাছি ঘাট থেকে কালনার কাছাকাছি ঘাটে। কিন্তু তাতে আটকায় নি। মানুষ সব পারে। সারারাত উজানে গুন টেনে নৌকো বেয়ে সকালে সে ফিরে এসেছে।

ঘাট থেকে সে একলাই বাড়ি ফিরল না। অন্য একখানা নৌকো ঘাটে বাঁধাই ছিল—সে নৌকোয় ছিল রাধাশ্যাম আর তার বাবা পণ্ডিতমশায়। তাদের সঙ্গে নিয়েই সে বাড়ি পৌঁছুল।

পুরনো কালের ভটচাজ বাড়ি বলে চেনাই যাচ্ছিল না। পুরনো ভটচাজ বাড়ি তো নয়, এ হল নতুন কালে গোবিন্দপুরের জটাধরবাবুর বাড়ি।

দ্বিতীয় পর্ব

বারো বছরে আমরা যুগ গণনা করি। ১৮৭২ সাল থেকে ১৮৮৬ সাল বারো বছর নয় চোদ্দ বছর। চোদ্দ বছর পর দ্বিতীয় পর্বের আরম্ভ।

হুগলী জেলার গোবিন্দপুরে বহুপুরুষের বৈষ্ণব পন্থার সাধক ভট্টাচার্য বংশ অকস্মাৎ সাধনভজনের বেদী থেকে নেমে এসে একালের (ঊনবিংশ শতাব্দীর নবম শতকের) নতুন অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে। একটি বাবুদের বাড়ি বা ঘরের প্রতিষ্ঠা করলে।

একটু খুলে বলতে হবে। এখানকার মানুষের কাছে এটি কোনো নূতন সংবাদ নয়। একটি চিরকেলে কথার কথা। বাংলাদেশে অভিজাত শ্রেণী চিরকালই গ্রামে গ্রামে আছে। কিন্তু না। তা ছিল না। ১৭৫৭ সালে বাংলা বেহার উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময় এ দেশের পরগনার সংখ্যা ছিল ষোলোশো ষাট। নবাবী আমলে পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট ছিল না অর্থাৎ জমিদার শ্রেণী ছিল না। একটা শ্রেণী ছিল—তাদের উপাধি ছিল রাজা বা রায়, খাঁ সাহেব বা নবাব সাহেব। এরা নবাবের কাছে সনদ পেয়েছিলেন। নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দিয়ে জায়গীরভুক্ত অঞ্চলগুলিকে রাজ্যের মতো শাসন করতেন। এদের প্রতিপালক এবং দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা ছিলেন। ষোলশো ষাট পরগনার মধ্যে একটা বৃহৎ অংশ ছিল বাংলার নবাবের খাস, বাকি একাংশ ছিল এই সব রাজা খাঁ সাহেবদের অধীনে। এক একজনের জায়গীর ছিল তিন চার থেকে পাঁচ সাত কি তারও বেশী সংখ্যক পরগনা। সুতরাং তাদের সংখ্যা ছিল কয়েক শত মাত্র। নবদ্বীপে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, নাটোরে মহারানী দেবী স্বরূপিণী রানী ভবানী, বীরভূমে রাজনগরের রাজারা ছিলেন এদের মুখপাত্র। রাঢ় বাংলা অর্থাৎ হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া এ সব অঞ্চল অধিকাংশই খাস অঞ্চল ছিল। এ সব অঞ্চলে সাধারণ মানুষেরা সেকালের সেই মনুর সমাজ ও প্রাচীন পৃথিবীতে বাস করতেন। আপনাপন বৃত্তি নিয়ে কোনোরকমে করে কর্মে খেতেন। মাটির দেওয়াল খড়ের চাল। কিছু জমি। একটা বাগান একটা পুকুর থাকলেই সে ছিল মা লক্ষ্মীর সমাদরের সন্তান। কামার কুমোর ছুতোর নাপিত নিজের নিজের কুলকর্ম করত। স্ববৃত্তি ছাড়লে তাকে পতিত হতে হত। ছুৎ পতিতের আর আদি অন্ত ছিল না। দশ হাত বিশ হাত লম্বা একটুকরো নারকেল ছোবড়ার দড়ি বা বাবুই ঘাসের দড়ি কি খড়ের দড়ি যদি কোনোক্রমে পথের উপর পড়ে থাকত তাহলে বিপর্যয় ঘটানোর মতো কাণ্ড ঘটে যেতে। দড়ির এ মাথায় কোনোও আঁস্তাকুড় বা এঁটো পাতা বা ব্রাত্যদের কেউ ছুঁয়ে থাকলে সারা পাড়াটার লোকেরই ছোঁয়াচ পড়ে যেত। সে বিমলা পিসী থেকে নিস্তারিণী ঠাকরুন এবং তার দিকে হাত বাড়িয়ে তর্কবাগীশ ও স্মৃতিরত্ন পর্যন্ত গঙ্গাস্নানের ফেরে পড়তেন।

তবে টাকায় কয়েক মণ চাল ছিল। সায়েস্তা খাঁ টাকায় আট মণ চাল করেছিলেন ; তা আট মণ আলিবর্দী সিরাজউদ্দৌলার আমলে ছিল না কিন্তু দু'তিন মণ ছিল। সস্তাগণ্ডার বাজার হলে টাকায় চাল চার মণে নামত।

'হরি বললে কাঁড়া চাল' মিলত। গনাগনুতিতেও ভিক্ষুকের সংখ্যা নির্ণয় করা যেত না। চব্বিশ ঘণ্টার দিন রাত্রি অত্যন্ত দীর্ঘ ছিল। কোনোমতে আপনাপন বৃত্তিতে রত থেকে দিনটা কাটিয়ে সন্ধ্যায় হরিভজন করে প্রথম প্রহরের শিবারব হবার পূর্বেই মানুষেরা—শয়ন করত। বছরে ওই পুজোপার্বণগুলি বাদ্যভাণ্ড বহু কৃচ্ছ্র সাধনের ও তপশ্চর্যার মধ্যে দিয়ে অনেক মিথ্যা আশ্বাস এবং সত্যকারের আনন্দ বহন করে আনত। ঢাকীরা ঢাক বাজাত, চরকে ভক্তরা বাণ ফুঁড়ত, জয়ধ্বনি দিত, আগুনের উপর নাচত এবং সারাটা দেশসুদ্ধ লোক

আমরা অবাক হয়ে দেখতাম। দেখি নাই তবে শুনেছি এবং পড়েছি—যা শুনেছি ও পড়েছি তাতে মনে হয় সে-কালের আনন্দ এবং উৎসব দেখে আমরা কেবল অবাকই হতাম।

ব্রাহ্মণদের টোল ছিল। গুরুদের গুরুপাট ছিল। মহান্তদের আখড়া ছিল, তান্ত্রিকদের শক্তিপাঠ ছিল। তা' ছাড়া পীর সত্যপীর পাঁচুঠাকুর শিবনাথ থেকে মনসাতলা ছিল, সুন্দরবন অঞ্চল ছিল বাঘরায়।

এই থেকে দেশ পাশ ফিরল। নিজে ফিরল না ঠিক কোম্পানি ঘুরিয়ে দিল। নিজের গরজে দিল। জায়গীর সমেত বাংলাদেশে পারমেনেন্ট সেটেলমেন্ট করে পত্তনীদার দরপত্তনীদার সৃষ্টি করলে তারা। ষোলশো ষাট পরগনা ছিল, আর তাতে ছিল শ' কয়েক রাজা নবাব মহারাজা। তার স্থলে হাজার চার পাঁচ জমিদার সৃষ্টি হল। তার সঙ্গে ভুঁইফোড়ের মতো গজিয়ে উঠল আর একদল মুখোল চোখাল এবং তীক্ষ্মবুদ্ধি মানুষ। এরা হল বাংলাদেশের নতুন কালের ব্যবসায়ী সমাজের লোক। কোম্পানির অধীনে কলকাতা বড় শহর হয়ে গড়ে উঠবার সমসাময়িক কাল থেকে হুগলী চন্দননগর শ্রীরামপুর থেকে কলকাতা পর্যন্ত যে সমস্ত বিভিন্ন ইয়োরোপীয় ব্যাবসায়ী কোম্পানি কুঠি তৈরি করে ব্যবসা ফেঁদেছিল তাদের সহায়তা করে একদল , একদল বললে কম বলা হবে—সে একটা থাক মানুষ বেশ সঙ্গতিপন্ন হয়ে উঠে পুরনো কালের ভাঙাচোরা পলেস্তারাওঠা জীর্ণ বাড়ি ঘর ভেঙে নতুন কালের এই এক অভিজাত বংশের সৃষ্টি হল।

এ দেশে মাটি পোড়ানোর অর্থাৎ পোড়া ইটের বাড়ি এক মন্দির ছাড়া কেউ করত না, এবার পাকা বা পোড়া মাটির ইটের বাড়ি তৈরি হল। দগ্ধ মৃত্তিকার বাড়িতে বাস করলে মঙ্গল হয় না এ ধারণাটা ছিল মানুষের মনে বদ্ধমূল। আগের কালে এই অপরাধ খণ্ডনের জন্য দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা আগে করে তারই সঙ্গে যেন অনেকটা সেই মন্দির এবং দেবতাকে বুড়ী ছোঁয়ার মতো ছুঁয়ে পাকাবাড়ি তৈরি করত। একালে সেই দেবমন্দিরের সংজ্ঞাটা ক্রমশ হরিমন্দির বা তুলসীমন্দির প্রতিষ্ঠাতেও পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু যেখানে সম্পদ আছে সেখানে সে বেশ মাথা চাড়া দিয়েই ঠেলে উঠেছে।

গোবিন্দপুরের ভটচাজেরা এখানকার স্থায়ী বা পুরানো বাসিন্দা নন। ও'রা এখানকার দৌহিত্র। পুরানো ভটচাজদের ভিটেতে উত্তরাধিকারী হিসেবে বাস করেছেন। এ অঞ্চলে লোকেরা এ বাড়িকে বলত ঠাকুরবাড়ি। ভটচাজেরা ঠাকুরমশায় ছিলেন। গত চোদ্দ বছরের মধ্যে ঠাকুরবাড়ির নাম হয়ে গেল ভটচাজবাবুদের বাড়ি। গঙ্গাধর জটাধর আর ভটচাজমশাই কি ঠাকুরমশাই রইলেন না, গঙ্গাধরকে লোকে বলতে লাগল বড়কর্তা আর জটাধর হলেন বাবুমশাই। মন্মথ ওই জটাধরজননী প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই খোকাবাবু হয়ে গিয়েছিল গ্রামে। গোবিন্দপুর গ্রাম থেকে গঙ্গার ঘাট চার মাইল পথ—রেল স্টেশন আরও খানিকটা বাঁয়ে গিয়ে চুঁচড়ো—আরও মাইল দুই পথ রাস্তাটা পাকা হয়ে গেল। জটাধরবাবুই করালেন। চুঁচড়ো থেকে কেরাঞ্চি গাড়ি চলে আসে।

কলকাতা শহর আরও দ্রুতবেগে ছুটছে।

বড় বড় রাস্তাগুলোর দুপাশে ফুটপাথ তৈরি হয়ে গিয়েছে। কলের জল হয়েছে। কলের জল হওয়ায় কলকাতার স্বাস্থ্য পালটেছে। নোনালাগা বলে একটা রোগ ছিল যেটা আসলে পেটের গোলমাল সেটা কমে আসতে শুরু করেছে; দোকানপসার বাজারহাট দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে জেঁকে উঠছে। ধর্মতলা থেকে কালীঘাট পর্যন্ত বড় রাস্তাটা চৌরিঙ্গী রোড—কলকাতা শহরের সবথেকে সেরা সড়ক; হ্যাঁ একেই বলে রাজপথ। ধর্মতলার মসজিদের ওখানে মিশেছে ধর্মতলা বেন্টিংক স্ট্রীট। সেখান থেকে সোজা দক্ষিণমুখে গেছে

সারকুলার রোড কেটে ভবানীপুর হয়ে মায়ের স্থান কালীঘাট। প্রশস্ত রাস্তা চৌরিঙ্গী—এতটুকু কাদা নয় ধুলো নয়, খোয়া পিটিয়ে রোলার চালিয়ে পাকা করা হয়েছে। রাস্তাটার পশ্চিমে বিস্তীর্ণ ময়দান গড়ের মাঠ। তার পশ্চিমে স্ট্র্যান্ড রোড—তারপর গঙ্গা; গঙ্গার ঘাট—জেটি। দক্ষিণ দিক ঘেঁষে কেল্লা। ফোর্ট উইলিয়ম। উত্তরে ইডেন গার্ডেন, হাইকোর্ট, লাটসাহেবের বাড়ি। ময়দানটা সুন্দর সমতল সবুজ। লোকে বলে আগে নাকি এখানটা জলা ছিল। গঙ্গার জোয়ার এলে জোয়ারের নোনা জলে ময়দানটা ভরে থাকত। এমন সমতল। মধ্যে মধ্যে বড় বড় গাছ তৈরি হয়ে উঠেছে। সুন্দর বিন্যাসে গাছগুলি লাগানো। এ-মাঠে গোরা পল্টনেরা কুচকাওয়াজ করে। এই সবুজ মাঠটিকে সামনে রেখে চৌরিঙ্গী রাজপথ। রাস্তাটার পূর্বদিকে সব প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা। বড় বড় বাড়ি, তিনতলা চারতলা উঁচু—তেমনি গড়নের বাহার। এ সব হল দোকান, হোটেল আর আপিস; বিলেতের দুর্লভ দ্রব্যসামগ্রীতে ভরা। সে গুলিকে এমন সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে যে চোখ পড়লে আর ফেরানো যায় না। এরই মধ্যে আছে জাদুঘর—মরা জন্তু, পাথরের মূর্তি, পুরনো আমলের কত জিনিস উদ্ধার করে রাখা হয়েছে। চৌরিঙ্গীর দুই পাশে লোহার তৈরি সুন্দর থামের উপর গ্যাসের আলো; সারিবন্দী হয়ে সোজা চলে গেছে। চৌরিঙ্গী থেকে পূর্বদিকে পার্ক স্ট্রীট চলে গেছে থিয়েটার রোড চলে গেছে। এসব অঞ্চলে মাছি নাই মশা নাই—ঝকঝক তকতক করছে চারিদিক, সিঁদুর পড়লে তোলা যায়। এখানে সব বড় বড় সায়েব মেমরা বাস করে।

সারকুলার রোডে কলকাতা শহর শেষ। রাস্তাটার নামই হল কলকাতা শহরের বেড় রাস্তা। এর পর ভবানীপুর—পূর্বে গ্রাম ছিল এখন ধীরে ধীরে শহরের চেহারা নিচ্ছে। কালীঘাট এখনও গ্রাম। রাঙচিতের বেড়া ঘেরা ছিটেবেড়ার ও খোলার চালের বা গোল-পাতার ছাউনি ঘরের বসতি, মধ্যে মাঝে কিছু কিছু পাকা বাড়ি, মায়ের থান বরাবর একটা বাজার—এই নিয়ে কালীঘাট। কালীঘাটও পালটাচ্ছে। কালীঘাটের পাণ্ডারা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে সারকুলার রোড ও চৌরিঙ্গীর জংশনে। পায়ে হেঁটে ছ্যাকরা গাড়িতে ডুলিতে সব মায়ের থানের যাত্রী আসে, তাদের কপালে সিঁদুরের টিপ পরিয়ে আপন যাত্রী যজমান করে নেয়।

ধর্মতলা রোড থেকে দুটো রাস্তা উত্তরমুখে চলে গেছে—একটা প্রথমে বেন্টিংক স্ট্রীট পরে চিৎপুর রোড হয়ে চলে গেছে সেই মারাঠা খালের ধার পর্যন্ত—সেখান থেকে খালের পশ্চিম-দিকের পুল পার হয়ে কাশীপুর রোড ধরে বরানগর বাজার হয়ে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের সঙ্গে মিশেছে। অন্যটা ওয়েলিংটন থেকে শ্যামবাজার হয়ে খালের পূর্বদিকের পুলটা পার হয়ে বি. টি. রোডের সঙ্গে মিশেছে। বি. টি. রোড চলে গেছে উত্তরে বারাকপুর পর্যন্ত। বারাক-পুরে লাটসাহেবের বাগান আছে। কিন্তু এ রাস্তাতেও একটা যেন ছেদ টেনে দিয়ে কলকাতার কুলদেবতা মা কালীর অভ্যুদয় হয়েছে। দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণী নিজেকে প্রকাশ করেছেন। রানী রাসমণির ভাগ্য জন্মজন্মার্জিত পুণ্য আর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের তপস্যার ফলে। তিনি নাকি রামকৃষ্ণ পরমহংসকে সশরীরে জীবন্ত হয়ে উঠে দেখা দিয়ে-ছিলেন। রামকৃষ্ণদেব তখন ছিলেন গদাধর চাটুজ্জে, রানী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত পাথরের তৈরি কালী প্রতিমার পূজক। সে মূর্তি পাথরের মূর্তিরূপেই বিরাজিত রয়েছেন দক্ষিণেশ্বরে। পাথরের মূর্তির পায়ে মাথা কুটেছিলেন রামকৃষ্ণদেব, গদাধর চাটুজ্জে—কিন্তু পাথরের মূর্তি—সাড়া দূরের কথা কোনো ইঙ্গিত ইশারাও দেননি। শেষ পর্যন্ত গদাধর পূজার ঘরে যে বলির খড়্গখানা থাকে, সেই খড়্গ তুলে যেই নিজেকে বলি দিতে চেয়েছিলেন অমনি সঙ্গে সঙ্গে পাথরের দেবতা সত্যকারের দেবতা হয়ে আবির্ভূতা হলেন। প্রথমে জ্যোতি—তারপর নাকি মা মানবী মূর্তিতে তাঁকে দেখা দিয়ে বলেছিলেন—না—না রে না। এই

দেখ আমি এসেছি।

রামকৃষ্ণ হাহা করে কেঁদেছিলেন—হেসেছিলেন।

মা বলেছিলেন—এবার তোকে আমার সত্যকারের পূজো করতে হবে বাবা। ফুল বেলপাতা গঙ্গাজল দিয়ে দৈনন্দিন পূজা করবি ভোগ দিবি—সে নেব আমি—ভক্তের ছোট প্রার্থনা পূরণ করব। দুঃখ হরণ করব। সবই হবে তোর মুখ দিয়ে তোর হাত দিয়ে। কিন্তু তাছাড়া পূজো আছে—বড় পূজো আমার।

—সে কোন্ পূজো মা?

—আমার এই মাতৃরূপকে জাগিয়ে রাখা বাঁচিয়ে রাখা। লোকে অবিশ্বাসী হয়ে গেল নাস্তিক হয়ে গেল। তুই মানুষকে বিশ্বাস করা যে আমি আছি।

এই বলে লোকে। এই বিশ্বাসই নতুন কালের আপামর জনসাধারণের বিশ্বাস। এম. এ, বি. এ. পাশ করা বড় বড় চাকরেরা কলেজের ছোকরারা এর আগে গোলদীঘির পাড়ের উপর বসে মদ খেতো, অস্পৃশ্য মাংস খেতো, ঈশ্বরে বিশ্বাস করত না; তারা থমকে গেছে। তাদের একটা অংশ এখন নতুন করে বিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। এমন কি ব্রাহ্মরা যারা এই ধরনের কিছু মানি না দলের না-হলেও ঠাকুরদেবতায় বিশ্বাস করত না প্রণাম করত না, তারাও রামকৃষ্ণের এই ঈশ্বরের মাতৃভাবকে মানে! বিদ্যেসাগরের বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়েও যে কিছু হল না তার একটা কারণ ঠাকুরের ধর্মবিশ্বাসও বটে। ধর্মবিশ্বাস ফেরাবার জন্যে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর ভক্তেরা এসেছেন। সিমলের দত্তবাড়ির এক আশ্চর্য ছেলে নরেন। সে ঠাকুরের সব থেকে প্রিয়। আর একজন হল গিরিশ ঘোষ! বাঙালীরা নতুন কালে বিলিতী ব্যাপার থিয়েটার খুলেছে কলকাতায়। নাটক হয় সেখানে। স্টার থিয়েটারে গিরিশ ঘোষ 'চৈতন্যলীলা' নাটক অভিনয় করে সে একেবারে ভক্তির বন্যা বইয়ে দিয়েছে। লোকে কেঁদে আকুল। স্বয়ং পরমহংসদেবের ভাবসমাধি হয়েছিল। চৈতন্য-লীলায় বিনোদিনী নটী সেজেছিল চৈতন্য, ঠাকুর তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন। লোকে বলে, বিশ্বাস করে, নটী এবং বেশ্যা হলেও বিনোদিনী এই জন্মেই উদ্ধার হয়ে গেল এই পুণ্যেই।

সাক্ষাৎ নরদেহে নারায়ণ—একাধারে রাম এবং কৃষ্ণ; গোটা বাঙালী জাতকে বাঁচাতে এসেছিলেন—বাঁচিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। তাঁর ভক্তেরা ও নরেন দত্তরা সন্ন্যাস নিয়ে তাঁর কাজ করবে।

পরমহংসদেব দেহ রেখেছেন।

১৮৮৬ সালের আগস্ট মাসে মহাপ্রয়াণ করেছেন কিন্তু তাঁর মহিমা সারা দেশের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। আজকাল দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী মন্দিরে এবং রামকৃষ্ণদেবের শেষ লীলাস্থল বরানগরের বাগানে লোকজন দলে দলে আসে।

বারাকপুর ট্রাংক রোডের উপর চিড়িয়ার মোড়। ওই মোড়ে ছ্যাকরা গাড়ির একটা আড্ডা। যাত্রী নিয়ে যায়। আবার নিয়ে আসে। চিড়িয়ার মোড় অর্থে এখানে এক সাহেবের বাগানবাড়িতে আগে অনেক জন্তুজানোয়ার ছিল। লোকে দেখতে যেত। বি. টি. রোড থেকে একটা রাস্তা পুবমুখে দমদমের দিকে গিয়ে দমদমের মোড়ে যশোর রোডের সঙ্গে মিশেছে। এখানে ভিড় প্রায় চব্বিশ ঘন্টাই।

এখানেই সেদিন একখানা ছ্যাকরা গাড়ি যেতে যেতে হঠাৎ থেমে গেল। ভেতর থেকে সওয়ারীদের একজন চিৎকার করে উঠলেন—রোখো, রোখো—ওরে বাবা কোচোয়ান গাড়ি রোখো।—শুনছ—?

গাড়ির ভেতর গঙ্গাধর ভটচাজ, একটি তরুণী আর মন্মথ। কোচবক্সে কোচম্যানের

পাশে একজন গ্রাম্য লোক। গ্রাম্য পরিচয়টা তার বেশভূষায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে আছে। গাড়ি রুখতেই গঙ্গাধর বললেন—মন্মথ, আমি আর যাব না। তুই যা। জটাধরকে বলিস কালীঘাটের মায়ের ইচ্ছে নয় যে আমি আজ যাই। আমি নতুন বউকে নিয়ে কাল ফিরব। বুঝলি!

মন্মথ বাপের মুখের দিকে বেশ খানিকটা বিস্ময়ের সঙ্গেই তাকিয়ে রইল। তারপর বললে—কেন বাবা?

—না। আমার বেশ ইচ্ছে হচ্ছে না। তা' ছাড়া—

মন্মথ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করেই রইল। গঙ্গাধর বললেন—তাছাড়া মন্মথ, নতুন বউ—মানে তোর ছোট মাকে খুব অনিচ্ছাসত্ত্বে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—এর ফল ভালো হবে না।

মন্মথ অনেকক্ষণ চুপ করে রইল তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—বেশ। তা' হলে এই গাড়িতেই আপনারা ফিরে যান—আমি একটা শেয়ারের গাড়িতে সীট নিয়ে চলে যাবো।

—সেই ভালো।

মন্মথ বাপকে এবং নতুন বউ অর্থাৎ তার বিমাতাকে পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করে গাড়ি থেকে নেমে গেল।

মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে গঙ্গাধর বললেন—তুই কলকাতায় এই তিন বছরে বড্ড পালটে গিয়েছিস মনু। তুই আলাদা হয়ে গেলি। তিনিও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

"জটাধর-জননী" প্রতিষ্ঠারও প্রায় মাস চারেক পরের ঘটনা এটি।

গঙ্গাধর ভটচাজ দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করেছেন। নতুন বউ সেই দ্বিতীয়া পত্নী। এবং এই বউ আর কেউ নয়, এ হল মন্মথের মাতামহীর স্থির করা কন্যা, তাঁর আপন বোনঝি অর্থাৎ মন্মথর মাসীমা তার মায়ের মাসতুতো বোন। এরই বিবাহের কথা মন্মথকে বলেছিলেন তার মাতামহী, যখন মন্মথ তাঁদের আনতে গিয়েছিল জটাধর-জননী পুজার সময় বৈশাখ মাসে। মন্মথ তখন পালিয়ে এসেছিল। মন্মথ পালিয়ে এলেও তার দিদিমা নিরস্ত হন নি—তিনি বোনঝিকে সঙ্গে করে নিয়ে একদিন পরেই গোবিন্দপুর এসেছিলেন।

গঙ্গধর ভটচাজ—অন্য কন্যা হলে কি বলতেন তিনিই জানেন—কিন্তু এই কন্যা সম্পর্কে খুব শক্ত করে বা জোর করে 'না' বলতে পারেন নি। কাদম্বরীর সঙ্গে মন্মথর মায়ের মুখের আশ্চর্য আদল, কাদম্বরীর বয়স সতের-আঠারো পার হতে চলেছিল। সুতরাং মন্মথর মা পুনর্জন্ম নিয়েছেন এ কথা বলা চলে না; কারণ মন্মথর মা মারা গেছেন মাত্র ছ সাত বছর, আর পূর্বেই বলেছি কাদম্বরীর বয়স সতের-আঠারো। তা হলেও অর্থাৎ পুনর্জন্মের কথা বাদ দিয়েও এই সাদৃশ্যের একটা যেন দাম আছে কোথাও। অন্তত এমন ক্ষেত্রে আছে।

সে সময় জটাধরের স্ত্রী কৃষ্ণভামিনী কিন্তু কতকগুলো কটু কথা বলেছিল তাঁকে অর্থাৎ মন্মথর দিদিমাকে। তার সঙ্গে তাঁর বোনঝি এই সৌভাগ্যাকাঙ্ক্ষিণীকেও বলেছিলেন। সে বাক্যগুলি শুধু তীক্ষ্ণই ছিল না সঙ্গে এমন কিছু রঙ্গরস মিশ্রিত ছিল যার মধ্যে জ্বালা ছিল মর্মান্তিক। কুলীনের মেয়ে কাদম্বরী। সেকালে তার বাপের বাড়িতে তার দুই পিসী সারাজীবন পাল্টা ঘরের কুলীন বর অভাবে কুমারীই থেকে গেছেন। এ মেয়েরও কুমারী থাকার কথা। হঠাৎ মিলে গেল বর। গঙ্গাধরেরা তাদের পাল্টী ঘর বটেন। তাদের পূর্বপুরুষেরাও জন কয়েক বিবাহকে পেশাও করেছিলেন। এদিকে সর্বাপেক্ষা পুণ্যশ্লোক যিনি তিনি চব্বিশটি বিবাহ করেছিলেন। চব্বিশের মধ্যে একটি সুন্দর হিসাব আছে—যাতে করে পনের দিন এক এক শ্বশুরবাড়িতে কাটালে বৎসরটি নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় হাটবাজার না

করে চাষবাসের ঝঞ্ঝাট না পুইয়েও জীবন কাটানো যায়। কিন্তু প্রথাটা গত একশো বছরের মধ্যে যেন উচ্ছেদ হতে শুরু করেছে। রামমোহনের সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ পুরোপুরি হয়েছে, উঠে গেছে। বিধবাবিবাহ আইন পাস হয়েও কিন্তু চলে নি বা চলছে না। বিধবারা বিয়ে করছে না। তার সঙ্গে এই কুলীনদের বিয়ে নিয়ে আন্দোলন হয়েছে বা হচ্ছে বড় কম না। শুধু কুলীন কেন বড়লোক ধনী লোক যারা তারাও সব বিয়ে করতো দুটো তিনটে চারটে। স্ত্রীর বয়স হলেই বিয়ে করতো এবং এখনও তারা বিয়ে করে। কুলীনেরা বড়লোক নয়— তারা ধর্ম সমাজ জাতের দোহাই দিয়ে বিয়ের ব্যবসা করে। এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও গঙ্গাযাত্রার পথে কুলীনের ছেলের ডুলি আটক করে অরক্ষণীয়া কুলীনকন্যার সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে তাকে উদ্ধার করে দিয়ে যেতো। বহু-বিবাহ বন্ধ করার জন্যে আন্দোলনও অনেকটা যেন বিধবা-বিবাহের দশা পেয়েছে মনে হলেও কলকাতায় এবং আশেপাশে এতে যেন মন্দা পড়েছে। গঙ্গাধর কুলীনসন্তান হয়েও একটার বেশী বিয়ে করেন নি। জটাধর বিয়ে হবার আগে পালিয়ে গিয়েছিল—তারপর দেশ দেশান্তর ঘুরে, যার তার সঙ্গে খেয়ে, যা মন চায় তাই করে কলকাতায় ফিরে কৃষ্ণভামিনীর বাপের মতো নটীদের পুরোহিত ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করে শুধু বিষয় সম্পদই অর্জন করে গণ্যমান্যই হয় নি—সে এই ধরনের প্রথাগুলির প্রতিও বিরোধী হয়ে উঠেছিল। জটাধরের চেয়েও বেশী বিরোধী ছিল বন্ধ্যা কৃষ্ণভামিনী। তার পক্ষে এটা স্বাভাবিকই ছিল। গঙ্গাধর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ—১৮৮০/৮১ সালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ; নিষ্ঠাবান হিন্দু ; কুলীনের সন্তান বলে নিজেকে পুণ্যবান এবং অধিকতর শুচি বা আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত বলেও মনে করতেন কিন্তু বহু-বিবাহ তিনি করেন নি। করেন নি তার কারণ তাঁর প্রথম জীবনে যখন তিনি টোলে পড়তেন তখন চুঁচুড়ার ইংরেজী ইস্কুলের ছাত্রদের জীবন দেখে অনেকটা মুগ্ধ হয়েছিলেন ; তাদের সব কথাবার্তা তাঁর ভালো লাগত। ইচ্ছা হত ইংরেজী ইস্কুলে পড়েন। কিন্তু তা হয় নি। ক্রমে অবশ্য শাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে এবং দেবার্চনা ও গুরুগিরি পেশার প্রভাবে, এই পেশানির্দিষ্ট জীবনচর্চার ফলে, সে-মোহ বা সে-মন তাঁর আর নেই। আধুনিক কালের এই সমস্ত কিছু প্রাচীন বিশ্বাসকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াকে সমর্থন করেন না। পুরানোপন্থী বলেই এ অঞ্চলে তিনি পরিচিত। তা' সত্ত্বেও পুরনো কালের মানুষদের থেকে তিনি স্বতন্ত্র। যেমন পুরনোপন্থী হয়েও তিনি প্রকাশ্যেই বলেন—সতীদাহ প্রথা উঠে যাওয়াটায় দেশের মঙ্গলই হয়েছে। সেই সঙ্গে এক নিশ্বাসে বলেন—না, বিধবাবিবাহ আমি সমর্থন করি না। আবার বলেন—না, ওই কুলীনদের কুলরক্ষার জন্য ষাট সত্তোর বছরের কুলীন বুড়োর পাঁচ ছ'গণ্ডা বিবাহ— ওটা প্রায় পশ্বাচার।

তিনি নিজে কুলীন। নয়নতারার সঙ্গে প্রথম বিবাহ হয়েছিল তাঁর পনের-ষোল বছর বয়সে। নয়নতারার বয়স তখন এগার বারো। অল্পবয়সেই তাঁরাই সংসারের কর্তা গিন্নী হয়েছিলেন। মা বাপ অল্প বয়সে মারা গিছল। সে কালে তারপর অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ তাঁর বাড়ি এসে তাঁকে কন্যাদায় উদ্ধারের জন্য ধরেছেন। কিন্তু নয়নতারার ফোঁসফোঁস শব্দ তুলে কান্নার জন্য খুব বিব্রত হয়ে তিনি তাঁদের বিদায় করেছেন। মুখেও তাঁদের বলে দিয়েছেন—দেখুন যত পুণ্যই থাক কুল এবং জাত রক্ষার জন্য বিবাহ করার মধ্যে, ওতে আমার কোনোপ্রকার প্রলোভন নাই প্রয়োজনও নাই।

এর জন্য লোকে তাঁকে স্ত্রৈণ বলত। তিনি হাসতেন।

অতঃপর তাঁকে পরিত্রাণ করেছিল ভাই জটাধর। জটাধর তার সম্পত্তি বিক্রি করে বাড়ি থেকে যখন পালাল তখন নানান জনে নানান গুজব রটিয়েছিল, কেউ বলেছিল—মেলেচ্ছদের সঙ্গে মাখামাখি—তাদের খাওয়া খায় এঁটো খায়—তার জাত গেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন উঠেছিল

—জটাধরের সঙ্গে এক্ষেত্রে গঙ্গাধরের জাত গেছে কিনা ? প্রশ্নটা প্রশ্নই থেকে গিয়েছিল—কেউ কোনো সদুত্তর দিতে পারে নি। কারণ জটাধর আপনার অংশ বিক্রিসিক্রি করে সম্বন্ধ চুকিয়েই চলে গেছে। তখন এই শাশুড়ীঠাকরুন বলেছিলেন—জাত যাবে কোন্ বিধানে ? 'ভিন্ন অন্নে বাপ পড়শী'। বাপে ছেলেতে যদি পৃথগন্ন হয়। ধর বাপ যদি জাত দেয় অন্য ধর্ম নেয় তাতে ছেলের জাত যাবে কেন ?

এরপর নয়নতারা মারা গেল। তখন আর একবার কুলীনকন্যার বাপেরা গঙ্গাধরকে বিব্রত করেছিল। স্ত্রী মারা গেলে বিবাহ না করে থাকার কোন্ অর্থ ? এবং থাকবেনই বা কেন ? আজও কুলীনেরা গণ্ডায় গণ্ডায় বিবাহ করে। করছে।

তখন গঙ্গাধরের শাশুড়ী বলেছিলেন—না-না-না। মন্মথ প্রমথ—কার্তিক গণেশের মতো দুই ছেলে। আবার বিয়ে কেন। সতীর সন্তান ছিল না—পতিনিন্দা শুনে দেহত্যাগ করেছিলেন—তিনিই আবার গৌরী হয়ে জন্মালেন—তখন শিব বিয়ে করেছিলেন। কার্তিক গণেশকে রেখে গৌরী দেহত্যাগ করলে তিনি কখনই বিয়ে করতেন না।

হঠাৎ সেই গুরুঠাকুরানীরূপিণী শাশুড়ীই তাঁর বিবাহের জন্য উদ্যোগী হলেন।

কারণ এই কাদম্বরী কন্যাটি আঠারো উনিশ বছরের কুমারী হয়ে ঘরেই ছিল তার মায়ের কাছে, অকস্মাৎ ঘটনাচক্রে সে এসে তার ঘাড়ে চাপল। তার মায়েরও কিছু শিষ্যসেবক ছিল। ভদ্রমহিলা অকস্মাৎ সন্ন্যাসরোগে দেহত্যাগ করলেন। কন্যাটির পিতৃকুলে যাঁরা ছিলেন তাঁরা কেউই তাকে ঘাড়ে করলেন না। শুধু উদ্যোগী হয়ে তার মাসীমার বাড়ি এনে পেঁছে দিলেন। মাসীমা অর্থাৎ গঙ্গাধরের শাশুড়ী মন্মথের মাতামহী তাকে ফিরিয়ে দিতে পারলেন না ; মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর মুখে বাক্য সরলো না—চোখ জলে ভরে উঠল—মনে হল এ যেন তাঁর নয়নতারাই এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। শুধু মাথায় একটু লম্বা এবং রঙটা একটু ফরসা। আর চুলগুলি একরাশ ঢেউ-খেলানো।

চোখের জল আঁচলে মুছে মেয়েটিকে বুকে টেনে নিয়ে বলেছিলেন—আয়। ভয় কি। আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ আমার বুকে থাকবি। তার—প—র—।

বলতে বলতেই তার পরের কথা প্রথমে ঝাপসা পরে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। নয়নতারা চলে গেছে ; তার শূন্য সংসার রয়েছে ; তার 'মাউড়ে' মন্মথ-প্রমথ রয়েছে ; সতী-হারা শিবের মতো গঙ্গাধর রয়েছে ! সুতরাং কিসের চিন্তা কিসের ভয় ! এ তো বিধাতার যেন নিজে হাতে কেটে দেওয়া ছক।

জটাধরের ব্যাপারটা তখন আরও ঘনীভূত হয়েছে। জটাধর কৃষ্ণভামিনীকে বিয়ে করেছে, এখানে এসেছে চলে গেছে কিন্তু সমাজের সমাজপতিরা কিছু বলতে পারেন নি। বিয়ে করেছে জটাধর—জাত গিয়েছে জটাধরের ; তাতে গঙ্গাধরের জাতকুল যাবে কেন ? কথাটা প্রশ্নের আকারে শুধু সমাজপতিদের মনে মনে ঘুরপাকই খেলে কিন্তু কোনো ঘূর্ণি বা আবর্তের সৃষ্টি হল না।

জটাধর-জননী প্রতিষ্ঠার সময় জটাধর ভটচাজবাড়ির সন্তান হিসেবে কাঁধে গামছা এবং তেলচকচকে শরীর ও ভুঁড়ি নিয়ে নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা করলে না—রীতিমতো টার্কিশ তোয়ালে কাঁধে, চুনোট করে কোঁচানো শান্তিপুরে ধুতি পরে, কোমরে দক্ষিণার আধুলি সিকির সিল্কের বটুয়া ঝুলিয়ে বিনীত নমস্কারে বিগলিত হয়ে আহ্বান জানালে। সে-আহ্বান প্রত্যাখ্যানের কেউ কোনো কারণ দেখলে না। মা কালী জটাধর-জননী নামে অভিহিতা হলেন সংকল্প জটাধরের নামে হল। তাতেও জটাধরের সঙ্গে গঙ্গাধরের এক-অন্নত্ব প্রমাণিত হল না।

এ থেকে, মন্মথর মাতামহী, তিনি বহুজনের মা-ঠাকরুন অর্থাৎ গুরুঠাকুরানী, তিনি

বিধান অতি সহজে বের করলেন—ভিন্ন ভাতে বাপ পড়শী। সে-ক্ষেত্রে বাপের জাত গেলে বেটার জাত যায় না। স্বামীর জাত গেলে স্ত্রীর জাত যায় না। জটাধরের কোনো পাপেই কোনো কর্মদোষেই গঙ্গাধরের জাতকুলে দাগ লাগে নি। সে নিষ্কলুষ কুলীন। মন্মথকে নিয়ে গিয়ে কলকাতার বাসায় রেখে পড়াচ্ছে—তাতেও কিছু যায় আসে না, পাসটাস করে একটা প্রায়শ্চিত্ত করলেই শুদ্ধ। তবে ভালো কাজ কর নি বাবা, ওই কাকার অন্নে মন্মথর বিদ্যেটিদ্যে যাই হোক মতিগতি ভালো হবে না।

কথাটায় একটু বিস্মিতই হয়েছিলেন গঙ্গাধর। কথাটা হয়েছিল ওই জটাধর-জননী প্রতিষ্ঠার সময়ই। মন্মথকেই প্রথম বলেছিলেন তার মাতামহী—দেখ ভাই, তোমার বাপ এই তো চল্লিশ পার হল সবে। নৈকষ্য কুলীন, নৈকষ্য কুলীনেরা পাঁচটা সাতটা দশটা, তোমাদের পূর্বপুরুষ তো বারো দুগুণে—চব্বিশটা বিয়ে করেছিল। তা তুমি উপযুক্ত ছেলে—আবার আমাদের দিক থেকে তুমি দৌহিত্র নাতি। নাতি স্বর্গের পথে বাতি জেলে ধরে দাদা। কাদু তোমার মাসী—তোমার মায়ের মুখ অবিকল বসানো। তুমি বল বাবাকে —কাদুকে বিয়ে করুক সে। তাকে দেখবে শুনবে। ঠাকুরের ভোগ রাঁধবে। তোমার আদরযত্ন করবে।

মন্মথ পালিয়ে এসেছিল মাতামহীদের সঙ্গে না নিয়েই। কিন্তু মাতামহী নিরস্ত হন নি —তিনি কাদম্বরীকে সঙ্গে নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রায় মন্মথর পিছু পিছু। গঙ্গাধর তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি বলেছিলেন—দেখ তো বাবা দেখ ভালো করে ; অবিকল —আমার নয়নতারা নয় ?

কাদম্বরীব গৌর বর্ণ রক্তাভ হয়ে উঠেছিল। তবে সে বয়স্থা মেয়ে—কর্তব্য সে ভাল করেই জানে—সে এগিয়ে এসে প্রণাম করেছিল গঙ্গাধরকে।

গঙ্গাধর একটু লজ্জিত হয়েছিলেন। আচ্ছা আচ্ছা বলতে বলতে তিনি বাইরে চলে গিয়েছিলেন।

কৃষ্ণভামিনী এই সময় এসে দাঁড়িয়েছিল একখানি রেকাবিতে জলখাবার সাজিয়ে নিয়ে। ঝি এসেছিল জলের গ্লাস আর আসন নিয়ে। আসন পেতে দিয়ে সে প্রণাম করতে গেলে গঙ্গাধরের শাশুড়ী বলেছিলেন—তুমি ছোট বউ। বাঃ বেশ মেয়ে খাসা মেয়ে। তবে পেটে একটা হল না। তা' দেবেন—মাকে প্রতিষ্ঠা করছ—মা দেবেন। না দেন, ওই তো ভাশুরপো রয়েছে। সব হবে। হ্যাঁ মা, ছুঁয়ো না, মাটিতে হাত দিয়ে প্রণাম কর। জল খাব তো।

কৃষ্ণভামিনীকে কে যেন জ্বলন্ত ধুপকাঠি দিয়ে ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে ছ্যাঁকা দিচ্ছিল। সে কলকাতার মেয়ে তার উপর সে মুখরা প্রখরা মেয়ে। এর উপরেও তার ছিল অহংকার। সে দপ করে জ্বলে উঠেছিল। একেবারে সরাসরি বলেছিল—আপনি নাকি বট-ঠাকুরের জন্যে বিয়ের সম্বন্ধ এনেছেন ? এই মেয়েটি বুঝি ?

—হ্যাঁ দেখ তো, একেবারে নয়নতারার মতো নয় ? আর আশ্চর্য গুণবতী। দেখবে তুমি তোমার ভাশুরের কেমন সেবা করে। একহাতে ও রাধাগোবিন্দের জটাধর-জননীর ভোগ রেঁধে উঠবে। কাজের ধনী মেয়ে।

কৃষ্ণভামিনী এবার শহুরে ধরনের বাঁকা কথার পথ ধরেছিল, বলেছিল—ভোগ রাঁধবার জন্যে তো পয়সা দিলে সাতপুরুষে শুদ্ধ গঙ্গাজলখাওয়া বামুনও মিলবে বামনীও মিলবে। ও নিয়ে আপনার ভাবনা কেন ?

এবার ফোঁস করে উঠেছিলেন মন্মথর মাতামহী।—বল কি মেয়ে ? আজ তো ছ'বছরের ওপর আমার গঙ্গাধরই ভোগ রাঁধছে গোবিন্দের! টাকা হয়েছে জটাধরের। ভাইপোকে

নিয়ে গিয়েছে ভালো কথা, তা' গঙ্গাধরের আমার তাতে হয়েছে কি ? সে তো সেই ভাত রাঁধে পুজো করে শিষ্য চরায়।

কৃষ্ণভামিনী বলেছিল—উনি চান তাই লোক রাখা হয় না। নইলে বারবার বলেছি লোক রাখতে। জিজ্ঞেস করে দেখবেন। কিন্তু আপনি কি বলে নিজের নাতির কপালে সৎমা জুটিয়ে দিতে এসেছেন বলুন তো ?

তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থেকে—যেন তাকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে পইপই করে দেখে তারপর ঠোঁটদুটো বেঁকিয়ে মন্মথর দিদিমা বলেছিলেন—অ মা গো ! এ কি আহ্লাদী পুতুল না কাঁচখুকী গঃ ! এ্যাঃ এমন কথা তো কখনও শুনি নি ! চল্লিশ বছর বয়সের ভর্তি জোয়ান, পণ্ডিত সজ্জন মানুষ, বাড়িতে দেবসেবা, চৌদ্দ বছরের ছেলে কলকাতায় পড়ছে। জাতখোয়ানো ভুঁইফোড় বড়লোক ভাই কলকাতায় নবাবী করছেন। রোগ হলে মুখে জল দেবার কেউ নেই, গরমের দিনে পাখা করতে কেউ নেই। রাতে শুয়ে কথা বলবার কেউ নেই। তার উপর নৈকুষ্যি কুলীন, তার জন্যে সৎ কুলীন ঘরের পাত্রী এনেছি—একে নাতির সৎমা জুটিয়ে দেওয়া বলে ?

আরও বাঁকানো হাসিতে ঠোঁট মচকে কৃষ্ণভামিনী বলেছিল—কি বলে সেটা আপনিই বলুন না। ও কি নিজের মা হবে ? না যেমন আপনি কাদম্বরীর মায়ের চেয়েও বেশী দরদী মাসী হয়েছেন তাই হবে ? আর বট-ঠাকুরেরও স্বর্গ হবে ?

—যা হবে তা বুঝবে না তুমি। তোমার বাবা শুনেছি নটীদের পুরুতগিরি করত। আর বিয়ের সময় তোমাদের ঘরে মেয়ের বাপে টাকা নেয়। শুক্র-বিক্রি করা ঘরের মেয়ে মা তুমি, কুলীনের ঘরের জাতকুল রক্ষের কত পুণ্য সে বুঝবে না তুমি।

এমন সময়েই দু'দিক থেকে—একদিক থেকে গঙ্গাধর অন্যদিক থেকে জটাধর এসে পড়েছিল হাঁ হাঁ করে।

মিটমাট কোনোরকমে হয়েছিল।

জটাধর গঙ্গাধর দুইজনে মিলে কোনোরকমে দু'পক্ষকে বুঝিয়েছিলেন। তাঁরাও বুঝেছিলেন। কৃষ্ণভামিনী বুঝেছিল এতবড় ক্রিয়াটার সব দায়দায়িত্ব তার আর জটাধরের। এটা বোঝাতে কিছুটা খড় কাঠ পোড়াতে হয়েছিল। হয়েছিল এই যে মন্দিরের মেঝের উপর মার্বেল ট্যাবলেট বসানো হয়েছিল—"শ্রীশ্রী৺রী পরমারাধ্যা জটাধর-জননী" প্রতিষ্ঠাত্রী সেবিকা শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী দেবী স্বামী শ্রীজটাধর ভট্টাচার্য। সাকিম গোবিন্দপুর জেলা হুগলী।

কৃষ্ণভামিনী মালিক হয়ে গিয়েছিল সমস্ত দেবোত্তরের।

তার দৃষ্টি সেই সনাতনী নারীর দৃষ্টি। গঙ্গাধর যে দৃষ্টিতে ওই নয়নতারার মুখের অবিকল সাদৃশ্যযুক্তা ওই কাদম্বরীর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন তার অর্থ ও তার অন্তরের অভিপ্রায় কৃষ্ণভামিনীর সেই সনাতনী দৃষ্টির সম্মুখে গোপন থাকে নি। সে শক্ত মেয়ে, কৃতী স্বামীর আদরিণী স্ত্রীই শুধু নয়, আইনটাইনও বুঝত সে। সে চুঁচড়ো উকীল বাড়ি গিয়ে নিশ্চিত হয়েছিল যে এই ট্যাবলেটই তার জটাধর-জননী দেবোত্তরের মালিকত্বের খুব শক্ত বনিয়াদ বা ফাউণ্ডেশন স্টোন হয়ে রইল। জটাধরের জ্যেষ্ঠ সহোদর হিসেবে গঙ্গাধরের এতে কোনো স্বত্ব রইল না।

আশ্চর্য, এরই মধ্যে যেন তারা চার ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। একটা চতুর্ভুজের চার কোণে দাঁড়িয়ে গেল। এক কোণে একা গঙ্গাধর, অন্য কোণে মন্মথর মাতামহী এবং কাদম্বরী, আর এক কোণে জটাধর এবং কৃষ্ণভামিনী, আর একটায় একা মন্মথ।

তখনই তখনই মীমাংসা তার কিছু হল না। একটি চতুর্ভুজের চার কোণে চার পক্ষ দাঁড়িয়ে রইল আর চতুর্ভুজের ক্ষেত্রটির মধ্যে একটি রেখা বা লাইন টানা হয়ে গেল। মানে মোটামুটি দু'ভাগ হয়ে গেল। দেবপূজা হয়ে গেল বিসর্জন হল। কুটুম্বেরা বিদায় নিলেন। জটাধর কৃষ্ণভামিনী কলকাতা ফিরে যাবে, তার আগে গঙ্গাধরকে বললে—দাদা, বিষয়সম্পত্তি সামান্যই তবু দেখবার শুনবার জন্যে একজন লোক রাখছি—তুমি মাথার উপর থাকলে—দেখবে শুনবে, তোমার হুকুম মতোই চলবে। কি বল?

গঙ্গাধর বললেন—বেশ তাই হবে। তাছাড়া বিষয়-আশয়ের জটিলতা ও তো ভালো বুঝি না! বিষয়পারঙ্গম একজন লোক রাখাই ভালো।

—সে সব বিষয়ে তোমার পরামর্শ নেবে। আদেশ নেবে। তুমিই সর্বময় কর্তা।

—নিশ্চয়। তাই হবে।

—আর একটা কথা।

—কি বল?

—আমি বলছি শক্তিপূজা আর বিষ্ণুপূজা দুটো পৃথক মতের পথের ব্যাপার—আমি বলি পূজো যখন আলাদা, পূজকও তখন আলাদা হোক।

—বেশ তো। সেও বেশ ভালো কথা। বিষ্ণুপূজা আমি করব—শক্তিপূজার জন্যে তুমি পূজক নিযুক্ত কর। গগনপুরের চক্রবর্তীদের বামাপদ আমারই ছাত্র—তাকে তো দেখলে পূজোর সময়। নিষ্ঠাবান ছেলে—ওকেই নিযুক্ত কর। মাত্র তো নিত্যপূজা বেদীতে হবে। বিগ্রহ তো থাকছে না। বৈশাখে বর্ষারম্ভের সময় প্রতিমা গড়ে পূজা হবে উৎসব হবে—তারপর বিসর্জন হয়ে যাবে প্রথামতো। এর পর বারো মাস বেদীতে পূজা।

—আর একটা ভোগ। একজন অতিথি আর ওই পূজক প্রসাদ পাবেন। পূজকই ভোগ রাঁধবেন।

—খুবই ভালো প্রস্তাব। তাই কর।

—আরও একটা বলব। বলছি—গোবিন্দবিগ্রহের আর লক্ষ্মীজনার্দনের সেবার জন্য আর একজন পূজক রাখি।

—সে তো আমি করি ভাই। ওটুকু না করলে আমি করব কি বল?

—তুমি কলকাতায় চল। তোমার বউমারও একান্ত ইচ্ছে।

—তা কি করে হবে বল? শিষ্যসেবক রয়েছে। বাবা মন্ত্র দিয়ে গেছেন—আমি দিয়েছি—তাদের গুরু না হলে কি করে চলবে বল? তাদের বিপদে আপদে তাদের দুঃখে শোকে আবার শুভকর্মে—মানে পা বাড়াতে হলেই তো গুরুর দরকার। আমি তো খুবই চিন্তান্বিত হয়েছি আমার পর কি হবে তাই ভেবে। মন্মথ কলকাতায় গেল তোমার কাছে—শুনছি লেখাপড়ায় খুবই ভালো; মনোযোগী এবং মেধাবী দুই-ই। ইংরিজীর প্রতি অনুরাগও খুব। আমার পর—

—সে যা হয় হবে দাদা। তার জন্য মনু বাবাকে তুমি টানাহেঁচড়া ক'রো না। দোহাই তোমার!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যেন কোনো কিছু খুঁজে না-পেয়ে শংকরাচার্যের মোহমুদ্গর আবৃত্তি করতে লাগলেন। আবৃত্তি শেষ করে বারকয়েক নারায়ণ স্মরণ করে উঠবেন এমন সময় মন্মথকে সঙ্গে করে কৃষ্ণভামিনী এসে দাঁড়াল।

মনু বললে—বাবা।

—কি রে? সঙ্গে যে ছোটমা!

—হ্যাঁ—ছোটমা একটি কবচের কথা বলেছিলেন তোমাকে।

—দেব। কবচ দেব। এবার কলকাতা যাবার আগেই কবচ করে দেব।

এইখানে জটাধর-জননী প্রতিষ্ঠাপর্ব শেষ হল। জটাধর কৃষ্ণভামিনীকে নিয়ে কলকাতা রওনা হল। তার আগেই গঙ্গাধরের শাশুড়ী এবং কাদম্বরী চলে গেছেন। মন্মথকে গঙ্গাধর বললেন—তুই দিন কয়েক থেকে যা মনু।

মন্মথ বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—আমার যে স্কুল কামাই হচ্ছে বাবা।

বাবা বললেন—তা হোক না! পাঁচ সাতটা দিন থাক।

মন্মথ বললে—সামনেই তো সামার ভেকেশন, ছুটি হলেই আসব—লিচু আম খেয়ে যাব।

জটাধর বললে—আমি তাই পাঠিয়ে দেব দাদা। এখন ওকে থাকতে বল না। ওদের হেডমাস্টার বলেন ওর নাকি আশ্চর্য মেধা।

গঙ্গাধর বললেন—বেশ তাই যা।

কলকাতায় ফিরে মন্মথ প্রথম দিন স্কুলে গিয়েই সে এক অপ্রত্যাশিত অভিনন্দনের মধ্যে এসে পড়ল। সকলের মুখেই তাদের বাড়িতে দেবপ্রতিষ্ঠার সমারোহের কথা। —তোমাদের দেশের বাড়িতে কালী প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল! খুব নাকি ধুমধাম হয়েছে!

সত্য বললে—তোমাদের বংশ তো নামকরা পণ্ডিতের বংশ। তোমার কাকা ব্যবসা করে বড়লোক হয়েছেন। কিন্তু তোমরা তো বৈষ্ণব। বাড়িতে গোবিন্দ আছেন—শালগ্রাম শিলা আছেন—আবার শাক্ত হলে কি করে?

বিভূতি সত্যকে একটু আঘাত করেই বললে—ও তুই বুঝবি নে সত্য। তোরা আবার কুলীন ব্রাহ্ম!

সত্য শান্ত থেকেই বললে—কেন বুঝব না কেন? বুঝিয়ে বল না শুনি।

মন্মথ বললে—তত্ত্ব খুব গভীর তত্ত্ব তাতে সন্দেহ নেই। আমি ঠিক জানি নে বুঝি নে। তবে ছেলেবেলা থেকে শুনি সবই এক—যে শ্যাম সেই শ্যামা। আমরা আবার গুরুগিরি করি তো; আমাদের শিষ্যরা এসে যে দেবতাকে ভালো লাগে তাঁরই মন্ত্র চায়। তাই দিতে হয় আমাদের। তবে আমার বাবা ভারী ভক্ত বৈষ্ণব।

সত্য বললে—তুমি?

মন্মথ চমকে গেল। সে?—সে কি? কেন সেদিন পর্যন্তও তো সে বাড়ির ওই লক্ষ্মী-জনার্দন এবং গোবিন্দকে সাক্ষাৎ ভগবান ভেবে এসেছে। ভালোও বেসেছে। তবু সে চমকে গেল। তবে সে চমকানো কয়েকটা মুহূর্তের জন্য, তারপরই সে বললে—আমিও বৈষ্ণব হতে চাই। ওই উপাসনাই ভালো লাগে।

এরই মধ্যে ক্লাস টীচার রমেশ গোস্বামী স্যার এসে ক্লাসে ঢুকেই সমস্ত ব্যাপারটার অতি সহজ একটা মীমাংসা করে দিলেন; ক্লাসে ঢুকে মন্মথকে দেখেই বললে—হ্যালো ভটাচারিয়া, তুমি তো ক'দিনে বেশ মোটা হয়েছ দেখছি! Mother goddess কালীর কাছে রোজ বুঝি বেশ নধর গোটচাইল্ড খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে বলি দিয়েছ? এবং নুলো ডুবিয়ে মায়ের প্রসাদ মেরেছ?

বলেই অট্টহাস্য করে উঠলেন—হা-হা-হা-হা-হা!

তারপর বললেন—তা আমাদের প্রসাদ কই হে?

হাসি থামিয়ে বললেন—তোমরা শুনেছ মন্মথরা কালীপুজো প্রতিষ্ঠা করলে। নতুন পুজো। ১লা বৈশাখ কালীপুজো—New year's day Kalipuja—

সত্য উঠে দাঁড়িয়ে বললে—ওরা বৈষ্ণব হয়ে কি করে কালীপুজো করলে স্যার?

—My dear boy, তারক গাঙুলীর স্বর্ণলতা পড়েছ—a very bcautiful novel,

তাতে গডাচের চণ্ডর বলে একটি character আছে, সে বলে—আমি ভুডও খাই টামাকও খাই। Milk and tobacco both. বুঝেছ না—এও তাই। বলে আবার হা-হা শব্দে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন—দেখ—খুব জটিল। হয়তো সবটাই মিথ্যে। ফাঁক তো চারিদিকে কিন্তু আমি নিশ্চিত বলতে পারি মানুষ যখন ঈশ্বর বলে পূজা করে কিছুকে তখন তার থেকে সিনসিয়ার আর কিছু নেই।

আরও একটু চুপ করে থেকে বললেন—পণ্ডিতমশায় আর রাধাশ্যাম গিছল তোমাদের বাড়ি। পণ্ডিতমশায় তোমার বাবার কথা খুব বলছিলেন। খুব ভালো লোক—now to your books—

রাধাশ্যাম গোবিন্দপুর থেকে ফিরে এসে এক আশ্চর্য গল্পকথা তৈরি করে চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে।

বাড়ি ফিরবার সময় সেদিন সে রাধাশ্যামকে বললে ; রাধাশ্যাম তার স্কুলের ছুটির পর মন্মথর জন্যেই দাঁড়িয়ে ছিল ফুটপাথের উপর ; মন্মথকে দেখেই সে একমুখ হেসে বললে —তোমাদের হেডমাস্টারমশায় তোমাদের ক্লাসের স্যার রমেশ গোস্বামী স্যার আমার বাবার কাছে তোমার বাবার গল্প শুনে কি বলেছেন জান ?

ভুরু কুঁচকে উঠল মন্মথর। রাধাশ্যামের বন্ধুত্বের এই আতিশয্য তার কেমন যেন অস্বস্তিকর মনে হয়। সে বললে—কি ?

রাধাশ্যাম বললে—বলেছেন—দেবতারা আর এর থেকে বড় কিসে বলুন! এই তো দেবতা! আমার বাবা বলেছেন—আমি তা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করি মশায়। তোমাদের রমেশ স্যার বলেছেন—ছেলেটাও মশায় অদ্ভুত। তবে ছেলেটা যেন একটু তপ্ত একটু ঝাল। তেজালো!

মন্মথ বিরক্তিভরে বললে—তুমি এই সব কথা এমন করে বলে বলে বেড়িয়ো না রাধাশ্যাম।

—কেন? কেন? মিথ্যে তো বলি নি—

—মিথ্যে হয়তো নয়, ওঁরা হয়তো তাই বলেছেন। কিন্তু বাড়িয়ে বলেছ অনেকখানি—

—চল তুমি রমেশ স্যারের কাছে। সামনাসামনি জিজ্ঞাসা করে দেবে—যাচাই কর—।

—না।

চলতে চলতে ঠনঠনের কালীতলা পার হয়ে যাবার সময় রাধাশ্যাম হঠাৎ তার জামা টেনে ধরে বললে— কি হে তুমি? প্রণাম করলে না?

—ও। ফুটপাতে হাত ঠেকিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বললে—হল তো—চল।

রাধাশ্যাম বললে—তোমার হয়েছে কি বল তো?

চুপ করে রইল সে। এমনি দেখতে তার কিছুই হয় নি। বরং আজ সে স্কুলে অনুভব করেছে তার গৌরব যেন খানিকটা বেড়ে গেছে। তার বাবার গৌরব তাকে এসে স্পর্শেছে —তার কাকার এই দেবপ্রতিষ্ঠার মধ্যে যে আর্থিক প্রতিষ্ঠার প্রশংসা তারও একটা ভাগ তাও খানিকটা পেয়েছে। কিন্তু তার মনে হচ্ছে এ সব সত্ত্বেও সে একান্তভাবে একা। তার বাবা তার থেকে দূরে গেছেন—না সে তাঁর থেকে দূরে চলে এসেছে তা ঠিক সে বুঝতে পারছে না।

হঠাৎ এই মুহূর্তটিতেই একজন জটাধারী সন্ন্যাসী এসে তার পথ রোধ করে বললে— বাবুজী, থোড়া ঠাহর যাও। তোমার ললাট তে বহুত লছমনমান আছে বাবা।—আরে শুনো শুনো। তুমাহারা মাতাজী গুজর গয়ী—মা নেহি আছে, ভাই ভি নেহি। উ ভি মর গেয়া। তুমাহারা পিতাজী তো সাধু আদমী।

দাঁড়িয়ে গেল থমকে মন্মথ। কোঁচকানো কপালের নিচে আশ্চর্য এক ধরনের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললে—কে বললে ?

—তুমাহারা ললাট!

—আমার ললাট ? আমার ললাটে আছে পিতাজী সাধু আদমী ? মা নেই—মারা গেছেন ? ভাই—

—হাঁ। হাঁ। ললাটমে সব আছে—হাঁতে আছে।

—আর কি আছে আমার ললাটে ?

—তুমাহারা পিতাজীকে কেয়ঠো সাদী বাবুজী—মালুম হোতা কি—

—দূর! আর কিছু জান তো বল।

—বল কি বলব ?

—পরীক্ষার কথা বলতে পারবে ?

—দেখে তুমাহারা হাঁত।

ডান হাতখানা মেলে ধরল মন্মথ—বাতাও। বল।

—কি বলব ?

—ফার্স্ট সমঝতা ? ফার্স্ট ?

—হাঁ! ফার্স্ট হোনে সেকতা লেকিন—

—মাদুলি নিতে হবে ?

—নেহি জী! তুমাহারা দোনো তরফ—ডাহনা বাঁয়া—হাঁ দোনো তরফ দোনো আদমী দৌড়তা হ্যায়। বহুত জোর—

চমকে উঠে মন্মথ বললে—দো আদমী ?

—হাঁ দো আদমী। লেকিন বহুত ধ্যায়ানসে তপস্যা করেগা তো উ হট যায়েগা!

পকেট থেকে একটা দোআনি বের করে সে সাধুর হাতে দিয়ে বললে—আবার আসব।

কয়েক বারই সে এর পর গেছে এবং সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করেছে। সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার ভাবও হয়েছে খানিকটা। বিচিত্রভাবে সন্ন্যাসী তাকে তার জীবনের কথা এমন কি মনের কথা বলে দিয়েছে।

হাফইয়ারলী পরীক্ষায় সে ফার্স্টই হবে। সত্য বিভূতি দুজনকেই সে হারিয়ে দিতে পারবে। সে যা করেছে অমানুষিক পরিশ্রম। সারা গ্রীষ্মের ছুটিটা সে দু'বেলা রমেশ স্যারের বাড়ি হেঁটেছে ইংরিজীর জন্য। গ্রীষ্মের ছুটিতে তার বাড়ি যাওয়া হয় নি। বাবাকে কথা দিয়েছিল সে বাড়ি যাবে কিন্তু তার বাবা এই সময়েই শিষ্যবাড়ি। ধনী শিষ্য তারা। জমিদার লোক, চন্দননগরের কাছে বাড়ি, তাদের বাড়িতে কয়েকটি ক্রিয়া ছিল। পুত্র এবং কন্যার বিবাহ একই বাড়িতে বদলাবদলী করে। তার সঙ্গে একটি ছেলের উপনয়ন। এ সময় এত বড় একটা ক্রিয়ায় গুরুর উপস্থিতি অবশ্যই প্রয়োজন। গুরুর পায়ের ধুলো পড়লে তবে বাড়িতে আয়োজনের অনুমতি হবে। তারা গুরুপুত্রকেও কামনা করেছিল। গঙ্গাধর ছেলেকে লিখেছিলেন—"তুমি এই সময় আসিলে তাহারাও খুশী হইবে এবং আমাদের কর্তব্যও করা হইবে।" কিন্তু মন্মথ যায় নি, এইটাকে ছুতো করে সে কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার হাঙ্গামা এড়িয়ে লিখলে—"আমার ইংরাজী পরীক্ষার জন্য মাস্টারমহাশয় সাবধান করিয়া বার বার বলিতেছেন—খুব সাবধান। এবং শিক্ষকমহাশয় বিনা পারিশ্রমিকে এই সময় পড়াইব বলিতেছেন—সুতরাং আমি যাইব না।"

মাস দুয়েক পর শ্রাবণ মাসে জটাধর-জননী এস্টেটের নায়েবের একখানা পত্র এলো।

আজকাল এস্টেটের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী গোলক সিং মাসে দু'খানা করে পত্র নিয়মিতভাবে দিয়ে থাকে। কোনোটায় থাকে—"বাড়ির সীমানার প্রাচীরগুলির যে অংশ মাটির তাহা বর্ষার আগে আর ভাঙিয়া পাকা করা হইবেক না। কারণ সকলেই বলিতেছে—এবার বর্ষা ঘোরতর হইবে। সুতরাং আদেশ হইলে এবারের মতো মাটির প্রাচীরের ভাঙাফুটা মাটি দিয়ে মেরামত করাইবার ব্যবস্থা করি।" অথবা—"খামারবাড়ির সামনের ফটকের জন্য কাঠ এবং লোহার শিক দিয়া মজবুদ একজোড়া দরজার প্রয়োজন।"

অথবা—"অত্র গ্রামের রায়েরা এবং পার্শ্বের গ্রামের কিছু কিছু লোকেরা নানাপ্রকারে আমাদের অনিষ্টসাধন করিতেছে। গুজব রটাইতেছে। বড়কর্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোনো সদুত্তর পাই না। তিনি পূজার্চনা লইয়া থাকেন—কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করিলে বলেন—যাহা ভালো হয় কর গোলক—আমি এসব বুঝি না। অথবা আপনাকে লিখিতে বলেন।"

বৈশাখ থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত খান ছয় চিঠি এসেছে। তার মধ্যে জ্যৈষ্ঠের প্রথম সপ্তাহের পত্রে ছিল—"বড়কর্তা গত পরশ্ব শিষ্যবাড়ি রওনা হইলেন। চন্দননগরের নিকট গোপালপুরের রায়েরা আপনাদের শিষ্য—রায়েদের মেজ ছেলে স্বয়ং আসিয়া লইয়া গেল। তাহাদের বাড়ি বড় ক্রিয়া আছে। বড়কর্তা এখন পনের দিন আন্দাজ ওখানেই থাকিবেন। সঙ্গে তাঁহার শিষ্য আঁটপুরের চক্রবর্তী গিয়াছে এবং সদগোপদের গোপাল গিয়াছে।"

রায়দের নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে ওদের বাড়ির লোক কলকাতাতে এসেছিল। জটাধর এবং মন্মথকে সে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে যাবার জন্য অনুরোধ করেছিল। বিশেষ করে মন্মথকে বলেছিল—অন্তত আপনি চলুন। মন্মথ বিব্রত হয়েছিল। তার যেন লজ্জার আর মাথা ছিল না।

রাধাশ্যাম দেখে শুনে হেসে সারা হয়েছিল। কিন্তু সে থাক। এখন এরই মধ্যে যা ঘটে গেল, যা মন্মকে একান্তভাবে একলা পথের পথিক করে দিল সেই কথাই বলি। গরমের ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে মন্মথর মনোভাব, যাকে বলে বেঁচে যাওয়ার মতো বা দণ্ড থেকে খালাস পাওয়ার মতো ঠিক না-হলেও, উল্লসিত অন্তত খুশী-খুশী হল এতে সন্দেহ নেই। সে গোটা গরমের ছুটিটা রমেশ গোস্বামী স্যারের বাড়ি গিয়ে তাঁর কাছে ইংরিজী গ্রামার এবং কম্পোজিশন শিখে এলো। শুধু ইংরিজী জ্ঞানই নয় বিচিত্র এই মানুষটি তাকে আরও একটি জিনিস দিলেন তার সঙ্গে। তাঁর বিচিত্র চরিত্রের ছোঁয়াচ। আরও একটা বিচিত্র তথ্য তার কাছে উদ্ঘাটিত হল। রমেশ স্যার কোষ্ঠী বিচার করেন। কোষ্ঠী তৈরি করেন। মন্মথর কোষ্ঠীর ছক তৈরি করেছিলেন তিনি। অদ্ভুত মানুষ। তালতলাতে বাড়ি—সেখানকার বাজারে একজন দোকানদার তাকে জলখাবার খাওয়াতো, ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি।

রাধাশ্যাম রোজ তাকে প্রশ্ন করত—ওর বাড়িতে জলটল খাসনে কিন্তু। উনি ক্রুশ্চান। কৃষ্ণভামিনীও সাবধান করত।

রমেশ স্যার হা-হা করে হাসতেন আর বলতেন—জাতটা খোয়াবি নাকি মন্মথ?

মন্মথ চুপ করে থাকত। রমেশ স্যার গম্ভীর হয়ে আবৃত্তি করতেন—"রেখো মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে।"—বুঝলি মাইকেলের এই পিসটি অদ্ভুত। আমার তো—। তুই যেন জাত খোয়াস নি বাবা। তার ওপর তোর বাবা একজন বড় ভালো লোক। জানিস সৎ লোক সাধু লোক থেকেও ভালো লোক আরও দুর্লভ রে।

এইভাবে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় চলে গেল। মন্মথর হাফইয়ারলী চলে গেল। এর মধ্যে গঙ্গাধরের বিশেষ কোনো সংবাদ গোলক সিং দেয় নি। মাত্র জানিয়েছিল—"বড়কর্তা শিষ্যবাড়ি হইতে আজও প্রত্যাবর্তন করেন নাই।"

এইবার শ্রাবণে সংবাদ এলো—"গোপালপুরের রায়েরা সংবাদ দিয়াছে যে বড়কর্তা মশায়ের হঠাৎ একজ্বরী জ্বর ও তৎসহ আমাশয় হইয়াছিল। চিকিৎসা সেবাদির যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হইয়াছে। চিন্তার কোনো কারণ নাই।" এর পরেই পত্র এলো—"বড়কর্তা ভালো হইয়া উঠিয়াছেন—পথ্যও করিয়াছেন। রায়েরা সংবাদ দিয়াছে—কর্তা গোপালপুর হইতে নিত্যানন্দপুর তদীয় শ্বশুরালয়ে গিয়াছেন। তাঁহার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া নিত্যানন্দপুর হইতে তাঁহার শ্বশ্রূমাতাঠাকুরানী গোপালপুর গিয়া শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকিয়া দেখাশুনা শুশ্রূষা করিয়াছেন এবং ঝোল পথ্যসহ দুটি অন্ন মুখে ঠেকাইয়া লইয়া তাঁহাকে নিত্যানন্দপুর বাটী লইয়া গিয়াছেন। অদ্য তাঁহার শিষ্য চক্রবর্তী ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন এবং বলিলেন ফিরিতে বিলম্ব হইবে। পরে শুনিতেছি গত ১০ই শ্রাবণ বড়কর্তা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছেন। কন্যা তাঁহার শ্যালিকা তাঁহার মাসশাশুড়ীর কন্যা। জ্ঞাতার্থে নিবেদন। পুঃ—নিত্যানন্দপুর হইতে কর্তার লোক এইমাত্র আসিল; তিনি লিখিয়াছেন এখন তিনি সেইখানেই অবস্থান করিবেন। লক্ষ্মীজনার্দন প্রভুকে তিনি গলায় বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছেন—নিজে পূজার্চনা করিয়াছেন—অসুখের সময় চক্রবর্তী করিয়াছিল। গোবিন্দজীর পূজা অন্য শিষ্য নারায়ণ ঘোষাল করিতেছেন—এখনো করিবেন ইতি—"

সংবাদটা ১৮৮০ সালে—এমন কোনো নিষ্ঠুর মর্মান্তিক সংবাদ নয়। এক বিগতদার চল্লিশ বিয়াল্লিশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি চৌদ্দ পনের বছরের ছেলে থাকতে বিয়ে করেছে। এমন ঘটনা আজও ঘটে। ঘটছে। সে কালে তো হাজার দরুনে ঘটত। কিন্তু তবু সেদিন মধু রায় লেনের জটাধরবাবুর বাড়িখানা এই খবরে একই সঙ্গে ম্রিয়মাণ এবং ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। কৃষ্ণভামিনী মন্মথর মাতামহী এবং কাদম্বরীর উদ্দেশে অজস্র কটু কথা বর্ষণ করলে। কথাগুলি কটু তার সঙ্গে তীক্ষ্ণ। এবং বিষাক্তও বটে। বার বার বললে—আমি জানি—মতলবটা আমি জানি। মতলব—সম্পত্তি টাকা। আমার তো ছেলেপুলে নাই সুতরাং এ সম্পত্তি ভোগ করতে লোক চাই। মন্মথর সঙ্গে আরও উত্তরাধিকারীর ব্যবস্থা। সে হবে না। কৃষ্ণভামিনী সব বোঝে। সে আমি দোব না। কিছুতেই না।

জটাধর চুপ করেই রইল। মাথা হেঁট করে চুপ রইল।

কৃষ্ণভামিনী গঙ্গাধরকে উদ্দেশ করে বললে—বটঠাকুর যেন শিব। তাই বলত—সতীহারা শিবের তপস্যা আমার দাদার। মরি মরি আমার মরি রে। পুরুষ জাতটাই আলাদা।—

সেই দিন সন্ধ্যাবেলাতেই মন্মথ স্কুল থেকে বাড়ি ফিরল না। রাধাশ্যামের হাতে বইগুলি দিয়ে বললে—বাড়িতে বলো আমি নিত্যানন্দপুর যাচ্ছি বাবার কাছে। তোমার কাছে লুকোব না—বাবা বিয়ে করছে আবার।

সেই নিত্যানন্দপুর থেকে গঙ্গাধর সস্ত্রীক এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বর। ভবতারিণী দর্শনে এসেছিলেন। সঙ্গে ছিল মন্মথ। মন্মথ সঙ্গ ছাড়ে নি। নিত্যানন্দপুর এসে তার একটা পরম লাভ হয়েছে।

লাভ হয়েছে তার ছোটমা কাদম্বরীকে।

আশ্চর্য ভালো লেগেছে। আশ্চর্য মিষ্ট মধুর এই জননীটি। তার বাপকে দেখেই সে বুঝেছিল তার বাবা নতুন একটা জীবনের স্বাদ পেয়েছেন। কিন্তু তাতে সে প্রথমটায় বিরূপই হয়েছিল। সে বিরূপতা তার স্থায়ী হয় নি। কাদম্বরী পরম যত্নে তার সকল ক্ষোভ সকল বিতৃষ্ণা ঘুচিয়ে দিয়েছিল আপন জীবনের মাধুর্য এবং দুই হাতে দশ হাতের সেবা যত্ন দিয়ে। যার ফলে একদিন দু'দিন পাঁচদিন সাতদিন করে দু'সপ্তাহ কেটে গেল, সে ফিরল না। ফিরল বাবা মার সঙ্গেই—ফিরল দক্ষিণেশ্বরে। ভবতারিণী দর্শন করে

এঁড়েদায় কাদম্বরীর এক খুড়োর বাড়ি। বাড়িটার একাংশ কাদম্বরীর বাপের। সেইখানে এসে উঠেছিলেন। সেখান থেকে আজ মন্মথ তাঁদের নিয়ে আসছিল তার খুড়োর বাড়ি। চেয়েছিল খুড়ীমা খুড়োমশায়ের সঙ্গে বাবা মার একটা মিল হয়ে যাক।

ছোটমায়ের সঙ্গে দুটো দিন বাস করলেই খুড়ীমার ভ্রম ঘুচে যাবে এতে তার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু হল না। ছ্যাকরা গাড়ি করে চিড়িয়ার মোড় পর্যন্ত এসে গঙ্গাধর বললেন—তুই ফিরে যা মন্মথ। আমি নতুন বউকে নিয়ে ফিরে যাচ্ছি এঁড়েদা। ওখান থেকে গোবিন্দপুর চলে যাব। মধু রায় লেনে আমি যাব না। তুই বলিস জটাধর বউমা যেন কিছু মনে না করে। নতুন বউকে দুঃখ পেতে দিতে আমি পারব না রে। বলিস তুই।

কাদম্বরী সারাটা পথ কথা বলে নি। মুখ ঢাকা দিয়ে চোখ বন্ধ করেই সে আসছিল। সে মুখে ভয়ের ছাপ ছিল সুস্পষ্ট। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে মন্মথ একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—বেশ। আমি একটা শেয়ারের গাড়িতে চলে যাব, আপনারা এই গাড়িতেই চলে যান।

শেয়ারের কেরাঞ্চী গাড়ি থেকে নেমে শ্যামবাজারে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে মন্মথর মনে হল সংসারে সে একেবারে একা হয়ে গেছে। একেবারে একা। কেউ নেই তার! এই যে প্রায় কুড়ি পঁচিশ দিন সে নিত্যানন্দপুর এঁড়েদায় বাবা আর নতুন মায়ের সঙ্গে কাটিয়ে এলো এর মধ্যে সে একটি নতুন কল্পনাকে গড়ে তুলতে চেয়েছিল প্রতিমাগড়ার কারিগরদের মতো। সুন্দর একটি কল্পনা করে তার খড়ের কাঠামোটি বেঁধে ছেঁদে মনের কল্যাণী পাটা বা তক্তার উপর খাড়া করে গেঁথে, তার উপর তুষমেশানো মাটি লাগিয়ে একটি দেবীপ্রতিমার আভাস খাড়া করেছিল—সেটি যেন হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে ভেঙে গেল। ভটচাজবাড়ির ছেলে, গঙ্গাধর ভটচাজের মতো পণ্ডিতের ছেলে এবং মন্মথর মতো ছেলের পক্ষে পুরাণ খুঁজে একটি দেবমূর্তি কল্পনা করতে কষ্ট হয় নি। অবলীলাক্রমে সে কল্পনা করেছিল গণেশ জননীর। তার বাবা শিব—নতুন মা গৌরী উমা—আর সে গণেশ।

সে ভালোই জানে যে গণেশ শিবানী বা পার্বতীর গর্ভজাত সন্তান নন। গল্পে শুনেছে মা দুর্গা একদিন মানসসরোবরে স্নানে গিয়ে ঘাটে বসে হলুদ মেখেছিলেন। সেই গায়ে মাখা হলুদ হাতে ঘষে-ঘষে গায়ের ময়লার মতো তুলে ফেলে সেই হলুদ হাতে নিয়ে খেলাচ্ছলে একটি পুতুল গড়েছিলেন—এবং পুতুলটিকে ঘাটের উপর রেখে স্নানে নেমেছিলেন মানসের জলে, সেই অবসরে শিবানীর বক্ষক্ষীরলুব্ধ পরমাত্মা সর্বযজ্ঞেশ্বর এসে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন পুতুলটির মধ্যে। এবং পুতুল জীবন্ত হয়ে উঠে কেঁদে উঠেছিল। ওদিকে স্নানরতা শিবানীর স্তন দুটি ক্ষীরভাণ্ডে পরিণত হয়ে উঠেছিল সেই মুহূর্তে।

নিত্যানন্দপুর সে গিয়েছিল অভিমানভারাক্রান্ত মন নিয়ে। গোবিন্দপুরে খুড়ীমা এবং তার দিদিমার ঝগড়ার জন্যে সেও বিব্রত হয়েছিল—এই যে-মেয়েটি নতুন মা হল সেও হয়েছিল। মেয়েটির বয়স ১৮/১৯—তার বয়স চৌদ্দ পার হয়ে পনেরোয় ঢুকছে। ভাই বোনের বয়সের পার্থক্য। ছেলেতে ছেলেতে এমন বয়সে বন্ধুত্বও হয়। সে বন্ধুত্ব সেখানে ঠিক হয়ে ওঠে নি। সেটা হল—এবং হল মা ছেলের সম্পর্ক ধরে অনায়াসে দু'তিনটে দিনের মধ্যে।

কাদম্বরী এককথায় তাকে তুষ্ট করেছিল। বলেছিল—তুমি আমার বাবা হবে?

সে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

কাদম্বরী বলেছিল—দেখ আমার বাবা মারা গেছেন খুব ছেলেবেলায়। আমি তখন চার পাঁচ বছরের। বাবা বলে ডাকতে তো কাউকে পাই নি এবার তোমাকে পেলাম। তোমায়

বাবা বলে ডাকব।

তারপর বলেছিল—তোমার বাবার তো একজন দাসীর দরকার আছে—আমারও আশ্রয় চাই। তার ওপর তুমি বাবা।

এরপর সে চমৎকার রান্না করে খাইয়েছিল—তেমন চমৎকার রান্না সে আগে খায় নি। তারপর একটু একটু করে ওর মুখের মধ্যে নিজের মায়ের ভুলে যাওয়া ছবিখানি যেন আস্তে আস্তে ফুটে উঠে তাকে একান্তভাবে আপনজন ভেবে নিতে পেরেছিল। শেষটা অর্থাৎ 'আপনজন ভেবে গাঢ়ভাবে ভালবাসাটা' খুব দ্রুত এবং সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে ঘটে উঠেছিল।

এরপর এঁড়েদায় যখন এলেন তার বাবা সঙ্গে সে এবং নতুন মাও এলো—তখন ওর মনে ছিল যে-বিচ্ছেদটা বাবা-মা ও খুড়োমশায়-খুড়ীমার মধ্যে এক-রকম অকারণ ঘটে গেছে সেটা ঘুচিয়ে ফেলবে সে। তার বাবা এবং নতুন মাকে একবার ভালো করে চিনিয়ে দিতে হবে ওঁদের। সে বড় পীড়া অনুভব করছিল। খুড়ীমার গাঢ় ভালবাসা তার ভালোই লাগে, তবু যেদিন এবং যখনই খুড়ীমা গলায় নতুন মাদুলি ঝোলান এবং তার বাবা মাকে উদ্দেশ করে বলেন সম্পত্তিতে হাত দিতে দেব না তখনই সে যেন পর হয়ে যায়। তাই এই মিলটা ঘটাবার জন্য এত আকুতি ছিল তার। কিন্তু তা হল না।

শ্যামবাজারের মোড় থেকে মধু রায় লেন পর্যন্ত নিজের পুঁটলিটা বগলে নিয়ে সে হাঁটতে হাঁটতেই এলো—এই কথা ভাবতে ভাবতেই এলো। সে বড় একা। একান্তভাবে মনে হল কাজ নেই তার বিদ্বান হয়ে—ইংরিজীজানা একালের বাবু হয়ে—সে কোনোরকমে এণ্ট্রান্স পাস করেই বাড়ি যাবে। বাবার কাছে সংস্কৃত পড়বে—সংস্কৃতে পণ্ডিত হবে। না-হলে হুগলী চুঁচড়োর কোর্টে চাকরিবাকরি করবে।

মধু রায় লেন—ঢুকতেই রাধাশ্যাম হৈ হৈ করে উঠল।—মন্মথ—মনু মনু। মনু এসেছে। মনু এসেছে। তুই ফার্স্ট হয়েছিস ভাই মনু। ইংরিজীতেও বিভূতি সত্য দুজনেই হেরে গেছে তোর কাছে।

বাড়িতে কাকা-কাকীমার স্নেহের তিরস্কার ও সমাদরে আবার একদফা বিপর্যস্ত হয়ে গেল সে। কাকা অনুযোগ করলেন, কাকীমা বকলেন, কাঁদলেন পর্যন্ত।

ইস্কুলে যেতেই সে আর এক চেহারা। গোটা ক্লাসটাই হৈহৈ করে করে তার কাছে ছুটে এলো।

জীবনে আতিশয্য তার কাছে কেমন কেমন লাগে। বিশেষ করে সেই আতিশয্যের কেন্দ্রমূলে যদি সে নিজে থাকে তবে তাতে তার বড় বিব্রত বোধ হয়। এমন কি বাবার স্নেহের সমাদরের মধ্যেও যেন সে খানিকটা প্রগল্‌ভতা, অশোভনতা দেখতে পায়। সেটুকু অবশ্য বাবা বলেই খানিকটা ভালো লাগে, আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যেন এতটা না হলেই ছিল ভালো। এবারও তার তাই মনে হয়েছে।

কিন্তু সে কোথাও কোনো আতিশয্য বা কোনো প্রগল্‌ভতার সমালোচনা করে নি মুখ ফুটে। দেখে কোথাও কৌতুক বোধ করেছে, কোথাও বা কটু কি অশোভন লেগেছে এই পর্যন্ত। সেটা অনুভবের নিঃশব্দ ক্ষেত্র থেকে আর বাইরে প্রকাশিত হয় নি। তার একটা বড় কারণ, নিজে সে কথা বলে কম। বেশি কথা বলতে তার ভালো লাগে না।

তাই সমস্ত ক্লাসটাই যখন প্রায় একযোগে তার কাছে ছুটে এলো তখন সে মুখে একটা কথাও বলতে পারলে না, শুধু বিব্রত হয়ে হাসল। তাও মৃদু হাসি।

ভিড় এবং উচ্ছ্বাস একটু কমে এলে সত্য হাসিমুখে তাকে জিজ্ঞাসা করলে—কিরে, এর আগে একদিনও কামাই করিস নি! এবারে বুঝি তার শোধ তুলে নিলি?

সে হাসিমুখে প্রায় ফিসফিস করে বললে—ক—ত দিন বাবাকে দেখি নি। তাই বাবার

কাছে গিয়েছিলাম ক'দিন।

আভাসে আভাসে সত্য মন্মথর বাবার প্রতি তার আনুরক্তির কথা জানে। তাই সকৌতুকে সে আস্তে আস্তে বললে—তাই বুঝি আর ফিরে আসতে ইচ্ছে হচ্ছিল না? মন্মথ কথার উত্তর না দিয়ে মৃদুমৃদু হাসতে লাগল।

ওপাশ থেকে বিভূতি কপট আস্ফালনে চোখ পাকিয়ে তাকে বললে—কিরে, ইস্কুল কামাই করে বুঝি নিজের 'পোজিশান' বাড়াচ্ছিলি?

এবার মন্মথ সত্যিই বেশ কৌতুক অনুভব করলে; ওর দিকে তাকিয়ে বললে--তার মানে?

ওর দিকে ভালো করে তাকাতেই বিভূতির কয়েকটা সুস্পষ্ট পরিবর্তন তার চোখে পড়ল। বিভূতি যেন আর আগের সেই বালক বিভূতি নেই। মুখখানা তার ভারী লাগছে,ঠোঁটের উপর গোঁফের রেখাটি আরও ঘন আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে। তার দুই বড় বড় চোখে কেমন একধরনের মাদক গভীরতা ছায়া ফেলেছে। গলার আওয়াজ তার অনেকদিন থেকেই ভারী হয়ে এসেছিল, এবার যেন সেই ভারী ভারী ভাবের মধ্যে যে জায়গাগুলো খালি ছিল, ফাঁক ছিল সেগুলিও ভরাট হয়ে উঠেছে। যেন সে লম্বাও হয়েছে আরও খানিকটা।

অমনিভাবে তার দিকে মন্মথকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বিভূতি একটু অবাক হয়েই ভ্রূ নাচিয়ে প্রশ্ন করলে—কি দেখছিস অমন করে?

মন্মথর মুখের সব কৌতুক মিলিয়ে গিয়ে সেখানে কেমন একধরনের আবিষ্ট দৃষ্টি ফুটে উঠল। তার কথার সুরেও যেন তার খানিকটা আমেজ লাগল। তার মুখের দিকে তেমনি-ভাবেই তাকিয়ে থেকে সে বললে—তোকে!

—আমাকে? ভারী আমোদ লাগল বিভূতির। সে হা হা করে হেসে উঠল। আবার খুশীও হল। বললে—কি দেখছিস আমাকে?

তেমনি আবিষ্টভাবেই মন্মথ বললে—তুই অনেকটা বড় হয়ে গিয়েছিস। আর অনেক পালটে গিয়েছিস!

—তাই নাকি? হা হা করে হেসেই চলল বিভূতি। হাসি তার আর থামে না। হাসির মধ্যে খুশীর আমেজটাই বেশী।

অকস্মাৎ হাসি থামিয়ে সে একটা আঙুলের খোঁচা দিলে সত্যকে, বললে—সত্য, মন্মথ কি বলছে শুনছিস?

—শুনেছি। কিন্তু তুই অমন করে খোঁচা দিস না বিভূতি।

—দেব না? নিশ্চয় দেব। আচ্ছা তুই বল, আমি মনুর চেয়ে কম কিসে?

—কম বলেছে কে তোকে? তুই তো রাজালোক! তুই তো সবারই চেয়ে বড়। তোর কথাই আলাদা।

বিভূতি বিরক্ত হল, বললে—আঃ, আমি কি সেই কথা বলেছি নাকি? আমি বলছি—মনু ফার্স্ট হয়েছে, শুধু ফার্স্ট হয় নি আমাদের চেয়ে এত বেশী নম্বর পেয়েছে যে ডবল ফার্স্ট বলতে পার। সত্য সেকেণ্ড, আমি থার্ড। থার্ড হয়েছি, মনুর অনেক পেছনে পড়ে আছি, বেশ কথা, মানলাম। কিন্তু এদিকে আমি যে বিয়ে করছি সে খবর রাখিস? বিয়ে করলে তোদের সবারই ওপরে চলে যাব সেটা বুঝিস?

মন্মথ যেন অকারণে লজ্জা পেল। সে মুখ নিচু করে একটু হাসল। সত্য বিরক্ত হল এবং সেই বিরক্তি সে গোপন করবার চেষ্টা করলে না। বললে—এই তো বয়স, এখনও ইস্কুলে পড়ছিস, এর মধ্যে বিয়ে করবি কি রে? ছিঃ!

বিভূতি চটে গেল, সে রেগে বললে—তোকে আর বক্তৃতা করতে হবে না, থাম। তোদের একঘেয়ে বুলি আমার সব জানা আছে। বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে, সুযোগ পেলেই,

এখুনি এইখানে একটা লম্বা বক্তৃতা দিয়ে দিবি।

সত্য ভীষণ চটে গেল। তবু যথাসম্ভব শান্তভাবে বললে—তোকে আর কি বলব বল! তোরা এমনিই! তোরা যে বিদ্যাসাগরকে মাথায় করে নাচিস, যার ভালো কথাকে ভালো বলে লাফালাফি করিস, আসল কাজের সময় তার কথায়ও কান দিস না! কি বলব! ...বলেই সে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে বসল। বিভূতির উত্তর শুনবার প্রবৃত্তিও তার নাই।

এই সময়েই মাস্টারমশাই চলে যেতেই আবার বিভূতি সত্যকে আস্তে আস্তে ডাকলে—সত্য, এই সত্য।

সত্য মুখও ফেরালে না, জবাবও দিলে না।

বিভূতি আশ্চর্য, সত্যর এ অবহেলা সে গায়েও মাখল না, আবার ডাকলে—সত্য!

এবার মুখ না ফিরিয়ে সত্য স্পষ্ট বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিলে—কি? কেন বিরক্ত করছিস বল তো?

বিভূতি বেশ মোলায়েমভাবেই বললে—রাগ করেছিস নাকি?

সত্য এবার মুখ ফিরিয়ে গম্ভীরভাবে বললে—না, রাগ করি নি। বল কি বলবি বল! বাল্যবিবাহ খুব ভালো, এইতো? বেশ, বাল্যবিবাহ খুব ভালো, মেনে নিলাম। আর কি?

বিভূতিও এবার গম্ভীরভাবে বললে—না, বাল্যবিবাহের কথা, আমার বিয়ের কথা বলি নি। আমার এই বয়সে বিয়ে করা উচিত নয়, তুই বললেও তো আর বিয়ে করা তুই আটকাতে পারছিস না! ও কথা বলি নি! বলছি অন্য কথা! আজ সন্ধ্যেতে আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবি?

সত্য সমান তেজের সঙ্গে বললে—তোমার সঙ্গে কোথাও যাব না।

আঘাতটা গায়েই মাখলে না বিভূতি। বললে—খারাপ জায়গা নয় রে ভালো জায়গা! নাম শুনলে এক্ষুণি লাফিয়ে উঠবি যাবার জন্যে!

সত্য জবাবও দিলে না, তার দিকে আর তাকালও না।

বিভূতি বললে—আজ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে সন্ধ্যেবেলায় যাবি আমার সঙ্গে? বুড়ো কর্তা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ফিরে এসেছেন। রবিবাবুর 'বাল্মীকি প্রতিভা' থিয়েটার হবে। আমাদের বাড়ির সব নেমন্তন্ন করেছে।

সত্য এবারও কোনো কথা বললে না।

বিভূতি এবার প্রায় মিনতি করে বললে—তোকে সত্যি বলছি সত্য, আমি এখন বিয়ে করতে চাই নি। আমি এখন বিয়েতে আপত্তি করেছিলাম, বলেছিলাম—এত অল্প বয়সে আমি বিয়ে করব না! তা দাদু কিছুতেই ছাড়ছে না, বলছে—আমি কবে মরে যাব। নাতবৌ না দেখে গেলে মরেও শান্তি পাব না। জানিস, বুড়ো আমাকে অনেক টাকা দিয়ে একটা ছবি-তোলা ক্যামেরা কিনে দিয়েছে। আমি তাই দিয়ে অনেক ছবি তুলেছি। তোকে দেখাব একদিন।

সত্য এবার একটু হেসেই বললে—আচ্ছা, তুই বিয়ে করবি তাতে আমার কি বল দেখি? আর তোর সঙ্গে আমাকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি যেতে হবে কেন? আমি তো এখুনি সেখানে যাব। আমি তো গান করব ওই বইয়ে।

টিফিনের সময় সত্য সত্যিই ছুটি নিয়ে চলে গেল।

টিফিনের সময় মন্মথ আনমনে একটা বকুলগাছের তলায় দাঁড়িয়ে ছিল। চনচনে রোদ্দুরে। বর্ষা শেষ হয়ে এসেছে। ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি। খুব একটা ভালো লাগছিল না তার। তবু দাঁড়িয়ে ছিল। এমন সময় কোথা থেকে বিভূতি এসে তার পাশে দাঁড়াল,

বললে—একা দাঁড়িয়ে আছিস ? সত্য চলে গেল বুঝি ?

মন্মথ তার মুখের দিকে না চেয়েই অন্যমনে বললে—না, এমনি ! বলে সে বিভূতির মুখের দিকে চাইল। চেয়েই রইল। তবু বিভূতির মনে হল সে যেন তাকে দেখছে না।

—কিরে, কি ভাবছিস কি ? বলে তাকে মৃদু ধাক্কা দিলে গায়ে-পড়া বিভূতি। এতক্ষণে মন্মথর নজরে পড়ল বিভূতির মুখে চোখে একটা চাপা উত্তেজনা যেন থমথম করছে।

তার কাছে আরও এগিয়ে গিয়ে বিভূতি ফিসফিস করে বললে—একটা জিনিস দেখবি ?

তার মুখের দিকে চেয়ে থেকেও কিছু বুঝতে না পেরে কেমন ভয় পেয়ে গেল মন্মথ। কি যেন একটা কথা বিভূতির মুখে খেলা করছে তা সে যেন খানিকটা বুঝতে পারছে, আবার পারছেও না। সে শুধু বললে—কি ?

—একটা ভারী মজার জিনিস। এখানে দেখানো যাবে না। আয়, ঝোপের এপাশে আয়।

কেমন একধরনের শঙ্কায় মনটা বিকল হয়ে গেল তার। অথচ আরশোলাকে কাঁচপোকা যেমন আকর্ষণ করে নিয়ে যায় তেমনি এক অনিবার্য আকর্ষণে বিভূতির পিছনে পিছনে ঝোপের আড়ালে নিভৃত জায়গায় সে গিয়ে দাঁড়াল। জামার নিচের পকেট থেকে একটা কি বের করে, বেশ আড়াল দিয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করে তার হাতে তুলে দিয়ে বিভূতি বললে—এর আগে কখনও দেখেছিস ? দেখ !

সে দেখলে। একখানা ছবি। ফটো। অসংবৃত-বাসা একটি তরুণীর ছবি। ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন, সেই নগ্নতার লজ্জায় কুণ্ঠিত হয়ে সে মুখ নিচু করে আছে। অথচ কি সকৌতুক সলজ্জতা ! ছবিখানা একবার, মাত্র একঝলক দেখেই সে বুঝে নিয়েছে যে এ ছবি মেয়েটির জ্ঞাতসারে তোলা ছবি। দেখতে দেখতে তার গলা শুকিয়ে এলো, পা কাঁপতে লাগল, হাত ঘামতে লাগল, মাথা ঘুরে উঠল, বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল তার। সে নিদারুণ ভয়ে ছবিটা বিভূতির হাতে ফিরিয়ে দিলে। অথচ ছবিটা তার আবার দেখতে ইচ্ছা করছিল।

বিভূতি কিন্তু তাকে তখনি ছাড়ল না। জীবনের অনেক গূঢ়, কুটিল, উত্তেজক, বিচিত্র অভিজ্ঞতার গোপন কথা তাকে জানিয়ে দিলে।

বিভূতির হাত থেকে সে যখন ছাড়া পেলে, তখন তার আলোকোজ্জ্বল পৃথিবীর উপর এক পোঁচ কালির ছোপ ধরে গিয়েছে।

কি একটা যেন হয়ে গেল তার।

সমস্ত দেহে মনে যেন জ্বরের উত্তাপ বা দাহ ছড়িয়ে পড়ছে ; শুধু ছড়িয়ে পড়ছেই নয় যেন বাড়ছে ছড়াচ্ছে ধীরে ধীরে। কান দুটো গরম হয়ে উঠেছে—নিজের হাত দিয়েই সে তো টের পাচ্ছে। হাতের তেলো পায়ের তলায়ও উত্তাপ জমে উঠেছে। নাকে নিশ্বাস ফেলছে—সে নিশ্বাসও গরম।

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরল একটা জর্জর আচ্ছন্নতার মধ্যে সারাটা রাস্তা সে একা একা এলো। ইচ্ছে করেই একা একা এলো। তার মনের মধ্যে আর একটা ছবির-বই ফটো অ্যালবাম যেন খুলে খুলে যাচ্ছে। অন্দরমহলের শোবার ঘরের ছবি। এদের দেওয়ালে লেখা কতকগুলো অশ্লীল শব্দ। স্নানের ঘরের ছবিতে অনেকগুলি যুবতীর আবরণমুক্ত ঊর্ধ্বাঙ্গ। যুবতী মেয়ে মেয়েতে হেসে ভেঙে পড়া। কোনো পুরুষের সঙ্গে কোনো মেয়ের ইশারায় কথা বলার ছবিগুলো সেলুলয়েডের নেগেটিভের মতো এতদিন কালো হয়ে ক্লীপে আবদ্ধ হয়ে ঝুলছিল—সেগুলো যেন ছবি হয়ে ফুটে উঠেছে। যে স্মৃতির টুকরোগুলোর অর্থ ছিল না, এতদিন সেগুলোর যেন অকস্মাৎ আজ অর্থ হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সাতাশি অষ্টআশি সাল। কলেজ স্কোয়ারের এলাকা মাধববাবুর

বাজার পেরিয়ে এসে হ্যারিসন রোড পার হয়ে কলাবাগান বসতি। মাঝখানে মা-শীতলার স্থান। কলাবাগান বসতি মার্কাস স্কোয়ার অঞ্চল জুড়ে বিরাট বসতি অঞ্চল। এ সমস্তের মধ্যে দিয়ে সে বিভ্রান্তের মতো মানুষের জীবনের বিচিত্র এই খেলাফুল দেখতে দেখতে বাড়ি এসে উঠল। রাধাশ্যাম বোধহয় তার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে এখনও। সে তাকে ইচ্ছে করে এড়িয়ে একলা একলা চলে এসেছে। এবং ইস্কুল থেকে তাদের বাড়ি পর্যন্ত—হিন্দু স্কুল থেকে মধু রায় লেনের জটাধর ভট্টাচার্যের বাড়ি পর্যন্ত এই পথটুকু অতিক্রম করে বাড়িতে পা দিয়ে সে নিজে নিজেই চমকে উঠল। মনে হল বাইরের জগতের অনেক অশুচিতা, অনেক পাঁক কাদা সে পরমাগ্রহে দুই হাতে তুলে সর্বাঙ্গে মেখে বাড়ি ফিরেছে। স্নান করতে ইচ্ছে হল তার। ইচ্ছে হল স্নান করে গীতা বা মহাভারত নিয়ে খানিকটা পড়ে।

স্নান করতে সাহস হল না তার। সেকালের কলকাতায় ম্যালেরিয়া থেকে টাইফয়েড পর্যন্ত নানান ধরনের ব্যাধি নর্দমায় খানাখন্দের ময়লার মধ্যে নিজের নিজের ঘাঁটি খুলে রেখেছে। বিকেলবেলা স্নান করা দেখলে খুড়ীমা আর বাকী রাখবেন না কিছু। স্নান কেন ? কিসের অশুচি ? কেন অশুচি এমনই ধরনের হাজারো প্রশ্ন হবে। তাছাড়া বোধহয় স্নানের জলেও অকুলোন পড়বে। জটাধরের বাড়িতে বাসন মাজার কলতলা কুয়োতলা থেকে বাথরুম পর্যন্ত তিনরকমের জলের ব্যবস্থা। প্রথম হল জটাধর এবং ছোটগিন্নীর স্নানঘর—সেখানে মার্বেলের চৌবাচ্চা মার্বেলের মেঝে মস্ত আয়না, মার্বেল-টপর‍্যাকেট। তার উপর অনেক গন্ধদ্রব্য। এই মার্বেলের চৌবাচ্চা নিত্য ভারীরা এসে গঙ্গা থেকে জল তুলে ভারে বয়ে এনে পূর্ণ করে দিয়ে যায়। দুই নম্বর হল, কলের জল। খাবার জন্য ব্যবহার হয়, বেসিনে হাত মুখ ধুতেও ব্যবহার করে। তবে কলের জল এখন ইচ্ছেমতো ব্যবহার হয় না। তিন নম্বর হল কুয়োর জল। খুব ভালো পাকা ইঁদারা করেছেন জটাধর। তা'হলেও জল নোস্তা এবং কষা। চৌবাচ্চার জল যেটা পবিত্র গঙ্গার জল তাতে স্নান করেন দু'জন—জটাধরবাবু আর কৃষ্ণভামিনী। আজকাল মন্মথও স্নান করে। কিন্তু মন্মথর দু'বেলা স্নান করার অধিকার এখনও মঞ্জুর হয় নি। চৌবাচ্চায় গঙ্গার জল ভরা হয় দু'বেলা ভোরবেলা যে জল আসে সে জলে সকালবেলা তিনজন স্নান করে। বেলা দুটো থেকে তিনটের মধ্যে আর একবার জল দিয়ে যায় ভারীরা—সে জলের পরিমাণ কম। কার জন্যে ক'ভার জল লাগবে বা লাগে তার হিসেব আছে। খুড়ীমার গা ধোয়া বোধহয় হয়ে গেছে। সাবান মেখে গা ধুয়ে তিনি চুল বাঁধবেন টিপ পরবেন। চোখের কোলে কোলে কাজল দেবেন। পাউডার মাখবেন। গন্ধ মাখবেন।

কাকা জটাধরবাবুর শরীরখানা মজবুত। তিনি দু'বেলা পুরো স্নান করেন। রীতিমতো সাবানমেখে স্নান করেন। তারপর চুনোটকরা কোঁচানো ধুতি পরে অনেক গন্ধদ্রব্য মেখে সেজেগুজে বেড়াতে বের হন। কোনোদিন থিয়েটারে যান।

আজকাল—বছর কয়েক হল হাতীবাগানের মোড়ে পেশাদারী থিয়েটারের পত্তন হয়েছে ; নিজের ঘরদোর ; সব নামকরা লোকেরা অ্যাক্টর হয়েছেন। তার মধ্যে ইংরিজীজানা বেশ পণ্ডিত লোক আছেন। বাগবাজারের গিরিশ ঘোষ, অর্ধেন্দু মুস্তাফী, অমৃতলাল বসু, লোকে ডাকে ভুনীবাবু বলে। মহেন্দ্র মাস্টার, অমৃত মিত্তির। মেয়েদের পার্ট এখানে মেয়েরা করে। মেয়েরা হল উত্তর কলকাতার দেহব্যবসায়িনী পাড়ার মেয়ে। পার্ট নাকি এরা ওই সব শিক্ষিত পুরুষদের সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে সুন্দরভাবে করে যায়। এত ভালো করে যে, দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেব অভিনয়ে তৃপ্ত হয়ে বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করেছিলেন। লোকেও বলে যে, বিনোদিনীর এই জন্মেই সব কর্মের গ্রন্থি খুলে গেল। আর ওর জন্ম হবে না। বিনোদিনীর খুব নামডাক। হাতীবাগানের থিয়েটার স্টার থিয়েটার। আরও

থিয়েটার হচ্ছে উঠে যাচ্ছে আবার হচ্ছে—এমনি চলছে। কলকাতায় যাঁরা ধনী লোক—যাঁরা হালফেশানী বেহ্মজ্ঞানী নন তাঁরা থিয়েটারকে ভালবাসেন। তার কাকাও তাদের মধ্যে একজন। বিকেলে যেদিন স্নান করবার সময় কাকা চাকরদের নিয়ে হইচই করেন সেদিন কাকা থিয়েটারে যান। খুড়ীমারও থিয়েটারে বাতিক আছে। থিয়েটার মন্মথও দেখেছে। দেখিয়েছেন তাকে কাকা। থিয়েটারে মেয়েরা নাচে—নাচের সময় তারা যে-সব ভাবভঙ্গি করে তার সম্পর্কে তার এতদিন পর্যন্ত কিছু কিছু লজ্জা ছিল—একটু ভয় ভয় ছিল। আজ যেন মনে করতেই সমস্ত শরীরটা কেমন ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল।

বাথরুমে বেশ করে মুখ হাত পা ধুয়ে—মাথায় খানিকটা জল দিয়ে—ভিজে গামছায় গা মুছে অন্যমনস্কতার মধ্যেই সে বিকেলের খাবার খেয়ে নিয়েছে। খাবারদাবার খেয়ে নিয়ে সে গিয়ে উঠেছিল ছাদে। এই ছাদে সে রোজই ওঠে–রোজই সে দেখে কলকাতার মধ্যের আর এক কলকাতাকে। গঙ্গার বুকে যত স্টীমারের ফানেলের ধোঁয়া—গঙ্গার ওপারে পাটকলের লোহার লম্বা চিমনিগুলো কালো রঙের আকাশছোঁয়া থামের মতো কি মিনারের মতো দাঁড়িয়ে আছে, ধোঁয়া ওগরাচ্ছে। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ওই উত্তরের ওই বরানগর কাশীপুর ঘাট থেকে বাগবাজার খড়ঘাট অন্নপূর্ণাঘাট কাশী মিত্তির নিমতলা ঘাট থেকে ওই দক্ষিণে বাবুঘাট হাওড়া ব্রীজের ধার পর্যন্ত বড় বড় সওদাগরী নৌকার মাস্তুলগুলো আশ্চর্য এক কলকাতার ঘোমটা তুলে দেয়, যে কলকাতার ঘোমটা তুলে দেয়, যে কলকাতাকে গঙ্গার ধারে ধারে পায়ে পায়ে ঘুরলেও দেখা পাওয়া যায় না।

রোজই সে কিছুক্ষণ অন্তত এই কলকাতাকে দেখে।

আজ কিন্তু সেদিকে তার দৃষ্টি যেন ফিরলই না। দৃষ্টিটা আবদ্ধ হয়েছিল কিছুটা দূরের একটা বাড়ির ছাদের উপর। দুটি মেয়ে বেড়াচ্ছে। রঙিন কাপড় এবং মাথার তৈলচিক্কন চুলের পরিপাটি বিন্যাস দেখে তার মনে পড়ে গেল বিভূতির দেখানো সেই ক'খানা ছবির কথা। মন্মথ ওই ছাদের মেয়ে দুটির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে ওই দিকের আলসের গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ একসময় মেয়ে দুটি খুব কাছাকাছি হয়ে কি যেন বলাবলি করে খুব ঢলাঢলি করে হেসে গড়িয়ে পড়ল। মন্মথর মনে হল তারা বোধহয় তাকে এইভাবে লুব্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে এমন হাসাহাসি করছে। একটা উত্তেজনায় সে ঘেমে উঠল। এবং বুকের ভিতরটা কেমন যেন দ্রুত হৃদ্স্পন্দনে মাথা কুটতে লাগল। হঠাৎ মেয়ে দুটি এসে তাদের ছাদের আলসেতে বুকে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তাকে ডাক দিতে লাগল তাদের হাতছানির ইশারায়। এবার একটা দুরন্ত ভয় তাকে আচ্ছন্ন করলে যার জন্যে সে একেবারে ছুটে নেমে গেল ছাদ থেকে। সে জানে সে বুঝতে পারলে মেয়ে দুটি এতক্ষণ তার ভয় নিয়ে পরস্পরের মধ্যে রঙ্গরস করে হেসে কৌতুকে প্রায় ভেঙে পড়ছে ওদের ছাদে। সে কিন্তু একবারের জন্যও পিছন ফিরে তাকাতে সাহস করলে না, মনে হল (সে জানে এ মনে হওয়া মিথ্যে কারণ এ অসম্ভব।)—তবুও মনে হল যে, মেয়ে দুটি বুঝি কোনো অলৌকিক বলে ডানা মেলে তাদের ছাদে এসে নেমে পিছন-পিছন ছুটে আসছে।

ছুটে আসার পথে দোতলার মুখে সে পড়ে গেল তার খুড়ীমার সম্মুখে। খুড়ীমা আজ খুব সাজসজ্জা করেছেন। তিনি তাকে এমন করে ভয়ার্ত বা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ছাদ থেকে নেমে আসতে দেখে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন—কি রে মনু? কি হয়েছে রে? এমন ভাবে—

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই মন্মথ তাঁকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। যাচ্ছিল সে নিচের তলায়। নিচের তলায় বাইরের ঘরে সে ঢুকল। এমন কৈশোরে তরুণ মন যখন নিজের কাছ থেকে পালাতে চায় তখন এমনিভাবেই সকল পরিচিত আবেষ্টনী থেকে দূরে

গিয়ে অপরিচয়ের মধ্যে অপরিচিতের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায়। ওদিকে দরজা দিয়ে বাইরে থেকে ঠিক তখনই ঘরে ঢুকল রাধাশ্যাম। সে বললে—কি? আমি তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরি আর তুমি চলে—। কিন্তু তুমি এমন হাঁপাচ্ছ কেন?

ঠিক সেই মুহূর্তটিতে খুড়ীমা তার পিছন ধরে এসে ঘরে ঢুকে ঠিক ওই একই প্রশ্ন করলেন—তুই এমন করে হাঁপাচ্ছিস কেন? মনু!

মন্মথকে কে যেন তৈরি উত্তর মুখের গোড়ায় যুগিয়ে দিল; আশ্চর্য অবলীলাক্রমে মিথ্যা উত্তরটা নিরীহ নির্দোষ সত্য হয়ে কথাগুলো বেরিয়ে এসে দুজনকেই চুপ করিয়ে দিল—সে বললে—আজ ব্যাকরণ পড়তে যাব কিন্তু একবারে ভুলে গিয়েছি। ছাদ থেকে রাধাশ্যামকে দেখে মনে পড়ে গিয়েছে আর ছুটে নেমে এসেছি।

রাধাশ্যামের বাবার কাছে ব্যাকরণ পড়ছে সে স্কুলে পড়ার সঙ্গে। সপ্তাহে তিন দিন করে ভটচাজমশায়ের বাড়ি যায়। আজ সেই তিনদিনের একদিন—আজ বুধবার।

রাধাশ্যাম বললে—কি ব্যাপার বল তো? আজ তোর হয়েছে কি? আজ আমার জন্যে ইস্কুল থেকে বেরিয়ে দাঁড়াস নি। ছেলেরা বললে চলে গিয়েছে। বাড়ি এসে আজ বুধবার ব্যাকরণের দিন তা ভুলে গেছিস। মনে তোর হল কি?

মানুষকে যেখানে মিথ্যে বলতে হয় সেখানে শরীরের দোহাই হল তুরুপের তাস। কোনো রকমে শরীর খারাপ হওয়ার দোহাই পাড়তে পারলে বাস্ তুমি নিরাপদ। মন্মথর এক্ষেত্রে শরীর খারাপ বললে রাধাশ্যাম নিরস্ত হবে কিন্তু খুড়ীমা জেরায় ফেলবেন কি না কে জানে! তবুও এই ছাড়া উপায়ও ছিল না। মন্মথ বললে—আজ লাস্ট আওয়ারের আগে থেকে শরীর এমন খারাপ হল যে ছুটির পর আর দাঁড়াতেই পারলাম না।

খুড়ীমা সত্যিই হাঁ-হাঁ করে উঠলেন—শরীর খারাপ! বাড়ি এসে দিব্যি মুখ হাত ধুয়ে জল খেলি, কিছু তো বললি নে? রাধাশ্যাম বাবা নায়েবকে একবার ডাকো তো!

মন্মথ বললে—না না। এখন আবার সব ঠিক হয়ে গেছে। ওটা বোধহয় খিদেটিদে লেগেছিল। তাই—। বোকার মতো হাসতে লাগল সে।

—না-না-না। যে রোগ বালাইয়ের আড়ং ডিপো হয়েছে কলকাতা তাতে মানুষ বেঁচে আছে এইটেই আশ্চর্য! তুমি হরগোবিন্দকে ডাকো বাবা রাধাশ্যাম।

হরগোবিন্দ তাকে পরিত্রাণ অবশ্য দিলে—কিন্তু পথ্যের-টথ্যের ব্যাপারে বেশ কিছু কিছু অসুবিধে ঢুকিয়ে দিয়ে তবে দিলে। মন্মথর নাড়ী পরীক্ষা করে বললে—নাড়ীতে দোষ বিশেষ পাচ্ছি না। কিন্তু একটা অসুবিধে ঘটে গেছে। নাড়ী এখনই ভালো এখনই মন্দ। মানে এই বেশ চলছে—মনে হচ্ছে কোনো অসুখ নেই—আবার হঠাৎ লাফাতে শুরু করছে। মানে খুব দ্রুত চলছে বায়ুর কাজ আর কি। মনে হয় বায়ু প্রকুপিত হয়েছে—তার জন্যে পরিপাকাদি ক্রিয়া বেশ ভালো হচ্ছে না। ওদিকে মলস্থলীর অবস্থাও বদ্ধাবস্থা আর কি!

—বুঝলাম—আজ রাত্রে তা' হলে ভাত লুচি রুটি চলবে না, না কি? কি খাবে তা হলে? দুধ? দুধেও তো বলে বায়ু হয়।

—দু মুঠো খই ফেলে দিয়ে খাবে। বায়ুর ভয় থাকবে না।

—বেশ। তা' হলে জ্বরটর হয় নি তো?

—না। জ্বর হয় নি।

—অ ঠাকুর, মনুবাবু আজ রাত্রে খাবে না। খই দুধ খাবে। শরীর ভালো নেই। আমি বাড়ি থাকছি না—কোনো রকমে যেন এদিক ওদিক না হয়। ঠিক ন'টার সময় খেতে দেবে। মনু আজ আবার তুই বেরুচ্ছিস যে! এই দেখ আমি থিয়েটার দেখতে যাচ্ছি। তোর কাকাকে

নেমন্তন্ন করে পাঠিয়েছে থিয়েটার থেকে। বাড়িতেই থাকিস বাপু। আর হরগোবিন্দ কাল একবার ওকে ডাক্তারকে দেখিয়ে আনবেন।

ব্যাপারটা এমন জটিল হয়ে দাঁড়াবে তা' মন্মথ ভাবে নি। শরীর খারাপের অজুহাত তুলে পরিত্রাণ পেতে গিয়ে একরাত্রি খই দুধ খেয়ে থাকাটা খুব কষ্টকর কিছু নয় কিন্তু এর জন্য বাড়ি বন্দী হয়ে থাকা এবং ডাক্তারের কাছে যাওয়ার ব্যাপারটাই একসঙ্গে বিরক্তিকর এবং ভয় লাগার মতো ব্যাপার। ডাক্তার যদি সত্যসত্যই ধরে ফেলতে পারে ব্যাধিটা কি তা' হলে কি হবে, এই ভাবনায় আবার তার বুক ধড়ফড় করে উঠল। একটা উদ্বেগ জাগল বুকের মধ্যে মনের মধ্যে—তার থেকে আর যেন পরিত্রাণ নেই।

সে বলতে গেল—না না তার দরকার নেই, সে ভালো আছে কিন্তু সে সব কথা শুনবার আগেই বাতিল করে দিলেন কৃষ্ণভামিনী। একনাগাড়ে বলে গেলেন—বাড়িতে থাক, আজ আর পণ্ডিতমশায়ের ওখানে যাবে না। বেশী রাত্রি জাগবে না। আমাদের আসতে তো দুটো হবে। নাহয় নতুন অপেরাখানা দেখে চলে আসব। সাড়ে বারোটার মধ্যে হয়ে যাবে। মেলা নাচগান আর রঙ্গরসের বই—তা'না-হলে তোমাকে নিয়ে যেতাম। বড্ড খোলাখুলি সব, আর মেয়েগুলো ভারী বিশ্রী! বড্ড ঢঙ করে। না—তোমার গিয়ে কাজ নেই। ভাল নাটক হলে দেখবে।

একনাগাড়ে কথাগুলি বলে শেষ করে খুড়ীমা চলে গেলেন বাড়ির ভিতরে। মন্মথ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সামনের ঘরে, যে ঘরে সাধারণ লোকেরা এসে বসে—তার খুড়ো জটাধরবাবু মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসে অপেক্ষা করে বসে থাকে।

রাধাশ্যাম বললে—শরীর খারাপ করে ফেললি এই সময়ে।

মন্মথ পরিত্রাণ পেয়েছে আসল সত্য প্রকাশ পাওয়ার বিপদ থেকে এইটেই আপাতত যথেষ্ট বটে কিন্তু কালকের ডাক্তারের হাত থেকে বাঁচবে কি করে তাই হল তার বিপদ। রাধাশ্যামের কথার উত্তরে বললে—কেন? তোর ধারণা বুঝি আমি মিথ্যে করে বলছি?

রাধাশ্যাম বললে—তা' কেন বলব, বলছি বাবা কাল বলছিলেন ভাটপাড়ার মহামহোপাধ্যায়কে—একটি ছাত্র পেয়েছি—তার আশ্চর্য মেধা। ব্যাকরণ এত তাড়াতাড়ি শেষ করলে যে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি।

চুপ করে গেল মন্মথ। কি বলবে উত্তর সে খুঁজে পাচ্ছে না।

এ যেন হঠাৎ অন্য একটা দমকা হাওয়া এসে সব বদলে দিল। রাধাশ্যাম তাকে একটু চুপ করে থাকতে দেখে বিস্মিত হল না, সে বললে—ইংরিজীতেও তোমার সঙ্গে বিভূতি সত্য এরা কেউ পারবে না একথা নাকি তোমাদের মাস্টাররা একবাক্যে বলেছেন। মন্মথর বুকটা কেবল আশ্চর্য একটা উদ্বেগে গুরগুর করতে লাগল, একটা নিদারুণ অস্বস্তি তার সমস্ত অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে দিলে। একটা উত্তপ্ত অশান্তি।

রাধাশ্যাম বাড়ি চলে গেল। খুড়ীমা খুড়োমশায় ব্রুহাম গাড়িতে চড়ে চলে গেলেন হাতীবাগান স্টার থিয়েটারে। সে খই দুধ খেয়ে বিছানায় শুয়ে চোখের পাতা দুটো খুলেই জেগে রইল।

কোমর থেকে উর্ধ্বাঙ্গ পর্যন্ত একেবারে নগ্ন একটি মেয়ের ছবি। একরাশি এলানো চুল, একেবারে নগ্ন দুটি সুন্দর সুগঠিত স্তন—মেয়েটি মাথা হেঁট করেও বিলোল কটাক্ষ হেনে যেন কথা কইছে যে দেখছে সে ছবি তার সঙ্গে।

বিভূতি গল্প বলেছে একটি মেয়ের। তার জাঠতুতো দাদার রক্ষিতা মেয়েমানুষ। চোখের ইশারায় সে বিভূতিকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে। তার কটাক্ষ হানা তার ইঙ্গিতময় কথাবার্তা, যা বিভূতি বলেছিল সব যেন জীবন্ত হয়ে মনের মধ্যে ঘুরছে।

একসময় চোখ বুজে আরও আশ্চর্য হয়েছে যে, সেগুলি সব যেন এক মুহূর্তে মনে মনে জীবন্ত হয়ে উঠল। থিয়েটারের স্টেজ এবং নর্তকীদের সারি, নাটকের সবাই যেন হেসে ইশারা করে চলে গেল। মনের মধ্যে ঘটনার পর ঘটনা নানান ঘটনা ভেসে যাচ্ছিল কিন্তু তার সবগুলির মধ্যেই বিচিত্রভাবে এই এক আশ্চর্য ধরনের মেয়েদের ভিড়ই ছিল বেশী, বিভূতির ছবিখানা যেন ওই থিয়েটারে স্টেজের উপর একশো মূর্তি নিয়ে নাচে গানে ইশারায় তাকে যেন উত্তপ্ত এবং উত্তেজিত করে তুললে।

মধ্যে একবার চুপিচুপি ছাদে গিয়ে উঠল। সেই বিকেলবেলার ছাদটা খুঁজে বের করতে চাইলে। কিন্তু তা, ঠিক সম্ভবপর হল না। কলকাতার আলোর ছটা মধ্য-শূন্যলোকে ভেসে রয়েছে; আকাশে অনেক তারা, অনেক তারা। তারাগুলো অনেক উঁচুতে উঁচুতে। ঈশ্বর আরও অনেক উঁচুতে।

হঠাৎ তার চোখে জল এসে গেল। চোখে জল বুকে বুকভরা কান্না। এ তার কি হল?

তার মন কেন এমন অশান্তিতে অস্বস্তিতে উৎকণ্ঠা উদ্বেগে ভরে গেল?

বয়স তার মোটামুটি হয়েছে। দেহ দিয়ে দেহ ভোগ করার অর্থ সে বোঝে—তার ইশারা তার সারা দেহের স্নায়ু শিরার মধ্য দিয়ে গঙ্গার বুকে জোয়ার আসার মতো কূল ছাপিয়ে আসে যায়। এ যেন ষাঁড়াষাঁড়ির বনের মতো জোয়ার।

গ্রামে থাকতে অল্পবয়সীদের আদিরসাত্মক হাসি-তামাশা শুনেছে। আবার গম্ভীর আলোচনার মধ্যে গ্রামাঞ্চলের পুরনো কালের লোকেদের নারীদেহ ভোগের বিবরণ শুনেছে। এর জন্য পুরনো কালের সমাজকে দোষ দিত, নিন্দা করত। ছেলের দল সব লজ্জিত হত। সমাজের জন্য দুঃখ পীড়া অনুভব করত। ওখানে জমিদার বাড়ি ছিল একটি আঁটপুরে। বুড়ো জমিদার ছিলেন জ্ঞানদাবাবু। জ্ঞানদা বাঁড়ুজ্যে। তাঁর রক্ষিতা ছিল কোথাকার এক চাটুজ্জেদের বিধবা মেয়ে। কুলীনের মেয়ে বিধবা হয়েছিল। তারপর জ্ঞানদাবাবু তাকে ভৈরবী মতে রক্ষণাবেক্ষণে এনে রেখেছিলেন। মহলে রাখতেন। যখন যে-মহলে বা যে-কাছারীতে যেতেন সেই কাছারীতে শ্যামা ভৈরবীর পালকি আগে আসত। বাড়িতে ক্রিয়া-কলাপ হলে ভৈরবী বাড়িতে থাকত একেবারে খোদ গিন্নীর কাছে। এ ছাড়া জ্ঞানদাবাবুর আরও চাহিদা ছিল। তিন ছেলের তিন রক্ষিতা ছিল। কোনো এক ছেলের যেন এক ঝাড়ুদারনী বা মেথরানী রক্ষিতা ছিল।

তাদের জ্ঞাতি ছিল মোহন ভটচাজ; ঘটকালি করে বেড়াত; সে যেদিন আসত সেদিন সকাল সন্ধ্যে রাত্রি কেবলি ওই ফিরিস্তিই শুনতে হত। মোহন ভটচাজের সহোদরের নিকষ-কালো রঙের এক রক্ষিতা ছিল—তার রূপ কোথায় প্রশ্ন করলে মোহনের ভাই বলত—"আমার চোখ দিয়ে দেখলে তবে বুঝতে।"

সে-সময়ে ছেলেদের বিয়ে পণের যোলতে হয়ে তো যেতোই, তার উপর ছেলেদের জন্যে ভালো ঝি-টি রেখে দেওয়া হত। এসব ছিল নবাবী আমলের বড় বড় ঘরের চালচলনসম্মত। এ ছাড়া ঘরে ঘরে পাড়ায় পাড়ায় চরিত্রহীন বেলেল্লাপনার আর শেষ ছিল না।

এখন সে সব পালটাচ্ছে।

লোকে বলে—চোখ খুলছে। পুরনো কালে সমাজের এই সব কুৎসিত আচরণ বিচিত্র-ভাবে সমাজে চলিত ছিল। কুলীনদের শত দরুনে বিবাহ। যেমন তেমন একটা আড়াল দিয়ে বালবিধবাদের নিয়ে লোফালুফি খেলা আজও চলিত রয়েছে।

মন্মথ যখন কলকাতায় পড়তে আসে খুড়োর সঙ্গে তখন সে একালের যে-আদর্শটি গড়ে উঠেছিল ততদিন পর্যন্ত তার সঙ্গে নিজের জীবনলতাটিকে জড়িয়ে দিয়েছিল সযত্নে এবং সুন্দরভাবে। আর লতাটিও দুর্বল ছিল না। তার জীবনের চারাটি জোরালো ছিল এবং

জড়িয়ে ধরবার জন্য লতার গাঁট থেকে যে আঁকড়ি বের হয় সেগুলিও ছিল বেশ মজবুত এবং শক্ত। কাল ছিল অনুকূল। ধর্মের দিকে নতুন জোয়ার এসেছে। রামকৃষ্ণ পরমহংসে শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যরা সব ব্রহ্মচারী হয়ে সন্ন্যাস নিয়েছেন। সোনা সোনা ছেলেরা ওই মুখে ঝুঁকেছে। ব্রাহ্মধর্ম চারিদিকে সাড়া তুলেছে। চারিদিকে নতুন ন্যায়ের স্রোত বইছে। তারই মধ্যে সেও চেয়েছিল একজন আদর্শ মানুষ হয়ে উঠবে। এই আদর্শবাদের কাছে তার বাবা যে বাবা, তিনিও দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করে কেমন যেন ছোট হয়ে গিয়েছেন।

তার সেই জীবনলতাটি আজ একটা বিচিত্র ঝাপটায় ওই একালের আদর্শের দণ্ডের সঙ্গে বন্ধনগুলো ছিঁড়ে ফেলে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে এবং লতা থেকে রূপান্তরিত হয়ে ধুলো-কাদার মধ্যে গোপনসঞ্চারী বিষাক্ত সরীসৃপের চেয়েও ভয়ংকর কিছু হয়ে উঠেছে। এর পিছনে দেহের এবং মনের যে তাগিদটা আছে তা সংবরণ করা যেন অসম্ভব। মনে হচ্ছে দেহে মনে আগুন জ্বলছে। আবার তার থেকেও সর্বনাশের আকর এটা—এটা পাপ এটা অন্যায় এটাও বলছে তার মন। কে রক্ষা করবে তাকে এর কবল থেকে?

আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ওই নক্ষত্র-পুঞ্জদের দেখছিল আর মধ্যে মধ্যে চোখ মুছছিল সে।

অনেকক্ষণ পর সে নিচে নেমে এলো। খুব আস্তে আস্তে নামল। যেন বাড়ির ঝি চাকরেরা কেউ শুনতে না পায়। জানতে না পারে যে, সে রাত্রে ছাদে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে একটা কিছু করেছে। তা' হলে আর রক্ষে থাকবে না।

নিচে এসেও বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ জেগে ছিল সে। ধীরে ধীরে আবার যেন ওই উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে এসেছে। অনুশোচনা যেন প্রবলতর হয়েছে। সে ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে এবার হাফ-ইয়ারলিতে। ইংরিজীতে পর্যন্ত সত্য বিভূতিকে হারিয়ে দিয়েছে—ক্লাসের স্যার রমেশ স্যার তাকে ভালবেসেছেন। তার জীবনের লতা যদি এ যুগের আদর্শের দণ্ডের সঙ্গে যতকিছু বাঁধন সব ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে তা' হলে সে যে সর্বনাশ হয়ে যাবে!

এরই মধ্যে তার ঘুম এসেছিল একসময়। ঘুম এসেছিল, কিন্তু সে ঘুম খুব পাতলা। এত রকমও স্বপ্ন সে দেখেছে এর মধ্যে। দু' একবার চিৎকারও করেছে। করেই নিজের ঘুম ভেঙে গিয়ে জেগে উঠেছে। একবার স্বপ্ন দেখেছে যে একটা ভূতের সঙ্গে তার লড়াই হচ্ছে। হচ্ছে-হচ্ছে—মাথার বালিশটা নিয়ে সে একদিকে টানছে আর ভূতটা অন্যদিকে টানছে। জেগে দেখেছে নিজের মাথার বালিশটা ধরেই টানছে সে। হেসে হেসে একটু জল খেয়ে শুয়েছে আবার। শেষরাত্রের দিকে কাকা এবং কাকীমা এসেছেন থিয়েটার থেকে ফিরে। ঘুম তার ভেঙেছিল কিন্তু কোনো সাড়া দেয় নি। তাতে তার সুবিধেই হয়েছে। কাকা কাকীমা থিয়েটারে যা যা দেখেছেন তাই নিয়ে বেশ সরসভাবে কথাবার্তা বলেছেন, হেসেছেন, তার সবই শুনেছে সে।

সকালে উঠে মাথা তার ঝিমঝিম করছিল। মুখখানাও শুকিয়ে গিয়েছিল, নিজেই আয়নায় নিজের শুকনো মুখ দেখে খানিকটা যেন শঙ্কিত হল। গতকাল বিকেলবেলা খুড়ীমা হরগোবিন্দ নায়েবকে বলেছিলেন কবিরাজকে বা ডাক্তারকে ডাকতে, সে কথাও মনে পড়ল। তবে বিধাতা একটা সুবিধে করে দিয়েছিলেন। আগের দিন থিয়েটার দেখে সারারাত জেগে কাকা বা কাকীমা দুজনেরই কেউ বেলা দশটা পর্যন্ত ওঠেন নি। এরই মধ্যে স্নান করে খেয়েদেয়ে মন্মথ ইস্কুলে চলে গিছল। সত্য তাকে দেখে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে—একি চেহারা হয়েছে তোমার? এঁ্যা? মন্মথ?

মন্মথ একটু বিষণ্ণ তো ছিলই তার উপর ধরা পড়বার ভয়ে ভীত হয়ে বলেছিল—কি হবে? কিছু তো হয় নি!

ঠিক সেই সময়েই বিভূতি তাদের বাড়ির গাড়ি থেকে নেমে হৈহৈ করে ঢুকল স্কুলে। চার পাঁচজন ছেলে সে হলে ঢুকতে না ঢুকতে তার সঙ্গে জুটে গেল। বিভূতি ক্লাসে ঢুকে বই রেখে চারিদিক খুঁজে তাকে সত্যর সঙ্গে কথা কইতে দেখে বললে—এই সেরেছে রে! 'মিথ্যা হইতে সত্যে যাইতেছ নাকি? না, অন্ধকার হইতে আলোকে?' ও মন্মথ!

মন্মথ তার দিকে তাকাতেই সে অর্থাৎ বিভূতি একটা ইশারা করে কিছু বললে। সে-ইশারাটুকুর সবই যেন কেমন অশ্লীল বা অভব্য; যার জন্য মনে মনে যেন কেমন একটা লজ্জা ছি ছি করে ওঠে। মন্মথ সেই লজ্জায় তাড়াতাড়ি মুখ নামালে এবং দৃষ্টিও ফেরালে। বিভূতি কিন্তু তাতে নিরস্ত হল না—সে তার দিকে এগিয়ে এসে তার হাত ধরে টেনে বললে—শোন!

যেতে না চেয়ে একজায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেই সে বললে—বল না।

—সত্যকে লজ্জা হচ্ছে না ভয় হচ্ছে? দূরে—। তুমি ভারী ভীতু! শোন না। বলে জোর করে টেনেই ওকে একটু সরিয়ে এনে তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বললে—আজ যা ছবি পেয়েছি না! একেবারে পাগলা হয়ে যাবে মাইরি। ঠিক টিফিনের সময়। সেইখানে হ্যাঁ।—

দামী সিল্কের লম্বা পাঞ্জাবি দুলিয়ে চলে যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের দিকে তাকিয়ে সত্যকে বললে—শাঁকআলুর প্রসাদ দিয়ে ভাল্লুক উল্লুক ভোলানো যায় সত্য, মানুষেরা ভোলে না। আর দাড়ি গোঁফও ঠিক চলবে না। আমি যে একটা বিলিতী ক্ষুর কিনেছি না, কি বলব মাইরি, একটি টানে দাড়ি সাফ!

হাসতে হাসতে চলে গেল সে। সত্যর মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছিল কিন্তু গম্ভীরভাবে কথাগুলি শুনেই গেল—মুখ ফুটে একটি কথাও বললে না। কলকাতায় একটা গান আছে—মন্মথ শুনেছে এখানে এসে, ব্রাহ্মদলের লোকেদের খ্যাপানোর গান।

—প্রভু আমার পরম দয়াল—

তোমার কৃপায় দাড়ি গজায় ভাল্লুকে খায় শাঁকআলু!

তাই নিয়ে অনেকটা অর্থহীনভাবেই এই ব্যঙ্গটা করে গেল বিভূতি। সত্য তাকে কিছু না বলে বললে মন্মথকে। বললে—ও তোমাকে কি বললে মন্মথ?

মন্মথ বিব্রত হয়ে পড়ল। কি জবাব দেবে? সত্য কথা বলতে গেলে সেই ছবির কথাটা যে বলতে হবে। সে বললে—বলতে কিন্তু বারণ করেছে আমাকে।

—বারণ করেছে? খারাপ কথা বুঝি?

এবার সে কথা খুঁজে পেয়ে গেল। বললে—ওর বিয়ে হবে শোন নি? সেই বিয়েতে সব কি ধুমধাম হবে—সেই সব কথা। তোমাকে বলতে চায় না।

সত্য তাকে শুধু বললে—তুমি মিথ্যে কথা বললে মন্মথ।

তার কণ্ঠস্বর বেশ খানিকটা কঠিন শোনাল। সত্য আর কোনো কথা না বলে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। পাশাপাশি তিনটে সিট। মন্মথ ফার্স্ট প্লেসে বসে, সত্য সেকেন্ড, বিভূতি থার্ড। সত্য মাঝখানে একেবারে শক্ত বোবা একখানা পাথর হয়ে বসে রইল। বিভূতি কিন্তু অদ্ভুত; চেহারায় সে বেশ খানিকটা বেড়ে উঠেছে। দাড়ি গোঁফও কামায় সে। গলায় যেন্ধরা ধরা মোটা একটা সুরের আমেজ ফুটতে শুরু করেছে। সে নির্বিকার নির্ভয়, হৈহৈ চিৎকার করে হাই বেঞ্চ চাপড়ে বাজনা বাজায়, টিফিনে বার্ডশাই খায়, খুব রোল তুলে হাসে। নিজের সেই যে একটি ভালবাসার ছেলেদের দল আছে তাদের সে বার্ডশাই খাওয়ায়। ঘুড়ি ওড়ানোর সময় বাড়িতে ডাকে। এই ছবি দেখানোর ব্যাপারটা একেবারে নতুন। তার বিয়ের কথা হচ্ছে যখন থেকে তখন থেকে ছবির পালা শুরু হয়েছে।

মন্মথ এসব ছবিকে যেন ভয় করে।

ভয় করে কিন্তু তবু দেখে ; দেখার লোভ সংবরণ করতে পারে না।

ব্যাপারটা একদিন ধরা পড়ে গেল। ধরা পড়ল—পড়ল সত্যরই চোখে। বিভূতির এই সব ছবি দেখানো এবং এই সব নিয়ে নানান গল্প বলার পালাটা আবদ্ধ ছিল মন্মথর সঙ্গেই। অন্তত ইস্কুলে ক্লাসে বিভূতি মন্মথকেই শরিক বেছে নিয়েছিল। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে বিপদ আছে। বিভূতি তা জানে। তা' ছাড়াও আছে। রুচির কথা পছন্দের কথা আছে। সে বড়লোকের ছেলে রাজার ছেলে—তার সম্পর্কে অনেক কথা হয় ইস্কুলে বা অন্যের সম্পর্কে উঠলে সামলানো যায় না। বিভূতির বিয়ে হবে—তার সঙ্গে চাউর হয়েছে একটা গল্প। গল্পটা হল এই যে বিভূতি বয়েসের তুলনায় বেড়ে উঠেছে বেশী। গোঁফ দাড়ি গজানো থেকে গলার আওয়াজ পুরুষালী হওয়া পর্যন্ত নানান পরিবর্তন যেন শ্রাবণ মাসের বাদলায় বন্যার জলের মতো হঠাৎ ঢল নেমে চলে এসেছে। এর ফলে বিভূতির হঠাৎ মাথা দমদম করতে এবং আরও যেন কি কি সব শরীর খারাপ হতে আরম্ভ হয়েছিল। মাঝে মাঝে খুব রাগ হচ্ছিল সেই কারণে কবিরাজ দেখানো হয়। দেখে শুনে কবিরাজ বলেন—বিভূতির বিয়ে দিতে হবে। রাঙাটুকটুকে একটি বউ চাই। এটা গল্পগুজব নয়, সত্য খবর হিসেবেই এ সব কথা ইস্কুলে এসেছে। এর উপরে কোনো হাত নেই কারুর। ইংরিজীর মাস্টার রমেশবাবু গোস্বামী স্যার হা হা করে হাসেন আর বলেন—তা' বেশ তো! এ তো ভালো কথা। লজ্জারই বা কি আছে আপত্তিরই বা কি আছে? ওদের দেশের বইতে পড়েছি কত কম বয়সে ওরা বিয়ে করে। যার যেমন বয়সে বিয়ের প্রয়োজন হবে সেই বয়সে বিয়ে করবে। থাকা চাই তোমার স্ত্রীকে স্বচ্ছন্দে রাখবার মতো টাকাকড়ি বিষয় সম্পত্তি ; আর থাকা চাই enough love, প্রচুর ভালবাসা to make your wife happy ; বুঝেছ! বিভূতির টাকা আছে জমিদারি আছে—ওদের ব্যবসা আছে—and বিভূতি নিজে সত্যিই বড় হয়ে উঠেছে। সম্ভবত বিয়ে নেসেসিটি হয়ে উঠেছে। এটা rare case ; তবে এ কালে বিয়ের আগে ওই বিচারটাই হবে—life-এ wife-necessity কি না? You understand?

এই রমেশ স্যারই কিন্তু বিভূতির উপর খড়্গহস্ত হয়ে বলতে গেলে কঠিন বা চরম বিচার চাইলেন।

দিন কয়েক পর। মন্মথর অবস্থা তখন নতুন নেশাখোরের মতন। টিফিনের সময় হয় আর বিভূতির সঙ্গে চট করে বেরিয়ে আসে এবং দু'জনে চলে যায় সকলকে এড়িয়ে কোনো দিকে। সত্য কোনোমতেই সন্ধান পাচ্ছিল না। অথচ এই বিভূতিকে মন্মথর সঙ্গে হাতেনাতে ধরে ফেলার জন্য প্রায় অস্থির হয়ে উঠেছিল।

মন্মথ সম্ভবত উপলক্ষ্য। আসল ব্যাপারটা হল তখনকার দিনের ওইসব হিন্দু বড়লোকদের বিরুদ্ধে শিক্ষিত সমাজ এবং ব্রাহ্মসমাজের ঝগড়া।

হ্যাঁ ঝগড়াই ; তাছাড়া আর কি?

মন্মথর মতো একটি দেখতে সুন্দর এবং লেখাপড়ায় এমন মেধাবী ছেলে শেষ পর্যন্ত বিভূতিদের মতো দাম্ভিক এবং মিথ্যাচারী ভুয়া বড়মানুষদের সঙ্গে এক নৌকায় পাড়ি জমাবে এটা সত্যর কোনোমতেই ভালো লাগছিল না। বিভূতির ছিল খেলা—মন্মথকে সত্যদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া। বড়লোকের ছেলে—বার্ডশাই সে খায়, বাড়িতে তার জন্যে গড়গড়া ফরসির ব্যবস্থা হয়েছে, তার দাদা কাকা এমনকি জ্যাঠার গরাণহাটা চিৎপুর অঞ্চলে মনোরঞ্জনের জন্য গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়ে রূপবতী বাঈ খেমটাউলী আছে—এসব খবর তাদের প্রকাশ্য এবং এ না-হলে রাজবাড়ির রাজাগিরিই হয় না বা হতে পারে না। বিভূতির

বাবা মারা গেছেন—তাঁর আবার একজন মুসলমানী বাঈজী রক্ষিতা ছিল। বাঈসাহেবার নাম ছিল নাজমা বাঈ। বিভূতির বাবা তাঁর উইলে নাজমা বাঈকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে গেছেন।

বিভূতি মন্মথকে রোজই বলেছে—তুমি আমাদের বাড়ি এস না। এখানে এই ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে নেশাখোর কি জোচ্চোরের মতো ভয়ে ভয়ে বসে—, দূর—।

মন্মথর কিন্তু এতখানি সাহস হয় নি। রাজবাড়ি ফটক বন্দুকধারী দ্বারোয়ান এ সবকে তার একটা ভয় আছে। রোজই হয় কলেজ স্কোয়ারের এদিকে নয় ওদিকে—নয়তো মাধববাবুর বাজারের ওপাশে ছবি দেখে গুলপগুজব করে জ্বলজ্বলে চোখ এবং সাপের মতো একসঙ্গে ভয়ার্ত ও হিংস্র মন নিয়ে ফিরে আসছিল।

ওদিকে ওদের খুঁজে বেড়াচ্ছিল সত্য। প্রথম তিন চারদিন সে ওদের উপেক্ষা করতেই চেয়েছিল। যাক না, উচ্ছন্নে যাক না পাড়াগেঁয়ে ভটচাজ বাড়ির ছেলেটা তাতে তার কি যাবে আসবে? কিন্তু বাস্তবে তা' ঠিক সম্ভবপর হয় নি। বড়লোকের ছেলে হয়েও বার্ডশাই তামাক খেয়েও বিভূতি ক্লাসে সত্যর প্রতিদ্বন্দ্বী। মন্মথ এবারে ওদের দু'জনকেই হারিয়ে কুরুপাণ্ডবের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মতো যেন একটা কিছু বা কেউকেটা একটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেদিন হঠাৎ সত্যর চোখে পড়ে গেল। টিফিনের সময় সেদিন একটা বিলিতী লতা দিয়ে তৈরি একটা বাওয়ারের মধ্যে বসে বিভূতি খুব জমিয়ে গল্প বলছিল। কয়েকখানা ছবিও ছিল তার কোলের উপর। ছবিগুলো কুৎসিত ছবি। একটা পুরুষ একটা মেয়ে। এবং সবগুলোই অশ্লীল। আর বিভূতি বলছিল—চল না একদিন আমার সঙ্গে—আমি তোকে গোটা পাড়াটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসব। একটা গোঁফ পরিয়ে দেব, আর এইটুকু একটা নুর আর একটা পরচুলো। তার সঙ্গে পরিয়ে দেব লক্ষ্ণৌইয়া কামদার টোপী, চুস্ত পায়জামা আওর পাঞ্জাবি—গলায় একখানা রঙিন রেশমী রুমাল, পায়ে নাগরা, চোখে সুরমা লাগিয়ে বের হলে কার বাবার সাধ্যি চেনে। কেউ চিনবে না অথচ এদিক থেকে ওদিক ঘুরিয়ে আনব তোকে। কেউ চিনতে পারবে না।

মন্মথ বলেছিল—ওরে বাপ্‌রে! সে আমি পারব না ভাই। বাবাঃ!

পায়ের জুতো খুলে অতি সন্তর্পণে সত্য ওদের পিছন দিক থেকে এসে খুব কাছে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা শুনেছিল এবং সামনে পড়ে থাকা মাত্র একখানা ছবি দেখে সে বাকী ছবিগুলোর বিবরণ আন্দাজ করে নিয়েছিল। তারপর সে আস্তে আস্তে চলে এসে জুতো-জোড়াটা পায়ে দিয়ে ডেকে বলেছিল—তোরা কি করছিস মন্মথ? ওগুলো সব কি?

মন্মথর মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল কিন্তু বিভূতি এতটুকু চঞ্চল হয় নি। সে বলেছিল—এ সব তোদের দেখতে নেই রে। দেখলে গোলকধামের শৌণ্ডিকালয়ের ফল হয়, নরকে পতন।

সত্য চলে গিছল উত্তর না দিয়ে।

মন্মথ বললে—ও নিশ্চয় বলে দেবে হেডমাস্টারকে।

বিভূতি চকিত ভঙ্গিতে ঘাড় ফেরালে, বললে—কোনো ভয় করিস নে। কোনো ভয় নেই। মুখখানা তার থমথমে এবং টকটকে রাঙা হয়ে উঠল একসঙ্গে। বিভূতির এ চেহারা সে কোনো দিন দেখে নি। কিন্তু তাতে তার ভয় যাবার কথা নয় এবং তা গেলও না। বলে দিলে হেডমাস্টার শাস্তি দিলে কি করতে পারে বিভূতি? হলই বা রাজার ছেলে। বিভূতি বললে—সব দোষ আমি আমার ঘাড়ে নেব। ভাবিস নে। নাহয় অন্য ইস্কুলে গিয়ে ভর্তি হব। আমার কথা ছেড়ে দে। তুই যতদূর পড়বি পড়বার সব খরচ আমাদের এস্টেটের

আমার অংশ থেকে যাবে। বিলেত যদি যায় তার খরচও আমি দেব।

ওদিকে টিফিনের পর ইস্কুল বসবার ঘণ্টা পড়ল। তারা ক্লাসে গিয়ে ঢুকল। ভয়ে মন্মথর পা যেন উঠছিল না, বিভূতি তার হাত ধরে নিয়ে ক্লাসে ঢুকল। সামনের সারির প্রথম বেঞ্চে সত্য আপনার ঠাঁইটিতে বসেই ছিল, এরা দুজনে গিয়ে তার দু'পাশে বসল। বাংলার পিরিয়ড, হেডপণ্ডিতমশায় তাদের বাংলা সংস্কৃত দুই পড়িয়ে থাকেন। পণ্ডিত-মশায় কবিরত্ন ব্যাকরণতীর্থ, বয়সে প্রবীণ, সর্বকালের অধিকাংশ প্রবীণ ও প্রাচীনদের মতোই পুরাতনেরই অনুরাগী, আধুনিকতার উপর অরুচি এবং বিরক্তিই পোষণ করেন। ক্লাসে ঢুকেই তিনি ছেলেদের বসতে বলে নিজে বসলেন। বসতে বসতেই আবৃত্তি করলেন—

"অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটনীরে—
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি।"

কেউ মুখস্থ বলতে পার তোমরা? পড়েছ মহাকবি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'?

বিভূতি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।—

ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী—
একা দেখিকুলবধূ কে বট আপনি।
পরিচয় নাহি দিলে করিতে নারি পার—
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফেরফার।

ঠিক এই সময় ইস্কুলের বেয়ারা এসে ক্লাসে ঢুকে পণ্ডিতমশায়ের হাতে একখানা কাগজের স্লিপ তুলে দিয়ে পিছনে দাঁড়াল।

স্লিপখানা পড়ে পণ্ডিতমশায় বললেন—Sree Bibhuti Bhushan Sinha; স্লিপ থেকে চোখ তুলে বললেন—হেডমাস্টার মশায় লাইব্রেরী ঘরে ডেকেছেন কি ব্যাপার?

মন্মথর মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। এইবার নিশ্চয় পণ্ডিতমশায় বলবেন—You also মন্মথ! মন্মথ ভট্টাচার্য is also wanted by the Headmaster; তুমিও যাও হে।

মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। বুকের ভিতরটায় যেন ঢেঁকির পাড় পড়তে লাগল। মনে হল চিৎকার করে কেঁদে উঠে বলে—আমি নির্দোষ কিন্তু তাও সে পারলে না।

বিভূতি চলে গেল। সেও বুঝেছে কিসের জন্য ডাক পড়েছে, তবুও এতটুকু ভয় পায় নি সে। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে চলে গেল বিভূতি। সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে গেল খানিকটা সুগন্ধ। আতর বোধহয়। বিভূতিদের বাড়িতে নানান রকম গন্ধদ্রব্য আসে। এক এক জনের এক এক রকম রুচি। বিভূতি আতর ভিন্ন সেন্ট ব্যবহার করে না। চিৎপুর হ্যারিসন রোড জংশনের বিখ্যাত আতরওয়ালার আতর ব্যবহার করে সে।

পিরিয়ড শেষ হয়-হয় তখনও পর্যন্ত বিভূতি ফিরল না বা কেউ এসে মন্মথকেও ডেকে নিয়ে গেল না। কয়েকবারই সে সত্যর দিকে আড়চোখে তাকালে। এক আধবার চোখ মিলল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে সত্য। অন্য সময়ে সে যেন খুব মনোযোগ সহকারে দৃষ্টিকে সামনের দিকে নিবদ্ধ রেখেছে ফাতনার দিকে মৎস্যশিকারী বাবুদের দৃষ্টির মতো। একটা কঠিন বিরূপতা কাঁটালতার মতো তার মনটাকে ক্ষতবিক্ষত করে বিষিয়ে তুলছিল।

পণ্ডিতমশায় পড়িয়ে যাচ্ছিলেন, পড়াচ্ছিলেন 'সীতার বনবাস'। অন্নদামঙ্গল এবং ভারতচন্দ্র প্রসঙ্গ ওই প্রথমেই যা হয়েছে হয়েছে, তারপর সেটা চাপা পড়ে গেছে। বিভূতি

চলে যেতেই পণ্ডিতমশায় মন্মথকে প্রশ্ন করেছিলেন—তুমি পার মুখস্থ বলতে মন্মথ ?

মন্মথ বলেছিল—না।

—তুমি পড় নি ?

চুপ করে ছিল মন্মথ। হ্যাঁ বা না কিছুই বলে নি। বলতে সাহস হয় নি যে, পড়েছি। কারণ অন্নদামঙ্গলের শেষে বিদ্যাসুন্দর ঠিক ছেলেদের ছাত্রদের পড়ার যোগ্য নয়।

পণ্ডিতমশায় সেটা ধরেছিলেন। বলেছিলেন—বলতে সাহস হচ্ছে না ? সভয়ে মন্মথ বলেছিল—একবার পড়েছি। সব মনে নেই।

—ও—আচ্ছা। সত্য ? তুমি ?

—ওই বই পড়তে আমাদের বাড়িতে নিষেধ আছে। আমি পড়ি নি।

—আচ্ছা।

—আর কে পড়েছে ?

কেউ পড়ে নি। অন্তত সাড়া দেয় নি। পণ্ডিতমশায় ঠিক সে হিসেব বা উত্তর পেতেও চান নি। তিনি ও প্রসঙ্গটাকে চাপা দিয়ে অনায়াসে অন্নদামঙ্গল থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাসে চলে এসেছিলেন। এবং দৈবক্রমে এমন একটা কৌতুকজনক ঘটনা ঘটল যে তার সেই কৌতুকেই সব চাপা পড়ে গেল।

পণ্ডিতমশায় রীডিং পড়তে বলেছিলেন শিবনারায়ণ দাস বলে একটি ছেলেকে—সে পড়ে গেল—"সীতার রূপের প্রভায় অরণ্যভূমি আলোকিত হইয়া উঠিল।" ঋ এবং রএ উ (রু) তে গোলমাল বাধিয়ে রূপ শব্দটাকে ঋপ উচ্চারণ করে সে এক কাতুকুতুর হাসির বেগ সৃষ্টি করেছিল।

—কি ? কি ? কি-পড়ছ ?

—'সীতার ঋপের প্রভায়' পড়লে শিবেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসময় হাসি। তবু শিবেন বুঝতে পারে না ভুলটা কোথায় হল। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে—ক্লাসের চাপাহাসিতে-কাঁপা-ছেলেদের দিকে তাকিয়ে দেখে।

ঠিক এমনই সময়টিতে ক্লাসের স্যার, রমেশ গোসেন স্যার এসে ঘরে ঢুকলেন, সঙ্গে সেই বেয়ারাটি। রমেশ স্যার পণ্ডিতমশায়কে বললেন—হেডমাস্টার মশায় আমাকে বলেছেন এই ক্লাসের বিভূতিভূষণ সিংহের বইটইগুলি যা আছে দেখে নিয়ে যাবার জন্য। বলেই এসে বিভূতির জায়গাটির সামনে দাঁড়ালেন। মন্মথকে বললেন—মন্মথ তুমি সমস্ত দেখে গুছিয়ে দাও। তুমি সব থেকে ভালো পারবে বলেই হেডমাস্টার মশায়ের ধারণা।

মন্মথ কলের পুতুলের মতোই সমস্ত কাগজপত্র গুটিয়ে গুছিয়ে রমেশ স্যারেরই হাতে দিল। রমেশ স্যার বললেন—আমার সঙ্গে এস তুমি। হেডমাস্টার মশায় ডাকছেন।

আপিসঘরখানা লম্বায় চওড়ায় সমান একখানা প্রশস্ত ঘর, চারিদিকে বড় বড় জানালা দরজা। প্রকাণ্ড একখানা খুব সুন্দর করে পালিশ বার্নিশ-করা টেবিলের ওদিকে একখানা দামী চেয়ারে বসেছিলেন সেই হেডমাস্টার মশায়। দেওয়ালের গায়ে গায়ে কাচের আলমারিতে ঝকঝকে বাঁধানো বই। সবুজবনাত মোড়া সুন্দর টেবিলখানাকে ঘিরে দামী চেয়ার ; দেওয়ালে ভারতসম্রাজ্ঞী কুইন ভিক্টোরিয়ার ছবি। তার পাশেই তাঁর স্বামীর ছবি। এপাশে প্রিন্স অব ওয়েলসের ছবি। অন্য দেওয়ালে হেডমাস্টারদের ফটোগ্রাফ। মন্মথ এ ঘরে আগে ঢুকেছে, প্রথম দিন তো অনেকক্ষণ বসেছিল এবং এই ঘরে বসেই অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়েছিল—কিন্তু সেদিন এ ঘরখানা আজকের মতো এমন গম্ভীর এবং অলঙ্ঘনীয় মনে হয় নি।

দরজার মুখে সে ভয় পেলে। মনে হল কোনো একটা ভীষণ অন্যায় সে করেছে এবং

তার জন্য বিধাতানির্দিষ্ট দণ্ড এই ঘরে তার অপেক্ষা করে রয়েছে। সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বিভূতির কি হয়েছে কতকটা অনুমান করা যায়। তার বই খাতা সব যখন বের করে এনেছেন ক্লাসের স্যার গোস্বামী স্যার তখন সম্ভবত ইস্কুল থেকে তাড়িয়েও দেওয়া হয়ে থাকবে। সারা দেহে তার ঘাম দেখা দিয়েছে। তার পিছনে বেয়ারা ভারী দরজা দু পাল্লা ভেজিয়ে দিচ্ছে।

হেডমাস্টার মশায়ের মুখখানা যেন থমথম করছে। তাঁর গায়ের রং ফরসা, সেই ফরসা রঙ তাঁর কপালে লালচে হয়ে উঠেছে। চোখ দুটি তীক্ষ্ণ—সে তীক্ষ্ণ চোখ যেন আরও তীক্ষ্ণ মনে হচ্ছে। তিনি বললেন—কাম ইন। এখানে। ডান হাতের তর্জনী হেলন করে তার স্থান নির্দেশ করে দিলেন।

সে এসে দাঁড়াল। কিন্তু মুখ তুলে চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকতে পারলে না। পা দু'খানা থরথর করে কাঁপছে, শরীর ঘামছে, গলা শুকিয়ে গেছে ; মাথা হেঁট করে সে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

হেডমাস্টার বললেন—মুখ তোল—তাকাও আমার দিকে। ভয়ে ভয়ে সে মুখ তুললে—চোখ রেখে তাকানো—তাও সে রাখলে কিন্তু তার পরেই কান্নায় সে ভেঙে পড়ল। এমন নিষ্ঠুর যন্ত্রণা এমন মর্মান্তিক ভয় এবং লজ্জা আর কখনও সে অনুভব করে নি। বুকের ভিতরটায় তার হৃৎপিণ্ডটাকে হাতে নিয়ে কেউ যেন দুরন্ত রাগের বশে কচলে দিচ্ছে।

আরও মিনিটখানেক তার দিকে এই মর্মভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হেডমাস্টার বললেন—যাও, ক্লাসে গিয়ে বস। আর এই সব খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশবে না। বুঝেছ ?

সে ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ। সে বুঝেছে।

—এই সব অস্বাস্থ্যকর কুৎসিত প্রসঙ্গ মানুষকে রুগ্ন করে দেয়, বিশ্রী করে দেয়। কদাচ বিভূতির সঙ্গে সংস্রব রেখো না। আমি ইস্কুলের বাইরের কথা বলছি। ইস্কুলে সে আসবে না। যাও আজ বাড়ি যাও এখান থেকেই—ক্লাসে যেতে হবে না। কাল থেকে আসবে।

এতক্ষণে চোখ মুছে অনেকটা সহজ স্বাভাবিক হয়ে সে আপিসঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল রাস্তার উপর। একটা কালো অন্ধ একটা তীব্রমাদক উত্তেজনার শেষ রেশটুকু তখনও স্পন্দিত হচ্ছিল তার বুকের মধ্যে তার মনের মধ্যে। আশ্চর্য, হেডমাস্টার মশায়ের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতেও তা' সরে গেল না নিঃশেষে। ওই উত্তেজনাটা এবং এই ভয়টা এই দুইয়ে মিশে তার দেহ-মনে একটা নতুন কিছুর সৃষ্টি করলে। একটা বিপুলকায় কালো অভিজ্ঞতা তার মাংসল অবয়ব দিয়ে তাকে পরম সমাদরে আলিঙ্গন করলে আর সে যেন বিপুল ভয়ে অপরিসীম ঘৃণায় পিছু হঠতে গিয়েও হঠতে পারলে না—একটা গভীর মোহ তার নিজের ভিতর থেকেই উদ্ভূত হয়ে তাকে কঠিন আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলে।

পরের দিন ক্লাসে এসে নিজের জায়গায় বসে শুধু পড়াই শুনে গেল। মাস্টারমশায়দের প্রশ্নের উত্তর দিলে এই পর্যন্ত। তার বাইরে সে কারুর সঙ্গে কথা বললে না।

সহজ সিধে জীবনটা হঠাৎ বেঁকে গেল। এ কালের শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতা ভব্যতার এই নিয়ম।

সত্য কথা বলতে চেষ্টা করলেও সে যথাসম্ভব সংক্ষেপে হুঁ-হাঁ-না বলে উত্তর দিয়ে চুপ করে গেল। এবং সুকৌশলে যেন কথা শেষ হওয়ার পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেওয়ার পন্থাটিও আবিষ্কার করে ফেললে। সত্যকেও থমকে দাঁড়াতে হল। এই বন্ধ দরজাটা খোলাতে সে যেন কিছুতেই পারলে না।

মাস দুয়েক পর। বিভূতির বিয়ে নিয়ে সত্য মন্মথর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াল কথা বল-

বার জন্য। এ কথা বলাটা হ্যাঁ, না, হুঁ দিয়ে ছেদ টেনে দেওয়া গেল না।

একখানা বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র হাতে নিয়ে সে মন্মথর সামনে দাঁড়িয়ে বললে—দাঁড়া রে মনু। কথা আজ আমি তোর সঙ্গে বলবই।

মন্মথ ঘুরে দাঁড়াল এবং একটু বিষণ্ণ হেসে বললে—বল। কথা বলবি তার জন্য ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার মতো কোমর বেঁধে দাঁড়াতে হবে কেন?

—নেমন্তন্নপত্র পেয়েছিস?

—কিসের?

—বিভূতির বিয়ের?

—পেয়েছি। নাপিতে দিয়ে গেছে।

—এরপর বিভূতির একজন দাদা আসবে—নিজেরা বলতে।

—তাই নাকি!

—হ্যাঁ। তাই কলকাতার নিয়ম। কিন্তু তুই যাবি নাকি?

স্থিরভাবে সত্যর মুখের দিকে তাকিয়ে মন্মথ বললে—তুই বলে দিবি তো হেডমাস্টার মশায়কে? ভাবিস নে—যাব কি যাব না সেটা স্যারের কাছে জিজ্ঞাসা করে তবে ঠিক করব।

একটু হেসে সত্য বললে—সেই কথাই বলছি মন্মথ। সেদিন ওই সব ছবি গল্পের কথা আমি হেড স্যারকে বলিনি। বলেছিলেন আমাদের ক্লাসের স্যার—গোসেন স্যার।

—গোসেন স্যার?

গোসেন স্যারই বিভূতির বই খাতাগুলি সেদিন ক্লাস থেকে দেখে গুছিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন বটে। কিন্তু গোসেন স্যার তো ঠিক এতখানি শুচিবাতিকগ্রস্ত মানুষ নন।

তা' নন। কিন্তু শুচিবাতিক না-থাকারও তো একটা সীমারেখা আছে। সকলেরই সেটা আছে, নেই সেটা বিভূতিদের মতো বড়লোকের। শুধু বড়লোক নন, তার সঙ্গে যাঁরা ধর্মের আচারে বিচারে ছোঁওয়াত, ছুঁইতে কড়া এবং গোঁড়া তাঁরাও বড়লোকদের এক গোঠের বা এক কোঠের লোক।

বাড়িতে ঠাকুরবাড়িতে ঠাকুরের পুজো হয় ষোড়শ উপচারে। যাত্রা হয়, খ্যামটা নাচ হয়, ঢপ, কীর্তন হয়। ব্রাহ্মণ ভোজন হয় জ্ঞাতি ভোজন হয়। বাড়ির বাইরে সাহেব ভোজন হয়—পেলেটির বাড়ির লোকেরা এসে খাইয়ে দাইয়ে দিয়ে যায়।

বাড়ির মেয়েরা বৈধব্য পালন করে, ব্রত উপবাস করে। বাবুরা বাইরে মুর্গি খান, নাটক করেন দেখেন, ইংরিজী শেখেন উর্দু শেখেন পার্সীও শেখেন, কেতাব কেচ্ছা লেখেন। এবং এর জন্য সভাসমিতিরও পত্তন করেছেন। সিদ্ধি থেকে মদ পর্যন্ত একালের পানীয় পান করেন। চুরুট থেকে বার্ডশাই এবং বরাত হলে খাম্বিরী বা অম্বুরী তামাকের সঙ্গে গঞ্জিকার মিশেল থাকে। ইংরিজী কবিতা আবৃত্তি হয়—বই নিয়ে আলোচনা হয়, সংস্কৃত কাব্য নিয়েও হয়। তার সঙ্গে বাংলা কাব্য পাঠেরও রেওয়াজ চালিত হয়েছে। মধ্যে মধ্যে অভিনয়ের বাতিক ওঠে। নাটকে এদের খুব ঝোঁক। আগেকার কালে জমিদার রাজা বড় বড় শেঠদের বাড়িতে এইসব পাঠের ব্যবস্থা ছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নবরত্নের সভা ছিল। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ছিলেন সভাকবি। এমন রেওয়াজ দেশে গ্রামে ছিল। কিছু কিছু ঠাকুর-বাড়িতে বাড়িতে হত। কথকরা এসে কথকতা করতেন। আবার গল্প বলিয়েরা আসত। তারা গল্প বলে যেত। নানান রকম গল্প। আরব্য রজনীর গল্প থেকে গোপন মহামূল্য গল্পের ভাণ্ডার ছিল তাদের। বাছাই ছাঁটাই করে নানান গল্পের বিভিন্ন আসর বসত। এখন কাল পালটাল। সেই মুসলমানী আমলের আরব্য উপন্যাস পারস্য উপন্যাসের গল্পের

সঙ্গে ইংরিজী আমলের গল্প ঢুকেছে।

—জান তো, কালীপ্রসন্ন সিংহ, যিনি মহাভারত অনুবাদ করিয়েছেন তিনি বিভূতিদের জ্ঞাতি হতেন আর ওদেরকে খুব ঘেন্না করতেন।

সত্য বলে যাচ্ছিল আর মন্মথ শুনছিল। অবাক হয়ে শুনছিল। রাধাশ্যাম এই ধরনের কথাবার্তা বলে বটে কিন্তু সত্যর কথা শুনে বার্তারও অধিক একটা কিছুর যে সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে তাতে তা পাওয়া যায় না।

সত্য বললে—কালীপ্রসন্ন সিংহ ছিলেন একজন অসাধারণ পুরুষ। বাবা বলেন—অকালে মরে গেলেন, না হলে তিনি ছিলেন জিনিয়াস। কালীপ্রসন্নের সঙ্গে সমানে তাল দিয়ে চলার সাধ ছিল বিভূতির বাপ জ্যাঠার খুড়োর। তাই রাজা খেতাব চালু করেছে। ওরা তো গভর্ণমেন্টের খেতাব দেওয়া রাজা নয়, ওরা সেই পুরনো কালের কোনো রাজা, রাজবাড়ির রাজা আর কি। তারপর করেছে এক সভা। কালীপ্রসন্নের বিদ্যোৎসাহিনী সভা ছিল। মহাকবি মাইকেল মধুসূদনকে রুপোর পানপাত্র দিয়ে সংবর্ধনা করেছিল, সেই দেখে ওরাও একটা সভা করেছে—নাম দিয়েছে সারস্বত সভা। ওদের বাড়ির আর ওদের মতো বাড়ির অল্পবয়সীদের সভা। বিভূতি এই সভার সভ্য হয়েছে এবার। এবার তো ওর বিয়ে হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ওকে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারীও করে দিয়েছে। এখন অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারী কাজ দেখাতে গিয়ে এই অপকার্জটি করেছেন। আমাদের ক্লাসের স্যার তো খুব প্রগ্রেসিভ খুব উদার—ও'কে এক চিঠি লিখেছে—আমাদের সারস্বত সভায় যদি মহাশয় ইংরাজী Arbian Nights আর বোকাসিওর ডেকামেরন পড়ে শোনান তা হলে আমরা খুব অনুগৃহীতটৃহিত হব। চিঠিতে সই করেছে ওর দাদা সম্পাদক হিসেবে—তার সঙ্গে নিজেও সই-টা মেরে দিয়েছে। বি. বি. সিন্‌হা। যে দিন ঘটনাটা ঘটে সেই দিনই এই চিঠিটা নিয়ে এসেছিল। ফার্স্ট আওয়ারে আমাদের ক্লাসেই চিঠিটা দিয়েছিল। স্যার চিঠিটা খোলে নি তখন। এখনই চিঠি হাতে এসেছে, তাড়া কিসের? টিফিনের সময় চিঠিটা খুলে পড়ে খুব চটে গিয়ে উনি খুঁজতে বেরিয়ে ওকে পান নি। উনি হেডমাস্টার মশায়কে বলেন। হেডমাস্টার মশায়ই ওকে ডেকে আনতে পাঠান। বিভূতি সব স্বীকার করেছিল—পকেট থেকে সব বের করেও দিয়েছিল। সে-ই তোমার নাম করেছিল। হেডমাস্টার বলেছিলেন—এসব ছবিটবি কেন এনেছ ইস্কুলে?

বিভূতি বলেছিল—আমাদের ক্লাসের মন্মথকে আমি খুব ভালবাসি—তাকে দেখাবার জন্য এনেছিলাম।

হেডমাস্টার বলেছিলেন—কত দিন ধরে ওকে এসব দেখাচ্ছ? বিভূতি বলেছিল—দু'দিন দেখিয়েছি—আজকে তিন দিন ছিল।

—ও তোমাদের বাড়ি যায়?

—না।

—ওকে এসব দেখাতে কেন?

—আমার দেখতে ভালো লাগে ওরও লাগবে বলে দেখাতাম।

—What? ধমকে উঠেছিলেন হেডমাস্টার।

বিভূতি বলেছিল—আমি মিথ্যে কথা বলি না।

একটু চুপ করে থেকে সম্ভবত ভেবেচিন্তেই হেডমাস্টার বলেছিলেন—এর জন্যে তোমার পানিশমেন্ট হবে।

বিভূতি বলেছিল—ফাইন ছাড়া অন্য কোনো পানিশমেন্ট আমি নেব না।

—তোমাকে দশ বেত খেতে হবে।

বিভূতি টপ্‌ করে টেবিলের উপর থেকে রোলারের গোল ডান্ডাটা তুলে নিয়ে বলেছিল —আমাকে ধরতে কি মারতে এলে আমি মারব। আমাকে ছেড়ে দিন —আমি ইস্কুল থেকে চলে যাচ্ছি।

বলেই সে আপিসঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে চলে গেছে। তার বইটইগুলির জন্যেও দাঁড়ায় নি। সেগুলো হেডমাস্টার মশায় বিভূতির দাদার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মন্মথর মন যেন নতুন করে খারাপ হয়ে গেল। বিভূতিকে তার ভালো লাগত। বেশ শক্তপোক্ত খুব হৈহৈ করা ছেলে। হা হা করে হাসত। পড়াশোনাতেও ভালো ছেলে। বড়লোকের ছেলে। ভালো সাজপোশাক পরে আসত। নানান খবর বলত। এসবের জন্যে ভালো লাগলেও ভয় হত তাকে। বিভূতি রাগলে এমন করে তাকাত যে ভয় না-হয়ে পারত না। ভয়ের জন্যেই কখনও সে ওদের বাড়ি যায় নি। এবং বিভূতি যে-নেশা তাকে ধরিয়েছিল তার জন্যেও তার ভয় ছিল বিভূতিকে। এই কিছুদিনে সে বিভূতিকে একটু একটু করে ভুলছিল। আজ আবার সত্য সেটাকে নতুন করে জাগিয়ে দিল।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মন্মথ বললে—বিভূতি কোন্‌ ইস্কুলে ভরতি হল গিয়ে?

—কোনো ইস্কুলে না।

—পড়া ছেড়ে দেবে?

—কি করবে পড়ে? এত বিষয়সম্পত্তি! একটু হেসে সত্য বললে—ওর নিজের অংশে ওর আয় হবে বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা।

অবাক হয়ে গেল মন্মথ।—পঞ্চাশ হা-জা-র!

সত্য বললে—বাড়িতে পড়বে। ভালো ভালো মাস্টার রাখবে। ইংরিজী হিন্দী উর্দু শিখবে—আর বুক-কীপিং—ব্যাস আপিসে গিয়ে বসবে। শুনছি আমাদের রমেশ স্যারকেই ও পছন্দ করেছে, ওঁরই কাছে ইংরিজী শিখবে। মাইনে একশো দেড়শো দুশো পর্যন্ত উঠেছে। রমেশ স্যার প্রথম দিন হা-হা করে হেসেছিলেন। দ্বিতীয় দিন বলেছিলেন Please excuse me. তারপর দুশো টাকার বেলা ভীষণ চটে গেছেন। চেঁচামেচি করেছেন। গেট আউট গেট আউট গেট আউট বলে সে ভীষণ চিৎকার।

—তুমি এত সব খবর কি করে জানতে পার সত্য?

—আমার বাবার সঙ্গে হেডমাস্টার মশায়ের খুব ভাব। তা' ছাড়া রমেশ স্যার আমার পিসতুতো ভাইয়ের খুব বন্ধু। তুমি ছাড়া কাউকে কখনও বলিও নি এ সব কথা। যা বললাম তাও বলতাম না। শুধু এই জন্যে বলছি মনু, রমেশ স্যার বলেছেন আমার পিসতুতো দাদাকে—সত্যদের সঙ্গে মন্মথ বলে একটা ছেলে পড়ে, তার কোষ্ঠী হল ওয়ান্ডার-ফুল। যদি অবশ্য বখে না-যায়।

ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরবার পথে কথা হচ্ছিল দুজনের মধ্যে। কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট আর মেছোবাজার স্ট্রীট জংশনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। রাধাশ্যামের ক'দিন জ্বর হয়েছে, সে ইস্কুলে আসে নি। সে থাকলে এত কথা হবার উপায় থাকত না। সত্য বলত না এবং রাধাশ্যামও বলতে দিত না। ক্রমাগতই চিমটি কাটত মন্মথকে। অর্থাৎ—চল না। চল না।

সত্য ব্রাহ্মবাড়ির ছেলে বলে রাধাশ্যাম তার সম্পর্কে সর্বদাই সন্ত্রস্ত। কেন কি কারণে এ প্রশ্ন করলে উত্তর সে দিতে পারে না—খুঁজেও পায় না। তবে বলে—কে জানে ওদের আমার কি রকম ভয় করে। কোনো কিছু মানে না যে!

সত্য পূর্বমুখে ফিরল। আমহার্স্ট স্ট্রীটের উপর ওদের বাড়ি।

—তোমাদের বাড়ি এখান থেকে কতটা দূরে ?

—বেশী না। এই তো। রাজা রামমোহন রায়ের বাড়ির ঠিক পরই।

—একদিন যাব। দেখে আসব।

রাধাশ্যাম বললে—খবরদার, খবরদার। ও পথে হেঁটো না। রামমোহনের বাড়ি দেখে বেরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়া বদল হয়ে যাবে। ওরা ভীষণ।

আশ্চর্য হয়ে গেল এবং বিরক্তও হল। বললে—তুমি পাগল নাকি ? কেন যা তা' বলছ ওদের সম্পর্কে !

অর্থাৎ ব্রাহ্মদের সম্পর্কে।

রাধাশ্যাম বললে—আমি পাগল নই। তুমি পাগলামির ছোঁয়াচ ধরাবে তার জন্যে ফাঁদ ছকেছ। ওদের সম্বন্ধে যা তা' বলি ! ওরা জাত মানে না। মুসলমান কৃশ্চান ডোম চণ্ডাল মানামানি নাই। ঠাকুরদেবতা মানে না। মেয়েগুলোকে ধিঙ্গী ধিঙ্গী বড় করে রাখে ! কোনো আচার-আচরণ করে না। বিধবা বিয়ে দেয়, বিধবারা একাদশী করে না। নিয়ম পালন করে না—ওদের সম্বন্ধে যা তা' বলছি আমি ! বিভূতিদের তো তবু পারা যায় — ওর ঠাকুরদেবতা মানে। হিন্দুর আচার-আচরণ পালন করে। ওরা এদের থেকেও ভয়ানক। তুমি সত্যর সঙ্গে কদাচ যাবে না। আমি ঠিক বলে দোব তোমার কাকাকে। কাকীমাকেও বলে দোব।

মন্মথ বিরক্ত হয়ে বলেছিল—আমি তোমার সঙ্গেও যাব না। ওর সঙ্গেও যাব না। হল তো !

কয়েকটা দিন সে একলা একলাই রইল। বাড়ি থেকে ইস্কুল আসবার সময়ও একলা আসত, যাবার সময়ও তাই—একলাই পথ হাঁটত।

কালটা এমন যে এর ভিতবের সত্য বা তথ্য যাই বলি না কেন, সেটা বুঝেও এ নিয়ে সহসা কোনো কথাবার্তা উঠত না। সে ছেলে থেকে বুড়ো পর্যন্ত।

দিন দশেক পর।

সত্য বললে—বিভূতির একটা খবর আছে মনু।

নিরাসক্তের মতোই শান্ত বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল মন্মথ। মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করল না খবরটা কি ?

সত্য একটু হেসে বললে—দারুণ খবর।

এতেও চঞ্চল হল না মন্মথ। সত্য বললে—মায়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছে, গার্জেনশিপ খারিজ করবার জন্যে। দাদাদের সঙ্গেও নাকি মামলা করবে পার্টিশনের। নালিশে বলেছে—নাবালক অবস্থায় যখন বাবা ওর মারা যান তখন ওর মা গার্জেন হবার সময় বয়েস লুকিয়েছিল।

—মায়ের গার্জেনশিপ খারিজ করাবে ?

—হ্যাঁ। ও বলছে ওর বয়স কমিয়ে লেখানো হয়েছে নাম জারির সময়। ওর বয়স আঠারো গেল এবার। ও সাবালক।

—তুমি কি করে জানলে ?

—বাবা বলছিলেন। বিভূতির বড়দাদা বাবার কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন। শুনলাম—আসল ব্যাপার হলো সম্পত্তি হাতে নিয়ে ও একটা থিয়েটার খুলবে।

—থিয়েটার খুলবে ? অবাক হয়ে গেল মন্মথ।—অ্যামেচার থিয়েটার ?

—না। দস্তুরমত পেশাদারী থিয়েটার। বাজারের মেয়েরা নাচবে গাইবে পার্ট করবে।

সত্য বলেই গেল—বিভূতির হিরো হয়েছে এখন রেলির বাড়ির বড়বাবু ছিলেন জোর-

বাগানের দত্ত, দ্বারকানাথ দত্ত, তাঁর এক ছেলে সে—আঠারো উনিশ বছর হতে হতেই পড়াটড়া ছেড়ে একেবারে থিয়েটারের বড় অ্যাক্টর হয়ে গেছে। নাম অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। সে বাপ মরতেই চাকরি-টাকরি সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে থিয়েটার খুলবে খুলবে করছে। মাস্তর এই কিছুদিন আগে বিয়ে করেছিল, বউয়ের সঙ্গে একরকম সম্পর্ক চুকিয়ে বিষয় বিক্রি করে বাগানবাড়িতে অ্যাকট্রেস নিয়ে স্ফূর্তি করছে। বিভূতিরও সেই ইচ্ছে। স্কুলের কাণ্ডটা হয়েই দু'কানকাটা হয়ে গেছে। কাউকেই কেয়ার করে না। নতুন জুড়িগাড়ি কিনেছে। সেই গাড়ি করে হপ্তায় দু'দিন থিয়েটারে যায়। এই স্কুল ছেড়েছে—সে আর ক'দিন, এরই মধ্যে বাজারে বিভূতিবাবুর নাম ছুটে গেছে। দালালরা নাকি বলছে সিংহী বাড়ির নতুন রাজা। থিয়েটারে যায় অনেক ফুল নিয়ে যায়—ড্যান্সিং গার্লদের আর অ্যাকট্রেসদের ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে।

মন্মথর বিস্ময়ের আর সীমা ছিল না।

থিয়েটারের হলে এত লোকের সামনে, ওই রঙের প্রসাধনে কেশচর্যার পারিপাট্যে পোশাকের জলুসে স্বর্গলোকের রূপসীদের মতো এই মেয়েদের ফুল ছুঁড়ে মারে বিভূতি! তার হাত ওঠে! সাহস হয়! মনে করতেই তার বুকের ভিতরটা যেন প্রবল উত্তেজনায়-উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার গলা শুকিয়ে গেল সে উত্তেজনায়।

—থিয়েটার, যাত্রাগান, বৈঠকী গান নাচ, এসবে কত উচ্চশ্রেণীর আনন্দ আছে। কিন্তু এই রকমের একদল লোকে নিজেদের পাপ এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে সর্বনাশ করেছে। আর একালে এই পাপটা এমন করে সমাজে ঢুকেছে যে—

মন্মথ বললে—ভাই আমি আজ যাই। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে আমার।

—ও। তা'—। একটু ইতস্তত করে সত্য বললে—একটা কথা বলব?

—কি?

—আমাদের বাড়ি এই তো খুব কাছে। আমহার্স্ট স্ট্রীটে পড়েই; চল না জল খেয়ে যাবে! যাবে? না—। একটু হাসলে সত্য। বললে—তুমি কতটা গোঁড়া তা' আমি জানি না। তবে তোমার কাকা গোঁড়া নন। আমার বাবা বরং প্রশংসা করেন তোমার কাকা তোমার খুড়িমাকে বিয়ে করেছেন বলে। পতিত হবার ভয়ে পিছপাও হন নি বলে।

বলতে বলতেই সত্য পূর্বমুখে মোড় ফিরল। মন্মথ চলছিল তার পিছনে। ওপাশে ঠনঠনের কালীবাড়ি। ওখানকার দেবীর উদ্দেশে কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম জানিয়ে মন্মথও মোড় ফিরল। বুকের ভিতর দ্বিধা ছিল না তা' নয়। তবু সামনে থেকেও কিছু যেন তাকে টানছিল এবং পিছন থেকেও কিছু যেন তাকে ঠেলে এগিয়ে দিচ্ছিল। নিজের উপর হাত যেন কিছু তার ছিল না।

আমহার্স্ট স্ট্রীট অঞ্চল নতুন রাস্তার অঞ্চল।

উত্তর দক্ষিণে সরল রেখার মতো সোজা এবং দুই পাশের দুই প্রান্তরেখাও সমান্তরাল রেখায় চলে গেছে। খোয়া দিয়ে রোলার চালিয়ে সুন্দর সমতল রাস্তা। খানাখন্দ গর্ত নেই বা ইট পাথর উঠে নেই। সর্বত্র একটি পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে ভাব। সম্ভ্রান্ত অঞ্চলের একটা পরিচয় যেন সর্বত্র ফুটে আছে। চওড়া রাস্তা, দু'পাশে ফুটপাথ। রাস্তার দু'পাশে অধিকাংশই বসতবাড়ি। দোকানদারি বা হাটবাজারের হইচই নেই। পথে ময়লা আবর্জনা বিশেষ পড়ে নেই। বাসিন্দাদের বাড়িগুলিতেও একটি শ্রী ফুটে রয়েছে। পথের উপর জনতা বা যানবাহনের ভিড়ও খুব নেই। ১৮৮৮/৮৯ সাল তখন—তখন অপরাহ্ণবেলায় এ অঞ্চলের বাবুরা বেশীর ভাগ শেয়ারের কেরাঞ্চির গাড়িতে বাড়ি ফিরে আপিসের পোশাক

ছেড়ে বাড়ির পোশাক পরে রাস্তায় পায়চারি করছেন। তখন কোঁচানো কাপড়ের কাল উঠেছে। কোঁচানো কাপড়, হাফহাতা ফতুয়া গায়ে দিয়ে বার্নিশকরা চটি পরে বেড়াচ্ছেন। এঁরা সম্ভ্রান্ত। এঁদের থেকে পরের একদল আছেন যাঁরা খাটো কাপড় পরেছেন। কেউ কেউ চেনে বাঁধা শখের কুকুর নিয়ে বেড়াচ্ছেন।

বড় বড় বাড়ির ঝি চাকরেরা প্যারাম্বুলেটরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ডল-পুতুলের মতো ঢঙে ফ্রক পরিয়ে বা অন্য পোশাক পরিয়ে পার্কের দিকে চলেছে। কলেজ স্ট্রীট ঝামাপুকুর মেছুয়াবাজার থেকে এখানের আবেষ্টনীর মধ্যে পড়লেই মানুষের মেজাজ মন খুশী হয়ে ওঠে, জুড়িয়ে যায়।

মন্মথর মন খুব খুশী হয়ে উঠল। কলকাতায় এসেছে সে কম দিন না, অনেক দিন হয়ে গেল, তিন বছর পার হয়ে গেছে। কিন্তু আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরে আজও সে হাঁটে নি। এদিকে কোনো কাজ পড়ে নি তার। তাছাড়া রাধাশ্যাম তাকে বার বার বলেছে—'ওই দিকে না ওই দিকে না। ওসব বাবা বড়লোকদের ফ্যাশনওয়ালাদের ঘাঁটি। রাজা রামমোহনের বংশধরদের বাড়ি—আবার তোমার ক্লাসের সত্য বন্দ্যোর বাড়ি। একবার গেলেই দু'বার যেতে হবে। দু'বার গেলে চারবার—এবং চারবারের শেষের বারে টোপে টোক্কর দিতেই হবে।'

রাধাশ্যাম তাকে গোপনে হুতোম প্যাঁচার নক্সা পড়িয়েছে। বলেছে—পড়ে দেখ তুমি। কালীপ্রসন্ন সিংহী পর্দা কেটে ফাঁক করে দিয়ে গেছে। দেখ না কি লিখছে!

মনে আছে মন্মথর। মন্মথর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, তাছাড়া এই রচনা এবং বিষয় এমন যে পড়লে আর ভোলা যায় না। "সহরের বাবুরা ফেটিং সেলফ ড্রাইভিং বগি ও ব্রাউহামে করে অবস্থাগত ফ্রেন্ড, ভদ্রলোক বা মোসাহেব সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন—কেউ বাগানে বেরুলেন—দু' চারজন সহৃদয় ছাড়া অনেকেরই পিছনে মালভরা মোদাগাড়ি চললো, পাছে লোকে জানতে পারে এই ভয়ে সে বাড়ির সইস কোচম্যানকে তকমা নিতে বারণ করে দেছেন, কেউ লোকাপবাদ তৃণজ্ঞান, বেশ্যাবাজী বাহাদুরির কাজ মনে করেন; বিবিজানের সঙ্গে একত্রে বসেই চলেছেন, খাতির নদারৎ!

"এদিকে সহরে সন্ধ্যাসূচক কাঁসর ঘণ্টার শব্দ হলো। সকল পথের সমুদায় আলো জ্বালা হয়েছে। বেলফুল! বরফ! মালাই চিৎকার শোনা যাচ্ছে। আবগারী আইন অনুসারে মদের দোকানের সদর দরজা বন্ধ হয়েছে, অথচ খদ্দের ফিরছে না—ক্রমে অন্ধকার গা ঢাকা হয়ে এলো; এ সময় ইংরিজী জুতো শান্তিপুরে ডুরে উড়ুনী আর সিমলের ধুতির কল্যাণে রাস্তায় ছোটলোক ভদ্দরলোক আর চেনবার যো নেই।···মেছোবাজারের হাঁড়িহাটা, চোরবাগানের মোড়, জোড়াসাঁকোর পোদ্দারের দোকান, নতুন বাজার, বটতলা, সোনাগাজীর গলি, আহিরীটোলার চৌমাথা, লোকারণ্য—কেউ মুখে মাথায় চাদর জড়িয়ে মনে করেছেন কেউ তাঁরে চিনতে পারবে না।"

··· ··· ··· "ছোট ছোট ছেলেরা চিৎকার করে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় পড়ছে। পীল ইয়ার ছোকরারা উড়তে শিখছে।··· ··· ···। রেস্তহীন গুলিখোর গেঁজেল ও মাতালরা লাঠি হাতে করে কানা সেজে "অন্ধ ব্রাহ্মণকে কিছু দান কর দাতাগণ" বলে মৌতাতের সম্বল করছে।" (হুতোমের নক্সা)।

সন্ধ্যের কলকাতার এ বর্ণনা চীৎপুর রোডের ওই অঞ্চলটায় অনেকটা মিলে যায়। হয়তো এর থেকেও কদর্য মনে হয় শহরের অংশবিশেষকে। কিন্তু আজ এই আমহার্স্ট স্ট্রীট অঞ্চলের এই খানিকটা জায়গা যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলে মনে হল।

সেদিন যেন সে কোথায় পড়েছিল এই সময়েই কলকাতার একটি বিবরণ। মনে পড়েছে

"…নির্মল রৌদ্রে কলিকাতার আকাশ ভরিয়া গিয়াছে। রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার বিরাম নাই, ফেরিওয়ালা অবিশ্রাম হাঁকিয়া চলিয়াছে,…।…এত বড়ো এই যে কাজের শহর কঠিন হৃদয় কলিকাতা, ইহার শতশত রাস্তা এবং গলির ভিতরে সোনার আলোকের ধারা যেন একটা অপূর্ব যৌবনের প্রবাহ লইয়া চলিয়াছে।" (গোরা) আমহার্স্ট স্ট্রীট রাস্তাটিকে তার মনে হল যেন সত্যসত্যই সোনার আলোয় ভরে উঠেছে।

—এই বাড়িটি।

প্রকাণ্ড একটা ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে গেল সত্য। আঙুল বাড়িয়ে বাড়িটাকে দেখিয়ে বললে—এই! এ বাড়িটি হল রাজা রামমোহন রায়ের বাড়ি।

—এই বাড়ি?

—হ্যাঁ। সারকুলার রোডের উপর একখানা বাড়ি আছে। তাতে মার্বেল ট্যাবলেট লাগানো আছে—লেখা আছে—Here lived Raja Rammohan Ray; প্রকাণ্ড বড় বাড়ি, প্রকাণ্ড হাতা প্রকাণ্ড বাগান। এইখানে মজলিস হত, নাচগান হত। বিখ্যাত নিকী বাঈজী আসত সেখানে।

—আমাকে একদিন নিয়ে যাবে?

—যাব। তুমি ইচ্ছে করলে নিজেই যেতে পার। এতদিন কলকাতায় রয়েছ অথচ এসব দেখ নি এইটেই আশ্চর্য! *অথচ তুমি তো ঠিক পাড়াগেঁয়ে নও।*

একটু হেসে মন্মথ বললে—কি জানি ভাই কাকার বাড়িতে তো থাকি। ওঁরা কিসে রাগ করবেন না-করবেন না জেনে তো আমি কিছু করি না। তুমিই বল না করা ঠিক কিনা!

সত্য বললে—কেন? তোমার কাকা তো খুব গোঁড়া নন।

—তা নন। তবে যতখানি মুখে দেখান ততখানি ঠিক নন। তা ছাড়া ভাই বাবা আছেন দেশে। ভটচাজ পণ্ডিত মানুষ। আমার মায়ের মৃত্যুর পর আবার বিয়ে করেছেন। আমার খুড়ীমা তাতে খুব চটা। পাঁচরকম ভেবে আমি খুব সামলে চলি।

সত্য একখানা বড় বাড়ির বাইরের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে গেল। এবং হেসে বললে —এস।

মন্মথ বাড়িখানার দিকে তাকালে। বড় বাড়ি নতুন বাড়ি। রামমোহন রায়ের বাড়ির মতো আরও দু'একখানা বাড়ির মতো বাড়িখানা এত বড় নয় তবে সাধারণ বাড়ি থেকে বড় বাড়ি। চারিদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা কম্পাউণ্ডের মধ্যে সুন্দর বাড়ি। বেশ খানিকটা বাগানও আছে।

সত্য বললে—এইটেই আমাদের বাড়ি।

মন্মথ দাঁড়িয়ে গেল। সত্য আগেই ভিতরে ঢুকেছিল। সে বললে—এস। সেই কখন বলেছ তেষ্টা পেয়েছে; এস একটু জল খেয়ে যাবে। মন্মথ চুপ করে রইল।

সত্য বললে—ভাবনা হচ্ছে?

—এ্যাঁ।

—তোমাকে তো গোড়াতেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমি—

মন্মথ বললে—হ্যাঁ।

—তা' হলে—?

তা' হলে একটা কিছু আছে কিন্তু সেটা কি তা' ঠিক বুঝতে পারছে না মন্মথ। আসলে সেটা তার নিজের ভয়। শুধু ব্রাহ্মবাড়িতে জল খেয়ে জবাবদিহির ভয় নয় আরও

আছে তার সঙ্গে।

সেইটেই তাকে যেন সামনে অদৃশ্যভাবে পথ আগলে দাঁড়াচ্ছে। সত্যদের এত বড় বাড়ি, এমন বাড়ি, তার উপর সত্যর বাবা হাইকোর্টের উকিল—সভ্যসমাজে তাঁর নামডাক অনেক। এ বাড়ির লোকেদের সামনে দাঁড়াতে কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করছে।

শুধু পুরুষদের কথা হলে কথা ছিল না। সত্য তাকে হয়তো বাড়ির ভিতর নিয়ে যাবে। কিংবা মেয়েরা মানে সত্যর মা বোনেরা বাইরের ঘরে বেরিয়ে আসবেন তাকে দেখতে। এবং তাকে দেখে তার মধ্য থেকে গ্রাম্যতা এবং হাস্যকর আড়ষ্টতা দেখে তাঁরা মুচকে মুচকে হাসবেন। সত্যদের বাড়ি নামকরা ব্রাহ্মদের বাড়ি। এ বাড়ির মেয়েদের অনেক প্রশংসা অনেক অপ্রশংসা লোকেদের মুখে-মুখে। এঁরা সভাসমিতিতে যান—মেয়েরা ইস্কুল কলেজে পড়ে, মেয়েরা গান জানে, সভা-সমিতিতে অনুষ্ঠানে গান গায়। এদের সাজপোশাকের ঢঙ এবং রীতি থেকেই দেশে সমাজে সাজপোশাকের ফ্যাশন ওঠে।

একদিন ইংরিজীর মাস্টার গোস্বামী স্যার বলেছিলেন—সত্যদের বাড়ির মেয়েরা ইউরোপের খুব কালচার্ড ফ্যামিলির মেয়েদের সঙ্গে সব দিক দিয়ে সমকক্ষ। আমরা কৃশ্চান হয়ে ইংরেজদের খুব কাছে কাছে এসেও ওদের মত হতে পারি নি। আমাদের দেশী কৃশ্চানদের মধ্যে ওদের দেশের অনেক খারাপ জিনিস ঢুকে গেছে।

আবার একদল লোক আছে এবং তারাই সংখ্যাতে অনেক—তারা ব্রাহ্মদের সম্পর্কে যা তা বলে। অথচ রাজার জাতের ধর্মাবলম্বী বলে কৃশ্চানদের এরা ভয় করে। তারা কোট প্যান্ট পরে ইংরিজী কথা বলে তেড়ে এলে ছুটে পালায়। কিন্তু ব্রাহ্মদের নিন্দের সময় এরা পঞ্চমুখ পঞ্চানন হয়ে ওঠে।

রাধাশ্যাম ওদের দলের লোক। রাধাশ্যাম সত্যদের বাড়ি সম্পর্কে মন্মথকে সাবধান করে দিয়ে বলেছে বা বলে—খবরদার খবরদার। সত্যদের বাড়ির মুখে হেঁটো না। ওদের বাড়ির বিদ্যেবতীদের মধ্যে পড়লে না, দফা খতম। ঠিক মাস কয়েকের মধ্যেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বেরিয়ে যাবে যে মন্মথকুমার ভট্টাচার্য নামক একজন ব্রাহ্মণ যুবক ব্রাহ্মধর্মের সত্য ও সারবত্তার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন।

মন্মথ এতদিন হেসেছে এসব কল্পনা করে।

রাধাশ্যামের ব্রাহ্মভীতি এবং বিদ্বেষ দেখে তার ভালো লাগত না, মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত বিরক্তও হত। আবার কখনও কখনও কৌতুকও অনুভব করত। রাধাশ্যামকে রাগিয়ে দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে হাসত।

মধ্যে মধ্যে বলত—সত্যরা চায়ের নেমন্তন্ন করেছে।

একমুহূর্তে উত্তেজিত হয়ে উঠত রাধাশ্যাম—কি? সেই নেমন্তন্নে তুমি যাবে নাকি?

—গেলে দোষ কি? অত্যন্ত ভালমানুষের মতো জিজ্ঞাসা করত সে।

সঙ্গে সঙ্গে রাধাশ্যাম আরম্ভ করত—ওরা জাত মানে না, ওরা দেবতা মানে না, ওরা অখাদ্য খায়—ওরা—ওরা—ওরা—

রাধাশ্যাম ফিরিস্তি খুঁজতে থাকে আর মন্মথ কৌতুক অনুভব করে। সেই মন্মথ আজ নিজে সত্যদের সেই বাড়ির সামনে বাড়ি ঢুকবার দরজায় থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

ভয় জাতের নয়, ভয় অখাদ্যেরও নয়, ভয় দেবতা না-মানারও নয়। ভয় সত্যদের বাড়ির সমস্ত কিছুর।

সব থেকে কিন্তু বেশী ভয় সত্যদের বাড়ির ওই মেয়েদের। যারা দরজার ওপাশ থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে না। যাদের ডেকে কথা বলিয়ে দিলেও কথা বলতে পারে না, অত্যন্ত সহজভাবে অতি মিষ্টভাবে নমস্কার করে কথা বলে, হাসে, চা খাবার এনে নামিয়ে দেয়,

অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ধবধবে বেশভূষা, আশ্চর্য সুন্দর তাদের চুল-বাঁধার ভঙ্গি।

ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালে তারাই বলবে—আসুন—দাঁড়ালেন যে? আপনি বুঝি দাদার সঙ্গে পড়েন? ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছেন আপনি? ওঃ আপনার কথা যা বলে না দাদা!

এতক্ষণে তার মনে হবে নমস্কার করার কথা। সে হয়তো কোনোরকমে দোষটা শুধরে নিয়ে বলবে—নমস্কার!

তারা হেসে ফেলবে। প্রচ্ছন্ন কৌতুক-প্রসন্ন নিঃশব্দ হাসি তাদের ঠোঁটদুটির এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত খেলে যাবে অনেক দূরের বিদ্যুৎ চমকের আভাসের মতো।

সবসুদ্ধ ভাবনাচিন্তাগুলো একসঙ্গে জড়িয়ে তার মন থেকে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ল। থমকে দাঁড়িয়ে না-গিয়ে তার উপায় ছিল না।

সত্য তার উত্তরের জন্য মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

ঠিক এই সময় বাড়ির ভিতর থেকে সামনের বারান্দায় বেরিয়ে এলেন দুজন ভদ্রলোক। একজন সুন্দর সুপুরুষ দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক, চোখে মুখে একটি উজ্জ্বল দীপ্তি এবং মার্জনা—পরিচ্ছদে আশ্চর্য পরিচ্ছন্নতা, যেটা পরিচ্ছন্ন হয়েই ক্ষান্ত থাকে নি তার থেকে বেশী কিছু হয়েছে—সুন্দর এবং সুশোভন বলাই উচিত। আর একজনকে দেখেই চিনতে পারলে মন্মথ। তাঁকে সে কয়েকবারই দেখেছে। তিনি আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী। তাঁরা বাড়ির ভিতর থেকে ফটকের দিকেই এগিয়ে আসছিলেন। ধীর মন্থর পদক্ষেপে কিছু বলতে বলতে আসছিলেন। সত্য চঞ্চল হল এবার এবং পরমুহূর্তেই শশব্যস্ততা প্রকাশ করে এগিয়ে গিয়ে শাস্ত্রী মশায়কে প্রণাম করলে।

শাস্ত্রীমশায় প্রসন্ন হেসে বললেন—শ্রীমান সত্য—? তারপর বললেন—সত্য তোমাতে জয়যুক্ত হোক।

সত্য এবার দ্বিতীয়জনকে প্রণাম করলে। মন্মথ আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না—এগিয়ে গিয়ে প্রথমে শাস্ত্রীমশায়কে তারপর দ্বিতীয়জনকে প্রণাম করলে।

শাস্ত্রীমহাশয় মন্মথকে বললেন—কল্যাণ হোক। তারপর সত্যকে জিজ্ঞাসা করলেন—এটি কে সত্য? বালকটি তো অতি প্রিয়দর্শন এবং দীপ্তিমান হে?

সত্য বললে—আমাদের সঙ্গে পড়ে। আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় এখন। পর পর এ ক'বছরই ফার্স্ট হয়েছে। খুব ভালো সংস্কৃত জানে!

—তাই নাকি? তাহলে বল, কস্তম্ভোঃ?

মন্মথ বললে—আমার নাম মন্মথ—

—উঁহু, উঁহু, সংস্কৃতে বল।

মন্মথর মনে পড়ে গেল চণ্ডীর শ্লোক। সে বললে—মন্মথকুমারো নামঃ উৎপন্ন বিপ্রাণাং কুলে।

—বাঃ বাঃ বাঃ! তাহলে তুমি নিশ্চয় ভট্টাচার্য—না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

এবার দ্বিতীয়জন এগিয়ে এসে তার পিঠে হাত দিয়ে বললেন—তুমি মন্মথ? তোমার কথা সত্য প্রায়ই বলে। এবং অনেক কথা বলে। আমি সত্যর বাবা। যাও—বাড়ির ভিতর যাও। যাও সত্য ওকে নিয়ে যাও—তোমার পড়ার ঘরে বসাও গে।

তারপর তাঁরা এগিয়ে চলে গেলেন বাড়ির বাইরে। পিছনে ফটকের ভিতরে সত্য এবং মন্মথ দাঁড়িয়ে রইল বাড়ির ভিতরের দিকে মুখ করেই।

সত্য তার হাতখানা তুলে নিয়ে তাকে আকর্ষণ করে বললে—এসো।

—এইটে ড্রইংরুম।

সোফা সেট এবং দামী দামী ভেলভেটমোড়া চেয়ার দিয়ে সাজানো ঘরখানা আয়তনে চৌকো। দেওয়ালে বড় বড় অয়েল-পেণ্টিং। অধিকাংশই বিলিতী ল্যাণ্ডস্কেপ। দামী দামী ফ্রেম। মেঝেতে কার্পেট। ছাদ থেকে ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে।

—এইটে হল বৈঠকখানা।

মস্ত বড় একখানা ঘর, লম্বায় বড়, চওড়ায় দ্বিগুণ।

মেঝের উপর মেঝেজোড়া শতরঞ্জ এবং তার উপর চাদর পাতা। চারিপাশে দেওয়াল ঘেঁষে তাকিয়া সাজানো রয়েছে। অনেক লোক বসতে পারে।

সত্য বললে—এইখানে ছোট ছোট সভাসমিতি হয়। মজলিস-টজলিসও হয়। দেখ না দেওয়ালে সব বড় বড় লোকেদের ছবি টাঙানো।

মন্মথ বললে—এরা তো সাহেব। ইংরেজ!

—হ্যাঁ। সত্য বললে—লাটসাহেবদের ছবি আছে। যাঁরা অবশ্য ভালো লোক। মানে লর্ড বেণ্টিঙ্কের টেণ্টিঙ্কের মতো লোক যাঁরা তাঁদেরই ছবি। এই দেখ রাজা রামমোহনের ছবি, ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের ছবি, রামকৃষ্ণ পরমহংসের ছবিও আছে ওই দেখ। মাসে একবার করে ধর্মসভা হয়।

বলতে বলতে পেরিয়ে এসে দাঁড়াল একখানা ঘরের সামনে।

—এ ঘরখানা বাবার আপিসঘর। বাবা মক্কেলদের সঙ্গে কথা বলেন, কাজ করেন। দরজার সামনে একজন কাপড়ের উপর চাপকান এবং মাথায় পাগড়ি পরে বুকে তকমা এঁটে আরদালী বসে আছে—একজন টানাপাখা টানিয়ে-লোক টানাপাখার দড়িটা ধরে চুপ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। ঘরখানার দরজার পাশে বাইরের দিকে দেওয়ালের গায়ে সুন্দর পিতলের প্লেটের উপর নাম লেখা রয়েছে জে. পি. ব্যানার্জি। মন্মথ জানে সত্যর বাবার নাম জ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দরজার মধ্য দিয়ে ভিতরে দেখা যাচ্ছিল প্রকাণ্ড একখানা টেবিলের এক পাশে একখানা চেয়ার, অন্য তিন দিকে অনেকগুলো চেয়ার সাজানো হয়েছে। ভিতরে দেওয়ালের গা ঘেঁষে সারি সারি কাচের আলমারি। কাচগুলিতে এতটুকু ময়লা নেই। কাঠের অংশগুলির বার্নিশ ঝকঝক করছে। আলমারির মধ্যে ঝকঝকে সোনার জলে নাম লেখা চামড়া-বাঁধানো বই ঠাসা হয়ে সাজানো রয়েছে। সোনার জলে লেখা বইয়ের নাম লেখকের নাম মালিকের নাম ঝিকমিক করছে। আবার থমকে দাঁড়াল মন্মথ। এবং মৃদুস্বরে সবিস্ময়ে বোধ করি আপনমনেই বললে—এত বই!

সত্য বললে—সব আইনের বই।

—আইনের বই? এত?

—সব হাইকোর্টের রিপোর্ট—সব বাঁধিয়ে রাখা হয় তো! বিলেতের পর্যন্ত!

অবাক হয়ে আলমারিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল মন্মথ।

এ এক নতুন জগৎ নতুন পৃথিবী তার কাছে।

সত্য বললে—আর একটা ঘরে আমাদের বাড়ির লাইব্রেরী আছে। অনেক বই আছে। ইংরিজী সংস্কৃত বাংলা; পার্সী বইও আছে। সে দেখাব অন্য একদিন। এখন চল, একখানা ঘরের পরই আমার পড়ার ঘর।

এ তো পায়ে হেঁটে চলা নয়, এ যেন কেমন স্বপ্নের মধ্যে চলা।

ড্রইং-রুম বৈঠকখানা মজলিসের হলঘর আপিসঘর সব সুন্দর করে সাজানো। আশ্চর্য সুন্দর করে। তার কাকার বাড়িতেও ফার্নিচার আছে বসবার ঘর আছে কারবারের ঘর আছে—তার কাকারও আপিসঘর আছে কিন্তু সে এমন নয়। কোথায় যেন কিসের তফাত

আছে। দামের নয়। অন্য কিছুর। রুচির পছন্দের।

—এই আমার পড়ার ঘর।

—বাঃ! আপনি মুখ থেকে বেরিয়ে গেল মন্মথর। সত্য বললে—বস তুমি—আমি এক্ষুণি আসছি।

সে দ্রুতপদে চলে গেল বাড়ির ভিতরের দিকে। মন্মথ মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে ঘরখানার সাজ সজ্জার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

একখানা ছোট টেবিল দু'পাশে খানপাঁচেক চেয়ার। এক আলমারি বই। সবই সত্যর বই। ইংরিজী ডিকশনারী—ইংরিজী থেকে ইংরিজী, ইংরিজী থেকে বাংলা। বাংলা অভিধান। একখানা নয় দু'খানা। সংস্কৃত শব্দকল্পদ্রুম রয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণ কৌমুদী, মুগ্ধবোধ। একটা থাকে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা সাজানো রয়েছে। এর নিচের থাকেই রয়েছে অনেক ইংরিজী বই। রবিনসন ক্রুশো হল থাকটার প্রথম বই। তারপর গালিভারস্ ট্রাভেল্স্। অ্যালিশ ইন দি ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড। নিচের থাকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' থাক দিয়ে রাখা হয়েছে।

টেবিলের উপর পিতলের লম্বা গ্লাসের ধরনের একটা ফুলদানিতে অনেক ফুল সাজানো। গোছাবন্দী রজনীগন্ধা। একটা ডাবরের মতো জয়পুরী কাজ করা ফুলদানীতে গোলাপের গুচ্ছ। সাদা, লাল, হলদে রঙের সুন্দর গোলপগুলি বিকেলের দিকে ম্লান হয়ে এসেছে।

এইগুলিই সব থেকে বেশী সুন্দর। এই ফুল এই বই এই ছবি এই রুচি।

—বাবু!

একজন চাকর একখানা ট্রের উপর একটি কাপড়ের ঢাকনায় ঢাকা কাচের গ্লাসে জল নিয়ে ঢুকল। এবং তার সামনে এনে ধরলে। ছোট একটি বাচ্চা চাকর। তার কাঁধে একখানি ধবধবে ধোওয়া তোয়ালে। মন্মথ তার দিকে তাকিয়ে তাকে দেখে নিয়ে গ্লাসটা তুলে নিল।

বুকটা ধক করে উঠল। খাবে? সে জল খাবে এখানে? না-খেয়েই বা উপায় কি আর। তার তৃষ্ণা এবার প্রবল হয়ে উঠল। গলা বুক শুকিয়ে গেল। তবু সে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার নাম কি?

মনে মনে সন্দেহ হচ্ছে—চাকর ছেলেটা অজাত বেজাত নয় তো? অস্পৃশ্য নয় তো? পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছেলে, সে হয়তো এ বাড়িতে এসে হয়েছে—কিন্তু জাত? ছেলেটি বললে—আমার নাম দুলাল। শচীদুলাল দাশ। এবার মন্মথ জলে চুমুক দিলে।

তৃষ্ণা তার খুব পেয়েছিল। গ্লাসটাকে শেষ করেই ফেললে প্রায়। ছেলেটা গ্লাসটা হাত থেকে নিয়ে তোয়ালেখানা এগিয়ে দিয়ে বললে—মুখ হাত ধোবেন আসুন। দাদাবাবু এক্ষুণি আসবেন।

বাথরুমেও ঠিক সেই পার্থক্য। কলাইকরা মগ, গালভানাইজড্ টিনের বাথটব, পরিচ্ছন্ন মেঝে, সুন্দর একটি চৌবাচ্চা, পাশে একটি আলনা, একটি সুন্দর বসবার চৌকি; পরিপাটী ব্যবস্থায় কোনো দিকে যেন কোনো ত্রুটি নাই। এখানে বাড়িতে কলের জল ছাড়া অন্য জল অর্থাৎ গঙ্গাজল নাই।

মগটি জলে ডুবিয়ে জল নিয়ে মুখ হাত ধুতে ধুতে চকিত হয়ে উঠল মন্মথ।

সুর। গানের সুর। অর্গানের সুর বেজে উঠেছে কোথায়। অর্গানের সুর সে চেনে। তাদের পাড়ার ছাতুবাবু লাতুবাবুদের বাড়িতে অর্গান বাজে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো এই বাদ্যযন্ত্রটির আওয়াজ শুনেছে। না, আওয়াজ নয়; আওয়াজ বললে কেমন যেন লাগে। কাঠি দিয়ে ক্যানেস্তারার টিন পিটলেও আওয়াজ বের হয়। আওয়াজ নয়। হঠাৎ তার মনে হলো—স্বরলহরী সুরলহরী। মোটা এবং মিহি সুরে মিশে যায়।

হাতে মগটা ধরেই সে ঘাড় বেঁকিয়ে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল ; হ্যাঁ এইবার মেয়েদের গলা তার সঙ্গে মিশল। কি সুন্দর গলার সুর! এবার গান! গানটা কি?—আশ্চর্য গান—এমন গান হয় এমন সুর হয় তা' ধারণা ছিল না মন্মথর।

ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রভাত অম্বর মা-ঝে।
দিকে দিগন্তরে ভুবন মন্দিরে শান্তি সংগীত বা-জে।
হের গো অন্তরে অরূপ সুন্দরে নিখিল সংসারে
পরম বন্ধুরে—
এসো আনন্দিত মিলন অঙ্গনে শোভন মঙ্গল সাজে।

এবার আরও দু তিনটি কণ্ঠস্বর মিশল প্রথম জনের সঙ্গে। কোরাসে মেয়েদের গলায় গানও সে শুনেছে। শুনেছে থিয়েটারেই। চৈতন্যলীলায় কোরাসে গান শুনেছে, ভক্তিসংগীত হরিনাম গান। এবং সে গান অত্যন্ত সহজ এবং সরল। এ গানখানি অপূর্ব সুন্দর। কিন্তু মন্মথর মনে হচ্ছে ঠিক যেন এমন সরল নয়। চৈতন্যলীলায় শেষ গানখানি তার খুব ভালো লেগেছিল—যেমন পবিত্র তেমনি গম্ভীর তার সঙ্গে তেমনি সরল ও সহজ।

কলুষ নাশন দীন তারণ কনকবরণধারী
চূড়া ঝলমল বেণী দলদল শোভিত কুসুম সারি
গৌরচন্দ্র চরণ বন্দন প্রেমানন্দ মেলা।
আদরে বাঁধি ভুজমৃণালে নয়নে নয়নে খেলা।
চিত্ত বিভোর নেহার নেহার মাধুরী মাধব সঙ্গ
রাসে রসে রসিক রসিকা মাধুরী তরঙ্গ—

গানখানা তার মুখস্থ হয়ে গেছে। তাদের বাড়িতে তার খুড়ীমা মধ্যে মধ্যে গানখানা গেয়ে থাকে। থিয়েটারে এ গান পুরুষ এবং মেয়েরা ভাগ করে গায়। খুড়ীমা একলা গায়। খুড়ীমার গলাও ভালো, সুরে জ্ঞানও আছে। কিন্তু এই এদের বাড়ির গানের সঙ্গে সবের কোথায় একটা কিসের তফাত থেকে যায়।

ওই গানখানা!

ও গানখানার মানে যেন কথায় কথায় মানে করে করা যায় না। মানের বাইরে কিছু আছে। ধরা যায় না কিন্তু ফুলের গন্ধের মতো চারিপাশের বাতাসে মাখা হয়ে ফেরে চারিদিকে।

হের গো অন্তরে অরূপ সুন্দরে—।

অরূপ মানে তো যার রূপ নাই। যার রূপই নাই তা সুন্দর না সুন্দর নয় কে বলবে? তাকে দেখবে কি করে? কিন্তু মানে না হোক তবু বোঝা যাচ্ছে যেন মানের বাইরের একটা কিছু সেটা। যাকে চোখ মেলে দেখা যায় না, চোখ বুজলে আপনি মনের মধ্যে এসে দাঁড়ায়।

—মনু! মনু!

বাইরে সত্য ডাকছে। চাকরটা বললে—বাবু চানের ঘরে আছে। মুখ হাত ধুচ্ছে।

এতক্ষণে সচেতন হয়ে উঠল মন্মথ। লজ্জিতও হল। তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে সামনেই দেখলে সত্যকে। এবং বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে বললে—ভারী সুন্দর গান ভাই সত্য। আমি কক্ষণো এমন গান শুনি নি।

সত্য হেসে বললে—আমার বোনেরা গাইছে।

মন্মথ বললে—গানটি ভাই ভারী সুন্দর। মানে যেন ঠিক ধরতে পারি নি কিন্তু খুব

ভালো। এসো আনন্দিত মিলন অঙ্গনে—ভারী সুন্দর।

সত্য বললে—কার গান! একটু মুচকে হাসলে সত্য।

—কার? প্রশ্ন করলে মন্মথ।

—রবিবাবুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। সে দিন যে দেখেছিলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে—তাঁর বড়ছেলে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে—তাঁদের বাড়ির ছোটছেলে রবীন্দ্রনাথ।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর!

সবিস্ময়ে মন্মথ তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—রবিঠাকুর?

—হ্যাঁ। মস্ত কবি। তেমনি সুন্দর গান গাইতে পারেন—গানের সুর তৈরি করতে পারেন। আর তেমনি কি সুন্দর দেখতে তিনি। তোমাকে একদিন নিয়ে যাব ওঁদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। দেখিয়ে আনব। মহর্ষিকে তুমি দেখেছ একদিন ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের সামনে। কিন্তু আসল মহর্ষিকে দেখ নি। দেখাব তোমাকে। সত্যকারের মহর্ষি। প্রচুর টাকা পয়সা সম্পত্তি কিন্তু এতটুকু অহংকার নেই।

বলতে বলতে থমকে দাঁড়াল সত্য। একটু কি ভেবে নিয়ে বললে—দুলাল!

বাচ্চা চাকরটি দাঁড়িয়েই ছিল, বললে—আজ্ঞে—

—যা তো, উপরে গিয়ে নতুন করে চা করে দিতে বল তো! চা-টা বোধহয় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। দিয়ে গেছে তো আমি আসবার আগে।

মন্মথ লজ্জিত হয়। দোষটা তার। এবং দোষটার মধ্যে একটু লজ্জাকর কিছু যেন আছে। বাথরুমে দাঁড়িয়ে মুখ হাত ধোওয়ার কথা ভুলে বাড়ির মেয়েদের গান শোনার মধ্যে সত্যিই লজ্জার কিছু আছে বলে মনে হল তার। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল—না না না সত্য। আর চা আনতে হবে না।

—কেন? জুড়িয়ে গেছে যে।

—আমি চা ঠিক খাই নে ভাই। আমার ঠিক ভালো লাগে না।

—কিন্তু খাও তো! খাও না? কতদিন তো বাড়িতে চা খাওয়ার কথা বলেছ—

—বলেছি। কাকা তো আমার বড়লোক হয়েছেন কিন্তু আসলে তো আমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবংশের সন্তান! আমাদের সব গুরুগিরির পাট ছিল। আমার বাবার কথা তো বলেছি তোমাকে। তাঁকে দেখ নি, দেখলে বুঝতে। খুব ঠাণ্ডা মানুষ শান্ত মানুষ।

—উনি চা খান না?

মুশকিলে পড়ল মন্মথ। বাবা চা খান। দেশে ম্যালেরিয়া ঢুকল যখন তখন চায়ে ম্যালেরিয়া আটকায় ধারণা ছিল লোকের—তার মা সেই সময় বাড়িতে চায়ের পাট করেছিলেন। মায়ের জন্যে বাবাকে চা খেতে হত। কিন্তু সে একবার। তা ঠাণ্ডা জুড়িয়ে যাওয়া চা। সকালে উঠে মুখ হাত পা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে প্রভাত সন্ধ্যা সেরে নিয়ে চাটুকু খেতেন। এবার বাবা চা খাচ্ছেন—একবার নয়, দু'বার, এবং গরম চা খাচ্ছেন। এই যে কঠিন অসুখ করেছিল—যে অসুখের সময় নতুন মা সেবা করেছিল। সেই অসুখের পর গরম চা খাচ্ছেন; নতুন মায়ের সঙ্গে বাবার বিয়ের পর ছোটবউয়ের ব্যবস্থায় বিকেলেও চা খাচ্ছেন। এ কথাগুলি বলতে যেন লজ্জা বোধ করলে সে।

ঠিক এই সময়েই বারান্দার ও-মাথায় দেখা গেল সত্যর বাবাকে—জ্যোতিপ্রসাদবাবুকে। শিবনাথ শাস্ত্রী মশায়কে বিদায় দিয়ে ফিরছেন। সত্য বলে উঠল—ওই বাবা এসে গেছেন। অর্থাৎ ভালো হয়েছে—যা হোক মীমাংসা উনি করে দেবেন। সে একটু এগিয়ে গিয়ে ডাকলে—বাবা!

জ্যোতিপ্রসাদবাবু এগিয়ে এসে মন্মথকে বললেন—কি? জল খেয়েছ?

উত্তর দিলে সত্য। বললে—জল খেয়েছে কিন্তু জলখাবার খায় নি।

জ্যোতিপ্রসাদবাবুর কপালে দু তিনটি কুঞ্চনরেখা দেখা দিল। তিনি বললেন—কেন? কি হল? সঙ্গে সঙ্গে গৌরবর্ণ মুখখানা খানিকটা লাল হয়ে উঠল। চোখের দৃষ্টির প্রসন্ন হাসিটুকু প্রদীপের শিখার দমকা হাওয়ায় নিভে যাওয়ার মতো নিভে গেল।

সেটা চোখে পড়ল মন্মথর। সে ওই রূপবান ধনবান এবং তার সঙ্গে আশ্চর্য আকর্ষণ করা ব্যক্তিত্ববান এই মানুষটির দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে ছিল। সত্য তাকিয়ে ছিল মন্মথর দিকে। জ্যোতিপ্রসাদবাবুর কথার জবাব দিলে সে। বললে—এই তো মুখ হাত ধুয়ে বের হল। ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনছিল। এদিকে চা জুড়িয়ে গেছে। বলছি নতুন চা নিয়ে আসুক—তাতে ওর আপত্তি। বলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাড়ির ছেলে আমি, পাড়াগাঁয়ের বাড়িতে ওদের চা আছে—খায়, কিন্তু চা ওর ভালো লাগে না। বলছে—না আর চা আনতে হবে না!

মুখখানি প্রসন্ন হল জ্যোতিপ্রসাদবাবুর। একটু হেসে বললেন—চা খেতে আপত্তি থাক খাবার খেতে আপত্তি নেই তো? চা ভালো না লাগুক খিদে তো পেয়েছে।

মন্মথ বললে—খাবার খেয়ে ঠাণ্ডা জলই আমার বেশ ভালো লাগে।

জ্যোতিপ্রসাদবাবু এবার উদারভাবে হেসে বললেন—তুমি তাহলে খাবার খেয়ে জল খাও। তোমার সঙ্গে আমরা বসে চা খাই। কি বল?

মন্মথ হেসে বললে—বেশ!

জ্যোতিপ্রসাদবাবুর ভুরু কুঁচকে উঠেছিল—কপালে কোঁচকানো দাগ ফুটে উঠেছিল সে সময়ের ব্রাহ্ম এবং হিন্দুদের মধ্যে নদীর বালির তলায় বয়ে যাওয়া জলস্রোতের মতো যে বিদ্বেষ এবং বিরোধ বয়ে যেত তারই জন্য।

ছেলের কাছে পাড়াগাঁয়ের একটি আশ্চর্য নম্র কোমল অথচ শক্ত ছেলের কথা শুনে দিন দিন তার সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠছিলেন। প্রথম বছরেই পাড়াগাঁয়ের পণ্ডিত ঘরের ভালো ছেলে একটি সংস্কৃতে সত্যকে এবং বিভূতিকে ডিঙিয়ে ফার্স্ট হলে তিনি বিস্ময় বোধ করতেন না। কিন্তু শুধু সংস্কৃত নয় অঙ্কে ইংরিজীতেও সত্য বিভূতিকে টপকে গিয়ে সর্বপ্রথম আসনটি দখল করে বসা তো সহজ কথা নয়! এ ছাড়াও হিন্দু ইস্কুলের হেড-মাস্টারের সঙ্গে তাঁর গাঢ় হৃদ্যতা আছে। লোকটি হিন্দু তবে উদার হিন্দু। তিনিও তাঁকে বলেছেন ছেলেটির কথা। সেই ছেলেটিকে হঠাৎ কাছে পেয়ে তিনি কৌতূহলবশেই কাছে বসিয়ে দীর্ঘক্ষণ গল্প করলেন। ওই চায়ের সূত্র ধরেই কথা। পাথরবাটিতে করে চা খাওয়া হত তাদের বাড়িতে। জ্যোতিপ্রসাদবাবু জানেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা চীনা মাটির বাসনকে পবিত্র মনে করেন না। ওর মূল্য পোড়া দেশীমাটির ভাঁড় গেলাসের চেয়ে বেশী নয়।

মন্মথ বললে—তামার একটি ঘটিতে চায়ের জল গরম হত। তারপর তাতে চা ফেলে দিয়ে আর একবার উনোনে চড়িয়ে ফুটিয়ে নিয়ে দুধ চিনি মেশানো হত পিতলের একটি গামলায়; তাই থেকে আবার ছেঁকে ঢালা হত পাথরের বাটিতে বাটিতে আর গেলাসে। বাবার ছিল গেলাসটা আর আমরা খেতাম অম্বল খাওয়া পাথরবাটি হয় যেগুলি সেই-গুলিতে।

জ্যোতিপ্রসাদবাবু বললেন—তাহলে?

কথা হচ্ছিল চা খেতে খেতেই। চা যখন এলো তখন তার মিষ্ট গন্ধ এবং সুন্দর রং করা পেয়ালা পিরিচের আকর্ষণ অত্যন্ত সহজে আকর্ষণ করেছিল মন্মথকে। নতুন পর্যায়ের গরম এবং চমৎকার স্বাদ ও গন্ধযুক্ত চায়ের মোহে সে আপনা থেকেই হাত বাড়িয়ে তার

সামনের কাপটা টেনে নিয়ে খেতে খেতে কথাগুলি বলে ফেলেছে। জ্যোতিপ্রসাদবাবুর প্রশ্নে সে একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে—এ্যাঁ ?

জ্যোতিপ্রসাদবাবু হেসে বললেন—তুমি তো পোরসিলেনের কাপে ডিসে চা খেলে ! কোনো 'এ' হবে না তো ? মানে দোষটোষ হবে না তো ?

অত্যন্ত সহজভাবে মন্মথ বললে—তা কেন হবে ? কাকামশায়ের বাড়িতে তো চীনেমাটির চায়ের সেট আছে। আমি তো খাই।

একটু হেসে জ্যোতিপ্রসাদবাবু বললেন—সেটা কি রকম হল ? গ্রামের বাড়িতে চীনেমাটির বাসনে খেলে দোষ হয় আর শহরে খেলে হয় না এটা কি রকমের নিয়ম ? তোমার বাবা জানেন ?

মন্মথ এতক্ষণে সচেতন হল জ্যোতিপ্রসাদবাবুর প্রশ্ন সম্পর্কে, বললে—বাবাকে কখনও জিজ্ঞাসা করি নি। বাবাও কখনও জিজ্ঞাসা করেন নি। কাকার কলকাতার বাড়িতে দু'একদিনের জন্যেই এসেছেন। এসব দেখেন নি। তবে—

—তবে—কি ?

—তবে বাবা বোধহয় জানেন। কিন্তু বারণ আমাকে করেন নি। এসব কথাও হয় নি কখনও। একবার—সে সেই প্রথম বছর যে বছর কলকাতায় এলাম সে বছর কাকীমা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—মনু তো কলকাতার ইস্কুলে ভর্তি হচ্ছে—এখানে ক্লাসে তো নানান জাতের ছেলে পড়ে, তাদের সঙ্গে তো একসঙ্গে বসবে বেঞ্চিতে ; তা ইস্কুল থেকে এসে কি চান করবে ? ছত্রিশ জাতের সঙ্গে ছোঁয়া পড়ে তো ! বিশেষ করে এ বছর ওর পৈতে হয়েছে। বাবা বলেছিলেন—যস্মিন দেশে যদাচার মা। এ তো না মেনে উপায় নেই। ছোঁয়ানাড়ার নিয়ম কড়া করে মানতে হলে পড়া হবে না। গঙ্গাজলটল ছিটিয়ে দাও। তাছাড়া হাত মুখ ধোওয়া কাপড় ছাড়া এসব তো থাকছেই।

জ্যোতিপ্রসাদবাবু গভীর মনোসংযোগ করে তার কথাগুলি শুনলেন। ছেলেটির অকপট সরল কথাবার্তাগুলি ভারী ভালো লাগল তাঁর। শুধু ছেলেটিকেই নয় ছেলেটির গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাপটিকেও ভালো লাগল। জটাধর ভট্টাচার্যকে তিনি চেনেন জানেন। দু'চারটে মামলাতেও স্বপক্ষে বিপক্ষে হাইকোর্টের কাজ্ করেছেন। সবই আপীলের কেস। কিন্তু তাকে তাঁর খুব ভালো লাগে নি। ব্যবসায়-বাণিজ্যে কৃতী ব্যক্তি—এবং পয়সাকড়ি খরচ করে মানসম্মান কেনার পন্থাগুলি সে বেশ ভালোই জানে। কিন্তু কোনো ন্যায়নীতি শাস্ত্র বা সূত্রের ধার ধারে না। কিন্তু নীতিবাগীশ সমাজপতির ভূমিকায় সে এ দলেও থাকে ও দলেও থাকে। এমন যে জটাধর ভট্টাচার্য তার ভাইপো এবং দাদা এমন স্বতন্ত্র একটি নম্র নীতিপরায়ণ যে কেমন করে হতে পারে তা ঠিক বুঝতে পারলেন না। ওই ভাবনাতে একটু মগ্ন হয়ে চায়ের কাপটি ধরে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন। মন্মথ চায়ের কাপটি শেষ করে টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললে—আমি একটু হাত ধুয়ে আসি।

জ্যোতিপ্রসাদবাবু চকিত হয়ে তার দিকে ফিরে চাইলেন। মন্মথ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সত্য দুলালকে ডেকে বললে—দুলাল, হাতে জল দে বাবুর !

তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে মন্মথ ফিরে এলো। জ্যোতিপ্রসাদবাবুর চোখ দুটি তখন যেন চকচক করছে। জ্যোতিপ্রসাদবাবুর চোখের গড়ন ছোট—লম্বা টান থাকলেও আয়ত নয়। কিন্তু তাতে তীক্ষ্ণতা আছে। সে তীক্ষ্ণতা আরও প্রখর হয়ে উঠেছে। মন্মথ ফিরে আসতেই তিনি প্রশ্ন করে বসলেন—সব সময় তুমি উচ্ছিষ্ট হাত ধোও ?

একটু বিস্মিত হয়ে মন্মথ তাঁর মুখের দিকে তাকালে। একটু অপ্রতিভের মতোই বললে —এ্যাঁ ?

জ্যোতিপ্রসাদবাবু বললেন—এই তো হাত ধুলে তুমি। তা' সব সময়ে কি খেয়ে হাত ধোও ?

মন্মথ বললে—তা' ধুই তো!

—ধোও ?

—হ্যাঁ।

—কিসের জন্যে ধোও ? হাতে কিছু লাগে সেইটে ধোওয়ার জন্যে ধোও না এমনি ধুতে হয় বলে ধোও ?

অনেকক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে মন্মথ বললে—তা' তো ভাবি নি কখনও। ছেলেবেলা থেকে শিখেছি।

জ্যোতিপ্রসাদবাবু বললেন—খুব খুশী হলাম তোমার সঙ্গে কথা বলে। বড় হয়ে কি করবে ?

—কি করব ?

—হ্যাঁ। কি করবে ?

মন্মথ বললে—তা' তো কোনো দিন ভাবি নি!

—কিন্তু পড়াশুনো শেষ করে কোনো একটা কাজ তো করতে হবে! তোমার বাবা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ—তোমাদের যজমান আছে—শিষ্যবাড়ি আছে—এণ্ট্রান্স এফ-এ বি-এ এম-এ পাস করে তো তুমি গুরুগিরি কি পুরোহিতগিরি করবে না!

মন্মথ খুব আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়লে, যার অর্থ হল 'না'। সে যেন খুব ভাবতে ভাবতেই এই 'না'-এর সত্যটি উপলব্ধি করলে। 'না'।

জ্যোতিপ্রসাদবাবু বললেন—তাহলে ?

মন্মথ বললে—আপনি বলুন আমি কি হব ?

—আমি বলব না তুমি বলবে।

সে সত্যর দিকে তাকালে। সত্য মুচকে মুচকে হাসছিল। মন্মথ বললে—সত্য কি হবে ?

জ্যোতিপ্রসাদবাবু বললেন—সত্য উকিল হবে।

মন্মথ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—আপনার বাবাও বুঝি উকিল ছিলেন ?

জ্যোতিপ্রসাদবাবু হেসে বললেন—না। আমার বাবা ছিলেন টীচার। স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। গ্রামে আমাদের বাড়ি ছিল। ওই তোমাদের হুগলী জেলাতেই। ব্রাহ্ম হয়ে গ্রামে আর থাকতে পারেন নি—কলকাতায় এসে স্কুলে চাকরি নিয়েছিলেন। আমি উকিল হয়েছি।

অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মন্মথ। তারপর বললে—এই বাড়ি ঘর দোর সব আপনি উকিল হয়ে করেছেন ?

জ্যোতিপ্রসাদবাবু বললেন—তা' করেছি। তবে সব কিছুর পত্তন বাবাই করে গিছলেন। এ তো বিশেষ কিছু না। অনেকে এর থেকেও অনেক বেশী করে।

আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল মন্মথ। এবার সে যেন কোনো একটা ভাবনায় মগ্ন হয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। দরজার মধ্যে দিয়ে সামনে খোলা জায়গায় ছোট একটি মাটির উঠান; উঠান নয়, বাগান; সুন্দর লনের চারিপাশে নানান রকমের গাছ; চামেলী এবং জুইলতা জড়ানো একটি বাঁশের ফটক। ঠিক মাঝখানে একটি চাঁপার গাছ; এ ছাড়া আরও অনেক রকম ফুল।

জ্যোতিপ্রসাদবাবু বললেন—কলকাতা হাইকোর্ট হল খুব বড় বার। এখানে বিলেত

থেকে ইংরেজ ব্যারিস্টাররা প্র্যাকটিস করতে আসে। কোটি টাকা রোজগার করে নিয়ে যায়।

মন্মথ তবু কোনো কথা বললে না।

জ্যোতিপ্রসাদবাবু বললেন—তুমি যদি উকিল হও আমি তোমাকে সাহায্য করব। সত্যকে যেমন করব সাহায্য তোমাকেও করব! মন ঠিক করে ফেল।

মন্মথ বললে—স্বগত উক্তির মৃদুস্বরে বললে—কলকাতা যেদিন আসি তার আগের দিন রাত্রে বাবা বলেছিলেন—পৃথিবীতে মৃত্যুপতি যম জীবনের সম্মুখে আয়ু পুত্র পৌত্র গো হস্তী অশ্ব স্বর্গ রাজ্য অপ্সরা দেবকন্যা প্রভৃতির ভোগ সমারোহ সাজিয়ে রেখে দিয়েছে। এর বিনিময়ে জীবনকে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। এর পিছনে ছুটেই মানুষ মরে। আমাকে বলেছিলেন—আশীর্বাদ করি বিদ্যাবলে এগুলোকে যেন অত্যন্ত সহজে অতিক্রম করতে পার।

জ্যোতিপ্রসাদবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন। এ কথাগুলি তাদেরও কথা। তাঁরও কথা। কিন্তু আজকের এই মুহূর্তটিতে সে সত্য বিচিত্রভাবে মিথ্যা দাঁড়িয়ে যেতে বসেছে এই বালকটির এই কয়েকটি কথায়। তিনি তাঁর হাতখানি মন্মথর কাঁধের উপর রেখে বললেন—না মন্মথ! ওই যে সম্পদ ঐশ্বর্য ভোগ—মানে স্বর্ণ রৌপ্য অন্ন বস্ত্র বাদ দিয়ে অমৃত সন্ধানে অনাহারে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে শুকিয়ে মরা এ আমরা অনেক করেছি। এবং তার জন্যে অনেক মারও খেয়েছি। ওই আঁকড়ে থাকলে আর চলবে না। অন্ন বস্ত্র স্বর্ণ রৌপ্য মণি মুক্তা রাজ্য সাম্রাজ্য এ আমাদের চাই। হ্যাঁ তবে ওই সিংহী, তোমাদের ওই ক্লাসফ্রেন্ড সিংহীর কথা বলছি—ওই সিংহীদের মতো না অবশ্য। বুঝেছ।

ঠিক এই সময়েই উপর থেকে কলকল করে কথা বলতে বলতে নেমে এলো কয়েকটি পরিচ্ছন্ন দীপ্তিমতী তরুণী মেয়ে। কালাপেড়ে শাড়ি, থ্রী-কোয়ার্টার হাতা লেসের ঘের দেওয়া বডিস, কানে দুল; গলায় হার, হাতে দুগাছি করে প্লেন বালা, আর একপিঠ এলো চুল। সর্ব শরীরে মনে মন্মথ যেন কি একটা মোহে অভিভূত আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

জ্যোতিপ্রসাদবাবু বললেন—কি কোথায় যাচ্ছ সব? এঁ্যা! এরা আমার মেয়ে ভাইঝি —আর একে চেন তোমরা?

মেয়েদের দলটিকে লক্ষ্য করে জ্যোতিপ্রসাদবাবু কথা কটি বললেন; তিনি ঘরের দিকে পিছন ফিরে দরজার দিকে মুখ করে বসে ছিলেন। মন্মথ ছিল জ্যোতিবাবুর দিকে মুখ করে। জ্যোতিবাবু কথা বলবার আগেই মেয়েদের কণ্ঠের কলস্বরে চকিত হয়ে নিজের অজান্তেই মুখ ফেরালে তাদের দিকে। গানের সুরে যে অপরূপ একটা কিছু ছিল তাই যেন এবার রূপ ধরে চোখের কাছে ধরা দিল। মেয়েদের মধ্যে রূপ ছিল এবং একটি শুভ্র সুন্দর পরিচ্ছন্নতা ছিল।

দলের মধ্যে যিনি বয়স্কা, যাঁকে দেখবামাত্র সত্যর মা বলে চেনা যায় তিনি থমকে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে গেলেন। একেবারে সরাসরি তিনি বললেন—মন্মথ এসেছে সে তো আমরা জানি। সত্য সে খবর তো অনেকক্ষণ দিয়েছে। সত্যর ইচ্ছে ছিল ওকে ওপরে নিয়ে গিয়ে জল খাওয়ায়। আমি বললুম—না রে—ওর কাকা জটাধরবাবু কলকাতার বাবু হয়েছেন কিন্তু মন্মথর বাবা তো শুনেছি গুরুগিরি করেন—খুব গোঁড়া ব্রাহ্মণের ঘর ওদের। আমাদের হাতে জল খাবে—আমরা দেব—না বলতে পারবে না, তার দরকার নেই। তার থেকে নিচেই জল খাওয়া। আমাদের যদুবর ঠাকুরের হাতে দিয়ে জলখাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুই খাইয়ে ওপরে নিয়ে আয়।

সত্যর মায়ের কথায় বার্তায় পোশাকে পরিচ্ছদে ভাবে ভঙ্গিতে আশ্চর্য একটি প্রসন্ন স্বাচ্ছন্দতা রয়েছে যা মুহূর্তে মানুষকে আপনার করে নেয়। মন্মথ চেয়ার থেকে আগেই

উঠে দাঁড়িয়েছিল—কথা শুনতে শুনতেই সে চেয়ার সরিয়ে বেরিয়ে এসে দরজার গোড়ায় দাঁড়ানো সত্যর মায়ের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে। কালটা ঊনবিংশ শতাব্দীর নয়ের দশকে ঢুকছে তখন, তখনও পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম অন্তত হিন্দু বাড়িতে ওঠে নি।

সত্যর মা তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন—লেখাপড়ায় তুমি শুনেছি খুব ভালো ছেলে—আশীর্বাদ করি আরও ভালো হও। খুব বিদ্বান হও।

জ্যোতিপ্রসাদ বললেন—তা' ও হবে।

মন্মথ তখন সত্যর মায়ের পশ্চাদ্বর্তিনী মেয়ে তিনজনের দিকে তাকিয়ে বিব্রত হয়ে ভাবছিল—সত্যর মাকে প্রণাম করলে, সে তো হল, এখন এদের কি কি করবে!

সম্মুখে যে মেয়েটি ছিল সে মেয়েটি বয়সে সমবয়সী তো বটেই হয়তো বা বড়ই হবে একটু। অন্তত বড় হলে তার পক্ষে সুবিধে হয়—সে প্রণাম করে এই দায় থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। সত্যর মায়ের পাশ দিয়ে এক পা এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে বললে—আপনাকে প্রণাম করি?

—সে কি? ও মা। প্রণাম করবেন কি?—বলতে বলতে সে ভ্রূ কুঞ্চিত করে অপূর্ব ভঙ্গিতে তার দিকে তাকালে। সঙ্গে সঙ্গে পিছনের মেয়ে দুটি খুক্ খুক্ শব্দ করে হেসে উঠল। মন্মথ বললে—আপনি তো সত্যর দিদি!

খুব বুদ্ধি সহকারে বললে—হয়তো খুব অল্পদিনের ছোট—তবু দিদি তো!

ভ্রূভঙ্গি করে মেয়েটি বললে—সত্য তাই বলেছে বুঝি?

সত্যর দিকে সে একবার তাকিয়ে নিলে; তারপর বললে—না না। আমরা কেউ কারুর দাদা দিদি নই। এক বছরে এক মাসে এক সপ্তাহে জন্ম আমাদের। আজন্ম ওর সঙ্গে আমার মারামারি চুলোচুলি হয়ে আসছে। ও আমাকে বলে মলি আমি ওকে বলি 'স্যাটা'।

মুখ বেঁকিয়ে সত্যকেই একটু ব্যঙ্গ করে বললে—মিস্টার স্যাটা বনারজী!

মন্মথর কানে এই মলি স্যাটা শব্দগুলোর মধ্যে একটা শহুরে ঢঙের আমেজ জাগিয়ে তুলল। এর উপর মনে মনে একটা গোপন রুচি আছে। কিন্তু লজ্জাও করে ভয়ও করে। লজ্জা করে ঠিকমতো হবে না; আর ভয় হয়—খুড়োমশায় খুড়ীমা চটে যাবেন। বেশী ভয় রাধাশ্যামকে—সে হয়তো তার বাবাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেবে।

মালতী নিজের কথার জের টেনে বললে—আপনিও আমাকে মলি বলবেন।

কানের পাশ দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল মন্মথর—বেশ অনুভব করলে মুখখনা রাঙা হয়ে উঠছে তার; সে বলে উঠল—অত্যন্ত বিব্রত লোকের মতোই বলে উঠল—না—না—না—। ছি—।

ছি যে কেন কিসের জন্য তা সে জানে না—কথাটা আপনি বেরিয়ে এলো—এবং ওই ছি কথাটি শুনে জ্যোতিপ্রসাদবাবু থেকে সত্যর সব বোনেরাই পর্যন্ত হেসে উঠল।

সত্যর মা সবিস্ময়ে বললেন—ছি কেন? একবয়সী ভাই বোন—কেউ কারুর দাদা না দিদি না। বন্ধু আর বান্ধবী। প্রণাম না, পরস্পরকে নমস্কার করবে। এতে ছি কেন? তিনি গম্ভীর হয়ে গেছেন তখন।

জ্যোতিপ্রসাদ তখনও হাসছিলেন। মুচকে মুচকে হাসছিলেন। তিনি মন্মথর সমস্যাটা যে কি তা বুঝেছিলেন। মন্মথ মলির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় মেলামেশা করবার জন্য একটা সম্পর্ক পাতাতে চাচ্ছে। এদেশে এতকাল পর্যন্ত মেয়েদের সঙ্গে পুরুষদের মাত্র দুটো সম্পর্ক চলিত আছে; সমাজের স্যাংশন আছে। মা আর দিদি। হয় মা নয় দিদি বলে কথা বল বাস নিরাপদ হয়ে গেল। অন্তত তাই ধারণা। এবং প্রণামের ওই একটিই ভঙ্গি,

প্রণাম। জ্যোতিপ্রসাদবাবুর জ্ঞাতিখুড়ো দেশে বেশ সম্পন্ন গৃহস্থের কর্তা। তিনি তৃতীয়পক্ষে বিয়ে করেছিলেন—বধূটি অর্থাৎ জ্যোতিপ্রসাদবাবুর খুড়ীমা বয়সে অনেক ছোট—অন্তত দশ বারো বছরের ছোট—তিনি স্বচ্ছন্দভাবে দুটি পা বাড়িয়ে প্রণাম নেন জ্যোতিপ্রসাদের এবং মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেন। ইংরিজী-শিক্ষিত সমাজে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে এবং ব্রাহ্মসমাজে চলিত নমস্কার প্রথা এবং বন্ধু-বান্ধবী সম্পর্ক মানুষকে যে কতটা বিব্রত করে তা' তিনি জানেন। এসব এখনও প্রণাম আশীর্বাদের মতো সহজ হয়ে ওঠে নি। সাহেবী ফ্যাশনের জামা পোশাকের ছাটকাট নিয়ে তৈরি করা বডিস ব্লাউজ কোট শার্ট ফ্রক জাতীয় পোশাকের মতো এখনও সমাজের বাছা বাছা বাড়িতেই চলে, তার বাইরে চলে না।

সত্যর মায়ের কথার জবাব খুঁজে পাচ্ছিল না মন্মথ। অথচ মেনেও যেন নিতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল জিভে আটকে যাবে মলি নামটা।

মালতী বললে, বোধ করি ধরেই নিলে যে জেঠীমার কথাগুলি একেবারে স্থিরনিশ্চিত হয়ে গেছে, বললে—আমি কিন্তু আপনাকে মনু বলব না। সত্য আপনাকে মনু বলে। 'মনু' নামটা আমার কাছে যেন 'খোকন খোকন' নামের মতো মনে হয়। আমি আপনাকে মন্মথ বলব।

সত্য এবার বললে—মনুও তোকে মলি বলতে পারবে না। সে তুই মনু বললেও পারবে না।

—বেশ তো তাহলে মিস ব্যানার্জী বলবেন—

সত্য ঘাড় নেড়ে নেড়ে বললে—তা' ও বলতে পারবে না।

—কেন পারবেন না! নিশ্চয় পারবেন। পারবেন না মন্মথবাবু?

মন্মথ তার পায়ের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কোনো উত্তর দিতে পারলে না। অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছে সে। যেন নদীর ঘাটে স্নান করতে নেমে হঠাৎ বুকজল থেকে পা বাড়িয়েই কোনো অজানা গর্তে অথৈ জলে পড়ে ডুবতে বসেছে।

সত্য বললে—বলছি ও তোকে মিস ব্যানার্জী বলে ডাকতে পারে না।

—কেন?

—তোমাদের মতো শহুরে নয়। পাড়াগাঁয়ের ছেলে—ওর বাবা খুব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ—

—আমরা কি অনিষ্ঠাবান?

—শহুরে তো বটে! সায়েবী ফ্যাশন—

—শহুরে? সায়েবী ফ্যাশন? ওরে বাপ্‌। পাড়াগাঁয়ের ছেলেটি কলকাতায় এসে শহরের ছেলে তোকে হারিয়ে দিলে, ওই সিংহীবাড়ির ছেলেকে হারিয়ে দিলে। দিলে দিলে ইংরিজীতেও হারিয়ে দিলে। ইংরিজীতে রমেশ গোস্বামীর প্রিয় ছাত্র—সে আবার পাড়াগাঁয়ের ছেলে?

জ্যোতিপ্রসাদবাবু কিছুটা কৌতুকভরেই এদের ঝগড়ার ঢঙটা দেখছিলেন। এর মধ্যেই তিনি খানিকটা নিজের চিন্তার যেন প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছিলেন। এই কিছুক্ষণ আগে শাস্ত্রী অর্থাৎ শিবনাথ শাস্ত্রী মশায়ের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ নিয়ে আলোচনা করছিলেন—তার মধ্যে মূল কথাটা ছিল রাজনারায়ণ বসুর কথা। কথাটা অনেকদিন থেকে ব্রাহ্মসমাজে মধ্যে মধ্যে আলোড়ন তোলে। রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শিবচন্দ্র দেবকে লিখেছিলেন—"Hindoo Society must be moved in a Hindoo way." লিখেছিলেন—"It is evident that, Brahmo movement is a superficial one, and has not penetrated into the very depths of Hindoo Society." অল্পক্ষণ আগেই সেই আলোচনা করেছেন তিনি। সেই সমস্যাই তিনি দেখতে পেলেন তাঁরই বাড়িতে

তাঁর পরিবারের ছেলেমেয়ের সঙ্গে হিন্দুসমাজের একটি উজ্জ্বল ছেলের মেলামেশার বাস্তব সমস্যার মধ্যে।

জ্যোতিপ্রসাদ মন্মথর পিঠে হাত রাখলেন নিজের। মন্মথ একবার মুখ তুলে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার মুখ নামালে। তার বুকের মধ্যে যেন উদ্বেগের মতো অস্বস্তিকর একটা কিছু নিরন্তর ঘূর্ণিপাকের মতো পাক খাচ্ছিল।

জ্যোতিপ্রসাদ বললেন—দাঁড়াও আমি একটা মীমাংসা করে দি।

মন্মথ মুখ তুললে।

জ্যোতিপ্রসাদ তাকে বললেন—তোমাদের গ্রামে তোমাদের পাড়ায় তা' ছাড়া তোমাদের জ্ঞাতিদের বাড়িতে তোমার বয়সী বোনেরা নেই? জ্ঞাতিবোন না হোক পড়শী বাড়ির মেয়ে, সকলেই তো বয়সে বড় নয়; দু'দশ দিনের কি দু' এক মাসের ছোট। তাদের কি বলে ডাক? নাম ধরে ডাক? নিজের বাড়ির হলে না-হয় নাম ধরে ডাকা হয়। কিন্তু পরের বাড়ির পড়শীর বাড়ির—এদের? নাম ধরে ডাক?

মন্মথ বললে—না।

—তাহলে কি বলে ডাক?

মন্মথর মনে পড়ে গেল পাশের বাড়ির মেয়ে টুনুকে—সরকারদের মেয়ে টুনু; মনে পড়ে গেল গোপালীকে, তার থেকে দশ দিনের ছোট, কুমুদীশ চাটুজ্জের মেয়ে, পাড়ার ঘোষেদের মেয়ে পুঁটলীকে মনে পড়ল। মনে পড়েও কিন্তু উৎসাহিত হল না। কারণ সেখানে যা বলে তা' যেন খুব গ্রাম্য বলে তার নিজেরই মনে হচ্ছে। তবুও সত্যিই বললে;—বোনটি বলি। সরকারদের টুনু দু'মাসের ছোট—আমি বলতাম টুনু বোনটি। গোপালী ছিল দশ দিনের ছোট—তাকেও বলতাম গুবুলি বোনটি; ঘোষেদের মেয়ে পুঁটলী আমার থেকে দু'মাসের ছোট—তাকেও বলতাম পুঁটলী বোনটি।

বলতে বলতে কিছুটা যেন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে বললে—জানেন আমাদের পাড়ার হিমাংশু মুখুজ্জে আমার দাদা হতেন। বয়সে কিন্তু অনেক বড়। তাঁর মেয়ে প্রভা—সে আমার থেকে এক বছরের বড়—তাকে ডাকতাম ভাইঝি বলে। শুধু আমি না সবাই তাকে ভাইঝি বলে ডাকত।

—মেয়েরা? প্রশ্ন করলে মালতী—মেয়েরা এক্ষেত্রে ছেলেদের কি বলে?

মন্মথ বললে—তারা দাদা বলত। মনু দাদা। প্রভা বলত মনু কাকা।

—আপনার থেকে দশ পনের এক কি মাস দু'মাসের বড় মেয়েরা কি বলে ডাকত? মনু ভাই বলে?

হেসে মনু বললে—হ্যাঁ। তারপর কৈফিয়ত হিসেবেই বোধ করি বললে—আমাদের ওখানে কি একটি সুন্দর কথা আছে জানেন? বলে—গ্রাম সুবাদে মুটে মিনসে কাকা হয়। সবারই সঙ্গে সবারই সম্পর্ক আছে। আমার বাবার সম্পর্কে একজন ভাইপো ছিলেন বাবার থেকে পঁচিশ বছরের বড়। বাবা তাঁকেও নাম ধরে ডাকতেন না—তিনিও বাবাকে নাম ধরে ডাকতেন না। বাবা তাঁকে বলতেন…'অনি ভাইপো'। নাম তাঁর অন্নদাচরণ; আর তিনি বাবাকে ডাকতেন 'বাপজান' বলে। আমরা বলতাম তাঁকে বড়দা। তিনি আমাকে বলতেন—ভাইটি।

সত্যর মা বললেন—বা! বেশ তো! ভারী সুন্দর তো। এ তো বেশ ভালো প্রথা!

জ্যোতিপ্রসাদবাবুর মন চলে গিয়েছিল তাঁর ছেলেবেলায়। হঠাৎ মনে পড়ে গেছে বুলাকী চাচাকে। বুলাকী মেথর; তাঁর মামার বাড়িতে থাকত। তাঁরও পৈত্রিক বাসভূমি হুগলী জেলায়। মামার বাড়ি বাঁশবেড়ের কাছে। ছেলেবেলার একটা ছড়া মনে

পড়ছে—"বংশবাটীতে কাংস পাত্রে যেবা হংস মাংস খায় ; সেজন কংসের মতো ধ্বংস হইবে সংশয় ইথে নাই ।" "গ্রাম সংবাদে মেথর মিনষে মামা" বলে কথাটা চলিত ছিল। যারা ময়লা ফেলার কাজ করে তাদের মধ্যে বুড়ো বুলাকীকে বুলাকী চাচা বলতেন । বুলাকী চাচার দুর্ভোগ দুর্ভাগ্য তাও মনে পড়ল। বুলাকীর বাড়ি ছিল গ্রামের সেই শেষ প্রান্তে। মাসে অন্তত দশ বারো দিন মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকত। এবং যতক্ষণ খাড়া থাকত মদ খেয়ে ততক্ষণ কিল চড় লাথি তাকে খেতে হত এবং সে তা' খেতো। এবং এই চাচা ডাকের জন্য এসব লাঞ্ছনা গৌরব হয়ে যেত । সে পথ দিয়ে চলে যেত—কেউ যদি প্রশ্ন করত—কে যাচ্ছে ? তবে ময়লার পাত্র মাথায় ধরেই বলত—বুলাকী চাচা বাবুজী !

তাঁর এই আকস্মিক স্তব্ধতা আশ্চর্যভাবে গোটা ঠাঁইটাকেই একটা প্রভাব বিস্তার করে স্তব্ধ করে দিলে । এ ওর মুখের দিকে তাকালে কিন্তু সকলের মনেই যেন একটা নীরব নিঃশব্দ জিজ্ঞাসা উদ্যত হয়ে উঠেছে। এমন কি সত্যর মাও স্বামীর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন । মালতীর মনে হল জ্যাঠামশাই বোধহয় জ্যাঠাইমার অকুণ্ঠ প্রশংসা করা ওই যে পাড়াগেঁয়ে প্রবাদ বাক্য, ওই বাক্যটির মাধুর্যে বিগলিত হয়ে গেছেন। বোধ করি ওই সূত্র অনুসারে তাকে এই পাড়াগেঁয়ে ছেলেটিকে 'মনু ভাই' বলেই ডাকতে হবে। 'মনু ভাই' ধ্বনিটার মধ্যেই যেন একটা গ্রাম্যতা আছে। তার কানে লাগে। তাদের বাড়িতে বছর তিনেক আগে একটি পাড়াগেঁয়ে বুড়ী ঝি এসেছিল। তার মালতী নামটিকে সে তার গ্রামীণ সমাদর ও স্নেহ মিশিয়ে 'মালু' করে তুলতে চেষ্টা করেছিল । বারণ করা হলেও সে তা শোনে নি—উলটে তর্ক করে বলেছিল—'ক্যানে মা, মলির চেঁয়ে মালু কত মিষ্টি বল দিকিনি ! দ্যাশে আমাদের নারকেলের খোলাকে মালাই বলে, বড়গুলান মালুই ছোটগুলানকে 'মালু' বলি । ছোট্ট পারা নারকেলের মালা ঘষে ঘষে সোন্দোর ত্যালের বাটি হয়।—চাকরি তার ওই তর্কেই গিয়েছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে তাকে যদি 'মনু ভাই' বলতে হয় তবে সে বড় বিশ্রী হবে, বড় বিশ্রী হবে ।

জ্যোতিপ্রসাদবাবু স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন।

তাঁর কপালে কয়েক সারি রেখা দাঁড়িয়ে উঠেছিল, সেগুলি মসৃণ হয়ে এলো, তিনি গম্ভীরভাবে বললেন—আমার বিবেচনায় মালতী মন্মথকে মন্মথবাবু বলবে আর মন্মথ মালতীকে মালতী দেবী বলে ডাকবে। সত্যর কথাটা ঠিক ! মিস ব্যানার্জী ডাকটা বড্ড বিলিতী বিলিতী লাগে ; হয়তো বা ফিরিঙ্গী ফিরিঙ্গী মনে হয়। সংস্কৃতে আমরা মেয়েদের 'দেবি' বলেই সম্বোধন করতাম ।•

মন্মথ এক মুহূর্তে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। সংস্কৃত সাহিত্য রসাস্বাদনে সে অভ্যস্ত । ভারী ভালো লাগল তার জ্যোতিপ্রসাদবাবুর কথা । মনে মনে সে বার বার উচ্চারণ করে দেখলে—মালতী দেবী, মালতী দেবী, মালতী দেবী ! "মালতী দেবী আছেন ?" "নমস্কার মালতী দেবী।" আশ্চর্য হল সে—এক মুহূর্তে নমস্কার এসে গেছে। মালতী দিদির টানে প্রণাম আসে, মালতী বোনটি বললে আশীর্বাদ আসে—ঠিক তেমনিভাবেই নমস্কারটা চলে এলো মালতী দেবী ডাকটার পিছন ধরে ধরে, বেশ সুন্দর স্বচ্ছন্দ গতিতে।

ঠিক এই সময় বাইরের দিক থেকে এলো জ্যোতিপ্রসাদবাবুর ওকালতি দপ্তরের একজন প্রবীণ কর্মচারী ; একটু তফাত বজায় রেখে নাকের ডগার উপর টেনে নামিয়ে-আনা চশমাটা এবং ভুরুর মধ্যেকার ফাঁক দিয়ে তেরচাভাবে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এরা ভগ্নদূতের মতো আসে—চুপচাপ দাঁড়ায়, প্রশ্ন করতে হয়—কি হে ? অথবা—কিছু বলছ ? কি—কি খবর ? তখন এরা আধখানা দেহ নুইয়ে নমস্কার করে বলবে—আজ্ঞে…।

লোকটি বললে—আজ্ঞে মধু রায় লেনের জটাধরবাবুর বাড়ি থেকে একটি ছেলে আর

একটি চাকর এসেছে মানে—আমাদের সত্যবাবুর সঙ্গে পড়েন কে মন্মথবাবু—তাঁর খোঁজ করছেন।

—খোঁজ করছেন? কেন? কি হল? কি বলছেন তাঁরা?

—হ্যাঁ। মানে ইস্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় পার হয়ে গেছে, অথচ ফেরেন নি—কোথায় গেলেন?

—ও। আচ্ছা! তাইতো। দেরি তো হয়েছেই বটে! এ তো সন্ধ্যে হয়ে এসেছে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ছটা বেজে গেছে!

জ্যোতিপ্রসাদবাবু মন্মথকে বললেন—তাই তো মন্মথ, অন্যায় তো নিশ্চয় হয়েছে। তাঁরা যখন উৎকণ্ঠিত হয়েছেন তখন অন্যায় স্বীকার করতেই হবে।

সত্যর মা জিজ্ঞাসা করলেন—এ তো তোমার খুড়োমশায়ের বাড়ি? বাড়িতে তো তোমার খুড়ীমা আছেন। তিনি খুব ভাবেন বুঝি?

মন্মথ খানিকটা লজ্জিত হয়ে পড়েছিল। একটা বয়স আছে যখন তার জন্য কেউ বেশী ভাবলে সে লজ্জা না-পেয়ে পারে না। সে লজ্জায় রাগ হয়। মন্মথর রাগটা বেশীই হল। কারণ সে ঠিক ধরেছে যে, এটা সবটাই রাধাশ্যামের কীর্তি। তার খুড়ীমা তার প্রতি নির্দয়া নন সদয়াই বটেন—কিন্তু এ সোনাতে যে খাদ আট আনারও বেশী তাতে তার কোনো সংশয় নেই। কাকার ভালবাসায় আট আনার বেশী খাদ না-হলেও সেও ষোল আনা খাঁটি সোনা নয়। ধীরে ধীরে এই ক'বছরে সে এটা বুঝতে পেরেছে। খুড়ীমার এবং খুড়োর একটা ধারণা ছিল যে, গৃহদেবতা জনার্দনের এবং গোবিন্দজীর সেবার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে আসার জন্যই তাঁদের সন্তান হচ্ছে না। শুধু দেবতার রোষ নয় দাদার মনোবেদনার কথাটিকেও তাঁরা উপেক্ষা করতে পারেন নি। খুড়ী কৃষ্ণভামিনীর সেই কবচ চাওয়ার কথাও মন্মথ ভুলে যায় নি। মন্মথকে স্নেহ করে তাকে পড়িয়ে শুনিয়ে মানুষ করে দিলে দেবতাও তুষ্ট হবেন দাদাও তুষ্ট হবেন এইটেই তাঁদের ধারণা। তাছাড়া অবশ্য নতুন বড়লোক জটাধরবাবু নিন্দা প্রশংসা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। কেউ তাঁকে হঠাৎ বড়লোক বললে রাগ হয় তাঁর। ভাইপো, ছেলে হিসেবে শুধু বুদ্ধিমান নয় অসাধারণ মেধাবী, তা' নিয়ে তাঁর গৌরব আছে। এর বেশী কিছু নয়। দিনে দিনে দিন তো কম দিন হল না। প্রায় চার বছরের কাছাকাছি। এই চার বছরে কাকা জটাধর ভট্টাচার্য আরও বড়লোক হয়েছেন। কলকাতার একটা গণ্যমান্য ধনী মহলের বিশিষ্ট জন বলে পরিচিতি হয়েছে তাঁর। জে. ভটাচারিয়া অ্যান্ড কোং মস্ত একটা কোম্পানি। কৃষ্ণভামিনী মোটা হয়েছেন, অনেক গয়না হয়েছে, ভারী ভারী গয়না। থিয়েটার, বারোয়ারি পুজো, জেলেপাড়া সং প্রভৃতি নিয়ে অনেক হৈহৈ সমারোহ করেন। তার সঙ্গে হিন্দুসমাজেও একটি আসন তাঁর হয়েছে। তাঁরা আপনার নিয়েই ব্যস্ত। মন্মথকে নিয়ে কথা উঠলে গৌরব করেন। কৃষ্ণভামিনী তার খাবারদাবার বিষয়ে খুব সচেতন—জামা কাপড় সম্পর্কেও বটেন। কিন্তু এ সবই ক্রমে ক্রমে পুরনো হয়ে কুমোরটুলীর তৈরি রঙচটা কাঁচা মাটির পুতুল ঠাকুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিত্য খানিকটা করে সিঁদুর লেপেও তার ভিতরের মাটির অস্তিত্বকে গোপন রাখা যায় না।

খুড়ীমা বা খুড়োমশায় ভাবলে ভাবেন। ভাবতে বললে ভাবতে বসেন। কিন্তু ভাবনার ব্যাপারটাকে উচিত কর্ম বলে মনে না করিয়ে দিলে ভাবতে বসেন না। এই সন্ধ্যেকালটা খুড়ীর সাজগোজের সময়। খুড়োর তো এখন কাজের অন্ত নেই। সারাদিনের কাজের খতিয়ান করা, পরের দিনের বরাত করা, তারপর স্নানটান সেরে বাইরে যাওয়াই হল তাঁর একেবারে বাঁধা কার্যসূচী। সপ্তাহে শনি রবি থিয়েটার বাগানবাড়ি—সোম শুক্র বন্ধুবাড়ি যাওয়া—মঙ্গলবার কালীঘাট—বুধবার বৃহস্পতিবার নিজের বাড়ি। বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীপুজো

—বুধবারে হরেকরকমব্যাপার, সে হিন্দুধর্ম নিয়ে আলোচনা থেকে ওস্তাদীগানের জলসা পর্যন্ত সে আসরে বাদ কিছুই পড়ে না। কোনো কোনো বুধবারে নাম করা করা সমিতির বৈঠক বসে।

এ সবের মধ্যে মন্মথ থাকে, কাজকর্মও করে। ফাইফরমাশও খাটে। মধ্যে মধ্যে জটাধর তাকে সিল্কের জামা শান্তিপুরে ধুতি পরিয়ে ওই সভার সভ্যদের সামনে নিয়ে গিয়ে বলেন—আমার ভাইপো!

এও কপট নয়। কিন্তু ওই মাটির পুতুল ঠাকুরের মতো অকপট মাটির ঠাকুর। কিছুদিনেই রঙ চটে নোনা ধরে।

সেই খুড়ীমা খুড়োমশায় তাকে খুঁজতে পাঠিয়েছেন? মনে কিছুতেই হয় না। খুড়ীমা খুড়োমশায়কে ব্যাপারটা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন করে তুলে লোক পাঠাতে বাধ্য করেছে—করেছে ওই রাধাশ্যাম।

রাধাশ্যামের ক'দিন হল জ্বর হয়েছে। জ্বর বেশী নয়—কম কমই বটে। কিন্তু ডাক্তারেরা বলেন—এই কম কম জ্বর এবং একজ্বরী ধরনই হল শহরের একটা কঠিন ব্যাধির ইঙ্গিত। রাধাশ্যাম ইস্কুলে আসছে না সেই জন্যে। কিন্তু বাড়িতে সে চারটে বাজলেই এসে বসে থাকে তার জন্যে। সে বাড়ি পৌঁছুলেই রাধাশ্যাম নিচের বসবার ঘর থেকে তার সঙ্গ ধরে এবং তার থাকবার ঘর থেকে ছাদ হয়ে নিচে পর্যন্ত ফিরে এসে স্কুলের খবরাখবর অর্থাৎ স্কুলে কি ঘটল তার কথা শোনে। তারপর তাকে নিয়ে যায় তাদের বাড়ি। পণ্ডিতমশায়ের কাছে সংস্কৃত এখনও পড়ছে মন্মথ। এখন পড়ে কাব্য। আজ তার ফিরতে দেরি দেখে রাধাশ্যাম ঠিক ধরেছে যে সে সত্যর সঙ্গে গেছে।

সত্যকে তার দারুণ ভয়। তার থেকেও বেশী। সত্যকে সে ভয় করে, তাকে একেবারে দেখতে পারে না। তার উপর বিভূতির ইস্কুল ছাড়ার পর থেকে রাধাশ্যামের ভয় বেড়েছে।

এই যে পাঁচ ছ'দিন সে বাড়িতে বসে আছে এ ক'দিন স্কুলের পর বাড়ি ফিরলেই রাধাশ্যাম তাকে জিজ্ঞাসা করেছে সত্যর কথা।

—তোর বন্ধু কেমন আছে? সত্য?

আজকাল রাধাশ্যাম এবং তার মধ্যে সম্বোধনটা তুমি তোমার থেকে তুই তোর ডাকে এসে পৌঁছেছে। একদিন প্রশ্ন করেছিল—তুই আমাকে বেশী ভালবাসিস, সত্য কথা বলবি। কালীঘাটের দিব্যি মিথ্যে বলবি না।

খুব চটেছিল মন্মথ। জিজ্ঞাসা করেছিল—তুই কি মেয়েছেলে না কি রে?

—কেন?

—কেন কি? বুঝতে পারছিস না কথাগুলো তোর মেয়েদের মতো হচ্ছে? তুমি ওকে ভালবাস না আমাকে ভালবাস? আমার মাথা খাও—সত্যি বলবে।

কেঁদে ফেলেছিল রাধাশ্যাম। কথাগুলো অবশ্য খুবই রূঢ় হয়েছিল। বলবার সময়েই সে কথা তার মনে হয়েছিল কিন্তু আত্মসংবরণ সে করতে পারে নি। তার কারণ ছিল। সে কারণের কথা মনে হলেই তার বুক ধড়ফড় করে ওঠে। সাধারণত রাধাশ্যামের সঙ্গে একসঙ্গে তার উপদেশামৃত পান করতে বাড়ি ফিরে এসে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় সে একান্তে নিজের সঙ্গে থাকে, তখন সে সারাদিনের কথা ভাবে, কোনোদিন জীবনের কথা ভাবে, এরই ফাঁকে সে একবার ছাদে ঘুরে আসে। সেই মেয়ে দুটিকেই খুঁজতে যায় কিন্তু বিচিত্র কথা যে, তাদের দেখা গেলেই সে প্রায় ছুটে পালিয়ে আসে। যেদিন তারা আগে থেকেই ছাদে থাকে সেদিন দরজা পার হয়ে ছাদে ঢুকেই ওদের দেখবামাত্র পালিয়ে আসার মতো ভঙ্গিতে পিছন ফিরে দ্রুত চলে আসে। এটা অন্য কেউ জানে না কিন্তু মেয়ে দুটি

ঠিক জানে। তারা জানে যে এই কিশোর ছেলেটি তাদের মোহের টানে পড়েছে ; চার-খাওয়া মাছের মতো ঠিক আসবে ছাদে তাদের দেখতে। এবং লুকিয়ে লুকিয়ে দেখবে—তারপর চোখে পড়লেই লজ্জায় পালাবে। এ তাদের কাছে পরম কৌতুক। ওর পালানো দেখে ওরা হেসে গড়িয়ে পড়ে। বিভূতি তাকে ছবি দেখিয়েছিল। এ ছবি নয়। এ সত্যকারের রক্তমাংসের যুবতী নারী। সে একা আসে এ সময়টা একলা থাকে। মেয়েগুলি অবশ্য সব দিন আসে না। যেদিন আসে সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত এই খেলা চলে। সন্ধ্যা হতেই নিচে খুড়ীমার লক্ষ্মীর ঘরে শাঁখ বেজে ওঠে। আকাশে পশ্চিম দিকে গঙ্গার ওপারে লালচে রঙ ধরে। বকেরা উড়ে চলে যায় দল বেঁধে, নিচে ঠিক এই সময় রাধাশ্যাম তাকে ডাকতে আসে—মনু ! মন্মথ তার আগেই নেমে পড়ে। এই যে অপরাহ্নের খেলাটুকু এ তাকে প্রায় নেশার আকর্ষণে আকৃষ্ট করে তুলেছিল। এবং এটুকু ছিল তার একান্তভাবে গোপন কল্পলোক। এই ক'দিন অর্থাৎ যে-ক'দিন রাধাশ্যাম জ্বর হয়ে ইস্কুল যাচ্ছে না, বাড়িতে থাকছে সে-কদিন তার এই গোপন কল্পলোকটিতেও সে অবাঞ্ছিতভাবে হানা দিয়ে তছনচ করে দিয়েছে। তার জ্বরের দ্বিতীয় দিন ছিল শনিবার। সে সকালে সকালে গিয়ে ছাদে উঠেছিল—তখন রাধাশ্যাম আসে নি। ভেবেছিল রাধাশ্যাম এসে যেই তার নাম ধরে ডাকবে অমনি ছুটে নেমে আসবে। কিন্তু অদ্ভুত রাধাশ্যাম—বাড়ি ঢুকেই সে ছাদে আছে শুনে তাকে না ডাক দিয়েই সটান উঠে এসেছে ছাদে। এবং চুপি চুপি নিঃশব্দে পিছনে দাঁড়িয়ে তার চোখ চেপে ধরেছে। তার সৌভাগ্য যে, তখনও মেয়ে দুটি ছাদে ওঠে নি। চোখ চেপে ধরায় চমকে উঠেছিল মন্মথ। বুঝতে বিলম্ব হয় নি কে চোখ চেপে ধরেছে কিন্তু তবু সে চমকে উঠেছিল, মনে হয়েছিল রাধাশ্যাম এমন গোপনে যখন ছাদে এসে চোখ চেপে ধরেছে তখন এ গোপন খেলার সন্ধান সে পেয়েছে। আপনার অজ্ঞাতসারেই একই সঙ্গে দুরন্ত রাগ আর দুরন্ত ভয়ে খুব জোরে চিৎকার করে উঠেছিল—কে—রে ?

রাধাশ্যাম হেসে উঠতেই চেয়েছিল কিন্তু মন্মথর ধমকের উগ্রতায় সেও চমকে উঠে চোখ ছেড়ে দিয়ে বলেছিল—এ্যাঁ ? কি হল ?

মন্মথ বলেছিল—তুমি অত্যন্ত অসভ্য।

দ্বিতীয়বার চমকে উঠে রাধাশ্যাম বলেছিল—এ্যাঁ ? আমি অসভ্য ?

—অত্য—ন্ত অসভ্য। সাড়া না-দিয়ে না-ডেকে তুমি আসবে কেন ?

এবার বিস্ময়স্তম্ভিত হয়ে রাধাশ্যাম বলেছিল—সাড়া না-দিয়ে না-ডেকে আসব কেন ?

—হ্যাঁ। কেন আসবে বল ?

অবাক হয়ে গিয়ে হতবাক হয়ে গিছল রাধাশ্যাম। মন্মথ তার হাত ধরে টেনে তাকে সঙ্গে নিয়ে নিচে নেমে এসেছিল। তাকে ফেলে চলে আসতে সাহস হয় নি, কারণ তাদের আসবার সময় হয়তো হয়ে গেছে, যে কোনো সময় আসবে এবং তাদের দেখলেই রাধাশ্যাম আর বাকী রাখবে না।

তাকে নিয়ে তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গেল। নিরন্তর একটি পাহারাদারের চোখের দৃষ্টির খোঁচার সামনে এতটুকু নড়াচড়া করতে গেলেও দৃষ্টির খোঁচা দুটো যেন কাঁটা ফোটায়।

আজও এ কাজ তারই। সে তাদের বাড়িতে এসে বসেছিল তার জন্যে, হয়তো চারটে থেকেই বসে আছে, সাড়ে চারটে পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা ছটা বাজল তবু মন্মথ এলো না দেখে সে ঠিক ধরেছে যে মন্মথ সত্যর পিছন ধরেছে।

মন্মথ সম্পর্কে রাধাশ্যামের ভয় অনেক। কলকাতার রাস্তায় ভয়। গাড়ি ঘোড়া, পালকি, গরুরগাড়ি, ঠেলাগাড়ি, ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ি, পথে লোকজনের ভিড়, হুল্লোড়,

রাহাজানি, পকেটমারি, গুণ্ডাবাজি, কলকাতায় দুর্ঘটনা ঘটে অনিবার্যভাবে, একটু অসাবধান হলেই বাস আর রক্ষা নাই, একটা কিছু ঘটে যাবে।

এ ছাড়াও আরও আছে। সেই আরও যা কিছু তার মধ্যেই আছে সত্যর আকর্ষণ। স্কুল থেকে ফিরবার সময় গাড়ি ঘোড়া চোর জোচ্চোর গাঁটকাটাদের হাতে পড়ার বিপদের চেয়ে মন্মথর বিপদ সত্যর কাছে বেশী বলেই রাধাশ্যাম মনে করে।

রাহ্ম হয়ে গেলেই বাস্—সর্বনাশ হয়ে যাবে। অন্ততঃ রাধাশ্যামের কাছে তাই বটে। আসতে দেরি হওয়া দেখে সঙ্গে সঙ্গেই সে জটাধরকে বলেছে—মনু এখনও আসে নি!

জটাধরবাবু আজ বড়বাজারে মাথা ঘষা গলির ওধারে গাঙুলীদের বাড়িতে যাবেন। গাঙুলীবাবুরা হাইকোর্টের কাজকর্ম দেখে দেন। ও'রাই তাঁর সলিসিটর। আইনের কাজ আছে—তাছাড়া বড়বাজার এলাকায় কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি বড় রাস্তা বের করবে হাওড়া পুলের মুখ থেকে; নতুন চওড়া রাস্তা হবে; আশপাশ এলাকার ঘিঞ্জি বসতি ময়লা কাঁচা পথঘাট-গুলো একেবারে বদলে পালটে ঝকঝকে চকচকে শহর হয়ে উঠবে; এই এলাকায় এরই মধ্যে জমির দর উঠতে শুরু করেছে। মাড়োয়ার রাজস্থান থেকে ওদেশী ব্যবসাদারেরা জমি কিনছে। বড়বাজারের যাঁরা বনেদী ধনী শেঠ বসাক এ'রাই হলেন জমির মালিক। দর চড়ছে দেখে কিছু কিছু জমি ছাড়তে শুরু করেছেন। এ'দের সব সুতোর ব্যবসা। মাড়োয়ারীরা বিক্রি করে কাপড়। এখানেই সায়েবী হৌসের মুৎসুদ্দী রতন সরকার মশায়ের অনেকটা জমি আছে। তাঁর বাড়ি রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীটে। মস্ত বাড়ি। তাঁর নামেই রাস্তাটার পর্যন্ত নাম হয়েছে। রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীটের জমি ছাড়াও শোভারাম বসাক স্ট্রীটে জমি আছে রতনবাবুর। এই জমি খানিকটা কিনতে চান জটাধরবাবু। ওখান থেকে ফিরবার পথে যাবেন পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটে রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের কাছে। কয়েকটা বেশ পুরনো আমলের মৃদঙ্গ অর্থাৎ খোল করতাল আর গুপীযন্ত্র এবং কয়েকটা একতারা সংগ্রহ করেছেন জটাধরবাবু। তাঁর যে-গোমস্তা এখন গোবিন্দপুরে রয়েছে, যে এখানকার সম্পত্তি ইত্যাদি দেখাশুনা ও পরিচালনা করে এবং দেবসেবা অর্থাৎ জটাধরের প্রতিষ্ঠিত কালীর বেদীতে পুজো চালায়, তার মারফত এসবগুলি সংগ্রহ করেছেন। সংগ্রহ করেছেন এই অসাধারণ মানুষটির জন্য। রাজা বাহাদুরের নাম কে না জানে? সারা কলকাতায় তিনি একদিকের এক দিকপাল। ধনী অনেক আছে গুণীও আছে। এমন ধনী ও গুণী একসঙ্গে কলকাতায় যা আছে তা ঠাকুর বাড়িতেই আছে। রাজা বাহাদুর কিছুকাল আগে বেঙ্গল অ্যাকাডেমী অব মিউজিক বলে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই সমিতিতে সারা ভারতের বড় বড় গাইয়ে ওস্তাদেরা আসেন—গানের আসর বসে। তেমনি একটা আসরে একদিন এসেছিলেন জটাধরবাবু। রাজা বাহাদুরের নজরে পড়েছিলেন খোল বাজিয়ে। জটাধর খোল বাজাতে শিখেছিলেন বাল্যবয়সে। জন্মগতভাবে গানে বাজনায় একটা বোধ তাঁর ছিল। ছেলেবেলাতে তাঁদের গোবিন্দ প্রভুর সামনে সকাল সন্ধ্যে আরতির সঙ্গে খোল বাজাতে হত। সন্ধ্যেবেলা আরতির পর সংকীর্তন হত সেখানেও খোল বাজত। ভটচাজ বাড়ির পুজো, করতেন নিজেরা পুজো, খোল করতাল বাজানোটা প্রতিবেশীদের উপর একটা অলিখিত হুকুমনামার মতো নির্দেশ ছিল। পড়শীরা এসে বাজিয়ে দিত। জটাধর ছেলেবেলা থেকেই জন্মগত তালমান-বোধের আকর্ষণে করতাল এবং খোল নিয়ে বাজাতে বসতেন। কিছুদিনের মধ্যেই পারঙ্গমও হয়ে উঠেছিলেন। সেদিন রাজা বাহাদুরের বাড়িতে এক কীর্তন-ওয়ালার সঙ্গে বাজিয়ে লোকটির বিরোধ হওয়ায় জটাধর বাজিয়েছিলেন এবং নিপুণভাবেই বাজিয়েছিলেন। রাজা বাহাদুর খুশী হয়ে আলাপ করেছিলেন। সেদিনের সেই সূত্রের সেই বন্ধনটি দিনে দিনে বিশেষ শক্ত এবং পোক্ত হয়েছে। জটাধর কলকাতার ধনী গুণীর

সমাজে প্রবেশের জন্য একজন অতিব্যগ্র মানুষ। সেই ব্যগ্রতায় গোবিন্দপুরে কর্মচারীকে লিখে এই সব বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহ করেছেন—রাজা বাহাদুরকে উপঢৌকন দিয়ে তাঁর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হতে চান।

এমনি সময়ে রাধাশ্যাম আজ জটাধরবাবুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। জটাধরবাবুকে বলে তার মেজাজটাকে খুব তাতিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল রাধাশ্যামের। সে কল্পনা করেছিল জটাধরবাবুর মাথায় আগুন জ্বলে যাবে এবং বাড়ির দারোয়ান মুচকুন্দ পাণ্ডেকে চিৎকার করে ডেকে বলবেন—আভি যাও এহি বাবুকে সাথ আউর উয়ো দাদাবাবুকো পাকড়কে লে আও হামারা পাশ। কিংবা বলবেন—কোচম্যান চলো পহেলে আমহার্স্ট স্ট্রীট!

আমহার্স্ট স্ট্রীটে সত্যদের ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁকবেন—মন্মথ!

না হল না। 'ম—ন্—ম্-থ।' এ ডাক শুনে মন্মথ বাড়ির ভিতরে চমকে উঠবে। বেরিয়ে এলে জটাধরবাবু হেঁচড়ে তাকে গাড়িতে তুলে নেবেন। গাড়ির দরজা বন্ধ করে হাত তুলবেন—সে আটকাবে। হ্যাঁ সে আটকাবে। বলবে—না। জটাধরবাবু মনুকে কিছু বলবেন না।

কল্পনা অনেকেই করে মানুষ অমন বয়সে, সময় সময় পাখা মেলে আকাশে উড়ে যায়। রাধাশ্যাম তেমনিভাবেই কল্পনা মনে নিয়েই বলেছিল—জামাইবাবু—! (গোপীনাথ শাস্ত্রী সম্পর্কে কৃষ্ণভামিনীর মামা; সেই হিসেবে জটাধরবাবু রাধাশ্যামের জামাইবাবু)—জামাই-বাবু, মনু এখনও বাড়ি ফেরে নি!

জটাধরবাবু নিজের সাজসজ্জা দেখতে ব্যস্ত ছিলেন, বললেন—ফেরে নি তো কি হয়েছে। এখুনি ফিরবে। কোনো কারণে দেরি হচ্ছে। তারপর ডেকেছিলেন নায়েবকে।

—নায়েববাবু! শুনুন—!

রাধাশ্যাম অত্যন্ত অধীর হয়ে উঠেছিল এই ধরনের উত্তরে এবং বলেছিল—আপনি কোনো খবর রাখেন না যখন বিশ্রী ঘটনা একটা ঘটবে তখন বুঝবেন—

—বিশ্রী ঘটনা? কি বলছ তুমি?

—আপনি জানেন সে আমহার্স্ট স্ট্রীটে হাইকোর্টের উকিল জ্যোতিপ্রসাদ ব্যানার্জীর ছেলে সত্যর সঙ্গে গলায় গলায় ভাব করেছে।

—করেছে তো কি হয়েছে? জে. পি. ব্যানার্জী একজন মস্ত উকিল। কলকাতার ভদ্র সমাজের বাছাট লোকেদের একজন। অতি সজ্জন—

—অতি সজ্জন! তিনি ব্রাহ্ম নন?

—হ্যাঁ তা বটেন—ব্রাহ্ম বটেন ও'রা। একটু থেমে ভেবে কোনো কিনারা না পেয়ে বললেন—তা হোক হে বাপু তা হোক। যাও, যাও। এখন আর ওই নিয়ে ফ্যাচাং তুলো না রাধাশ্যাম—আমাকে জরুরী কাজে বেরুতে হচ্ছে। বলতে বলতে তিনি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে বারান্দায়—সেখানে ফটকের সামনে রাস্তার উপর জুড়িগাড়ি দাঁড়িয়েছিল, সহিসেরা দুজনে দাঁড়িয়েছিল তাঁর প্রতীক্ষায়। তিনি বের হতেই গাড়ির দরজা খুলে দিলে একজন এবং জটাধরবাবু ভিতরে বসতেই আবার বন্ধ করে দিলে—অন্যজন ঘোড়ার আগে 'তফাত তফাত' বলে ছোট রাস্তার লোকদের সাবধান করতে করতে ছুটে গেল।

ঘটনাটা কিন্তু কৃষ্ণভামিনীর চোখে পড়েছিল। কৃষ্ণভামিনীর এখন অনেক কাজ, ঘুম থেকে উঠে তো সব থেকে বেশী কাজ এবং নিজের কাজ। গা ধোওয়া চুল বাঁধা পাউডার মাখা, দেহের তদ্বির করা রূপের মার্জনা করা সাজসজ্জা করা, তারপর কিছুক্ষণ সারা বাড়িতে গিন্নীপনা করা, কে কি খাবে, কোন্ তরকারি হবে, ভাঁড়ারের জিনিসপত্র কি আছে কি নাই—লক্ষ্মীর পুজো, ঘরে ঘরে আলো জ্বালানো, চৌকাঠে চৌকাঠে জল দেওয়া হল

কি না, কাজের কি আর হিসেব আছে? হিসেবের নাগালের মধ্যে ধরা ছোঁয়া যায় না। একবার জটাধরবাবু একজন গিন্নীপনার লোক রেখেছিলেন, তাতে সাত দিনের মধ্যে সাত সাতে উনপঞ্চাশ কেলেঙ্কারি হয়েছিল। প্রথম দিনই ঘুঁটে ছুট হয়েছিল। সে ঠিক সন্ধ্যেবেলা রান্নাশালের ঝি এসে বলেছিল—ঘুঁটে ফুরিয়েছে—ঘুঁটে নেই। আঁচ পড়বে না।

ব্যস্তসমস্ততার মধ্যেও সেদিন তাঁর হাতে সময় ছিল—তাড়া ছিল না পিছনে। কর্তার সঙ্গে থিয়েটার যাওয়া ছিল না, ঠাকুর মন্দিরে যাওয়া ছিল না, কোনো পড়শীর বাড়িতে কি কোনো সখীর কাছে যাওয়ার কথা ছিল না। তিনি বাথরুমে ঢুকবার আগে জরদাদেওয়া দু'খিলি মোটা পান চিবিয়ে নিচ্ছিলেন। সেই পিক ফেলতে বারান্দায় এসেই রাধাশ্যাম এবং জটাধরের সমস্ত কথা শুনেছিলেন এবং ঘটনাটাও দেখেছিলেন। তিনি ডেকে পাঠালেন রাধাশ্যামকে।—কি রে রাধাশ্যাম? কি বলছিলি বাবুকে?

রাধাশ্যাম চটেছিল জটাধরের উপর। জটাধর বড়লোক—তার জন্যে সে খাতির তাঁকে করে। কিন্তু গোপীনাথ শাস্ত্রী এ বাড়ির ভাগ্যলক্ষ্মী থেকে তেত্রিশ কোটি দেবতাদের দরবারের নিযুক্ত করা উকিলের মতো বহুসম্মানিত ব্যক্তি। একসঙ্গে দেবতা ঠাকুর সম্প্রদায়দের জানিত ব্যক্তি এবং পণ্ডিত বিদ্বানজনও বটেন। যত রকমের যে কোনো বিধানই হোক না কেন সে দেবার মালিক একমাত্র তিনি। তাছাড়াও সংস্কৃত কলেজিয়েট ইস্কুলের পণ্ডিত হিসাবে সমাজেও একটি বিশেষ সম্মান পান। সেই গোপীনাথের পুত্র রাধাশ্যামের জটাধরের এই উপেক্ষায় চটে ওঠারই কথা। সে চটেমটে হয়তো বাড়ি চলেই যেত। কিন্তু কৃষ্ণভামিনীর ডাক শুনে ফিরল। কৃষ্ণভামিনী সম্পর্কে তার দিদি। গোপীনাথ শাস্ত্রী কোনো দূর সম্পর্কে কৃষ্ণভামিনীর মামা। সেই সুবাদেই কৃষ্ণভামিনী তাকে তুই বলেন।

ডাক শুনে রাধাশ্যাম ফিরে দাঁড়াল—বারান্দার দিকে চোখ তুলে কৃষ্ণভামিনীকে বললে—যা বলছিলাম তা শুনে আর কি হবে তোমার? তুমিও তো ওই গোড়েই গোড় দেবে যে। তোমাদের স্বামী স্ত্রীর সব শেয়ালের এক 'রা' আমি জানি।

—যা গেল! তুই এত চৌক কেন রে?

—তোমরা বড়লোক—তোমাদের কাছে ট্যাক করতে পারি? তবে আমি অনাচার অনাছিষ্টি দেখতে পারি নে! বুঝলে! বাড়ির ভেতর লক্ষ্মীপুজো সত্যনারায়ণ-সেবা দেশে মা কালীর পুজো সব ভড়ং, আর দোহি দোহাঁর জন্যে। আসলে সেই এক কাণ্ড—খ্রীস্টানী আচরণ ব্রাহ্মদের সঙ্গে মেলামেশা।

সহ্য হল না কৃষ্ণভামিনীর, বাধা দিয়ে বললেন—কি বলছিস রে তুই? আমাদের খেরেস্তানী কারবার কি দেখলি? দেখ জাহাজের মাল খালাস মাল বোঝাই কাজে আমি কোনো দিন যেতে দিই না বাবুকে। বাড়ি ফিরলে কাপড় না ছাড়িয়ে হাত পা না ধুইয়ে ঘর ঢোকাইনে। আমাদের খেরেস্তানী দেখিস তুই? বড় পাকা হয়েছিস তুই। বলছি আমি মামাকে—দাঁড়া—।

—বলগে যাও। তার আগে নিজের ভাশুরপো কোথায় যায়—কাদের সঙ্গে মেলেমেশে—কাদের নামে লাল পড়ে সে খোঁজটা নাও।

—কে? মন্মথ?

—হ্যাঁ গো। ভাশুরপো আবার কটা তোমার? ওই একের ঠ্যালাতেই অস্থির। জাত-জন্ম সব যেতে বসেছে। একটু খোঁজটোজ নেবে? না তোমারও সময় নেই?

—মন্মথ কার সঙ্গে মেশে? সে তো তোর সঙ্গে ইস্কুল যায় তোর সঙ্গে ইস্কুল থেকে আসে।

—আসে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভারী লালসা ব্রাহ্মবাড়ির সঙ্গে মেলামেশা করার।

চীনেমাটির পেয়ালা পিরিচে চা তার সঙ্গে ছোট ডিম পাউরুটি বিস্কুট খাবার ভারী ইচ্ছে। বিশ্বাস না হয় তো দাও না তোমার লোক কাউকে আমার সঙ্গে—তাকে আমহার্স্ট স্ট্রীটে তার ক্লাসফ্রেন্ড সত্যপ্রসাদের বাড়িতে পাওয়া যাবে; সত্যপ্রসাদের বাবা জ্যোতিপ্রসাদবাবু নামজাদা ব্রাহ্ম। আমি সঙ্গে নেই তো! ব্যাস ঠিক গিয়ে উঠেছে ওদের বাড়ি। দেখ না কিছুদিনের মধ্যেই উড়বে ও ছেলে। একেবারে ব্রহ্মলোকে গিয়ে হাজির হবে।

সত্যকারের রাগ কৃষ্ণভামিনীর হল না এতে। অন্তত মন্মথর উপর হল না, যা বা যেটুকু অশান্তি ও বিরক্তি হল সেটা ওই রাধাশ্যামের উপরেই হল। রাধাশ্যামকে তিনি জানেন। তিলকে তাল করে ধর্মকর্মের আদালতে সে হল টাউট। বাপ অতি ভালোলোক—সে ভালমানুষটার শাসনদণ্ড চুরি করে অহরহ তাঁদের শাসাচ্ছেই। সেই বিরক্তিবশে ধনী-গৃহিণীর মতোই কৃষ্ণভামিনী গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলেন—নায়েববাবু! যান তো, আমহার্স্ট স্ট্রীটে জ্যোতিপ্রসাদবাবু হাইকোর্টের উকিলের বাড়িতে মন্মথ আছে—এখনও বাড়ি ফেরে নি—তাকে ডেকে আনুন তো। বলবেন আমি ডাকছি। আপনি নিজে যান। বুঝলেন! বলবেন যে সে যদি এখুনি না আসে তবে তাকে আর আসতে হবে না। আমার বাড়ি যেন সে না ঢোকে।

তারপর বললেন—সে আসুক একবার। এত বড় স্পর্ধা তার হল কি করে? গোবিন্দ-পুরের ভটচাজ বংশের ছেলে—বাড়িতে বিগ্রহসেবা—বাপ গুরুগিরি করে শিষ্যবাড়ি সেধে বেড়ান—তাঁর ছেলের এই কাজ! আমার বাড়িতে দুবেলা ঘড়া ঘড়া গঙ্গাজল ঢালছি, এ আসে, সে আসে তাদের পায়ের ছাপ মুছছি—বাড়িতে আমার মা লক্ষ্মীর সেবা রয়েছে। মাছ মাংসের হেঁশেল আলাদা—সেখানে ওই অনাচার।

বলতে বলতেই স্নানের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন—আর এই ছোঁড়া-টাও আচ্ছা হয়েছে বাবা। যেন গোয়েন্দা পুলিশ! কে কোথা কি করছে শুঁকে শুঁকে বেড়ানো!

মধু রায় লেন থেকে আমহার্স্ট স্ট্রীট বেশী দূর নয়। বলতে গেলে ইস্কুল কলেজ পাড়া থেকে প্রায় সমান দূর। সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের নিচের বাহুটির দুই প্রান্তে অবস্থিত, এবং তলাকার বাহুটি পাশের দুটি বাহু থেকে ছোট। বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট ধরে কর্নওয়ালিস স্ট্রীট পার হয়ে এপাশে বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট ধরে সামান্য দূর। নায়েব বেনিয়ানের উপর মোটা সাদা চাদরখানা চাপিয়ে নিয়ে পথে বেরিয়ে দক্ষিণমুখে কিছুদূর এসে বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটে পূর্বমুখে ফিরবার সময় দেখলে রাধাশ্যাম সঙ্গে আসছে। বললে—কি তুমিও সঙ্গ নিয়েছ। যাবে?

—চলুন না দেখিয়ে দিচ্ছি আমার কথা সত্যি না মিথ্যে।

নায়েব কোনো কথা বললে না—এসে দাঁড়াল আমহার্স্ট স্ট্রীটে জ্যোতিপ্রসাদবাবুর বাড়ির ফটকে। দারোয়ানকে বললে—দেখ তো তোমাদের খোকাবাবু সত্যবাবুর কাছে একটি ছেলে এসেছে। মন্মথ ভট্টাচার্য। তাকে বল—আমরা ডাকছি। আমরা তার বাড়ির লোক।

দারোয়ান বললে—ভিতরে যাইয়ে, সামনাকে কামরামে বেয়ারা আর্দালী হোগা—উ লোক বোলায় দেগা।

নায়েব ভিতরে গেল—রাধাশ্যাম গেল না।

নায়েব ডাকলে—এস ভিতরে এস—

—না। রাধাশ্যাম যাবে না ভিতরে।

কিছুক্ষণ পরেই জ্যোতিপ্রসাদবাবু সত্য এবং মন্মথ বাড়ির ভিতরের দিক থেকে লম্বা দরদালানটা বেয়ে এসে সামনের ঘরে দাঁড়ালেন।

মন্মথ নায়েবকে দেখে বললে—আপনি এসেছেন ?

নায়েব হেসে বললেন—গিন্নীমা বললেন আপনি নিজে যান।

জ্যোতিপ্রসাদবাবু বললেন—তাহলে তো চিন্তিত হয়েছেন খুব।

নায়েব সবিনয়ে মাথা চুলকে বললে—কোথায় একটা কি এ্যাকসিডেণ্ট ঘটেছে চিৎপুরের দিকে—একটা জোয়ান ছেলে গাড়ির ধাক্কা খেয়েছে, এই শুনে উনিও অস্থির হয়ে উঠেছেন।

জ্যোতিপ্রসাদবাবু হাসলেন, বললেন—খুড়ীমা খুব ভালোবাসেন মন্মথকে। কিন্তু অ্যাক্সিডেণ্ট হয়ে আমাদের বাড়ি থাকতে পারে এখবর পেলেন কোথায় ? তারপরই গম্ভীর হয়ে বললেন—তা, তুমি যাও মন্মথ। তাড়াতাড়ি যাও। আবারও এস। ইচ্ছে হলে চলে এস এখানে। বুঝেছ ? ভারী ভালো লাগল হে তোমাকে !

ফটক থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে মন্মথ অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বললে—অ্যাকসিডেণ্টের খবর শুনে খুড়ীমা আমার খোঁজ করতে পাঠিয়েছেন ? না আর কিছু হয়েছে ? আপনি আমার কাছে আসল কথাটা ঢাকছেন।

নায়েব বললে—উকিলবাবু তো বললেন মন্মথবাবু, যে অ্যাকসিডেণ্ট হয়ে মন্মথ যে আমাদের বাড়ি থাকবে, এ খবর খুড়ীমা পেলেন কোথায় ?

মন্মথ নায়েবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে—তার মানে ? তার মানে আপনি বলছেন অ্যাকসিডেণ্ট ফ্যাকসিডেণ্ট সত্যি নয়—

নায়েব বললে—উকিলবাবু হাইকোর্টের উকিল, উনি ধরেছেন ঠিক। রাধাশ্যাম তোমার খুড়িকে বললে—তোমার ভাশুরপো ব্রাহ্মবাড়ি গিয়ে চা পাঁউরুটি ডিম খাচ্ছে আর তোমরা লক্ষ্মীপুজো কালীপুজো করছ—ধর্ম হচ্ছে না ছাই হচ্ছে। এই আর কি গিন্নীমা দপ করে জ্বলে উঠলেন। আমাকে ডেকে বললেন—এখনি যান আপনি। নিয়ে আসুন তাকে। এক্ষুনি।—খুব রেগেছেন বাপু। খুব রাগ সে। বুঝেছ ! বলেই দিলেন—যদি এক্ষুণি না আসে তবে সে যেন আর না আসে এ বাড়িতে। জিজ্ঞাসা কর রাধাশ্যামকে !

—রাধাশ্যাম ? সে কোথায় ?

—এই তো ফটকের এপাশে ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে ছিল।

—কিন্তু কই ? চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখলে মন্মথ। তার মাথার ভিতরটায় একটা অসহনীয় উত্তপ্ত যন্ত্রণা যেন দপদপ করছিল ; কান দুটো লাল এবং গরম হয়ে উঠেছে, রগের পাশে শিরা দুটো দপদপ করে লাফাচ্ছে। আবার সে জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় সে ? গেল কোথায় ?

নায়েব বললে—কি জানি ! চল এখন বাড়ি চল।

রাস্তায় তখন আলো জ্বালছে মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে কিন্তু দিনের আলো পুরো মিলিয়ে যায় নি। আকাশে আলো এখনও ছড়িয়ে আছে। কুলপিবরফওয়ালারা হাঁড়ি মাথায় হাঁক তুলে ডেকে ডেকে যাচ্ছে। বেলফুলওয়ালারা মালা ফিরি করছে। সামনে উত্তর দিকে মানিকতলা স্ট্রীটের ওপাশে প্রকাণ্ড একটা বসতি। সেই বসতিটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল মন্মথ। সে কিছু ভাবছে। তাও তার কাছে স্পষ্ট নয়।

একটা প্রশ্ন এসে তার সামনে দাঁড়িয়েছে। ঘটনাবিন্যাস থেকে আপনা-আপনি প্রশ্নটা মাথা তুলে উঠে দাঁড়িয়েছে।

প্রথমে মনে হয়েছিল—এখুনি এখুনি উঠে দাঁড়াল। কিন্তু না এখুনি উঠে দাঁড়ায় নি,

অনেকদিন ধরে ধীরে ধীরে একটু একটু করে উঠেছে। আজ অতি আকস্মিকভাবে যেন মাথার মুখের আবরণ খুলে সামনে দাঁড়িয়েছে ঠিক এই মুহূর্তটিতে।

বলছে—এরপর?

—এরপর কি সে ওই বাড়িতে যাবে?

—যাওয়ার কি কোনো অধিকার আছে তার?

মন বললে—না অধিকার নেই।

কিন্তু যাবে কোথায়? থমকে দাঁড়ল মন্মথ। বললে—আপনি বাড়ি যান নায়েবমশাই। আমি যাব না!

—যাবে না?

—না।

—কোথায় যাবে বলবে তো? আমি গিয়ে কি বলব? সামনে রাত্রি—! জ্যোতিপ্রসাদবাবুদের বাড়ি যাবে?

—না। আমি এখন রমেশ গোস্বামী স্যারের বাড়ি যাচ্ছি। রাত্রিটা ওঁর বাড়িতে থাকব। তারপর কাল যেখানে হোক একটা জায়গা দেখে নেব।

—সে কি? রমেশ মাস্টার তো কৃশ্চান!

—আমি জাত মানি না।

—জাত মানো না?

—না।

বেশ কিছুকাল পর। বছরখানেক পার হয়ে গেছে।

জগন্নাথঘাটের চাতালে বসেছিল মন্মথ। গালে হাত দিয়ে ভাবছিল। চৈত্র মাসের প্রথম। গঙ্গার জল এখন নির্মল। বর্ষার সে ঘোলাটে জলও নেই আর সে দুকূলভাসানো জলের সে ক্ষ্যাপা চেহারাও নেই। জোয়ারের সময় জল ঘোলা হয়ে ফেঁপে উঠে দুকূল ছাপাতে চায় বটে কিন্তু সে ওই কিছুক্ষণের জন্যে। বিকেলবেলা; ওপারে পশ্চিম দিকে আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। ওপারে লিলুয়া বেলুড় বালী উত্তরপাড়ার গঙ্গার ঘাটে নৌকোর ভিড় জমে রয়েছে। পাড়ের উপর নারকেলগাছের মাথা দেখা যাচ্ছে। অন্য গাছগুলোকে ঠিক চেনা যায় না। মধ্যে মধ্যে পাকা বাড়ির চিলেকোঠা দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণ দিকে পাটকলের চিমনি উঠেছে মাথা ঠেলে। এদিকের ঘাটের চেহারা আলাদা। এদিকের অধিকাংশ ঘাটেই স্টীমার ভিড়বার জন্যে জেটী তৈরি হয়েছে। এবং গঙ্গার এপাশ ঘেঁষে স্টীমার যাচ্ছে আসছে। নোঙর করে রয়েছে। স্টীমারগুলোর চিমনি দিয়ে অলস মন্থর বেগে স্টীমার বয়লারের কয়লার পোড়া কালো ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে। লালচে পশ্চিমাকাশের পটভূমিতে যেন কালো রঙ নিয়ে তুলি বুলিয়ে চলেছে। চৈত্র মাস থেকেই মানে রোদ একটু চড়া হয়ে উঠলেই বিকেল বেলা সন্ধ্যের মুখে একটা ভারী মিষ্টি হাওয়া ওঠে দক্ষিণ দিক থেকে। যত গরম প্রবল হবে এ হাওয়াও তত জোরে বইবে। সন্ধ্যেবেলাটাকে মিষ্টি করে তুলবে, রাত্রে তো গা শিরশির করবে।

মন্মথ ভাবছিল নিজের কথা। এই ক'মাসে কত কাণ্ডই না ঘটে গেল। সেই সেদিন জ্যোতিপ্রসাদবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে কাকাবাবুর নায়েবের সঙ্গ ছেড়ে ঠিক বিপরীত-মুখে পথ ধরেছিল দক্ষিণমুখে। আমহার্স্ট স্ট্রীট হ্যারিসন রোড জংশন থেকে পূর্বমুখে হ্যারিসন রোড ধরে সারকুলার রোডে পেঁছে দক্ষিণমুখে সটান চলেছিল জোড়া গির্জে লক্ষ্য করে। জোড়া গির্জের দক্ষিণে বেনেপুকুর এণ্টালী এলাকায় রমেশ স্যারের বাড়ি।

রমেশ স্যারকে তার ভারী ভালো লাগে। রমেশ স্যার তাকে শাস্তির সম্মুখীন করেছিলেন বিভূতির সেই ছবি দেখানোর কাণ্ড নিয়ে। সত্য কথাটা তাকে বললেও সে প্রথমে বিশ্বাস করে নি, কিন্তু রমেশ স্যারই একদিন তাকে বলেছিলেন—হ্যাঁ আমিই বলেছিলাম কথাটা হেডমাস্টার মশায়কে—অ্যান্ড আই ওয়াণ্টেড—আমি চেয়েছিলাম তোমার আরও কঠিন শাস্তি হোক। কিন্তু হেডমাস্টারমশায় তোমার উপর কিছু বেশী সদয়। বিভূতিকে শাস্তি দেবার জন্যে আমার আগ্রহ ছিল না। ও ছেলে নিজেই চলে যেত পড়া ছেড়ে। গিফ্‌টেড বয়—ভেরি ইণ্টেলিজেণ্ট—শার্প—বয়সের চেয়ে মনে মেজাজে বড়—এরা আলাদা জাতের ছেলে। ওরা বখে যাবার জন্যে জন্মেছে। ওরা হল গঙ্গার সেই বাড়তি জল যা পদ্মা দিয়ে বয়ে যায়; ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিশে ব্রহ্মপুত্রের মাহাত্ম্যেও কাদা ময়লা গুলে দেয়। কিন্তু জোরে হারে না। ওরা অবিশ্যি দুর্যোধনের মতো উরু ভেঙে মরে কিন্তু ভীমের চেয়ে বিক্রমে এক তিল কম নয়। শুনেছি আজকাল টেরি কাটতে চুল আঁচড়াতে তার এক ঘণ্টার ওপর লাগে। তাছাড়া চাকরে নাকি কোঁচানো কাপড় ছাড়ায়, পরায়। আশ্চর্য! দিব্যি উলঙ্গ হয়ে চাকরের সামনে দু'হাত তুলে গৌরাঙ্গ ঠাকুরের মতো দাঁড়াল আর চাকরটা—

বলতেবলতে হা-হা শব্দে খানিকটা হেসে নিয়ে হঠাৎ সামলে গিয়ে বেশ সহজ এবং গম্ভীর-ভাবে বলেন—এ সব তোমাদের সাধ্যাতীত। এ তোমরা পারবে না। Don't try it. বুঝেছ? হবিষ্যিকরা ব্রাহ্মণসন্তান অকালে অপঘাতে মারা যাবে। আমার দেখ না, তিন পুরুষ আমরা কৃশ্চান হয়েছি, তার আগে ওই কিঞ্চিৎ গব্য ঘৃত সৈন্ধব লবণ আর এটা ওটা সেদ্ধ খাওয়া পুরোর ব্রাহ্মণসন্তান ছিলেন কর্তারা। তারপর দু'পুরুষেও রপ্ত করতে পারি নি কৃশ্চান ভাই মানে সায়েব দাদাদের হাল-হদিস চাল-চলন স্বভাব-চরিত্তির!

সেদিন ওই রমেশ স্যার ছাড়া আর কাউকে মনে হয়নি। হয়েছিল, সর্বাগ্রে সত্যদের বাড়ির কথাই মনে পড়েছিল—কিন্তু সেখানে ফিরে গেলে যেন তার উপর আনা অভিযোগ-গুলো হাতেনাতে প্রমাণিত হয়ে যাবে বলেই সে-দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এত বড় শহর কলকাতার দিকে মনে মনে ফিরে তাকাতেই মনে পড়েছিল রমেশ স্যারের কথা। স্যারের বাড়িতে যখন পৌঁছেছিল তখন রমেশ স্যার বেশ সুরেলা উচ্চকণ্ঠে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করছিলেন। পড়ছিলেন কালিদাসের 'কুমারসম্ভবম্'। মন্মথ বারান্দায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল স্তব্ধ হয়ে।

সংস্কৃত সে জানে—আদ্য এবং মধ্য দিয়ে উপাধির জন্যে সে প্রস্তুত হয়েছে তখন। তার সঙ্গে কাব্য পড়াও আরম্ভ করেছিল সুতরাং শুনবামাত্র বুঝতে পেরেছিল। এ সবের উপরেও শ্লোকটির শেষের চরণ তার অত্যন্ত পরিচিত। বাবার মুখে বহুবার শুনেছে; নিজেরও তার দু'দুবার কুমারসম্ভব পড়া হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। এই চরণটি মুখস্থও আছে।

"একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্ক।"

আবৃত্তি করতে করতেই বেরিয়ে এসেছিলেন রমেশ স্যার।

"যশ্চাপ্সরো-বিভ্রম মণ্ডনানাং
সম্পাদয়িত্রীং শিখরৈর্বিভর্তি।
বলাহকচ্ছেদ-বিভক্ত-রাগামকাল
সন্ধ্যামিব ধাতুমত্তাম্॥"

রমেশ স্যার তাকে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গিছলেন। তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—মন্মথ!? তুমি? এই সন্ধ্যেবেলা?! কি ব্যাপার হে? এ্যাঁ। বগলে দেখছি ইস্কুলের বইগুলো রয়েছে। কি ব্যাপার! বাড়ি যাও নি এখনও?

মিনিটখানেক চুপ করে থেকে নিজেকে সংযত করে নিয়ে সে সরাসরি বলেছিল—আজ রাত্রিটা আমি আপনার বাড়ির এই বাইরের ঘরে শুয়ে থাকব স্যার। কাল সকালে উঠেই চলে যাব।

—কাল সকালে—? কোথায় যাবে কাল সকালে উঠে? তর আগে বল তো বাড়ি যাও নি কেন? কি হয়েছে সেখানে?

মাটির দিকে তাকিয়ে থেকেছিল সে। ভেবে নিচ্ছিল কিভাবে কথাটা বলবে। কতটা বলবে!

রমেশ স্যার এবার তার হাত ধরে বারান্দা থেকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে বলেছিলেন—বস। আই অ্যাম সরি, আমি ঠিক তোমাকে বুঝতে পারি নি। তুমি নিশ্চয় খুব বিপন্ন হয়েই আমার কাছে এসেছ। না-হলে এই সন্ধ্যেবেলা ইস্কুলের বই বগলে নিয়ে—। তুমি কি বাড়ি থেকে চলে এসেছ?

মন্মথ বলেছিল—পথ থেকে চলে এসেছি স্যার, আর আমি সেখানে যাব না।

—পথ থেকে চলে এসেছ? কেন?

একটু চুপ করে থেকে মন্মথ বলেছিল—আমি আজ সত্যদের বাড়ি গিছলাম—কিছুতেই সে ছাড়লে না—রাজা রামমোহন রায়ের বাড়ি দেখে ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম—চা মিষ্টি খেয়েছি ওদের বাড়ি, সেই খবর আমার কাকা কাকীমার কাছে জানিয়ে দিয়েছে রাধাশ্যাম—

—ইউ মীন পণ্ডিত গোপী শাস্ত্রীর ছেলে যে তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে পথে?

—হ্যাঁ। খুড়ীমা আমাকে তাঁর বাড়িতে মাথা গলাতে বারণ করে পাঠিয়েছেন। আমি আর সেখানে যেতে চাই নে।

—হুঁ। এরপর একটু হেসে বলেছিলেন—তাহলে জাতটাত প্রায় খুইয়ে-টুইয়েই এসেছ? তা বেশ করেছ। কিন্তু আমি কি করি? রাত্রে তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। একটু মিষ্টিটিষ্টি এবং এক গ্লাস মাদার গ্যাঞ্জেস ওয়াটার কিংবা ফলটল—?

হঠাৎ থেমে গেলেন এবং বার বার ঘাড় নেড়ে বললেন—না বৎস। তোমার এখানে কিছুই খাওয়া হবে না। নট ইভেন্ এ গ্লাস অব মাদার গ্যাঞ্জেস ওয়াটার। দেখ কোনো ধর্ম কোনো জাতটাতে আমি বিশ্বাস করি না। সুতরাং তোমার জাত আমার থেকে যাবে না—যাবে তোমার বাড়ি থেকে ওই খুড়ো খুড়ীর কাছ থেকে। বুঝেছ এখানে তোমার খুড়ো খুড়ী হলেন কেরোসিন-ভিজানো ঘুঁটে এবং ওই রাধাশ্যাম ছোকরাটি হল বেশ ভ্রাই ম্যাচস্টিক—দেশলাইয়ের কাঠি। সে ফস করে জ্বলে উঠে ঘুঁটেতে আগুন ধরাবে। তারপর গোটা সমাজের তেঁতুলকাঠ চেলা করে চাপাবে। অবশ্য তাতে তুমি পুড়বে না। তোমার মধ্যে ধাতু আছে। সেটা সোনা। ওরা পুড়িয়ে তোমাকে খাঁটি করবে। আমি ওদের গ্রাহ্য করি নে। কিন্তু ইয়োর ফাদার। তোমার বাবার কথা আমি শুনেছি। তাঁর একটা ছবি আমার মনের মধ্যে আছে। একটি শান্ত শুদ্ধ সহনশীল নির্লোভ মানুষ। আমি যেমন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না তিনি তেমনি বিশ্বাস করেন। যতখানি আমার অবিশ্বাস ততখানি তাঁর বিশ্বাস। তাঁর আর ছেলে নেই। একটি ভাই ছিল তোমার, সে মারা গেছে। তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছেন। কিন্তু সন্তান হয়নি। তাঁকে আঘাত দিতে তো পারব না। নইলে, আমি নিজে ধর্মে ঈশ্বরে জাতে বিশ্বাস না-করলেও আমাদের ফাদারদের কাছে নিয়ে যেতাম। তোমার নবজীবনে অনেক সুবিধে হত সাহায্য পেতে। ইউ নো মাইকেল মধুসূদন ডাট, রেভারেন্ড কে. এম. ব্যানার্জী। তুমিও এমনি একজন হতে পারতে। কিন্তু না, সে হয়ে তোমার কাজ নেই। আমি নিজেও তোমাকে বারণ করছি!

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে মন্মথ শুধু শুনেই গিয়েছিল। গোস্বামী স্যারের কথাগুলি

সচরাচর সাধারণ চলিত জীবনের কথা নয় কিন্তু জীবনের গভীরতম অন্তঃপ্রদেশের কথা। সারা অন্তর যেন কেমন করছিল। বুকের স্পন্দন চলছিল তারই সঙ্গে সঙ্গে কখনও দ্রুত কখনও স্তিমিত নির্জীব হয়ে।

রমেশ স্যার কথা শেষ করেছিলেন "তোমাকে বারণ করছি" বলে। কথা শেষ হতেই মন্মথ মৃদু স্বরে আতঙ্কাস্ত মানুষের মতোই বলেছিল—তাহলে আমি আসি স্যার।

ক্যাম্বিসের ডেক-চেয়ারখানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে স্যার বলেছিলেন—মাই বয়, তোমাকে যেতে আমি বলিনি। অন্তত বাড়ি ফিরে যেতে বলি নি। তোমার হৃদয়ের দুঃখ আমার সঠিক বোঝার কথা নয় তবুও বুঝছি বুঝতে পারছি কিছুটা। তোমার আর সে বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত নয়। তোমাকে আমি নিয়ে যাব চল হেডমাস্টার মশায়ের কাছে। উনি তোমাদের স্বজাতি। এবং ও'র বাড়ি রাত্রিযাপন করলে কেউ কোনো কথা বলতে সাহস করবে না। করলেও তার দাম থাকবে না। উনি তোমার একটা ব্যবস্থা অনায়াসে করে দেবেন। কলকাতায় অনেক বড়লোক আছেন যাঁদের নানারকম দানধ্যান আছে। সন্ন্যেসী ভোজন ভিখিরী ভোজন থেকে ব্রাহ্মণ ভোজন গোরুদের ঘাস খাওয়ানোও আছে। এরা বামুনের ছেলেদের খাওয়া পরা দিয়ে টোলে পড়ান। বৃত্তিসুদ্ধ দেন। আজকাল গরীব মেধাবী ছাত্রদের বাড়িতে থাকবার জায়গা দেন, খেতে দেন, টাকাকড়ি বৃত্তিও দেন। বেশী কিছু না বিনিময়ে বলতে হবে—লং লী—ভ দাতাজী। হে ঈশ্বর তাঁকে জয়যুক্ত কর ; সেণ্ড হিম ভিক্টোরিয়াস,—মামলা ফৌজদারী দেওয়ানী অসংখ্য চলছে এদের কোর্টে ; সেই সব মামলা জিতুন তিনি—বাস !

দীর্ঘক্ষণ আপনার মনেই কথা বলে চলেছিলেন রমেশ স্যার। এইটিই ও'র স্বভাব। আপনার কথা ক্রমাগত বলেই চলবেন বলেই চলবেন—উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা করবেন না এবং এক এক স্থানে এসে খুব উচ্চশ্রেণীর রসিকতা করেছেন ভেবে নিজেই প্রবলবেগে অট্টহাস্যে ভেঙে পড়েন। এবারও ওই ধনী দাতাদের মামলায় জয়যুক্ত করার জন্য প্রার্থনার কথা বলে অট্টহাস্যে ভেঙে পড়লেন। মন্মথ তাঁর মুখের দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল।

হঠাৎ হাসি থামিয়ে রমেশ স্যার বললেন—আরম্ভ করব বিদ্যেসাগর মশায়ের কাছ থেকে। তোমার ভাগ্য ভালো হলে তুমি বিদ্যেসাগর মশায়ের আশ্রয় পেয়ে যাবে।

না। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মশায়ের আশ্রয় সে পায় নি। সে রাত্রিটা সে স্কুলের হেডমাস্টার মশায়ের বাড়িতে ছিল—পরের দিন সকালেই রমেশ স্যার এসে তাকে বিদ্যাসাগর মশায়ের বাড়ি নিয়ে গিছলেন কিন্তু মন্মথর দুর্ভাগ্য বিদ্যাসাগর মশায় শহরে ছিলেন না। তিনি কার্মাটারে গিছলেন। রমেশ স্যার ওখান থেকে সেদিন আবার তাকে হেডমাস্টার মশায়ের ওখানে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি গিছলেন। হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনোখানে নিজের মতে তিনি দিতে চান নি। বিদ্যাসাগর মশায়ের বাড়ি থেকে ফিরবার পথে বলেছিলেন—মন্মথ দেখ, তোমরা আমরা তো ভিন্ন জাত নই, আমরাও তো বামুন ছিলাম হে। জান আমার বুড়ী ঠাকুমা আজও বেঁচে আছেন। ঠাকুমার বাবা যখন কৃশ্চান ধর্ম গ্রহণ করেন তখন ঠাকুমার বয়স ছ'বছর। তখনকার শেখা সেই পুণ্যশ্লোক নলরাজা পুণ্যশ্লোক যুধিষ্ঠির, পুণ্যশ্লোকা বৈদেহী চ পুণ্যশ্লোক জনার্দন—তারপর অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী এসব শ্লোকগুলি আজও ভোরবেলা আওড়ান। আমার তো মালপোতে আর বৈষ্ণব কাব্যে তার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় অত্যন্ত রুচি। তবুও আমিও ঠিক নিজেকে তোমার পরমাত্মীয় মনে করতে পারছি না, আর তোমার খুড়ো খুড়ী বিশেষ করে ওই রাধাশ্যাম বালকটি দেখবে কত রটনা রটাবে তোমার আমার নামে। আমি সাহস পাচ্ছি না হে। না। মাস্টারমশাই যা

হয় করবেন—আমি করব না। চল ও'র ওখানেই চল।

দু'দিন পর সেদিন ইস্কুলে মন্মথর কাকাবাবু এসেছিলেন। দু'দিন অপেক্ষা করার পর যখন মন্মথ আর ফিরে যায় নি তখন এসেছিলেন। বেশ যুদ্ধং দেহি ভাব নিয়েই এসেছিলেন, গোঁড়া হিন্দু সমাজের একজন মুখপাত্রকেও সঙ্গে করে এনেছিলেন। নামকরা লোক কেউ নয়, তবে মজবুত পাটোয়ার লোক, যাঁরা তর্কতকরারে পটু—বড় বড় ধনী সমাজপতিদের সামনে রেখে যাঁরা তাঁদের হয়ে যেখানে যেমন সেখানে তেমনি ধরনের সওয়াল জবাব করে থাকেন তাঁদেরই একজন। ইন্দুবাবুর মুখে চুরুট মাথায় রুখু চুল পায়ে তালতলার চটি চোখে চশমা—এই সজ্জায় দেখতেও তিনি রীতিমতো রাশভারী ব্যক্তি। এহেন লোকটিকে নিয়ে এসেছিলেন কাকাবাবু রমেশ স্যারের নামে নালিশ করতে। তিনি রাত্রে মন্মথকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন, অখাদ্য খাইয়ে তার অজ্ঞাতসারেই তার জাতটি মেরে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু সে তকরার গোড়াতেই নাকচ হয়ে গিয়েছিল। হেডমাস্টার মশায় খুব গম্ভীরভাবে বলেছিলেন--জটাধরবাবু, গোড়াতেই বলে রাখি যে, কাল রাত্রে মন্মথ রমেশ গোস্বামীর বাড়িতে খায় বা নি শোয় নি; সেখানে সে গিয়েছিল এটা ঠিক কিন্তু রমেশ গোস্বামী মশায় তাকে নিয়ে আমার বাড়িতে এসেছিলেন। সমস্ত বিবরণ আমি ওদের দু'জনের কাছেই শুনেছি। এবং তার মধ্যে একবিন্দু মিথ্যা নেই বলে বিশ্বাসও করেছি। রমেশবাবুর বাড়িতে থাকার কথা তো ওঠেই না। সে রাত্রিতে আমার বাড়িতে ছিল মন্মথ। আমি বলছি খাওয়ার কথা। খাবার কি জল কিছুই রমেশবাবু খাওয়ান নি মন্মথও খায় নি। অবশ্য খেলে যে মানুষের জাত যায় এ কথাটা আমি মানি না। আপনারা মানেন তাই বললাম।

এরপর কাকার বাড়ি ফিরে না-গিয়ে উপায় ছিলনা এবং মুখ বুজে ফিরে যেতে হয়েছিল। খুড়ো জটাধরবাবু যাবার সময় চোখ মুছতে মুছতে গিয়েছিলেন। বারকয়েক জটাধর মন্মথকে বলেছিলেন—তা বেশ, রমেশবাবুর বাড়িতে থাকিস নি, খাসনি ভালো করেছিস। একেবারে পাঁড়-কৃশ্চান। গোঁসাইবাড়ির ছেলে, তিন পুরুষ আগে কৃশ্চান হয়েছে, হ্যাম না হলে ব্রেকফাস্ট হয় না। ভগবান তোকে রক্ষে করেছেন। গোবিন্দের সেবা আমাদের বাড়িতে সেই আদ্যিকালের। শুনেছি স্বপ্ন দিয়ে এসেছিলেন। আমাদের পূর্বপুরুষকে স্বপ্ন দিয়েছিলেন—'ভটচাজ্যি আমাকে তুই বাড়িতে এনে পুজো কর।' আবার যাঁর বাড়িতে ছিলেন তাঁকেও স্বপ্ন দিয়েছেন—'আমাকে তুই অমুক ভটচাজ্যির বাড়িতে দিয়ে আয়। তোর বাড়িতে থাকবো না আর।' পর পর সাত দিন স্বপ্ন দেখে তাঁরা ঠাকুর কাঁধে করে গোবিন্দপুরের ভটচাজদের খোঁজে বেরিয়েছিলেন। আমাদের পূর্বপুরুষও তাঁদের খোঁজে বেরিয়েছিলেন। দেখা হয়েছিল পথে বটগাছতলায়। ইনিও ভাবছেন উনিও ভাবছেন—তারপর পরিচয়।—কি ভাবছেন মশায় এত?—যা ভাবছি মশায় তা বলতে তো নিষেধ আছে। কিন্তু আপনি কি ভাবছেন?—তাও তো বলতে নিষেধ আছে।—তাহলে?—কি তাহলে?—বলুন, তাহলে—কি? বলুন!—জয় রাধাবল্লভ!—হরিবোল হরিবোল—আজ্ঞে হ্যাঁ উনিই রাধাবল্লভ! বলে কাপড়ে ভালো করে মোড়া রাধাবল্লভের মোড়ক খুলে প্রভুকে তুলে দিয়েছিলেন গোবিন্দপুরের ভটচাজের হাতে। তিনি বাড়িতে থাকতে কি ধর্ম নষ্ট হয়? হয় না। নে ফিরে চল। রাধাবল্লভের কৃপা—তিনিই তোর জাত রক্ষে করেছেন।

মন্মথ পাথরের মূর্তির মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এতটুকু নড়ে নি। মুখের ভাবের তিলমাত্র পরিবর্তন হয় নি। কথা বলে নি। তার মনের মধ্যে এর উত্তর তার মনই দিচ্ছিল।

রমেশ স্যার বলেছিলেন তাঁদের বংশের কথা। তাঁর ঠাকুরদা কৃশ্চান হয়েছিলেন; শ্রীরামপুরের পাদরীদের কাছে চাকরি করতেন। লোক ছিলেন জটিল চরিত্রের। ও'দের

বাড়িও ছিল পুরুতে বামুনের বাড়ি। মঙ্গলচণ্ডীর আটন ছিল। সেই আটনে জ্যান্টমাস ভর পুজো হত। প্রতি মঙ্গলবারে যাত্রী আসত। রমেশ স্যারের ঠাকুরদাদার বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন হাঙ্গামা বাধে নি। তিনি ভক্তিমান্ লোক ছিলেন, পুজো চালাতেন। একমাত্র ছেলে রমেশ স্যারের ঠাকুরদাদা এই পাদরীদের সঙ্গে মেলামেশা করে ইংরিজী শিখেছিলেন। তারপর চাকরী নিয়েছিলেন নীলকুঠিতে। তখন নীলের আমল। নীলকুঠির চাকরি তখন জজ ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরির সমান। রমেশ স্যার তাঁদের এই ইতিবৃত্ত বলবার সময় হেসে বলেছিলেন—জান মন্মথ, যারা জ্যোতিষচর্চা করে তারা জানে মানুষের ভাগ্যে একটা উভচরী যোগ বলে যোগ আছে। যার মানে হল কি জান—ভাগ্যের রথখানা মাটির উপর চার ঘোড়ায় টানবে, আবার দৈবক্রমে যদি পথের সামনে নদী কি বিল সাগরটাগরই পড়ে তাহলে রথখানা সঙ্গে সঙ্গে একেবারে দশ বিশ দাঁড়ওয়ালা মহাজনী নৌকো হয়ে জল কেটে তরতর করে চলবে। দরকার হলে পুষ্পক হয়ে দাঁড়াবে ; ঘোড়াগুলোর পাখা গজিয়ে হাঁস হয়ে যাবে। নীলকুঠির চাকরি সেকালে তাই ছিল। কিন্তু আমার ঠাকুরদাদা মুশকিলে পড়লেন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে। ঠাকুরদার বনাবন্তি ছিল না বাড়ির সঙ্গে। বাপ নিষ্ঠাবান পুরুতঠাকুর—মঙ্গলচণ্ডীর আটন আছে বাড়িতে—তাঁর সঙ্গে বনে না, মা ছিলেন না, স্ত্রী তখন সদ্য যুবতী হয়েছেন, গোঁসাইবাড়ির গিন্নী হয়েছেন, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা কেটে দেবাংশিনীর মতো বেড়ান। এবং ঠাকুরদাদা রোজগার যাই করুন আর যতই করুন কোনোক্রমেই ধর্মের তুফানের মধ্যে থই পান না। বাড়ি বলতে গেলে আসতেনই না। তা হলেও চলছিল সব কোনোক্রমে। বাপের জাত-ধর্ম মঙ্গলচণ্ডীর সেবা-আর্চায় নিয়ে বেশ চলছিল। বউকেও লোকে বলত খাঁটি ব্রাহ্মণকন্যে—ধর্মের মুখ চেয়ে মতিভ্রষ্ট স্বামীকে চায় না। ওদিকে ছেলের নীলকুঠির চাকরি চলে সায়েবীআনা চলে। এ সব চলছিল। কেবল একটি ছেলে হয়েছিল যিনি আমার পিতৃদেব—বিপদ হয়েছিল তাঁকে নিয়ে। উভয় পক্ষই তাঁকে নিয়ে টানাটানি করছিল। তারপর সমাধান হল। বাপ মরলেন। ছেলে শ্রাদ্ধ করলেন। প্রায়শ্চিত্ত করলেন। মাথা ন্যাড়া করলেন। মঙ্গলচণ্ডীর দেবাংশীগিরিও করলেন দিন কয়েক। তারপর ভর হতে লাগল পুরুতের। ভর জান তো মন্মথ ? দেখেছ তো ? দেবতার ভর হয় ভক্তের ওপর !

ভর মন্মথ দেখেছে।

ধূপের ধোঁয়ার মধ্যে প্রায় ঢেকে গিয়ে দেবতার ভক্ত প্রচণ্ডবেগে ঘাড় দোলাতে থাকে ; তার চারিপাশে খান পাঁচ সাত ধুনুচি থেকে ধূপের ধোঁয়া ওঠে, চারিপাশের উপভক্তেরা এর উপর বাতাস দেয় ; তখন প্রচণ্ডবেগে ঘাড় দোলাতে দোলাতে ভক্ত কথা বলতে থাকে। সে কথা জ্বরবিকারে প্রলাপের মতো কথা।

—আর থাকব না—এখানে থাকব না। দিয়ে আয় আমাকে দিয়ে আয়। না দিয়ে এলে নির্বংশ করব গোঁসাই বংশকে। বাতি দিতে কাউকে রাখব না ! তারপর সে— ।

দুই হাত মুঠো বেঁধে শক্ত করে কাঁপতে থাকত 'ভর-চাপা' পুরুত। তার সঙ্গে দাঁতে দাঁতে ঘষে কটকট শব্দ করতে থাকত। কোনোও সময় ম্যালেরিয়া জ্বরের কম্পের মতো প্রবল কম্পনে কম্প হত তার।

—তখন বুয়েচ মন্মথচন্দ্র— । বলেছিলেন রমেশ স্যার, সুপ্রচুর কৌতুকভরে হাসতে হাসতে বলেছিলেন—মাই গ্রাণ্ডপা ওয়াজ এ জিনিয়াস, ইউ সী— । প্রতিভা তাঁকে বলতেই হবে। বুয়েচ—এসব প্ল্যানিং তাঁর। নীলকুঠি চালানো বুদ্ধি ! দি জেন্টেলম্যান যেমন পোক্ত ছিলেন ফৌজদারীতে তেমনি শার্প ছিলেন দেয়ানীতে। পুরুতকে টাকা দিয়ে তিনি বশ করে এই অ্যারেঞ্জমেন্টটি করেছিলেন। না-হলে আমার ভীয়ার লাভিং গ্র্যাণ্ডমাকে কোনো-

মতে বাগ মানাতে পারছিলেন না। তিনি ধরে ছিলেন—তাঁর স্বামী যদি নীলকুঠি ছেড়ে গোঁসাইয়ের পাটে এসে ওই মা মঙ্গলচণ্ডীর সেবাইতগিরি করেন তবেই স্বামীকে ছোঁবেন তাঁকে গ্রহণ করবেন তাঁর ছেলেকে দেবেন, নাহলে—স্বামীকে বলেছিলেন—তুমি তোমার পথে যাও আমি আমার পথে যাব। সে যাকে বলে bow-breaking পণ। ধনুর্ভঙ্গ পণ। গ্রাণ্ডপা আমার জিনিয়াস ছিলেন সে তো বলেইছি, সব পারতেন দ্যাট জেণ্টেলম্যান। কিন্তু ওই যে ছেলে মানে আমার পিতা তার মমতায় এবং শুনি ওই পুত্রের মাতার প্রতি প্রণয়বশত প্রথম তাতেই রাজী হয়েছিলেন। তারপর আবেগটা কিঞ্চিৎ কমলে হিসেব নিকেশ করে দেখলেন—একদিকে এই খালি গায়ে খালি পায়ে মাথায় টিকির গুচ্ছসর্বস্ব গোঁসাইবাড়ির জীবন আর মা মঙ্গলচণ্ডীর প্রসাদে মণ কয়েক আতপচাল তৎসহ মুলো কলা ফলমূল বলির পাঁঠার 'মুড়ি'—এর সঙ্গে পত্নীপুত্রসুখ যোগ করেও নীলকুঠির চাকরির ধারে কাছে পৌঁছুচ্ছে না। তখন এই বুদ্ধি ফাঁদলেন। এটা তখনকার দিনে যত 'ওপেন সিক্রেট' তত তার প্রচণ্ড জোর। দেখেছ তো মাটির মা মনসার বারি মাথায় করে নাচি আমরা একদিকে অন্যদিকে সাপ দেখলে দমাদম পিটি—এও তাই আর কি! পুরুত তখন ভরের মধ্যে বললে আমায় দিয়ে আয় গিয়ে—আমি আর থাকব না, জোর করে রাখলে নির্বংশ করব গোঁসাইবাড়িকে তখন গ্র্যাণ্ডমা আমার টললেন। —তাহলে? উপায়?

উপায় আর কি? মায়ের আদেশ যখন তখন এর আর অন্য উপায় আছে নাকি? কিন্তু—। কিন্তু দিয়ে আসবেই বা কোথায় কাকে?

হঠাৎ খবর এলো গ্র্যাণ্ডমায়ের বড় ব্রাদার পাগল হয়ে গেছেন, মা-মা-মা রবে চেঁচাচ্ছেন আর বলছেন—যাই মা যাই মা, বলে কিছুদূর ছুটে এসে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন বা হাউহাউ করে কাঁদছেন আর বলছেন—কোন্ দিকে বলে দে মা। চুপ করলি কেন মা? মা গো!

অতঃপর সমস্ত ব্যাপারটা ভেরী ভেরী ভেরী ইজি হয়ে গেল। কল্পনা কর—একদিকে গোঁসাইবাড়ির পুরুত ভরের মধ্যে কেবল বলছেন—দিয়ে আয় আমাকে দিয়ে আয়, আর আমি থাকব না, আর ওদিকে প্রায় ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্তী এক গ্রাম থেকে গোঁসাইমশায়ের শ্যালক তিনিও ভরের মধ্যে চিৎকার করছেন—আয় মা আয় মা আয় মা। এবং একদা তিনি সেই ভরের মধ্যে গৃহ থেকে বের হয়ে এঁকেবেঁকে এগ্রাম ওগ্রাম করতে করতে চলে এসে পেঁছিলেন ভগ্নীপতির বাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে হরিষে বিষাদ। যত হর্ষ তত বিষাদ। বা যত বিষাদ তত হর্ষ। কারণ মা চলে যাচ্ছেন বলে বিষাদ, হর্ষ এই বলে যে, যাচ্ছেন যাচ্ছেন ভগ্নীপতির বাড়ি থেকে শ্যালকের বাড়িতে যাচ্ছেন। From brother-in-law's house to brother-in-law's house, বুয়েচ!

এর পরিণতি কি হল জান—এই যে শ্যালকটি ভগ্নীপতির ঘুষ খেয়ে মঙ্গলচণ্ডীর আটন বাড়িতে এনে জাঁকজমক করে ব্যবসা ফেঁদে বসলেন ইনিই একদা ভগ্নীপতির সঙ্গে কলহ করে আত্মীয়স্বজন মহলে সমাজে রোল তুললেন—ভগ্নীপতি গিরীশ গোঁসাইয়ের জাতিপাত হয়েছে। তিনি নীলকুঠির মত এক সাহেবের উচ্ছিষ্ট এক বাঈজীজাতীয়া যবনীকে রক্ষিতা রেখে তার ঘরে যা তা' খেয়ে থাকেন। সব থেকে বিস্ময়কর কি জান? সেটা হল এই যে আমার বাবা—তখন তাঁর বয়স কুড়ি পার হয়েছে—তিনি ইংরেজীতে সুশিক্ষিত ব্যক্তি—তিনি এই ব্যাপারে মাতুলের সঙ্গে যোগ দিলেন। এখন গিরীশ গোস্বামী এক আশ্চর্য কাণ্ড করে বসলেন। তিনি নীলকুঠির চাকরি ছাড়লেন, ওই বাঈজীকে ছাড়লেন, হিন্দুধর্ম ছাড়লেন and he became a Christian. ব্যাণ্ডেল চার্চে তাঁরা দীক্ষা নিয়েছিলেন। এতে আমার ঠাকুমা নাকি খুশী হয়েছিলেন। বলতেন—মঙ্গলচণ্ডী মা চলে গিয়ে অবধি প্রাণটা হু-হু

করত এখন মেরী মাকে পেয়ে যেন ভালো লাগছে।

কাকাবাবু ; জটাধর ভটচাজ এখন জটাধরবাবু এবং কাকার স্থলে কাকাবাবু। কাকাবাবু তাকে ফিরিয়ে নিতে এসে যখন বার বার রাধাবল্লভ প্রভুর ভটচাজবাড়িতে স্বপ্ন দিয়ে আগমনের অলৌকিক কাহিনী বলে বলেছিলেন—এ বংশের ছেলের কি জাত যায় না যেতে আছে ? প্রভু রাধাবল্লভ স্বয়ং রক্ষাকর্তা। তিনিই তোকে রক্ষা করেছেন যে তুই ওই রমেশ গোঁসাইয়ের বাড়ি জল খাস নি। চল এখন বাড়ি চল। মন্মথ তখন মনে মনে রমেশ স্যারের কাছে শোনা তাঁদের বংশের ওই গল্পটিকে স্মরণ করেছিল। এই স্মরণ করার মধ্যেই ছিল তার উত্তর। কিন্তু সেটা মুখ ফুটে বলতে তার কষ্ট হচ্ছিল। কথা তো কম নয়। আর তার সঙ্গে জড়ানো দুঃখকষ্ট সেও কম নয়।

মা মারা গেলেন—ছোট ভাইটি মারা গেল—বাগদী-মাও মারা গেল। তারপর ছিলেন বাবা আর ছিলেন বংশের ঠাকুর রাধাবল্লভ। মায়ের মৃত্যুর পর কাকা এলো নতুন জীবন নতুন জগতের সন্ধান নিয়ে। সে এই জগতে এই জীবনে এসেছিল এই কাকার হাত ধরে। তার বাবা ছিলেন তার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। পুরুষোত্তমের সেবক তিনি, পুরুষোত্তমকে জানে যে মানুষ সেই মানুষ তিনি। তাঁর কাছে পৃথিবীর রাজ্যপাট তুচ্ছ ভোগবিলাস তুচ্ছ—তিনি এসবের অনেক ঊর্ধ্বে। রাজা মহারাজা যেই আসুন না কেন এই খালিপা খালিগা মানুষটির কাছে মাথা নত করে দাঁড়াতে হয় সকলকে। কিন্তু আড়াল থেকে এবং আড়াল দিয়ে একদল মানুষ উলটো কথা বলে। বলে—জীবনে জগতে নতুন বিদ্যা এসেছে যে বিদ্যা মানুষকে এমন মহিমা দেয় সেটা পার্থিব হলেও তার অনেক দাম। এ নিয়ে সমাজ সংসারে আর কথার শেষ নেই। এবং সে কথাগুলো কথার কথাই নয় কথাগুলোর এমন একটা দাম আছে যে-দামকে মানতেই হয় মানুষকে এবং দিতেও হয়। তার কাকা বংশের মহিমা আয়ত্ত করতে পারে নি চায়ও নি আয়ত্ত করতে ; সোজাসুজি হাটবাজারে কাজকারবারে নেমে গিয়েছিল এবং লক্ষ্মীর কৃপাও সে পেয়েছিল। সেই লক্ষ্মীর কৃপায় জলুস নিয়ে যেদিন কাকা গোবিন্দপুরে গিয়েছিল সেদিন সে দেখেছিল যে কাকার সম্পদের জলুসের কাছে বাবার ঠাকুরপুজোর এবং শাস্ত্র-জানার মহিমা মাহাত্ম্য বড্ড যেন ম্লান হয়ে গেল। তার সারা বাল্যকালটা ধরেই তাদের বাড়ির বাইরে বাইরে যেটা লোকে বলে আসছিল সেটা যেন সেদিন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল একমুহূর্তে। সে কাকাকে একসময় বলে ফেলেছিল—আমাকে কলকাতায় নিয়ে যাবে কাকা ?

কাকা সেদিন গদ্‌গদ হয়ে উঠেছিল। বড়ভাইকে অর্থাৎ তার বাবাকে খুশী করার জন্য তার সে কি আকুতি। তার স্পষ্ট মনে আছে সে ভেবেছিল এই নতুন কালের বিদ্যাকেও শিখে অনেক সম্মান অনেক মহিমা অর্জন করে গ্রামে ফিরে এসে ওই ঠাকুরের সেবা করবে। বাবা তাকে বলেছিলেন—মন্মথ, পৃথিবীতে মৃত্যুপতি যম পুত্র পৌত্র রাজ্য সম্পদ হস্তী অশ্ব স্বর্ণ মণি মুক্তা অপ্সরা দেবকন্যা সাজিয়ে রেখেছেন—মানুষ এর জন্যে ছুটে যায় এবং যমকে জীবনের অমৃতটুকু মূল্যস্বরূপ দিয়ে এই সব পাওয়ার সঙ্গে মৃত্যুকেই বরণ করে। এই তো সেদিন পরশু দিন মানে যেদিন এই ঘটনা ঘটে, কাকার বাড়ি ছেড়ে সে যেদিন চলে আসে সেদিনও এ কথা সে জ্যোতিপ্রসাদবাবুকে বলেছিল। জ্যোতিপ্রসাদবাবু বলেছিলেন—না মন্মথ। ঐশ্বর্য মানে স্বর্ণ রৌপ্য রাজ্য অন্ন বস্ত্র বাদ দিয়ে ভুয়ো অমৃত সন্ধানে অনাহারে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে শুকিয়ে থাকার সাধনা আমরা অনেক করেছি।

সে কথাটাকে অস্বীকার করে নি। অস্বীকার করবে কি ? এই ক'বছর পড়তে পড়তে সে তো এই সত্যটাকে উপলব্ধি করেছে, এবং মনে মনে স্বীকার করে নিয়েছে।

তারপর, রমেশ স্যার তার কাছে তাঁদের নিজেদের বাড়ির মঙ্গলচণ্ডীর আটনটির বৃত্তান্তের সঙ্গে তাদের রাধাবল্লভের মনোহর আগমনকাহিনীটির যে আশ্চর্য মিল দেখিয়ে দিলেন তারপর সে তো সব বিশ্বাস সব শ্রদ্ধাভক্তি হারিয়ে যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল। কলকাতায় এসেছে সে কম দিন নয়, তা অনেক দিন হল, আড়াই বছর। এম. ই. পাস করে এসে হিন্দু স্কুলের ফোর্থ ক্লাসে ভরতি হয়েছিল, এখন সে সেকেন্ড ক্লাসে পড়ছে ; সামনে ছ' মাস পরেই ফার্স্ট ক্লাস, তারপর এণ্ট্রান্স পরীক্ষা। এই আড়াই বছর সে সত্য এবং বিভূতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তপস্যা করার মতো পড়েছে। সেই পড়ার মধ্য দিয়ে যা শিখেছে সে তার বংশের মহিমা এবং কুলগত শিক্ষা ও বিশ্বাসের সঙ্গে অনুকূল নয়। তবু কোনো রকমে মানিয়ে নিয়ে চলছিল। কলকাতায় কাকার বাড়িতে কাকীমার প্রবর্তন করা নানান আচার-আচরণ সে দিব্যি মেনে চলত। বাড়ির বাইরে কোথাও থেকে বাড়ি ঢুকলেই দাঁড়াতে হত স্থির হয়ে—কাকীমা গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধ করে নিতেন। কোনো খাদ্যের পবিত্রতা সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থিত হলে গোবরের কুচি খাওয়াতেন, নানান ধরনের অন্ধ ভ্রান্ত আচরণ পালন করাতেন ; সেও পালন করে চলত। মনে মনে বুঝেও মনে মনে হেসে পালন করত। মধ্যে মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হত ; একবার গামছা পরে বাথরুমে যাওয়া নিয়ে বিরোধ বেধেছিল। কিন্তু কাকা জটাধর নিজে তাকে অনুরোধ করেছিলেন—বাবা, মেয়েছেলের কাণ্ড রে, একটু মেনে চলই না বাবা। ক্ষতি কি বল? তুই খোঁজ করে দেখ সক্কলেই গামছা পরে বাথরুমে যায়।

সে মেনে নিয়েছিল। এবং খোঁজ করে দেখেছিল কাকার কথা ষোল আনাই সত্য। কাকাকে গোবর খেতে হত রোজ। কারণ কাকা ব্যবসায়ের দায়ে রোজ সায়েব কোম্পানির বড়সায়েব ছোটসায়েব মেজসায়েব সেজসায়েবের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। সেখানে কিছু খান বা না-খান কাকীমা গোবর খাওয়ার ব্যবস্থা করতেনই করতেন। বলতেন 'না খাও কিছু কিন্তু যে-টেবিলের উপর রেখে ওরা চা খায় খানা খায় সেই টেবিলে তো হাত রেখে বসেছ, নেড়েছ চেড়েছ। বল না? নেড়েছ কিনা? আর সেই হাত মুখে দিয়েছ। দাও নি?'

এ সমস্তই সেদিন সেই রাত্রে তার কাছে সেই ঘর ছেড়ে চলে আসার সঙ্গে যেন অসহ্য অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। এমন কি বাবার সম্পর্কেও তার সারা অন্তরটা যেন শুকনো এবং শক্ত হয়ে উঠেছিল। রাধাবল্লভও তার কাছে যেন মিথ্যা হয়ে গিয়েছিল। রাধাবল্লভ একটি পাথরের গড়া মূর্তি—তার মধ্যে ভগবান নেই এ কথা মনে উঠলেও তার বুকটা টনটন করে নি চোখে জল আসে নি।

জটাধরবাবু তাকে বার বার বলেছিলেন—তুই ফিরে চল বাবা। তোর কাকীমা তোকে কত ভালবাসে তুই কি জানিস নে?

পাথরের মূর্তির মতোই নির্বাক নিরুত্তর এবং স্থির হয়েই সে সারাটা ক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল স্কুলের বারান্দার মেঝের দিকে তাকিয়ে। তার বাঁ হাতখানা সে রেখেছিল নিজের মুখের উপর। কোনোমতেই আজ আর সে কাকার কথা মেনে নিতে পারছিল না।

শেষ কথা বললেন জটাধরবাবু—ভেবে দেখ দাদাকে আমি কি বলব?

তাতেও কোনো কথা বলে নি মন্মথ। এবার জটাধর বলেছিলেন—বেশ আমার কথা নয় ছেড়েই দিলাম কিন্তু তুই, তুই কি বলবি তোর বাপকে? কি বলবি? না হয় বলবি কাকা কাকীমা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বাবা যখন জিজ্ঞাসা করবে—কেন তাড়িয়ে দিলে? কি বলবি তুই? বলবি—বিনা দোষে? না বলবি—ওই জ্যোতিপ্রসাদবাবু ব্রাহ্মদের বাড়িতে তুই যাওয়া আসা করতিস বলে খেতিস বলে—

মন্মথ এতক্ষণ পর কথা বলেছিল, কাকার কথার মাঝখানেই সে বলে উঠেছিল—সব আমি

খুলে বলব কাকা। একটি কথাও আমি লুকোব না।

জটাধর নির্বাক হয়ে ভাইপোর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিলেন। বিস্ময়ের আর তাঁর সীমা ছিল না। অনেকক্ষণ পর তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কিন্তু থাকবি কোথায়? এই কলকাতা শহরে—

মন্মথ বলেছিল—হেডমাস্টার মশায় আমাকে চিঠি লিখে দিয়েছেন। পাঁচখানা চিঠি দিয়েছেন—তার কোনো না কোন জায়গায় হয়ে যাবে।

কলকাতায় সারা ভারতবর্ষের মূলধন খাটে। এখানে সারা উত্তর ভারতের কাঁচামাল দেশান্তরে চালান যায়—দেশান্তর থেকে নানান জিনিস এসে নামে। এখানে ধুলোর মুঠো ধরলে সোনার মুঠো হয়। আবার যে হতভাগা তার সোনার মুঠো ধুলো হয়ে ধুলোয় মিশে যায়। কলকাতায় সারা দেশের বড় বড় ধনী ধনকুবেরের বাস। তাদের বিলাসে অর্থ ওড়ে, ব্যসনে অর্থ ওড়ে; কামিনীর পিছনে কাঞ্চন গলিত হয়ে ছোটে জলস্রোতের মতো; জুয়ায় ছিটিয়ে দেয় খোলামকুচির মতো; আবার দাতা দান করে, ভক্ত ভগবানের পূজায় ব্যয় করে—তারও পরিমাণ কম নয়; তাও অনেক, বিপুল।

কলকাতায় গত পঞ্চাশ ষাট বছরের মধ্যে যা কিছু হয়েছে—ইস্কুল কলেজ দাতব্য চিকিৎসালয় হাসপাতাল গ্রন্থাগার—এ সবই হয়েছে দাতাদের দানে। ধনীরা দান করেছেন। করেছেন নামের জন্যেই বেশী এ কথা বলেও বলতে হবে তাঁরা করেছেন। কলকাতায় ভিক্ষুক হাজারে হাজারে। সেই সঙ্গে এও বলতে হবে যে এদের জন্যে অন্নদানও কম হয় না। এঁটোকাঁটা বাদ দিয়েই বলছি মোটা ডাল ভাত গরীবদের খেতে দেওয়ার ব্যবস্থা কলকাতার অনেক বাড়িতে আছে।

কলকাতার ছড়াতে আছে—

> "চোরবাগানে ক্ষুধার্ত জনের নাহি বঞ্চনা
> রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক রায়
> অকাতরে অন্ন বিলায়—"

শুধু মল্লিকবাড়ি কেন, মল্লিকবাড়ি, লাহাবাড়ি, লালাবাবুদের রাজবাড়ি, মতি শীল, কৃষ্ণ বোস, ছাতুবাবুর বাড়ি, হাটখোলার দত্তবাড়ি, শোভাবাজারের দেব রাজবাড়ি বড় তরফ ছোট তরফ, রাজা দিগম্বর মিত্তির, রানী রাসমণির বাড়ি, রানী স্বর্ণময়ীর বাড়ি, পাথুরেঘাটা, জোড়াসাঁকোর রাজবাড়ি, ঠাকুরদের বাড়ি, বড়বাজারে বসাকদের শেঠদের বাড়িতে অন্নদান বস্ত্রদান অর্থদান অনেক দানের ব্যবস্থা আছে। অনেক দান। নানা দায় আছে মানুষের জীবনে—তার জন্য নানান দানও আছে। মুষ্টিভিক্ষা কন্যাদায় পিতৃমাতৃদায় নানান দায়। দায়ের মতো দানও আছে হাজার দু'হাজার। কন্যাদায়ে হাজার দু'হাজার ও তিন চার হাজারও দান করেন বলে শোনা যায়। পিতৃমাতৃদায়ে দুশো পাঁচশোও দান করেন। এঁদেরই বাড়িতে বিদ্যার্থীদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা আছে। মাসিক বৃত্তি। আবার অনেকের বাড়ি আহার আশ্রয় বৃত্তি তিনরকমই দেওয়া হয়। এসব ক্ষেত্রে প্রায় সকল বাড়িতেই দেবসেবার সঙ্গে এগুলিকে জুড়ে দেওয়া আছে। ঠাকুরবাড়ির সংলগ্ন অতিথিদের থাকার ঘরে বিদ্যার্থীরা থাকে—ঠাকুরবাড়িতে খায়, দেবোত্তর এস্টেট থেকে বৃত্তি পায়।

আবার দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের মতো বিদ্যার্থীদের পরমাশ্রয়ও আছেন। তিনি ছাড়াও কলকাতা হাইকোর্টের বড় বড় উকিল আছেন যাঁরা বিদ্যাশিক্ষার্থীদের অন্ন এবং আশ্রয় দিয়ে থাকেন।

হেডমাস্টার মশায় এঁদেরই কয়েকটি বাড়িতে পত্র লিখে তার হাতে দিয়ে বলেছিলেন—

দেখ পত্র কয়েকজনের নামেই দিয়েছি তার মধ্যে তোমার কাকার পাড়ারই দেব সরকারদের নামেও দিয়েছি। কিন্তু ওখানে তুমি যাবে সব শেষে। যদি কোথাও না-পাও তবে যাবে। কেমন ?

মন্মথ তাই স্বীকার করেছিল। এবং তার নিজেরও, ওই কাকারবাড়ির প্রায় সামনাসামনি বিখ্যাত ছাতুবাবু লাতুবাবুর বাড়িতে যেতে সংকোচ হয়েছিল। ওদের বাড়ির সামনে দিয়ে কাকার জুড়ি গাড়িতে চেপে সে অনেক দিনই এখান ওখান যাতায়াত করেছে। লোকেও কানা-কানি করে বলে, জটাধরবাবুর ভাইপো, ওই সব বিষয়সম্পত্তি পাবে, ওঁর তো ছেলেপুলে নেই। একবার কাকাবাবুর সঙ্গে ওদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতেও এসেছিল। কাকা তার পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন—আমার ভাইপো। তবে আমার বাপধন। আমাদের বংশে ছেলে ওই একটাই। দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে ঠিকানা অনুযায়ী সে যাবার সংকল্প করে প্রথমেই গিয়েছিল বড়বাজার অঞ্চল। বড়বাজারে তখন নতুন বড়বাজার গড়ে উঠছে। শেঠ, বসাক, রতন সরকার, গাঙ্গুলীবাবুরা, একটু সরেই ঠাকুরবাবুরা এখানকার বনেদী বাসিন্দে। এঁরা ছাড়াও এখানে তখন নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে এবং ভাসা হাওড়ার পুল তৈরি হয়েছে বলে এখানে দলে দলে মাড়োয়ারীরা এসে দোকানদানী খুলছে; এই অঞ্চলেই আরম্ভ হল তার নতুন জীবন।

প্রথমেই সে গিয়েছিল ঠাকুরবাবুদের বাড়ি। বিরাট বাড়ি। দরজায় দারোয়ান—তার বুকে পেতলের তকমা আঁটা, মাথায় মস্ত পাগড়ি, তার সঙ্গে একজোড়া পাকানো গোঁফ; দেখে শুনে ভয় হয়েছিল তার। তবুও কোনরকমে ভয়কে জয় করে সে ঢুকেছিল কিন্তু তাতেও তার কাজ হয় নি। কারণ কর্তাবাবু তখনও ওঠেন নি। তখন বেলা ন'টা।

কর্মচারীরা বলেছিল—বসতে হবে।

কিছুক্ষণ বসে থেকে সে বিরক্ত হয়ে আস্তে আস্তে অনেকটা যেন চুপিচুপি সবার অগোচরে বেরিয়ে এসেছিল; ওখান থেকে যাবে শেঠদের বাড়ি; তারপর পাথুরেঘাটা। সেখানে আরও বড় বাড়ি আরও বড় ব্যাপার—মহারাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ি; শৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুর তার কাকাকে চেনেন। তাঁর ওখানে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? ভাবতে ভাবতেই চলছিল এমন সময় একখানা জুড়ি গাড়ির সামনে পড়ে গেল সে। তেজী দামী একজোড়া ফিটু সাদা রঙের জুড়ি ফটক থেকে বেরিয়ে রাস্তার উপর মোড় নিচ্ছিল—অন্যমনস্ক মন্মথ সরে দাঁড়াবার হিসেব ভুলে সামনে পড়ে গিছল।

গাড়ির সহিসটা বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে-ই তার হাত ধরে টেনে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল—কাঁহাকা বুড়বক হো—উল্লু কাঁহাকা! সহিসটার হ্যাঁচকাটানে পথের ধুলোর উপর পড়ে গিয়ে মন্মথর লজ্জা এবং নিজের উপর রাগ অভিমানের আর শেষ ছিল না। পথের লোকেও হৈহৈ করে উঠেছিল। গাড়ির ভিতর থেকে বাবু হেঁকেছিলেন—রুখ যাও! করীম! রুখো গাড়ি।

গাড়ি রুখে গিছল। বাবুটি গাড়ি থেকে নেমে মন্মথকে ধরে তুলতে গিয়েছিলেন।

মন্মথ জামা কাপড় ঝেড়ে উঠতে উঠতে বলেছিল—না না না। আমার লাগে নি। কিছু হয় নি আমার!

বাবুটির দিকে তাকিয়ে তার বিস্ময়ের আর অন্ত থাকে নি।

কালো কুৎসিতদর্শন একটা লোক। পারনে পেন্টালুন চাপকান মাথায় শ্যামলা চাপকানের উপর চাদর, দেখেই বোঝা যায় যে লোকটি কোনোও পদস্থ জন। সম্ভবত উকিল।

বাবুটি বলেছিলেন—তুমি কে? এমন সুন্দর তোমার চেহারা তুমি এমন অন্যমনস্ক উদ্‌ভ্রান্তভাবে পথ হাঁটছিলে? আমি তোমাকে লক্ষ্য করেছি তুমি যখন এসে পড় সামনে। কি

হয়েছে তোমার ?

—না না । কিছুই হয় নি আমার। দোষ আমারই। আমি আমি—বলতে বলতে সে কেঁদে ফেলেছিল।

—না। তুমি আমার সঙ্গে এস। এই গাড়িতে আমি হাইকোর্টে যাচ্ছি, তুমি আমার সঙ্গে চল, এস।

সে একরকম তাকে টেনেই গাড়িতে তুলে নিয়েছিলেন।

হাইকোর্টের খুব নামজাদা উকিল হরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কালো কুৎসিতদর্শন কিন্তু মানুষ হিসেবে এ মানুষের বুঝি তুলনা নেই। তার সমস্ত কথা চোখ বন্ধ করে গাড়ির পিছনের গদিতে হেলান দিয়ে বসে তিনি শুনেছিলেন একটিও কথা বলেন নি। তার কথা শেষ হবার পরও কিছুক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। তারপর হঠাৎ বলেছিলেন—বল তো, আমাদের দেশে সব থেকে বড় মানুষ কে ? যাঁরা মারা গেছেন তাঁদের কথা বলছি।

সে নাম করেছিল ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন আর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

—আচ্ছা। আর বল তো—ইদানীং ক'বছরের মধ্যে আমাদের দেশে কি নিয়ে বেশী হইচই মানে আন্দোলন হল ?

মন্মথ বলেছিল—কংগ্রেস আর ইলবার্ট বিল।

তিনি বলেছিলেন—তুমি আমার বাড়িতে থাকবে ? আমি তোমার সব ভার নিতে প্রস্তুত আছি। তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। আমরাও ব্রাহ্মণ। চাটুজ্জে আমরা। বুঝেছ ! আমাদের দেশ হল বর্ধমান।

হরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল। হাইকোর্টের উকিল।

সে খানিকটা অভিভূত হয়ে গিছল।

হরচন্দ্রবাবু বলেছিলেন—আমরা একটু গোঁড়া হিন্দু। তবে তোমার কাকার মতো ঠিক নয়। তোমার ওই জ্যোতিপ্রসাদবাবুকেও খুব জানি আমি। আমরা দুজনেই হাইকোর্টের উকিল। আমি ওঁর বাড়িতে চা-টা খাই। মানে বিস্কুট মিষ্টি খাই। আমি ঠাকুরের শিষ্য। পরমহংসদেবের।

এসব এক বছর আগের ঘটনা।

এই এক বছরের মধ্যে সে অ্যানুয়াল পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েই ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছে। সত্য সেকেণ্ড হয়েছে।

কাকা আর তার সঙ্গে দেখা করেন নি। পত্রও লেখেন নি। তবে বাবা লিখেছিলেন। লিখেছিলেন—"কি ঘটিয়াছে আমি তাহাও জানি না এবং যতদূর শুনিয়াছি তাহা হইতেও ঠিক অনুমান করিতে পারি নাই ইহার গুরুত্ব কতটুকু। তোমার ছোটমা বলিতেছেন—আমার ছোটবাবা কখনই অন্যায় করিতে পারে না। তোমার ছোটমা তোমাকে ছোটবাবা বলে তাহা তুমি জান। তিনি বলিতেছেন—জটাধর এখন নিত্যই উত্তরোত্তর ধনী হইতেছে। এখানে সম্পত্তির পর সম্পত্তি ক্রয় করিতেছে ঈশ্বরী কালীমাতার নামে ; অবশ্য সেবায়েত সে এবং ছোটবধূমাতা উভয়ে। তাহার ব্যবস্থাদি যাহা করিবার তাহার ম্যানেজার করিয়া থাকে। রাধাবল্লভ জীউয়ের সেবাইত স্বত্ব সে আমাকে অনেককাল আগে বিক্রয় করিয়াছে। সেই কারণে রাধাবল্লভ জীউজীর বারো মাসের পূজায় বা পার্বণে সে কোনোপ্রকার ব্যয়াদি করে না। ১লা বৈশাখ কালীপূজায় খ্যামটানাচ ঢপ কীর্তন হয়—তজ্জন্য তোমার ছোটমাতা তাহাকে নিজ হাতে লিখিয়াছিলেন রাধাবল্লভ জীউর রাস উৎসবে

একটা কিছু করাও—তাহাতে সে সোজাসুজি 'না' করিয়া দিয়াছে। লোকপরম্পরায় শুনিলাম অনেক মন্দও কহিয়াছে। জটাধরের এখানকার কর্মচারী ইহা প্রচার করিয়াছে। এবার অর্থাৎ তুমি জটাধরের বাড়ি হইতে চলিয়া যাওয়ার পর জটাধর নাকি তাহার কর্মচারীকে ম্যানেজারকে লিখিয়াছে—বড়কর্তাকে বলিয়ো রাধাবল্লভের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করা প্রয়োজন কারণ বড়কর্তার উত্তরাধিকারী মন্মথ যেভাবে কলিকাতায় নব্যপ্রবাহে ব্রাহ্মমোহে পড়িয়াছে তাহাতে ভবিষ্যতে রাধাবল্লভ তৃষ্ণার জল পাইবেন না ক্ষুধায় এক মুষ্টি আতপ চাউল একখানা বাতাসা পাইবেন না।"

সে অনেক বড় চিঠি।

জগন্নাথঘাটে বসে চিঠিখানা সে পড়ছিল। চিঠি একখানা নয়। দু' তিনখানা চিঠি তার বুকপকেটে রাখা ছিল। আবার সে সমস্যায় পড়েছে। আবার সে বোধহয় আশ্রয়হীন হতে চলেছে। হরচন্দ্রবাবুরও সেই আপত্তি।

ধর্মকে সে বিসর্জন দিতে চলেছে। হয়তো জানে না নিজে। নিজের অজানিতেই একালের কোনো প্রমত্তজনের ছেঁড়া পৈতের মতো কাঁধ থেকে খসে পড়তে চলেছে, ওর প্রতি পদক্ষেপেই একটু একটু করে খসে পড়ছে ও বুঝতে পারছে না। একবারে যখন পড়বে তখনও খেয়াল হবে না। তারপর আর হয়তো পৈতের ওর প্রয়োজনই হবে না। হরচন্দ্রবাবু তাকে চিঠি লিখেছেন। আর একখানা পত্র হেডমাস্টারমশাই তাকে লিখেছেন।

কয়েক দিনই সে স্কুলে যাচ্ছিল না। উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরছিল চারিদিকে। আজই চিঠি পেয়েছে। 'অবিলম্বে দেখা কর'—immediately শব্দটার তলায় দাগ দেওয়া আছে। সে জানে মাস্টারমশায় কি বলবেন! বোধহয় হরচন্দ্রবাবু তাঁকে তাঁর কথাগুলি জানিয়েছেন। অথবা মাস্টারমশায়ও ঠিক এই কথাই অনুভব করেছেন। এই একটা বছরের মধ্যে মাস্টারমশায়ের খুব কাছে এসে পড়েছে সে। যার তুলনায় তার শ্রদ্ধার রমেশ স্যারও একটু দূরে পড়েছেন। এ সব কথা নিয়ে সে রমেশ স্যারের কাছে যেতেও চায় না। চিঠিগুলো নিয়ে সে জগন্নাথঘাটে বসে পড়ে দেখে স্থির করে নিচ্ছে হেডমাস্টারমশায়কে সে কি বলবে কি উত্তর দেবে?

জগন্নাথঘাটের একপাশে বসে মন্মথ ওপরের দিকে তাকিয়ে নিজের চিন্তাতেই মগ্ন হয়ে গিয়েছিল। সমস্যাটা তার কাছে প্রায় জীবন-মরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হরচন্দ্রবাবু যেদিন তাকে আশ্রয় দেন সেদিন তাকে বলেছিলেন তিনি হিন্দু, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য, তবে তার কাকার মতো গোঁড়া নন। তিনিও হাইকোর্টের উকিল—জ্যোতিপ্রসাদবাবুও হাইকোর্টের উকিল—দুজনে দুজনকে বিলক্ষণ চেনে—এবং এখানে ওখানে দু'চার জায়গায় সভাসমিতি থাকলে বা সামাজিক নিমন্ত্রণ থাকলে ছোঁয়াছুঁয়ির মধ্যে চা-ও খেয়ে থাকেন। বলেছিলেন—তুমি যদি আমার এখানে থাক তাহলে তোমার অসুবিধে হবে না। আমি খুব খুশী হয়েছি তোমার উত্তর শুনে। মন দিয়ে পড় জীবনে উন্নতি করবে তুমি।

সে হেডমাস্টারমশায়ের কথামতোই চাটুজ্জেবাড়িতে এসেছিল। এবং কিছু কাল বেশ ভালোই ছিল। একখানি স্বতন্ত্র ছোট ঘর তাকে দিয়েছিলেন হরচন্দ্রবাবু—তক্তাপোশ, তার বিছানা মশারি, ছোট একটি বইরাখা শেল্‌ফ দুখানা চেয়ার একখানা টেবিল—মোটমাট বেশ পরিচ্ছন্ন ভদ্র থাকবার ব্যবস্থায় মনে মনে একটি স্বচ্ছন্দ স্ফূর্তি পেয়েছিল। কাকার বাড়ির মতো তার বিলাসিনী এবং ধনীগৃহিনী কাকীমার সমাদরের অপচয়ে খুব আনন্দ পেত না সে। বরং মনে হত কাকীমা তাকে কৃতার্থ করে অনেকটা যেন কেনা পোষ্যজন করে নিচ্ছেন। কাকাবাবু পুরুষমানুষ—তাঁর মেজাজটাও কিছু আলাদা—তাঁর সমাদর কিছু অন্য ধরনের হলেও সেটাও ছিল অন্যরকমের অস্বস্তিকর। একজনের সমাদরের মধ্যে উত্তাপের

মাত্রা ছিল অসহনীয়—শীতকালেও যে গরম জল গায়ে ঢাললে চমকে উঠতে হয় তেমনি ধারার, অন্য জনের আদরটা ছিল দামী জরিদার সুঁওসুঁওওয়ালা পশমী শালের মতো, যেটা গায়ে জড়ালে তার জরির খোঁচায় এবং পশমের সুঁওসুঁওতে সারা দেহ মন ত্রাহি ত্রাহি করে ওঠে। তার উপর রাধাশ্যাম—। রাধাশ্যাম এরপর বেশ কিছুদিন—অন্তত মাস কয়েক তার ঠিক সামনে আসে নি। আশেপাশে বেড়িয়েছে কিন্তু সামনে এসে কথা বলে নি। হিন্দু স্কুলের ফটকের আশেপাশে সে পূর্বের মতোই দাঁড়িয়ে থাকত কিন্তু কাছে এসে কথা বলত না। মন্মথ স্কুল থেকে বেরিয়ে বড়বাজারের রাস্তা ধরত, চলে যেত সোজা গঙ্গার দিকে পশ্চিমমুখে; আর রাধাশ্যাম সোজা চলত কলেজ স্ট্রীট ধরে উত্তরমুখে পুরনো রাস্তায়। চলত কলেজ স্ট্রীটের পশ্চিমদিকের ফুটপাথ ধরে। কারণ পূর্বদিকের ফুটপাথ ধরে চলত সত্যপ্রসাদ। সত্যই এ কথা তাকে বলেছিল, সে কখনও রাধাশ্যামের দিকে ফিরে তাকাত না।

রাধাশ্যামের বাবা পণ্ডিতমশাই কিন্তু দুঃখ পেয়েছিলেন। কিছুটা লজ্জিতও যেন হয়েছিলেন। কিছুদিন পর—বোধ করি মাসখানেক পর একদিন নিজে তাদের ইস্কুলে এসে তাকে ডেকে একটু একান্তে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন—আমি সব শুনেছি মন্মথ। রাধাশ্যাম এইটের হেতু হল এতে আমার দুঃখ অনেক। কিন্তু ও ঠিক এইটে চায় নি। জটাধর কৃষ্ণভামিনীও, না তারাও ভাবে নি যে এমনটা হতে পারে।

একটু চুপ করে থেকে একটু হেসে বলেছিলেন—তাইতো হয়। মানুষ যা করতে চায় আর সর্বকর্মের নিয়ন্তা বিধাতা যা ঘটাতে চান এ দুটো সম্পূর্ণরূপে পৃথক; একটা ভাগীরথী অন্যটা কীর্তিনাশা! জলকে যিনি নিচের দিকে টানেন তিনিই চান যে জল চলুক উঁচু দিকে। তারপর বিচিত্র হেসে বলেছিলেন—জান, বিধাতা যিনি তাঁর মধ্যে একটি নারদমুনি আছেন যিনি ল্যাঠা লাগাতে ভালবাসেন। ভালো কথা অর্থাৎ শুভ কথা যে বলে মানুষের কাছে সেই হয় দোষী সেই হয় অপ্রিয়। রাধাশ্যাম তোমার হিতকামনা করে কিনা—!

মন্মথর মনে পণ্ডিতমশায়ের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ সেদিন পর্যন্ত ছিল না। রাধাশ্যামের বাবা হয়েও আচারে বিচারে তিনি অনেক উদার ছিলেন। কিন্তু সেই দিন ওই কথাগুলি শুনে সে মনে মনে বিরূপ না হয়ে উঠে পারে নি। তাঁর কথার মধ্যে তিনি স্পষ্ট করে রাধাশ্যামের দোষ হালকা করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মুখে সে কথা সে বলতে পারে নি। চুপ করে মাটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছিল।

পণ্ডিতমশায়ও ওই কথা ক'টি বলে চুপ করে বা চুপ হয়ে গিছলেন। তিনিও চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাঁর হাতের ছাতাটার বাঁটের ডগায় লাগানো লোহার আংটাটা দিয়ে মাটির উপর ঠুকতে শুরু করেছিলেন। মন্মথ খুঁজছিল মনের খানিকটা বল খানিকটা রূঢ়তা যাতে সে কথার উত্তরে কথা বলতে পারে। কিন্তু সে বল সে কোনোমতেই মনের হাতের কাছে পাচ্ছিল না। পণ্ডিতমশাই ভেবে পাচ্ছিলেন না আর কি বলবেন। তাই কিছুক্ষণ পর হঠাৎ বলার মতো বলে ফেলেছিলেন—ওকে আমি বকেও খানিকটা দিয়েছি। বুঝেচ। তবে তর্কে ঠিক এঁটে উঠি নি। তর্কবিদ্যায় ও পটু। এখন যে জন্যে তোমাকে ডেকেছি। এবার তো তোমার ব্যাকরণের শেষ পরীক্ষা। দিনও আর বেশী নেই—কিন্তু তুমি আসছ না—তা হলে।

বিচিত্রভাবে একটি মুহূর্ত এসেছিল, মন্মথ এক কোপে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলবার লগ্নটিকে মুহূর্তে আবিষ্কার করেছিল এবং বলেছিল—আমি আর উপাধি পরীক্ষা দেব না পণ্ডিতমশাই।

—সে কি ?

—না। ও আমি আর পড়ব না।

—তোমার বাবাকে কি বলব আমি ? জান তো, তুমি যখন ব্যাকরণ পড়া শুরু কর আমার কাছে তখন তিনি আমাকে কি লিখেছিলেন কি ভার দিয়েছিলেন। তুমি তো পড়েছ সে চিঠি !

—পড়েছি।

—তা হলে—তাঁকে কি লিখব আমি ?

—লিখবেন—যা সত্যি তাই লিখবেন। লিখবেন মন্মথ আর পড়তে চাইলে না।

—প্রশ্ন তো হতে পারে—শিখতে শিখতে দুটো পরীক্ষা ভালভাবে পাস করে শেষ পরীক্ষাটা দেবে না কেন ?

—তার উত্তরে যা সত্য মনে হবে আপনার তাই লিখে দেবেন।

—সেটা কি ? রাধাশ্যাম জটাধর ভামিনী তোমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে তা কিঞ্চিৎ অধিক কঠিন অধিক কর্কশ হয়েছে আমি স্বীকার করব। কিন্তু জ্যোতিপ্রসাদবাবুর পরিবারের সঙ্গে একটু বেশী মাত্রায় আকৃষ্ট নও কি ? সত্যপ্রসাদ ভালো ছেলে—পড়াশোনায় ভালো। কিন্তু ওদের আচার-আচরণ খৃীস্টানী। রাধাশ্যাম আমাকে সব বলে।

মনে মনে অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছিল মন্মথ। সে বলেছিল—তা হলে তাই লিখে দেবেন। লিখে দেবেন যে, ওদের প্রতি মন্মথ আকৃষ্ট। তার সঙ্গে এও লিখবেন যে, তবে তাদের বাড়িতে একদিনের বেশী যায় নি।

একটু হেসে পণ্ডিতমশায় বলেছিলেন—তা জানি। বেশী দিন যাওয়া আসার কথা যদি শুনতাম বাবা তাহলে তোমাকে এই কথাগুলি বলতে আসতাম না। আচ্ছা—। বলে পণ্ডিতমশায় চলে গিছলেন।

তাঁর চলে যাওয়ার ধরন কথাবার্তার সুর সব কিছুর মধ্যেই মন্মথ রাধাশ্যামকে দেখতে পাচ্ছিল।

ঠিক দিন তিনেক পর হেডমাস্টারমশাই তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তুমি কি উপাধি পরীক্ষাটা দিচ্ছ না মন্মথ ?

মন্মথ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, কোনো জবাব দেয় নি।

হেড স্যার বলেছিলেন—পণ্ডিতমশায় এসেছিলেন আমার কাছে।

মন্মথ এবার মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকালে। তার দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল।

হেডমাস্টার বললেন—না না তিনি কোনো অভিযোগ আমার কাছে করেন নি।

মন্মথ বললে—হ্যাঁ স্যার, আমি বলছি আমি সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা দেব না।

কিছুক্ষণ নীরব হয়ে একটা অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে তাকিয়ে রইলেন হেডমাস্টারমশায়, তারপর বললেন—তুমি সত্যদের বাড়ি আর কোনো দিন গেছ ? সেদিনের পর ?

মাটির দিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে সে জানালে—না।

—সত্যর সঙ্গে ঠিক আগের মতো কথাবার্তা আর বল না এইরকম নাকি শুনেছি। কথাটা সত্যি ?

মন্মথ আবার ঘাড় হেঁট করে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল।

হেডমাস্টারমশায় বললেন—না-না-না। কদাচ যেন এরকমটা না হয়। বুঝেছ ! সত্যপ্রসাদ সত্যপ্রসাদের বাবা ব্রাহ্ম—কিন্তু মহাশয় লোক। রুচিবান পরিবার। উদার অন্তঃকরণ। ওঁদের সঙ্গে কখনও যেন অভদ্র কি কটু ব্যবহার ক'রো না।

আবার একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—সংস্কৃত উপাধি তুমি দিচ্ছ না—তা একদিক দিয়ে তোমার পক্ষে ভালো হবে। সব সময়টা এণ্ট্রান্স পরীক্ষার জন্যই দিতে পারবে। ইংরিজীটায় আরও খানিকটা জোর দাও। ইংরিজী ভালো হয়েছে তোমার—তবু ইংরিজী হওয়া চাই ইংরেজের ইংরিজীর মতো।

কিছুক্ষণ পর বলেছিলেন—তোমার এবং সত্যর উপর স্কুলের আমাদের বিশেষ প্রত্যাশা আছে। আমি আমার নিজের প্রত্যাশাকে হাই হোপ্‌স বলতে পারি। এবং তুমি যে সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা এখন দিচ্ছ না এটা সেই আশার পক্ষে খুব অনুকূল হবে। আমি পণ্ডিতমশায়কে যা বলবার বলে দেব। কিন্তু তোমাকে চলতে হবে ক্ষুরের ধারের উপর দিয়ে। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম পথস্তত কবয়ো বদন্তি মনে রেখ, তুমি পড়তে এসেছ।

আবারও একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন—সর্বদা মনে রেখ তুমি হিন্দু হলেও তুমি মানুষ। তুমি student. এবং ব্রাহ্মরা হিন্দু থেকেই ব্রাহ্ম হয়েছে। যাও, এখন; না—আর একটা কথা বলি, তুমি একবার সত্যদের বাড়ি যাবে। ওঁরা খুব দুঃখিত হয়েছেন। যা ঘটেছে এসবের জন্যে নিজেকে দায়ী ভেবেছেন। আর একটা কথা, হরচন্দ্রবাবুর দুই ছেলে ঘোরতর বাবু এবং বিলাসী। এককালে পড়াশুনাতে ভালো ছেলেই ছিলেন দু'জনে। ওঁদের সম্পর্কে একটু সাবধানে থেকো। অবশ্য তাঁরা বাড়িতে থাকেন না। তাঁরা বাপের সঙ্গে পৃথক। তবু তাঁদের সম্পর্কে একটু সতর্ক থেকো। তবে হরচন্দ্রবাবুর প্রশংসা ইদানীং সকলেই করে।

হরচন্দ্রবাবুর দুই সংসার। প্রথমপক্ষের স্ত্রী দুটি ছেলে রেখে বিগত হওয়ার পর হরচন্দ্রবাবু দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছেন। দু'জনেই সংসারী, ছেলে মেয়ে স্ত্রী নিয়ে পৃথক-ভাবে বাড়ি তৈরি করে বাস করছে। বড়ছেলে করে কয়লার কারবার, ছোটছেলের কারবার পাটের; এছাড়া ধান চাল চালানের কারবারও আছে। সে কারবার এদেশে কিনে ওদেশে বিক্রি করার। মোটমাট পুরোপুরি সায়েবী ফার্মের সঙ্গে কারবার।

হরচন্দ্রবাবু যৌবনে সায়েবভক্ত ছিলেন। সায়েবভক্তি ছিল অত্যন্ত প্রবল। কেউ কেউ বলত আন্তরিক বাসনা ছিল খ্রীস্টান হয়ে বিলেত ঘুরে এসে যতখানি সায়েব হওয়া যায় ততখানি সায়েব হয়ে তবে ছাড়বেন। সেটা হয় নি তাঁর প্রথমপক্ষের স্ত্রীর জন্য। তিনি যতখানি সায়েব ছিলেন স্ত্রী তার বিপরীতে ঠিক ততখানি, না তাইবা কেন তার থেকেও বেশী গোঁড়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন বামুনী বা ব্রাহ্মণী ছিলেন। শোনা যায় তিনি গোবর গঙ্গাজল গোলা একটা বালতি নিয়ে শোবার ঘরে রাখতেন এবং বাইরে থেকে হরচন্দ্র এলেই তাঁর পায়ে সেই জল ঢালতেন এবং মাথাতেও ছিটে দিতেন। গোবরজলের বদলা নেবার কোনো পথ হরচন্দ্র পান নি। কারণ ভদ্রমহিলার বিদ্যাবুদ্ধি কিছু না থাক একটা বোধ ছিল যে সত্যিকারের প্রাণপণ যে করতে পারে তাকে হারাতে কেউ পারে না। তিনি মরতে পারতেন বলে হরচন্দ্র নিশ্চিন্ত ছিলেন। অবশেষে অনেক চিন্তা করে তাঁর উপরে আক্রোশ চরিতার্থ করবার জন্য এবং নিজের অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ করবার জন্য ছেলেদের পুরো সায়েব করবার জন্য তাদের ওপরে সায়েব টিউটর রেখেছিলেন। ইচ্ছে ছিল এক ছেলে ব্যারিস্টার হয়ে হাইকোর্টের জজ হবে, অন্যজন হবে আই-সি-এস। বড়ছেলে বার দুই এণ্ট্রান্স ফেল করে বিলেত গিয়েছিল। কিন্তু ব্যারিস্টার হয় নি। এদিকে হঠাৎ কয়লার খাদ কিনে কয়লার ব্যবসায়ে নেমে হরচন্দ্র তাকে কয়লাখনি ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে বলেছিলেন। এখানে তখন ছোটছেলে পড়াশুনা ছেড়ে কলকাতার শীল মল্লিক ঘোষ সিংহী বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে মিশে ঘোড়া গাড়ি এবং

গানবাজনার আসরে উঠতি মহাজন হিসেবে নাম অর্জন করেছে। এরই মধ্যে মারা গেলেন তাঁর প্রথমা স্ত্রী, ছেলেদের মা। শ্রাদ্ধ একটা তিলকাঞ্চন হল। তারপর কিছু দিন চাটুজ্জেবাড়িতে সায়েবীয়ানা চলেছিল চার ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে! এই সময়েই অঘটন ঘটল। হরচন্দ্র ঠোক্কর খেলেন ছেলের কাছে।

ওই ছোটছেলের কাছে। হাইকোর্টের উকিল হরচন্দ্র তাঁর আইন বুদ্ধি দিয়ে অনেক হিসেব-নিকেশ করে, কোলিয়ারী ও কয়লার ব্যবসা তার সঙ্গে পাটের ও ধান চাল চালানের ব্যবসা করেছিলেন দুই ছেলের নামে। বড়কে দিয়েছিলেন কয়লার ব্যবসায়ে ম্যানেজিং এজেন্সী, ছোটকে দিয়েছিলেন পাট ও ধান চালের ব্যবসার এজেন্সী। নিজে হাইকোর্টের উকিলই থাকতে চেয়েছিলেন এবং তাই ছিলেনও। বাড়িতেই নিচের তলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত বাড়ি ঢুকবার ফটক থেকে ঘোড়া এবং গাড়ি পর্যন্ত নিখুঁত এবং নির্ভুল আইন মাফিক আলাদা করে চিহ্নিত ছিল। একখানা ব্রুহাম ছিল—তাতে মনোগ্রাম এবং নাম লেখা ছিল—H. C. C. একখানা পালকিগাড়ি—সেটা ছিল ছোটছেলের নামে চিহ্নিত। মনোগ্রাম H. C. C. হলেও নিচে স্পষ্টাক্ষরে লেখা ছিল হৃদয়চন্দ্র চ্যাটার্জী। ওদের সকলেই H. C. C, বাপ হরচন্দ্র বড়ছেলে হরিশ্চন্দ্র ছোটছেলে হৃদয়চন্দ্র। বড়ছেলের নামে ছিল ল্যাণ্ডোখানা। ঘোড়া ছিল চারটে। ল্যাণ্ডোটার জন্যে ছিল দুটো সাদা ঘোড়া। ছোটছেলের কাছে ঠোক্কর খেলেন হরচন্দ্র এই গাড়ি নিয়ে।

সেদিন ছিল এক রবিবার। ছোটছেলে একদিন বাগানবাটিতে নিয়ে গিয়েছিল বড়দাদার নামাঙ্কিত ল্যাণ্ডোগাড়িখানা। পার্টিতে পান ভোজন নৃত্যগীত জাদুবিদ্যা মৎস্যশিকার প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল ঢালাও রকমে। ল্যাণ্ডোখানা খ্যামটাওয়ালীদের নিয়ে আসা যাওয়া করছিল। সেদিন সন্ধ্যায় হরচন্দ্রের দরকার হয়েছিল ল্যাণ্ডোগাড়ির। বাগবাজার বোসপাড়ায় সেদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস এসেছিলেন—হরচন্দ্র দৈবক্রমে বন্ধুর অনুরোধে ঠাকুরকে দেখতে এসে কেমন যেন একটা আকর্ষণে পড়ে যান। বাড়ি ফেরার কথা ঘণ্টাখানেক দেড়েক দুয়েক পরে, কিন্তু ঘণ্টা চারেক হয়ে গেল ফিরতে পারলেন না। মনে মনে একটা পিপাসা হল এই আশ্চর্য সরল সুন্দর মানুষটির মিষ্টি কথা শুনতে। ক্রমে ক্রমে মনে হল এঁর কাছে তাই পাওয়া যাবে যা তিনি পান নি। ধনসম্পদ খ্যাতি প্রতিপত্তি তো অনেক হয়েছে কিন্তু মন ভরে নি। মন বলছে এই লোকটির শরণ পেলে মন ভরবে। তাই সংকল্প করলেন পা জড়িয়ে ধরে বলবেন—ঠাকুর আমায় শরণ দাও। শূন্য মন পূর্ণ করে দাও। কিন্তু সর্বসমক্ষে কিছুতেই বলতে পারলেন না। তাই ঠিক করলেন—ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরবেন —তিনিও সঙ্গে যাবেন। যাবার পথে গাড়ির মধ্যে ঠাকুরের পায়ে গড়িয়ে পড়বেন। সেই মনে করেই কোচম্যান ইয়াসিনকে বললেন—ব্রুহাম বাড়ি নিয়ে যা। ল্যাণ্ডোখানা পাঠিয়ে দে। দক্ষিণেশ্বর যাব আমি।

ইয়াসিন বলেছিল—হুজুর লেণ্ডো তো ছোটা হুজুর লিয়ে গিয়েসেন বাগান পার্টিমে।

উনি বলেছিলেন—হাঁ হাঁ উ মুঝে মালুম হ্যায়। তুম যাও—যা কর দেখো গাড়ি ঘুমকে আয়া হোগা। নেহি আয়া তো পালকিগাড়ি ভেজো। ব্রুহাম থেকে পালকিগাড়িখানায় বসবার জায়গা বেশী। একটু চওড়াও বটে আর সামনের সিটটা হাফ সিট বা ডগ সিট নয়. পুরো সিট।

সেদিনের ঘটনাচক্রকে বিধাতার পাকচক্র বলতে হবে। ব্রুহামখানা বড়বাজারের ফটকে ঢুকেই দেখে ল্যাণ্ডোখানা এসে দাঁড়িয়ে আছে। ল্যাণ্ডোখানা একদফা খ্যামটার দল পৌঁছে দিয়ে বাগানে ফিরে যাবার পথে বাড়িতে এসেছে—বাড়ির সরকারবাবুর কাছে আড়াইশো টাকা এবং ছোটা হুজুরের শালের আচকান এবং টুপি নেবার জন্য। ইয়াসিন

ল্যাণ্ডোর কোচম্যান করিমকে পরম বিস্ময়ভরে বলেছিল—তাজ্জব কি বাত করিম, ই ক্যায়সে হুয়া এ আ!

করিম বলেছিল—তাজ্জবের বাত কোথায় রে ইয়াসিন—এ তো ভাই ছোটা হুজুরের মর্জি। আর উ মর্জির পিছে বিলাইতী দারু আর বাঈলোকের খুবসুরতির খেল। বাবুজীর নয়া কাশ্মীরী শালের আচকান আজই এসেছে খালিপাকে ঘরসে। সামকো আয়া। তো—

হেসে বলেছিল—শালকে আচকানকে ক্যা কিস্মৎ, ক্যা ফয়দা, বিনা বাঈলোকোকো তারিফসে, কহো? লেকেন তাজ্জব ইসমে ক্যা হ্যায় কহো?

ইয়াসিন বলেছিল—হ্যায় করিম হ্যায়; পহেলে তো শুনু লো! বোসপড়ামে এক আজব ফকীর এক পীরভাই এক জিন্দাপীরকো দেখা। কর্তাবাবু একদম গোলাম বন গেয়া। উনকে ওহি পীরসাহেবকে ল্যাণ্ডোপর সওয়ারী লেকে যানে কা মতলব কিয়া। আর দেখো ল্যাণ্ডো গাড়ি লেকে তুম ঠিক হিঁয়া খাড়া হ্যায়। তাজ্জব নেহি?

তাজ্জব এর মধ্যে আছে কি নেই এ তর্ক শেষ করবার মতো সময় ছিল না। না হলে তর্ক নিশ্চয় বাধতো। দু'জনের কাছে দুই সত্য দিবালোকের মতো উজ্জ্বল এবং স্পষ্ট। ইয়াসিন স্পষ্ট দেখছে যে, বাবুসাহেব ল্যাণ্ডোতে ওই হিন্দু পীরকে দক্ষিণেশ্বর নিয়ে যাবেন বলেই ওই পীরের দয়াতে ল্যাণ্ডোখানা বাঈজীবাড়ি থেকে বাগানে ফেরার পথে ওই শালের আচকান নেবার অজুহাতে ফিরে এসে তার জন্য অপেক্ষা করছিল। আর করিমের কাছে সত্য বাঈজী এবং পার্টিতে উপস্থিত রইস আদমীদের কাছে এই নতুন শালের আচকান দেখিয়ে তারিফ কুড়োবার মেজাজ। করিম শুনেছে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পলাশীতে আংরেজের কাছে হেরে গিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন বেহার মুল্ক। ভগবানগোলায় বড় বয়েল গাড়ি ছেড়ে নৌকোয় উঠে গঙ্গা ধরে চলে যাবেন রাজমহল থেকে পাটনা পর্যন্ত যেখানে হোক, শেষ দিল্লী আছে। পথে চারটি চাল ফুটিয়ে খাবার জন্য একজায়গায় থেমেছিলেন। দানশা ফকীরের আস্তানায়। সিরাজউদ্দৌলা পোশাকআশাক বদল ঠিক করেছিলেন দেখে সাধারণ মানুষই মনে হওয়ার কথা। কিন্তু জুতোজোড়াটা বদলান নি। বদলানো সম্ভবপর হয় নি। শুকনো মোটা চামড়ার নাগরা নবাবের পায়ে সহ্য হয় নি। সব শেষে, ভাত ছেড়ে উঠে পালাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হল না। কারণ জুতোজোড়াটা ঘুরিয়ে দেবার কোনো লোক ছিল না বলে দাঁড়িয়েই থেকেছিলেন এবং সব শেষে ধরা পড়েছিলেন মীর জাফর আলি খাঁর দামাদ মীর কাসিম আলী খাঁর হাতে। করিম স্পষ্ট দেখছে এও সেই আমীরী চাল; কাশ্মীরী শালের আচকান নাহলে বাগানবাড়িতে বাঈলোক আর দোস্ত ইয়ার লোকের মধ্যে শীত ভাঙে না। তার নসীব মন্দ! না হলে ভকীল সাবের এ কি বদখেয়াল বল তো? এক আধপাগলা হিন্দু ফকিরকে নিয়ে যাবে দক্ষিণেশ্বর!

যাই হোক সেদিন করিম ল্যাণ্ডো নিয়ে গিয়ে ছিল দক্ষিণেশ্বর; জুড়িগাড়ির কোচম্যান ফরাৎ আলি বাড়ি ছিল না বলে ইয়াসিনই ব্রুহাম নিয়ে গিছল বাগানবাড়ি। পরের দিন কোর্টের সময় জুড়িগাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলেন হরচন্দ্রবাবু। মনমেজাজ খুব খুশী ছিল। আগের দিন রাত্রে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করেছেন সাক্ষাৎ ঈশ্বরতুল্য ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। মনটি শান্তিতে ভরেই ছিল। হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো এলো এক অকল্পিত আঘাত। ছোটছেলে একজন নতুন কোচম্যান সঙ্গে এনে ওই জুড়িগাড়িখানা নিয়ে চলে গেছে। জুড়ির কোচম্যান ফরাতের জবাব হয়েছে—ল্যাণ্ডোর করিমের জবাব হয়েছে—ইয়াসিনকে ঘাড় ধরে প্রহার দেওয়া হয়েছে। এর কারণ গত রাত্রির গাড়ি বিভ্রাট। তাঁরা হুজুরের দোহাই দিয়েছিল কিন্তু কানেই তোলে নি ছোট হুজুর। শুধু তাই নয় নতুন

কোচম্যান সঙ্গে হাইকোর্টের পাড়ায় এসে জুড়িগাড়িখানা নিয়ে চলে গেছে। গাড়িখানা তার নিজের। গাড়ির দরজায় তার নামের H. C. C. মনোগ্রাম এবং নিচে হরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্পষ্ট করে লেখা আছে। হরচন্দ্র সেদিন একখানা সেকেন্ড ক্লাস ফীটন গাড়ি ভাড়া করে বাড়ি ফিরেছিলেন। এবং ছোটছেলের সম্মুখে একখানি বজ্রগর্ভ কালান্তক কালো মেঘের মতো এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এবং বিদ্যুৎ বর্ষণ করে গর্জন করে উঠতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ছোটছেলে হৃদয়চন্দ্র নিজে হাইকোর্টের উকিল না হলেও উকিলের ছেলে। সে ঝড় হয়ে প্রবল তুফান তুলে হরচন্দ্রবাবুর মেঘ হয়ে আক্রমণটাকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। হরচন্দ্র বলেছিলেন—আমার ইজ্জত তুমি ধুলোতে লুটিয়ে দিয়েছ। তোমাকে আমি ত্যাজপুত্র করব।

হৃদয় বলেছিল—আর আমার ইজ্জতটা তুমি আকাশে তুলেছ, না? আমাকে ত্যাজপুত্র করতে চাও করতে পার। আমি ভিক্ষুক নই। আমি চলে যাব আমার যা আছে তাই নিয়ে। তুমি হাইকোর্টে ওকালতি করে রোজগার কর আমি বিজনেস করে রোজগার করি।

ছোটছেলের বিয়ে হয়েছিল কলকাতার বনেদী বড়লোকের বাড়িতে। সে বাড়িতে একশো পঁচিশটা ঘড়ি আছে—তার মধ্যে বড় দেওয়াল ঘড়িই হল আশির উপর। বিলিতী পেন্টারের আঁকা ছবি আছে—তার সংখ্যা পঁচিশখানা। দারোয়ান আছে তিরিশজন। রান্নাশালা চার চারটে। একটা চাকরবাকর কর্মচারীদের—তার সঙ্গে আধখানা হেঁশেল একটা—বিধবা আত্মীয়াদের জন্য নিরামিষ। তা ছাড়া ছেলেদের রান্নাশালা আলাদা। কর্তার আলাদা। ঠাকুরবাড়ির ব্যাপার সে তো আছেই। আত্মীয় পোষ্য সংখ্যা ষাটের মতো। ছেলেদের আলাদা আলাদা গাড়ি। আরও আছে। ছেলেদের পোষা বাঈজী আছে। যাই হোক হৃদয়ের স্ত্রী এমন বাড়ির কন্যা যেহেতু সেহেতু সেও স্বামীর পিছনে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল—দরকার নেই। তুমি পৃথক হয়ে যাও।

বড়ভাই বিলেতে ছিল। বড়বউ ব্যারিস্টারের মেয়ে বড় ব্যারিস্টার এবং চালচলনে পাকা সাহেব। এ বাড়িতে ঠিক থাকতো না। নিজের ঘরটরগুলিতে তালা লাগানো থাকত। ঠাকুর চাকর বাবুর্চী আলাদা ছিল। তারা থাকত ঘরদোর ঝাড়ামোছা করত। দুই বেয়াইয়ে আকচাআকচি ছিল। উকিল বড় না ব্যারিস্টার বড় সে ঝগড়াটাও ছিল তার তলায় তলায়। ঝগড়াটা মীমাংসা হতে লেগে গেল পুরো একটা বছর। বড়ছেলে বিলেত থেকে দেশে ফিরল। হরচন্দ্রবাবু বদ্ধপরিকর হলেন এর শেষ মীমাংসার জন্য।

ছোটছেলে শুধু তাঁকেই অবজ্ঞা উপেক্ষা করে নি। যার জন্যে এত কাণ্ড, এবং তখনকার দিনে সারা কলকাতায় লোকে যার জন্যে পাগল সেই সাক্ষাৎদেবতা রামকৃষ্ণদেবকে কটুকথা বললে। এবং ছোটবউ সমস্ত কিছুর তলার কথাটা টেনে বের করে প্রচার করে দিলে। বড়-বউ এতে সাক্ষ্য আর সায় দুই দিয়ে বললে—বেশ তো উনি যা চান তাই হোক—আবার বিয়েই তিনি করুন। শ্বশুরের সেবাদাসীকে সমীহ করার দায় থেকে আমরাও বাঁচি।

কথাটা সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশও পেয়ে গেল। অবশ্য গোপনও ঠিক ছিল না। জানত অনেকেই। সেটা হল এই। স্ত্রীর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত হরচন্দ্রের রক্ষিতা এক ইহুদী বাঈ ছিল বউবাজারে। কোর্ট থেকে সেখান হয়ে বাড়ি ফিরতেন সাতটার সময়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর বাড়িতে দু'জন সেবাদাসী বাহাল হয়েছিল। তাদের বাড়িরই পোষ্য বালবিধবা এবং অন্যজন কোনো গরীব আত্মীয়ের কন্যা, সধবা কুলীন পত্নী।

এসব কথা যদি হরচন্দ্রবাবুর বাড়িতে আশ্রয় নেবার সময় জানতে পারত মন্মথ তাহলে সে এ বাড়িতে আশ্রয়ের প্রস্তাব দূরে থেকে নমস্কার করেই ফিরিয়ে দিত। কিন্তু সে-সময়

পর্যন্ত বড়বাজারের বড় উকিল চাটুজ্জেসাহেবের বাড়িতে অনেক জল অনেক ঢেউ অনেক তুফান পার হয়ে গেছে।

বাপ ছেলেদের ঝগড়া কোর্টে উঠি উঠি করেও সরাসরি ওঠেনি বটে তবে বাঁকাচোরা পথে মামলা হয়েছে। বাপ বড় উকিল—কলকাতার বড় নাম—বড় বড় মক্কেল; ছেলেরা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রের লোক; হরচন্দ্র কয়েকটা মামলা বাধিয়ে দিয়েছিলেন; কয়লার এবং পাটের কণ্ট্রাক্টনামার জটিল ধারা মতে কয়েকটা নালিশ দায়ের হয়েছিল বিভিন্ন আদালতে; তাতে বিবাদীপক্ষ ছিল তরুণ চাটুজ্জে মহাশয়েরা। অর্থাৎ জুনিয়র চ্যাটার্জীসাহেবরা দুই ভাই। বাদীপক্ষে যারা ওকালত-নামা পেয়েছিলেন তাঁরা হরচন্দ্রের বন্ধুও বটেন এবং অনুজও বটেন। যাকে বলে স্ক্রুয়ে পাক দিয়ে চাপ সৃষ্টি করেছিলেন উকিল বাপ। অবশেষে সমস্ত কিছুর মীমাংসা হল রীতিমতো দলিল দস্তাবেজ তৈরি করে।

সেও হল ওই পরমদয়ালু দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের কথায়। ঠাকুর একদিন বলেছিলেন —ওরে হরচন্দ্র তুই যে দেখি দুই কান কাটতে পণ করেছিস রে। না-না-না, কান কেটে ফেলিস না রে। কান না থাকলে ভগবান কী ধরে শাসন করবেন মতি ফেরাবেন?

হরচন্দ্র প্রথমটা বুঝতে পারেন নি, বলেছিলেন—কি বাবা? কি বলছেন?

ঠাকুর বলেছিলেন—ছেলেদের সঙ্গে মামলা করছিস, এ কানকাটা ছাড়া আর কি রে! মিটিয়ে নে মিটিয়ে নে।

শুধু মিটে যাওয়া নয় হরচন্দ্রবাবু ঠাকুরের নির্দেশে ইহুদী বাঈজী এবং বাড়ির সেবা-দাসীটাসী সব পরিত্যাগ করে নতুন বিয়ে করে সংসারী হয়েছিলেন। ছেলেরা আলাদা বাড়ি তৈরি করে উঠে গিয়েছিল এবং যে সমস্ত কোলিয়ারী এবং পাটের কারবার তাদের নামে ছিল তাই নিয়েই তারা সন্তুষ্ট থাকবে বলে আপোসনামায় একটা শর্তও রেখেছিল। এরপর থেকে হরচন্দ্রবাবু নাকি আশ্চর্য মানুষ। অর্থাৎ পুণ্যবান ব্যক্তি। সকালে উঠে নাম করলে দিন সার্থক হয়। মুখ দেখলে সেদিন যে একটা কোনো সৌভাগ্যলাভ হবে এতে সন্দেহ থাকে না।

এই কারণেই সেদিন সে যখন হরচন্দ্রবাবুর প্রস্তাবের কথাগুলি হেডমাস্টারের কাছে বলেছিল তখন তিনি অমত করবার কারণ দেখেন নি। হরচন্দ্র একখানা চিঠি লিখেছিলেন হেডমাস্টারমশাইকে। লিখেছিলেন—"মন্মথনাথ ভট্টাচার্য আপনার স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্র; শুনিলাম ক্লাসের সে ফার্স্ট বয়। ছেলেটি আজ দৈবক্রমে আমার গাড়ির সম্মুখে পড়িয়া দুর্ঘটনার সম্মুখীন হইয়াও পরম দয়ালু ঠাকুরের কৃপায় এবং তাহার নিজের ভাগ্যবলে বাঁচিয়া গিয়াছে। অথচ একচুল এদিক ওদিকে জুড়ি ঘোড়ার পায়ের তলায় পড়িত। অবশ্য দোষ কাহার তাহা বিচার করিয়া লাভ নাই তবে সকলেই বলিল দোষ ছিল তাহার। তাহার চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত ছিল। জিজ্ঞাসাবাদে অবগত হইলাম যে সে আশ্রয়ের সন্ধানে চিন্তাকুল হইয়াই পথ হাঁটিতেছিল। সমুদয় বিবরণই আমি তাহার নিকট অবগত হইয়াছি এবং কথা-বার্তা বলিয়া-কহিয়াও পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। সে ইলবার্ট বিল সম্পর্কে যে সকল কথা বলিল তাহা বিশিষ্ট শিক্ষিত জনের উপযুক্ত। এই হেতুই ইহাকে সাহায্য করিবার জন্য আমি উৎসুক হইয়াছি। তাহা ব্যতীতও সমাজের দিক দিয়া এই আশ্রয় দেওয়ার খুবই প্রয়োজন আছে। আপনি ছেলেটিকে যদি আমার এখানে থাকিবার নির্দেশ দেন তবে আমি সবিশেষ সুখী হইব এবং সারা দেশ ও সমাজেরও কল্যাণ হইবে। কারণ এখন এই যে নূতন কালের ইংরাজী অনুকরণের ও মেকী সায়েবীয়ানার তুফান বহিতেছে তাহাতে এমন একটি ছেলের ভাসিয়া যাইবার সম্ভাবনাই বেশী।"

হেডমাস্টারমশায় চিঠিখানা পড়ে খুশী হয়েও খানিকটা চিন্তা না করে হরচন্দ্রবাবুর

প্রস্তাবিত আশ্রয় নিতে মত দেন নি। ভেবে চিন্তে দেখে তবে বলেছিলেন—ওখানেই যাও। তবে ওঁর ছেলেদের সম্পর্কে সাবধান থেকো। তারা বড় বিলাসী এবং ঘোরতর বাবু। বুঝেছ। অবশ্য তারা বাপের সঙ্গে পৃথক। এবং হরচন্দ্রবাবুর এখনকার আচার-ব্যবহার চরিত্রের প্রশংসা সকলেই করে থাকে। উনিও আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

প্রথম প্রথম বড়বাজারে হরচন্দ্রবাবুর বাড়িতে এসে তার খুব ভালো লেগেছিল। এক-খানি নিরিবিলি ঘর, পরিচ্ছন্ন খাওয়াদাওয়া, অন্দরমহল থেকে খোদ গিন্নীঠাকুরানীর অন্তত একবার সুবিধা-অসুবিধার প্রশ্ন তার ভারী ভালো লাগত। খোদ কর্তাও মধ্যে মধ্যে ডেকে প্রশ্ন করতেন—কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?

মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করতেন—চাকরবাকরে কথাবার্তা শোনে তো? অমান্য করে না তো?

সে হেসে বলত—অমান্য কেন করবে?

—না। ওরা সব পারে। অমান্য করলে আমাকে বলবে।

এই ছেলেরা আসত কখনওসখনও। অধিকাংশ সময়েই আসত বৈষয়িক প্রয়োজনে। এবং অন্যায্য অন্যায় দাবি নিয়ে এসে ঝগড়া করত। কখনও কখনও আসত এ বাড়িতে কোনো ক্রিয়াকলাপ হলে। হরচন্দ্রবাবুর বাড়িতে ক্রিয়াকলাপ অনেক ছিল। মাসে সত্য-নারায়ণের পুজো হত খুব সমারোহ করে। কিন্তু এতে সায়েবী মেজাজের এবং আমীরী মেজাজের ছেলে বউরা আসত না। এ ছাড়া বরানগর কাশীপুরের বাগান থেকে ঠাকুরের শিষ্যরা আসতেন। ঠাকুরের নাম গান হত। ধর্মসভা হত। এতেও ছেলে বউরা আসত না। তবে বড় গাইয়ে বাজিয়ে এলে হরচন্দ্রবাবু আসর বসাতেন, বড় বড় আমীর রইস লোককে নেমন্তন্ন করতেন। তাতে ছেলেরা বউরা আসত।

এ ছাড়া প্রায় সপ্তাহে একদিন অন্তত দুই ছেলে তাদের গাড়িতে বোঝাই হয়ে বড়বাজারের বাড়ির ফটকে পেঁছুত—লোকজনে ধরাধরি করে নিচের তলায় একখানা ঘরে শুইয়ে দিত। তারপর চাকরবাকরেরা মাথায় জল ঢালত বাতাস করত।

এটা ঘটত থিয়েটার দেখতে এসে বেসামাল হলে। থিয়েটারের লোকেরা পাঁজাকোলা করে গাড়িতে তুলে দিত—কোচম্যান নিয়ে আসত বড়বাজারের বাড়িতে। ভবানীপুর অনেকটা দূর।

ছেলেরা দু'জনেই বাপের সঙ্গে পৃথক হয়ে বাড়ি করেছে ভবানীপুরে।

বড়ভাই আর ছোটভাই; বড়বাবু আর ছোটবাবু; কর্তাবাবু হলেন বাপ হরচন্দ্রবাবু। বড় ছোট দুই বাবুই বিশ্রী ভাষায় কোনো দুষ্ট ব্যক্তিকে এবং দুষ্ট নারীকে গালাগালি করত। সকলেই বলত এই উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি হলেন বাপ এবং নারীটি হলেন সৎমা।

কর্তার এবং গিন্নীর হুকুম ছিল যেন মন্মথ এই সময়টা ঘরে খিল বন্ধ করে বসে থাকে। কোনোমতে না বের হয়।

এই রকমই চলছিল। তখনকার দিন আর কলকাতা শহর। এধরনের কাণ্ড ছিল অতি সাধারণ। অবস্থাপন্নদের ঘরে ঘরে বললেও অত্যুক্তি হয় না।

হঠাৎ ঘটনাচক্রে হরচন্দ্রবাবুর দুই পুত্রের সঙ্গে তার পরিচয় হয়ে গেল। এর মূলেও ছিল সত্য।

সত্যদের বাড়ি সে এর মধ্যে (সময়টা মাস আট নয় হবে) বার তিনেক গিয়েছে বটে কিন্তু হেড স্যারের কথাগুলি স্মরণে রেখে মাথামাখি সে কমই করেছিল। ইচ্ছে তার প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েই উঠেছিল সত্যদের পরিবারটির সঙ্গে মেলামেশা করবার জন্যে। এমন

পরিচ্ছন্নতা এমন একটি শুচিশুভ্র সুরুচি এবং এমন মাধুর্যের মোহ ছিল তাদের বাড়ির সর্বত্র যে সর্ব অন্তর বাহিরে একটা আকর্ষণ অনুভব করত। ইচ্ছে হত পড়াশুনা সব ফেলে রেখে ওদের বাড়ি চলে যায়।

থমকে যেত। মনে প্রশ্ন উঠত—কি বলবে? সত্য তো জিজ্ঞাসা করবে—কি রে মন্মথ —তুই যে? কি ভাই?

উত্তরে সে কি বলবে?

বলতে গিয়ে যে সে নিজেই থমকে যাচ্ছে, কথা যেন আটকে যাচ্ছে। কথা তো অনেক আছে। বলা যায়—ভাই তোদের এনসাইক্লোপিডিয়াখানা দেখব একবার। কিংবা বলা যায়—তোর বাবাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব—লর্ড রিপন আর লর্ড ডাফরিনের মধ্যে বেশী উদার কে? ইলবার্ট বিল আর ন্যাশনাল কংগ্রেসের মধ্যে কোন্‌টা হল—মানে—, মানে আমদের কাছে কোন্‌টা বেশী গুরুত্বপূর্ণ?

হয়তো আরও ভারী কিছু বলা যায়। কিন্তু সত্য হয়তো তার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলবে একটু। সে হয়তো বলবে—বাবা তো এখন মক্কেলদের কাজ করছেন। তুই একটু বস। না হয় চল না ওপরে, মলি এসেছে—মা খুব জমিয়ে বসেছেন ওদের নিয়ে। ওখানে একটু বসবি—তারপর বাবার হলে দেখা করে কথা বলবি।

সত্যর ওই হাসিটুকুকে তার অত্যন্ত লজ্জা অত্যন্ত সংকোচ।

সত্যর ওই হাসির ইঙ্গিতেই সে যেন দেখতে পেত যে সত্যদের বাড়ির সকল কিছুর আড়ালে একটি মেয়ে চুম্বকে গড়া মূর্তির রূপ ধরে লোহাকে টানার মতো তাকে টানছে। সে হল মলি। একা মলিই বা কেন মলিকে ঘিরে ওদের বাড়ির তরুণী মেয়েগুলিই এক চুম্বক রাজ্যের সৃষ্টি করেছিল। মনে করলেই লজ্জায় ভয়ে সে সংকুচিত হয়ে উঠত। এ যদি কোনো রকমে প্রকাশ পায় তাহলে তার যে কি হবে তা সে ভাবতে পারে না। সে কারণেই সে যায় না। সত্য এবং সত্যদের বাড়ির সকলে সত্যর বাবা এবং মা পর্যন্ত এ সম্পর্কে খুব সাবধান।

তাঁদের বাড়িতে আসার জন্য মন্মথর লাঞ্ছনার কথা তাঁদের কাছে গোপন ছিল না। ঘটনাটা তো তাঁদের বাড়ির ফটকেই ঘটেছিল। এবং জেনেওছিলেন তাঁরা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। মন্মথ যখনই জটাধরের নায়েবের সঙ্গে বাড়ি রওনা হয়েছিল তখনই জ্যোতিপ্রসাদবাবু একটা আশঙ্কা করেছিলেন। কিন্তু মন্মথ যে পথের মাঝখান থেকে মুখ ঘুরিয়ে রমেশ গোস্বামীর বাড়ি যাবে এটা ভাবেন নি বা ভাবতে পারেন নি। ঘটনাটা জেনেছিলেন তাঁরা পরের দিন। সত্যই খবরটা এনেছিল ইস্কুল থেকে। জটাধরবাবুর সঙ্গে মন্মথর এবং জটাধরবাবুর সঙ্গে হেডমাস্টারমশায়ের কথাবার্তার খবরটা রঙচঙ মেখে ইস্কুলে ছড়িয়ে পড়েছিল। এবং সত্য তাই বয়ে এনে বাড়িতে বলেছিল। সারা বাড়িটাই দুঃখিত হয়েছিল এবং গোটা হিন্দু-সমাজের সংকীর্ণতা ও পতিত করার কুটিল মনোবৃত্তির জন্য ক্ষোভও হয়েছিল প্রবল। তারই সঙ্গে অভিমানের মতো একটা আবেগও তারা অনুভব করেছিল মন্মথর উপর।

মন্মথ কেন তাদের বাড়ি ফিরে এলো না?

তারা কি কৃশ্চান রমেশ গোস্বামী থেকেও আপন নয়?

জ্যোতিপ্রসাদবাবু সেইদিনই বাড়িতে সকলকেই বিশেষ করে সত্যকে ডেকে বলেছিলেন —দেখ সত্য, কোনোক্রমেই নিজে থেকে অকারণ হৃদ্যতা যেন করতে যেয়ো না মন্মথর সঙ্গে।

ব্যাপারটা হয়তো জটিলতর হয়ে উঠত এর পর। কিন্তু হেডমাস্টারমশায় সেটা থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁর উপদেশ মতো মন্মথ সত্যদের বাড়ি এসেছিল একদিন, এবং জ্যোতিপ্রসাদবাবু এবং তাঁর স্ত্রীকে প্রণাম করে গিয়েছিল।

সত্যর মা বলেছিল—তুমি ওই রাত্রে রমেশ গোস্বামীর বাড়ি না-গিয়ে এখানে ফিরে এলে না কেন বাবা ?

জ্যোতিপ্রসাদবাবু ঘাড় নেড়ে বলেছিলেন—না-না-না। মন্মথ ভালোই করেছে। আমার বাড়িতে এলে মন্মথর আর ফেরবার পথ থাকত না।

সত্যর মা বলেছিলেন—নাই থাকত। ক্ষতি কি হত ? তাতে ওর কল্যাণ হত।

জ্যোতিপ্রসাদ বলেছিলেন—দেখ আমি একটা কথা ভুলতে পারি না। মন্মথর বাবা আছেন এবং তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ। যজমান, শিষ্য সেবক নিয়ে তাঁর কাজ। কিন্তু অতি সজ্জন ব্যক্তি। এ ভালো হয়েছে। জটাধর ভট্টাচার্যকে আমি ভালোই জানি। এদেশে যারা ধনী হয় তারা শতকরা নব্বুইটা ক্ষেত্রেই গুণী হয় না। অর্থ উপার্জন এদেশে অসাধুতার পথে। পুকুর চুরি বলে একটা কথা আছে—এদেশে ধনসম্পদ সম্পত্তি হয় ওই পুকুর চুরির পথে। জটাধর ঠিক তাই নয় কিন্তু তাদের মাসতুতো ভাই। জটাধরের সংসর্গে থাকলে মন্মথ হয়তো তাই হত। এখন জটাধর আবার রইস আমীর মহলে নাম লেখাবার জন্যে যা করছে তার ছোঁয়াচ মন্মথর লাগলে ওর সারা জীবনটাই নষ্ট হয়ে যেত। আমার কাছে থাকলে অন্যরকম হত। বাপের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যেত। এ ও দাঁড়িয়েছে আপনার পায়ে ভর করে। মঙ্গল হবে ওর।

সেদিন বাড়ির বাইরের ঘরে মানে ড্রইং-রুমে বসে কথা বলে ফিরে এসেছিল মন্মথ। মালতী কি সত্যর বোনেরা সেদিকে আসে নি। জ্যোতিপ্রসাদবাবুর বোধহয় নিষেধ ছিল। মন্মথ একটু বিষণ্ণ হয়েই ফিরে এসেছিল সেদিন। অনেকক্ষণ পথে পথে ঘুরেছিল। অকারণ ঘুরেছিল। সন্ধ্যার সময় জগন্নাথঘাটে এসে কিছুক্ষণ বসে থেকে বাড়ি অর্থাৎ বড়বাজারে হরচন্দ্রবাবুর বাড়িতে ফিরেছিল।

দ্বিতীয়বার মন্মথ সত্যদের বাড়ি গিয়েছিল—সেও ছিল সত্যর নিমন্ত্রণ; কিন্তু উপলক্ষ্যটি ছিল স্মরণীয় উপলক্ষ্য। তখন জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাশেষি; সত্যদের একজন দারোয়ান এসে তাকে একখানা চিঠি দিয়ে গিয়েছিল। একখানা নিমন্ত্রণপত্র তার সঙ্গে সত্যর নিজের পত্র।

"সুপ্রসিদ্ধ অক্ষয়কুমার দত্ত—বঙ্গ সাহিত্যাকাশের অন্যতম অত্যুজ্জ্বল তারকা—মৃত্যু-রাহুর কবলগ্রস্ত হইয়াছেন। এমন একটি অমূল্য নিধিকে হারাইয়া সারা বঙ্গদেশই আজ ক্রন্দন করিতেছে। তদুপলক্ষে আমহার্স্ট স্ট্রীটে শ্রীযুক্ত জ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসভবনে (···নং আমহার্স্ট স্ট্রীটে) একটি শোকসভার অনুষ্ঠান হইবেক। উক্ত সভায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয় সভাপতিত্ব করিবেন। অতএব মহাশয়···।"

এর সঙ্গে সত্যর লেখা পত্রে লেখা ছিল—"সভায় অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি আসিবেন। এবং ভালো ভালো বক্তৃতা হইবে। আমি একটি পদ্য রচনা করিয়াছি—সভায় পাঠ করিব। আমার বোনেরা ব্রহ্মসংগীত গান করিবে। মালতী দলের প্রধানার কাজ করিবে। বাবা কাল রাত্রে বলিলেন তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতে। তুমি অবশ্য অবশ্য আসিবে। ইতি সত্যপ্রসাদ।"

তারও ইচ্ছা হয়েছিল একটি পদ্য রচনা করিতে। সত্য পদ্য লিখেছে আর সে পারবে না ? অক্ষয়কুমার দত্তের মৃত্যুর পর এ কাগজে ও কাগজে শোকোচ্ছ্বাস কবিতা ছাপা হচ্ছে—সে পড়েছে। সোমপ্রকাশ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আসে হরচন্দ্রবাবুর বাড়িতে—সে নিয়মিতই পড়ে থাকে।

বাজিল শোকের ভেরী ভারতে আবার—
মরম ভেদিয়া ওঠে শোক পারাবার ;

এ সব একবার পড়েই মুখস্থ হয়ে গেছে।

অক্ষয়ের হায় ! আজ অক্ষয় লেখনী
অক্ষয়ের হায় ! উচ্চ বিজ্ঞান কাহিনী
অক্ষয়ের ধর্মরীতি অমল অক্ষয় নীতি
অক্ষয় কীর্তি যার করিছে প্রচার—
আজি সে অক্ষয় তবে বঙ্গে হাহাকার !

চারটে লাইন তার নিজের মনেও এসেছিল—

কে রে অনাথিনী কাঁদে ধুলায় লুটায়—
বক্ষে করে করাঘাত মুখে হায় হায়—
কে মা তুমি কে মা তুমি—এ যে মোর বঙ্গভূমি—
কিন্তু কেন কাঁদ মাগো বল মা আমায়—
কেন কাঁদি ? হায় হায়—
আমার অক্ষয় নিধি নাই !

শেষের ছত্রটার দুটো অক্ষর বেড়ে গিয়েছিল, সেটা ঠিক করবার চেষ্টা করেছিল অনেক কিন্তু কিছুতেই মনের মতো হয় নি। আমার অক্ষয় নিধি নাই—এর 'আমার' শব্দটা কি 'অক্ষয়' শব্দটার যেটাকে কমাতে যাও পদ্যর অক্ষর ঠিক হবে কিন্তু কেমন যেন বিশ্রী শুকনো রোগা হয়ে যাবে জোর থাকবে না। ঘণ্টা তিন চার চেষ্টা করে সেও চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছিল। তা দিলেও সভায় সে গিয়েছিল। সত্য বাড়ির গেটেই দাঁড়িয়ে ছিল। সকলকে অভ্যর্থনা করছিল। সত্যর পরনে শান্তিপুরে ধুতি গায়ে পাঞ্জাবি বগলে তিনটে করে সেলাই দেওয়া পাঞ্জাবি ! সুন্দর করে চুল আঁচড়ানো। চমৎকার মানিয়েছিল তাকে। পদ্য তার ভালো হয় নি। অন্তত তার ভালো লাগেনি। তবে ভালো লেগেছিল মালতীদের গান। আর সভার সজ্জা। সে যেন চারিদিকে শরৎকালের প্রথম প্রহরের রৌদ্রের মতো একটি উজ্জ্বল সাদা ছটা ঝলমল করছিল। বসবার ফরাশে ধবধবে সাদা চাদর, তেমনি সাদা ওয়াড়পরানো বেশ সুন্দর গোলালো তাকিয়া, তার সঙ্গে অধিকাংশ সমবেত ভদ্রজনদের সজ্জার তেমনি সাদা চাদর সাদা জামা ধবধবে ধোয়া পাটভাঙা কাপড় মিলিয়ে যে একটি অতি পবিত্র ভাবমণ্ডলের সৃষ্টি করেছিল তার সঙ্গে মালতীরাও যেন বসন্তকালে সাদা ফুলে ভরা কোনো বহুশাখা-প্রশাখাওয়ালা বড় একটা গাছের গায়ে জড়িয়ে ওঠা সাদা ফুলে ভরা কোনো লতার মতোই সুন্দরভাবে মানিয়ে গিয়েছিল। এক পাশে, সভাপতির আসনের ডানদিকে ওদের বসবার ঠাঁই হয়েছিল ; তানপুরা তার সঙ্গে বেহালা ও মন্দিরা বাজিয়েরা বসেছিল একধারে, হারমোনিয়ম ধরে বসেছিল মালতী। আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। মালতী দেখতে সুন্দর ; গৌরবর্ণ থেকেও উজ্জ্বল তার গায়ের রঙ—বাঁশীর মতো নাক, আয়ত দুটি চোখ, ছোট কপালটি—তার কোলে সত্যি সত্যি ধনুকের মতো আকারের ভুরু আর একপিঠ উজ্জ্বল কালো চুল। পরনে ছিল তাদের কালো বর্ডার দেওয়া সাদা বডিস আর কালাপেড়ে ফরাসডাঙার তাঁতের ধোয়া সুতোয় বোনা শাড়ি। অপূর্ব লাগছিল ওদের। কিন্তু ওদের মধ্যে আবার সব থেকে উজ্জ্বল লাগছিল মালতীকে। মালতী তার বাঁ হাতখানি দিয়ে হারমোনিয়মের বেলো ধরেছিল—ধবধবে অনাবৃত হাতখানি যেন মাখন দিয়ে গড়া মনে হচ্ছিল। ওর হাতে ছিল একগাছি সোনার বালা। এমন সুন্দর গৌরবর্ণ হাতে বালাটিকে যেন বেশী ঝলমলে মনে হচ্ছিল।

তার দিকে সে মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রায় যেন মোহগ্রস্ত হয়ে তাকিয়ে ছিল। মালতী তাকিয়ে ছিল অন্য দিকে। শুধু মালতী নয় মেয়েরা এবং অধিকাংশ পুরুষেরাও তাকিয়ে ছিলেন

অপরূপ সুন্দর এবং সেই সঙ্গে মহিমান্বিত একজন ভদ্রলোকের দিকে। পরে মন্মথ জেনেছিল যে, তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর পাশে ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আরও অনেক বড় বড় লোকই ছিলেন কিন্তু লোকে দেখছিল ওই ও'দের দুজনকে। হঠাৎ একটি মেয়ে মালতীর গায়ে আঙুলের টিপ দিয়ে ডেকে কানে কানে কিছু বলেছিল; বলেছিল তারই কথা, সে মালতীকে দেখছে সেই কথাটা বোধহয় সে তাকে বলে দিয়েছিল। মালতী এবার তার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ঈষৎ চাঞ্চল্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। সেটা মালতীর লজ্জা। কারণ তার দুটি ঠোঁটের চাপের মধ্য থেকেও ঈষৎ একটু একান্তভাবে একটু হাসি বেরিয়ে এসেছিল। এবং ঘাড় নামিয়েছিল।

সে কিন্তু সারাক্ষণই দেখেছিল মালতীকে।

কি রূপ মালতীর! একা মালতীরই বা কেন? ওদের গায়িকার দলটিকেই মনে হচ্ছিল যেন একটি দেবকন্যার দল—আজকের এই অনুষ্ঠানের জন্য নেমে এসেছে এই পৃথিবীতে। আর সে কি গান!

আনন্দ-লোকে মঙ্গললোকে বিরাজো সত্য সুন্দর—
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে—

আরও একটা গান—মহাবিশ্বের মহাকাশে—। সে আরও একটা গান তেমনি সুর। সমস্ত ঘরখানা এত বড় সমাবেশটা যেন কেমন একটা ভাবাবেশে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল।

সভার শেষে সে চলে আসতে গিয়েও চলে আসে নি বা চলে আসতে পারে নি। বারদুয়েক বাইরে যাবার জন্য কয়েক পা এগিয়েও ফিরেছিল বাড়ির দিকে। বাড়ির দিকে—সত্যর সঙ্গে দেখা করবার কথাটা মনে হলেও মালতীদের সঙ্গে দেখা করবার একটা গোপন এবং কাঙালের মতো করুণ লজ্জিত অভিপ্রায়ও প্রায় ধনীর বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গের লোকের মতোই পিছনে দাঁড়িয়েছিল।

দেখা হয়েছিল। সত্যই এগিয়ে এসে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল।

—মা ডাকছেন রে তোকে।

হঠাৎ সত্য তুই বলে ফেললে সেদিন। মন্মথ চমকে উঠেছিল।—মা ডাকছেন আমাকে?

—হ্যাঁ।

যে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল সেখানা সত্যর সেই পড়ার ঘরখানা। সে ঘরে কেউ ছিল না। বড় ড্রইং-রুমে বারান্দায় লোকজনেরা দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছেন এবং গাড়ির অপেক্ষা করছেন। যারা পায়ে হেঁটে যাবে তারা অধিকাংশই চলে গেছে; তাদের ভিড়টা এখন রাস্তার উপরে জমেছে।

সত্য তাকে বসিয়ে বললে—কেমন লাগল রে সভা?

—ভালো লাগল। খুব বড় বড় লোক এসেছিলেন।

—আমার পদ্য কেমন লাগল রে?

—ভালো হয়েছে তবে আরও ভালো হলে ভালো হত! কিন্তু তোর বোনেদের গান ভাই খুব ভালো হয়েছে।

—কেন? আমাদের নাম নেই নাকি?

পিছন দিক থেকে অতি মিষ্ট গলায় কথা ভেসে এসেছিল। মন্মথ চমকে উঠে পিছন দিকে তাকিয়ে লজ্জায় অপ্রতিভ হয়ে গিছল। মালতী পিছন দিকের দরজাটা দিয়ে ঢুকেছিল। মালতী হেসে বলেছিল—সেদিন কথা হয়েছিল আমরা যখন একবয়সী তখন নাম ধরে ডাকব দুজনের। যেমন সত্য ডাকে। এখন আমার নামটা মুখে আটকাচ্ছে কেন!

প্রসঙ্গটাকে চাপা দিয়ে মন্মথ বলেছিল—কি সুন্দর গান যে আপনারা গাইলেন ! ওঃ !

—আরও ভালো হত অনেক ভালো হত হয়তো। কিন্তু সামনে বসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—যিনি গান লিখেছেন স্বয়ং তিনি। বাবাঃ ! বুকের ভিতরটা যা করছিল না ! কাঁপছিল থরথর করে !

ঠিক এই মুহূর্তটিতেই ভিতরের দিকের বারান্দা ধরে যেতে যেতে জ্যোতিপ্রসাদবাবু বললেন—সত্য দেখ তো আমাদের গাড়ি আনতে দেরি করছে কেন ? শাস্ত্রীমশায়ের রাত্রি হয়ে যাচ্ছে। আর মন্মথ তুমি আর রাত্রি ক'রো না। রাত্রি হয়েছে। হয়তো হরচন্দ্রবাবু চটবেন। তুমি ওঁকে বলে এসেছ তো ?

বলেই তিনি চলে গেলেন। দাঁড়ালেন না। সত্যও চলে গেল। মন্মথও উঠে দাঁড়াল। বললে—আচ্ছা। এবং হাতদুটি নমস্কারের ভঙ্গিতে জোড় করে মালতীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলে।

মালতী বলল—না। খেয়ে যেতে হবে কিছু। ব'সো, তাতে দেরি হবে না। চা আনছে।

মন্মথ বসল। ভালো লাগল বসতে। সেই মনের কথাটুকু সে আর প্রকাশ না করে পারলে না, তবে ঘুরিয়ে প্রকাশ করলে—বললে, এত—সুন্দর গান কক্ষনো শুনি নি আমি !

মালতী এবার তাকে তিরস্কার করে বললে—কিন্তু সারাক্ষণ আমার দিকে এমন করে চেয়েছিলে কেন বল তো ?

—কি সুন্দর যে লাগছিল আপনাকে—

—এরে ! আবার বলছে 'আপনাকে'। তোমাকে বল !

ঠিক এই সময়ে করুণা এক কাপ চা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল। করুণা সত্যর বোনেদের মধ্যে সকলের বড়। সত্যর ঠিক ছোট।

মালতী নিজেই কথাটা চাপা দিল। আপনি তুমির ঝগড়ার ছেদ টেনে দিলে। এবং হেসে বললে—রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা' নাটক আমরা অভিনয় করব। তুমি আসবে দেখতে ? তাহলে তোমাকে নেমন্তন্ন করব আমরা।

মন্মথ এতটা প্রত্যাশা করে নি। তাকে তারা নেমন্তন্ন করবে ? বিডন স্ট্রীটে হাতিবাগানে গিরিশচন্দ্র ঘোষ অমৃত বসু অর্ধেন্দু মুস্তফী এরা সব থিয়েটার খুলেছে ; টিকিট বিক্রি করে থিয়েটার করে ; সেখানে বাজারের মেয়েরা যারা বেশ্যাবৃত্তি করে তারা মেয়েদের পার্ট করে। এখানে তার খুড়ো খুড়ী প্রায় টিকিট কিনে থিয়েটার দেখতে যায়। তাকেও তারা এ থিয়েটার দু'তিন দিন সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছে। এখানে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও মধ্যে মধ্যে আসতেন। তবুও লোকে এ থিয়েটারকে ঠিক ভালো জায়গা বলে না। কিন্তু এই সঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ঠাকুরবাবুরা নিজেরা যে নাটক করেন তার ধারাধরন শৃঙ্খলা সভ্যতা সব আলাদা জাতের। তার রুচি সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে দেখবার সুবিধা সহজে হয় না। কলকাতার বড় বড় রুচিবান জ্ঞানী গুণী লোকেদের নিমন্ত্রণ করা হয়। ঠাকুরবাড়ির 'মায়ার খেলা' নাটক অভিনয়ের কথা সে অনেক ভালো ভালো লোকের কাছে শুনেছে। স্বয়ং রমেশ স্যার তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সেই 'মায়ার খেলা' অভিনয় করবে সত্য এবং তাদের জানাশোনা শিক্ষিত রুচিবান লোকেরা। মালতীও তাতে নামবে ! সেই অভিনয় দেখতে নিমন্ত্রণ করবে সত্যরা ? !

মন্মথ বলেছিল—সত্যি নেমন্তন্ন করবেন ?

মালতী হেসে বলেছিল—সত্যি নেমন্তন্ন করব। আসবে তো ?

—নিশ্চয় আসব। আসব আসব আসব। তিন সত্যি করে গেলাম।

সেই নিমন্ত্রণে এসে হরচন্দ্রবাবুর ছেলেদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। হরিশচন্দ্র এবং হৃদয়চন্দ্র এই এদের অভিনয় দেখতে এসে বসল ঠিক মন্মথর পাশে। এখানে তারা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আসে নি। নিজের নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এখানে একেবারে আলাদা চেহারা নিয়ে এসেছিল। এবং আগাগোড়া এমন একটা ভদ্র এবং শিক্ষিত মানুষের আচার আচরণ করলে যে মন্মথ আশ্চর্য হয়ে গেল। সঙ্গে একদল খুব সাজপোশাক দুরন্ত এবং সাহেবীয়ানা-রপ্ত উঁচুতলার মানুষও ছিল। তারা মন্মথকে মুখে কিছু বললে না তবে বারকয়েক বেশ তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে যেন ভালো করে দেখলে। সারাটা থিয়েটারের মধ্যে তারা এতটুকু অভদ্র আচরণ করলে না; জোরে কথা বললে না, নিজেদের মধ্যে এমন কথাবার্তা কিছু বললে, যে কথাগুলো মন্মথর কানে স্বাভাবিক নিয়মে বাধ্য হয়ে এলো এবং মন্মথকে কেমন যেন অস্বস্তির মধ্যে ফেললে।

তার কাপড় জামার দিকেই তাদের নজরটা পড়েছিল প্রথম। মন্মথর চেহারা ওই সমাবেশের মধ্যেও অশোভন ছিল না। বরং হরচন্দ্রের ছেলেদের গায়ের রং এবং থ্যাবড়া নাকের চেহারা যথার্থই বেমানান ছিল। কিন্তু ওদের কাপড়চোপড়ের মহার্ঘতা ওদের সর্বাঙ্গে একটা ধ্বজা উড়িয়ে রেখেছিল।

নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলতে-বলতে কপাল কুঁচকে উঠছিল ওদের। স্পষ্টই মন্মথ বুঝতে পারছিল যে গরীবজনোচিত কাপড় জামা পরা তার পাশে বসতে তাদের যেন ইচ্ছে হচ্ছে না। তারও ইচ্ছে হচ্ছিল সে উঠে গিয়ে অন্যত্র বসে। মনের মধ্যে কেমন একটা ভয়-ভয় অস্বস্তিবোধ অনুভব করছিল। হরচন্দ্রবাবু তাকে আশ্রয় দিয়েছেন—ওখানে থাকে খায়—এবং মাসে চার টাকা হাতখরচও দেন হরচন্দ্র। তাঁর ছেলে এরা। এদের উপর বাপ চটা এবং এরাও বাপের উপর চটা—এমন চটা যে একসঙ্গে বাস পর্যন্ত করে না এ জেনেও ওই আশঙ্কা সে অনুভব করেছিল। কিছুক্ষণ পর সে সামনের দিক থেকে উঠে গিয়ে পিছনের দিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল। একবার ইচ্ছে হয়েছিল চলে আসে কিন্তু এত ভালো থিয়েটার হচ্ছিল—বিশেষ করে মালতী এত সুন্দর গান গেয়েছিল যে ওই আশঙ্কা এবং অসুবিধা সত্ত্বেও চলে আসতে পারে নি। তা' ছাড়া চলে আসার উপায়ও ছিল না। থিয়েটার ভাঙতে রাত্রি হবে বলে সেদিন রাত্রে সত্য তার বাবার ক্লার্কের কাছে থাকার এবং খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। আমহার্স্ট স্ট্রীটে সত্যদের বাড়ির কাছাকাছিই তাঁর বাড়ি।

এর ঠিক দিন পনের পরেই সেদিন সে হরচন্দ্রবাবুর বাড়িতে বড়লোকের মেয়ে ছোট-বউয়ের সামনে পড়ে গেল। বড়লোকের মেয়ে ছোটবউ এসেছিল শ্বশুরের কাছে সং-শাশুড়ীর নামে নালিশ করতে এবং শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করতে। হঠাৎ দোতলার বারান্দা ধরে শ্বশুরের ঘরের দিকে যাবার সময় তার চোখে পড়ল মন্মথ বই খাতা বগলে নিয়ে নিচের তলায় তাকে দেওয়া ঘরখানার দরজা খুলছিল। ঘরখানা হরচন্দ্রবাবুর কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরগুলির একেবারে একপাশের একখানা। মন্মথকে দেখে ছোটবউ থমকে দাঁড়িয়ে গিছল। চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময়ের সীমা ছিল না। সে দৃষ্টি মন্মথ সইতে পারে নি। চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। ছোটবউ বড়লোকের মেয়ে হলেও এ বাড়ির বউ; বউ মানুষের ঘোমটা খোলা এবং গলার আওয়াজ উঁচু করে চেঁচিয়ে কথা বলা অপরাধের সামিল। কিন্তু সে নিয়ম গ্রাহ্য না-করে ছোটবউ বেশ উচ্চকণ্ঠে একটা চাকরকে ডেকে বলেছিল—হ্যাঁরে ওই নিচের ওটা কে র‍্যা? চাকর না ঠাকুর না কেরানী মুহুরী? কবে বহাল হয়েছে রে?

চাকরটা কি বলছিল সে শুনতে পায় নি, ততক্ষণে সে ঘরে ঢুকেছিল। তবে উত্তরে ছোটবউ যা বলেছিল তা বেশ শুনতে পেয়েছিল সে। বোধ করি সে ঘরে ঢুকে যাওয়ার জন্যই ছোটবউ গলা চড়িয়েছিল সপ্তমে না হলেও পঞ্চমের নিচে নয়। বলেছিল—ছাত্তর! অ—। এখানে ভাত খেয়ে পড়ে বুঝি! মরণ। এই হল—পাখাওঠা পিঁপড়ে।

মন্মথ স্তম্ভিত হয়ে গিছল। কথাগুলির বিন্যাসে, বলার ভঙ্গিতে এমন তাচ্ছিল্য এবং অবজ্ঞা ছিল যে তার সর্বাঙ্গে একটা এমন জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল যে গঙ্গায় একশোটা স্নান করলে তা যাবার নয় অথবা হিমালয়ে বরফের উপর শিবের মতো যোগাসনে বসলেও জুড়াবার নয়।

সে ভাবছিল সে এদের বাড়ি থেকে চলে যাবে। এ অপমান তার সহ্য হবে-না। কিন্তু নিজে থেকে চলে যাওয়ার মধ্যে যে একটা অপমান ফিরিয়ে দেওয়ার তৃপ্তি আছে সেটা সে পেলে না।

তার ভাগ্য!

তা' ছাড়া আর কি বলবে? ঝগড়াটা দেখতে দেখতে খড়ের ঘরের আগুনের মতো জ্বলে উঠেছিল।

বিচিত্র ঝগড়া। না। বিচিত্র কেন? বরং তার ঠিক উলটো। চারিদিকে ভালো করে চোখ মেলে তাকালে যে সযত্নঢাকাদেওয়া জীবনের আসল চেহারা ফুটে উঠত সেটা ঠিক এই-ই বটে।

ছোটবউ অভিযোগ এনেছিল শ্বশুরের কাছে যে, শাশুড়ী এ বাড়িতে তাঁর যে জলখাবার পান জরদা প্রভৃতি দেখবার লোক ছিল—যাকে পানসাজুনী বলত—সেই মেয়েটিকে সুকৌশলে ছোটবাবুর দৃষ্টির সামনে তুলে ধরে এ বাড়ি থেকে সরিয়ে দিয়েছেন।

মেয়েটা সদ্য সদ্য এ বাড়িতে এসেছিল এবং শাশুড়ী-ঠাকুরানীরই দূর সম্পর্কের কোনো অনাথা ষোড়শী বিধবা। সে নাকি কর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে বা করতে পারে আশংকায় শাশুড়ীঠাকরুন তাকে ছোটছেলের নয়নপথে স্থাপন করেছেন। সে মেয়ে এখন কোনো বাগানবাড়িতে ছোটবাবুর দ্বারা সংরক্ষিতা। এবং তার অদৃষ্টের সৌভাগ্যের পাড়ে ভাঙন ধরেছে তাতে আর তার সন্দেহ নাই।

আশ্চর্যের কথা ঝগড়াটা খড়ের চালের আগুনের মতো অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রলয়ংকর হয়ে জ্বলে উঠে অল্পক্ষণেই তা' আবার নিভেও গেল।

বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ার মতো দু'জন চাকরের চাকরি গেল। বউমার নামে ছোটছেলে এবং শ্বশুর দু'জনেই পাঁচহাজার টাকার কোম্পানির কাগজ নাম বদল করে দিলেন। যে মেয়েটা বাগানে ছোটছেলের শখ ও সাধ মিটিয়ে তাকে ভজনা করেই নিশ্চিন্তে নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে আয়নায় মুখ দেখছিল সে মেয়েটা বিসর্জিত হল। অবশ্য বাজারে সোনাগাছি অঞ্চলে কোনো নাম করা বাড়িউলির বাড়িতে একখানা ঘরে শো-কেসে পুতুলের মত রক্ষিত হল। আর হল, হরচন্দ্র বললেন—দেখ মন্মথ আমি আর তোমাকে আশ্রয় দিতে পারব না।

মন্মথ খুব বিস্মিত বা স্তম্ভিত হল না। সে অনেকটা প্রস্তুত হয়েই ছিল। সে বললে —'বেশ।'

হরচন্দ্র বললেন—আমি তোমাদের হেডমাস্টারমশাইকে লিখেছি সব। তোমার ঠিক দোষ দিই নি। তবে—হ্যাঁ। তুমি তো এদের চিনতে। গোড়াতেই তুমি সরে গেলে না কেন?

হেডমাস্টারমশায় একখানা ছোট্ট চিঠি পাঠিয়েছিলেন।—'তুমি আমার সঙ্গে শীগ্‌গীর দেখা কর।'

বেশ খামে বন্ধ করা চিঠি, স্লিপ যাকে বলে তা' নয়। মন্মথ নতুন আশ্রয়ের খোঁজে বের হয়েছিল—সেই আশ্রয় স্থির করে সে, ওই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটা যেদিন ঘটল তার পরের পরের দিনের পরের দিন অর্থাৎ দু'দিন পর জিনিসপত্র নিতে এসে মাস্টার মশায়ের চিঠিখানা পেলে। চিঠিখানা তাকে হরচন্দ্রবাবুর ওকালতি সেরেস্তার মধুবাবু দিলে। বললে—মন্মথ তোমার ইস্কুলের দারোয়ান এসে চিঠিখানা কাল দিয়ে গেছে। তুমি ইস্কুলে যাও নি, মাস্টারমশায় ব্যস্ত হয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন। পরশু থেকে দুটো রাত দেড়টা দিন ছিলে কোথায়? এ্যাঁ?

দুটো রাত্রি দেড়টা দিন থেকেও বেশী। পুরো দুটো দিন রাত্রি।

সোমবার দিন বেলা দশটা সাড়ে দশটায় এ বাড়িতে ঘটনাটা ঘটেছিল। শনিবার রাত্রি থেকে রবিবার রাত্রি বারোটা পর্যন্ত বাইরে থেকে স্বামীর বাড়ি ফেরার কথা। এইটেই নিয়ম। কিন্তু রবিবার রাত্রি পুইয়ে গেল তবু ছোটবাবু বাড়ি ফিরল না। রবিবার রাত্রি বারোটার পর থেকে ছোটবউ সারারাত্রি স্বামীর জন্য একবার শুয়েছে একটু ঘুমিয়েছে আবার উঠেছে এবং বাইরে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকেছে।

এমনটা কখনও হয় না।

প্রতিদিনই নিয়ম আছে বাবু আপিসে যায়, সেখান থেকে সরাসরি এখান ওখান হয়ে রাত্রি দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ বাড়ি ফেরে। মদ্যপান করেই ফেরে। স্ত্রী তাকে শরবত-টরবত খাওয়ায় বা গরম কফি খাওয়ায়; স্নান করায় চাকরদের দিয়ে। তারপর অনুযোগ অভিযোগ করে। বাবু অপরাধ স্বীকার করেই মাথা নিচু করে হাসে আর বলে—আর হবে না। মাইরি বলছি। দেখো।

এর মধ্যে নিন্দা নাই। চাঁদের কলঙ্কের মতো পুরুষের পুরুষালির অহংকারের অগৌরব আছে। এ কাল তো অনেক ভালো হয়েছে। আগের কালে নাকি যারা পুরুষের মতো পুরুষ তাদের এখানে ওখানে সেখানে সেবা করবার দাসী থাকত। যেখানে যেতো সেখানেই সঙ্গে যেতো এদের কেউ-না-কেউ। রাত্রি দিন কাটত এদের বাড়িতে। কর্তা বাড়ি ফিরত সাত দিন পর পনের দিন পর। মাস দু'মাসও হয়েছে কতজনের। বাড়ি ফিরেও বিয়ে ছিল কারুর দুই কারুর চার কারুর সাত। কলকাতার মস্ত নামী ঘর—কর্তা বিয়ে করেছিল সাতটা।

সে কালের কথা থাক্। এ কালে সে সব কমে এসেছে। কৃশ্চানদের দেখাদেখি ব্রাহ্মরা তার সঙ্গে একালের ইংরিজীজানা লোকদের ঠ্যালায় সব পালটেছে। পুরুষেরা একটার বেশী বিয়ে করে না। আর অবস্থাপন্ন ঘরের লোকেরা দোজপক্ষে কি তেজপক্ষে মেয়ের বিয়েও দেয় না। তা' বলে পুরুষ, জোয়ান বয়েস, ঘরে মা লক্ষ্মীর কৃপা রয়েছে—সে সন্ধ্যে থেকে ঘরে বসে থাকবে কি?

ছোটবউয়ের বাপ নামজাদা ধনী। তাঁর বাগানবাড়ি আছে। কয়েকজন নামজাদা বাঈয়ের সঙ্গে দহরম-মহরম আছে। তাঁরা যায় আসে। ছোটবউয়ের তিন ভাই। তাদেরও তাই। বড়ভাই তো লক্ষ্ণৌ থেকে বাঈ এনে রেখেছে। সবার ক্ষেত্রেই এক নিয়ম। সন্ধ্যাতে সবাই বের হবে। আপিস থেকে ফিরে স্নান সেরে পাউডার মেখে গন্ধ মেখে আবার গাড়ি করে বের হবে। অথবা আপিস ফেরত সরাসরি বেড়িয়ে টেড়িয়ে বাড়ি ফিরবে। নানান স্থান ভ্রমণের। ময়দান মাঠ থেকে ক্লাবঘর লাইব্রেরী বন্ধুদের মজলিস হয়ে গানের আসর বাগান-বাড়ি পর্যন্ত। বিশিষ্ট জনেরা বিশেষ করে ধনী এবং পদস্থ জনেরা নিজের-নিজের বাগানে যায়; কিছু কিছু ধনীরা নিত্যনূতন রূপকুঞ্জ বা কুণ্ড আবিষ্কার করে সেখানে রাত্রি দশটা

পর্যন্ত কাটিয়ে বাড়ি ফেরে। এই বাড়ি না ফিরলেই মেয়েরা অর্থাৎ বউয়েরা দুর্ভাগ্য গণনা করে। কেবল শনিবারটা ব্যতিক্রম। শনিবার হাফ-ডে আপিসের পর জুড়ি চলে বাগান-বাড়ি, জুড়ি সেখানেই থাকে শনিবার রাত্রি রবিবার সারা দিন, সারা দিনের পর সন্ধ্যে নটা পর্যন্ত কাটিয়ে দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ জুড়ি ফেরে। জুড়ি থেকে বাবু নেমে এসে বাড়ি ঢোকে মোটমাট বিপর্যস্ত অবস্থায়।

ছোটবউ বড়ঘরের মেয়ে; যেমন বনেদী তেমনি ধনী; সেই উপযুক্ত কড়া নজরও ছিল তার স্বামীর উপর। এসবের উপর সে ছিল আবার বাঁজা; বয়েস বিশ পার হয়ে গেছে, তা' ক'বছর হবেই। প'চিশের ঠেকাতেও আর ঠেকে থাকছে না। মধ্যে মধ্যে হৃদয়চাঁদের বিবাহের কথা ওঠে। কিন্তু সে পথে ছোটবউয়ের পিতৃগৌরব এবং পিতৃভাগ্য দুর্লঙ্ঘ্য বাধার মতো দাঁড়িয়ে আছে। ছোটবউয়ের বাপ মস্ত ধনী তো বটেই, তার সঙ্গে ব্যাঙ্কিং ব্যবসা জুটে বিজনেস ফিল্ডেও বেশ হোমরা-চোমরা বড় ব্যক্তি। আরও আছে, সেটা হল, জুট বিজনেসে H- C. Chatterjee & Co-র অংশীদারও বটে। এবং সে অংশীদারত্বের মধ্যে ছোটবউ খানিকটা অংশের মালিকও বটে। ছোটবউ নিত্য রাত্রি দশটায় বারান্দায় এসে দাঁড়ায়— রাত্রি সাড়ে দশটা নাগাদ জুড়ি ফিরলে ছোটবাবুর নামার পর ঘরের ভেতর ঢুকে তে'তুলের শরবত-টরবত করতে বসে। এ ব্যবস্থায় এতটুকু এদিক ওদিক হয় না। মাস তিনেক আগে থেকে হঠাৎ বাতাস যেন খানিকটা এলেমেলো হয়ে উঠেছে। একটা ফিসফাস কিছুর কানা-কানি এসে কানে ঢুকছে।

কানে ঢুকছে—বড়বাজারের বাড়িতে কর্তার কোনো পিসীর দেওরঝি জাতীয় এক অষ্টাদশী কন্যা কপাল পুড়িয়ে থান পরে এসে হাজির হয়েছে। হরচন্দ্রবাবুর বাড়িতে একটা মহল আছে সেখানে অনাথা আত্মীয়ারা থাকে। সেখানেই ছিল। হঠাৎ যে কি করে কে কর্তার কাছে একদিন এসে সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে সে কথা খোঁজ করবার প্রয়োজন হল না, কারণ কর্তার দৃষ্টি করুণায় সজল হয়ে উঠল। এ বাড়ির নতুন গিন্নী সতর্ক এবং সজাগ হয়ে উঠলেন। কিন্তু তখন আর ব্যাপারটা খুব সহজ ছিল না। কর্তা প্রায় করুণায় বিগলিত হয়ে গঙ্গা হয়ে উঠেছে। সব ভাসিয়ে দেবার মতো তুফানের বেগ সঞ্চয় করছে দ্রুতবেগে। নতুন গিন্নীর স্বাভাবিকভাবে মনে পড়ল ঐরাবত সম প্রমত্ত শক্তিশালীকে। যে শুঁড়ে টেনে নিয়ে তাকে হজম করে দেবে। সে ঐরাবত আর কেউ নয়—সে হল হৃদয়চন্দ্র, ছোটবউয়ের ছোটবাবু। বড়বাজারের বাড়িতে ছিল মানদা ঝি। মানদার এ বাড়িতে প্রতাপ অনেক। লোকে বলে হরচন্দ্রবাবুর দুটো চোখ ছিল একসময় যে চোখ দিয়ে তিনি অন্দরের সকল ঘরের সকল জনকে দেখতে পেতেন। এবং এমন একটা ইচ্ছা ছিল যেটা যেখানে যে কোণে যেমন ভাবে পাঠাতে চাইতেন তেমনিভাবেই গিয়ে পৌঁছুত এবং বিজ্ঞাপিত হত। তার মূলে নাকি এই মানদা ঝি। বাড়িতে সেকালে হরচন্দ্রকে গোপনে বলত 'মনসা' এবং মানদাকে বলত 'নেতা ধোবানী'। এ বাড়ির নতুন গিন্নী এই নেতা ধোবানী মানদার হাতে তুলে দিলে এই অষ্টাদশী বিধবাটিকে। তারই ফিসফাস ছোটবউ শুনেছিল। একটু শঙ্কাও হয়েছিল। মানদা মেয়েটাকে ছোটবাবুর চোখের সামনে ধরবে নাকি?

বিশ্বাস করে নি ছোটবউ। এত সাহস হবে মানদার? তার বাপেদের দাপটে গরানহাটা সোনাগাছি রামবাগান ভয়ে কাঁপে।

হঠাৎ সেদিন রবিবার রাত্রি যখন বারোটা তখন ছোটবাবুর জন্যে বারান্দায় রেলিংয়ে ভর দিয়ে অপেক্ষা করতে করতে মনে হল—না। এ আর হাওয়ায় ভাসা কথা নয়। এ কথা •অদৃষ্টের তীরের মতো বাতাস চিরে ছুটে এসেছে এবং তার ভাগ্যকে বিদ্ধ করেছে। ছোটবাবু শনিবার আপিস থেকে গেছে বাগানে—সেখানে শনিবার রাত্রি রবিবার সারা দিন সন্ধ্যের

পর ঘণ্টা দুয়েক কাটিয়ে এতক্ষণ ফিরে এসে পেঁৗছে ছোটবউয়ের সামনে হাত জোড় করে ক্ষমা চাওয়ার কথা কিন্তু কই ? কোথায় ? কি হল ? কোনো দুর্ঘটনা ? !

না। দুর্ঘটনা ঘটলে খবর আসত। সঙ্গে গাড়ি আছে—সহিস কোচম্যান ছোকরা নিয়ে তিনজন লোক আছে। কেউ না কেউ এসে পেঁৗছুত।

ঝপ করে মনের মধ্যে মানদা ঝি আর এ বাড়ির নতুন গিন্নী অর্থাৎ শাশুড়ীঠাকরুনের মুখ ভেসে উঠেছিল। মেয়েটাকে সে দেখে নি। তাতে উলটো ফল ফলেছিল। না-দেখার জন্য একটা মেয়েরই একশোটা মনভোলানো মুখ ভেসে উঠেছিল।

ভোরবেলা না হতে হতে মানদা ঝি সর্বাঙ্গে ধুলো মেখে মুখে পিঠে মারের দাগ নিয়ে কেঁদে এসে আছড়ে পড়েছিল ছোটবউয়ের পায়ের কাছে। ছোটবউ লাথি মেরেছিল মানদার মুখের উপর।—এই নে, এই নে, এই নে !

মানদা বলেছিল—মার মা মার। লাথি মার ঝাঁটা মার জুতো মার। দোষ আমার স্বীকার করছি দোষ আমার বটে। কিন্তু বিচার কর, এ বিচার তুমি ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না।

চৌবাচ্চার নালীর মুখের ন্যাকড়া খুলে দিলে জল যেমন অনর্গল বের হয়ে যায় তেমনি-ভাবেই মানদা সব নিবেদন করলে।

বললে—"সে পেরায় হাজার হাজার টাকার গয়না ছোটবউমা—একেবারে গিনি 'সামিগ্‌গিরি'; একখানা এই বড় কাঁসার বগিথালা ভর্তি ভর্তি; হার চুড়ি বালা অনন্ত বিছে বাজু; সে বাছা সর্বাঙ্গ সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়া। তাতে আবার পাথর বসানো। দামী দামী পাথর। নাকছাবির পাথরখানার ওপর আলো পড়ে সে যেন ঝক্‌মক্ ঝক্‌মক্ করে ওঠে মা ! তাই দেখে আমি বন্নু—ওলো কম্‌লি এ কাজ তুই করিস না। ছোটবাবু পাগল মানুষ দিলদরিয়া মেজাজ। তোকে চরণে ঠাঁই দিয়ে বাগানে এনেছে এই ঢের। তোর সাতপুরুষের ভাগ্যি। সেই মানুষের সর্বনাশ করিস না। কিছু গয়না নিয়ে বাকি সব বাবুকে ফিরিয়ে দে; বল্—তোমার কাছে রাখ। নয় চল ছোটবউরানীর কাছে গিয়ে সব খুলে বল। গয়নাগাঁটি তার চরণে রেখে হাত জোড় করে বল, তোমার যা হুকুম হবে আমি তাই করব। তোমাদের রাজবাড়ি—এখানে এক রানীর দশ বিশ ঝি। এক বাবুর দশটা রাখ্‌নী বাঁদী। আমাকে দয়া করে ওদের সঙ্গে একপাশে ঠাঁই দাও—তোমাদের অনেক পুণ্যি হবে।"

মানদা বসে হাত জোড় করে কথা বলছিল, হঠাৎ এইবার উঠে প্রায় অভিনয়ের অঙ্গভঙ্গি করে বললে—"এই না শুনে মা, একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল খাট থেকে মেঝের ওপর। তারপর চুলের মুঠো ধরে, ছোটবাবুর হাতে একগাছা ছোট লাঠি মতন থাকে, সেইটে নিয়ে আমাকে আথালিপাথালি মার। বাপরে মারে বলে চেঁচালাম তো ছোটবাবু ছুটে এসে সব শুনে আর একদফা মার আমাকে। নাথি কিল চড়। আর সেই হারামজাদী এই মুখে হাতে নখ দিয়ে খামচে দিয়েছে দেখ। রক্ত পড়েছে দেখ, কাপড়ে দেখ দাগ রয়েছে। তারপর আমাকে বলে নাকি তোমার কাছে ঘুষ খেয়েছি, আমি নাকি তোমার চর। তা' বললাম—তাই। তাই। তাই। শতেকবার আমি তার চর। তুই ভেবেছিস তুই ছোটবউরানীর কপাল খাবি ? তা' হবে না তা দোব না। এই বলে—তুই হারামজাদী খানকী, এত বড় কথা বলিস তুই ? তোর ছোটবউরানীর কপাল খাব কি, খেলাম—আজই খাব। খাই তুই দেখ। বলে আমাকে ঘরে পুরে রেখে ছোটবাবুকে মদ গিলিয়ে সে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইল। রাত্ত দশটা এগারোটা বারোটা চলে গেল উঠতেই দিলে না। শেষ রাত্রে ফাঁক পেয়ে আমি পালিয়ে এসেছি।"

এইবার আবার হাত জোড় করে বসে হাঁসফাঁস করতে করতে মানদা বললে—"এই শ্যামবাজার পেরিয়ে টালার খাল, খাল পার হয়ে বারাকপুরের রাস্তায় মা পাকপাড়ার একটু আগে খেলাতবাবুর বাগান; মস্ত বাগান; ওইখানে নতুন বাগান নিয়ে মাইফেল হচ্ছে মা। এর উপায় কর।"

ছোটবউরানী সঙ্গে সঙ্গেই একখানি গাড়ি ভাড়া করে সঙ্গে দারোয়ান নিয়ে হাজির হয়েছিল বাপের বাড়িতে; সেখান থেকে বাপের বাড়ির সর্বময়ী কর্ত্রী পিসীমাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল এ বাড়িতে। হরচন্দ্রবাবু কোর্টে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন ঠিক এই সময় ঢুকল ছোটবউ-এর বাপের বাড়ির জুড়ি। অন্য সময় গাড়ি লাগে ভিতর-বাড়ির মহলের দরজায়, সে দিন লেগেছিল একেবারে বাইরের বাড়িতে হরচন্দ্রের ওকালতি সেরেস্তার জন্য মহলটার সদর ফটকে। তারপর সে এক প্রচণ্ড মামলা।

সারাটা দিন ধরে মামলা চলল। হরচন্দ্রের কোর্টে যাওয়া হলনা, বাড়িতে আসামী হলেন। তাঁর পাশে বাড়ির গিন্নীও এসে দাঁড়ালেন আসামী হয়ে। বাগানবাড়ি থেকে ছোটছেলেকে গাড়ি পাঠিয়ে আনানো হল। এখান থেকে দারোয়ান গেল টালার বাগানবাড়ি; হুকুম রইল ওখানকার মেয়েছেলেটা যেন না-পালায়।

ছোটবউরানীর পিসীমা জজের মতোই বসে রইল। নালিশের আর্জি বহস বিস্তারিতভাবে উচ্চ দৃপ্ত কণ্ঠেই করে গেল ছোটবউ। মধ্যে মাঝে এ বাড়ির নতুন গিন্নী হরচন্দ্রের দ্বিতীয়া স্ত্রী বাদপ্রতিবাদ করতে চাইলে কিন্তু পারলে না। গলায় জোর এলো না, বোধহয় মনেও জোর ছিল না; কয়েকবার বাদপ্রতিবাদ করতে গিয়ে ধমক খেলে ছোটবউয়ের কাছে। ছোট-বউয়ের পিসী ছোটবউয়ের চিৎকারের পরই মৃদুকণ্ঠে বললে—বেয়াই, গোপেশ্বর বারবার করে বলে দিয়েছে যে, হুণ্ডির টাকার জন্যে আর সময় দিতে পারবে না। ওগুলো মিটিয়ে দিন।

H. C. Chatterjee & Co-র পাটের কারবারের কাটা হুণ্ডির টাকার জামিন মানে গ্যারেণ্টার আছে গোপেশ্বর মুখুজ্জে। এ কথাগুলোর এ ক্ষেত্রে সঙ্গতি না থাকলেও কেউ বলতে পারলে না—"এ কথা এখন এখানে কেন?"

বিচিত্রভাবে এরই উত্তরে হরচন্দ্র মৃদুস্বরে স্ত্রীকে বললে—চুপ কর, তুমি চুপ কর সুর-বালা। এ নিয়ে চেঁচামেচি করে না। ঠাকুর বলেছেন—সহ্য কর। যে সয় সে মহাশয়। চুপ কর চুপ কর!

বিচিত্রচরিত্র হৃদয়চন্দ্র এরই মধ্যে কোথা থেকে মদ সংগ্রহ করে খেয়ে মাতাল হয়ে পড়ে আছে। মধ্যে মধ্যে বলছে—নেহি মাংতা হ্যায়। মধ্যে মধ্যে বলছে—নিকাল দো বাড়িসে নিকাল দো। কখনও বলছে—মাইরি বলছি আর করব না।

সমস্ত বাড়িটা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। শুধু সন্ত্রস্ত নয়, কুটিল কৌতুহলে কৌতুহলী হয়ে উঠেছিল প্রত্যেক মানুষটি। মন্মথ দশটায় স্কুলে গিয়েছিল—সে এর মধ্যে থাকতে চায় নি, কিন্তু টিফিন নাগাদ এই কৌতুহল তাকে বঁড়শি-গাঁথা মাছকে টানার মতো টান দিয়ে ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরিয়ে এনেছিল। মনের মধ্যে ক্রমাগত প্রশ্ন হচ্ছিল—তারপর? কি হল তারপর?

যাই, না-যাই করতে করতেই বই দপ্তর বগলে নিয়ে বড়বাজার ফিরে এসেছিল। হরচন্দ্র-বাবুর বাড়ির সামনে কোনো ভিড় ছিল না। তবে দারোয়ান একটার জায়গায় দুটো দাঁড়িয়ে ছিল। পায়ে পায়ে এসে ফটকের ভিতর ঢুকেই দেখতে পেয়েছিল পাথুরেঘাটার রায়চৌধুরীদের বাড়ির সম্ভ্রান্ত পালকি দু'খানা তখনও রয়েছে; হরচন্দ্রবাবুর ব্রুহাম দাঁড়িয়ে আছে—ছোট-বাবু অর্থাৎ হৃদয়চন্দ্রের জুড়িখানাও রয়েছে। সহিস, কোচম্যান, বেহারার দল সব ওদিকে

আস্তাবলের ধার ঘেঁষে বসে তামাক খাচ্ছে গল্প করছে। উঠোনের একপাশে জমাদারনীটা বসে আছে ঝাড়ু বালতি নিয়ে। উপরের কাজ বাকী রয়েছে। উপরে যাওয়ার এখন হুকুম নাই। কাজ না করেও তার যাবার সাধ্য নাই।

মন্মথর ফটকে ঢুকতে বাধা ছিল না। দারোয়ানেরাই ফটকটা একটু খুলে দিয়ে তার ভিতরে ঢুকবার পথ করে দিলে। সে সরাসরি এসে তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরখানার দরজায় তালা খুলতে খুলতে পিছন ফিরে একবার সব দেখে নিলে।

নিচের তলায় আদালত সেরেস্তায় তিনজন কেরানী, তারা উপুড় হয়ে থুতনিতে হাত দিয়ে বসে আছে। কথাবার্তা বলছে না। তারা কথা শুনছে। কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে, পুরো-পুরি না, টুকরো টুকরো ; যা কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা এবং উচ্চতার জন্য দেওয়াল দরজার বাধা ঠেলেও বেরিয়ে আসতে পারছে। এই তীক্ষ্ণ কথাগুলি একজনেরই। সবই হৃদয়চন্দ্রের স্ত্রীর। কণ্ঠস্বরখানিকে সে সকালেই চিনে গেছে। ওদিকে বাড়ির ঠাকুর চাকরেরা ক'জন এসে দরজার মুখে মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ঠিক এই মুহূর্তটিতেই ছোটপুত্রবধূর কণ্ঠস্বর যতখানি তীক্ষ্ণ এবং ক্রুদ্ধ হতে পারে তাই হয়ে উঠল, তেমনি কণ্ঠে সে বললে--আমি চললাম। এরপর কোর্টে গিয়ে দাঁড়াব আমি। —হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। দাঁড়াব দাঁড়াব দাঁড়াব। আমার খোরপোষ আদায় করে নেব আমি।

সে যেন মুহূর্তে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল দোতলার ঘরের ভিতর থেকে বারান্দায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে ডেকেছিল—চলে এস পিসী, চলে এস।

পিছনে পিছনে হরচন্দ্রের কণ্ঠস্বর ভেসে এসেছিল ছোটবউয়ের খোলা দরজা দিয়ে।

—বউমা বউমা—শোন। বউমা!

তার সঙ্গে ছোটবউয়ের পিসীর ঠাণ্ডা গলায় ডাকা ডাকও ভেসে এলো—চপ্‌লি! চপ্‌লি, শোন ; দাঁড়া ; যাচ্ছি আমি দাঁড়া!

ছোটবউয়ের ডাকনামটা জানত মন্মথ। সেটা—চপলা।

বেশ নাম। অন্তত মানানসই নিশ্চয়। বিদ্যুৎই বটে। হাত-পা-নাড়া, ঘোরাফেরার মধ্যে এমন চমক আছে যে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। সে ভুলে গিয়েছিল নিজেকে কয়েক মুহূর্তের জন্য ; অবাক হয়ে ছোটবউ চপলার দীপ্তি দেখছিল। হঠাৎ ছোটবউ বারান্দার দিকে ফিরল এবং মন্মথকে দেখে যেন থমকে গেল।

চোখ বিস্ফারিত করে মন্মথর দিকে তাকিয়ে রইল। চোখের দৃষ্টির তীব্রতা ক্রোধ বিস্ময়ের সঙ্গে জড়িয়ে তাকে যেন ভস্ম করে দিতে চাইলে।

পরক্ষণেই চিৎকার করে উঠল—দারোয়ান! দারোয়ান!

দারোয়ানেরা ছুটে এলো—মাঈজী!

—ই ছোকরা কৌন হ্যায়? কৌন উসকো ঘুষনে দিয়া? ও কি মক্কেল?

এরপর?

জগন্নাথঘাটের সিঁড়ির উপর বসে একটু হাসলে। হাসিটা একটু হয়তো আয়তনে ছোট কিন্তু তিক্ততার আর শেষ নেই এ হাসির।

পকেটে হরচন্দ্রবাবুর একখানা চিঠি ছিল। সেটাকে সে স্পর্শ করলে। চিঠিখানা হরচন্দ্রবাবু হেডমাস্টারমশায় মারফত তাকে লিখেছিলেন।

"এবম্বিধ ঘটনা সংঘটন জন্য আমি সাতিশয় দুঃখিত। কিন্তু ঠাকুর বলিতেন যাহা ঘটে তাহা তাঁহার ইচ্ছায় ঘটে, তাহা সহ্য করিতে হয় মানিয়া লইতে হয় ; দুঃখ করিলে হিসাবের জের টানা হয়।

তুমি অন্যত্র স্থান দেখিয়া লও। আমি তোমার খরচ জন্য মাসিক টাকা দিব। তবে

ইহা ক্ষতিপূরণ নয় বা তোমার নিকট কোনোপ্রকার দোষের মাসুল নহে। এতৎসঙ্গে ইহা লেখা প্রয়োজন যে দোষ প্রথমেই তোমার আবার দ্বিতীয়বারেও তোমার। তুমি জানিয়া চিনিয়া কয়েকটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের করা থিয়েটারে হৃদয়চন্দ্র হরিশচন্দ্র বড় বউমা ছোটবউমার পাশে একসারিতে বসিলে কেন? প্রথমেই উঠিয়া যাওয়াই কি উচিত ছিল না? গতকল্য তুমি ঘরের তালা খুলিতে খুলিতে দোতলায় কি ঘটিতেছে তাহাই বা দেখিতেছিলে কেন? বধূমাতার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকা অতীব লজ্জার কথা! আরও বড় অপরাধ তোমার পলাইয়া যাওয়া।"

সে পালিয়ে এসেছিল ও বাড়ি থেকে। তখনও উপরের মামলা মেটে নি। মামলাটা তখন আপোসের মুখে।

ঘটনাস্রোত তখন দুটো সহজ ভাঙনের মুখে বের হতে আরম্ভ করেছে। একটা ভাঙনের মুখে সে ভেসে গেল অন্য ভাঙনটা হল সেই হতভাগিনী মেয়েটা, যে মেয়েটা নাকি পাক-পাড়ার কাছাকাছি খেলাতবাবুর বাগানের পাশের একটা বাগানে থালাভর্তি গিনিসোনার গয়না পরে রায়চৌধুরীদের মেয়ে চপলার লম্পট স্বামীটিকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল ভালবাসার জনরূপে!

মন্মথ বড়বাজারের বাড়িতে থেকেছিল তো কম দিন না। এক বছর ক'মাস। সেকেন্ড ক্লাসে উঠে গোটা সেকেন্ড ক্লাস এবং ফার্স্ট ক্লাসের এই কয়েক মাস। এ বাড়ির গলিঘুঁচি সবই তাঁর চেনা এবং জানা। তাছাড়া শহরের বাড়িতে পাহারায় ধুম, ফটকের মুখে। এ ছাড়াও দু'তিনটে পথ বাড়িতে থাকে। এ বাড়িতেও খিড়কির পথের মতো ছোট ছোট দুটো দরজা বাড়ির দু'পাশে ভিতর থেকে বন্ধ থাকে। বাইরে আছে সংকীর্ণ গলিপথ। জমাদারনী ঝাড়ু দিয়ে বার হয় এই পথে। সেই একটা পথ ধরে জিনিসপত্র ফেলেই সে বেরিয়ে চলে এসেছিল ও বাড়ি থেকে।

বেলা প্রায় আড়াইটে পর্যন্ত সে ঘরে আটক হয়ে ছিল। ছোটবউ হুকুম দিয়েছিল—ছোঁড়াটাকে আটকে রাখো। আড়াইটের সময় যখন ঠিক হল ওই মেয়েটাকে সোনাগাছিতে কোনো বাড়িউলীর বাড়িতে চালান হবে। তার দামটা পাবে ওই মানদা ঝি। এবং হরচন্দ্রবাবু পাঁচ হাজার টাকার এবং ছোটবাবু হৃদয় পাঁচ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ করে দেবে ছোটবউয়ের নামে। এরপর আর স্থির হল যে এই উদ্ধত এবং রীতজ্ঞানবহীন আশ্রিত বালকটিকে ডেকে হাত জোর করে বলাতে হবে—আমার দোষ হয়েছে। কথাটা বাড়ির ভিতর দিক থেকে একটা ঝি এসে তাকে বলে গেল। বলে গেল—যাক তোমার খালাস হয়ে গেল বাছা! শুধু হাত জোড় করে বললেই হবে যে দোষ হয়েছে! এ্যাঁ! বাঁচলাম বাবা! তোমার তরে আমার বড় ভাবনা হয়েছিল গো। সে বলেছিল—ওকথা আমি বলব না। তারপর যা ঘটেছিল সে তার কল্পনাতীত। এবং জীবনের সব সুখ আনন্দ যেন ওই ঘটনাতেই সমুদ্র-মন্থনে অমৃতের মতো উঠেছিল। সেটা হল এই। ওই ঝি-টি চলে যাবার পরই ওই জানালাতেই মিনিটখানেকের জন্য এসে দাঁড়িয়েছিল এ বাড়ির নতুনমা ছোটগিন্নী। তাকে সে চিনত। চিনত রূপে। সেদিন চিনেছিল স্বরূপে। ছোটগিন্নী জানালায় দাঁড়িয়ে বলেছিল—তুমি যদি ক্ষমা না চাও তো হয়তো অপমান করাবে ছোটবউমা।

সে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল—করাক অপমান। আমি সইব। কেমন করে জানি না। হঠাৎ সে যেন সেদিন এক আলাদা মানুষ হয়ে উঠেছিল। সে মনে মনে পাথরের মতো কঠিন হয়ে উঠে স্থির করেছিল সে ক্ষমা কোনোমতে চাইবে না।

এ বাড়ির গিন্নী বলেছিল—তুমি তাহলে চলে যাও। পিছন দিকে একটা গলি আছে

সেই গলির উপর দরজা আছে—তা তালার চাবি খুলে দিচ্ছি তুমি চলে যাও।

সে আর না বলে নি। চলে এসেছিল।

বেরিয়ে এসেছিল একবস্ত্রে। পকেটে কিছু পয়সা ছিল। ছ' আনা আড়াই পয়সা। একমাত্র ভাবনা ছিল ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার। বেরিয়ে এসে ভাবনা হল—কোথায় যাবে? হেডমাস্টার মশায়ের কথাই প্রথম মনে হয়েছিল। কিন্তু না; সে যায় নি সেখানে। রমেশ স্যারের কাছেও যায় নি। সত্যপ্রসাদদের কথা প্রথম থেকে বার বারই মনে হচ্ছিল—কিন্তু না।

কাকা কাকীমা পণ্ডিতমশায় এদেরও পড়েছে। কিন্তু না।

বিভূতিকে মনে পড়েছে। রাধাশ্যামকে মনে পড়েছে। কিন্তু না।

অবশেষে সে গিয়ে উঠেছিল দ্বিজবর মুন্সীর বাড়ি। দ্বিজবর মুন্সী জ্যোতিপ্রসাদবাবুর হেডক্লার্ক। দ্বিজবর বসু, জ্যোতিবাবু হেডক্লার্ক হিসেবে মুন্সী বলেন। তা' থেকে মুন্সীই হয়ে গেছে দ্বিজবর বসু। সেদিনের সেই দুর্ভাগ্যজনক থিয়েটার দেখতে এসে, থিয়েটার ভাঙার পর মন্মথ দ্বিজবরের বাড়িতেই ছিল। ব্যবস্থাটা জ্যোতিপ্রসাদবাবুর।

মানুষটি প্রবীণ মানুষ, বয়স পঞ্চাশের কোঠা পার হয়ে গেছে। সেদিন সে সত্যর কথা-মতো তাকে ডেকে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল, স্নেহসমাদর করেছিল। দ্বিজবর মুন্সীকেই সে প্রথম বলেছিল থিয়েটারে হৃদয়চন্দ্র হরিশচন্দ্রের সঙ্গে একসারিতে বসা নিয়ে যে ঘটনাটুকু ঘটেছিল তার কথা। মুন্সী বলেছিল—তোমার কোনো দোষ নাই। কিন্তু ওরা যদি দোষ ধরে তবে সে কথা ওদের বোঝাবে কে বল? এই জাতটা বড় খারাপ হে মন্মথ! এই আজকালকার পয়সাওলা আধা ফিরিঙ্গীর দল!

মন্মথ কোনো কথা বলে নি। অন্তরে সে আজ কঠিনতম আঘাত পেয়েছে। সে কোনো কথা বলে নি। মুন্সীই আবার বলেছিল—তুমি যে বিনা লাঞ্ছনায় চলে আসতে পেরেছ এটা তোমার ভাগ্য আর ওই হরচন্দ্রবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের করুণা। উনি পাকা চুলে সিঁদুর পরুন। তুমি বড় হয়ে সুযোগ পেলে ও'র উপকার ক'রো। সুযোগ পাবে। আমি বলছি তুমি সুযোগ পাবে। আমি তো জানি—হরচন্দ্রবাবুর ক্লার্ক তো আমাদেরই আপনাআপনি। সবই শুনি জানি। তোমার কথাও শুনেছি। তুমি বড় হবে হে তুমি বড় হবে। দ্বিজু মুন্সীর চোখ ভারী তাজা হে! একনজরে খাঁটি মেকী ধরে ফেলতে পারে। খাঁটি ছেলে না হলে তুমি আমার বাড়ি আসতে না হে, যেতে জ্যোতিপ্রসাদবাবুর বাড়ি। তা' থাকো এখানে দু'চার দিন। কষ্ট হবে, বাড়ি ছোট। তাছাড়া তুমি বামুনের ছেলে আমি কায়স্থ। তবু আমি খুশী হয়েছি তুমি আমার বাড়ি এসেছ!

মন্মথ বলেছিল—আপনাকে আমার ভালো লাগে। বেশ সোজা মানুষ আপনি।

দ্বিজু মুন্সী বেশ সম্পন্ন লোক। এতবড় উকিলের মুহুরীবাবু, উপার্জন তার যথেষ্ট। বড় বড় ঘরের সঙ্গে পরিচয় আছে। তাদের অন্য কাজকর্ম করে দেয়। তাছাড়া বাড়ি জমি কেনা বেচার কারবারের মধ্যেও আছে। দালালী করে দেয়। কৃপণ মানুষ। অন্তত মুঠো-শক্ত মানুষ তো বটেই। থান কাপড় গলাবন্ধ কোট আর পাটকরা চাদর গুণচিহ্নের ভঙ্গিতে কোটের উপর চড়িয়ে কোর্টে যায়। বাড়ি এসে আটহাতি খাটো ধুতি পরে; জ্যোতিপ্রসাদ-বাবুর বাড়ি যায় থান কাপড় আর মেরজাই গায়ে দিয়ে।

চোরবাগানের একটা বসতির আরম্ভ যেখানে সেখানেই একখানা একতলা বাড়িতে থাকে দ্বিজু মুন্সী। বাড়িখানা পুরনো। ঘর কয়েকখানাই আছে। বাড়িতে লোক পাঁচ জন।

স্বামী স্ত্রী আর তিন কন্যা। স্ত্রী রান্না করে, মেয়েরা অন্য কাজকর্ম করে। চাকরবাকর নেই। আছে ঠিকের ঝি। বাসন মেজে সকালের কাজকর্ম করে দিয়ে যায়। দ্বিজু মুন্সী নিজে বাজারে যায়। মেয়েরা বাপের জন্য কলকেতে তামাক সেজে রাখে। মুন্সী বাড়ি ফিরেই বাবুর সেরেস্তায় ছোটে। বাবুর বাড়ি খুব কাছে।

মন্মথর উপর একটা স্নেহ তার পড়েছে। ছেলেটির সঙ্গে কথাবার্তা বলে ভারী ভালো লেগেছিল তার। তাই থিয়েটার ফেরত মন্মথকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি আসবার সময় বলেছিল—তুমি তো জটাধর ভটচাজের ভাইপো?

মন্মথ বলেছিল—হ্যাঁ।

—ওখান থেকে তুমি হরচন্দ্রবাবুর বাড়ি চলে গিয়েছ?

—হ্যাঁ।

—জ্যোতিবাবুর বাড়িতে চীনেমাটির বাসনে চা খাবারটাবার খেয়েছ বলে তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে শুনলাম।

মন্মথ বলেছিল—না আমি নিজেই চলে গিছলাম। সত্যদের বাড়ি থেকে চা খেয়ে জল খেয়ে বেরুচ্ছি—

—সে আমি জানি। কিন্তু জটাধর ভটচাজ তো নিজে আচণ্ডালের বাড়ি খেয়েছে হে, খায়ও।

মন্মথ চুপ করে থেকেছিল।

দ্বিজু মুন্সী বলেছিল—দেখ তোমার যিনি ছোটমা, মানে সৎমা আর কি তিনি হলেন আমার গুরুবংশের মেয়ে। বুঝেচ? আমি দিদি বলি। আমরা কায়স্থ তো। গুরুকন্যা প্রণাম করতে হয়। তা' সে আমাকে চিঠি লিখেছিল ওই ঘটনার পর—তুমি তখন হরচন্দ্র-বাবুর বাড়ি চলে গেছ। বুঝেচ? লিখেছিল—ভাই জীবন আমার সৎছেলে মন্মথ আপন সন্তানের অধিক এবং তাহার বাপের একমাত্র বংশধর জলপিণ্ডের আধার। আমি জানি সে অতি বুঝিল এবং বুদ্ধিমান ছেলে। ছেলেও বাপকে খুবই ভালবাসে। কেবল আমাকে বিবাহ করার জন্যই বাড়ি আসে না। আসে না একদিন আসিবে। কিন্তু ব্রাহ্ম হইয়া গেলে আর ফিরিবে না। এখানে আমার দেবরের কর্মচারী মারফত প্রচার হইতেছে যে, সে ব্রাহ্ম হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে তোমার ভগ্নীপতি মর্মান্তিক দুঃখ পাইয়াছেন। শুনিতেছি তুমি ব্রাহ্ম উকিলবাবুর সেরেস্তাতেই কর্ম করিয়া থাক। তুমি সঠিক সংবাদ দানে আমাদের মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চার করিবে।

মন্মথ কুণ্ঠিতভাবে প্রশ্ন করেছিল—কি লিখেছেন আপনি?

—ঠিক যা তাই লিখেছি। লিখেছি ব্রাহ্ম সে হয় নাই। আমি জানি। জটাধরবাবু এবং তাহার স্ত্রী যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য নহে। সেই কারণেই ছেলেটি অন্য একজন উকিলের বাড়িতে আশ্রয় লইয়াছে। ছেলে ভালো বলিয়া উকিলবাবু হরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজে ডাকিয়া আশ্রয় দিয়াছেন। হরচন্দ্রবাবু গোঁড়া হিন্দু। এক্ষণে আবার ঠাকুরের শিষ্য হইয়াছেন। তবে তাহার সহিত একথাও সত্য যে তোমাদের ছেলে আর সেই ছেলে নয়। ইংরাজী পড়িতেছে—তাহার জন্য বদল হইয়াছে এবং হইবে। গ্রামে ফিরিয়া সে আর গুরু পুরোহিতের কর্ম করিবে না শিষ্য যজমান সাধিবে না।

মন্মথ বলেছিল—জানেন, যখন কলকাতা আসি তখন বাবা আমাকে বলেছিলেন—নচিকেতাকে যম ধনরত্ন রাজ্য ঐশ্বর্য দেবকন্যা দিয়ে ভোলাতে চেয়েছিলেন। নচিকেতা বলেছিল—ধনরত্নে মানুষের তর্পণ হয় না। যা অমৃত নয় তা নিয়ে আমি কি করব? এই কথাটি যেন মনে থাকে। বিদ্যা শিখে দেশে ফিরে যাব বাবার কাজ করব এইটাই তখন

মনে ধরত।

হা হা করে হেসেছিল দ্বিজু মুন্সী। একচোট হেসে নিয়ে বলেছিল—তুমিও যেমন হে! ওসব শাস্ত্রের কথা। ওসব ওই দু'চারজন বড়জোর দশজনের জন্যে তৈরি। ওই পরমহংসদেব বলতেন টাকা মাটি মাটি টাকা। বলে গঙ্গার জলে মাটি টাকা ফেলতেন। তাঁর আশীর্বাদে তাঁর শিষ্যদের ক'জন—এই ধর দত্তদের ছেলে নরেন দত্ত-টত্ত ক'জনের কাছে তাই হল। ও কি তা বলে সবারই হবে? ব্রাহ্মদের কেশব সেন মশায়ের এমনি হত। শুনি জোড়াসাঁকোর দেবেন ঠাকুর মশায় পায়ের জুতোয় মণি-মুক্তো বসান। তা' সেই জ্ঞান কি আমার হবে? ওসব কপালে করে হে। এই দেখ এক লগ্নে ক্ষণে জন্মেছিল এক রাজার ছেলে আর এক চামারের ছেলে। জন্মলগ্নের গ্রহসংস্থানের ফলে ছিল একটা নির্দিষ্ট সময়ে সোনাপ্রাপ্তি। তা' রাজার ছেলে ঠিক একতাল সোনা কুড়িয়ে পেলে আর চামারের ছেলেটা পেলে এই বড় একটা মরা সোনাব্যাঙের চামড়া!

দ্বিজু মুন্সী আরও বলেছিল—দেখ, সংসারে জন্মেছ—খাবে দাবে স্ত্রী পুত্র নিয়ে ঘর-সংসার করবে, মোটামুটি কাউকে ঠকাবে না—নিজে তো ঠকবেই না। আর সঞ্চয় করবে, বুঝেচ। গরীবের ঘরে মা লক্ষ্মী ঢোকেনই না। বড়লোকের ঘর থেকে অপব্যয়ের জন্য পালান—যারা সঞ্চয় করে তাদের বাড়ি এসে লোহার সিন্দুকের মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোন। ওসব বড় বড় শাস্ত্রের কথা মাথায় করতে হয়। বুঝেচ। তার বেশী নয়। হ্যাঁ। ভালো করে মন দিয়ে পড়। ভালো ছেলে তুমি। সত্যপ্রসাদ তো ছেলেমানুষ, খোদ বাবু খুব প্রশংসা করেন তোমার। পাস করে নাও টপটপ করে—বড় উকিল হও। তা' হতে পারবে তুমি। একবার নাম ছুটলে হয়। একটা পাশার দান। বাস্। হুড়হুড় করে টাকা আসবে। লগ্নী কর সেই টাকা। জলে জল বাঁধবে। ওকালতির তুল্য লাইন নাই। মামলা লাগলে টাকা চলে জলের মতো। শোভাবাজারের দেবেদের বাড়ির পুষ্যিপুত্তুর নেওয়ার মামলা, প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত। এপক্ষে দশ ওপক্ষে বারো বাইশ লক্ষ টাকা মামলা খরচ। তারপরে ধর দিল্লীর বাদশার টাকা বন্ধ—রাজা রামমোহন বিলাত চলে গেল মামলা করতে। বুঝেচ। ওকালতি হল মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ নিয়ে পাশাখেলা! বুঝেচ ইংরেজদের রাজত্ব হল established by law.

মন্মথ নির্বাক হয়ে শুনেই গিয়েছিল।

সেদিন হরচন্দ্রবাবুর বাড়ি থেকে কোনোরকমে বেরিয়ে এসে দ্বিজু মুন্সীর বাড়িতে এসে বলেছিল—আমাকে একটু আশ্রয় দিন। অন্তত আজকের মতো।

সমস্ত শুনে দ্বিজু মুন্সী বলেছিল—তাই তো হে, স্বজাতি হলে তো ভাবনা ছিল না, বলতাম এখানেই থাক। লেখাপড়া কর। অন্ন আমি দেব মাইনেও দেব। না হয় একটা মেয়েকে তোমার হাতে দিতাম। কিন্তু—।

চুপ করে গিছল মুন্সী। সকালে উঠে মুখ হাত ধুয়েই সে বেরিয়েছিল একটা আশ্রয় তাকে বের করতেই হবে এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে। তাকে সন্ধান একটা ওই মুন্সীই দিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল—বেরুচ্ছ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় কোথায় যাবে বল তো? কার কার বাড়ি?

চুপ করে থেকেছিল মন্মথ। বড়মানুষে শ্রদ্ধা তার আর ছিল না। এক জ্যোতিপ্রসাদদের মতো লোকের বাড়ি যেতে পারে সে কিন্তু তাও সে যাবে না। সে বুঝতে পেরেছে ওদের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক রাখা তার ঠিক হবে না। তার বাবার হয়তো জাত যাবে, মাথা হেঁট

হবে। না। সেটা সে হতে দেবে না।

মুন্সী বললে—দেখ একটা কথা তোমাকে বলি। তোমার কাকার পয়সা হয়েছে। পয়সাওয়ালা আপন কাকা—তার অন্নই তোমার সয় নি। তোমাকে আমি বড়লোকের বাড়ি ভাত মেগে খেতে আর মাথা গুঁজবার ঠাঁইয়ের জন্য যেতে বলব না। ও তুমি যেয়ো না। তুমি বরং হুগলী জেলার মেস বোর্ডিং যেখানে-যেখানে আছে সেখানে-সেখানে যাও। এখন নানান জেলার লোক ঝেঁটিয়ে আসছে কলকাতায়, ছোট বড় মাঝারি কাজ করে, একলা বাসা করলে পোষায় না। আর তাতেই বা ফল কি? মেস বোর্ডিং করে। বড় চাকরেরা বড়র মতো দেয়। মাঝারিরা তাদের মতো দেয়। দু'চারজন ছোট চাকর থাকে। তারা কাজকর্ম করে দেয়। মেসের বাজার করা, হিসেব রাখা। দু'চারটে বরাতসরাত যা চাকরে পারে না তাই করে দেয়—তাদের সঙ্গে থাকে খায়। অনেক ছাত্রও আছে। ল পড়ে, ডাক্তারি পড়ে। খোঁজ কর ঠিক মিলে যাবে।

দ্বিজ্ন মুন্সীর একটা আশ্চর্য রকমের 'কলকাতা পরিচয়' আছে। তার মধ্য দিয়ে নতুন করে কলকাতাকে চিনলে মন্মথ। কলকাতার পরিচয় সে মস্ত বড়—দ্বিজ্ন মুন্সী বলেছিল—ওসব বৃহৎ ব্যাপার মন্মথ। একটা ছড়া আছে জান? 'বহুরঙ্গের পুরী; কেউ হাসছেন, কেউ কাঁদছেন, কেউ করছেন চুরি!' চোর হচ্ছেন রাজা, রাজা হচ্ছেন ফকির। ধর্ম হচ্ছে অধর্ম, অধর্ম হচ্ছে ধর্ম। পয়সা দিলে বাপের শ্রাদ্ধে মাথা কামাতে হয় না। আইন করে বিধবার বিয়ে হয়। সায়েবদের সঙ্গে খানা খায়, টেবিলের উপর রেখে খায়, ভটচাজ্যিরা পয়সা নিয়ে বলে বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নাই। আবার কচি মেয়ে বিধবা হয়ে বৈশেখী একাদশীতে জল খেলে ভ্রষ্টা বলে পতিত হয়। কাশী নবদ্বীপে গিয়ে চরে খায় কিংবা সোনাগাছি গরানহাটা হাড়কাটা রামবাগানের বাজারে গিয়ে দাঁড়ায়। ম্লেচ্ছ! বামুনে জুতোর দোকান করে। ছোঁড়ারা বার্ডশাই খায়, আলবার্ট কাটে, পিছনের চুলগুলো চেঁচে ফ্যালে। তবে হ্যাঁ কোনোরকমে যদি লেখাপড়াটা শেখো তাহলে করে খাবে! তা' খাবে। এলেমের কাল; মাটি খুঁড়ে কালো-মাটি কয়লা বের হচ্ছে। রেলের লাইন বসছে। তারে-তারে খবর যাওয়া আসা করছে। কলকাতায় কলের জল হচ্ছে। শুনছি গ্যাসের আলো হবে শীগ্গির। গোটা বাংলা মুলুকের লোক কলকাতায় আসছে। সারা দেশের জিনিসপত্র আসছে কলকাতায়, জাহাজে তুলে নিয়ে যাচ্ছে নিজের দেশে—দিয়ে যাচ্ছে এই সব দ্রব্যি। পাড়াগাঁ মরল। কলকাতা ফাঁপল। পাড়াগাঁয়ের বড়লোকেরা ধনীরা জমিদারেরা এখানে বাস করছে, সাত-পুরুষের ভিটে ছাড়ছে। মানে তোমার খুড়ো যে দলে নাম লিখিয়েছে গো। আবার এই আমার উকিলবাবু ও তোমার হরচন্দ্রবাবু সবাই তাই গো। এরা তোমার আমার মতো মানুষের কেউ নয়। তবে আছে। খুঁজলেই মিলবে জায়গা। গোটা কলকাতা-ময় এ জায়গা ছড়ানো আছে।

দেখ বাংলাদেশে যতগুলো জেলা আছে মানে বাংলা বিহার উড়িষ্যার যত জেলা আছে তার বিশ পঁচিশ গুণ করে যত সংখ্যা হবে, তত মেস বোর্ডিং আছে—তা' ছাড়া দু'তিন ভাগী থেকে চার পাঁচ ভাগীর বাসা বাড়ি আছে। তা' বেহারটেহারের কথা ছেড়ে চট্টগ্রাম থেকে মেদিনীপুর—ওদিকে তোমার পূর্ণিয়া মানভুম থেকে ময়মনসিং গোহাটী-টোহাটি পর্যন্ত লোকেরা ভাগের বাসা, মেস বোর্ডিং করে কলকাতার বুকে বসে আছে। এরাই হল কলকাতার আসল জান। এইগুলিই হল কেনারামদের আড্ডা।

মন্মথ সবিস্ময়ে দ্বিজু মুন্সীর দিকে তাকিয়ে ছিল।

দ্বিজু বলেছিল—এমন করে তাকাও কেন ?

মন্মথ বলেছিল—কেনারাম ? সে কে ?

—ওঃ ! জানো না বুঝি ? শোন ; মানুষদের চার থাক হিঁদুর ঠাকুর করেছে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র। মুসলমানের আল্লা করেছে সিয়া সুন্নী মোগল পাঠান, ক্রুশ্চানদের গড করেছে রোমান ক্যাথলিক আর যেন কি—তেমনি মালক্ষ্মী মানুষকে ভাগ করেছে তিন ভাগে। প্রথম হল কেনারাম। তারা পরিশ্রম করে বিদ্যে বুদ্ধি খাটিয়ে উপার্জন করে সম্পত্তি কেনে টাকা জমায়। তারপর হল রাজারাম—তারা সেই সম্পত্তিতে ভোগ করে, বাবুগিরি করে রাজাগিরি করে, বাঁদরের বিয়েতে লাখ টাকা খরচ করে। ঘোড়া কেনে গাড়ি কেনে, বাঈ রাখে। গান শোনে। ওদেরই এক ভাগ আবার দান করে। মুঠি ভরে দান করে, শেষে দেনা করে দান করে। আর এক ভাগ হল বেচারাম। বুঝেচ এরা বেচে বিক্রি করে। এরা দেনার ওপর দেনা করে। হীরে বিক্রি করে জিরের দরে। সোনা বিক্রি করে পিতলের মতো। বিলিতী মদ কিনবে টাকা নেই—হীরের আংটিটা খুলে দিয়ে বললে, এইটে রেখে দাও। বাস সেই যে দিলে আর ফিরে নিলে না। এরাই হল বেচারাম। রাজারাম বেচারাম যারা তারা নিজের বাড়িতে থাকে ; ফটকে দারোয়ান বাড়িতে ঝি চাকর বিলিতী কুকুর থাকে ঘোড়া থাকে গাড়ি থাকে। ওদের তো দেখলে। ওই বিভূতিকে দেখেছ—তোমার সঙ্গে পড়ত গো। তারপর তোমার কাকাবাবুও এখন রাজারামের খাতায় নাম তুলেছে। হরচন্দ্রবাবুকেও দেখলে। ও-ও রাজারাম। ও না হোক ওর ছেলেরা। কিছুদিন পরই ওরা বেচারাম হবে। বাকী আছে কেনারামেরা। এরা বাইরে মানে মফস্বল জেলা থেকে এসে এক-একটা আধা মেস আধা বাসা করে থাকে। জানাশোনা গ্রামের পাড়ার অঞ্চলের লোকদের নিয়ে বাসা। কেউ চাকরি করে, কেউ দালালি করে, কেউ দোকানদারি করে, কেউ চা বেচে বেড়ায়, হাজারো রকমের কারবার তো ভাই সংসারে। আবার ছেলেরা কলেজে পড়ে। কেউ ল পড়ে কেউ এল-এ বি-এ এম-এ পড়ে কেউ ডাক্তারি পড়ে। কেউ মাস্টারিও করে। প্রাইভেট মাস্টারি করে। বাসাতে খাটো কাপড় পরে খালি গায়ে থাকে। বেরুবার সময় কোঁচানো কাপড় পরে বের হয়। এরা সবাই কেনারাম তবে মূল কেনারামই আসল। ওই কেনারাম হলেন কোনো বড় ব্যবসাদার। বুয়েচ ? বাড়িটার দোতলা তেতলা দুটো বা শুধু দোতলা হলে দোতলটা হল তাঁর। তিনি থাকেন আর তাঁর সঙ্গে ছেলে ভাইটাই থাকে জামাইটামাইও এরা থাকে। কখনও কখনও মেয়েরাও আসে। তবে নিচের তলাটা একেবারে মেস—সেখানে থাকে সব ছোট কেনারামের দল। এরা সব নিচের তলার এখানে ওখানে, এঘরে ওঘরে কেউ বা সিঁড়ির পাশে একটু-আধটু জায়গা করে নিয়ে থাকে। এঁদের বললে দু'একজন ভালো ছেলেকে গরীব জনকে জায়গা ওঁরা দেন। ওই বাজারটা দেখতে হয়—মানে হিসেব রাখা দু'চারটে ফাই-ফরমাশ শোনা, বাচ্চা ছেলে থাকলে 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' পড়ানো আর যতখানি পার ওদের নজরের বাইরে বাইরে থাকা ; বাস ! এই এদের কোনো মেসে যদি ঠাঁই পাও তাহলে তুমি নিশ্চিন্ত। মস্ত লাভ কি জান ? ছোট ছেলেপিলে থাকলে তাদের পড়িয়ে মাসে চারটে পাঁচটা টাকা রোজগারও হয়। তা' ছাড়া পাস করার পর এদের কারবারে চাকরিরও সুবিধে হয়। অবাক হয়ে কথাগুলি সে শুনে গিয়েছিল।

তামাক ছিলমটা শেষ করে একটা পাথরবাটিতে তেল নিয়ে মাটিতে তেল ছিটিয়ে, নাকে নাইয়ে তেল নিয়ে তেল মাখতে মাখতে মুন্সী আবার শুরু করেছিল—হবে। হয়ে যাবে। খেয়েদেয়ে দু'চার টাকা যাতে হাতে পাও তাও করে দিতে পারি। বুয়েচ ? তুমি যে হুগলীর লোক—রেঢ়ো বামুন—নইলে—। একটু নীরব থেকে মুন্সী হঠাৎ তাকে প্রশ্ন করেছিল—তুমি ঝাল কেমন খেতে পার মন্মথ ?

—ঝাল ? তা' খাই তো ঝাল। মুড়ির সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা খাই। তারপর—বাধা দিয়ে মুন্সী বলেছিল—ও দুটো একটা লঙ্কার কাজ নয় হে। গণ্ডা দরুনে লঙ্কার কারবার। দেখ আমার বাবুর মক্কেল বেশীর ভাগ হল চাটগাঁ কুমিল্লা ঢাকা বরিশালের। ময়মনসিংয়ের মক্কেলও আছে। ওদের ওখানে বললেই হবে। কিন্তু ওই। লঙ্কা। শুধু লঙ্কা না। মধ্যে মধ্যে শুটকী মাছও কোথাও কোথাও খায়। গণ্ডা গণ্ডা লঙ্কা খেয়ে তোমার হয়তো ব্যাধি ধরে যাবে। উঁহু। ও হবে না। জেনে শুনে লঙ্কার ঝালের জ্বালাপোড়ার মধ্যে ফেলে দেব না তোমাকে। তুমি আমার জেলার লোক !

অতঃপর খানিকটা তেল পেটে মর্দন করতে করতে বললে—দাঁড়াও দাঁড়াও হয়েছে। কাঁচা কলাইয়ের ডাল আর কি বলে পোস্তবড়িতে তরকারি আর কাঁচা মাছের অম্বল পুঁটি মাছের চটচটি এই খেয়ে থাকতে হবে—বুয়েচ ! তবে লোক ভালো—মহাশয় লোক হে ! বীরভূমের বাঁড়ুজ্জেরা ! কয়লার ব্যবসা, বেশ বাড়বাড়ন্ত ব্যাপার ! ওখানে তোমার থাকতে খেতে খুব অসুবিধে হবে না। কিন্তু খবরদার—! 'ক্যানে' 'কি হঁয়েছে' 'ইসব' এসব শুনে যেন হেসো না বাপু !

কথা শেষ করে একটা দম নিয়ে গামছা টেনে নিয়ে দ্বিজু মুন্সী কুয়োতলার ধারে স্নানের চৌকির উপর বসে গেল।

সেই দিনই সন্ধ্যেবেলাতেই মন্মথ নতুন আশ্রয় পেয়ে গেল। দ্বিজু মুন্সী স্নানটান সেরে আটটা না বাজতেই তার সায়েবের সেরেস্তায় চলে গেল। বলে গেল—দেখ তুমি আজ বেরিয়ো না। আজ ছুটি আছে। সায়েবের ওখান থেকেই আমি চলে যাব। তোমার একটা ব্যবস্থা করে তারপর ফিরব। তুমি খেয়েটেয়ে নিয়ো। স্কুলে হেডমাস্টার কি তোমাদের ওই রমেশ স্যারের ওদিকে কি অন্য কোনোখানে বেরিয়ো না। সেবার হর চাটুজ্জের জুড়ির সামনে পড়ে তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলে—এবার কোনোও জনের নজরে পড়ে তার বাড়ি গিয়ে উঠবে। বাড়িতে থেকো। সায়েবের চিঠি আমি নিয়ে আসব। হেডমাস্টারের চিঠি একটা তো আছে, সেখানাও দাও।

বলেই সে সায়েবের বাড়ি ছুটেছিল। সায়েব মানে জ্যোতিপ্রসাদবাবু। সে আমলটাই মোটামুটি সাহেব হবার আমল। বিশেষ করে শহরের এলাকায়। শহরগুলোর গড়ন হচ্ছে বিলিতী টাউনের মতন। নগর শহর নাম পালটে টাউন গড়া হচ্ছে। লণ্ডন প্যারিসের মতন রাস্তাঘাট গড়া হচ্ছে। গাড়ি ঘোড়ার হালচাল তাও তাই। দোকানে কায়দার হরফে লেখা সাইনবোর্ড ঝুলছে। বাজারে গদির বদলে চেয়ার টেবিল সাজানো অফিস হচ্ছে। বাজনাতে বাদ্যিতে ব্যাণ্ড বাজায় যারা তারাও ইংরিজী পোশাক পরছে। শহরের লোকেরা সবাই মোটামুটি সায়েব হতে চলেছে। ব্যারিস্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার যারা বিলেতফেরত নয় তারাও সায়েব নামটাই পছন্দ করে। মারচেণ্ট আপিসে যে সব সাদা চামড়ার সায়েব আছে তারা এবং তাদের সঙ্গে খিদিরপুর বউবাজারের আধাকালো ফিরিঙ্গীরাও সায়েব। এ সায়েব মুখলাই সায়েব বা সাব নয়। এ সাব ও সায়েবরা মিস্টার অর্থাৎ ইংরেজ লোক। জ্যোতিপ্রসাদবাবু সায়েব নাম পছন্দ করেন না—শুনলে অস্বচ্ছন্দ বোধ করেন কিন্তু মক্কেলরা এবং তাঁর কেরানীরা নায়েব বললে রাগ করেন না, নীরবে হজম করে যান।

যাকগে ও কথা। দ্বিজু মুন্সী সেদিন আটটায় বেরিয়ে ফিরল প্রায় দুটোর কাছাকাছি। ফিরেই বললে—মা কালী আমার মুখ রক্ষে করেছেন মন্মথ। তোমার হিল্লে একটা হয়ে গেছে। তোমার ভাগ্য আর আমার হাতযশ তার সঙ্গে আমার সায়েবের বুদ্ধি বিচার। হাজার হলেও হাইকোর্টের একজন মস্তবড় উকিল তো ! তবে কপালের জোরটাই বড় তোমার। তা' মানতেই হবে।

ঘটনাটা ঘটেছে এই।—

সকালে জ্যোতিপ্রসাদবাবুর কাছে কয়লাখনির একটা মামলা এসেছিল। এক পক্ষে খাস বিলিতী এক মস্তবড় লিমিটেড কোম্পানি একদিকে অন্যদিকে দুজন বাঙালী ভদ্রলোক—তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি দেশী প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। বাঙালী ভদ্রলোক দু'জন ভাগ্যবান পুরুষ, সামান্য অবস্থা থেকে আজ লক্ষপতি ধনীতে পরিণত হয়েছেন। লক্ষপতি হয়তো ছোট বলা হল বা কম করে বলা হল ; ও'দের আয় কষলে বোধহয় নিয়মিত দু'চার লক্ষ টাকায় পৌঁছুবে। বীরভুমের মাধববাবু এবং মানভুমের মনোহর ঘটক দুই বেয়াই। মাধববাবু দুর্লভ রূপের অধিকারী অসামান্য ব্যক্তি। সোনার মতো সুগৌর দেহবর্ণ ; ছ' ফুটের উপর মাথায় উঁচু, মেদহীন দেহ, তবুও এতটুকু সামনে ঝুঁকে বা বেঁকে পড়েন নি। বয়স পঞ্চাশ বছরের এপারেই এবং সর্বাঙ্গের মসৃণতা আশ্চর্য রকমের নবীন ও উজ্জ্বল। কিন্তু মাথার চুলে এরই মধ্যে বেশ সাদা ছাপ ধরেছে। মাথার চুল প্রায় দু' আনার উপর পেকে গেছে। তবে চুলে পাক ধরলেও মাথায় টাক ধরে নি। চোখ দুটি পিঙ্গল। সমস্ত মিলিয়ে আশ্চর্য একটি শ্রদ্ধা করার মতো ব্যক্তিত্ব মাধববাবুর। মাধববাবুরা জ্যোতিপ্রসাদবাবুর নতুন মক্কেল। মাস কয়েক আগে হাইকোর্টের বড় উকিল মহেশ চৌধুরী মারা যাওয়ার পর একঝাঁক মক্কেল জ্যোতিপ্রসাদবাবুর কাছে এসেছিল—মাধববাবুরা তাদেরই মধ্যের একজন। এবং এই প্রথমবার তিনি এবং বেয়াই মনোহর ঘটক প্রথম এসেছিলেন জ্যোতিপ্রসাদবাবুর সেরেস্তায়।

তাঁকে দেখেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল দ্বিজু মুন্সী ; এমন রূপ—দেবদুর্লভ শান্ত সুন্দর রূপ মানুষের হয়! এ এক আছে জোড়াসাঁকো পাথুরেঘাটার ঠাকুরবাবুদের বাড়িতে, বড়বাজারের গাঙুলী বাড়িতেও রূপবান মানুষ আছেন। মাধববাবু রূপে এঁদের কদরের মানুষ।

শুধু রূপই নয়, এর সঙ্গে আর একটা পরিচয়ও পেয়েছিল সে। সেটা মাধববাবুর গুণের পরিচয়। মাধববাবু লিমিটেড কোম্পানির ডিরেক্টার হিসেবে মামলাটা যখন জ্যোতিবাবুকে বুঝিয়ে বলছিলেন তখন দ্বিজু মুন্সী ও'দের দেওয়া দলিলের এবং অন্যান্য কাগজের বাণ্ডিলের কাগজগুলির একটা লিস্ট তৈরি করছিল। হঠাৎ বাণ্ডিলটার মধ্যে থেকে একখানা কাঁচা দলিল অর্থাৎ খসড়া পেয়ে যত বিব্রত হয়েছিল তত আশ্চর্য হয়েছিল। দলিলখানার সঙ্গে এই মামলাটির কিছু নাই। এখানা একখানা দেবত্র এস্টেটের অনুকূলে তৈরি দানপত্র ; মাধববাবু বাড়িতে রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছেন—অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী প্রতিষ্ঠা করেছেন ; লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম শিলারও সেবা আছে ; এই দেবতাদের পুজার অঙ্গ হিসাবে লোকহিতকর সেবাকর্মের ব্যবস্থা আছে। গ্রামে ইস্কুল স্থাপন করেছেন, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন, টোল প্রতিষ্ঠা করেছেন ; অতিথিসেবা আছে। এই সবের ব্যয় নির্বাহার্থ বার্ষিক প্রায় দশ হাজার-টাকা-আয়ের-সম্পত্তি দানপত্রের খসড়া একখানি দলিল।

দ্বিজু মুন্সী শুধু জ্যোতিপ্রসাদবাবুরই কেরানীগিরি করছে না, জ্যোতিবাবু ল' পাস করার আট বৎসর আগে থেকে মুন্সী উকিল অ্যাডভোকেটদের দপ্তরে এবং আদালতের এলাকায় ঘোরাফেরা করছে। আইন আদালত মুসাবিদা এ সব সে ভালোই বোঝে। দলিলখানা সে আগাগোড়া পড়ে নিয়েছিল, হাতের লেখাটা তার চেনা। তার গুরুস্থানীয় হাইকোর্টের ঝানু বাবুদের একজনের হাতের লেখা। ইসাদী লেখক হিসেবে কালীচরণ ঘোষের নামও লেখা রয়েছে। এমন হাতের লেখা দলিলখানার মধ্যে দু'চারটে তারিফ করার মতো ছত্র থাকবেই। সেই আকর্ষণে পড়তে বসে আগাগোড়া দলিলখানা পড়ে রেখেছিল। সেদিন

সকালবেলা তার কর্তার সেরেস্তায় গিয়ে রবিবারের ছুটির বাজারের মতো আয়েসী চালে ধীরেসুস্থে বকেয়া কাজকর্মের ব্যবস্থা করছিল। মুন্সীর নিচে আরও তিন তিন জন কেরানী আছে সেরেস্তায়—নাম মুহুরীবাবু—তাছাড়া সরকার আছে। এদের উপরের মানুষ দ্বিজু মুন্সী। বেশ সুন্দর কলিগড়নের একটি মাঝারি আকারের হুঁকোয় ফৌজদারি বালাখানার তামাক খেতে খেতে কাজ করছিল অভ্যাসমতো। এমন সময় এসে দাঁড়িয়েছিল মাধব বাঁড়ুজ্জের আপিস যাবার গাড়িখানা। এক ঘোড়ায় টানা চারচাকার পালকিগাড়ি। গাড়ি থেকে নামলেন মাধববাবু, বড়জামাই, বড়ছেলে এবং ক্যাশিয়ারকে নিয়ে। দ্বিজু মুন্সী সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলে। হ্যাঁ, একজন ভাগ্যবান পুণ্যবান তা' দেখবা-মাত্রই মনে হয়।

মাধববাবুর ক্যাশিয়ারটির বয়স খুব অল্প—হয়তো বা কুড়ি কি একুশ, এগিয়ে এসে দ্বিজু মুন্সীকেই বলেছিল—আমরা উকিলবাবুর নতুন মক্কেল।

চশমা আর ভুরুর ফাঁক দিয়ে দ্বিজু মুন্সী তাকিয়ে দেখতো মানুষের মুখের দিকে। সেইভাবে তাকিয়ে মুন্সী বলেছিল—নতুন মক্কেল? তা' নতুন মক্কেলের তো নাম একটা আছে? কে? কোথাকার লোক?

—উনি মাধবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—

চমকে উঠেছিল দ্বিজু মুন্সী, মুহূর্তে মনে পড়ে গিছল তাঁর দেবোত্তরে দানপত্র দলিল-খানার কথা! প্রশ্ন করেছিল—বীরভূমের মাধববাবু?

—হ্যাঁ। কলিয়ারী প্রপাইটারস—কোল মারচেন্টস—

দ্বিজু মুন্সী ক্যাশিয়ার ছেলেটির কথা আর শোনে নাই, সে এগিয়ে গিয়েছিল ফটকের দিকে। মাধববাবু বড়জামাই এবং বড়ছেলেকে নিয়ে গেটের মুখে সবে ঢুকছেন দ্বিজু মুন্সী আহবান জানিয়ে বলেছিল—আসুন আসুন আসুন।

মাধববাবু প্রসন্ন হেসে কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে বলেছিলেন—ব্যানার্জী সায়েব কি খুব ব্যস্ত আছেন? আমি তো খবর দিয়ে আসি নি! আজ কি ও'র সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হবে? আমি আবার কাল দেশে চলে যাব।

দ্বিজু মুন্সী বলেছিল—লোক আছে দু'জন। তা' হোক, আপনার জন্য সময় হবে বই কি! আসুন।

সোনার মানুষ হয় না কিন্তু সোনার মানুষ বলে একটা কথা আছে। দ্বিজু মুন্সীর মনে হল এই মানুষটি সত্যিই সোনার মানুষ।

এই মাধববাবুদের বাসাতেই মন্মথর আশ্রয় এবং অন্নের ব্যবস্থা করলে দ্বিজু মুন্সী। ও'দের একটা জটিল মামলা ছিল একটা জায়গার আণ্ডারগ্রাউণ্ড রাইট নিয়ে, সেই সব কথা আলোচনার সময় ওই দেবোত্তরের দলিলখানার খসড়াখানা বের করে দিয়েছিল দ্বিজু মুন্সী। তারপর আলোচনার শেষে ও'রা জ্যোতিপ্রসাদবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠতে যাবেন ঠিক সেই সময়ে হাত জোড় করে সামনে দাঁড়িয়েছিল দ্বিজু মুন্সী। বলেছিল—কর্তাবাবুর কাছে অধীনের একটি প্রার্থনা আছে।

—প্রার্থনা? বলুন কি প্রার্থনা? আমি সামান্য লোক—আমার কাছে কি প্রার্থনা আপনার থাকতে পারে? আমার কি সাধ্য?

দ্বিজু মুন্সী হাইকোর্টের বড় উকিলের প্রধান কেরানী। সে বলেছিল—আপনার সাধ্য অসামান্য। আপনি অসামান্য ব্যক্তি। অসাধারণ পুরুষ। আপনার দেবোত্তরের দানপত্রের খসড়াখানা কলিয়ারীর কাগজপত্রের সঙ্গে ছিল—ওটা পড়েছি আমি। বাধ্য হয়েই পড়েছি। প্রথম তো ধরতেই পারি না—এটা কেন? পরে বুঝলাম কলিয়ারীর রয়ালটীর উপর টাকায়

এক পয়সা হিসেবে যে দেবোত্তরের প্রাপ্য তারই কোনো হিসেবটিসেব করতে ওখানা এর সঙ্গে এসে পড়েছে।

মাধববাবুর বড়জামাই বলেছিল—হ্যাঁ তাই বটে। তা' আপনি কি চান সংক্ষেপে বলুন। বেলা বাড়ছে। রোদ্দুর চড়ছে। বলুন আপনার কি করতে হবে।

দ্বিজু মুন্সী বলেছিল—একটি ছেলে, ভালো ছেলে, কলকাতায় পড়ছে, হিন্দু স্কুলে পড়ে—তার থাকবার আশ্রয় নেই খাবারও সংস্থান নেই। সেই ছেলেটিকে যদি আপনাদের বাসায় একটু আশ্রয় দেন আর দু' মুঠো করে খেতে দেন—

মাধববাবু বলেছিলেন—আপনার কে হয়? মানে অজ্ঞাতকুলশীল হলে তো বিপদ আছে।

দ্বিজু মুন্সী বলেছিল—আজ্ঞে হ্যাঁ নিশ্চয় কথা। বিপদ নিশ্চয় আছে তাতে। শাস্ত্রের কথা। তা ছেলেটি আমার আপন জন না-হলেও আমি তাকে ভালো করে চিনি। আমি কায়স্থ, ছেলেটি ব্রাহ্মণ। খাঁটি ব্রাহ্মণপণ্ডিত বংশের ছেলে। হুগলী জেলার গোবিন্দপুরের ভটচাজ বাড়ির ছেলে। বাপ নিষ্ঠাবান পণ্ডিত; মহাশয় ব্যক্তি। ছেলে এসেছে ইংরিজী পড়তে।

মাধববাবু হেসে বলেছিলেন—ছেলের ইংরিজী পড়াতে বুঝি বাপের মত নেই? বাবা রেগে গিয়েছেন?

দ্বিজু মুন্সী বলেছিল—আজ্ঞে না। ব্রাহ্মণ দেবতুল্য মানুষ। তিনি অনুমতি দিয়েছেন বেশ আনন্দের সঙ্গে। ছেলে খুব মেধাবী। চারিদিকে ইংরিজীপড়া লোকেদের খাতির দেখে ইংরিজী শিখবার বাসনা হয়। মাইনরে বৃত্তি পেয়েছিল। তার উপর তার কাকা কলকাতায় ব্যবসা করে অবস্থার উন্নতি করে। কাকার বাসাতেই এসে পড়তে শুরু করে। তারপর হঠাৎ খুড়ী চটে যান। খুড়ী চটতেই খুড়ো চটে। এই আর কি—!

মাথার উপর বেলা বাড়ছিল। মাধববাবু ছাতা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন কিন্তু সূর্যের তাপ ওতে ঠিক আটকাচ্ছিল না। মাধববাবু হেসে বলেছিলেন—হ্যাঁ। এ তো আজকালকার দিনে ঘরে ঘরে ঘটছে। আগের দিনে নিজের পাতে ভাতে হাত দেবার আগে জিজ্ঞাসার নিয়ম ছিল—বাড়ির সকল জনের অন্ন হবে তো? অন্তত কর্তারা জিজ্ঞাসা করতেন—ছেলে মেয়েরা খেয়েছে? অন্য সকলে? আজকাল সে মনই হারিয়ে গেল। এক ভাই ভালো রোজগার করলে ছুতো খোঁজে কতক্ষণে পৃথগান্ন হবে। তা' বেশ—আপনি ছেলেটিকে নিয়ে আমার ওখানে আসবেন আজ বিকেলে। আমাদের তো ঠিক বাসাও নয় মেসও নয়। আমরা সব গুষ্ঠিসুদ্ধ মিলে থাকি। সকলকে বলে মত করিয়ে রাখব আমি। তবে মত হবে, এইটেই ধরে রাখুন। ওর জন্যে আটকাবে না।

মুন্সীর পত্র নিয়ে একলাই গিয়েছিল মন্মথ। মুন্সী আসতে পারে নি। দুপুরে আবার জরুরী ডাক এসেছিল জ্যোতিপ্রসাদবাবুর দপ্তর থেকে; বড় মক্কেল এসেছে মফস্বল থেকে। তাতে অসুবিধা কিছু হয় নি; হয়তো বা ভালোই হয়েছে। খোদ মাধববাবুর সঙ্গে তার দেখাশোনা যা হয়েছে তা' তার নিজের ভারী ভালো লেগেছে। নিজের মনের কথা সে সহজ ভাবে বলতে পেরেছে। দ্বিজু মুন্সী সঙ্গে থাকলে সে পাশে বসে একখানা হাতের কয়েকটা আঙুল দিয়ে তার হাতে বা পায়ের কোনোখানে স্পর্শের ইশারায় তাকে কখনও উৎসাহিত করত কখনও বা চিমটি কেটে বলতে চেষ্টা করত—উঁহু উঁহু—না-না!

তবে ভাগ্য তার প্রসন্ন ছিল এটা বলতেই হবে। নাহলে প্রথমেই যা ঘটল তা ঘটত না। ভাদ্র মাসের রবিবারের অপরাহ্ণবেলা; ঠাকুরেরা চাকরেরা কাজকর্ম মিটিয়ে বেশ করে চৌর

কেটে জুতো জোড়াটা ঝেড়ে মুছে পায়ে দিয়ে বেড়াতে গিয়েছে। দু'একজন বাড়ি আছে—তারা বারান্দায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে। দোতলার কার্নিসে কার্নিসে কয়েকটা পায়রা কোঁ কোঁ কোঁ ধরনের শব্দ করছে। অজস্র চড়ুই পাখীর কিচিরমিচির কলকলরবের আর শেষ নেই। মন্মথ এসে দাঁড়িয়ে বিব্রত হল। একটা চাকর একসময় চোখ মেলে তাকে দেখে একবার উঠে বসল, তারপর বললে—কর্তাবাবুর পাস আসিয়েসেন তো? এবং উত্তরের অপেক্ষা না-করেই বললে—বইঠেন ঘরকে ভিতর। আভি আসবেন নিচে।—একটা ঘরের খোলা দরজা দেখিয়ে দিলে।

উপরে কোথাও বোধহয় তাস খেলা হচ্ছে।

হঠাৎ একটা চাপড়ের শব্দের সঙ্গে একটা 'ছক্কা' শব্দ বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়েছিল।

উঠানকে কোলে নিয়ে চকমিলানো বাড়ি। সব ঘরেরই দরজা বন্ধ, রবিবারের দিন ভাদ্র মাসের শেষ দুপুর—ঘরের মধ্যে সকলে বেশ মজিয়ে ঘুম দিয়ে নাক ডাকাচ্ছেন। দুটো কি তিনটে নাকডাকা এমন স্বতন্ত্র রকমের চড়া যে বর্ষারাতের হাঁড়ি ব্যাঙের ডাকের মতো ডাক ছাড়ছে। মন্মথ চাকরটার দেখিয়ে দেওয়া অল্পখোলা দরজা দু' পাটি খুলে ঘরে ঢুকেছিল।

ঘরখানা বেশ বড়সড় ঘর। ঘরজোড়া তক্তাপোশ পেতে বাইরের ঘর বৈঠকখানা সাজানো হয়েছে। পূব দিক আর দক্ষিণ দিকের দেওয়াল ঘেঁষে তক্তাপোশ পাতা। পশ্চিম ও উত্তর দিকে হাত তিনেক চওড়া একটা ফাঁকা ফালি পড়েছে দেওয়াল এবং তক্তার মধ্যে। তক্তাপোশের উপর মোটা শতরঞ্জ পাতা—তার উপর ধবধবে সাদা ধোওয়া সুতোর চাদর বিছানো। গোটাচারেক তাকিয়া পড়ে রয়েছে। একপাশে একখানা পার্টিবিছানো জায়গার উপর একটা ক্যাশবাক্স, কয়েকখানা খাতা, একটা ট্রের উপর দোয়াতদানে দু'পাশে দু'রকম কালি—কালো এবং লাল। ব্লটিং প্যাড। সেকালের নতুনওঠা নিবলাগানো কলম। আর ওই ফালি জায়গায় খানকতক সুন্দর বার্নিশকরা দামী চেয়ার। তক্তাপোশের গা ঘেঁষে একটা তেপায়ার উপর একটা বেশ দামী গড়গড়া। নলটি ঝকঝকে রুপোলী তার বাঁধা নল, পাকিয়ে গুড়িয়ে গড়গড়ার নলচের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে। গড়গড়ার মাথায় ধুনুচির গড়নের কলকে।

ঘরে ওই মাদুরবিছানো দপ্তরের দিকটিতে মাধববাবুর অল্পবয়সী ক্যাশিয়ারটি শুয়ে আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিল। মন্মথ তক্তাপোশের ধারের দিকে বসে আধো-ছায়াচ্ছন্নতার মধ্যে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। দেওয়ালের গায়ে ছবি টাঙানো রয়েছে দেবদেবীর ছবি। রাধাকৃষ্ণ, দশভুজা, কালী, জগদ্ধাত্রী, একদিকের দেওয়ালের মাঝখানে ঝুলছে মহারানী ভিক্টোরিয়ার ছবি, দু'দিকে ঝুলছে মহারানীর স্বামী এবং পুত্রের ছবি। এই দেখেই বা কতক্ষণ কাটে! চোখ মন ক্লান্ত হয়ে এলো। এই সময়ে চোখে পড়ল ফরাশের মাঝখানে বেশ চকচকে বাঁধাই করা সোনার জলে নাম লেখা দু'খানা বেশ মোটা আকারের বই। বই দু'খানার একখানা সে টেনে নিল। দেবনাগরী হরফে সোনালী কালিতে চামড়ায় বাঁধাই পুটের উপর লেখা—শ্রীমদ্ভাগবতম্। তার খানিকটা নিচে লেখা ১ম-৫ম স্কন্দ, নিচে লেখা শ্রীমাধবলাল দেবশর্মা।

শ্রীমদ্ভাগবত সে পড়েছে। রাধাশ্যামের বাবার কাছে ব্যাকরণ পড়তে পড়তেই সে শ্রীমদ্ভাগবত রামায়ণ এবং মহাভারত পড়ে ফেলেছে। সে পড়ে ফেলা অবশ্য সাধারণ পড়ার পড়ে ফেলা।

সে মলাট উলটে পাতা উলটে গেল—সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে থেকে শ্রীমদ্‌ভাগবতমাহাত্ম্য জিবের ডগায় এসে গেল। মুখস্থ ছিল তার ভাগবদমাহাত্ম্য—

শ্রীমদ্‌ভাগবতং নাম পুরাণম্ লোকবিশ্রুতম্—
শৃণুয়াচ্ছ্রদ্দয়াযুক্তো মম সন্তোষকারণম্—

পাতার পর পাতা ওলটাচ্ছিল। মুখে মুখস্থ শ্লোক বলছিল—

নিত্যং ভাগবতং যস্তু পুরাণং পঠতে নরঃ।
প্রত্যক্ষরং ভবেত্তস্য কপিলাদানজং ফলম্‌ ॥

হঠাৎ মনে হল—না, ভাতখাওয়া কাপড় পরে ভাগবতের শ্লোক আবৃত্তি ঠিক হচ্ছে না। "স্নাতঃ শুচিভূত্বা প্রাণাণায়ম্য স্থিরাচস্য চ মঙ্গলপাঠপূর্বক ভগবন্তং প্রণমেৎ।"

বইখানা বন্ধ করে সশব্দে বইখানাকে সে ফরাশের উপর নামিয়ে দিলে।

—বইখানি পড়ছিলে—দেবনাগরী অক্ষরে লেখা পড়তে পার?

ভারী প্রসন্ন কোমল এবং মৃদু কণ্ঠস্বর। মন্মথ মুখ তুলে তাকালে; ওদিকের দেওয়ালের গায়ের দরজার পাল্লা দুটি নিঃশব্দে খুলে একজন অসামান্য পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। দেখেই মনে হল—সোনার মানুষ। ছ' ফুটের উপর দীর্ঘাকৃতি পুরুষ—কাঁচা সোনার মতো গায়ের রঙ, ধবধবে সাদা চুল গোঁফ, চোখ দুটি পিঙ্গলবর্ণ—পরনে ধবধবে ধোয়া থান ধুতি, গায়ে হাফ হাতা কোমর পর্যন্ত খাটো ফতুয়া, ডান হাতে কনুয়ের উপর সোনার তারের তাগা, দু'হাতের আঙুলে আংটি—পাঁচটা আংটি। তার মধ্যে প্রবাল গোমেদ সে চেনে।

—কতক্ষণ এসেছ তুমি?

এতক্ষণে তার খেয়াল হল—যিনি সামনে তিনিই তার আশ্রয়দাতা হবেন—তিনিই দ্বিজু মুন্সীর সোনার মানুষ! সে সসম্ভ্রমে তক্তাপোশ থেকে নেমে দাঁড়াল। এবং তাঁকে প্রণাম করবার জন্য এগিয়ে আসতে গিয়ে একখানা চেয়ারে ধাক্কা দিলে। চেয়ারখানা পড়ে যেত কিন্তু পড়াটা সে-ই কোনোরকমে আটকালে, ধরে ফেললে হাত বাড়িয়ে।

—বাঃ। শব্দ হলে কালীর ঘুম ভেঙে যেত। বেচারা রবিবারের দুপুরে আরাম করে ঘুমুচ্ছে। এবার তিনি সন্তর্পিত পদক্ষেপে ঘরে ঢুকলেন।

মন্মথ এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলে।

তিনি বললেন—মঙ্গল হোক তোমার। অনেক লেখাপড়া হোক। বস।

তিনি সন্তর্পণেই তক্তাপোশের উপর উঠে বসে মৃদুস্বরে ডাকলেন—কালী! কালী রে! শুনছিস—কা—লী!

মাদুরে শোওয়া লোকটি ধড়মড় করে উঠে বসল। এবং মাধববাবুকে দেখে চমকে উঠে তক্তাপোশ থেকে নেমে দাঁড়াল। মাধববাবু বললেন—এই দ্যাখ্—কি যে তোরা সব হুড়মুড় করে ব্যস্তবাগীশের মতো করিস!

কালী অপ্রতিভের মতো বললে—ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম।

—তা' বেশ করেছিলি! কি হয়েছে তা। যা এখন মুখ ধুয়ে আয় আর রামধনিকে ডাক। তামাক দিতে বল। আর চা চাপাতে বলে আয় উপরে।

কালী চলে গেল।

মাধববাবু মন্মথকে নিয়ে বসলেন—তোমাকে ক'টা কথা জিজ্ঞাসা করেছি হে তার কোনো জবাব পাই নি।

—আজ্ঞে?

—তুমি বইখানা ওলটাচ্ছিলে, ওখানি তো 'শ্রীমদ্‌ভাগবত', আজই দপ্তরী বাঁধিয়ে দিয়ে গিয়েছে। তা' বইখানা কি পড়ছিলে? সংস্কৃত মানে দেবনাগরী লেখা তুমি পড়তে পার?

—আজ্ঞে পারি। আমাদের তো ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘর।

মাধববাবু হেসে বললেন—ব্রাহ্মণবংশের সন্তান তো আমিও হে। আমিও তো পারি কিছু পড়তে। কিন্তু তোমার মতো ভালো তো পারি না। আর সংস্কৃত ঠিক বুঝিও না। আমি কেন? এই দেখ আমাদের এই বাসাটিতে আমরা পঁচিশজন ব্রাহ্মণসন্তান থাকি—তাও তোমার পাচক ব্রাহ্মণ ছাড়া, পঁচিশ জনের কেউ জানে না হে সংস্কৃত। তুমি তো দিব্যি

শ্লোকগুলি পড়ে যাচ্ছিলে।

সবিনয়ে মন্মথ বললে—রামায়ণ মহাভারত শ্রীমদ্‌ভাগবত আমি পড়েছি। আমার বাবা শুধু ব্রাহ্মণ নন তিনি গুরুগিরি করেন দশকর্ম করান শাস্ত্র পড়েছেন—আমি ছেলেবেলা থেকে শুনে শুনে শিখেছিলাম। তারপর মাইনর পাস করে ইস্কুলে পড়বার সময় ব্যাকরণও পড়েছি আমি। আদ্য মধ্য পরীক্ষা দেওয়া হয়ে গেছে, এবারই উপাধি পরীক্ষা দেবার কথা। কিন্তু তা হল না।

—কেন হবে না। দিয়ে ফেল। সংকল্প করে পিছিয়ে এলে তো হার হল।

—হেডমাস্টার মশায় বারণ করেছেন। এবার আমার এণ্ট্রান্স পরীক্ষারও বছর তো। বলেছেন—সব কিছু এখন রেখে দাও। এখন শুধু পড়া এবং পড়ার বই পড়া। ইংরেজীতে আমি একটু কাঁচা—মাস্টারমশায় বলেছেন ইংরেজীর উপর খুব বেশী জোর দিতে।

ভাগবতের পাতার উপর দৃষ্টি রেখে মন্মথ কথা বলছিল, আশ্চর্য সুন্দর প্রসন্ন এবং মহীয়ান চেহারার এই বৃহৎ মানুষটির পিঙ্গল চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে সে যেন কেমন সংকোচ অনুভব করছিল। চোখ দুটি কোনো কিছুর উপর রাখবার জন্যই ভাগবতখানিকে খুলে রেখেছিল।

ছেলেটিকে ভারী ভালো লাগছিল মাধববাবুর। কমনীয়কান্তি লম্বাটে গড়ন ছেলেটির মধ্যে প্রসন্ন এবং প্রদীপ্ত কিছু আছে। তার দিকে তিনি তাকিয়েই ছিলেন। হঠাৎ বললেন—তোমার বাবা তো গুরুগিরি করেন—তোমাদের বাড়ির গুরুপাটের খুব নাম। অনেক শিষ্যসেবক। তা ইংরিজী শিখছ—শিখে কি করবে? গুরুগিরি কি ভালো লাগবে?

মন্মথ এবার চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকালে।

রামধনি চাকর কলকেতে ফুঁ দিতে দিতে এসে দাঁড়াল। গড়গড়ায় কলকে পরিয়ে দিয়ে, গোল করে গোড়ানো নলটির পাক খুলে তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল।

মন্মথ তাকিয়েই থাকল তাঁর মুখের দিকে। এতক্ষণে ওই চোখের দিকে তাকাতে যে সংকোচ অনুভব করছিল সেটা তার যেন চলে গেল। মধ্যে মধ্যে এই প্রশ্নটা তার মনের মধ্যে এসে দাঁড়ায়।

মধ্যে মধ্যে অনুভব করে যে তার বাবা সেই অতিপ্রসন্ন সৌম্যদর্শন মানুষটি অনেক দূরে থেকে আরও অনেক দূরে চলে যাচ্ছেন। তাদের গোবিন্দপুর গ্রাম, তাদের ঠাকুর গোবিন্দ, তাদের বাড়ির সংলগ্ন-বাগান ফল ফুলের গাছ, হাঁসচরা খিড়কি ডোবা, ডোবার জলের উপর ঝুঁকে পড়া শজনেফুলের শোভা, বাঁদরলাঠির ফুলঝুরি, বিস্তীর্ণ মাঠ, ইসলামপুরের মসজেদ মক্তব, মিয়াদের দলিজা—এসব অনেক দূর হয়ে যাচ্ছে। দিনের দিন দূরে চলে যাচ্ছে; হয়তো বা একেবারে মনের বাইরে চোখের বাইরেই চলে গেছে, কেবলমাত্র মনে পড়িয়ে দিলে তারা যেতে যেতে ফিরে এসে দৃষ্টির সীমানার সীমান্তরেখায় দাঁড়ায়। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভুলে যায়। তখন সামনে থাকে কলকাতা, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, হাওড়া স্টেশন, গঙ্গার ধারের জেটিগুলো। খিদিরপুরেও একদিন গিয়েছিল সে। ডক দেখে এসেছে। এসপ্ল্যানেড, চৌরিঙ্গী, ধর্মতলা, রাইটার্স বিল্ডিংস। তারপর হিন্দু ইস্কুল, রমেশ স্যার, হেড স্যার, সত্যপ্রসাদ; তার সঙ্গে মনে পড়ে জ্যোতিপ্রসাদবাবু, সঙ্গে সঙ্গে ওদের বাড়ির সভা মনে পড়ে; তারপর সব কিছুকে আড়াল করে দাঁড়ায় মিনু—মানে মালতী। সারা দেহ মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। বিভূতিকে মনে পড়ে। তার সেই দেখানো ছবিগুলোকে মনে পড়ে। তার কাকার বাড়ির ছাদে উঠে দেখতে পাওয়া সেই বিচিত্র দুটি মেয়েকে। যারা তাকে হাত-ইশারায় ডেকে হেসে ভেঙে পড়েছিল।

প্রাণ তার যেন জলমগ্ন মানুষের মতো রুদ্ধশ্বাস হয়ে ওঠে। বুকের ভিতর হাতুড়ি

পেটে, বড় বড় হামারের ঘায়ে যেন তার বুকের পাঁজরাগুলোকে ভাঙতে চায়।

সে মনে করতে চায় কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, শিবনাথ শাস্ত্রী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাবার কথা মনে পড়ে। বাবা তাকে উপনিষদের কথা বলেছিলেন কলকাতা আসবার আগের রাত্রে। সেও স্কুলে ভরতি হবার সময় বলেছিল—আমি লেখাপড়া শিখে এম. এ. পাস করে গ্রামে ফিরে যাব, বাবার মতোই শাস্ত্রচর্চা করব রাধাগোবিন্দের পূজা সেবা করব; আর যারা দীক্ষার প্রার্থনা নিয়ে আসবে—সংসারের বস্তুপুঞ্জের অভাব থেকে তাদের পীড়ন থেকে অব্যাহতি চাইবে তাদের দীক্ষা দেব।

সে সব মিথ্যে হয়ে গেছে।

শুধু সংস্কৃত ভাষা এবং হিন্দু সংস্কার আর এদেশের আচার আচরণের মধ্যে থাকলে কি হত তা ঠিক বলতে পারে না—তবে ইংরিজী যা শিখেছে তাতেই তার মনে হয়েছে সংস্কৃত ভাষায় সম্পদ যাই থাক তার শাস্ত্রার্থ এবং এদেশের আচার আচরণ হিন্দু সংস্কার এবং ভাব নিতান্ত অর্থহীন—রাশি রাশি মিথ্যাকে জড়ো করে বহুমূল্য সম্পদ ভেবে মাথায় করে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি।

কলকাতায় এসেছে সে চার বছর।

চার বছরের মধ্যে আশ্চর্যভাবে এমনই সে পালটে গেছে যে তার নিজেরই আশ্চর্য মনে হয়। কিন্তু আজকের এই মুহূর্তটি মাধববাবুর মতো এই দেবতার মতো মানুষটির সামনে বসে তাঁরই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যে বিস্ময় সে অনুভব করলে এত বিস্ময় সে কোনোদিন অনুভব করে নি।

এলোমেলোভাবে অনুভব করা এই কথাগুলি মনের মধ্যে ঘুরপাক খেয়েই গেল না তার মধ্য থেকে যেন প্রশ্ন এসে দাঁড়াল।

বাবাকে পেলে সে আজ প্রশ্ন করত—আপনি বলেন যা অমৃত নয় তা নিয়ে করব কি?

কিন্তু এই 'অমৃত'ই বা কি? এ কি সত্যি?

স্বর্গ? স্বর্গ আছে?

আশ্চর্য সুন্দর এবং বড়লোক এই মানুষটির মুখের দিকে নিস্পলক চোখে তাকিয়ে এই প্রশ্নগুলি যখন তার দৃষ্টির মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছিল তখন মাধবলালবাবু বললেন—বল? পারবে?

মন্মথ আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়লে এবং মৃদুস্বরে বললে—না।

মাধবলালবাবু একটু হাসলেন।

মন্মথ এবার বেশ স্ফুটকণ্ঠে বললে—নাঃ। ও আর পারব না আমি। আমি এম. এ. পর্যন্ত পড়ব তারপর আইন পাস করে হাইকোর্টের উকিল হব।

মাধববাবুর মুখের হাসি সপ্রশংস হাসি হয়ে উঠল। বললেন আমি আশীর্বাদ করছি তুমি সব থেকে বড় উকিল হও।

মন্মথ বললে—তবে সংস্কৃত আমি পড়ব। আমার খুব ভালো লাগে।

একজন পঞ্চান্ন বছরের অসাধারণ জীবনের অধিকারী বৃদ্ধ আর একটি সদ্য ষোল বছরে পা-দেওয়া কিশোর বিচিত্রভাবে একান্ত আপনজন হয়ে উঠেছিলেন। মুগ্ধদৃষ্টিতে ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে মাধবলাল বললেন—বড় উকিল হবে হাইকোর্টের—অনেক রোজগার করবে নিশ্চয়।

—তা তো করবই।

—তা সে টাকা দিয়ে কি করবে?

মন্মথ একটু থমকাল। প্রথমেই মনে হয়েছিল—অনেক টাকা হবে—তা দিয়ে খুব ভালো বাড়ি করব ; গ্রামে বাড়ি করব ; কাকার চেয়েও বড় বাড়ি হরচন্দ্রবাবুর বাড়ির চেয়েও বড় বাড়ি ; জ্যোতিপ্রসাদবাবুর বাড়ির মতো বাড়ি। ভালো ভালো চারটে ঘোড়া কিনব। তার সঙ্গে গাড়ি। জুড়ি গাড়ি, টমটম একখানা, একখানা ব্রুহাম। এসব প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে তার। কিন্তু বলতে গিয়েও কথাগুলো সে বলতে পারলে না। লজ্জাবোধ করলে। একটু ভেবে নিয়ে বললে—আমাদের গ্রামে একটি ইস্কুল করব—H. E. School, একটি চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি দেব গ্রামে—

—আর—

—আর গার্লস্ স্কুল একটি।

—টোল করবে না ?

—করব।

—একটি বড় দীঘি কাটিয়ো। বুঝলে ? গ্রামে বাড়ি করবে বড়—সেই বাড়ির সামনে মস্ত বড় দীঘি কাটিয়ো। ঘাট বাঁধিয়ে দিয়ো। মেয়েদের ঘাট আলাদা করে দিয়ো। গ্রামে কয়েকটা কুয়ো কাটিয়ে দিয়ো। বড় বড় আম কাঁঠালের বাগান করো। এ ছাড়া আর দুটি কাজ—প্রথম—ক্ষুধার্ত ভিক্ষুককে অন্ন দিয়ো। আমাদের দেশে খাদ্যের অভাব নাই—ধান চাল অঢেল। আমার বাড়ি বীরভুম—আমাদের দেশে বলে পৌষমাসে ইঁদুরেরা বিয়ে করে। এক একটা ধেড়ে ইঁদুরের সাত সাতটা বউ হয়। যাদের জমি আছে তাদের মধ্যে বড় যারা তাদের বাড়িতে পাঁচ সাত বছরের ধান বাঁধা থাকে। সাধারণ লোকের ঘরে তিন বছরের ধান বাঁধা থাকে। কিন্তু ভিখিরীদের আর শেষ নাই, চেয়ে খাওয়া ছাড়া তাদের পথ নাই। পাঁচটি কি দশটি—যদি কিছুই না পার একটি ভিক্ষুককেও অন্ন দিয়ো। আর একটি কাজ—।

—বলুন।

—এ কালের ছেলে তো তোমরা—তোমরা সাধু-সন্ন্যাসীদের গালিগালাজ কর। তা করো না। সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব—যারা ভগবানের নামে ভেকধারী আর কি ! তাদেরও সাহায্য করো, তা না-করো না-পারো, তাদের যেন গালিগালাজটা করো না।

অবাক বিস্ময়ে প্রায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিল মন্মথ। অসংকোচ নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাঁর দুটি নীল ও পিঙ্গল বর্ণে মেশানো চোখের তারার দিকে তাকিয়ে রইল।

মাধববাবু বললেন—তোমাকে আমার ভালো লেগেছে। ভারী ভালো লেগেছে হে ! মন্মথ নত হয়ে পড়ল যেন। একটু চুপ করে থেকে আবার মাধববাবু বললেন—দেখ আমার ছেলেবেলায় আমি ভারী গরীব ছিলাম হে। আমাদের বাড়ির উঠোনে কুকসীমার এত জঙ্গল যে তা সাফ করবার ক্ষমতা ছিল না আমার মায়ের। আমার বাবা আমার নিতান্ত ছেলেবেলায় দারিদ্র্য-দুঃখ ঘোচার পথ না-পেয়ে বৈদ্যনাথধাম গিয়েছিলেন ধরনা দেবেন বলে। তখন রেল হয় নি। পায়েহাঁটা পথ। পায়ে হেঁটে বেরিয়ে আর ফেরেন নি। মা অনেক কষ্ট করে আমাকে আর আমার দুই বোনকে মানুষ করেছিলেন। আমি ষোল বছর বয়সে লেখাপড়া ছেড়ে মন্দ সঙ্গে মিশে হাঘরেই হতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমাদের গ্রামের একজন জামাই এলেন শ্বশুরবাড়ি। তিনি রানীগঞ্জে বেঙ্গল কোল কোম্পানীর কয়লার আপিসে কাজ করেন। তিনি আমাকে নিয়ে এলেন রানীগঞ্জ—মুন্সীর চাকরি করে দিলেন—মাসে পাঁচ টাকা মাইনে। খেতাম ওই জামাইবাবুর বাড়িতে। বুঝেছ ? অবাক হয়ে গেলাম। মাটি কেটে কালো কালো কয়লার চাঁই বের করেছে ওই সায়েবরা ইংরেজরা। সাক্ষাৎ বিশ্বকর্মা, সাক্ষাৎ শুক্রাচার্য —মানে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের জাত। বৃহস্পতি দেব-বুদ্ধি নিয়ে বারবার দৈত্যদের গুরুর

কাছে হেরেছেন। আমাদেরই দেশ, মাটির নিচে এই কয়লা তো চিরকাল আছে! ওঃ রেল লাইন পেতে তার উপর রেলগাড়ি, তারে তারে বিদ্যুৎ চালিয়ে খবর পাঠানো—এসব হল ওই দৈত্যগুরুর বিদ্যা। ওঃ—কি করলে ওরা! এই কলকাতা শহর—কি ছিল কি হল!

হঠাৎ একটুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেলেন, তারপর একটু হেসে বললেন—দেখ কি বলতে বলতে কি বলছি। কলিকালে দৈত্যবুদ্ধি দৈত্যবিজ্ঞান—এরই জয়! তা আমি ওই ওদের কাছে হাতে কলমে পাঠ নিলাম হে! সায়েব বড় ভালবাসতেন; দুর্দান্ত সাহস ছিল—বুঝেছ, একবার ডাকাতে আটকেছিল পথে—লাঠি ছিল হাতে—তাদের সঙ্গে লড়েছিলাম। সায়েব আমাকে বলেছিলেন—মাধব তুমি এক কাম করিবে আর এক বাত মনে রাখিবে। যাহা করিবে তাহা ফাঁকি দিবে না—কোল মাইনের নাম—কোম্পানির কাম—ই কাম তুমি এমন করিয়া করিবে যে তোমার আপনা কাম হইয়া যাইবে। আর এই বাত মনে রাখিবে—যো কাম করিবে উ লিয়ে ভুখ করিবে না। হাঁ। তা দেখ আমার ভাগ্য খুলল ওই মন্ত্রে। আমার মা বলতেন—আমার এই কুকসীমারই বন মাধব সোনা কেটে হেথা গড়বে বৃন্দাবন। বুঝেছ মায়ের কথা সব ফলেছে—বাড়িতে রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ স্থাপনা করেছি লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা নারায়ণ আছেন। মা বলেছিলেন—গরীবকে অন্ন দিয়ো বাবা, সাধুসন্ন্যাসীকে আসন দিয়ো ভোজন করিয়ো। তোমাকে আমি এই কথাগুলি বলে গেলাম। তুমি এখানে থাকবে।

ঠিক এমনই মুহূর্তটিতে এক অদ্ভুত মূর্তি এসে দাঁড়াল। হাতে একখানা কাঁসার থালার উপর একটা বড় রুপোর বাটিতে বেশ ঘন সর পড়া দুধ, একখানি রেকাবিতে দুটি মিষ্টি তার পাশে রুপোর গেলাসে কিছু পানীয় নিয়ে এসেছে সে। মানুষটি যেন কয়েক তাল মাংস-পিণ্ড জুড়ে তৈরি হয়েছে। নির্মাতা বিধাতার এ হাতের তারিফ অবশ্যই করতে হবে। মুণ্ডটি একটি গোল তাল, বুকটি তার থেকে বড় আর একটি তাল। তার নিচে পেটটি তার থেকেও বড় একতাল মাংসপিণ্ড এবং এইটিই সব থেকে গোলালো মোটা মাংসপিণ্ড, তার সঙ্গে পা দুটি এবং দুটি হাত যেন চারটি মাংসপিণ্ডে তৈরি লেডিকেনি। মাথায় চুল নেই। সবই টাক পড়ে উঠে গেছে কিন্তু সর্বাঙ্গে ভালুকের মতো লোম। গলায় কিষ্টিকালো একটা ঘামে সপসপে পৈতে। মুখের মধ্যেও তিনটে ছোট তাল—দুটো দিকে দুটো গাল নিচেরটা দিয়ে থলথলে গলার সঙ্গে জুড়ে থুতনি রচনা করেছেন স্রষ্টা।

থালাখানা নামিয়ে দিয়ে সে মন্মথকে দেখে বললে—গড ইজ গুড! বাবুমশায়, এই পুঁচকে ছেলেটা আসবে বলে এক ঘণ্টা আগে উঠেছেন? এটা কে? কাদের ছেলে?

মাধববাবু রুপোর গ্লাসটি তুলে নিয়েছিলেন এবং তার ভিতর থেকে গিঁটবাধা এক টুকরো ন্যাকড়া তুলে ফেলে দিয়ে পানীয়টুকু পান করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু লোকটির কথা শুনে তিনি তার দিকে হাতের গ্লাস নামিয়ে রেখে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন এবং মৃদু কঠোর কণ্ঠে বললেন—নিসু!

লোকটির নাম নিসু। নিসু চমকে উঠল। তারপর বললে—দু' চড় লাগিয়ে দ্যান আমাকে। মাথায় হাত বুলোবে নিসু। তাই বলে আপনি এম এল ব্যানার্জী কলিয়ারী প্রপাইটর অ্যাণ্ড জ্যামিন্ডার মার্চেণ্ট এ্যাণ্ড ব্যাংকার আপনি একটা ছোঁড়ার—

—চুপ কর! ধমক দিয়ে উঠলেন। তারপর আঙুল দেখিয়ে বললেন—যাও এখান থেকে।

নিসু চলে গেল। মাধববাবু মিষ্টি সমেত রেকাবিখানি মন্মথকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—খাও।

নিস্ত ধমক খেয়েও যায় নি। সে মাথার অল্প ক'গাছা চুলের গোড়া চুলকে বললে—তা' আপনি মারুন ক্যানে আমাকে। তা' বলে আপনি কিনা—

বাধা পড়ল। রাস্তা থেকে কেউ একজন বিচিত্র উচ্চারণে 'কর্‌তাবাবু' বলে হাঁক মেরে ডাকলে; মাধববাবু এবার পানীয়টুকু পান করে দুধের বাটিটি তুলে নিয়ে সাড়া দিলেন —আসুন। পানীয়টুকু আফিংগোলা জল। গন্ধ থেকে বোঝা যাচ্ছিল। আফিং খেয়ে দুধটুকু খেয়ে মুখ ধুয়ে বললেন—কই ?

সেই বাইরের জনটিকে। সাড়া দিয়ে একজন ঢুকল। এও এক বিচিত্র মূর্তি—ছ' ফুটের মতো লম্বা আবলুস কাঠের মতো কালো দেহবর্ণ ছিপছিপে রোগা কিন্তু দেখতে মোটামুটি প্রিয়দর্শন এক ঘোরতর বাবু চটি ফটফট করে বাড়ি ঢুকল। এসেই পায়ে হাত দিয়ে ধুলো নিয়ে প্রণাম করে বললে—রাইট সায়েব এসেছে বাবু। আমি বললাম—তুমি যেয়ো না। করতা যাবেন না গার্ডেন পার্টিতে। সে কিছুতেই শুনলে না। বলে— আমার কান নাক কেটে নে রে শালা। মেরে দে আমাকে। ব্যাটা ওই আসছে।

বাইরে থেকে কেউ বললে—হাঁ-হাঁ বেটা এসেছে (৪) এসেছে (৪) অ্যান্ড সে ঠিকই আস্‌তো। এ শালাকে (৪) আপনি কেনো পাঠাইলেন আমি বুঝি না!

একজন সত্যি সত্যি লালমুখো সায়েব এসে বাড়িতে ঢুকল। এবং আশ্চর্য সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে খাস বাংলায় কথা বলে গেল।—করতাবাবু আপনাকে আমি ফাদারের মতুন দেখি—রিগার্ড করি রেসপেক্ট করি—আপনি আমাকে বেইজ্জৎ করবেন ? এ শালা পোড়া কাঠ একদম আমার গার্ল-এর বাড়িতে গিয়ে বলে—করতাবাবু কিছুতে আসবেন না পার্টিতে! এ কি বাত্‌ ? আমি কি বলব উদের ? তারা সব বড় বড় ইংরেজ জেন্টেলম্যান, বড় বড় বাড়ির ছেলে। আপনারা পার্টি দিচ্ছেন—আমি আপনাদের এজেন্ট ব্রোকার— আমি আপনাদের নিমন্ত্রণ নিয়ে তাদের পাশ গিয়ে আপনাদের নামে invite করলাম। ব্যানার্জী মুকুরজী রয় কোম্পানির নাম আছে কার্ডে। আপনি যাবেন না তো কি বলবে আমি those জেন্টেলমেনলোককে ? তারা ইনসালটেড ফীল করবে—

বাধা দিয়ে মাধববাবু বললেন—রাইট তুমি বুঝছ না আমার কথা। আমার ষাট বছর বয়স হয়ে গেল। বাগানবাড়িতে পার্টি হবে—বাঈজীতে নাচগান করবে, আমার জামাই ছেলেটেলেরা থাকবে—

—কেনো করতাবাবু, আপনা বাড়িতে ইস্কুল ওপেনিং হল—আই ওয়াজ দেয়ার— সেখানে খেমটা নাচ হল। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিল জজসাহেব ছিল—এসপি অলসো ওয়াজ দেয়ার—আপনার জামাই ছেলেরা ভী ছিল; সো মেনি রিলেটিভস্‌—ইভেন লেডীজ এসেছিল নাচ দেখতে।

মাধববাবুর মসৃণ প্রশান্ত সুগৌর কপালে একটি একটি করে রেখা জেগে জেগে উঠছিল। তবু শুনছিলেন রাইট সাহেবের কথা। হঠাৎ এবার তিনি হাত তুলে বললেন—শোন শোন আমার কথা শোন—

রাইট বললে—কোনো কথা শুনবে না আমি বাবা—আমার সব প্ল্যান বরবাদ হয়ে যাবে। হাঁ—। আমি বলছি করতাবাবু আপনি আমার কথা শুনুন—চলুন পার্টিতে। ফর হাফ অ্যান আওয়ার অর সো। ফরটি ফাইভ মিনিটস্‌। বাঈজীর গান শুনুন নাচ দেখুন—গেস্ট লোকের কাছে হাত জোড় করে শরীর খারাপ বলে চলে আসুন। তারপর ছোকরা বাবু লোক থাকুক সায়েব লোক থাকুক—অ্যাংলো গার্লস্‌ আসুক—সায়েব লোক ছোকরা লোক ওদের নিয়ে যা খুশি করুক। আপনি তখুন ট্রেনে চলবেন আপনা ঘর। রাতকে ট্রেন আমি নিশ্চয় ধরিয়ে দেব। না-পারলে আমার মুখ দেখবেন না।

—থাম রাইট থাম।

—না আমি থামব না। এই এক পার্টিতে ব্যানার্জী মুকুর্জী কোম্পানিকে প্রিমিয়ার কোল কোম্পানির রেকগনিশন আদায় করবে। না তো আমাকে রাইট বলবেন না, রং (wrong) বলবেন।

—শোন আমি যাব, কিন্তু তুমি থাম।

সাহেব মাধববাবুর পায়ের হাঁটু ছুঁয়ে বললে—মাই ফাদার।

মাধববাবু মন্মথকে বললেন—তুমি আজ বাড়ি যাও। থাকা তোমার এখানেই হবে। তবে কাল পাকা জানাবো। হ্যাঁ। কাল—

মন্মথ খুব আহত হয়েই ফিরে এলো। মাধববাবু শেষটা যেন আর এক মানুষ হয়ে গেলেন। মাটির ঘট পেতে, যেন শেষকালটায় পায়ে ঠেলে ফেলে দিলেন। কথারও কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পেলে না। মাধববাবু রাইট সাহেবকে বললেন আজ রাত্রেই দেশে যাবেন। দ্বিজু মুন্সীকেও দুপুরবেলা তাই বলেছেন। অথচ তাকে বলেছেন—কাল এস তুমি। কাল তোমার ব্যবস্থা করব। আরও বেশী খারাপ লাগল—বাগান পার্টি হবে—তাতে সাহেব কোম্পানির সাহেবরা আসবে, মাধববাবুর ছেলে জামাই ভাইপো এবং অন্য অন্য ছেলেমানুষ আত্মীয় থাকবেন—বাঈজী নাচ হবে সেখানে—ফিরিঙ্গী মেম সাহেবরা আসবে—তাদের নিয়েও নাচটাচ হবে—সেখানে তিনি যাবেন—এবং তারই ব্যস্ততায় তার সঙ্গে কথা শেষ করে বলবার সময় পেলেন না।

বড়লোক মানুষেরা এমনিই বটে। তার কাকা জটাধরকে দেখলে, বিভূতিকে দেখেছে, হরচন্দ্রবাবুকে দেখলে, আবার এই আশ্চর্য লোকটি সেও তাই। মাধববাবুর বাসা থেকে বেরিয়ে সে সারা সন্ধ্যেবেলাটা পথে পথে ঘুরে বেড়ালে। এবং রাত্রি নটা নাগাদ দ্বিজু মুন্সীর বাড়ি ফিরে চুপি চুপি বাইরের ঘরের তক্তাপোশটির উপর শুয়ে পড়ল।

সন্ধ্যের সময় দ্বিজু মুন্সী সাহেবের সেরেস্তা থেকে ফিরে বেশ মৌজে থাকে। সন্ধ্যের সময় আপিং খায়, আমাশয়ের ধাত তার উপর কলকাতার মতো নোনায় জরা জায়গা, আপিং না-খেলে উপায় নেই। এর উপরে মনিববাড়ি থেকে ফেরার পথে বেশ এক কলকে শুকনো নেশা করে বাড়ি ফেরে। তখন আর মাটির পৃথিবী নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো মন মেজাজ থাকে না। বাড়িতে ফিরে ঠাকুরঘরে মহাপ্রভুর পটের সামনে খোল বাজিয়ে নামগান করে। রাত্রিতে মুন্সী আর কোনো খোঁজখবর করে নি। মুন্সীর স্ত্রী বাতে পঙ্গু, বাড়িতে লোকের মধ্যে কয়েকটি কন্যা, বড়টি বিধবা মেজটি শ্বশুরবাড়িতে থাকে, বাকী দুটি কুমারী। বিধবা মেয়েটি একবার জিজ্ঞাসা করেছিল—কিগো তুমি যে এসে শুয়ে পড়লে। খাবে না?

মন্মথ বলেছিল—না। আমার শরীরটা ভালো নেই!

—কি হল? জ্বর নাকি?

—না। এই কেমন কেমন করছে!

—তাহলে উপোষ দেওয়া ভালো। ভিতরের দরজাটা ভেজিয়ে দিচ্ছি। ঘরের কোণে কলসী আছে গেলাস আছে। কেমন?

সে চলে গিছল। তারপর আর কেউ তাকে ডাকে নি। শেষ রাত্রে খিদের চোটে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল এবং তখন থেকে আর ঘুম আসে নি। ভোর হতেই সে হাত মুখ ধুয়ে বাইরে যাবার জন্যে অধীর হয়ে বসেছিল। মুন্সীর বড় মেয়ে উঠে দরজা খুলতেই সে তাকে বলেছিল—আমার একটু জরুরী কাজ আছে—আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। মুন্সী মশায়কে বলবেন ফিরে এসে দেখা করব।

বেরিয়ে সে চলে গিছল কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের দিকে। দরকার ছিল তার চায়ের দোকানের। সদ্য তখন চায়ের দোকানের রেওয়াজটা এখানে ওখানে একটা দুটো করে বাড়তে শুরু করেছে ; বাজারের কাছ ঘেঁষে খাপরার চাল ঘরের মধ্যেই চায়ের দোকান বেশী হয়েছে। সেখানে ভাঁড়ে করে চা বিক্রি হয়, তার সঙ্গে তেলেভাজা শিঙাড়া কচুরি মেলে। পাশেই কাছাকাছি মিষ্টির দোকান আছে, চায়ের সঙ্গে জিলিপির কাটতিটাই বেশী হয়। তাও হাঁটতে হল বেশ খানিকটা পথ। সেই সিমলে পর্যন্ত ; শ্রীমানী বাজারের কাছে এসে মিলল দোকান। পথে লোহার উনোনে চায়ের হাঁড়ি বসিয়ে যারা পথে পথে চা বিক্রি করে তাদের কাছে চা খেতে তার ইচ্ছে হল না। ওই দোকানে চা এবং জিলিপি খেয়ে খিদের জ্বালা থেকে রেহাই পেয়ে বাঁচল সে। তাও পেট ভালো ভরল না। পেট ভরে জিলিপি খাবার মতো পয়সা নেই। আবার দোকানে বসে মুড়ি কিনে খেতেও যেন লজ্জা লাগল।

জিলিপি এবং তেলেভাজা কচুরির সঙ্গে চা খেয়ে চলতে চলতে ঠনঠনের কাছে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে। সেই দাড়ি গোঁফ চুল জটাওয়ালা সন্ন্যাসী যে তার হাত দেখে বলে দিয়েছিল তার সংমা আছে। এবং যে বলেছিল—তুমি ফার্স্ট হবে। তাকে পেয়ে সে যেন বেঁচে গেল। একটা কথা বলবার লোক পেলে। সেই তাকে ডেকে কথা বললে—কি কেমন আছ ?

সে হেসে বললে—সন্ন্যাসীর 'খারাব' রহতে নেই বাবু। তোমার খবর বাতাও।

মন্মথ বললে—বাঃ সে তো তুমি বলবে। বল তো এখন আমার সময় কেমন চলছে ?

সন্ন্যাসী সঙ্গে সঙ্গে তার ডান হাতখানা টেনে নিয়ে বেশ মন দিয়ে দেখে বললে—আরে বাপ্‌! তোমার বহুৎ আচ্ছা সময়ের তো এহি শুরু হচ্ছে বাবু। বহুৎ বড়া হবে তুমি। বহুৎ বড়া। ব—হু—ৎ বড়া। ললাট দেখি—হু ললাটমে ভী ওহি লিখছে।

মন্মথ বললে—ধু—ৎ! পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি আর তুমি বলছ ব—হু—ৎ বড়া।

—হাঁরে বাবা হাঁ! বাড়ি হোবে গাড়ি হোবে রাজ হোবে—বহু—ৎ খুবসুরতি স্ত্রী আসবে—আউর—

—আউর তোমার মাথা—

—আচ্ছা। বাতাও একঠো ফুলকে নাম—

মন্মথর মনের মধ্যে নামের সঙ্গে মালতীর মুখ ভেসে উঠল। কিন্তু বলবার সময় বললে—চামেলী।

সামনেই একটা দোকানে একটা বোর্ডে লেখা বিজ্ঞাপন ঝুলছিল—'সুগন্ধী চামেলী তৈল'। সেই নামটাই বলে দিল সে। সন্ন্যাসী বললে—চামেলী কে 'চ'—এহি অখছর দিয়ে নামকে এক আওরৎ তুমারা জিন্দগীমে আয়েগী বাবুজী। উ তুমারা শক্তি, সাকষাৎ শক্তি হোগী তুমারা।

—যাঃ! ছাড় হাত ছাড়। যত বাজে কথা! ভণ্ড কোথাকার!

হি হি করে হেসে সন্ন্যাসী বললে—দোঠো পয়সা তো দিয়ে যা বাবা। চা পিয়ে লিব সকালমে। এক পয়সা চা এক পয়সাকে জিলাইবি। আর হামি ঝুট বোলে নাই, দেখবি।

মোট দু' টাকা তিন আনা সম্বল ছিল মন্মথর। তা থেকে দুটো পয়সাই সে বের করে তার হাতে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মা কালী প্রণাম করে আবার ফিরল। ফিরল পূর্বদিকে। আবার পড়ল আমহার্স্ট স্ট্রীটে।

মনে নানান কথা ঘুরছিল। কোথায় যাবে ? কাকার বাড়ি ফিরে যাবে ? সত্যদের বাড়ি যাবে ? লোকটাকে এই কথাটা জিজ্ঞাসা করলে হত! দূর দূর! নিজেকেই তিরস্কার

করলে সে। আজও ওইসব বিশ্বাস করে সে।

আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িগুলো ঝকঝকে এবং বড় বড়। দেখতে দেখতে হাঁটতে হাঁটতে এসে উঠল আবার দ্বিজু মুন্সীর বাড়িতে। মুন্সী তখন বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে কথা বলছিল এই লম্বা মাথায় একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে। ভদ্রলোকের পোশাক যেমন ধবধবে গায়ের রঙটা তেমনি কালো ; মন্মথ একটু এগিয়ে কাছে এসেই লোকটিকে চিনলে ; এ তো সেই কালকের মাধববাবুর বাড়ির কালো লোকটি ! যে রাইট সাহেবকে সঙ্গে করে এনেছিল। সাহেব ওকে পোড়া পোড়া বলে ডাকছিল। খুব জমিয়ে বসে গল্প জুড়ে দিয়েছে। ভদ্রলোকের হাত পা নেড়ে গল্প বলার ক্ষমতা আছে। বোধহয় কাল রাত্রের বাগান পার্টির কথা বলছে।—প্রায় সব ব্যাটা লালমুখ একেরে কাৎ। বুঝেছেন না। কেবল এক ব্যাটা সিঁটকে আর এই লম্বা মানে আমারই ধলো এডিশন আর জন দুই তিন—তারা খেলেও কম আর রইলও ঠিক। শালা—সে যেন থমথম করছে। বললাম—স্যার আর দেবো ? খোনাখোনা আওয়াজে বললে,—নোঁ ! উঠবার চেষ্টা করছে চেয়ার ধরে, বললাম—ধরব ? বললে—নোঁ ! শেষ—ইঁয়েস বললে কিসে জানেন ?

কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললে—শুনো ইঁউ ব্ল্যাঁক—ক'ল দ্যাঁট ল'চু গার্ল ! সোনাগাছির ডালিম বলে মেয়েটাকে শালা একশো টাকার নোট বের করে দিলে।

দ্বিজু মুন্সী এবার তাকে বাধা দিয়ে বললে—দাঁড়ান। গল্পটা ভালো করে মজিয়ে শুনতে হবে। বুঝেছেন ! এখন মন্মথ এসে গেছে। চিঠিখানা আপনিই ওকে দিন।

—কই ? এই ছোকরা ? কাল যখন কত্তাবাবুর কাছে দেখেছিলাম তখন নজর করে দেখি নি। কে না কে ? উঁ ! তা' চেহারা মন্দ নয়। কিন্তু কি বলেছিলে বল তো সোনা ? বাবু এত মজল কিসে ? সে রাত্তির তখন নটা—বাগান পার্টি আরম্ভ হয়েছে। কোথাও কোনোও ফাজলামি নাই বেলেল্লাগিরি নাই ; আসরে খ্যামটার দল নেমেছে। বৈঠকী গান গাইছে ফিরোজা বাঈ। কত্তা গান ভালো বোঝেন। মন দিয়ে শুনছেন। শুনতে শুনতে বার দুই এদিক ওদিক মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। সায়েবরা সব বসে আছে, সামনে টেবিলে টেবিলে গেলাস। মুখে লম্বা লম্বা চুরোট। পিছন দিকে ছোকরা বাবুরা বসে সিগারেটে ফুঁকছে। বাবুর মুখ ফিরিয়ে তাকানো দেখেই আমি ছুটে গেলাম। বললাম—কিছু বলছেন ? তো বললেন—বাড়ি ফিরবো, গাড়ি ঠিক করে রাখ।

কি হল, কি বৃত্তান্ত সেসব কাউকে কিছু বললেন না ; শুধু সায়েবদের বললেন—আই অ্যাম অ্যান ওল্ড ম্যান ; আমাদের দেশে ওল্ড এজে এসবে নিষেধ আছে আমাদের ধর্মের নিষেধ। তবুও, আপনারা এসেছেন তাই আপনাদিগে সেলাম দিতে এসেছিলাম। আপনারা এখন আমোদ-আহ্লাদ করুন। আমি যাই। বলে চলে এলেন। তা' ছাড়া দেশে যাবার কথা রাত্রি সাড়ে এগারটায়। কর্তাকে বিদেয় করে সায়েবদের বড়গুলোদের বিদেয় করে নিশ্চিন্ত হয়ে সারারাত মাইফেল করে বাড়ি এলাম তো দেখি বাবুর ঘরে শুধু আলো জ্বলছে। বাকী সব ঘরাঘরি ঘুমুচ্ছে। অন্যান্য বাবুরা সব বাগানবাড়ি থেকেই আপন আপন মেয়েমানুষের বাড়ি চলে গিয়েছেন। চাকরেরা দরজা খুলে দিলে। দরজা খোলার শব্দ শুনেই কত্তা ডাকলেন—কে ? কে ফিরল, রামধনি ? রামধনি বললে—পোড়াবাবু ফিরলেন। ব্যাটা তো খোদ কত্তার চাকর—পেয়ারের চাকর, আমাকে পোড়াবাবু বলে। বাবু বলেন তো ! আমি বলি কি জানেন ? বলি—নে বেটোরা পোড়াঝোড়া কয়লা কেলে যা বলবি বল, আমার বাবু খুশী থাকলেই হল। আমি ছুটে গেলাম—বলতে গেলাম সব ভালোয় ভালোয় চুকে গেছে। সায়েবরা খুব খুশী হয়ে ফিরে গিয়েছে। খুব খুশী। সব বলে লঙ লিভ বড়াকর্তা !

আর আমাদের বাবুরাও সব ভালো আছেন। নিরাপদেই আছেন। বাবু মাঝপথে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—পোড়া তোর সব ভালো রে—তুই যদি একটু কম কথা বলতিস!

মন্মথর চিবুকে হাত দিয়ে সমাদর করে পোড়াবাবু বললে—আমি সোনামণি তোমার জন্যে বেকুব বনে গেলাম। মাথা চুলকে বললাম—তাহলে আজ্ঞে কি বলছেন? কিছু অন্যায় তো করি নি। কর্তা বললেন—তুই করিস নি আবার করেছিসও। বিকেলবেলা রাইট সাহেবকে হুড়মুড় করে এনে ফেললি—সে তুই। নইলে আধ ঘণ্টা দেরি হলে আমার অন্যায়টা হয় না। তখন দেখেছিলি, সুন্দর একটি ছেলে—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ গায়ের রঙ—টানাটানা চোখ—আমার কাছে কথা বলছিল?

হাতখানি 'ফুরৎধা' ভঙ্গিতে নেড়ে পোড়াবাবু বললে—আমি বাবু কাল তোমাকে দেখেও দেখি নি। ওই যে রাইট সায়েব, না? ব্যাটা অ্যাংলো, নেশার পাঁড়। চরস খায় গাঁজা খায় গুলি খায়—কি না খায়! মদ তো খায়ই। কাল বিকেলবেলা আসবার সময় খিদিরপুরে এক ফকিরের আস্তানায় গাঁজা খেয়ে তবে এলো। ওর সঙ্গে আমিও খেয়েছিলাম। তার ওপর ভাদ্রমাসের রোদ চনচন করছে। মাথায় গার্ডেন পার্টি। আমি তোমাকে গেরাহ্যিই করি নি। কত্তাবাবুর কাছে সত্যিই বললাম, বললাম—না কত্তা সে ব্যাটা ভাগ্যিমানের ব্যাটা ভাগ্যিমানকে তো নজর করি নি।

বাবু বললেন—তোর দোষ কি? ঝাড়া তিনমণি গাছের গুঁড়ির মতো রাইট সায়েব ব্যাটা নাকে মুখে চোখে কথা কয়। আমারই ভুল হয়ে গেল। আমি তাকে বললাম—। কি বললাম ঠিক মনে পড়ছে না। কাল আসতে বলেছি—না কি বলেছি? কথা সেই বাগান থেকেই মনে পাক খাচ্ছে। বুঝলি! বাড়ি এসে সারারাত ঘুম হয় নি। রাত্রের ট্রেনে যেতে ইচ্ছে হল না। তুই দ্বিজু মুন্সীর বাড়ি যা, সেখানে গিয়ে সেই ছেলেকে বলে আয় যে যতদিন সে পড়বে ততদিন সে আমাদের মাধব লজে থাকতে পাবে খেতে পাবে।

মন্মথ অবাক হয়ে শুনছিল এই দুর্লভ চেহারার এবং বিচিত্র চরিত্র মানুষটির ততোধিক বিচিত্র ভঙ্গিতে বলা কথাগুলি, মনের মধ্যে ভাসছিল কিন্তু মাধববাবুর স্বর্ণকান্তি ও প্রসন্ন মুখ।

পোড়াবাবুর কথা শেষ হয় নি—সে বলেই চলেছিল—চল তুমি আমার সঙ্গে। সঙ্গে নিয়ে তবে যাব আমি। বাবু বলেছেন সঙ্গে নিয়ে আসবে। আমি হাওড়া রওনা হচ্ছি। কাল রাত্রে তো বাবু যান নি আজ সকালে যাচ্ছেন। চল। কি জিনিসপত্র আছে তোমার? একটা ঝাঁকামুটে ডেকে নিচ্ছি। তুমি জিনিস গোছাও।

মন্মথ বললে—আমার জিনিসপত্তর বই আর একটা তোরঙ্গ আর একটা বিছানা। সে পড়ে আছে বড়বাজারে।

দ্বিজু মুন্সী বললে—বড়বাজারে তুমি যেতে পারবে না আমি সঙ্গে যাব?

মন্মথ বললে—না আপনাকে যেতে হবে না। আমি যাব। গিন্নীঠাকরুন খুব ভালো-মানুষ। বাবুও খুব ভালো লোক। বাড়ির কর্মচারীরাও আমাকে ভালবাসেন। আমাকে ওঁরা কেউ কিছু বলবেন না।

বড়বাজারের বাড়িতে নিজের জিনিসপত্র নিতে এসে কিন্তু সে অবাক হয়ে গেল। হরচন্দ্রবাবুর সেরেস্তার সরকার প্রবীণ লোক। শান্ত মানুষ। তার সঙ্গে গম্ভীরও বটে। সে নাকি তার জন্যে হাইকোর্ট না গিয়ে বাড়িতে অপেক্ষা করে বসে আছে। বাড়ির ফটকে এসে সে দাঁড়াবামাত্র রমণ সরকার বেরিয়ে এসে তার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বললে—তোমার জন্যে আমি বসে আছি। বাবু আমাকে রেখে গেলেন। বলে গেলেন—রমণ যা হয়েছে তা

হয়েছে, আর কেলেঙ্কারির হয় এ আমি চাই নে। ছেলেটা কাল ফেরে নি—আজ নিশ্চয় ফিরবে। না ফিরলে খোঁজ করতে হবে। আজ ফেরবার কথা। ফেরা উচিত। ছোটবউমা আজ সকালেই এসেছেন। কি মতলব বুঝি না। সেই জন্যেই তোমাকে রেখে যাচ্ছি। মন্মথ ছেলেটি এলে যেন কোনোরকম বিশ্রী কাণ্ড না ঘটে। তার জিনিসপত্রগুলি বের করে দিয়ো। এই চিঠিখানি দিয়ো। আর এই টাকাটা—।

রমণ সরকার একখানি খামের মধ্যে বন্ধ করা নোট তার দিকে বাড়িয়ে ধরলে। বললে—উনি ভারী দুঃখিত। খুব দুঃখ পেয়েছেন উনি। অবশ্য ওঁর আর কি হাত ছিল এতে? তা' যা হোক এই টাকাটা তুমি রাখ কাজে লাগাবে। একশো টাকা আছে। এর থেকে বিস্মিত হবার আর কি থাকতে পারে। রমণ সরকার খামখানা বাড়িয়ে ধরলে। মন্মথ পিছিয়ে গেল। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলে না।

রমণ বললে—কি হলো?

এবার মন্মথ বললে—না। তারপরই প্রশ্ন করলে—টাকা নিয়ে কি করব আমি?

রমণ সরকার হেসে ফেললে। বললে—তা' বটে! টাকা নিয়ে কি করবে? তবে সরাসরি না বলার চেয়ে এটা তুমি ভালোই বলেছ। তা' বেশ—আমি ফিরিয়ে দেব বাবুকে। তারপর? জিনিসপত্র নিতে এসেছ, নিয়ে যাবে কোথায়?

মন্মথ বললে—সে একজন কয়লার ব্যবসাদার খনির মালিক ভদ্রলোক খুব সদাশয় লোক—বীরভূম জেলায় বাড়ি—

—ও। রমণ সরকার কথার মাঝখানেই বললে—মাধববাবুর ওখানে—

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তা' ভালো হয়েছে। তবে কি জান? না সে সব থাক। সবই অদৃষ্টে করে হে। নইলে ওই ছোটবউটি এ বাড়ির—ওর মতো হৈহৈ করে হাসিখুশী দাতা এমন মেয়ে আর আছে নাকি? বংশ কি! মস্তবড় বাড়ির মেয়ে তো! আর অতিরিক্ত আদরে মানুষ। বড্ড খেয়ালী। রাগলে ভালমন্দ কেনো জ্ঞান থাকে না। যা মুখে আসে বলে, ঝি চাকরকে সামনে যা পায় ছুঁড়ে মারে। আবার রাগ পড়লে টাকা দেয় কাপড় দেয়—মানে বড়লোকের খেয়াল।

মাথা হেঁট করেই মন্মথ কথাগুলি শুনছিল। এ বাড়িতে বছরখানেকের উপর সে থেকেছে—এর মধ্যে ছোটবউ বড়বউ মধ্যে মধ্যে এসেছে। উপরতলায় তাদের কলহাস্য শুনেছে। তাদের কাপড়-চোপড়ের রঙের ছটায় চোখ ধেঁধেছে তার। তাদের গায়ে মাথা সেন্টের গন্ধ এসেছে নাকে। এ সব অবশ্য তার কাছে খুব একটা নতুন নয়, তার খুড়ীমা কৃষ্ণভামিনীর এ সবই ছিল। তবে কৃষ্ণভামিনী এ বাড়ির ছোটবউ বড়বউয়ের মতো আধুনিক বা শিক্ষিতা নন—বড্ড বেশী হিন্দুয়ানী আর ছুঁৎপবিত বিচার। তা নইলে খুব বেশী তফাত নেই। মালতীদের সমকক্ষ ওরা নয়। কিন্তু অহঙ্কার খুব বেশী। তাছাড়া রাগ। এমন রাগ এমন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কথা এমন জেদ আর কোনো মেয়ের সে দেখে নি।

রমণ সরকার বলেই যাচ্ছিল—সে শুনছিল। উত্তর দেবার তার একটুও ইচ্ছে ছিল না। মাথা হেঁট করে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মেঝেতে দাগ কাটছিল অকারণে।

রমণ সরকার হঠাৎ থেমে গেল। বললে—চল জিনিসগুলো তোমার গুছিয়ে নাও। একটা ঝাঁকামুটে ডেকে দিক। বই অনেকগুলো আছে। চল।

সামনেই উঠানের ওপাশে মন্মথর ছোট ঘরখানার দরজায় তালা লাগান ছিল; রমণ সরকারই এগিয়ে গিয়ে চাবি খুলতে খুলতে বললে—তাড়াতাড়ি নাও। ছোটবউ আজ সেই সকাল থেকে এসে হাজির হয়েছেন। কি যে মতলব তা' কেউ জানে না। হঠাৎ এসে হাজির। বাবু কোর্টে বের হচ্ছেন। এসে একেবারে তেতলায় উঠে দরজা বন্ধ করে

দিলেন। মনে হচ্ছে তেতলার বারান্দার দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দেখছেন।

রমণ সরকারের অনুমান মিথ্যে নয়; পরক্ষণেই উপরতলার বারান্দা থেকে তরুণ উচ্চকণ্ঠ বেজে উঠল—সুবাসী সুবাসী!

রমণ সরকার ঘরের ভিতর থেকে উপর দিকে তাকিয়ে দেখলে। হ্যাঁ রঙিন শাড়ির আঁচল দেখা যাচ্ছে। তেতলার বারান্দাতেই বুকে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তার নিজের ঝি সুবাসীকে ডাকছে।

রমণ সরকার দৃষ্টি ফিরিয়ে মন্মথর দিকে তাকিয়ে ইশারায় কিছু বলতে চাইলে; মন্মথ সেটা ঠিক বুঝলে না তবে তার বইগুলি সে গোছাতে আরম্ভ করেছিল, সে গোছানোর কাজ বন্ধ করলে। বন্ধ করলে কথাটা ঠিক নয়—বন্ধ আপনি হয়ে গেল। সমস্ত মনটা তার নিদারুণ উদ্বেগে ভরে গেল। বুকের মধ্যে অস্বস্তির আর শেষ ছিল না। হাত থেমে গেল।

যে-বউ শ্বশুরকে বিশেষ করে হরচন্দ্রবাবুর মতো কৃতী হাইকোর্টের উকিলকে এমনই করে কটু কথা বলতে পারে সে তো সহজ মেয়ে নয়। এবং সেদিনের পর আজ যে আবার কোনো কাণ্ড করবে না তা কে বলতে পারে।

এবার উচ্চতর এবং তীক্ষ্ণতর কণ্ঠে ছোটবউ বললে এ—ই হারামজাদী সুবাসী! কথা শুনতে পারছিস নে?

আড়ামোড়াভাঙা টানা লম্বা সুরে এবার জবাব এলো—বাপ রে বাপ। শুনেছি শুনতে পেয়েছি।

—ঘুমুচ্ছিস যে এত বেলা পর্যন্ত? কাজটা হল?

—হয় নি। হবে। ঠিক হবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

—তুমি আগে দয়া করে ওঠো তবে নিশ্চিন্ত হব। আর দেখ ছোটবাবু গাড়ি পাঠিয়েছে কিনা দেখ। যদি গাড়ি না এসে থাকে তবে একখানা ভাড়া গাড়ি দিতে বল। সরকার মশাইকে বলে আয়।

রমণ সরকার মন্মথর পিঠে হাত দিয়ে চুপিচুপি বললে—তুমি এক কাজ কর মন্মথ। এখন তুমি চলে যাও। একটু ঘুরেটুরে ঘণ্টা দুয়েক পর এস; নয়তো আমাকে তোমার ঠিকানাটা দিয়ে যাও আমি লোক দিয়ে পেঁাছে দেব। কেমন? কি দরকার কতকগুলো অপ্রিয় কথা শুনে!

মন্মথর গলা থেকে বুক পর্যন্ত শুকিয়ে গিয়েছিল। দয়ামায়াহীন ন্যায়-অন্যায়-বোধ-রহিতা এই ধনী কন্যাটির সেদিনের সেই নিষ্ঠুর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি তার মনে পড়ে গেল, সে উঠে দাঁড়াল কোনোক্রমে। রমণ সরকার তার হাত ধরে এনে ফটকের বাইরে হ্যারিসন রোডের উপর বের করে দিয়ে বললে—ঠিকানাটা লাগবে না—মাধববাবুদের কিছু কেস আমরাও করেছি। ঠিকানা পাব। আমি পাঠিয়ে দেব জিনিসপত্র। আজ সন্ধ্যের আগেই পেঁাছে দেব। তুমি চলে যাও। উনি যে কখন যাবেন তা' দেবতাও বলতে পারে না, আমরা মানুষেরা কি করে বুঝব।

মন্মথ হ্যারিসন রোড ধরে পশ্চিমমুখে খানিকটা এসে দাঁড়াল। হরচন্দ্রবাবুর বাড়ির কম্পাউণ্ড এইখানে শেষ হয়েছে, একটা ছোট্ট রাস্তা চলে গেছে বাড়ির পশ্চিম দিক বেড়ে উত্তর-মুখে; এই রাস্তাটা দিয়েই সেদিন সে বেরিয়ে চলে গিছল। ভাবছিল এইখানটাতেই একটুখানি এদিক ওদিক করবে—তারপর হরচন্দ্রবাবুর বাড়ি থেকে গাড়ি বেরিয়ে গেলেই সে ফিরে গিয়ে বাড়ি ঢুকবে। সে ফটকের দিকে চোখ রেখে একটা বাড়ির দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

নতুন হ্যারিসন রোড তৈরি হয়েছে। দু'পাশে খাপরার বস্তি ভেঙে বড় বড় বাড়ি তৈরি

হচ্ছে। এ অঞ্চলে মাড়োয়ারী ব্যবসাদারেরা এসে নানা ব্যবসা ফেঁদে বসছে। নানান দোকান হচ্ছে! দোকান এবং বড় বাড়ি বাদ দিয়ে একখানা খাপরার বাড়ির চালের ছাঁচের তলায় সে দাঁড়িয়ে ভাবছিল; ভাবছিল ওবাড়ির গিন্নীর কথা। তাঁর সঙ্গে তার দেখা করা উচিত ছিল। সেদিন তিনিই তাঁর ঝিকে দিয়ে খিড়কির গলি পথে তাকে বের করে দিয়ে বাঁচিয়েছিলেন।

—অ বাবু; ওগো! বলি ও ছেলেমানুষ বাবুটি—

চমকে উঠল মন্মথ। এমন নারীকণ্ঠে বেশ হৃদ্য স্বরে কে কথা বলছে? কাকে বলছে?

—এই গলির মুখে! তাকাও!

চকিতভাবে মন্মথ গলিটার দিকে তাকালে। দেখতে পেলে একখানি মুখ সেখান থেকে আধখানা বেরিয়ে আছে। তার মনে হল মেয়েটি নিশ্চয় বাড়ির গিন্নীর ঝি! সে চকিত হয়ে উঠল। যাবে কি যাবে না ঠিক করতে পারলে না। বুকের ভিতরটা উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় আশঙ্কায় যেন তোলপাড় করছিল। মেয়েটি এবার হাত ইশারা দিয়ে ডাকলে।

এবার সে এগিয়ে গেল।

এগিয়ে গিয়ে গলির সামনে দাঁড়াতেই দেখতে পেলে একটি মাঝবয়সী বিধবা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চমৎকার পরিচ্ছন্ন ধবধবে ধুতিপাড় কাপড় পরনে—মুখে একমুখ পান বাঁ গালে পোরা, তার মাথার চুলের বোঝা সে একরাশ—তা' দিয়ে মাথায় তার একটা মস্ত এলো খোঁপা। তাকে দেখে মেয়েটি একমুখ পানের পিচ ফেলে বললে,—আমাকে চেন তুমি?

মন্মথ বললে—না। তবে দেখেছি মনে হচ্ছে!

—হ্যাঁ আমি উকিলবাবুর ছোটব্যাটার বউয়ের খাস-ঝি। আমার নাম সুবাসী।

চমকে উঠল মন্মথ। সে শুকনো গলায় বললে—আমাকে কেন ডাকছ?

মেয়েটি হেসে বললে—একখানা চিঠি আছে তোমার!

—চিঠি?

—হ্যাঁ চিঠি। এই ধর। সে বাড়িয়ে ধরলে একখানা রঙিন খাম। খামখানা থেকে বেশ মিষ্ট গন্ধ বের হচ্ছিল। মন্মথ স্থির করতে পারছিল না চিঠিখানা নেবে কি না-নেবে! মেয়েটি হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা এগিয়ে দিয়ে বললে—কি ছেলে গা তুমি! দিচ্ছি—ধরো না! ধরো!

এমনি একটি সহজ আশ্বাস এবং হুকুমের সুরে কথাটি সে বললে যে মন্মথ কলের পুতুলের দড়ির টানে উঁচিয়ে ওঠা হাতের মতো আপনি উদ্যত হয়ে উঠল। সুবাসী বললে —দেখ সেদিন যে কাণ্ডটা ঘটে গেছে সেটা একটা ক্ষণের মাথায় হয়ে গেছে। রাগলে মেয়েটার আর জ্ঞানগম্যি থাকে না। সেদিন রাগটা হয়েছিল সৎশাশুড়ীর উপর। শাশুড়ীর বিধবা বোনঝির কেলেঙ্কারি। শাশুড়ী তাকে ছোট ছেলের ঘাড়ে চাপিয়ে চালান করেছিল। সেই রাগ ঝাড়তে এসেছিল শ্বশুরের ওপর। মাঝখান থেকে তুমি সামনে পড়ে গেলে। অমনি সব রাগ পড়ল তোমার ওপর।

অবাক হয়ে মন্মথ তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে।

সুবাসী বললে—চিঠিখানা পড়লেই বুঝতে পারবে। এর জন্যে ওর মনের আর খুঁত-খুঁতির শেষ নেই। বলে—আমি এ কি করলাম সুবাসী! ছি ছি ছি! আর ওই ওর স্বভাব। দিনে পাঁচটা দশটা টাকা ও খেসারত দেবেই। ঝিকে বকবে তারপর ডেকে টাকা হাতে দিয়ে বলবে—কিছু মনে করিস নে।

একটু চুপ করে থেকে আবারও সুবাসী বললে—দেখ ওকে আমি ওর তিনমাস বয়স থেকে মানুষ করেছি। আমার মা ছিল ওর মায়ের ঝি, আমি চৌদ্দবছরে বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি এলাম। মা বিধবা হয়ে ওদের বাড়ির ঝি। গিন্নী সব শুনে আমাকে ওর ঝি করে দিলেন।

ওকে নিয়ে আমার যত ঝঞ্ঝাট তত জ্বালা। আমি ওকে খুব বলি। খুব কটকট করে বলি। বড্ড জেদী বড্ড আদুরে! আমি বকলে যা হাতের কাছে পাবে তাই ছুঁড়ে মারবে। তারপর বিছানায় পড়ে মুখ গুঁজে ফোঁসফোঁস করে কাঁদবে। সেদিনও ওবাড়ি গিয়ে ওকে আমি খুব করে বকেছি। এর ওপর রাত্রে কি সব স্বপ্নটপ্ন দেখেছে। সকালবেলা সে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। দুপুরবেলা বলে—ওকে এমন করে অপমান করেছি—ও যদি আমাকে শাপ দেয়! শাপকে ওর—ওর কেন ওদের গুষ্টির বড় ভয়। ওর দাদামশায় কোনো ব্রাহ্মণকে অপমান করেছিলেন—তার জন্যে শাপ দিয়েছিল সে ব্রাহ্মণ। তিন দিন না-যেতে দাদামশায় মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মারা যান। ওদের মায়ের বেটাছেলে হয়ে বাঁচে নি। তা'—তুমি কিছু মনে ক'রো না। ওই চিঠি প'ড়ো—সব বুঝতে পারবে। এমনি তো সবার সামনে তোমার কাছে হেঁট হতে পারে না। তাই চিঠি লিখে নিয়ে সেই সকাল থেকে এ বাড়িতে এসে বসে আছে। ভাগ্যিস তুমি চলে যাও নি তাই রক্ষে। না হলে সুবাসীর কপালে গেরোর ফেরের আর শেষ থাকত না। কোথায় গেছ—সেই খুঁজে খুঁজে আমাকে ছুটতে হত তুমি যেখানে আছ!

এসব কথা মন্মথর কাছে খুব কিছু অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য নয়; সে ইংরিজী পড়ছে আজ সাত আট বছর, কলকাতায় এসেছে চার বছর, তাহলেও সে একেবারে যজমানসেবী ব্রাহ্মণের ছেলে। তার বাড়ির রাধাগোবিন্দ সম্পর্কে কত বিচিত্র গল্প শুনেছে। তার মাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে কত কথা বলেছেন, তার বাবা তো এমনিই ঠাকুরের সামনে বসে কথা বলেন। তাদের অঞ্চলে কত বাড়ির কত স্বপ্ন দেখার গল্প শুনেছে সে। সে সুবাসীর কথাগুলি শুনে মনে মনে দুঃখ অনুভব না-করে পারলে না। যে অপমান এবং যে দুঃখ তার হয়েছিল—যে বেদনা সে অনুভব করে চোখের জল ফেলেছিল তার সঙ্গে শাপমন্যি না দিলেও ওই মেয়েটির সম্পর্কে মনে মনে বলেছে—হে ভগবান তুমি বিচার করো। এবং তার বিশ্বাস এতে ওই মেয়েটির অনিষ্ট নিশ্চয় হতো না।

সুবাসীর মুখে কথাগুলি শুনে কিন্তু আহত ক্ষুব্ধ মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। ছোটবউয়ের সেই দৃপ্ত মুখ এবং চোখঝলসানো দৃষ্টিওয়ালা দৃষ্টি মুছে গিয়ে সে স্থলে ভেসে উঠল সত্যদের সেই থিয়েটারের আসরে হৃদয়চন্দ্রের পাশে-বসা অপরূপ লাবণ্যবতী সাজ-সজ্জায় ঝলোমলো ছোটবউয়ের হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি। তার খুব কাছেই বসেছিল।

সুবাসী বললে—দেখ ওতে তোমাতে প্রায় সমবয়সীই হবে। আপনা-আপনির মধ্যে খেলাধুলো করতে গিয়েও তো কত কিছু হয়—তা তুমি সেই রকম কিছু ভেবে নিয়ে—

মন্মথ এবার বলে উঠল—না—না—না। তুমি বলো ও'কে—আমি দুঃখ মনে রাখব না। আর কোনো শাপ-শাপান্ত আমি করি নি। কিছু মনে রাখব না আমি।

—ওর কাছে কিছু টাকা নাও তুমি।

—না। তা আমি নেব না।

কথাটা বলেই মন্মথ পিছন ফিরলে এবং হনহন করে চলতে শুরু করল। পিছন থেকে সুবাসী ডেকে বললে—শোন শোন। ও ছেলে শোন। একটা কথা! দাঁড়াও!

মন্মথ দাঁড়াল না। চলে এসে হ্যারিসন রোড ধরে পশ্চিমমুখে চলতে আরম্ভ করল সে। হাতে তার হরচন্দ্রবাবুর ছোটপুত্রবধূর চিঠি। ক্ষমা চেয়েছে ওবাড়ির ছোটবউ।

অকস্মাৎ তার মন গভীর সহানুভূতিতে ভরে উঠল ওই মেয়েটির জন্য। অন্যায় করে ফেলে ক্ষমা চাওয়া তো সহজ কথা নয়। যে পারে সে-মানুষকে ক্ষমা না করে কি থাকতে পারে! বড়লোকের মেয়ে বড়লোকের বউ মুখে তার কাছে ক্ষমা চাইতে পারে নি—পত্র লিখেছে। পত্রখানা পড়বার জন্য তার আগ্রহের আর বাকী রইল না। পত্রখানা একবার ভালো করে দেখে খুলতে গিয়েও সে খুললে না।

না। পথে দাঁড়িয়ে পড়া সুবিধে হবে না। কোন্ দিকে যাবে ভাবতে গিয়ে চোখে পড়ল হাওড়া ব্রিজের মুখটা। বিখ্যাত হাওড়া ব্রিজ—জলের উপর বয়া ভাসিয়ে ব্রিজ বানিয়েছে। চলতে লাগল হাওড়া ব্রিজের দিকে। ব্রিজের পাশেই জগন্নাথ ঘাটের কথা মনে পড়ল তার। তার ভারী প্রিয় স্থানও বটে। বড়বাজারে হরচন্দ্রবাবুর বাড়িতে যতদিন রয়েছে ততদিন সে দিনান্তে একবার-না-একবার এখানে এসেছে। কোনোদিন হাওড়া ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে গঙ্গার দিকে চেয়ে থেকেছে, কোনোদিন জগন্নাথ ঘাটের চাতালে বসে থেকেছে।

ঘাটের উপরে চাতালে বসে সে চিঠিখানা খুললে। চমৎকার নীলচে চিঠির কাগজে মেয়ের হাতের লেখা চিঠি। বড় চিঠি নয় ছোটই বটে তবে খুব ছোটও নয়। হাতের লেখাটি কিন্তু সুন্দর। এমন হাতের লেখা সে প্রত্যাশা করে নি। বড়লোকের আদরিণী মেয়ে—বড়লোক উকিলের মাতাল বেশ্যাসক্ত ছেলের সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছে, যে মেয়ে খুব সাজগোজ করে সেন্ট মেখে এই স্বামীর সঙ্গে দিব্যি হাত ধরে গরবিনীর মতো বেড়ায়, থিয়েটার দেখতে যায়—তাও আবার পেশাদার থিয়েটারের সেই জালে ঘেরা তেতলায় মেয়েদের জায়গায় বসে নয়, একেবারে স্বামীর পাশে চেয়ারে বসে, তার হাতের লেখা মোটা মোটা টেরাবেঁকা হরফে আঁকাবাঁকা লাইনে লেখা হবে বলেই সে ভেবেছিল। কিন্তু সমান লাইনে গোটা গোটা সুন্দর হরফে লেখা চিঠিখানি দেখে বিস্মিত হয়ে গেল সে। আরও বিস্মিত হল সে এই দেখে যে গোটা চিঠিটায় দুটি ছাড়া বানান ভুল নেই।

গঙ্গার বুক বেয়ে ঠাণ্ডা জলো হাওয়া বইছিল ঝড়ের মতো। ভাদ্রমাসের বেলা তিন প্রহর—আকাশে এখন ক'দিন মেঘ কেটে রোদের পালা পড়েছে; এবং সে রোদ খুব চড়া রোদ। গঙ্গার বাতাসে চিঠিখানা থরথর করে কাঁপছিল—পড়া যাচ্ছিল না, তাই সে গঙ্গার দিকে পিছন ফিরে বসে নিজেকে আড়াল করে চিঠিখানা কোলের উপর রেখে পড়লে।

শ্রীশ্রীদুর্গামাতা সহায়

১৪ই ভাদ্র ১২৯২ সাল

শ্রদ্ধাস্পদমান্যবরেষু

'অসেশ' শ্রদ্ধা ও সম্মানপূর্বক নিবেদনমিদং—মহাশয় আমি আপনার নিকট অপরাধিনী হইয়াছি—আপনি ব্রাহ্মণ এবং নিষ্ঠাবান গুরুবংশের সন্তান—আপনাকে কটু কহিয়াছি দুর্বাক্য বলিয়া অপমান করিয়াছি। আপনার চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইয়া ভূমিতে পড়িয়াছে তাহা দেখিয়াছি। তত্রাপি আমার চৈতন্যোদয় হয় নাই। আমি নিজে ব্রাহ্মণকন্যা ব্রাহ্মণপত্নী বয়সেও আপনাপেক্ষা বড় হইব তত্রাপি আপনার মনোকষ্টের ফলে এবং আপনি অভিশাপ দিলে আমি সারা জীবন তাহাতে দগ্ধ হইব। ইহা আমার স্থির বিশ্বাস। ইহা ব্যতীত আমি গতকাল রাত্রে যাহা স্বপ্ন দেখিয়াছি তাহাতে আপনার প্রতি এইরূপ আচরণের জন্য আমার ভয় 'অনুসোচনা' ও মনস্তাপের আর সীমা-পরিসীমা নাই; আমার তদবধি মনের সকল সুখ-শান্তি বিগত হইয়াছে। আপনার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া লওয়া ছাড়া আর কোনো পথ আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। সেই কারণেই এই বাড়ি আসিয়া আপনার ঠিকানা সন্ধান করিয়া দেখিলাম আপনি জিনিসপত্রগুলি এখনও লইয়া যান নাই। সেই কারণে আপনার অপেক্ষা করিলাম কখন আপনি আসিবেন। সকল জনের সমক্ষে আপনার কাছে ক্ষমা চাহিতে পায়ে ধরিতে পারিতেছি না। বড়ই লজ্জা হইতেছে। সেই কারণে এই পত্র লিখিতেছি। পত্র লইয়া যাইতেছে

আমার বিশ্বাসিনী ঝি সুবাসী। তাহাকেও বলিয়া দিয়াছি আপনাকেও করজোড়ে মিনতিপূর্বক নিবেদন করিতেছি যে আপনি জগন্নাথ ঘাটের ওখানে গিয়া কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিবেন। আপনি গমন করিলে আমি এ বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গাড়িতে ওখানে যাইব এবং আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। মা গঙ্গাকে সাক্ষী করিয়া আমি ক্ষমা চাহিব এবং আপনি ক্ষমা করিবেন তবে আমার জীবনে শান্তি ফিরিয়া আসিবে। অধিক কি ; নিবেদন ইতি—

অপরাধিনী
ছোটবউ।

মনটা তার জুড়িয়ে গেল—একটা আশ্চর্য পুলকরসে আপ্লুত হয়ে গেল। গঙ্গার বুকের বাতাসের মতো একটি সুখের স্পর্শ তার সারা অন্তরটার উপর দিয়ে বইয়ে দিয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ সে চিঠিখানাকে হাতের মুঠোয় ধরে চোখ বুজে বসে রইল। চিঠির কাগজখানার মিষ্টি গন্ধ নিশ্বাসের সঙ্গে বুকের ভিতরটাকে আনন্দে ভরে দিচ্ছিল—তার বোজা চোখের দৃষ্টির সামনে ছোটবউয়ের মুখখানা ভাসছিল। সেটা তার সেদিনের সেই রাগে জ্বলন্ত আগুনের মতো দৃষ্টি এবং রাগে থমথমে মুখ নয় ; সে আর একদিনের দেখা মুখ। সেই সে ছোটবউকে প্রথম দেখেছিল। সেদিনও সে তেতলায় তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরখানার সামনে বারান্দায় রেলিংয়ের বুকে ভর দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। সেটা ছিল বর্ষার সময়। সারাদিনের মেঘাচ্ছন্নতা বাদলা বর্ষণ কেটে সেই সময়টায় মেঘ কেটে নীল আকাশ দেখা দিয়েছিল এবং রোদ উঠেছিল। ছোটবউয়ের রঙটা একটু চাপা—শ্যামলা মেয়ে, কিন্তু তাহলেও সে রূপসী। সে রূপকে সেদিন সেই বাদলাকাটা বিকেলের রোদে ঝলমল লাবণ্যে মাখামাখি করে দিয়েছিল। সেই মুখ মনে পড়ল তার।

—শুনছ!

চমকে উঠল মন্মথ ডাক শুনে। সুবাসী ডাকছিল তাকে। মন্মথ না না বলে চলে এলেও সুবাসী বলেছিল—চল না দেখে তো যাই। মুখে 'না' বললে তো হলটা কি? হাজার হলেও তো তোমার মতো একটা মেয়েতে একটা ছোঁড়াকে চিঠি লিখে একটা কাজ করতে বলেছে—দেখা করতে বলেছে—সে দেখা করবে না—তাই হয়!

ছোটবউ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল—চল্ তাহলে।

গাড়িখানা ভাড়ার গাড়ি। উপরে কোচবক্সে ভবানীপুরের বাড়ির দারোয়ান বসে ছিল ; সুবাসী তাকে বলেছিল—জগন্নাথ ঘাট হয়ে চল পাঁড়েজী। হুঁয়া গঙ্গাজল পরশ অরশ করকে যাব। সমঝালে?

গঙ্গার ঘাটে একটু এগিয়েই সুবাসী ঠিক দেখতে পেয়েছিল মন্মথকে। মন্মথ চিঠিখানা মুঠোয় চেপে ধরে চোখ বুজে যেন ধ্যানস্থ হয়ে আছে। ছোটবউ পিছনেই ছিল—সে তার দিকে ফেরে তাকিয়ে বলল—ওই দেখ! ছোটবউ দেখছিল—সে খুশী হয়ে বললে—চল্।

কাছে এসে সুবাসী তাকে ওইরকম চোখবোজা অবস্থায় দেখে একটু হেসে মৃদুস্বরে ডাকলে—শুনছ!

চমকে উঠে চোখ খুললে মন্মথ এবং ঠিক সামনেই সুবাসী এবং ছোটবউকে দেখে কি করবে কি বলবে ভেবে উঠতে পারলে না। ছোটবউ হাত জোড় করে চোখ নত করে দাঁড়িয়ে রইল। সুবাসীকে বললে—সুবাসী বল্ এই মা গঙ্গা সাক্ষী রেখে আমার সব অপরাধ ক্ষমা করতে হবে।

মন্মথ বললে—না—না—না, অপরাধ তো আমি নিই নি। সত্যি বলছি আপনার কোন অপরাধ হয় নি। সেদিন—সেদিন বরং আপনাদের পাশে—

—না। ছোটবউ ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললে—না। তাতে আপনার কোনো অপরাধ হয় নি। অপরাধ আমার—।

সুবাসী বললে—কাজ কি বাপু না-না করে। তুমি বাপু বল না ওকে তোমার অপরাধ আমি গঙ্গা সাক্ষী রেখে ক্ষমা করছি। ওই দেখ ও আজ উপোষ করে আছে। চান করে চুলে চিরুনি দেয় নি। বেরতো করার মতো কাণ্ড করেছে। ব্রহ্মশাপকে ওর ভারী ভয়।

মন্মথ তাকিয়ে ছিল ছোটবউয়ের মুখের দিকে। অপরূপ সুন্দর মুখ—ছোট কপাল টানা টানা দুটি চোখ পাতলা দুটি ঠোঁট, তেমনি সুন্দর চিবুক, শুধু খুঁত আছে নাকে—নাকটি একটু খাটো কিন্তু তাইতেই যেন রূপ তার বেড়ে গিয়ে অপরূপ হয়ে উঠেছে। সেই ডাগর চোখ দুটি তখন জলে ভরে টলটল করছে, পাতলা ঠোঁট দুটির সঙ্গে সুন্দর চিবুকটি মৃদু কম্পনে কাঁপছে ; এলো চুল—সে একরাশ এলো চুল পিঠে পড়ে আছে—গঙ্গার বাতাসে গুচ্ছ গুচ্ছ হয়ে উড়ছে ; ছোটবউ হাত দুটি জোড় করলে এরই সঙ্গে—।

মন্মথ আর পারলে না থাকতে, সে বললে—আমি ক্ষমা করেছি—ক্ষমা আমি চিঠি পেয়েই করেছি—গঙ্গা সাক্ষী রেখেও তা' বলছি—ক্ষমা করেছি আপনাকে।

—আমি আপনাকে প্রণাম করি—

—না। না—। পিছিয়ে গেল মন্মথ—

—আমি মিনতি করছি—আপনার পায়ের ধুলো নিতে দিন।

—না—আপনি আমার থেকে বয়সে বড়। আপনিও ব্রাহ্মণের মেয়ে ব্রাহ্মণবধূ—আপনার প্রণাম আমি নিলে আমার অপরাধ হবে। আপনিই বরং আমার থেকে বড়—আমি আপনাকে প্রণাম করব।

—না না। আপনি প্রণাম করলে আমি ফেটে মরে যাব। বয়সে বড় হলে কি হবে। না। না।

ছোটবউ পিছিয়ে এসে দাঁড়াল সুবাসীর পিছনে।

মন্মথ বলল—আপনি আমার দিদি হবেন ?

ছোটবউ বললে—না। দিদি হতে পারব না আমি। না।

মন্মথ বললে—তাহলে কি বলে ডাকব আপনাকে ?

ছোটবউ বললে—আমি আপনার যজমান হব। আমার বাড়িতে পুজো-পার্বণে আসবেন —আমি প্রণাম করব।

—না। আমি পুজো অর্চনার কাজ জানি কিন্তু তা' তো করি না। করবও না।

—বেশ, ব্রাহ্মণ হিসেবে ডাকব। খাওয়াব দক্ষিণে দেব—

—না আপনার প্রণাম আমি নেব না।

—তাহলে ? ছোটবউ কাতর হয়ে তাকালে তার দিকে।

সুবাসী বললে—তার থেকে আমি একটা কথা বলি। কি ?—বলি ?···এই গঙ্গার ঘাটে দু'জনে দু'জনের গঙ্গাজল হও, কেমন ? দিদি না ভাই না—গঙ্গাজল। কেমন ? দাঁড়াও।

সুবাসী মুহূর্তে যেন মেতে উঠল। বললে—এস দু'জনে এস—একেবারে ওই জলের ধারে এস—দু'জনে গণ্ডূষে জল নাও। তুমি ওকে দাও আর তুমি একে দাও। কেমন ? তারপর হাত ধর দু'জনের।

কোথায় ভেসে গেল দু'জনের আপত্তি বাধাবিঘ্ন—একটি পরমানন্দে অভিষিক্ত হয়ে দু'জনে দু'জনের হাত ধরলে।

সুবাসী বললে—বল মা গঙ্গাজল আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

ছোটবউ বললে—গঙ্গাজল আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

সুবাসী বলল—তুমি বল—ক্ষমা করেছি গঙ্গাজল। তোমার সব দোষ মা গঙ্গার জলে ভেসে যাক।

তাই বললে মন্মথ।

সুবাসী বললে—এখন চল। আজ আর না। এখন পাথুরেঘাটা গিয়ে দুটো কিছু মুখে দেবে চল।

ছোটবউ বললে—আজ আসি। তোমাকে কিন্তু আমার বাড়িতে আসতে হবে। এ বাড়ি থেকে চলে যাবে, সে ভালোই করবে। আমার সৎ-শাশুড়ী ভালো লোক না। ভবানীপুরের বাড়িতে নেমন্তন্ন করব। আমার ঠিকানায় তুমি চিঠি দিয়ো, কেমন? চিন্ময়ী দেবী। না। আমার ভালো নাম চিন্ময়ী—ও নামে চিঠি তুমি দিয়ো না। চপলা দেবী বলে চিঠি দিয়ো—ওটা আমার বাপের বাড়ির ডাকনাম। কেমন—?

চিন্ময়ী দেবী। চপলা দেবী। গঙ্গাজল।

ওই নাম তিনটে যেন মনের মধ্যে গঙ্গার জলের ঢেউএর শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আছাড় খেয়ে খেয়ে পড়ছিল।

চিন্ময়ী—চপলা—গঙ্গাজল। ছলাৎ! ছলাৎ! ছলাৎ!

পকেটে তার আরও তিনখানা চিঠি। একখানা হরচন্দ্রবাবুর একখানা মাধববাবুর একখানা হেডমাস্টার মশায়ের। চিঠিগুলি খুলে খুলে একখানা একখানা করে পড়ে গেল। শেষে আবার পড়লে চিন্ময়ীর চিঠি। দু'খানা চিঠি বাতিল হয়ে গেছে। মানে নেই। চপলার সব দোষ গঙ্গা জলে ভেসে গেছে।

আবার সে চিঠিগুলি বুকপকেটে পুরলে। তারপর এই আশ্চর্য আনন্দে অভিভূত হয়ে বসেই রইল। অনেকক্ষণ বসে রইল। তারপর সে উঠে এসে বড়বাজারের বাড়িতে ফিরে এলো।

রমণ সরকার তার জিনিসপত্রগুলি গুছিয়েই রেখেছিল, সে বললে—এস এস—তোমার জন্যে আমি বসে রয়েছি। ঝাঁকামুটে না, বাবু ফিরেছেন তো, তিনি বললেন—মালীকে বলে দাও, মাথায় করে সব দিয়ে আসবে। আর. চিঠিতে তোমাকে লিখেছেন সব। মুখেও বলেছেন—কিছু যেন মনে করো না, ছোট বউটি আমাদের বড়ই বদরাগী, বড়ঘরের খুব আদরের মেয়ে, রাগলে আর জ্ঞান থাকে না। উনি কি করবেন। নিরুপায়! তবে তুমি ওই জ্যোতিপ্রসাদবাবুদের বাড়ি বড় যেও না। ওতে তোমার ভালো হবে না।

এসব কথা তার কানেই ঢুকল না। সে ভাবছিল গঙ্গা জলের কথা—চপলা ছোটবউয়ের কথা। ভাবতে ভাবতেই সে আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরে দ্বিজু মুন্সীর বাড়ি এলো। দ্বিজু মুন্সীর কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তবে যাবে মাধববাবুর বাড়ি। পথে জ্যোতিপ্রসাদবাবুর বাড়ির সামনে দাঁড়াল—সত্যকে বলে যাবে নাকি?

মালীটা বোঝা মাথায় করে পিছনে আসছিল—সে জিজ্ঞাসা করলে—এই বাড়ি অছি বাবু?

বাড়ির ভিতর থেকে গান ভেসে আসছে। ভিতরে গান গাইছে সত্যর বোনেরা কোরাসে। মালতীর গলাখানি এত ক'খানি কণ্ঠস্বরের মধ্যেও চেনা যাচ্ছে। মালতী!

রমণ সরকার বললে—ওদের সঙ্গে মিশো না। হরচন্দ্রবাবুও বারণ করেছেন! এরা আচম্বর্ধ খুঁত ধরা লোক। বলে, আকাশে চাঁদ উঠলে সে দিকে তাকিয়ো না—জ্যোৎস্নার আলো চোখে লাগলে চোখ খারাপ হয়ে যাবে!

এরপর বাকী পথটা একবার মালতী একবার চিন্ময়ীকে মনে পড়ল। চিন্ময়ী—চপলা—ছোটবউ—গঙ্গাজল।

মালতী মলি। মালতী মলি। হঠাৎ ওই নামটা এরই মধ্যে মনে পড়ে গেল।

আট-ন মাস পর।

গরমের সময়; জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। মন্মথ গোবিন্দপুরে আপনাদের বাড়িতে কোঠাঘরের মাটির মেঝের উপর একখানা মাদুর পেতে বুকে বালিশ দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। দুপুরে গরম বাতাসের হলকা বইছে। বাড়ির পিছনেই যে বাগানটা সেই বাগানের গাছগুলোর ঝলসে ম্লান হয়ে যাওয়া পাতাগুলির দিকে তাকিয়ে ছিল। আমগাছগুলোয় এবার খুব আম এসেছে। লম্বা বোঁটায় থোকবন্দী আম ধরে রয়েছে এবং এই গরম বাতাসে দুলছে। ফল পাকবার সময় হয়েছে পাকতে শুরু করেছে। রঙও ধরেছে। মধ্যে মধ্যে একটা দুটো আম টুপ-টাপ করে খসে পড়ছে। বাগানে বাগদীমায়ের বিধবা মেয়েটা 'তরি' অর্থাৎ তরঙ্গিণী তার ভাইদের সঙ্গে আমবাগান আগল দিচ্ছে। দুটো বেশ বড় এবং দুর্লভজাতের কালোজামের গাছ আছে, তার উপর মন্মথর খুব লোভ—সে গাছ দুটোতেও এবার ডালপালা ভেঙে ফল এসেছে ; এখনও ; পাকবার সময় হয় নি ; যখন পাকবে তখন একেবারে ঝাঁক দরুনে পাকবে। গরম বাতাস খোলা জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যেও ঝলকে ঝলকে উত্তাপ বইয়ে দিচ্ছে। মন্মথর বিছানা থেকে একটু দূরে এককোণ ঘেঁষে আর একটা বিছানায় বসে আছেন মন্মথর বাবা গঙ্গাধর ভটচাজ। গঙ্গাধর দিনে কখনও ঘুমোন না। শাস্ত্রের নিষেধ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। তাঁর বিছানার ওধারেই দেওয়ালের গায়ে একটা দরজার মধ্য দিয়ে পাশের ঘরখানায় কিছুটা দেখা যাচ্ছে। ঘরখানা ছোট। কোঠা-ঘরখানার উপরে-নিচে দু'খানা করে চারখানা ঘর। উপরের দু'খানা ঘরের ছোটখানায় বাক্স তোরঙ্গ থাকে, একটা সিন্দুক আছে তাতে বাসনকোসন থাকে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাড়ি বাসনকোসনের সাম্রাজ্য। শুধু পিতল কাঁসার বাসন নয় রুপোর বাসনও পেয়ে থাকেন। রুপোর বাসন খাট-বিছানা যা শ্রাদ্ধে সুখশয্যা হিসেবে গুরুর প্রাপ্য তা' অবশ্য সবই বিক্রি করে দেন। কি হবে রুপোর বাসনে ভালো খাটে বিছানায়। এই ঘরখানাতেই এখন মন্মথর ছোটমা-অর্থাৎ বিমাতা কাদম্বরী শুচ্ছেন। সাধারণত গঙ্গাধর এবং কাদম্বরী বড় ঘরখানাতেই শুয়ে থাকেন ; এখন মন্মথ বাড়ি এসেছে বলে কাদম্বরী তার নবজাত পাঁচমাসের ছেলেটিকে নিয়ে ওই ছোট ঘরখানাতে শুচ্ছে আর গঙ্গাধর ও মন্মথ বাপ বেটায় বড় ঘরে শুচ্ছেন।

দীর্ঘকাল পর মন্মথ এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি এসেছে। এবং এসেছে বাপের বিশেষ তাগিদে। সেই একবার এসেছিল গঙ্গাধর যখন দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করেন—তখন। তারপর সেই যে চিড়িয়ার মোড় থেকে গঙ্গাধর কলকাতা না-এসে দেশে ফিরে গেলেন তখন থেকে আর মন্মথ দেশে ফেরে নি। গঙ্গাধরও খুব আগ্রহ করে আসতে লেখেন নি। মন্মথও দেশে আসবার জন্য খুব ব্যগ্র ছিল না।

গঙ্গাধর দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন তাতে সাধারণভাবে লজ্জার কোনো কারণই ছিল না। সমাজে কুলীনদের দশটা পাঁচটা বিবাহ একান্তভাবে অতি সহজ চলিত প্রথা। স্ত্রী বিদ্যমানেই বিবাহ করে কুলীনেরা বড়লোকেরা। সুতরাং স্ত্রী বিয়োগের পর বিবাহ করার জন্য গঙ্গাধরের লজ্জা অনুভবের কোনোই হেতু ছিল না কিন্তু গঙ্গাধর বিচিত্র চরিত্রের মানুষ—তিনি লজ্জা অনুভব করতেন। বিশেষ করে ছেলের কাছে এবং ছোটভাই জটাধরের কাছে। জটাধর এবং কৃষ্ণভামিনী পত্র মারফত গঙ্গাধরকে লজ্জিত করবার জন্য চিঠি লিখেছিলেন। শুধু তাই নয় গোবিন্দপুরে জটাধর জননী এস্টেটের নায়েবকে কৃষ্ণভামিনী

হুকুম দিয়েছিলেন যেন বড়কর্তার এই দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীকে মায়ের পূজার্চনা এবং গোবিন্দপুরে তিথি-নৈমিত্তির পালনে কোনো প্রকার কর্তৃত্ব করতে দেওয়া না-হয়।

কাদম্বরী ভালোমানুষের মেয়ে, না-হলে সে কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে পারত। কিন্তু তা সে করে নি। স্বামী বলেছিলেন—"ছি ছি ছি। লজ্জার কথা নতুন বউ; ওকথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। ছি ছি ছি!"

এইটাই অর্থাৎ জটাধরের এই মনোভাবটিকেই তিনি মন্মথর মনের কথা বলে ধরে নিয়েছিলেন। এবং আগ্রহ করে আসতে লেখেন নি। জটাধর মন্মথকে নিয়ে গেছে—তার সন্তান নেই—মন্মথই তার সন্তানের স্থান জুড়ে বসেছে এই ধরে নিয়ে মনে মনে বলেছিলেন—তাই থাক মন্মথ। লেখাপড়া শিখে যেন কাকার যোগ্য উত্তরাধিকারী হতে পারিস, এই আশীর্বাদ করি।

কাদম্বরী একখানা চিঠি লিখেছিল কিন্তু তার উত্তর পায় নি। চিঠিখানায় লিখেছিল—তুমি আমার ছেলে নও আমার বাবা; আমি তোমার মেয়ে হব।

এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে সে গ্রামে ফিরে এলো অনেকদিন পরে। কাকার বাড়ি ছেড়ে যখন সে বড়বাজারে হরচন্দ্রবাবুর বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিল তখন বাবাকে পত্র লিখে জানিয়েছিল—"আমি কাকাবাবুর বাড়ি হইতে চলিয়া আসিয়াছি। বর্ধমান জেলার অধিবাসী প্রতিষ্ঠাপন্ন হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্তবাবু হরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে দয়া করিয়া আশ্রয় দিয়াছেন। কাকীমা আপনার এবং ছোটমা সম্পর্কে কটু কথা বলেন। তাহা ছাড়া আমি এক বন্ধুর বাড়ি যাই বলিয়া আমি ব্রাহ্ম হইয়া যাইতেছি ভাবেন। সেই কারণে আমি নিজেই চলিয়া আসিয়াছি। শ্রীযুক্ত হরচন্দ্রবাবু ধার্মিক লোক, শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য। আপনি তাঁহাকে চিঠি লিখিয়া জানিতে পারেন—আমি ব্রাহ্ম হই নাই বা হইব না। হেডমাস্টার মহাশয়কেও পত্র লিখিলে তিনিও এই কথাই লিখিবেন।"

উত্তরে গঙ্গাধর প্রায় মাস তিনেক পর লিখেছিলেন—"তোমার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। আমি মোটামুটি সব জানিয়াছি। এখানে তোমার খুল্লতাতের নায়েব মহাশয় প্রচার করিতেছেন যে, তুমি ব্রাহ্ম পরিবারের সংস্রবে জড়াইয়াছ। তোমার খুল্লতাত আমাকেও একথা লিখিয়াছেন। লিখিয়াছেন—আপনাকে সংবাদ জানাইয়া আমি দায়িত্বে খালাস হইতেছি। কিন্তু তোমাদের হেডমাস্টার মহোদয় এবং শ্রীযুক্ত হরচন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন যে তুমি মোটামুটি স্বধর্মে অধিষ্ঠিত আছ। অনেক প্রশংসাও করিয়াছেন। তাহাতেই আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি। অন্যথায় বাড়ি চলিয়া আসিতে লিখিতাম। আমি তোমাকে ব্রহ্মদীক্ষা দিয়াছি, গায়ত্রী মন্ত্র দিয়াছি। তুমি কুলধর্মগত শিক্ষা গ্রহণ কর নাই। এ যুগে পুরাতন কালের শিক্ষা অচল হইয়াছে। সুতরাং যে-শিক্ষা লইতেছ তাহা যত্নপূর্বক আয়ত্ত করিবে গ্রহণ করিবে। অধিক কি লিখিব।

আমার আশীর্বাদ লইবা। ইতি—"

মাধববাবুর আশ্রয়ে এসে আবার একখানা পত্র লিখেছিল। উত্তরে গঙ্গাধর লিখেছিলেন—"এ সংবাদ আমি অবগত আছি। কোনো একজন তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি এ সংবাদ জানাইয়া লিখিয়াছেন যে এবারও সেই ব্রাহ্ম সহপাঠী সত্যপ্রসাদদের সংস্রবের জন্য হরচন্দ্রবাবু তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। আমি তোমাদের হেডমাস্টার মহোদয়কে পুনরায় পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি আমাকে নিশ্চিন্ত করিয়াছেন। লিখিয়াছেন—এমত সম্ভাবনা কোনোপ্রকারেই দেখি না। আপনার পুত্র আমাদের স্কুলের অন্যতম উৎকৃষ্ট ছাত্র। একক্ষণে তাহাকে কোনোপ্রকারেই বিচলিত করিবেন না। পরীক্ষা হইয়া গেলে তাহাকে গৃহে লইয়া

যাইবেন। তখন নিজেই যাহা হয় বিচার করিয়া করিবেন। অতএব তুমি মনোযোগপূর্বক বিদ্যাভ্যাস করিয়া পরীক্ষা প্রদান করিয়া এবাটী চলিয়া আসিবে। শ্রীযুক্ত মাধববাবু মহাশয়ের নাম আমি জানি। তিনি ভাগ্যবান পুরুষ এবং মহাশয় ব্যক্তি। তাঁহার অনেক কীর্তিকলাপ। তাঁহার আশ্রয়ে তোমার মঙ্গলই হইবে। তবে সাবধান থাকিবে যেন এখানেও কোনোপ্রকার বিঘ্নসৃষ্টি না-হয়।" তার বাবাকে ব্রাহ্মসংস্রবের কথা জানিয়ে যে পত্র লিখেছিল সে যে রাধাশ্যাম তা তার বুঝতে একমুহূর্ত দেরি হয় নি।

এরপরই আর একখানা চিঠি সে পেয়েছিল তার বাবার কাছ থেকে। বাবা লিখেছিলেন —"তুমি শুনিয়া সুখী হইবা যে গত ২৫ অগ্রহায়ণ তোমার ছোটমাতা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন। তোমার ছোটমাতা তোমাকে লিখিতে বলিলেন যে রামচন্দ্রের অনুজ লক্ষ্মণ একই দিনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তোমার লক্ষ্মণ ষোলবৎসর পর ভূমিষ্ঠ হইল। সে তোমার সেবার জন্যই আসিয়াছে। এখানে তোমার খুল্লতাত মহাশয় এবার একখানি মহল ক্রয় করিয়া জমিদার হইলেন। উক্ত মহলের পুণ্যাহ উপলক্ষে খুবই ঘটা সমারোহ হইল। জটাধর বা বধূমাতা দুইজনের কেহ আইসেন নাই। শুনিলাম ছোটবধূমাতা অন্তর্বত্নী। মাস দুইয়েকের মধ্যেই সন্তান হইবে। তুমি একবার খোঁজখবর করিবা।"

সে সবই করেছে। কাকার বাড়ি সে গিয়েছিল। কাকা মশায় বিচিত্র চরিত্র লোক। মানুষ সামনে এলে একেবারে বেসামাল মতো এলিয়ে পড়েন—যেন গলে যান। কোথায় রাখবেন কোথায় বসাবেন কি বলবেন খুঁজে পান না। হইচই করে করে সব গোলমাল করে দেন—হা-হা করে হাসেন। মন্মথকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন—বাবা রে আমার সোনা রে আমার! মানিক রে আমার! তোর কি প্রশংসাই শুনলাম রে—ওঃ সে এক্কেরে 'যা-তা'। বুঝলি থিয়েটারের রিহারশ্যালে—বুঝলি—সব বাঘা বাঘা অ্যাক্টর অ্যাকেট্রেসের সামনে সিংহীবাবুদের ছেলে প্রশংসা করলে; ছোকরা মানুষ, অমর দত্তর আড্ডায় যায় আসে—অঢেল টাকা—তোদের সঙ্গে পড়ত—বিভূতি সিংহী নাম। আমার নাম শুনেই সে বলল—আপনি তো মনুর কাকা—মন্মথ ভটচায্যি—হিন্দু ইস্কুলে পড়ে—। আমি বললাম—তা' আপনি কি করে চিনলেন? বললে—আমি যে ওর সঙ্গে এককাসে পড়তাম। আশ্চর্য ভালো ছেলে। যেমন মেমরি.তেমনি ইন্টেলিজেন্স—তেমনি বিনয়, সংস্কৃতে তো একটা গোটা পণ্ডিত—।

সে একঘর কথা বলেছিলেন। খুড়ীমা শক্ত মানুষ। বলেছিলেন—তাও ভালো মনু যে তোর মনে পড়েছে আমাদের কথা। তা হ্যাঁরে এমনি করেই কি ওই ব্রাহ্মবাড়ির মায়াতে পড়তে হয়!

সে বলেছিল—না খুড়ীমা এর মধ্যে ওসব কিছু নেই। তোমরা আমাকে মিছে সন্দেহ করছ। কাকাবাবুরও দু'চারটে কেস জ্যোতিপ্রসাদবাবুর কাছে থাকে—উনিও তো যান আসেন শুনেছি—

খুড়ীমা কথা কেড়ে নিয়ে বলেছিলেন—দেখ্ ও'র কথা তুলিস নে। উনি কারবারী মানুষ—অনেক স্থানে যান, বাড়ি ফিরে গঙ্গাজলে গোবর ঠেকিয়ে সেই এক গণ্ডূষ খেয়ে তবে বাড়ি ঢোকেন। তুই তো জ্যোতিপ্রসাদবাবুদের বাড়ি শুধু জল নয় জলখাবারও খাস শুনেছি।

মনু রেগেছিল মনে মনে, কিন্তু মুখে হেসে বলেছিল—তাই খাই খুড়ীমা। আর গোবর ঠেকানো গঙ্গাজলও খাই নে। একথা ঠিক। তাই তো সেদিন নায়েববাবু সত্যদের বাড়ির দরজায় আমাকে কথাটা বলবামাত্র উলটো মুখে পা চালিয়েছিলাম, আর এবাড়ি আসি নি।

খুড়ীমা বলেছিলেন—রাধাশ্যাম আমাকে সব খবর দেয়, বাবা—আমি সব খবর রাখি। আজও, জিজ্ঞেস করনা কোথায় কোথায় গিছলে সব জানি আমি। আজকের বলতে পারব না।

কালকের সব খবর জানি। রাধাশ্যাম কালও বলে গেছে সব। মাধববাবু কাল তোমার মুখে ভাগবত পাঠ শুনে খুব খুশী হয়েছেন—বলেছেন রোজ রাত্রে তুমি ও'কে পাঠ করে শোনাবে—উনি তোমাকে নাকি মাসে দশ টাকা করে দেবেন। তা' তুমি তো বাবা কাকার কাছে এসে বললেই পারতে কাকা তুমি আমাকে পড়ার খরচটা দাও। আমি মেসেটেসে থেকে পড়ি। গোবিন্দপুরে তো কাকাকে দিব্যি বলেছিলে—কাকাবাবু আমাকে কলকাতা নিয়ে যাবেন আমি ইংরিজী লেখাপড়া শিখব। কই, কোনো লজ্জা তো লাগে নি, কোনো মান তো খোয়া যায় নি—

শুনতে শুনতে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করেছিল মন্মথ, ইচ্ছে হয়েছিল তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরে হনহন করে চলে আসে অথবা চিৎকার করে বলে ওঠে—খু—ড়ী—!

কিন্তু তা করে নি খুব ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছিল কতক্ষণে ছোট-খুড়ীর কথা শেষ হয়! ছোটখুড়ীর কথা শেষ হবার নয়। তবুও নিশ্বাস নিতে সময় চাই, কথা খুঁজে নিতে সময় চাই। তেমনি একটা ফাঁক পেয়ে মন্মথ বলেছিল—ভুল হয়ে গেছে খুড়ী। তখন ইংরিজী লেখাপড়া শিখে জজ ম্যাজিস্ট্রেট উকিল প্রফেসর হবার এমন রঙ লেগেছিল যে বাবাকে জিজ্ঞাসা না-করেই কথাটা কাকা মশায়কে তোমাকে বলেছিলাম। তবে তার জন্যে তোমাদেরকে আমি আমার বাবা আমার ছোটমা সবাই দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করছি। তোমাদের অনেক বাড়-বাড়ন্ত হোক, তোমাদের বংশধর আসছে সে দীর্ঘজীবী হোক—মস্ত বড় মানুষ হোক। এখন আর ঋণ বাড়ানোটা ঠিক হবে না। তাই চলে গিয়েছি।

বলে সে চলে এসেছিল!

খুড়ী বলেছিল—হ্যাঁরে বটঠাকুরকে লিখতে লজ্জা লাগে—তা' তুই লেখ না যাতে বাড়ির লক্ষ্মীজনার্দন আর রাধাবিনোদের অংশ আবার আমাদের ফিরে দেন! দেখ্ এবার তো আমার জলপিণ্ডির আধার হবে সন্তান হবে, আর পৈত্রিক ঠাকুরের ভাগ থাকবে না—এটা কেমন মন খুঁতখুঁত করছে। বটঠাকুর বিয়ে করাতে খুব কড়া চিঠি লিখেছিলাম—আর তোর ছোটমার দুই মাসী আমাকে বাপ তুলে কথা বলেছিল তাই সামলাতে পারি নি। তা' তুই লিখবি? আর খুড়োর কাছে মাসে মাসে পড়ার খরচ নিয়ে পড়। লোকের বাড়ি ভাত মেগে খাবি, তুই জে ভটচাজের ভাইপো—

—বাবাকে লিখব তোমার কথা। আর পড়ার খরচ আমি নেব না খুড়ী—এই ক'বছর যে ভাত আমি খেয়েছি তা' আজও হজম হয় নি। আর না।

—পরের ভাত চেয়ে তো খাচ্ছিস? হর চাটুজ্জে উকিলের ভাত হজম হয়েছে?

সারা দেহমন জ্বলে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে চপলাকে তার গঙ্গাজলকে মনে পড়েছিল। চপলার ভালো নাম চিন্ময়ী। তবে গঙ্গাজল আশ্চর্য মেয়ে। হরচন্দ্রবাবুর বিনত দৃষ্টি মনে পড়েছিল। ফলে জ্বলে ওঠা মনের ও জ্বালাধরা দেহের সব আগুন নিভিয়ে গিয়েছিল এক মুহূর্তে। সে বলেছিল—বলতে আমারও আশ্চর্য লাগছে—শুনে তোমারও আশ্চর্য লাগবে খুড়ী যে হরচন্দ্রবাবুদের অন্নের একটি কণাও আমার হজম না-হওয়া হয় নি। ঠাট্টা করে খুড়ী বলেছিল—বলিস কিরে!

উত্তেজিত হয়ে মন্মথ অকস্মাৎ যেন কোথা থেকে আশ্চর্য এক প্রগল্‌ভতা খুঁজে পেয়েছিল—খালিহাত মানুষের হাতে একটা লাঠি বা অস্ত্র কেউ যুগিয়ে বা ধরিয়ে দেওয়ার মতো কথা যেন কেউ যুগিয়ে দিয়েছিল, সে বেশ সুর দিয়ে কথাগুলি বলেছিল, বলেছিল—সে তুমি বুঝতে পারবে না খুড়ী তবে তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলতে পারি হরচন্দ্রবাবুর বাড়ির অন্ন জল মান অপমান সব হজম হয়ে গেছে বিদুরের কলার খোসার মতো!

বলে আর দাঁড়ায় নি—হনহন করে বেরিয়ে চলে এসেছিল, আসবার সময় কাকা জটাধর-

বাবুর সঙ্গে দেখাও করে নি। আসবার সময় মনে মনে বলেছিল সে আর আসবে না। এবং পড়াশুনা করে তাকে বড় মানুষ হতেই হবে। মস্ত বড় ব—ড় মানুষ! তার কাকা জটাধর ভট্‌চাজ—মিস্টার জে ভট্যাচারিয়া থেকে অনেক বড়। অর্থে বড় সম্মানে বড় গুণে বড় জ্ঞানে বড়। বামুনে জ্ঞান গুণ নয় একালের অর্থাৎ ইংরিজী লেখাপড়ার জ্ঞান ও গুণ।

গোবিন্দপুরে জটাধর জননী প্রতিষ্ঠা করেছে খুড়ো; এস্টেট তৈরি করেছে; কলকাতায় ব্যবসা ফেঁদেছে। এসবের চেয়েও অনেক বড় কিছু করবে সে।

বিচিত্র পন্থায় বিচিত্র যোগাযোগে সে যুক্ত হয়েছিল মাধববাবুর সঙ্গে। মাধববাবুর আশ্রয় নিত্য তাকে প্রলুব্ধ করত। এবং ও অনেক বড় কিছু করবে এই আকাশ-কুসুমটিকে কোনো দৈবী মায়ায় যেন দলের পর দলে ফুটিয়ে যেত।

মদন মিত্তির লেনে মাধববাবুর ব্যানার্জী কোম্পানীর ভাড়াকরা বাড়িতে আধা মেস আধা বাসা। মাধববাবু নিজে থাকেন, তাঁর বড়ছেলে থাকে, ছোটজামাই থাকে, বড় জামাইও থাকেন। বড়মেয়ে থাকে ছোটমেয়ে থাকে। এ ছাড়া তাঁর আপিসের কর্মচারীরা থাকেন জন আষ্টেক। এ ছাড়া তাঁর গ্রামের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর জন পাঁচেক থাকেন—তাঁরা তাঁর কর্মচারী নন, তাঁরা সব সরকারী চাকুরে। কেউ জি. পি. ও-তে কাজ করেন, কেউ পি. ডবলু. ডি.-তে কেরানী, একজন আছেন পোস্টমাস্টার; একজন কাস্টমস্‌ হাউসের কেরানী। তা ছাড়া গ্রামের চাকুরিসন্ধানী লেখকের আসা-যাওয়া লেগেই আছে। চাকরির জন্য মাধববাবুর বাসায় এসে তাঁর পায়ের গোড়ায় ঢিপ করে প্রণাম করে দাঁড়ালেই হল। মাধববাবু কোনো কলিয়ারীতে পাঠিয়ে দেন। বড়বাজারে হরি চাটুজ্যে কয়েকটা দোকানে খাতা লেখে—সেও এই বাসাতে থাকে। এর ওপরেও কুটম্ব-স্বজনের আসা যাওয়া আছে। কেউ হাইকোর্টে মামলা নিয়ে আসেন, এঁরা দেশের বর্ধিষ্ণু সম্পত্তিশালী লোক, কেউ বাজার হাট করতে আসেন বাড়িতে বিয়ে বা শ্রাদ্ধ বা পৈতে ইত্যাদি উপলক্ষ্যে।

বাসায় দুই তলাতে সবশুদ্ধ কুড়িখানা ঘর, এ ছাড়া ছাদে চিলেকোঠার ঘর আরও দু'-খানা। কুড়িখানা ঘরের বাড়ি—দুটো উঠোন, দু'মহলা দুটো সিঁড়ি।

মাধববাবুর বার্ষিক আয় তিন লক্ষ টাকার উপর। তিন লক্ষ টাকা আসে কলিয়ারী থেকে। এ ছাড়া বাড়িতে অর্থাৎ দেশে বীরভুম জেলায় চাষবাস জমিদারি এ সবের আয়টায় অনেক। হাজার বিশেক জমিদারির আয়, চাষের আয় ধান পান ফলপাকড় পুকুরের মাছ প্রভৃতির আয় তো কেউ ধরেই না।

মাধববাবুও জীবন আরম্ভ করেছিলেন মাসে পাঁচ টাকা মাইনেতে। তখন বয়স তাঁর সবে সতের বছর। তখন পড়াশোনার সুবিধে ছিল না। পাঠশালায় পড়ে খানিকটা পার্সী শিখে লোকে মোক্তারি করত, আরও একটু বেশী পড়াশোনা করে লোকে উকিল হত।

নিজের সেই জীবনের গল্প বলতেন তাকে। বলতেন—দেখ আমার বাবা মারা গেলেন যখন তখন ছেলেমানুষ আমি। মা আমাকে আর আমার দুটি বোনকে নিয়ে যে-কষ্টে পড়েছিলেন সে ঠিক বলে বোঝানো যায় না। এর উপরে বখে গেলাম। বিয়ে হল। শেষে একদিন মায়ের কান্নায় চৈতন্যোদয় হল। খুব সিদ্ধি খেয়ে প্রায় পাগল হয়ে গিছলাম—জ্ঞান হয়েছিল দু'দিন পর, সুস্থ হতে লেগেছিল পনের দিন। সেই সময় আমাদের গ্রামে দলুবাবুর জামাই এসেছিলেন। রানীগঞ্জে চাকরি করতেন বাঙ্গাল কোল কোম্পানির কয়লা-কুঠিতে তাঁরই সঙ্গে চলে এলাম—চাকরি করব। মুন্সীর কাজ। মানে মালকাটাদের কাটা কয়লার হিসেব করার কেরানী। পাঁচ টাকা মাইনে। সেই করতে করতে এই। বুঝেছ মন্মথ ভাগ্যকে আমি মানি। খুব মানি তবে তার সঙ্গে একটা কথা বলি—ভাগ্য যত ভালো হোক

তার সঙ্গে যদি তুমি তোমার চেষ্টা আর নিষ্ঠা যোগ করে দাও তাহলে আগুনে ঘি পড়ে। চুলো হোমকুণ্ড হয়ে যায়। মাথায় পাগড়ি বেঁধে হাতে লাঠি নিয়ে গোটা মানভুম ঘুরেছি হে। সাঁওতালদের বাড়ি বাড়ি গিয়েছি—তাদের বিশ্বাস করিয়েছি যে, কয়লাখাদে জাত যায় না, মানুষ মরে না, নিচে ওই কলের বাক্সতে চেপে নেমে গিয়ে মানুষ আবার উঠে আসতে পারে। সে খুব কঠিন কাজ! সে কালে খুব কঠিন ছিল!

একটু হেসে বলতেন—আমাদেরই ভয় লাগত! যেদিন আমি প্রথম খাদে নামি সেদিন সে কি বুক ধড়াস ধড়াস! ইচ্ছে হয়েছিল—কাজ নেই চাকরিতে আমি ছুটে পালিয়ে যাই—চেঁচিয়ে উঠি—ওগো আমি পারব না গো! চাকরিতে কাজ নাই গো আমার!

নিজেই হা-হা করে হেসে উঠতেন।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত মন্মথ।

মাধববাবু আবার আরম্ভ করতেন—সব ভয় আমার ভাঙিয়ে দিয়েছিলেন বড়সাহেব এটু কিনসন। এই লম্বা মানুষ—আমার থেকেও মাথায় এক মুঠো লম্বা। আর রাঙা টকটকে গায়ের রঙ, চুলগুলো ঘিয়ের মতো, আমাকে খুব ভালবেসেছিলেন আর যত্ন করে সব শিখিয়েছিলেন। একেবারে খাঁটি বিশ্বকর্মা কিংবা শুক্রাচার্যের জাত। এই দেশ পড়েছিল—এর মাটির তলায় কোথায় ছিল কয়লা কোথায় ছিল কেরোসিন তেল কোথায় ছিল লোহা, লোহার কারখানা এসব ওরাই বের করলে। রেল পাতলে ট্রেন চালালে, ইষ্টিমার চালালে—দুর্ধর্ষ জাত। এক একবার মনে হয়—যদি তোমার মতো তখন সায়েবকে বলে পড়তাম হে!

আক্ষেপ করে ঘাড় নেড়ে বলতেন—কয়লার কারবার করেছি—কলিয়ারীর কাজ বুঝি—ভাগ্য আমাকে ভালো কৃপাই করেছে—কিন্তু আক্ষেপ কি জান—ইংরিজী বিদ্যেটাও ভালো করে জানি না—সংস্কৃতও ভালো করে জানি না। তুমি ভাগবত পড়ে শোনাও—আমার যে কি ভালো লাগে তা' তোমাকে কি বলব! জান প্রথম দিন দ্বিজু মুন্সীকে বলে এলাম তোমাকে পাঠিয়ে দিতে। বাড়ি এসে সকলকে বললাম। তা' এঁরা সকলে বললেন—ভাত দেওয়াটা আর এমন কি কথা। ভাত তো তিন চারজন করে অতিথি ফকির ভিখারীতে খেয়ে যায়! তবে ব্রাহ্মদের সঙ্গে মেলামেশা করায় খুড়োর আপত্তি—ছেলে-সে আপত্তি অগ্রাহ্য করে অন্যের বাড়িতে ভাত চেয়ে খায়। সেখানেও সেই একই কথা। এখানেও যদি এমন কিছু ঘটে তো কি করবেন? মন খুঁতখুঁত করছিল। তিনটের সময় উঠে বসে ভাবছিলাম—কি করব'। এমন সময় তুমি এলে। একটু ভেবে নিচে নেমে এলাম, ভাবলাম বলব—তুমি দু'বেলা খেয়ে যেয়ো এখানে—থাকার ব্যবস্থাটা তুমি অন্যত্র দেখ। সিঁড়ি বেয়ে নেমে সে দরজার মুখে থমকে দাঁড়ালাম; তোমার তরুণ কণ্ঠে ভাগবতপাঠ মাহাত্ম্য শুনে কান মন জুড়িয়ে গেল। বুঝেছ, তখনই ঠিক করলাম তুমি থাকবে এখানে—খাবে থাকবে পড়বে—রাত্রে আমাকে রামায়ণ মহাভারত ভাগবত পাঠ করে শোনাবে। ভাগবত থেকে শুরু কর। একজন পাগলা সন্ন্যাসী আমাকে বলেছে—বাবুজি থোড়া কুছ শাস্ত্রপাঠ করো—মনমে শান্তি মিলেগা। শান্তি আমার দরকার বুঝেছ! অশান্তিতে ঘুম হয় না। তোমার উচ্চারণ ভালো। কণ্ঠ ভালো লাগবে আমার।

এ পাগলা সন্ন্যাসী আর কেউ নয়—এ সেই শ্রীমানী বাজারের ফুটপাথের সেই পাগলাটে জটাধারী সন্ন্যাসী। মধ্যে মধ্যে সে মাধববাবুর কাছে আসে। মাধববাবুর কাছে হাত পেতে দাঁড়ায়—কুছ দো।

মাধববাবু হেসে বলেন—কেন?

—তোমার কিছু মিলবে ভাই—দশ বিশ হাজার পচাশ হাজার ভী হো সকতা। মুঝে তো কুছ মিল্ যায়—।

—কত ?

—দো আনা চার আনা যো চাহে তুমহারা দিল্ ।

নয়তো বলে—তোমারা নুকসান হো জায়েগা ভাই। ত্রিশ চাল্লিশ হাজার চলা জায়েগা মুঝে দে দো কুছ—দু'চার আনা—যাস্তি চানে সে ক্যা হোগা ?

মাধববাবু ওকে বেশী বেশীই দিয়ে থাকেন। দু'আনা চার আনা চাইলেও ওকে গোটা টাকাটাই দেন। মাধববাবু বলেন—ওর সব কথা ফলে যায়।

মাধববাবুর কাছে মন্মথকে দেখে প্রথম দিনই সে বললে— ক্যা বাবুজী! তুম হিঁয়া আ গিয়া! বাঃ বাঃ বাঃ। ঠিক জাগা মে আ গিয়া ভাই। এহি ভাগ্‌বান ভগবানভক্তকে পাশ তুমারা জাগা ঠিক জাগা হায়! হাঁ।

যাবার সময় সে তাকে ডেকে বলেছিল—হিঁয়াসে আওর কোই দুস্‌রা জাগা মৎ জানা। হিঁয়া রহনেসে তুমহারা ভালা হোগা। ফতে হো যায়গা।

খুব বিস্মিত হয়েছিল মন্মথ। সন্ন্যাসী হাসতে হাসতে বলেছিল—এমুন করে তাকাচ্ছে কেনো বাবু ?

মন্মথ বলেছিল—তুমি এসব কি বলছ ?

পাগলা হেসে বলেছিল—তুমহারা বিশোয়াস নেহি হোতা ?

মন্মথ বলেছিল—না।

সন্ন্যাসী মুখখানা খুব গম্ভীর করে বিচিত্রভাবে ঘাড় নেড়ে ভঙ্গি করে বলেছিল—আংরেজী পঢ়তা হ্যায় না! উস্ লিয়ে। আংরেজী লিখা পঢ়ি— !

মন্মথ বলেছিল—হ্যাঁ তাই বটে। ইংরিজী না পড়লে তোমাদের বুজরুকি ধরা যায় না।

—কাহে ভাই! ক্যা বুজরুখী ময়নে তুমকো দেখায়া, বাতাও!

এর উত্তর মন্মথ দিতে পারে নি। সন্ন্যাসী হেসে বলে গিয়েছিল—শুনো! পরীখসা মে তুম ভাই সবসে উঁচা হোগা! আবু তুমকা নসীবসে জমীনকে পর পানসী ছুটেগা ভাই। তুমাহারা উয়ো শক্তি তো আগেয়ি জরুর।

—ক্যা বোলতা— ? চমকে উঠেছিল মন্মথ। —শক্তি ক্যা ?

—শক্তি, এক লেড়কী হোগা আউর ক্যা। ক্যা ফুলকা নাম বোলা উ রোজ— ? চামেলী—! চম্পা এইসন কুছ হোগা।!

সে চলে গিছল।

পথের উপর অবাক হয়েই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল মন্মথ। লোকটার শক্তি একটা আছে। মুখ দেখে হাত দেখে যা বলে তা' জীবনের সঙ্গে মিলে যায়। সেদিনও বলেছিল শক্তির কথা। বলেছিল—একটি ফুলের নাম কর। সঙ্গে সঙ্গে তার মন বলে উঠেছিল—মালতী। কিন্তু মালতী ফুল মনে পড়ে নি—মালতীকে মনে পড়েছিল এবং লজ্জিত হয়ে পড়েছিল।

সেই লজ্জায় মালতী কথাটা চেপে গিয়ে বলেছিল—চামেলী।

আসলে ওটা হবে মালতী।

মালতী তার ভাগ্যে কি এসেছে ? হ্যাঁ এসেছে বই কি। তার এই কলকাতার জীবনে যা ঘটল তার পিছনে মালতী তো সব সময় রয়েছে।

জ্যোতিপ্রসাদবাবুদের বাড়ি সে যে যায় তার মধ্যে অনেক রকমের আকর্ষণ আছে—অনেক কারণ আছে। সত্য সত্যর বাবা সত্যর মা মালতী—সত্যদের বাড়ির রুচি—সত্যর বাবার ঐশ্বর্য প্রতিষ্ঠা—ওদের বাড়ির সুন্দর পরিবেশ—অনেক কারণ, এগুলির প্রত্যেকটিই এক-একটি আকর্ষণ। কিন্তু সব থেকে মধুর আকর্ষণ মালতী, সব থেকে গোপন।

মদন মিত্তির লেন থেকে আমহার্স্ট স্ট্রীট খুব কাছে। আমহার্স্ট স্ট্রীটের পুব দিকের বাড়ির কাছাকাছি দ্বিজু মুন্সীর বাড়ি। মন্মথ মদন মিত্তির লেন থেকে মুন্সীর বাড়িতে মধ্যে মধ্যে আসত কিন্তু জ্যোতিপ্রসাদবাবুর বাড়ি যেত না। দু' দু'বার সত্যদের সঙ্গে সংস্রবের জন্য তার ভাগ্যে এক-একটা ঝঞ্ঝাট ঝামেলা জুটে সব গোলমাল করে দিয়েছে।

সেই দিন অর্থাৎ ওই পাগলা সন্ন্যাসী যেদিন ওকে ওই কথা বলে গেল সেদিন তার হঠাৎ মন এমন উথলে পাতলে উঠল যে সব উপেক্ষা করেই সে চলে গেল সত্যদের বাড়ি। না-গিয়ে সে পারে নি।

বাড়িতে সত্য বা সত্যর মা বাবা এঁরা ছিলেন না। ওঁদের বড়মেয়ে সন্ধ্যাকে নিয়ে গেছেন সন্ধ্যার ভাবী শ্বশুরবাড়ি। চাকরটা যাবামাত্র বলেছিল—কেউ বাড়িতে নেই। সব গিয়েছে বড় দিদিমণির হবু শ্বশুরবাড়ি। শুধু মলি দিদি বাড়ি আছেন। ওঁকে বলব? মন্মথ তাড়াতাড়ি বলে উঠল—না না না। আমি সত্যর কাছে এসেছিলাম।

মনঃক্ষুণ্ণ হয়েই চলে আসছিল মন্মথ, বাড়ির ফটক পর্যন্ত এসেছে এমন সময় চাকরটাই আবার তাকে ডাকলে—মলি দিদিমনি আপনাকে ডাকছেন। মলি দি বাড়ি আছেন। বললেন —যা ডেকে আন।

যত খুশী হয়েছিল মন্মথ তত যেন নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। হাতের তালু দুটো ঘামতে শুরু করেছিল সঙ্গে সঙ্গে।

মালতী সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে বলেছিল—বাঃ বেশ লোক তো! সত্য নেই বলে চুপিচুপি চলে যাচ্ছেন? আসুন আসুন—চা খেয়ে যান।

থতমত খেয়ে মন্মথ বললে—রাখহরি বললে কেউ বাড়ি নেই।

হেসে মালতী বললে—তা' বটে, আমি তো ঠিক এবাড়ির নই। ওঁরা যাওয়ার পর আমি এসেছি। দেরি হয়ে গেছে আমার। বাড়ি ফিরব, ভাবলাম একটু চা খেয়ে যাই। আপনি এসে গেলেন—। একেই বলে ভাগ্য। অতি সুন্দর হাসিতে মুখখানি তার উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

মালতী সত্যই মালতীর মতো শুভ্র উজ্জ্বল এবং গন্ধে স্নিগ্ধ। তার মুখের দিকে তাকাবার জন্য তার ব্যগ্রতার আর অন্ত ছিল না। কিন্তু নিজেরই একটা দুরন্ত ছি-ছিকারের ধিক্কারে সে কিছুতেই তার দিকে তাকাতে পারছিল না।

মালতীও যেন কিছুক্ষণের মধ্যে একটু একটু করে আড়ষ্ট হয়ে আসছিল। কিন্তু নবযুগের ব্রাহ্মবাড়ির মেয়ে, ইস্কুলে পড়ে, সভাসমিতিতে যায় গান করে, সে আড়ষ্ট হতে হতেও সেটাকে কাটিয়ে উঠল। একলাই সে অনেক কথা বলে গেল। সত্যর বড়দির নাম সন্ধ্যা, তার সঙ্গে একজনের বিয়ের কথা অনেকদিন থেকে হয়ে আছে; ইউ পির প্রবাসী বাঙালী, রুরকীতে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ছিলেন এতদিন, এবার পরীক্ষা হয়ে গেছে, কলকাতা এসেছেন তাঁর মাসীর বাড়ি, আসল কথা বিয়ে। সেই কথাগুলি বলতে বলতেই সে বললে—না-যাওয়া হয়েছে। ভালোই হয়েছে। আমি বেঁচেছি। বাবাঃ। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। যেখানেই যাই না, বরাত হবে মলি দু'খানা গান গেয়ে শোনা না! আমার ভারী খারাপ লাগে।

এরই মধ্যেই মন্মথ সহজ হয়ে উঠেছিল। সে বলেছিল—গান গাইতে আপনার খারাপ লাগে?

মলি বলেছিল—না। গান গাইতে কি খারাপ লাগে? বরাত করলে গেয়ে শোনাতে খারাপ লাগে। বিশেষ করে এই সব গোমড়ামুখোদের সমাজে। আপনি তো জানেন না ব্রাহ্মসমাজে আমাদের কি খুঁতখুঁতি গোঁড়ামি শুচিবাই! গানে যদি একটু প্রেমের ছিটে থাকল তো মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল। এই আপনাকে চা খাওয়ালাম গল্প করলাম—এর কথা

ছড়ালে অনেক ব্রাহ্মবাড়িতে কথা উঠবে।

—তাই নাকি?

হেসে মালতী বলেছিল—আপনার তো অনেক দুর্ভোগ হল আমাদের বাড়ি আসার জন্যে।

—কে বললে?

—সব জানি। শুনেছি আমরা। সত্য তো আপনাকে খুব ভালবাসে! সে সব খবর রাখে। সে কত বলেছিল মামাবাবুকে এই বাড়িতে আপনাকে রাখতে কিন্তু মামাবাবু বলেছিলেন—না। আমরা তাহলে অন্যায় করব। লোভ দেখিয়ে কৌশল করে ধর্মান্তর ঘটানোর মতো অন্যায় আর হয় না। ওতে ধর্মেরই অমর্যাদা হয়। জোর করে ধর্মান্তরের মতোই সমান অন্যায়।

মালতীর মুখের দিকে অসংকোচ পরিপূর্ণ দৃষ্টি যে সে কখন মেলে দিয়েছিল তা সে নিজেও জানত না।

মালতী বলেছিল—এবার যাদের বাসায় রয়েছেন তারা আবার এ বাড়ি আসার জন্যে তাড়িয়ে দেবে না তো?

—দিলে অন্যত্র আবার একটা ঠাঁই খুঁজে নেব।

—না। আর আপনার পরীক্ষার দেরি নেই। আর এখন ওই সব মান অপমানের লড়াই বাধিয়ে পথে দাঁড়াবেন না। ক'টা মাস মন দিয়ে পড়ে পাস করে নিন। আমি শুনেছি আর জানিও আপনি নিশ্চয় স্কলারশিপ পাবেন।

ফিরে আসবার সময় সত্যসত্যই সে মনে একটা আশ্চর্য জোর নিয়ে ফিরে এসেছিল। সারা সন্ধ্যেটা সেদিন আর তার পড়াশোনা হয় নি। মনের মধ্যে ওই কথাবার্তাগুলিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আসা যাওয়া করেছিল। তার মধ্যে একটা কথা—যে কথাটা শোনবার সময় বিশেষ কিছু মনে হয় নি অথচ সেইটেরই মানে যেন বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর মতো বিশাল এবং বিপুল হয়ে উঠেছিল।

মালতী বলেছিল—দেরি হয়েছিল আসতে বলে মামাবাবুরা চলে গেছেন। আমি একলা কি করব? ভেবেচিন্তে চা খাব বলে চা তৈরি করছি আর আপনি এসে গেলেন। দেখা হয়ে গেল। একেই বলে ভাগ্য।

ওই একেই বলে ভাগ্য কথাটার কত মানে যে হল তার মনে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল ওই পাগলা সন্ন্যাসীটার কথা।

এর পর ছ'টা মাস সে তপস্যার মতো পড়াশুনা করেছে। ওই যে মালতীর ক'টি কথা —"আপনি স্কলারশিপ পাবেনই—আমি জানি আমি শুনেছি"—এই কথাক'টি মন্ত্রের মতো কাজ করেছে। আর কাজ করেছে মাধববাবুর সমাদর। মাধববাবু মস্ত কাজের মানুষ—তাঁর ব্যবসা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। কলিয়ারী তাঁর বরাকর নদীর ওপারে ছোট ধেমো বড় ধেমো থেকে শুরু করে ঝরিয়া কাতরাসগড় জিনাগড় পর্যন্ত অনেক কলিয়ারীর, নতুন নতুন জায়গায় নতুন কয়লার খনি তৈরিও করছেন। এ ছাড়া এইসব কলিয়ারীর কয়লা বিক্রির আপিস সারা ভারতবর্ষ ব্রহ্মদেশ সিঙ্গাপুর এডেন পর্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও ওঁদের কয়লা যায়। সারা ভারতবর্ষে দুটি তিনটি ইংরেজ কোম্পানি ছাড়া তাঁদের সমকক্ষ আর কোনো কোম্পানি নেই। মাধববাবুর বেয়াই শ্যালকপুত্র জামাই শালিকাপুত্র প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনেরাই তাঁর কারবারের অংশীদার; তারা প্রাণ দিয়ে খাটছে। মাধববাবু এরই মধ্যে কলকাতা আর কয়লার খাদ অঞ্চল বেধে বেড়ান। মাসান্তে শেষ পনের দিন তিনি কলিয়ারী ঘুরে বেড়ান, সাত দিন যান তাঁর গ্রামে, সাত দিন থাকেন কলকাতায়। তিনি যে

ক'দিন কলকাতায় থাকেন সে ক'দিন নিজে খোঁজ করেন মন্মথর। ঘিয়ের ভাঁড় নিয়ে এসে চামচে করে পাতে ঘি দেন। বলেন—ঘৃতে মেধা বৃদ্ধি হয়। স্মরণশক্তি দৃঢ় হয়। পরীক্ষার সময় এমন করে ঘাড় গুঁজে পড়ছ—এখন একটু ঘি খানিকটা দুধ, এ না-হলে চলবে কেন? শরীর যে ভেঙে যাবে। আধসের দুধের ব্যবস্থাও তিনি বরাদ্দ করে দিয়েছিলেন।

সাতটা দিন—যে সাত দিন মাধববাবু থাকতেন সে সাত দিন তার বড় আনন্দে এবং বড় সুখে কাটত। বাকী তেইশটা দিন সে সুখ অসুখের দিকে পিছন ফিরে বসে কেবল ঘাড় গুঁজে পড়েই যেত। একলার জন্যে একখানা ছোট ঘর তাকে তিনি দিয়েছিলেন। ছোট্ট ঘর অবশ্য। লম্বায় আট হাত চওড়ায় চার হাত থেকেও কম। একটা ভালো লণ্ঠনও কিনে দিয়েছিলেন। মস্তবড় দু'মহলা দোতলা বাড়ি। বাসিন্দে তিরিশজনেরও বেশী। ঠাকুর দু'জন। চাকর জন আষ্টেক। মাধববাবুর ছেলে জামাই প্রভৃতিদের জন্যে আপনাপন খানসামা আছে। ও'রা সকলেই দোতলায় থাকেন। নিচের তলায় মাধববাবুর খাস বৈঠকখানা আছে—সেখানে তাঁর নিজের একজন কেরানী আছে। শুধু কেরানী নয়, কেরানী ক্যাশিয়ার সব সেই। বাবুর চিঠিপত্র লেখে। বাবুকে দেখাশুনাও করে। আর একটা ছেলে জামাইদের বৈঠকখানা আছে ভিতর মহলে। চমৎকার করে সাজানো। তবে জ্যোতিবাবুদের রুচিটি যেন নেই। সেখানে তাঁদের আড্ডা চলে। এ ছাড়া নিচের তলায় দুই মহলে রান্নাশালা আছে ভাঁড়ার আছে। আর থাকে আপিসের কর্মচারীরা। আর থাকে মাধববাবুর গ্রামের ক'জন লোক।

এরা সকলেই মন্মথকে বাঁকা চোখে দেখত। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে কাজ করত বিভূতি চাটুজ্জে, আপিস থেকে ফিরেই কাপড়খানি ছেড়ে গামছা পরে কাপড়খানি পাট করে আলনায় তুলে রেখে হুঁকোটি হাতে নিয়ে ডাকত গোবিন্দ চাকরকে—গোবে এক কলকে তামাক দিয়ে যা বাবা।

তামাক খেতে খেতে হঠাৎ আরম্ভ করত—লেখাপড়া—। কি হয় লেখাপড়া শিখে বি-এ এম-এ পাস করে? নিজেই উত্তর দিত—নাথিং। লবডঙ্কা। পড়ছে! যা না ওই বাজারের রাজাদের বাড়ি দেখে আয়, কোনোরকমে সই করতে পারলেই সাব-রেজিস্ট্রার। এণ্ট্রান্স ফেল হলেই ডেপুটী। পাস করলেই ম্যাজিস্ট্রেট। পাস। পাস তো এপাশ ওপাশ।

মধ্যে মধ্যে মন্মথকে ডেকে বলত—ওহে ছোকরা! অয়েলিং করতে জান.? তেল দিতে তেল দিতে? পার? আমার কাছে মধ্যে মধ্যে এস শিখিয়ে দেব।

তাঁর বড় যিনি জি. পি. ও. তে কাজ করেন তিনি ফেরেন দৌরিতে, এসেই ভাইয়ের হাতের হুঁকোটা কেড়ে নিয়ে বেশ কয়েকবার ধোঁয়া ছেড়ে তাকে দেখতে পেলেই বলতেন, হুঁ-হুঁ! হুঁ-হুঁ! গুড বয় গুড বয়—আই অ্যাম ভেরি গ্ল্যাড টু সি ইউ। বাট এ ভটাচারিয়াস সান ট্রাইং টু বি এ সাহেব—হাও ইজ ইট?

পোড়া মুখুজ্জে সেই কালো লম্বা ঘাড় চেঁছে চুল কাটা বিচিত্র মানুষটি এসে দাঁড়াত এবং বলত—হুঁকোটা হাতে ধরে রয়েছ যে! বলি সব ফয়ের করে দিয়েছ বুঝি ফণিকা। তা এ ছোঁড়াটার ওপর লাগলে কেন? ওর পিছনে লেগো না। ছেলেটার লগ্নে চন্দ্র গো। খোদ কর্তাবাবু খুশী। ঘি খাওয়ান ওকে।

ছোটভাই বিভূতি বলত—তুই বেটা ওকে মিষ্টি খাওয়া, আখেরে ফল পাবি। কোথাকার উড়ো খই—বেটা উড়ে এসে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দের নৈবিদ্যির মাথায় চাড়িয়ে দিলে। হুঃ!

পোড়া বলত—মাইরি বলছি বিভূতিকা ওকে মিষ্টি আমি খাওয়াতুম, গো যদি আইবুড়ো মেয়ে কি বোনটোন থাকত। ওই যে শ্রীমানী মার্কেটের সেই পাগলাটা না সে বেটা পর্যন্ত

ছোঁড়ার কথায় ফাইভ মাউথ—পঞ্চমুখ! বলে—লেড়কাকা জমীন পর পানসী চলেগা।

মাধববাবুর বড়জামাই নিত্যই আপিস যাবার সময় একবার খোঁজ করতেন; গম্ভীর তাঁর কণ্ঠস্বর—উচ্চারণও একটু বাঁকা বাঁকা—হেঁকে বলতেন—কি? অসুবিধে নেই তো তোমার? হলে আমাকে বলবে। লজ্জাটজ্জা ক'রো না যেন!

মাধববাবুর বড়ছেলে সবথেকে বিচিত্র মানুষ। সাত আট মাসের মধ্যে একবার কথা বলেছেন। পূজার সময় তাকে ডেকে বলেছিলেন—বাবা তোমাকে কাপড় জামা জুতো চাদর দিয়েছেন। তুমি দাম নেবে, না জিনিষ আমরা কিনে দেব?

মাধববাবুর ছোটছেলে কলিয়ারীতে থাকেন। মাসান্তে একবার কলকাতায় আসেন। শৌখিন বাবু লোক। কলকাতায় এসে ঘোড়া কুকুর দেখে বেড়ান, হার্টের আড়গড়ায় মানে হার্ট কোম্পানির ঘোড়ার আস্তাবলে যান। টেরিটিবাজারে কুকুর দেখে আসেন। আর থিয়েটার দেখেন। সঙ্গে পাঁচ সাত দশ জন সঙ্গী। হঠাৎ একদিন এঁর দলের মধ্যে বিভূতিকে দেখে একটু বিব্রত হয়েছিল সে। বিভূতি এখন যেন পরিপূর্ণ জোয়ান হয়ে উঠেছে। সে শুনেছিল বটে যে, মামলা করে বিষয় ভাগ করে নিয়ে সে থিয়েটারে থিয়েটারে ঘুরে বেড়ায়। হাতীবাগানের দত্তবাড়িব ছেলে অমর দত্ত থিয়েটার খুলেছে—মূল আড্ডাটা তার অমরবাবুর থিয়েটারেই। বিভূতির কথা সে কাকার কাছেও শুনেছিল। বিভূতি তাকে দেখে তার স্বভাবমতো হইচই করে উঠেছিল। "আরে আবে আরে—একি হেরি কারে হেরি নয়নে আমার? মনু তুই?"

সে বিব্রত হয়েছিল। মাধববাবুর ছোটছেলের সঙ্গে বিভূতি এসেছে—তার মস্তবড় জুড়ি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। কলকাতার একটি রাজবাড়ি বলে খ্যাত বাড়ির শরিক। ধনী মহলে, বাঈ মহলে, থিয়েটার মহলে ওর খুব খাতির। চেহারাখানাও হয়ে উঠেছে রাজপুত্রের মতো। শুধু একটু মেদবাহুল্যের আভাসে যেন একটু স্থূলকায় দেখায় এই যা। সে মাধববাবুর বাসায় এসে সবার সামনে মনু তুই বলে এমন সমাদর করে তাকে জড়িয়ে ধরায় তার আর সংকোচ লজ্জার বাকী ছিল না। কিন্তু সে-লজ্জা-সংকোচ মন্মথ নিজেই ঝেড়ে ফেলেছিল সেই দিনই।

সুযোগ বিভূতিই করে দিয়েছিল। সে ধরেছিল—চল থিয়েটারে চল। যেতেই হবে।

মন্মথ বলেছিল—না বিভূতি। আমায় টানিস নে। আমি যাব না।

মাধববাবুর ছোটছেলে বলেছিল—কেন হে! একদিন থিয়েটার দেখলে তোমার কি ক্ষতি হবে?

মাধববাবুর ছোটছেলে তার থেকে বয়সে বড়, বিভূতির থেকেও কিছু বড়, তার উপর আশ্রয়দাতা মাধববাবুর ছেলে—সে তাকে তুমিই বলত। তবুও সেদিন সেই মুহূর্তে বিভূতির সামনে এই তুমি সম্বোধনটা তাকে যেন একটু ছেঁকা দিয়েছিল। সে বলেছিল—না ছোটবাবু, আমার গুরুর নিষেধ আছে। আমার ইস্কুলের হেডমাস্টার মশায় আমাকে বারণ করেছেন! পরীক্ষা না-দেওয়া পর্যন্ত যেন থিয়েটার-টিয়েটার না-দেখি। এমনকি সংস্কৃত পরীক্ষা পর্যন্ত বন্ধ রাখতে বলেছেন।

বিভূতি এতেই চটে গিছল এবং বলেছিল—ছাড়ুন, ওকে ছেড়ে দিন। ওর জাত যাবে। ছেড়ে দিন ওকে। ওরে মশায়, ভালো ছেলে আমিও কম ছিলাম না। ফার্স্ট সেকেণ্ড আমিও হয়েছি। এখনও হতে পারি।—

এই ভাবেই কেটেছে তার এই সাত আট মাস।

মধ্যে মধ্যে সত্যদের বাড়ি সে গেছে আর গেছে রমেশ স্যারের বাড়ি।

দু' জায়গাতেই সে যেত পড়াশোনার সুবিধের জন্য।

রমেশ স্যার তাঁকে ইংরেজী পড়িয়ে দিতেন। আর সত্যদের বাড়িতে বইয়ের সুবিধে ছিল। তাছাড়া সত্যর সঙ্গে একসঙ্গে বসে পড়াশোনাতে সুবিধেও হত। কথাতেই আছে—একে উন্ঘুন্ দুইয়ে পাঠ। তা কথাটা খুব সত্যি। তাছাড়া আরও আকর্ষণ ছিল। মালতীর সঙ্গে দেখা হত।

সত্যদের বাড়ি যাওয়ার একটা বার নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। রবিবার বিকেলবেলা তিনটে থেকে পাঁচটা। রবিবার ওদের বাড়িতে সকালে হত প্রার্থনা, সন্ধ্যেতে বসত মজলিস। সাহিত্য নিয়ে ধর্ম নিয়ে কিংবা আত্মীয়স্বজন নিয়ে। খালি ছিল তিনটে থেকে পাঁচটা। ওই সময়টায় সে যেত—সত্যকে নিয়ে একসঙ্গে পড়ত। সত্যর কাছে ও সাহায্য নিত ইংরিজীর। আর মন্মথ ওকে সংস্কৃত এবং অংকে সাহায্য করত। মালতী রবিবার দিন সারাদিনই থাকত আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে। সেই রাত্রি পর্যন্ত। জ্যোতিপ্রসাদবাবুর উপর ওরা নির্ভরশীল বলেই নয়, স্নেহের সম্পর্কটা ছিল সুনিবিড়। তাও আগে মালতী সকালবেলার প্রার্থনা-টার্থনার আসর শেষ করেই বাড়ি চলে যেত। আবাব আসত সন্ধ্যার আগে। এখন আর যায় না। এখানেই থাকে। প্রায়ই থাকে। যখন বড্ড বেশী চোখে পড়ে এই সারাদিন থাকাটা তখনই সে পরপর দুটো রবিবাব বাড়ি চলে যায় এগারটা বাজতেই।

সত্য এবং মন্মথ পড়ত—মালতী এসে টেবিলে কনুই রেখে ভর দিয়ে ওদের পড়া শুনত। বিচিত্র কথা যে এই ঘনিষ্ঠতাটুকুর মধ্যেই তারা যেন নীরবে পরস্পরকে অনেক দিয়েছে অনেক নিয়েছে। দুজনেই অনেক আনন্দ অনুভব করেছে।

এরই মধ্যে দিয়ে আজকাল ওরা পরস্পরের দিকে অসংকোচে তাকিয়ে থাকতে শিখেছে। কত কাছে এসে পড়েছে।

পরীক্ষা যেদিন আরম্ভ তার আগের দিন সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ মালতী বলেছিল—সত্য আমি বাড়ি যাব রে। শরীরটা যেন ভালো নেই। আমি চাকরটাকে আর মনুকে সঙ্গে করে চলে যাচ্ছি।

বাড়ি কাছেই—বেশী দূর নয়। বাড়ি এসে চাকরটাকে বিদায় করে দিয়ে মালতী বলেছিল—তোমাকে একটা কথা বলবার জন্যে মিথ্যে শরীর খারাপ বলে চলে এলাম।

মন্মথ বলেছিল—তুমি না বললে হয়তো আমি বলতাম মিথ্যে কথা।

মালতী বললে—আমি তোমাকে একটি জিনিস দেব। ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন আমার মাকে একবার একটি পদ্মফুল দিয়েছিলেন। তারই একটি পাপড়ি দেব তোমাকে। তোমায় কিন্তু ফার্স্ট হতে হবে।

মন্মথ বলেছিল—সত্যকে হারানো সহজ নয়—

মালতী বলেছিল—সত্য বলে তুমি ফার্স্ট হবেই।

মন্মথ বলেছিল—তুমি তাহলে কাল আমার জন্যে প্রার্থনা ক'রো। আমি তোমাকে সেই কথাটা বলবার জন্যই ভাবছিলাম একটা মিথ্যে কথা বলে সত্যকে কোনোক্রমে একটু সরিয়ে দিয়ে আড়ালের সুযোগে কথাটা বলব।

এরপর একটুক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থেকে সে বিদায় নিয়েছিল।

পরীক্ষা দিয়ে আসবার দিনও মালতীর সঙ্গে সে দেখা করে এসেছে। এই দিনের দেখাটি খুব বিচিত্র। সে সত্যর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল কিন্তু সত্য ছিল না, তার স্থলে অপেক্ষা করছিল মালতী। এইটে সে চেয়েছিল এবং মালতীও চেয়েছিল, কারণ মালতী বলেছিল—দেখ, ভগবান যেন সময়ে সময়ে মানুষের মনের কথা শোনেন এবং দয়া করে ঠিক তেমনিটিই

ঘটিয়ে দেন। সকাল থেকে ভাবছিলাম তুমি নিশ্চয় আসবে কিন্তু সত্য যখন থাকবে না তখন যদি আস তবে কত ভালো হয়। ঠিক তাই ঘটে গেল।

মন্মথ বলেছিল—আমিও তাই বলেছি সকালবেলা থেকে।

মালতী হেসেছিল। বড় সুন্দর হাসি। জিজ্ঞাসা করেছিল—চিঠি লিখবে না?

মন্মথ বলেছিল—আমি সত্যকে লিখব। তুমি লিখো না।

সারা অঞ্চলটায় সাড়া পড়ে গিছল।

গঙ্গাধর ভটচাজের আশ্চর্য বুদ্ধিমান ছেলেটি আধাব্রাহ্ম হয়ে ফিরে এসেছে। সাজে-গোজে চেহারায় তাকে আর গঙ্গাধর ভটচাজের ছেলে বলে চেনাই যায় না। হাল ফ্যাসনে ছোটবড় করে চুল ছাঁটাতে তাকে ভারী ভালো মানিয়েছে। তার উপর পরিষ্কার কালাপাড় মিহিজমি রেলির বাড়ির ধুতি, গায়ে গেঞ্জি এবং টুইল শার্ট পায়ে চড়া জুতো পরে যেদিন সে একটা কুলীর মাথায় মোট চাপিয়ে তার পিছন পিছন গ্রামে এসে ঢুকেছিল সেদিন অধিকাংশ লোকেই তাকে চিনতে পারে নি। ভেবেছিল কলকাতা শহরের কোনো ছোকরা বাবু আসছে। গ্রামে ঢুকতেই বাগদীপাড়ার যে ছেলেগুলো পথের উপর গাবু খুঁড়ে নিয়ে কড়ি খেলছিল এবং খেলা দেখছিল তাদের একটা মস্ত অংশ তার পিছন ধরে নিয়েছিল। যে-সব মেয়েরা পথের ধারের পুকুরঘাটে বাসন মাজছিল কাপড় কাচছিল তাদের কার্যরত হাতখানা আপনি থেমে গিছল এবং বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল তার দিকে।

সেও কম বিস্মিত হয় নি। সে দেখছিল তাদের সেই বহুদিনের পুরানো গ্রামখানার চেহারা যেন অনেক বদলে গেছে। সর্বাগ্রে নজরে পড়েছিল গ্রামে ঢুকবার রাস্তাটা। রাস্তাটা আর মাটির রাস্তা নয়। আগের মতো আর এই বৈশাখের প্রথমে হাঁটুভর ধুলো নেই।

বাগদীপাড়ার পরই ছিল ছোট্ট একটি 'বৈরাগীপাড়া'। কেউ বলত বোষ্টুমপাড়া। চার ঘর গৃহস্থ বৈষ্ণব ছিল, আর একটা ছিল আখড়া। আখড়ার বৈষ্ণবেরা ভিক্ষে করে খেত। আর গৃহস্থ বৈষ্ণবেরা এর ওর বাড়িতে কাজ করত, নিজেদের অল্পস্বল্প তিন চার বিঘে করে জমি ছিল, সেই জমিটুকু চাষ করত। হাল ভাড়া করে নিত, জনের কাজ নিজেরা করত। সদ্‌জাতির ঘরে ক্রিয়াকর্মে খাটত। মেয়েরা ভানা কোটার কাজ করত। আবার কাজ না থাকলে খঞ্জনি নিয়ে কাঁধে ঝোলা ফেলে বৈষ্ণবদের সঙ্গে হরিবোল বলে ভিক্ষেয় বের হত।

বড় দুটো নিম কয়েকটা শিরীষ আর একটা আমগাছের ছাতার মতো ডালপালার বিস্তারের তলায় শান্ত পাড়াটি যেন চব্বিশ ঘণ্টাই ঘুমের ঘোরের মধ্যে মগ্ন থাকত। উঠত কেবল পাখির ডাক আর গরু বাছুরের ডাক। কখনও কখনও আখড়ায় গোপীযন্ত্র গাবগুবাগুব বা একতারা বাজাত, গানও গাইত। সেখানটায় এসে অবাক হয়ে গিয়েছিল মন্মথ। বাড়িগুলোর চাল নেই, ভাঙা পাঁচিলগুলো দাঁড়িয়ে আছে। এর পরেই তাদের এলাকা। মানে গোবিন্দপুরের ভটচাজবাড়ি।

সে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল—আরে!

কুলীটা বুঝতে পারে নি, প্রশ্ন করেছিল—আজ্ঞে?

—এই বাড়িগুলো ভেঙে গেছে কেন? বোষ্টুমেরা কোথায় গেল?

ওই ছেলের পাল বলেছিল—বোষ্টোমরা চলে যেয়েছেন গো!

—চলে গেছে? কোথায়? কেন?

—ওই যে জটা মায়ের বাগান হবে বলে কিনে নিয়েছে ভশচাজবাবু মশায়!

—জটা মায়ের বাগান হবে?

—হিঁ গো। ওই পিছনদিকের মাঠের পুকুর কাটা হবে। তা বাদে ইস্কুল হবে।

আরও কত কি হবে।

চকিতে মনে পড়ল বাবা লিখেছিলেন—"এখানে জটাধর জননীর নামে সম্পত্তি কেনা হইতেছে। জমিদারী জমি, পুকুর বাগান। অবশ্য কীর্তিও হইতেছে। এম. ই. স্কুলের কথা পাকা হইয়া গিয়াছে। গ্রামের রাস্তাটা ভালো হইয়াছে। শুনিতেছি এবার ঘোড়া ও গাড়ি কেনা হইবে। জটাধর এবং বধূমাতা এখন মাসান্তে একবার আসিতে চান।"

এর পরই যে বাঁকটা সেই বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন গঙ্গাধর ভটচাজ তার বাবা। বাবার কোলে একটি শিশু। মাত্র ঘাড় সোজা করে মাথা তুলতে পারছে। তার বুঝতে দেরি হয় নি যে এইটি তার ভাই।

গঙ্গাধর চমকে উঠেছিলেন ছেলেকে দেখে। তার কারণ এই শিশুটিকে কোলে নিয়ে মন্মথর সামনে দাঁড়াতে একটা লজ্জা যেন পুঞ্জীভূত হয়ে জমা হয়েছিল। আর মন্মথকে যেন অনেক বেশী সম্ভ্রান্ত বলে মনে হচ্ছে।

মন্মথ তাঁকে প্রণাম করে হাসিমুখে ভাইকে কোলে করতে গিয়েছিল। গঙ্গাধর অপ্রস্তুত হয়ে উঠে খুব ব্যস্তভাবে বলেছিলেন—না, না না, বড্ড পেচ্ছাপ করে। এমন পরিষ্কার জামা—।

মন্মথ মানে নি। শিশুকে টেনে নিয়েছিল আপনার বুকে এবং তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—ও বাবা, সে-ই যে ফিরে এসেছে মনে হচ্ছে। ঠিক তার মতো।

অর্থাৎ তার সহোদর ছোটভাই যে মরে গেছে।

গঙ্গাধর বলেছিলেন—হ্যাঁ রে, অবিকল তার মতো। বলেই ছুটে গিছলেন বাড়ির ভিতরের দিকে। কাদু কাদম্বরী—মনু এসেছে—আমার মনু এসেছে। বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে ডেকেছিলেন জটাধর জননী এস্টেটের নায়েবকে—ওহে, ওহে মনু এসেছে, মন্মথ এসেছে। একবার জেলে পাড়ায় লোক পাঠাও বাবা—খিড়কি গড়েটায় মাছ ধরাতে হবে। দেখ ওই পথে এদের বাড়িতে খবরটা একটু পৌঁছে দিয়ো তো যে, মনু ফিরে এসেছে। পৈতেটৈতে সব ঠিক আছে।

মন্মথ ব্রাহ্ম হয়ে যায় নি এবং সে সেই মন্মথ হয়েই ফিরে এসেছে এই কথাটা যেন হেঁকে হেঁকে গাঁ-ময় ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন গঙ্গাধর। এবং তা' ছড়িয়েও গিয়েছিল। পল্লীগ্রাম—উনবিংশ শতাব্দীর পল্লীগ্রাম—নিস্তব্ধ ঘুমন্ত প্রায় রূপকথার বনের মতো সে শান্ত ঘুমন্ত, কিন্তু মধ্যে মধ্যে হৈহৈ হুংকার উঠলে পাখিরা কলকল করে ওড়ে, গাছপালা আছড়ে পড়ে হাতীতে ডাক ছাড়ে বাঘেরা হাঁকড়ে ওঠে। সেই বৃত্তান্ত। শান্ত ঘুমন্ত গোবিন্দপুরের পল্লী-জীবন সেদিন মন্মথর ফিরে আসায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

একজন দু'জন করে লোক আসতে শুরু করেছিল। তাকে দেখতে এসেছিল। বিকেল-বেলা পর্যন্ত দলে-দলে। প্রথমে ছেলেরা তারপর মেয়েরা। তারপর প্রধানেরা। সে-পালা আজও শেষ হয় নি। প্রায় বৈশাখ শেষ হয়ে এলো। আজও লোক আসছে তাকে দেখতে। গ্রামান্তর থেকেও আসছে। সেদিন গ্রামের প্রাচীন বর্ধিষ্ণু পরিবার চক্রবর্তী বাড়ির কর্তা এসেছিলেন দশ বছরের নাতির হাত ধরে।—ও গঙ্গাধর, এ যে ফ্যাসাদে পড়লাম ভাই। তোমার ছেলেকে ডাক তো, দেখি, কি চুল সে কেটেছে! নাতি ধরেছে ঠিক ওইরকম চুল কাটা হওয়া চাই।

গঙ্গাধর বলেছিলেন—আসুন আসুন। বসুন।

—আরে ছেলেকে ডাক—

—সে ঠাকুরঘরে আছে। আসতে হয়তো দেরি হবে।

—ঠাকুরঘরে?

সেই মুহূর্তেই বেরিয়ে এসেছিল মন্মথ।

অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন বুড়ো চক্রবর্তী।—তাই তো হে, তুমি তো বড় সুন্দর হয়েছ! বলেছিলেন তিনি।

আজ আসবেন এ অঞ্চলের বড় পণ্ডিত এবং মাননীয় জন স্মৃতিতীর্থ মশাই। বিকেল-বেলা রওনা হয়ে সন্ধ্যেবেলা আসবেন, যাবেন কুটুম্ববাড়ি, পথে হয়ে যাবেন। গঙ্গাধরকে লিখেছেন—"তোমার পুত্রের খুবই সুখ্যাতি শুনিতেছি। তা কুটুম্ববাড়ি যাইবার পথে তাহাকে দেখিয়া আশীর্বাদ করিয়া যাইব। সে যেন বাড়িতে থাকে।"

বৈশাখ শেষের দুপুরবেলায় সেদিন কোঠাঘরের মেঝেতে বাপ বেটায় শুয়ে সেই কথাই হচ্ছিল।

আজ আসছেন রামরাম স্মৃতিতীর্থ। এ অঞ্চলের সমাজপতি, মহামান্য পণ্ডিত তো বটেনই, তা' ছাড়াও তিনি সচ্ছল ও সম্পন্ন অবস্থার লোক ; এ অঞ্চলে হুগলী যখন নবাবী আমলে ফৌজদারের শহর ছিল তখন থেকে তাঁর পূর্বপুরুষ নবাবপ্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর ভোগ করছেন। ফরাসীদের যখন চন্দননগরে প্রবল প্রতিপত্তি, তখন ফরাসীদের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তাঁদের দেবতার মতো ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন, কৃষ্ণনগরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারেও তাঁদের প্রভাব ছিল। মোট কথা ভাটপাড়ার প্রসিদ্ধ গুরু-বংশীয়েরা ছাড়া এমন সম্মানিত বংশ এবং অবস্থায় সচ্ছল-ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘর বাংলাদেশে খুব কমই আছে। একটা গল্প তাঁদের সম্পর্কে প্রচলিত আছে যে, সোনার থালায় অন্নের উপকরণ সাজিয়ে একথলি কাঞ্চনমুদ্রা দক্ষিণাসহ সিধা পাঠিয়েছিলেন ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ; কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর পতিতা নারী-সংসর্গ দোষ ছিল বলে সে সিধা তাঁদের বংশের কর্তা ফেরত পাঠিয়েছিলেন। এটা তাঁদের বংশের নির্লোভ-চিত্ততার এবং পুণ্যবলের নিদর্শন বলে গণ্য হয়ে আসছে। এ অঞ্চলের বড় বড় জমিদার বংশ এবং জাত্যংশে যাঁরা ব্রাহ্মণ তাঁদের গুরু তাঁরা, শুধু ব্রাহ্মণ জমিদারই নয়, বড় বড় ব্রাহ্মণ বংশেরও গুরু তাঁরা। এমন একজন ব্যক্তি লিখেছেন—"চুঁচুড়া যাইব ভাগিনেয়ের পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষ্যে ; পথে অপরাহ্নে তোমার গৃহে নামিয়া তোমাদের গৃহদেবতাকে প্রণাম করিয়া যাইব। এবং তোমার পুত্র যাহার নাম ঘরে বসিয়া দূরাগত পুষ্পসৌরভের মতো নিকটে আসিয়া পেঁাছিতেছে তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া যাইব। সে যেন বাড়িতে থাকে। আরও কিছু আলাপ করিবার আছে তোমার সঙ্গে। তোমার ভ্রাতা শ্রীজটাধর আমাকে একখানি পত্র দিয়াছে। সাক্ষাতে সমস্ত কথা হইবেক। ইতি—"

গঙ্গাধর বেশ খানিকটা চিন্তিত হয়েছেন মনে মনে। রামরাম স্মৃতিতীর্থ অযাচিত হয়ে মনুকে দেখতে আসছেন এর জানা অর্থ মনের মধ্যে উঁকি মেরে যাচ্ছে। মনুকে নিয়ে যে হইচই হচ্ছে, লোকে তাকে দেখতে আসছে তার দুটো দিক দুটো অর্থ। একদল লোক দেখতে আসছে গঙ্গাধরের ছেলে ইংরেজী শিখে ব্রাহ্ম হয়ে গেছে। আর একদল আসছে যে ছেলেটি কলকাতায় গিয়ে কলকাতার বড় বড় ঘরের ছেলেদের হারিয়ে দিয়ে ফার্স্ট হয় তাকে দেখতে। প্রথম গুজবটা তো রটেছে জটাধরের জটাধর-জননী এস্টেটের নায়েব থেকে। গত বৎসর-খানেকের উপর অর্থাৎ মন্মথ যেদিন থেকে জটাধরের বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে তখন থেকেই কথাটা রটেছে। জটাধর লেখে নায়েবকে, লেখে—"ও-বাড়ির বড়কর্তাকে বলিবে যে, মন্মথ এ বাটী হইতে চলিয়া গিয়াছে। সে সম্প্রতি তাহার এক ব্রাহ্ম সহপাঠী বন্ধুর বাটীতে যাওয়া আসা করিতেছিল—তাহাদের বাটীতে চা পাঁউরুটি এবং তৎসহ মুরগীর ডিম

ইত্যাদিও খাইতেছিল বলিয়া আমরা খবর পাইয়াছিলাম। এই খবর আনিয়াছে মন্মথরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রীরাধাশ্যাম ভট্টাচার্য—পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্যের পুত্র। মন্মথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছে সংস্কৃত পড়িত।

"এসব অপ্রিয় সংবাদ পত্রযোগে জ্ঞাত করা অতীব অপ্রীতিকর কর্তব্য। সেই হেতু বড়কর্তাকে আমি নিজে লিখিলাম না। তোমাকে লিখিতেছি, তুমি তাঁহাকে জ্ঞাত করাইবা।"

জটাধর-জননীর এস্টেটের নায়েব এতদিন পর্যন্ত মোটামুটি বড়কর্তা বা বড় ভটচাজ মহাশয়ের অধীন ছিল, কাজে কর্মে না হলেও সামাজিক ক্ষেত্রে অধীন ছিল—এবার সে সমান সমতল মেঝেতে দাঁড়িয়ে কথা বলবার অধিকার পেয়ে পঞ্চমুখে কথা বলতে শুরু করেছিল। এর উপরেও গুজব যে স্মৃতিতীর্থ মহাশয় নাকি কলকাতায় গোপীনাথ পণ্ডিত মশায়কে পত্র দিয়েছেন। তার উত্তরও তিনি পেয়েছেন।

গঙ্গাধর ভট্টাচার্য সেই কারণে উদ্বিগ্নচিত্ত হয়ে রয়েছেন তবে মুখে তা' প্রকাশ করেন নি। কিন্তু তার আভাসও গোপন নেই। মন্মথও তা' অনুভব করছে। কাদম্বরীও জানে, সেও অনুভব করছে, কিন্তু মুখে কিছু বলছে না বা বলে নি।

মন্মথর মনে কিন্তু একটা উত্তাপ জমা হয়েছে। সেও সেটা মনে চাপা দিয়ে রেখেছে। গরমের দিন কোঠাঘরের উপরতলা থেকে নিচের তলার মাটির ঘর অনেক ঠাণ্ডা। অন্যদিন গঙ্গাধর এবং কাদম্বরী নিচের তলাতেই বিশ্রাম করেন। উপরতলায় শোয় মন্মথ। সে বইটই পড়ে। কলকাতা থেকে আসবার সময় সে অনেক ইংরেজী বই এনেছে। বইগুলি সত্যদের বাড়ির বই। তার ইচ্ছে এই সময়টার মধ্যে এই বইগুলি সে পড়ে নেবে। ইংরেজীতে সে সেই ফোর্থ ক্লাস থেকেই পিছিয়ে আছে। চেষ্টা সে অনেক করেছে, রমেশ স্যার তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন—পড়িয়েছেন বাড়িতে; এবং তার ফলে সে পরীক্ষায় সত্যকে ছাড়িয়ে দু' তিন নম্বরের জন্য ফার্স্টও হয়েছে। কিন্তু সে তার মুখস্থ বিদ্যার জন্য; নেসফিল্ড রোজাহিন্ট দু'খানা ইংরেজী ব্যাকরণের বই সে প্রায় কণ্ঠস্থ করে ফেলেছে। কিন্তু যখন বাংলা থেকে ইংরেজী ট্রানস্লেশন করতে হয় কিংবা ইংরেজী কবিতা ও সাহিত্যকে ব্যাখ্যা করতে হয় তখন সত্য হয় স্বচ্ছন্দ আর সে কেমন যেন আড়ষ্টতা অনুভব করে। সেই কারণেও বটে আর এখন যেন ইংরেজী বই পড়তে ভালো লাগে বলে সে এই ইংরেজী বইগুলি একের পর এক পড়ে যাচ্ছে। ইংরেজী কবিতা, ইংরেজী উপন্যাস আশ্চর্য সুন্দর—মনকে মাতিয়ে দেয়। আহার-নিদ্রা ভুলিয়ে দেয়। বাবা তার এই তন্ময় হয়ে পড়া দেখে মধ্যে মধ্যে বলেন —হ্যাঁরে এগুলি তো ইংরেজী কাব্য আর ওইগুলি—গদ্যতে লেখাগুলিই বুঝি উপন্যাস? কাঁঠালপাড়ার চাটুজ্জে বাড়ির বঙ্কিম চাটুজ্জে যেমন সব লিখেছে—কপালকুণ্ডলা দুর্গেশ-নন্দিনী টন্দিনী তেমনি বই এগুলি?

মন্মথ খুব কথা বলে না। বাবা বলেন—ওর একটা নেশা আছে। আশ্চর্য নেশা। কপালকুণ্ডলা দুর্গেশনন্দিনী আমি পড়েছি। কপালকুণ্ডলা একেবারে দেবী প্রতিমা। বইখানা পড়ে আমি সারারাত্রি ঘুমুই নি।

আরও একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—ঘুম এলেই যেন গঙ্গার পাড় ধসে পড়ার শব্দ উঠেছে। মনে হয়েছে—আঃ কপালকুণ্ডলা ভেসে গেল! তবে দুর্গেশনন্দিনীতে—। একটু থেমে আবার বলেন—ও বাপু ওই ক্ষত্রিয় রাজা মহারানা মানসিংহের ছেলের সঙ্গে পাঠান নবাবের কন্যার প্রেম—ওটা যেন—

নিজেই লজ্জিত হন গঙ্গাধর। মন্মথও মুখ নামিয়ে চুপ করে থাকে। গঙ্গাধর আবার বলেন—তুই কালীপ্রসন্ন সিংহীর অনুবাদ করা মহাভারত পড়েছিস? সুন্দর হয়েছে। গদ্যটি চমৎকার। আর ভাবটিও যথাযথ রক্ষা করা হয়েছে।

নতুনমা কাদম্বরীর সঙ্গে মন খুলে কথাবার্তা হয়। কাদম্বরী বয়সে তিন চার বছরের বড়; তাহলেও দেখতে মন্মথর থেকে ছোট; বিশেষ করে এই যে বাড়ের সময় মন্মথ ছিলহিলে লম্বা হয়ে উঠেছে, গোঁফের রেখা বেশ স্পষ্ট নীলাভ হয়ে উঠেছে, চিবুকের নিচে দাড়ির আভাস দেখা যাচ্ছে—এখন মন্মথকেই বড় দেখায়। মাথায় তো বড় বটেই।

কাদম্বরীও তাকে জিজ্ঞাসা করে—ছোটবাবা—

মন্মথ বলে—না। ছোটবাবা কি? ছোটবাবা মানে কি? ওসব ব'ল না।

কাদম্বরী হেসে বলে—লজ্জা হচ্ছে বুঝি! ভয় নেই, আমার মা তো বেঁচে নেই যে "ও কর্তা বলি শুনছ" বলে কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলবে—কি দিন-রাত্তির এই সব পড়ছ? তার থেকে এক 'শোলোক' বল আমরা সব শুনি!

'শোলোক' হল শ্লোক। কিন্তু মানে তার গল্প—এক ছিল রাজা। কিংবা পুরাকালে অযোধ্যায় সূর্যবংশোদ্ভূত ক্ষত্রিয় রাজারা রাজত্ব করতেন। সেই বংশে তখন মহারাজ অজ রাজার পুত্র রাজা, নাম দশরথ। এই শোলোকের কথাই শোনে লোকে। কিংবা 'কুনি বুনি' দুই পেত্নীর গল্প।

কাদম্বরী বলে—আমি তোমার খুব লক্ষ্মীমেয়ে হব, তোমার সব কথা শুনব। যা বলবে তাই শুনব যদি বল—কাদি ব'স তো বসব, যদি বল—ওঠ তো উঠব। যদি বল—হাস তো হাসব, আবার কাঁদ বললে ভ্যাঁ করে কেঁদে দেব।

মন্মথ হেসে ফেলে নতুনমায়ের কথা শুনে। বলে—বেশ, এখন কি কথা তাই বল।

—ওঠ, জল খাও। বেলা অনেকটা হল, আজ আবার আমার মঙ্গলবার আছে।

—তাল কেটেছে তো তাহলে!

—তা' কেটেছে। এস, খাবে এস।

—না। সে তোমাদের ওই অস্ত্র দিয়ে ওঠানো কোয়া আমি খাব না। আমি তালে মুখ দিয়ে আঙুলে তুলে খাব।

—তাই এস। তাড়াতাড়ি এস। কিন্তু ও বইখানা কি পড়ছ বল তো? নাওয়া খাওয়া ভুলেছ?

—খুব ভালো বই। ইংরিজী উপন্যাস। আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রও ঠিক লাগে না ছোট মা!

—তা কি করে বলি বল? কই গল্প করে বললে না তো কোনোদিন।

একটু হেসে মন্মথ বলেছে—তা কি হয় ছোটমা? ইংরিজী ভাষার গল্প আর কি সুন্দর লেখা। মুখে বাংলায় তা বলা যায় নাকি? ওরে বাপ্ রে। জানো, এই ভাষাটি কি সুন্দর! কি বলব তোমাকে!

—লোকে কি বলছে জানো?

—কি বলছে?

—বলছে—অমুক ভট্টাচার্যির বড়ছেলে গাদা গাদা ইংরিজী বই পড়ে ফেলেছে এরই মধ্যে, দেখবে আর দু'চার বছর যেতে যেতে একেবারে সায়েব হয়ে যাবে!

—বলুক। বলতে দাও। যত সব হিংসুটের দল—!

কাদম্বরী বলে—শিষ্যেরাও দু'চারজনে জিজ্ঞাসা করে—'ঠাকুরমশাই, আপনার ছেলে তো খুব ইংরিজী লেখাপড়া শিখছে—তা' উনি কি আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখবেন? শিষ্য-সেবকের কাজ কি করবেন উনি?'

চমকে উঠেছিল মন্মথ। কথাটা কোনোদিন এমনভাবে তো তার সামনে আসে নি৷ সে ভাবনাটা মাথায় নিয়ে সেদিনও ঠিক এই কোঠার মেঝেতে বুকে বালিশের উপর ভর দিয়ে সামনে খোলা ইংরেজী বইখানার পাতার উপর অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। এ সময়ের

দুপুরের গরম বাতাসের নাম ঝলা। ঝলা আসে ঝলকে ঝলকে যা দমকায় দমকায় বয়। সেই বাতাসে বইয়ের পাতাগুলো ক্রমান্বয়েই উড়ে উড়ে চলছিল। বইখানাকে বন্ধ করে কাদম্বরীই বলেছিল—সে আমি বলে দিয়েছি। তোমার বাবা মাথা চুলকোতে লাগল। —তাই তো! কথাটা তো সত্যিই ভাবনার কথা। আমি বললাম—কি ভাববার আছে বাপু; মনু আমি প্রায় একবয়সী। মনু যদি নাই পারে শিষ্যসেবক চালাতে তাহলে আমি তো থাকব, আমার জীবন তো মেয়ের জীবন—সহজে তো যাবার নয়—আমি চালাব। আমার পর আমার পেটের ওই তো একটা জীব এসেছে—গোবিন্দ ওকে বাঁচিয়ে রাখলে ওই চালাবে।

কাদম্বরীর কথা শুনে সে মুখ হয়েগিয়েছিল। সে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ছিল কিছুক্ষণ, তারপর বলেছিল—আমি ছোটমা এম.এ. ল' পাস করে ঠিক করে রেখেছি ওকালতি করব হাইকোর্টে। সত্যর বাবা জ্যোতিপ্রসাদবাবু বলেন তিনিও খুব গরীব ছিলেন। ওকালতি করে এই তো পঁচিশ বছরের মধ্যে বাড়ি গাড়ি করেছেন। টাকাও অঢেল। আমিও পঁছিশ বছরের মধ্যে এমনি বড়লোক হব। তোমাদের নিয়ে যাব কলকাতায়। ঠাকুরবাড়ি করে দেব। গোবিন্দকে লক্ষ্মীজনার্দনকে নিয়ে যাব। এখানে বাড়ি করব মন্দির করব। এখানেও কয়েকমাস ঠাকুর থাকবেন। পুজো করবার লোকও থাকবে। কিন্তু ও শিষ্যবাড়ি সেধে বেড়াবে কেন বাবা? শ্রাদ্ধশান্তিতে গিয়ে দানই বা নেবে কেন? শিষ্যদের মন্তরটন্তরই বা দেবে কেন?

কাদম্বরী বলেছিল—তাহলে এ কাজ করবে কে? লোকে মন্ত্র নেবে কার কাছে?

প্রশ্নটা শুনবামাত্র মন্মথর মনে হয়েছিল তার পিঠের দিকটা যেন ঘরখানার একপাশের দেওয়ালে ঠেকে গেছে। চট করে এর উত্তর খুঁজে পায় নি সে।

কাদম্বরী বলেছিল—বল!

মন্মথ বলেছিল—লোকে মন্ত্র নেবে কার কাছে, তার ভাবনা তারাই ভাববে ছোটমা—এত ভাবনা ভাববার কথা আমাদের নয়।

—তাই কি হয়? কত বড় গুরু বংশ তোমাদের!

মন্মথ চুপ করেই থেকেছিল। উত্তর দেয় নি। বাইরে বাপের সাড়া পাচ্ছিল। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য যেন কার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বাইরের খামার-বাড়িতে এসে ঢুকলেন বলে মনে হয়েছিল তার।

কাদম্বরী বলেছিল—দেখ, সংসারে যা হবার তাই হয়। যা ঘটবার তা' ঘটে। মানুষ তার পথ আটকাতে পারে না। মুখে, সেখানে, কিছুতেই এ আমি হতে দেব না, এসব বলে লাভ কি বল? তোমার এই সব কথাবার্তার জন্যেই লোকেরা নানান কথা বলছে। কেউ বলছে নাস্তিক হয়েছে, কেউ বলছে ব্রাহ্মদের টানে পড়েছে। কেউ বলছে—ভালো করে পড়ে পাস করলে সরকার থেকে কি বৃত্তি পায় সেই বৃত্তি নিয়ে বিলাত গিয়ে সাহেব হয়ে আসবে ও ছেলে। গোবিন্দপুরের ভটচাজবাড়ির ধর্ম ভক্তি আন্ধেকখানা জটাধর ভটচাজ ব্যবসা করতে গিয়ে বেচে দিয়েছে—বাকি আন্ধেকটা এই ছেলে লেখাপড়া শিখে ছেঁড়া পুরনো পুঁথির মতো ঝেঁটিয়ে ফেলে দেবে।

মন্মথর ভুরু কুঁচকে উঠেছিল। সে শুনেই যাচ্ছিল। এসবের জবাব সে দিতে চায় না। তা' ছাড়া বাবার সাড়া পেয়ে বেশী সাবধান হতে চেয়েছিল। এই সময়েই গঙ্গাধর ভটচাজ বাড়ি ঢুকেছিলেন। সঙ্গে তাঁর দু'জন ভাগ জোতদার, পাশের গ্রামের 'হরন্দ' আর 'গজেন্দ' দুই ভাই। গরুর গাড়িতে চার বস্তা তিল এবং দু'টিন আখের গুড় নিয়ে এসেছে। এসবই জমির উৎপন্নের ভাগ। সকালবেলাতেই গঙ্গাধর গিছলেন ভাগ দেখে নেবার জন্য। ওই ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই ঘরে ঢুকে বলেছিলেন—কই রে মনু! তোর জন্যে খেজুরের

গুড়ের পাটালি এনেছি—নে। ছেলেবেলায় বড্ড রুচি ছিল তোর।

একখানা শালপাতার মোড়কে খানকয়েক লবাদ দাওয়ার উপর নামিয়ে দিয়ে বললেন—এ যেন ঠাকুরদের ভোগে দিয়ো না। বুঝলে? হরুন্দই বললে—ঠাকুরদের ভোগে দেবেন না, খুব ছুঁৎপবিত মেনে তৈরি নয় বাবা!

কথাটা বললেন কাদম্বরীকে। তারপর মন্মথর দিকে তাকিয়ে বললেন—হ্যাঁরে মনু, গোপালগঞ্জের রামহরি পণ্ডিতের সঙ্গে কি তকরার করে এসেছিস?

মন্মথ বাপের মুখের দিকে তাকালে, বললে—তর্ক তো কিছু করি নি—

—করিস নি? তবে যে, হবিবপুরের মোহন মিয়া বললেন; ওনার সঙ্গে দেখা হল পথের মধ্যে। মস্ত একটা কালো ঘোড়া কিনেছেন মিয়া—আমাকে দেখে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে বললেন—ঠাকুরজী, আপনার বড়ছেলে নাকি খুব লায়েক হয়েছে—লিখাপড়ায় নাকি খুব এলেম। শোনলাম রামহরি পণ্ডিত নবাব সিরাজউদ্দৌলার কথা পড়াচ্ছিল পোরাইবেটে ছাত্তরকে। বলছিল, নবাব সিরাজউদ্দৌলা খুব জুলুমবাজ জালিম লোক ছিল, বদমাশ আদমী ছিল, তার অত্যাচার থেকে ই দ্যাশকে বাঁচাবার জন্যে ইংরেজ কোম্পানীর ক্লাইব সাহেব আর নবাবের সেনাপতি মীরজাফর একটা শলাপরামর্শ করে পলাশীর যুদ্ধে নবাবকে হারিয়ে দিয়েছিল। নবাব ছাওয়াটার জুলুমের আর শ্যাষ ছিল না। তা' তুই বলেছিস—না, ওসব ইংরেজদের সব সাজানো মিছে কথা। একজন ষোল সতের বছরের ছেলে, সে অত অত্যেচারী হল কি করে? রামায়ণের বিভীষণ আর ইতিহাসের মীরজাফর—এরা হল একজাতের মানুষ। আমরা তো শুনেছি নবাব ভীষণ অত্যাচারী ছিল—গঙ্গায় নৌকো ডুবিয়ে মানুষ ডুবিয়ে মেরে মজা দেখত; মেয়েদের উদর চিরে সন্তান কেমনভাবে থাকে তা' দেখত। এসব তার খেলা ছিল। তা' তুই বলেছিস—।

মন্মথর ভুরু কুঁচকে উঠেছিল—সে মাঝখান থেকেই বলেছিল—হ্যাঁ, তা' বলেছিলাম। যা সত্যি তাই বলেছি। তবে তর্ক আমি করি নি পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে। গোপালগঞ্জের হাটে গিছলাম, পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রণাম করলাম। কেমন আছিটাছি জিজ্ঞাসা করছিলেন। এমন সময় হাটের মালিক সিংহীবাবুদের খোকাবাবু—আমাদেরই বয়সী সে—সে চাপরাসী সঙ্গে করে হাটে ঢুকে জনকয়েক হাটুরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাদের মারধর আরম্ভ করে দিলে—চাপরাসীদের হুকুম দিলে গলায় গামছা বেঁধে নিয়ে চল কাছারীতে।

আমি বললাম—বাবা! এই রকম অত্যাচার! এ তো দেখছি মগের মুলুক। তা' পণ্ডিতমশায় বললেন—সিরাজউদ্দৌলাকে হার মানায় এ ছেলে। তাইতে কথাটা উঠল। আমি বললাম—না কথাটা ঠিক নয় পণ্ডিতমশায়। আজকাল সব বড় বড় পণ্ডিতেরা বলছেন সিরাজউদ্দৌলার অখ্যাতি অপযশ অপবাদ সব হল ইংরেজদের তৈরি করা। আসল পাষণ্ড হল মীরজাফর আর তার ছেলে মীরন। তাই বলেছিলাম রামায়ণের বিভীষণ আর ইতিহাসের মীরজাফর হল পাপী! তা' নিয়ে এত হইচই হয়েছে তা' তো আমি জানি না।

গঙ্গাধর বলেছিলেন—হইচই খুব হয়েছে। বিভীষণকে পাপী বলা নিয়ে একদল খুব আপত্তি করেছে।

মন্মথ চুপ করে থেকেছিল। গঙ্গাধর কথার জের টেনে বলেছিলেন—কথাটা অবশ্য অন্যায় বলেন নি। রাবণ মহাপাপী, রাক্ষসাচারসর্বস্ব মহা বলবান এক পাষণ্ড—তার কাছে অকর্ম কুকর্ম কিছু নাই। পাপ নাই পুণ্য নাই। পাপেই তার একমাত্র আসক্তি। ধর্মরাজ যমকে দিয়ে ঘোড়ার ঘাস কাটিয়ে তার পরিতৃপ্তি। সুতরাং বিভীষণ সীতা হরণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে পদাঘাত খেয়ে তাকে পরিত্যাগ করে কর্তব্যই করেছিলেন। অন্যায় বা অধর্মের

কাজ করেন নি।

কথাটার সেদিন ওইখানেই ছেদ পড়েছিল। আর অগ্রসর হতে পায় নি। পুকুরে মাছ ধরে মাছের ভাগ নিয়ে এসেছিল জেলেরা। মাঠের পুকুরে মাছ ধরা হয়েছে। খাড়ুই থেকে কয়েকটি আধ সের আড়াই পো ওজনের কাতলা মাছ উঠোনে ফেলে দিয়ে বলেছিল—জটা-জননীর নায়েব বললেন ওনাদের ভাগে আজ কিছু বেশী নেওয়া থাকল। আপনকার সিকি আর জটাজননীর দেবোত্তর হয়েছে বারো আনা। আজ মাছ ওনারা নিলেন একটা আট সের রুই আর জটাজননীর ভোগের তরে একটা কাতল—ওজনে খরখর এক সের। এই হল গিয়ে ন' সের এক পো। আপনকাদের পাওনা হয় তিন সের। তা' এই তিনটেতে হবে খরখর দেড় সেড়। তা' নায়েব বললে দেড় সেরই পাওনা রইল।

কাদম্বরী বললে—বলি হ্যাঁরে, আট সের রুইটা ওরা নিলে—কেন, আমাদের কেটে ভাগ করে দিলে না কেন? মনু মাথাটা খেতো।

গঙ্গাটর এগিয়ে এলেন—থাম থাম। বকে না। মনু এই বড় কাতলাটার মাথা খাবে!

কাদম্বরী থামল না। বললে—তুমি নিজে মাছ খাও না বেশ কথা, কিন্তু ছেলে এসেছে কলকাতা থেকে—তা' ছেলের জন্যেও চাইবে না!

—চাইতে হবে কেন? ওই তো ওই কাতলাটা রয়েছে।

মাথা চুলকে জেলে হাটকুড়ো বললে—আজ্ঞে আজকে একটা ভেট যাবেন গো থানার নেস্‌পেক্টরবাবুর কাছে। আম লিচু জামরুল—অনেক দ্রব্য। তার সঙ্গে বড় মাছটা মানাবে ভালো। তাই—। আর বড়বাবা তো কখনও কিছু বলেন না। যা দেয় তাতেই তুষ্টি।

কাদম্বরী কিন্তু এতে খুশীও হল না, শান্তও হল না। সে বকতেই লাগল আপন মনে। কতদিন এইভাবে যে মাছ ভাগ করতে গিয়ে ওরা বেশী মাছ নেয়—কে তার হিসেব রাখে? নিজে মাছ খান না! গোবিন্দের ভোগ নিরামিষ। মাছ খায় শুধু কাদম্বরী—তাও সধবা নারীর সিঁদুর নোয়ার কল্যাণের জন্যে। ওদের জটাধরজননীর আমিষ নইলে ভোগ হয় না। মাছ নিত্য চাই। তার ওপর পর্ব আছে—দুটো অষ্টমী দুটো চতুর্দশী পূর্ণিমা অমাবস্যা সংক্রান্তি, এ ছাড়া আরও আছে—এই জ্যৈষ্ঠতেই আছে রটন্তীকালীপুজো। ওরা তো নিয়েই যাচ্ছে। নিয়েই যাচ্ছে।

গঙ্গাধর বললেন—বেশ তো, আমরাও নেব—

—নেবে? বেশ। হিসেব রেখেছ?

গঙ্গাধর বললেন—তুমি রেখেছ আমি জানি।

থতমত খেয়ে গেল কাদম্বরী, বললে—কে বললে?

—দেওয়ালে দাগগুলো দিয়ে রেখেছ, আমি দেখি নি ভাবছ? গোটা রান্নাঘরের সামনের দেওয়ালটা দাগ দিয়ে দিয়ে যাও; আমি দেখেটেখে নিশ্চিন্ত হয়েছি। একেবারে পাকা খতিয়ান খাতা। জটাধরজননীর জ হরন্দর হ গজন্দর গ। দেনা-পাওনার দে পা। আমি সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি। মাছ-এর মা লেখা থাকে—ধানের ধ লেখা থাকে।

কাদম্বরীর লজ্জার আর শেষ ছিল না। লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠে মাথার ঘোমটাটা খানিকটা টেনে দিয়ে ওদিকপানে চলে গেল। অর্থাৎ ঠাকুরঘরের দিকে। ওখান থেকেই সে এবার বললে—কথায় আছে, মন বোঝে না ভিক্ষে করি মিছে কাজে ঘুরে মরি। ভিক্ষে মেলে না জাত যায় পেট ভরে না। হিসেব না হয় আমি রেখেছি কিন্তু ফলটা কি? সেই দেওয়ালের দাগ দেওয়ালেই থাকল, অথচ অখ্যাতি রটল ছোটভাইয়ের উন্নতিতে বড়ভট্‌চাজের বুক চড়চড় করছে। ছেলেকে ভাইয়ের বাড়িতে না রেখে পরের বাড়িতে ভিক্ষের অন্ন খাইয়ে পড়তে পাঠিয়েছে। ছেলে সায়েব হবে—ব্যারিস্টার ম্যাজেস্টার জজটজ হবে।

—না-না-না। কি বল তার ঠিক নাই। ছি! ছি! ছি!

মন্মথ এতক্ষণ চুপ করেই বসে একটা কাঠি দিয়ে নিকানো দাওয়ার উপর দাগ কাটছিল, মধ্যে মধ্যে রান্নাঘরের বাইরের দেওয়ালে মায়ের দেওয়া হিসাবের দাগগুলি দেখছিল, সারি সারি সরু কাঠিতে টানা দাগ। দাগগুলির দৈর্ঘ্যের একটি নির্দিষ্ট মাপ আছে, যা থেকে বোঝা যায় কোন্‌টি সিকি কোন্‌টি আধখানা কোন্‌টি বারো আনা কোন্‌টি ষোল আনা মাপের। মাছের 'মা' লেখা হিসাবে সত্য সত্যই দাগের আর শেষ নেই। ছোটমা তার পাকা হিসেবী গিন্নী। সাল সন পর্যন্ত লেখা আছে। হঠাৎ তার একটা কথা মনে হল। মনে হল ছোটখুড়ীর কথা। ছোটখুড়ীর কথাবার্তার মধ্যে একটা আশ্চর্য অবজ্ঞা আছে। নিজের সন্তান হবে এই সম্ভাবনা প্রকাশ পাওয়ামাত্র আর এক মানুষ হয়ে গেছে। মনে হল, তার নতুনমায়ের কোলেও তো নতুন খোকা এসেছে। তারও কোল জুড়ে এসেছে তার ছেলে। তার অন্নপ্রাশন হবে। সেই অন্নপ্রাশনে তো এই ভাগের মাছ নিতে পারা যায়। ছোটখুড়ীর ইদানীংকার ব্যবহারে সে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছে। শুনেছে, কাকার বংশধরের অন্নপ্রাশনের নাকি খুব সমারোহ হবে। সমারোহটা এখানে হবে সেখানে হবে। এবার ১লা বৈশাখ জটাধরজননীর পুজো সেই কারণে মোটামুটি সংক্ষেপে সারা হয়েছে। ছোটকাকী কাঁচা ছেলেকে নিয়ে এখানে আসবেন কি করে! আর ছোটকাকী না এলে ছোটকাকাই বা আসবেন কি করে! সেই সূত্রেই শোনা গেছে আগামী অন্নপ্রাশনে ধুমধামের বিবরণ।

মন্মথ বলেছিল—ছোটমা, তুমি আমাকে বুঝিয়ে দিয়ো, আমি হিসেব করে কাগজে লিখে নেব। এই পাওনা মাছ আমরা আমাদের খোকনের অন্নপ্রাশনে খরচ করব।

ও ঘরের দাওয়ার উপরে দাঁড়িয়ে ছিল কাদম্বরী, সে তার দিকে ফিরে ভারী সুন্দর হেসে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে গঙ্গাধরকে। অর্থাৎ বল বল কথাটা বল।

মন্মথ বাবাকে খোঁচা দিয়েছিল—বাবা!

গঙ্গাধর হেসে বলেছিলেন—আমাদের লক্ষ্মীজনার্দন আর রাধাগোবিন্দ তো কোনোকালে মাছ খান না রে। মাছ নিয়ে কি করব?

—গ্রামের লোককে নেমতন্ন করে খাওয়াব। যজ্ঞি হবে।

হঠাৎ জমির ভাগীদার হরুন্দ বলে উঠল—বড়বাবাঠাকুর!

—কি রে?

—ছোটদাঠাকুর তো ঠিক বলেছেন গো—অ্যানেকদিন বাড়িতে 'কিয়াকম্ম' কিছু হয় নাই। তা' করেন না কেন একটা ভোজভাতের কাণ্ড।

মন্মথ বলেছিল—ওই শুনুন ও কি বলছে!

সঙ্গে সঙ্গে হরুন্দ বললে—বাবু ভটচাজবাবুর ছেলের ভাতে নাকি সে তুলুকেলাম বেপার হবে। ভোজভাত, জটামায়ের পুজো, শোনলাম ডাইনে বাঁয়ে বলি, যাত্রাগান, খেমটা নাচ, তরজা পালা। ও বাড়ির লায়েববাবু বিবরণ বলছিলেন সেদিনকে, শোনলাম আমরা।

এবার গঙ্গাধর একটু যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ একেবারে স্বর্গে থেকে দেবতারা আসবেন—গন্ধর্বলোক থেকে গন্ধর্বরা আসবে। বৈকুণ্ঠ থেকে গোবিন্দ আসবেন। মতঃ সব।

কাদম্বরী বলে উঠল—সে না হয় নাই এলো—স্বর্গের দেবতারা বৈকুণ্ঠের গোবিন্দ না হয় আমাদের বাড়িতেই এলেন। সেই সঙ্গে গ্রামের ব্রাহ্মণদের মেয়েছেলেদের খাওয়ালে কি হয়? মন্দ হয়?

প্রসঙ্গটাকে সরিয়ে দিয়ে গঙ্গাধর বললেন—এ বাড়ি গোবিন্দ নতুন করে কি আসবেন। তিনি তো এ বাড়িতে অধিষ্ঠান হয়ে রয়েছেন। 'যস্মিন্‌ তুষ্টে জগৎতুষ্ট'—বুঝেছ—এ ঘরে

যিনি তিনি হলেন গোবিন্দ।

গজেন্দ্র বললে—ইবারে ওনারা প্রভুরে নিয়ে যাবেন ওবাড়ি। এই অন্নপ্রাশনের সময়।

কাদম্বরী বললে—কি করে নিয়ে যাবে? ঠাকুরপো তো ঠাকুরের জমি সম্পত্তির শুনেছি ঠাকুরেরও দাম নিয়েছে।

—ওনারা আবার টাকা দেবেন আপনাদের। সে যা চাইবেন।

—কে বললে? এ কথা তোমাকে কে বললে গজেন্দ্র? গঙ্গাধরের কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে উঠেছিল এবার। কপালে কুঞ্চনরেখাও ফুটেছিল।

গজেন্দ্র বললে—আজ্ঞে, আমার সম্বন্ধী গোপাল যে হল গিয়ে হরিহরপুরের ঠাকুরমশায়ের ভাগ জোতদার। সেই বলছিল সেদিনকে নাকি জটাজননীর নায়েব গিয়েছিল ঠাকুরমশায়ের কাছে। বাবু ভটচাজবাবু চিঠি নিকে তার ঠাকুরের কাছে যাতি বলেছেন। বলেছেন—তাঁরে বলবা—।

সে অনেক কথা বলে গেল। তার মর্মার্থ হল এই যে, জটাধর তার পৈত্রিক ঠাকুর লক্ষ্মীজনার্দন এবং রাধাগোবিন্দের অংশ ফিরে চেয়েছে। একদিন সে যে দেবোত্তর সম্পত্তি নিজের সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছিল তা' সে স্বীকার করেছে এবং গ্রামের চক্রবর্তীরা অবস্থাপন্ন হয়ে উঠে তার কাছে গৃহদেবতা দুটির সেবাপুজার অংশও যে বিক্রি করবার কথা ভেবেছিল তাও স্বীকার করেছে। পরে দাদার কাছে টাকা নিয়ে ঠাকুরের অংশ তাকেই দিয়েছিল তাও স্বীকার করেছে। কিন্তু—।

কিন্তু তার আজকের দাবি হল এই যে, এই দেবতা দুটির সেবাপুজার অংশ তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। কারণ এর জন্য তাদের স্বামী-স্ত্রীর মনে এতটুকু শান্তি নেই। গ্রামে সে জটাধরজননী নামে কালী প্রতিষ্ঠা করেছে, তাতেও তার মন পূর্ণ হয় না। দাদা এই পুজো উপলক্ষেও লক্ষ্মীজনার্দন এবং রাধা-গোবিন্দকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সেবা-সমারোহ করতে দেন না। অভিযোগ করেন—জটাধরজননীর পুজায় বলি হয়; তাছাড়া আমিষের প্রচলন—মাছ ইত্যাদির ভোগ হয়। এবং এখানে পুজার সময় কিছু কিছু কলকাতার ভিন্নজাতীয় লোকজনও আসে—তারা মদ্যাদি পান করে। এই সব অভিযোগ দেখিয়ে দাদা ঠাকুরকে এ বাড়ি পাঠান না বা ভোগের নিমন্ত্রণ নেন না। এটা তাদের স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে যত বেদনার কারণ তত ভয়ের কারণও বটে। কে জানে কোন্ সেবাপরাধে কি ঘটে— ? কে বলতে পারে? তাই মহামহোপাধ্যায় রামরাম স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের কাছে পত্র লিখেছে—"আপনি আমাদের এই অঞ্চলের সর্বজনপূজ্য এবং মান্য মহোদয় ব্যক্তি। আপনার আদেশের মূল্য দেবতার আদেশের তুল্য। আপনি বিচার করিয়া আপনার এই একান্ত অনুগত জনকে তাহার দেবসেবার অধিকার ফিরাইয়া দিলে আমি কৃতকৃতার্থ হইব—চিরদিন আপনার নাম করিব।"

এই পত্রে নাকি মন্মথর কথা তুলেছে জটাধরবাবু। গজেন্দ্র বললে—দাদাবাবুর নাম নিয়েও পাঁচরকম কথাও নাকি নিকেছে শুনলাম।

হরেন্দ্র বললে—আপোনারে চিঠি নিকে নাকি ঠাকুরমশায় এ বাড়ি আসবেন।

গজেন্দ্র বললে—গোপাল আমারে জিজ্ঞাসা করছিল। বলে, হ্যাঁ বোনাই তোমার মনিবের ছেলে—সে কেমনতর ছেলে হে! বলে নাকি সে ছেলের ইধারেও কাটে উধারেও কাটে আর কাটে সে নাকি ক্ষুরের মতন। খুব ধার ছেলের। তা' আমি বলি—বটে তাই গোপাল! ছেলে খুব জ্বলজ্বলে ছেলে হে! গোপাল বললে—আমার মনিব যাবে একদিন—বুয়েচ —ছেলেটারে চোখে দেখার ইচ্ছা খুব।

চিন্তিত সেইদিন থেকেই হয়েছিলেন গঙ্গাধর ভটচাজ। রামরাম স্মৃতিতীর্থ বড় কঠিন

ব্যক্তি। আজই তিনি আসবেন।

বাইরে জ্যৈষ্ঠের দুপুর ঝাঁ-ঝাঁ করছে, যত উত্তাপ তত উত্তপ্ত হওয়ার দাপাদাপি। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য বাঁ হাতে তালপাতার পাখা চালাচ্ছিলেন আর মধ্যে মধ্যে ভিজে গামছাখানা দিয়ে পিঠের উপর বুলিয়ে নিচ্ছিলেন। মন্মথর সামনে জানলাটা খোলা। সামনেই খিড়কির পুকুর। পুকুর না ডোবা। চারিপাশে ঘন গাছপালা। তার মধ্যে বাঁশের ঝাড়গুলির মাথাই সব থেকে উপরে উঠে আছে এবং হাওয়ায় দুলছে।

পাখির দল এখন স্তব্ধ। ঝিমুচ্ছে। শুধু একটা মাছরাঙা পাখী বাঁশগাছগুলি সব থেকে বড় যেটি বেঁকে এসে ডোবার উপর ঝুঁকে পড়েছে সেইটের মাথায় বসছে, লেজ দোলাচ্ছে আর একসময় ঝপ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবে গিয়ে মুহূর্তে একটা মাছ ধরে উড়ে যাচ্ছে। মন্মথর সম্মুখে খোলা ছিল ডিকেন্সের এ টেল অব টু সিটিজ। কিন্তু পড়া ঠিক হচ্ছিল না।

গঙ্গাধর মধ্যে মধ্যে ছেলেকে প্রশ্ন করেছিলেন—ওসবগুলো বলতে গেলি কেন? কি চতুর্ভুজ হলি তুই।

—কি অন্যায় বললাম। যা সত্যি তাই তো বলেছি। ভূমিকম্প হয় পৃথিবীর বুকের মধ্যে আগ্নেয়গিরির তাপ বৃদ্ধি হলে—বাসুকি মাথা নাড়ার জন্যে নয়। এই তো সত্যি কথা!

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে গঙ্গাধর বললেন—তার সঙ্গে বাসুকী নাগও মাথা নাড়ে—এটা সত্যি হলেই বা দোষ কি? আর ক্ষতিই বা কি?

মন্মথ বিব্রত হয়ে পড়ল। এরই মধ্যে একদিন ও যে ইস্কুলে ইউ পি পাস করে বৃত্তি পেয়েছিল সেই ইস্কুলে বেড়াতে গিয়ে বাঙলার বুড়ো পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক করে এসেছে।

গঙ্গাধর ভাবছেন জটাধর যা লিখেছে তার সমর্থন এর মধ্যেই তো খুঁজে পাবেন রামরাম স্মৃতিতীর্থ। খবর পেয়েছেন এই কথাটিও নাকি স্মৃতিতীর্থ শুনেছেন। গঙ্গাধর বললেন—হুঃ, যত সব সফরীপনা! অল্প জল হলে হয়—লাফাতে শুরু করবে।

কাদম্বরী পাশের ঘরে শুয়ে ছিল—নিঃশব্দে। মুখে কাপড়ের আঁচলখানা ঢাকা দিয়ে পড়েছিল ঘুমন্তের মতো। সে ধড়মড় করে উঠে বসল। বাইরে কয়েকটা কা-কা-কা শব্দ তার কানে এসেছে। গ্রীষ্মের দুপুরে হঠাৎ একসময় স্তব্ধতার থমথমানি ভেঙে দিয়ে পাখিরা ডাক দিয়ে বাসা ছেড়ে বেরিয়ে এসে মাটির ওপরে নামে। সঙ্গে সঙ্গে দু'পহরও শেষ হয়ে যায়। কাদম্বরীর এই শিক্ষা ছেলেবেলা থেকে। সে উঠে পড়ে। আজ সে উঠল বেশী ব্যস্ত হয়ে। গায়ের কাপড় বেশ করে গুছিয়ে চাবির থলিটি পিঠে ফেলে সে যাবার সময় বলে গেল—বলেছে তো হয়েছেটা কি? তোমার মতো ভীতু মানুষ তো আমি দেখি নি।

গঙ্গাধর মুহূর্তের জন্য অন্য গঙ্গাধর হয়ে গেলেন, বললেন—কি বললে?

সে কণ্ঠস্বরে কাদম্বরী এবং মন্মথ দু'জনেই চমকে উঠল। কাদম্বরী যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল, মন্মথ উঠে বসল। দু'জনেই গঙ্গাধরের দিকে তাকাল বেশ একটু শঙ্কার সঙ্গে। গঙ্গাধর মুহূর্তেই আবার নিজেকে সামলে নিলেন—তবুও ঈষৎ একটু কাঠিন্য কণ্ঠস্বরে থেকে গেল; বললেন—ভয়ের কথা নয়। ভয় আমরা করি না কাদু। গোবিন্দপুরের ভটচাজদের অখ্যাতি ছিল—অন্য অন্য ব্রাহ্মণেরা আমাদের গোবিন্দকে বলতেন গোঁয়ারদের গোবিন্দ। সত্যকে তো ভয় না, ভয় মিথ্যাকে। মনু দুটোকে 'সত্যি' বলে মানলে কারই বা কি বলার আছে? 'বাসুকি মাথা নাড়লে ভূমিকম্প হয়'—এ আছে আমাদের শাস্ত্রে পুরাণে, আর পৃথিবীর মাটির তলায় গলন্ত ধাতুর তাপ বেশী হলে তার ফলে ভূমিকম্প হয় এ লেখা আছে সায়েবলোকের বইয়ে, দুইই ও পড়েছে, ও তো নিজে জানে না। ও যখন একটাতে বিশ্বাস

করে বলে এটাই সত্যি তখন অন্যটাতে আপনাআপনি অবিশ্বাস করা স্বীকার করা হয়। আমাকে যদি বলতে হয় আমার ছেলে আমাদের কুলধর্মেই প্রতিষ্ঠিত আছে তাহলে আমি যে মিথ্যাচারী হব। তা' ছাড়া স্মৃতিতীর্থ আমার থেকে বিশ বাইশ বছরের বড়—তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে আমি চাই না। নইলে ভয় কিসের?

চুপ করলেন গঙ্গাধর। মন্মথ চুপ করে বসে রইল। সে এর জবাব খুঁজে পাচ্ছে না। কাদম্বরী ভীত হয়েছে। সে একটু বেশী চাপল্য প্রকাশ করে ফেলেছে তারুণ্যধর্মবশে।

গঙ্গাধর বললেন—যেতে যেতে দাঁড়ালে কেন? যাও, নিচে গিয়ে দেখ, বোধ হয় শিবু পাঠকেরা বাপ-ব্যাটাতে এসে থাকবে এতক্ষণে। টোলঘরখানা খুলে দাও গিয়ে।

আর বলতে হল না। কাদম্বরীই বাকিটা বলে গেল—সে সব আমি ঠিক করে রেখেছি। গালিচার আসন বের করে রেখেছি, ক'খানা পাতব? চারখানা পেতে দিই? মহামহো-পাধ্যায়রা হয়তো দু'জন, তুমি তিনজন, আর একখানা—

—পাঁচখানা পেতে দাও। জটাজননী টোলের পণ্ডিতও হয়তো আসবে। অবিশ্যি সে আমার ছাত্র। তা হোক, এখন তো সে অধ্যাপক। আর রেকাবিতে পান মসলা, হরীতকী কুচি, পান। দু'তিনটি গেলাসে শরবত করে রেখো।

মৃদুস্বরে কাদম্বরী বললে—মিছরি ভিজিয়ে রেখেছি।

হেসে গঙ্গাধর বললেন—এই তো, এই সেবাতেই আর এই গুণেই তুমি আমাকে বাঁধলে কাদম্বরী! মন্মথর জননী আমার সতী। সে আমার জীবনে একান্ন মহাপীঠ হয়ে রয়েছে। বুঝেছ! আর তুমি আমাকে সেবায় বশ করে মাথায় চড়লে। মাথায় চড়েও কিন্তু মাথাখানি শীতল করে রেখে দিয়েছ।

মাথার ঘোমটাটা সলজ্জভাবে একটু টেনে নিয়ে কাদম্বরী এবার বললে—তুমিও নিচে এস। নিজে বরং সব দেখে নেবে।

বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া বলে একটা কথা আছে। মহামহোপাধ্যায় রামরাম স্মৃতিতীর্থের আসার সমস্ত ঘটনাটার মধ্যে যেন ওই কথাটাই সত্য হয়ে উঠল। এ বাড়ির সকলেই মনে মনে খানিকটা চিন্তিত ছিল। এবং গ্রামের কিছু লোক বিশেষ করে গ্রামের সম্পন্ন অবস্থার চক্রবর্তীবাড়ির বড়বাবু এবং মেজবাবু আর জটাজননীর এস্টেটের নায়েব প্রভৃতি ব্যক্তিরা বেশ খানিকটা উৎসাহিতও হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা সকলেই এসেছিলেনও দেখতে। কিন্তু সারা বিকেলবেলাটা আশ্চর্য প্রসন্নতার মধ্যে কোন্ দিকে কিভাবে যে কেটে গেল তা কেউ বুঝতেই পারলে না। মন্মথ মনে-মনে কঠিন হয়েই তৈরি হয়েছিল। তবে বাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মতো মন তার তখনও হয় নি।

দুটি হৃষ্টপুষ্ট বলদে টানা সুন্দর টাপরওয়ালা একখানি গাড়িতে চেপে স্মৃতিতীর্থ মশায় এলেন। খবরটা আগেই এসে পৌঁছেছিল; গ্রামের বাইরে লোক ছিল—সে গাড়িখানাকে আসতে দেখেই ছুটে এসে খবর দিয়েছিল—'আসছেন।' দাওয়া থেকে নেমে গঙ্গাধর পথের উপর দাঁড়িয়েছিলেন—তাঁর পিছনে পিছনে মন্মথও নেমে এসেছিল। স্মৃতিতীর্থ মশায় নামলেন—মাথায় একটু খাটো উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মানুষ, নাকে খুঁত আছে, চোখ দুটি আয়ত সুন্দর, পরনে গরদের ধুতি, গায়েও গরদের চাদর, হাতে সোনার তাগায় পরানো একটি চৌকো তাবিজ, ডান হাতের তিনটে আঙুলে তিনটে আংটি—সোনার নয়—দুটো আংটি রুপোর, তাতে গ্রহরত্ন বসানো রয়েছে—অনামিকায় একটি নবরত্নের আংটি। ছোট করে ছাঁটা মাথার চুলগুলি সাদা ধবধব করছে, মাথার মধ্যস্থলে সুপুষ্ট একটি টিকিতে একটি শ্বেতকরবী বাঁধা।

মন্মথ প্রণাম করতেই স্মৃতিতীর্থ তার দুই কাঁধ ধরে তাকে তুলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—বাঃ বাঃ ! এ যে বড় সুন্দর ছেলে তোমার গঙ্গাধর। কি নাম ? মন্মথ নয় ? মন্মথ কি ? মন্মথকুমারই হওয়া উচিত। নাথটাথ রেখে থাকলে বদলে দিয়ো। এ যে কন্দর্প হে। গঙ্গাধরের আশীর্বাদধন্য মন্মথ, দীর্ঘজীবী হও। কুলকে উজ্জ্বল কর। বংশকে গৌরবান্বিত কর।

মন্মথ অবাক বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এমনটি তো সে ভাবে নি। মনে মনে সে যে অনেক প্রশ্ন তৈরি করে নিজেই তার উত্তর দিচ্ছিল। সে গোটা সায়েন্সের বইখানা মনে মনে আউড়ে তার বাংলা করে যাচ্ছিল। প্রশ্ন করলে একের পর এক বলে যাবে। কিন্তু এ কি হল ? এ তো বড় ভালো লোক। ভালবাসার মতো মানুষ।

স্মৃতিতীর্থ তার দৃষ্টি দেখে হেসে বললেন—কি দেখছ হে ? এ্যাঁ ? এ বৃদ্ধের মুখের মধ্যে কি আছে যার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে দেখছ ?

মন্মথ লজ্জিত হয়ে মুখ নামাল।

গঙ্গাধর বললেন—আসুন।

স্মৃতিতীর্থ মন্মথর হাত ধরে বললেন—তোমার নাম তো ভাই খুব শুনেছি। তা' ভাই নামের মতো রূপ তোমার আছে। পরীক্ষা দিয়েছ ? না ?

কথা খুঁজে পেলে মন্মথ, বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিলাম।

—বাংলাতে তো বলে প্রবেশিকা ?

হেসে মন্মথ বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এরপর কি করবে ?

—কি করব ?

—হ্যাঁ।

—বৃত্তি পেলে এফ. এ. পড়ব। তারপর বি. এ.। তারপর এম. এ.। তারপর ইচ্ছে আছে আইন পড়ব—পড়ে উকিল হব।

গঙ্গাধর ছেলের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। এই মনের কথাগুলি তো মন্মথ তাঁকে বলে নি।

স্মৃতিতীর্থ বললেন—বৃত্তি তুমি পাবে। বৃত্তি কেন তার থেকেও ভালো ফল হবে তোমার !

হাসলেন স্মৃতিতীর্থ। মন্মথর মুখ চোখ জ্বালানো প্রদীপের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল—তার সঙ্গে উদগ্রীব একটি প্রশ্নকে অনুভব করতে দেরি হয় না ; স্মৃতিতীর্থ হেসে বললেন—গোপীনাথ পণ্ডিতকে তো জান ? সে আমার ছাত্র। তার কাছে তো তুমি সংস্কৃত পড়ছিলে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তা' ছাড়লে কেন ?

—ছাড়ি নি তো ! পরীক্ষা এসে গেল, তাই এখন বন্ধ রেখেছি। এইবার আবার পড়ব।

—গোপীনাথ আমাকে লিখেছে—এই বালকটি সম্পর্কে অনেকে বলিতেছেন পরীক্ষায় সম্ভবত প্রথম হইবে।

কথা বলতে বলতে দাওয়ার কাছে এসে পড়েছিলেন, গঙ্গাধর বললেন—আপনি বসুন চৌকির উপর—মন্মথ পা ধুয়ে দিক আপনার !

দাওয়ার উপর আগে থেকেই একখানি জলচৌকি পাতা ছিল—সামনে রাখা ছিল একখানা পিঁড়ি। সামনে ছিল পিতলের বড় গামলায় কানায় কানায় পরিপূর্ণ জল—তার পাশে একটি গাড়ু। গাড়ুর উপর একখানি পরিচ্ছন্ন নতুন গামছা। ইতিমধ্যে কাদম্বরী এসে

দাঁড়াল—তার হাতে একখানি রেকাবিতে ছেঁচা পান।

স্মৃতিতীর্থ এবার গঙ্গাধরের দিকে তাকিয়ে হা হা শব্দে হেসে উঠলেন। এবং বললেন—তুমি এখনও মনে করে রেখেছ, গঙ্গাধর!

গঙ্গাধর মাথা চুলকে সলজ্জ হেসে বললেন—এ কথা কি ভুলবার? তার পর ছেলেকে বললেন গঙ্গাধর—মনু, দাও বাবা, পিতামহের পা ধুয়ে দাও।

স্মৃতিতীর্থ অনায়াসে পা দু'খানি বাড়িয়ে দিলেন, রাখলেন চৌকির সামনে রাখা পিঁড়িখানির উপর। মন্মথ স্মৃতিতীর্থের পা দু'খানির দিকে চেয়ে দেখলে, না, পায়ে আঙুলের ফাঁকে হাজা নেই; পা দু'খানি বড় সুন্দর, আঙুলে গোড়ালিতে জুতোর কড়া নেই হাজা নেই, তা' ছাড়াও একটি লালচে আভা আছে। সে বাঁ হাতে ঘটি ধরে গামলায় ডুবিয়ে পায়ের উপর ঢেলে ডান হাত দিয়ে মার্জনা করে দিলে।

গঙ্গাধর ছেলেকে বললেন—এ তোমার পরম সৌভাগ্য বাবা মনু।

স্মৃতিতীর্থ হেসে বললেন—হ্যাঁ ভাই, এ তোমার ভালো লাগছে?

মন্মথ বললে—হ্যাঁ।

স্মৃতিতীর্থ বললেন—তোমার বাবাকে এই শিক্ষাটি দিয়েছিলেন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। আমি সেদিন এখানে উপস্থিত ছিলাম। বুঝেছ। সে এক প্রখর বৈশাখের নটা আন্দাজ বেলা; সূর্য তারই মধ্যে একেবারে দ্বাদশ সূর্যের উত্তাপে অগ্নিবর্ষণ করছেন। আমি এই পথে সেদিন বাড়ি ফিরছিলাম। সে আজ প্রায় বিশ বৎসর হয়ে গেল। তোমার বাবার তখন নিতান্ত অল্প বয়স। পিতৃবিয়োগ হয়েছে অকালে; জটাধর তখন বালক। তোমাদের এই গুরুপাটের অনেক নাম ছিল তখন। তোমার পিতামহকে আমি জ্যেষ্ঠের মতোই শ্রদ্ধাভক্তি করতাম। এককালে এক টোলে পড়েছি। দাদা বলতাম। তিনি আমাকে ত্রিবেণীর গঙ্গায় সাঁতার শিখিয়েছিলেন। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মশায়দের টোলে পড়তাম। আর শিখেছিলাম পান খেতে ও নস্য নিতে এবং ষোড়শাঙ্গী ধূপ তৈরি করতে। পাঠও অনেক নিয়েছি। শিখেছিও অনেক। তিনি অকালে গেলেন—ছেলে দুটি ছোট। ছোটটি তো নাবালক। তাই যাওয়া আসার পথে দেখে যাই। তা' ছাড়া তোমাদের বাড়ির এই রাধামাধব বিগ্রহ, এঁরও একটা আকর্ষণ আছে। সেদিন সকালে চুঁচড়া থেকে বেরিয়ে বাড়ি যাবার পথে নেমেছি; বসেছিলাম এই টোলগৃহের দাওয়াতেই; চলে যাব, এমন সময় তোমাদের ওই গাড়ি ঢুকবার পথটার সামনে এক বৃদ্ধ এসে দাঁড়ালেন। মনে হল যেন খুব ক্লিষ্ট হয়েছেন। মাথায় একটা ছত্র আছে, কিন্তু অত্যন্ত জীর্ণ—সেকেলে তালপাতার ছাতা। হাতে একটি লাঠি। কাঁধে চাদর—পায়ে একজোড়া চটি আছে, সে চটি থেকে হাঁটু পর্যন্ত একরাশ ধুলো। বললেন—বাবা দুপুরের মতো এখানে একটু আশ্রয় পাব? তোমার বাবা সঙ্গে সঙ্গে বললেন—আসুন আসুন আসুন।

ব্রাহ্মণ এসে বসলেন—সে যেন এলিয়ে পড়লেন। বললেন—আঃ! তোমার বাবা তাড়াতাড়ি গাড়ুটা নিয়ে চলে গেলেন পুকুরঘাটে, জল নিয়ে এলেন। যা জল ছিল তাতে আমি হাত-পা ধুয়েছি। গাড়ুতে জল এনে ব্রাহ্মণকে বললেন—হাত মুখ ধুয়ে ফেলুন। ব্রাহ্মণ গাড়ুটা ধরে তুললেন; কিন্তু গাড়ুটা ছিল ওজনে ভারী, আকারে বড়, জলসুদ্ধ গাড়ু তুলতে কষ্ট হলো তাঁর। গঙ্গাধর গাড়ুটা নিয়ে বললে—আমি দিচ্ছি। সে জল ঢেলে দিতে লাগল। পা ধুয়ে গামছা দিয়ে মুছে দিলেন।

আমার হাতে পাখা ছিল—সেটা নিয়ে বাতাস করতে লাগল।

ব্রাহ্মণ এতক্ষণে সজীব হয়ে উঠলেন। আরামের শ্বাস ফেলে বললেন—আঃ! বাবা বাঁচলাম। বাঁচালে তোমরা।

ইতিমধ্যে তোমার গর্ভধারিণী তিনি তখন বালিকা, তিনি খবর পেয়ে শরবত করে এনে বাড়িয়ে ধরলেন। ব্রাহ্মণ পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে বললেন—তোমাদের মঙ্গল হোক বাবা। তোমাদের তরিবৎটি বড় ভালো। এমনটি ঠিক আজকাল আর পাই না, বাবা। যাব চুঁচড়ার সন্নিকট। বেরিয়েছি খুব ভোরে। এসেছি তা' ক্রোশ তিনেক হবে। ইতিমধ্যে রৌদ্র উঠেছে—সে রৌদ্র এত প্রখর তা' ধারণা করতে পারি নি। পিছনের গ্রামে একটু আশ্রয়ের চেষ্টা করলাম কিন্তু আজকাল নাকি ডাকাতির ভয় বেড়েছে, আর এইভাবে ডাকাতদের চর এসে আশ্রয় নেওয়ার ছল করে বাড়ির খোঁজতল্লাস নিয়ে যায়—তাই তারা না বললে দোষ তো দিতে পারি না। অজ্ঞাতকুলশীলকে আশ্রয় দিতে শাস্ত্রেরই নিষেধ। কি করব। ওঃ—! তা ভগবান মালিক—তিনি তোমাদের মতো সজ্জনের আশ্রয়ে এনে দিলেন। বড় ভালো তোমাদের আচার আচরণ। বড় ভালো।

তারপরই হেসে বললেন—এরপর বাবা একটি পান দেবে অতিথিকে।

ব্যস্ত হলেন তোমার বাবা—পান!

তোমার মা ব্যস্ত হয়ে বাড়ির ভিতরে গেলেন। ব্রাহ্মণও ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, বললেন—না-না, বাবা। আমি দন্তহীন বৃদ্ধ, আমি পান খাই নে। আমার জন্যে আমি বলি নি।

স্মৃতিতীর্থ বললেন—আমিই বললাম, তা' বেশ তো, দাঁত নেই, ছেঁচে এনে দেবে পান। বউমা! পান তুমি হামালদিস্তেতে ছেঁচে আন মা।

ব্রাহ্মণ বললেন—না বাবা। আমি তার জন্যেও বলি নি। আমি তোমাদের সুন্দর আচার আচরণ দেখে খুব খুশী, আরও সুন্দর করতে বলছি। দেখ বাবা, ধর তোমার কোনো পাওনাদার বা কোনোও জন কোনো কারণে তোমার উপর কঠিন আক্রোশে তোমার আপমান কি ক্ষতি করতে এসেছে। তা' বাবা ভেবে দেখ, তুমি যদি তাকে আসুন আসুন বলে সমাদর করে বসিয়ে তার হাত পা ধুইয়ে দাও—মুখে চোখে দেবার জল হাতে ঢেলে দাও—তারপর বাতাস কর তাহলে বাইরে দেহটা জুড়িয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে মন—তারপর এক গ্লাস শরবত। পান করলে ভেতরও ঠাণ্ডা হল। এর পর এক খিলি পান যদি দাও সে পান চিবুতে চিবুতে সারা মুখ রসে ভরে যায়—তাহলে বল তো বাবা, তার রাগ সে তোমার ওপর কি করে ঝাড়বে? বলেই বুড়ো হেসে উঠে ছ্যাঁচা পানটুকু মুখে ফেলেছিলেন আলগোছে। বলেছিলেন—আমি পান খাইনে বাবা, তা' আজ মা যখন এনেছেন তখন এ অমৃত খেয়েই ফেলি—কি বল গো বাবা!

আশ্চর্য সুন্দর কথা বলবার ভঙ্গি স্মৃতিতীর্থের। যারা এসে উপস্থিত হয়েছিল তারা সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিল। মন্মথও শুনছিল। তারও বিস্ময় কম হয় নি। সে তার বাবার কাছে ভাগবত রামায়ণ মহাভারতের গল্প ছেলেবেলায় মুগ্ধ হয়ে শুনেছে; কিন্তু তার স্মৃতি এই ক'বছরে ঝাপসা হয়ে এসেছে। স্মৃতিতীর্থ তাঁর কথার প্রায় সবটাই যেন মন্মথকেই শুনিয়ে বললেন।

অনবদ্য ভঙ্গিতে গল্পটি শেষ করে স্মৃতিতীর্থ বললেন—দেখলাম গঙ্গাধর, তোমার বাবা সেই বৃদ্ধের কথা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মনেই রাখে নি, পালনও করছে; বউমা ছ্যাঁচা পানটুকু পর্যন্ত এনে হাজির করলেন। বলে আবার হাসতে লাগলেন।

এরপর গল্প করলেম খানিকক্ষণ। এ-গল্প সে-গল্প—এক বাগদী ঘরের বীর মেয়ে দ্রবময়ীর গল্প যে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সামনে গাছকোমর বেঁধে কাপড় টেনে পরে দু'হাতে দু'গাছা লাঠি নিয়ে চারজন হিন্দুস্থানী কনেস্টবলের মহড়া নিয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাকে চৌকিদারী চাকরি দিয়েছিলেন। ত্রিবেণীর ঘাটের কাছে গঙ্গার দ্বীপে ডাকাতের

আত্মার কথা হল, বিশ্বনাথ রায় বিশুবাবুর গল্প হল। তা' থেকে রামপ্রসাদের মা কালীকে গান শোনাতে কাশী যাওয়ার পথে ত্রিবেণীতে এসে স্বপ্ন পেয়ে ফিরে যাওয়ার গল্প এসে গেল বিচিত্রভাবে। তা' থেকে এলো সতীদাহ নিবারণের কথা। এবং হুগলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হ্যালিডে সাহেবের আমলে শেষ সতীদাহের সেই আশ্চর্য গল্প বললেন স্মৃতিতীর্থ। যিনি সতী হয়েছিলেন তিনি সাহেবকে এবং তাঁর সঙ্গীদের সামনে একটা প্রদীপ জেবলে তার শিখাতে আঙুল পুড়িয়েছিলেন—দেখিয়েছিলেন মনের বলে তিনি অনায়াসে জীবন্ত দগ্ধ হতে পারবেন।

পরিশেষে বললেন—দেখলাম অনেক গঙ্গাধর। এসেছি তো কম দিন না। অনেকদিন অ-নে-ক দিন হয়ে গেল। দেখলাম কি কম? এবং—

একটু চুপ করে থেকে কি ভেবে নিয়ে বললেন—রেলগাড়ি কলের জাহাজ তারে তারে টেলিগ্রাফে খবর যাচ্ছে সেই পৃথিবীর ও-মাথা পর্যন্ত। ওঃ! আবার একটু চুপ করে থেকে যেন আস্বাদন করে-করে সমস্ত কিছুকে ভেবে নিলেন, তারপর হঠাৎ ঈষৎ চকিত হয়ে বললেন —সায়ংসন্ধ্যাটা সেরে নিতে হবে। পথেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে। মাকে বল, গঙ্গাধর, জায়গা করে দেবেন।

সায়ংসন্ধ্যা সেরে আসনে বসেই ডেকে পাঠালেন গঙ্গাধরকে। গঙ্গাধরের সঙ্গে ঘরের দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ কথা বলে প্রসন্ন মুখে বেরিয়ে এসে, জটাধরজননীর নায়েবকে ডেকে বললেন—শোন হে, তোমাকে বলছি—জটাধরের নায়েব—কি নাম তোমার—

নায়েব বললে—আজ্ঞে অধীনের নাম কিশোরী সিংহ—

—ভালো। তোমার বিক্রম সিংহতুল্যই হোক, এবং জটাধরজননীর চরণতলে তুমি সবিক্রমে আসীন থাক। তোমার কর্তা আমাকে পত্র লিখেছিলেন—তুমিও গিয়েছিলে তোমাদের গোবিন্দপ্রভুর নিমন্ত্রণের ব্যাপার নিয়ে। কথাটা বাইরে থেকে কেমন দেখায়ই বটে। তোমাদের জটাধরজননীর পুজো হয় এক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন আর গোবিন্দ সেই শুকনো আতপ চালের ভাত আর সিদ্ধ পক্ব খেয়ে থাকেন। ঠাকুরের নিমন্ত্রণ নেন না গঙ্গাধর। তা' গঙ্গাধর বলে—শক্তিপুজার আয়োজন—আমিষ নিয়ে একাকার। বলি হয়, মৎস্যাদি তো আছেই, অন্যান্য সব নাড়ী ঠেকা হয়ে যায়। তা' দেখ, বড়দিনে মা কালীর পুজো হচ্ছে—তোমরা ১লা বৈশাখ নাগাদ করছ। এ সব পুজোয় ওরকম সব হবারই কথা। হবেই। কলকাতার বউবাজারে মা কালী আছেন—তাঁকে লোকে বলে ফিরিঙ্গী কালী। ফিরিঙ্গীরা মানত করে, পুজো দেয়। তাতে তাঁর মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয় না। এখানেও তাই। ১লা বৈশাখ পুজো;—তাই বেশ! পুজো হোক ১লা বৈশাখ। এদিকে গোবিন্দ হলেন স্বয়ং বিষ্ণু; বৈষ্ণব মতে তাঁর পুজো। অন্য মতে তো হতে পারে না। গঙ্গাধর আমাকে বললে—দেখুন, নীলাচলে প্রভু জগন্নাথ অধিষ্ঠিত—পাশেই মা বিমলা রয়েছেন, সন্তানের স্নেহে বাঁধা হয়ে। শক্তিপুজোয় মহাষ্টমীর দিন বলির প্রথা আছে। সে মধ্যরাত্রে, জগন্নাথের শয়ন হয়ে গেলে তখন, তাও সদর দুয়ার দিয়ে নয়, গোপনে, খিড়কির পথে। গঙ্গাধর বলছে, এখানেও সেই বিবেচনা করেই ও জটাধরজননীর স্থানে পুজোয় যখন বলি হয় তখন এবাড়িতে গোবিন্দের অন্নভোগই বন্ধ হয়। পক্বান্নের ভোগাদি হয়। সুতরাং কি করে ওবাড়িতে ভোগের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে? কথাটা খুবই সমীচীন। ওই আমিষের আসরে কি ঠাকুরকে নিয়ে যাওয়া হতে পারে? তাতে জটাধরেরও অকল্যাণ হবে। তবে এরপর থেকে ওবাড়ি থেকে স্বতন্ত্র-ভাবে ভোগের জন্য ফলমূল মিষ্টান্ন দুগ্ধ ঘৃতও পাঠাতে পার। নিশ্চয় পার।

গঙ্গাধর সায় দিলেন—হ্যাঁ, নিশ্চয় পারে। নিশ্চয় নেব।

স্মৃতিতীর্থ জটাধরজননীর টোলের পণ্ডিতকে উদ্দেশ করে বললেন—কি হে টোলের অধ্যাপক, তোমার কিছু বলার আছে?

সে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল, বললে—কি থাকবে? আপনার বাক্যের উপর কি বিধি আছে, না বাক্য আছে! স্মৃতির আপনি আমাদের বৃহস্পতি।

মন্মথ এই বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়েই ছিল সারাক্ষণ। বৃদ্ধ তা' লক্ষ্য করেছিলেন—হঠাৎ হেসে বললেন—কি হে? কি দেখছ?

মন্মথ একটু হেসে বললে—আপনাকে দেখছি।

—আমাকে? কি দেখছ আমাকে?

মন্মথ বললে—খুব ভালো লাগছে, তবে কেমন তা' তো বুঝিয়ে ঠিক বলতে পারব না!

—আমি বলছি। আমাদের মতো প্রবীণ এবং প্রাচীন যারা চিরকালই পিতামহ ভীষ্মের মতো। আর তোমরা হলে পৌত্র—তোমরা অর্জুন। অর্জুনেরা এমনি করেই মুগ্ধ বিস্ময়ে ভীষ্মের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর কালের অমোঘ নির্দেশে ভীষ্মকে শরশয্যায় শায়িত করে।

চমকে উঠল মন্মথ। গঙ্গাধরও চমকে উঠলেন। গঙ্গাধর কিছু বলতে পারলেন না। মন্মথ কিন্তু বলে উঠল—না-না-না, আমি তো—

স্মৃতিতীর্থ বললেন—তুমি অর্জুন নও, আমিও কুরুপিতামহ নই হে। উপমা আর ওটা উপমা। হেসে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—আনন্দ পেলাম তোমাকে দেখে। ভারী আনন্দ হল।

মন্মথ তাঁকে প্রণাম করলে আবার।

স্মৃতিতীর্থ বললেন—এই জীরেটের মুখুয্যেদের গঙ্গাধর ডাক্তার আছেন কলকাতায় ভবানীপুরে। তাঁর ছেলে আশুতোষ খুব উজ্জ্বল ছেলে। গতবার এম. এ. পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে সে। এ পরীক্ষায় তুমিও প্রথম হবে। গোপীনাথ পণ্ডিত লিখেছিল—আপনি একদিন গোবিন্দপুর গিয়ে বালককে দেখলেই বুঝতে পারবেন। তা'—

বলতে বলতে এসে গাড়ির উপর উঠে বসলেন।

•

আরও অভিভূত হয়ে গেল বাড়ির ভিতরে এসে। কাদম্বরী সন্ধ্যারতির প্রদীপে তেল সলতে দিচ্ছিল। মন্মথ ভিতরে এসে দাওয়ার একপাশে বসল। গঙ্গাধর গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম ছাড়িয়েও কিছুটা গেছেন। স্মৃতিতীর্থকে এগিয়ে দিতে। মন্মথ ভাবছিল স্মৃতিতীর্থেরই কথা। কিছুক্ষণ পর গঙ্গাধর ফিরে এলেন এবং বেশ আগ্রহভরেই ডাকলেন—কাদম্বরী! কাদম্বরী! ও কাদম্বরী!

কাদম্বরী বেরিয়ে এসে দাঁড়াল—কি? কি হল?

গঙ্গাধর বললেন—এই যে, মনুও রয়েছিস। ভালোই হয়েছে। একটা কাজ করে ফেলেছি তোমাদের জিজ্ঞাসা না-করে। তা' আমি করে ফেলেছি বাপু!

—কি কাজ? কি বলছ?

—স্মৃতিতীর্থ মশায় বললেন, গঙ্গাধর, আমার দৌহিত্রী আছে একটি—তার জন্য পাত্র খুঁজছেন জামাতা বাবাজীবন। তা' শ্রীমান মন্মথকুমারের কথা শুনে তাঁর একান্ত অভিপ্রায় যে শ্রীমানের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। আমি বাপু কথা দিয়ে ফেলেছি। তবে অবশ্য আজই নয়; আমি বলেছি—শিরোধার্য করছি আপনার কথা, কিন্তু ও পড়েশুনে মানুষ হোক, তারপর! তবে একটা নিশ্চিন্ত হলাম কি জান? নিশ্চিন্ত হলাম যে, মনুকে ইংরিজী পড়তে দিয়ে পাপটাপ করি নি। মনুও ভ্রষ্ট হয় নি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ। আশির কোঠা শেষ হয়ে আসছে। কলকাতা এবং তার আশপাশ বিচিত্র গড়নে গড়ে উঠেছে। গঙ্গার দু'ধারে পাটকল বসছে একটার পর একটা, পাট-কল ছাড়াও আরও নানা কলকারখানা তৈরি হচ্ছে। কলকাতার যে সব পথঘাট আগের কালে বর্ষায় দুর্গম হত কাদার জন্য, বর্ষার পর অন্য সময়ে ধুলো উড়ত, সে সব পথ-ঘাট পাকা হচ্ছে। খাপরার চাল হোগলার চাল ছিটেবেড়ার ঘরগুলো ভেঙে ভেঙে পাকা ইটের চুন-সুরকির গাঁথনিতে সব ছোট বড় দালান তৈরি হচ্ছে। গ্যাসের বাতি হচ্ছে রাস্তায়। শোনা যাচ্ছে, বিলাতে বিদ্যুতের জোরে যেমন ট্রামগাড়ি চালানো হয় তেমনি ইলেকট্রিক ট্রাম হবে। ঘোড়া-টানা ট্রাম উঠে যাবে। কলকাতা ইউনিভারসিটিতে ছাত্রসংখ্যা বাড়ছে। রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা আইন বন্ধ করিয়েছেন; বিদ্যাসাগর বিধবার বিয়ে হবে আইন পাস করিয়েছেন; কলকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরমশায়দের দ্বারকা ঠাকুরমশায়ের বড় ছেলে দেবেন ঠাকুর রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম নিয়ে সমাজ গড়েছেন, স্ত্রী পুরুষে একসঙ্গে চলেন ফেরেন, সমাজে গিয়ে চোখ মুদে প্রার্থনা করেন। মেয়েরা ঘোমটা খুলেছে—জুতো পায়ে দিচ্ছে—বিবি সেজেছে—লেখাপড়া শিখছে। ছেলেপুলেরা গোরাদের ফ্যাশন দেখে ঘাড় চেঁছে সামনেব চুল রাখছে। কোট পরছে, কামিজ পরছে। বার্ডশাই চুরুটের চল হয়েছে।

তাহলেও কিন্তু গ্রাম অঞ্চল আজও বিশেষ নড়ে নি। সেখানে এখনও ধর্ম আছে ঈশ্বর আছেন, সমাজ আছে জাত আছে। গ্রাম অঞ্চল সে ব্রতকথার বন অরণ্যের মতো ছায়াচ্ছন্ন আধো অন্ধকারে থমথম করছে; সেখানে ডাল ভাঙলে তা' থেকে ঢেঁকি হয়, পাতা পড়লে তা থেকে কুলো হয়। তা' এই ঘটনায় অর্থাৎ স্মৃতিতীর্থ মশাই এসে এই যে গোবিন্দপুরের ভটচাজবাড়ির উজ্জ্বল গৌরবর্ণ একটু পিঙ্গল আভাযুক্ত ছেলেটির পিঠে হাত বুলিয়ে সস্নেহে সমাদর করে বলে গেলেন—"তুমি ফার্স্ট হবে। আমি তোমার নামে তুলসী দিয়েছি",—এইটেই মনে হল যেন কোথাও কিছু নেই—ঝড় না বাতাস না—একটা প্রকাণ্ড ডাল মড়মড় করে ভেঙে পড়ল।

রাতারাতি চারিদিকে বিচিত্র রটনা রটে গেল। গোবিন্দপুরের গঙ্গাধর ভটচাজের ছেলে মন্মথকুমার শাপভ্রষ্ট হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে—গোছের রটনা।

সেদিন অরণ্যষষ্ঠীর দিন। আশপাশের গাঁয়ের মেয়েরা গোবিন্দপুর রাধানগর খাঁয়ের পাড়া এই তিনখানা গাঁয়ের এজমালি ষষ্ঠীদেবী খাঁয়ের দীঘির পাড়ের উপরের বকুলগাছতলায় পুজো দিতে এসে ভটচাজবাড়িতে উঁকিঝুঁকি মেরে গেল, এহেন ছেলেটিকে যদি দেখতে পায়। ওদিকে এ অঞ্চলের অল্পবয়সী ছেলেরাও এলো ভিড় করে এগিয়ে। এদের মন বিচিত্র। খানিকটা সবিস্ময় কৌতুহল আছে, প্রীতির আকাঙ্ক্ষা আছে, আবার তার সঙ্গে ভুরু কোঁচকানোও আছে। কিছু কিছু ছেলে যারা ডানপিঠে শক্তসমর্থ তারা এলো একটা 'যুদ্ধং দেহি' ভাব নিয়ে।

মোটামুটি একটা আড্ডা জমে গেল।

আড্ডাটা বসবার জায়গা আপনাআপনি আপন জোরেই নির্দিষ্ট হয়ে গেল ওই খাঁয়ের দীঘির পাড়ের ষষ্ঠীতলা ওই বকুলতলায়।

তিনখানা গ্রামের সীমানা যেখানে ছোঁওয়াছুঁইয়ি হয়েছে সেইখানে এই খাঁয়ের দীঘি; মৌজা খাঁয়ের পাড়ার অন্তর্ভুক্ত। খাঁয়েরা অনেককালের পুরনো বাড়ি। তাঁদের আর কেউ নেই একালে। ভাড়া বাড়ি ঘরদোর পড়ে আছে। তাঁরাই দীঘি কাটিয়েছিলেন। খাঁয়েরা খাঁ উপাধি হলেও জাতে বামুন ছিলেন। বকুলগাছটা বুড়ো হয়েছে। দীঘিটা মজে এসেছে। বকুলগাছ তলাটায় সেই আদ্যিকাল থেকে বছরে এক দিন ষষ্ঠীপুজো হয়, বাকী তিনশো চৌষট্টি দিন ছেলেছোকরাদের আড্ডা বসে। সকাল হতেই ফাল্গুন চৈত্র হতেই মেয়েরা আসে,

বকুলফুল কুড়িয়ে নিয়ে যায়। তারপর দুপুরে যত রাখালদের আড্ডা বসে। সামনেই খানিকটা পতিত জমি আছে, সেখানে গরু চরে—রাখালেরা গাছতলায় বসে গান গায়, ঝালু ঝালু খেলে, কিছু মেয়েরা আসে ওই সব রাখালদের জাতেরই—তারা গোবর কুড়িয়ে এখানে ওখানে ডাঁই করে রাখে। বিকেল হতেই সব আসে সুদ্‌জাতদের, মানে বামুন কায়েত ঘরের ছাওয়ালরা, তখন তাদের আড্ডা চলে। চেল ডিগ্‌ডিগের কোট আছে—নুন দাঁড়ির কোট কাটা আছে, ছেলেরা খেলা করে। গাছটার বয়স অনেক—অনেক ঝড় পার করেছে—অনেক ডাল ভেঙেছে ; ডালভাঙা জায়গাগুলোয় হয়েছে গর্ত, সেখানে তাঁদের হুঁকো কলকে তামাক চকমকি থাকে, তামাক খায়, ইয়ারকি করে। রাত্রেও বকুলতলার আড্ডা খালি যায় না। চোরদের ডাকাতদের আড্ডা বসে।

এইখানে বিচিত্রভাবে মন্মথ এসে এ-অঞ্চলের চৌদ্দ-পনের থেকে আঠারো বিশ বছরের ছোকরাদের সঙ্গে মিশে, তাদের সর্দার দলপতি না হলেও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। তারা কলকাতার গল্প শুনতে চাইত। রেলের গাড়ি অনেক দেখেছে—ইস্টীমারও অনেক দেখেছে। কিন্তু কিভাবে চলে তা' জানে না। গঙ্গার উপর বয়া ভাসিয়ে যে পুলটা করেছে রাঙামুখোরা সেটার কথাও তারা জানতে চায়। কলকাতায় নতুন থিয়েটার হয়েছে। মেয়েছেলেরাই মেয়ে সাজে এবং সাজগোজ করলে মেয়েদের দেখে ব্যাটাছেলেরা পাগল হয়ে যায়। এ সব গল্পও শোনবার দল আছে।

সেই ছেলেবেলায় যখন এখানে এম. ই. স্কুলে পড়ত, তখনকার তার বন্ধু হাবিবপুরের মিয়াবাড়ির খোন্দকার তাকে এখানে ডেকে এনে এই আড্ডার সভ্য করেছে। খোন্দকার আর জগবন্ধু ঘোষ। জগবন্ধু ঘোষ এখানকার অবস্থাপন্ন কায়স্থবাড়ির ছেলে। জগবন্ধু খোন্দকার থেকেও বয়সে বড়। তারা শুনতে চায় থিয়েটারের গল্প এবং কোন্ ব্রাহ্মদের সঙ্গে মন্মথর আলাপ আছে সেই বাড়ির গল্প। কখনও শুনতে চায় বড়দিনের কলকাতার গল্প। নানান গল্পের মধ্যে সেই ভূমিকম্পের কথাটা তারা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্ন করে। মাটির বুকের মধ্যে আগুন, তার উত্তাপ, এত উত্তাপ যে ধাতু গলতে থাকে টগবগ করে, তার ফলে ভূমিকম্প হয়। এমন উত্তাপওয়ালা বুকের ভেতর গলন্ত ধাতুওয়ালা পাহাড় আছে তার নাম আগ্নেয়গিরি ; সেই আগ্নেয়গিরির মুখ খুলে যায় প্রচণ্ড উত্তাপে, মুখ দিয়ে আগুন ধোঁয়া বের হয় তুবড়ির মুখের আগুনের ফুলঝুরির মতো।

সে বলে, আর ছেলেরা সব শোনে। এর চেয়েও তারা শুনতে ভালবাসে, যে সব মানুষদের দেখেছে মন্মথ তাদের কথা। সে হিন্দু স্কুলের হেড স্যার রমেশ স্যারের গল্প বলে, মাধববাবুর গল্প বলে, জ্যোতিপ্রসাদবাবুর গল্প বলে। ঠাকুরবাড়ির দ্বিজেন ঠাকুরকে রবি ঠাকুরকে সে দেখেছে। শিবনাথ শাস্ত্রীকে দেখেছে, রাজনারায়ণ বোসকেও দেখেছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশায় তো আশ্চর্য মানুষ। চেনাই যায় না বিদ্যাসাগর বলে। একদিন মেদিনীপুরের ক'জন লোক এসেছিল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি খালি গায়ে বাগানে গাছের গোড়া খুঁড়ছিলেন। লোক ক'টি তাঁকে উড়িয়া মালী বলে ভ্রম করেছিল, এবং বলেছিল—একছিলম তামাক খাওয়াতে পার হে ? তোমার মনিবের সে সব বন্দোবস্ত আছে তো ? বিদ্যেসাগর মশায় কোনো কিছু না-বলে আগে তাঁদের তামাক খাইয়ে তারপর নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন, আমিই ঈশ্বরচন্দ্র দেবশর্মা—তা' কি প্রয়োজন বলতে পারেন আমাকে !

আর অবারিত দ্বার। আশ্চর্য মানুষ! কিন্তু এখানকার ছেলেরা মাধববাবুর কথা শুনতে বেশী ভালবাসে। চার টাকা মাইনের কয়লাখাদের মুন্সী থেকে কয়লাখাদের মালিক। গোটা ঝরিয়া এলাকাটাই তিনি বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন। সেও ন কড়া ছ কড়ায়। আগে গিয়েই বাড়ির ছেলেদের ডেকে হাতে একখানা করে গিনি দিতেন। দশটা ছেলে থাকলেও

দশ ষোলং একশো ষাট। বাস্—বাড়ির গেরস্ত খুব খুশী, ওরে বাপ রে! মাধববাবু সোনার টাকা দিলেন গ—। সব ছেলেকে একটো করে—হুঁ!

একবার কলিয়ারীতে ডাকাত পড়েছিল। পাঞ্জাবী ডাকাত। মাধববাবু ধাঁ করে চাকরের ময়লা কাপড় পরে মাথায় গায়ে কয়লার ধুলো হাতে নিয়ে মেখে ঘর ঝাড়ু দিতে আরম্ভ করেছিলেন।

জগবন্ধু এবং খোন্দকার ফস্ করে গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে বসে—আচ্ছা তুমি যে জ্যোতিপ্রসাদবাবু উকিলের বাড়ি যাও—ও'র ছেলে তোমার খুব বন্ধু, তা' ওদের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আলাপ নেই তোমার?

মন্মথ চুপ করে যায়। হেসে বলে—আছে, কিন্তু সে বলবার মতো নয়।

—তারা গান গায়?

—তা' গায়।

বলতেই চলে আসে থিয়েটারে মেয়েদের কথায়।

—থিয়েটারের মেয়েদের চেয়েও ভালো গান গায়?

সমস্যায় পড়ে মন্মথ। বলতে পারে না ঠিক জোর করে। ভেবে চিন্তে সে বলে—দেখ, গান আমি ঠিক তালমান বিচার করে ভালো বুঝি নে। তবে এ একরকম, ও আর একরকম। ব্রাহ্মসমাজের ওদের গানগুলি খুব মিষ্টি, আর কি জান বেশ পবিত্র।

মাঝখানেই ছেদ টেনে দিয়ে জগবন্ধু বলে—তা বললে হবে কেন? থিয়েটারের গান খু—ব ভালো। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সমাধি হয়েছিল চৈতন্যলীলার বিনোদিনীর গান শুনে! কি? হয় নি?

—খন্দেকার বলে— বউবাজারের লক্ষ্ণৌওয়ালী বাঈদের গান সব থেকে ভালো। শুনেছি বহুত উমদা! মালকাজান, গওহরজান—

জগবন্ধু খোন্দকারের দলই কিন্তু সব নয়। আরও দল আছে। একদল আছে খেলুড়ের দল। তারা গোরাদের ইংরেজদের ফুটবল ক্রিকেট খেলার কথা শোনে মন্মথর কাছে। কলকাতায় এখন অনেক বাঙালী ফুটবল টীম হয়েছে। তারাও নাকি বেশ ভালো খেলে।

গোরা টীমের মধ্যে গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্সদের টীম দুর্ধর্ষ টীম। ইস্ট ইয়র্কও বড় কম যায় না। ব্ল্যাকওয়াচ টীম খুব ভালো টীম। সিবিলিয়ান সায়েবদের, মানে যে সব ইংরেজরা কলকাতায় কমার্সিয়াল ফার্মে চাকরি করতে এসেছে তাদের ফুটবল টীম আছে। 'ডালহৌসি', 'ক্যালকাটা', 'রেঞ্জার্স'। ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্টের কাস্টমস্ ডিপার্টমেন্টের সায়েবরাও টীম খুলেছে। এ ছাড়াও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের টীম আছে। তবে মিলিটারী টীমগুলোর সঙ্গে এরা তাদের গায়ের জোরের জন্যে পেরে ওঠে না। বড্ড মেরে ধরে খেলে গোরারা। বর্ষার সময় লীগ খেলা হয়—কাপ শীল্ড খেলার পত্তন হয়েছে। বিকেলবেলা লোকেরা দলে দলে খেলা দেখতে ছোটে।

মন্মথ তাদের গল্প বলে। ছেলেগুলি প্রশ্ন করে। মন্মথ তাদের বলে দিয়েছে যে, সে খেলা দেখতে যায় না। খেলা দেখার নেশা খুব খারাপ নেশা। এ ধরলে আর রক্ষে নেই। তবে খবর সে রাখে। হরচন্দ্রবাবুর বাড়িতে ইংলিশম্যান কাগজ আসে—সেই কাগজে খেলার খবর বের হয়। সে বিকেলবেলা ইস্কুল থেকে এসে কাগজখানা পড়ত। মাধববাবুও নেন ইংলিশম্যান। ইংলিশম্যানে নানান বিজ্ঞাপনও থাকে। রেল কোম্পানির জাহাজ কোম্পানির কয়লা চাই বলে বিজ্ঞাপন থাকে। এখানকার এই ছেলেগুলি চাঁদা করে একটা ফুটবল আনিয়েছে। চুঁচড়াতেও বাইরের ছেলেদের টীম আছে। তারাও ম্যাচ খেলে। খবরও রাখে। কিন্তু মন্মথ যত খবর রাখে এত খবরটবর তারা রাখে না। বঙ্গবাসী, হিতবাদী,

বসুমতী পড়ে এরা। সপ্তাহে একখানি কাগজ। ইংরিজী কাগজ বলতে এখানে সাপ্তাহিক অমৃতবাজার আসে। কিন্তু তাই ক'খানাই বা আসে!

এইভাবেই তার খ্যাতি রটছিল দিন দিন। দিনগুলিও দিন দিনে বেশ মিষ্টি হয়ে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার বাড়ির বাইরে বেড়ানোর মাত্রা বেড়ে গেল। জ্যৈষ্ঠ মাস—প্রখর উত্তাপ—দশটা হতে হতেই এলোমেলো গরম হাওয়া দাপাদাপি করে বইতে শুরু করে। এরই মধ্যে বাইরে ঘোরে মন্মথ। আবার চারটে না বাজতেই বাইরে বের হবার জন্য ছটফট করে।

নতুনমা কাদম্বরী দিন কয়েকের মধ্যেই যেন শঙ্কিত হয়ে উঠল। বললে—এ কি হচ্ছে তোমার মন্মথ?

হঠাৎ সম্ভ্রম করে মন্মথ ডাক শুনে একটু আশ্চর্য হল মন্মথ, বললে—কি হচ্ছে ছোটমা?

—এই দিনরাত টো-টো করে ঘুরছ!

—টো-টো করে ঘুরছি?

—ঘুরছ না?

—কি করব লোকেরা আসে—

—তা আসুক, ওরা সব ভালো লোক না। ওদের অনেক নিন্দে।

বাবাও বললেন—ওরে মনু, ওই যে হবিবপুরের খোন্দকার আর ওই জগবন্ধু ঘোষ ওরা লোক ভালো না রে। বড্ড তামাক খায়। শুনি নাকি অন্য দোষও ঢুকেছে। ওদের সম্পর্কে একটু সাবধান হোস। আর ওই জগবন্ধুটা তো তোর নামে যা তা' বলেও বেড়ায়। বলে ব্রাহ্ম উকিলবাবুর বাড়িতে যে যায়—সে কেন যায়? সে আমি ঠিক বের করছি দেখ না। আর তামাকটামাক খেতে শিখিস নে বাবা। তিন পুরুষে আমাদের হুঁকো কলকের পাট ছিল না। জটা কলকাতায় গিয়ে তামাক ধরেছে।

কাদম্বরী কথার মধ্যে কথা ছুঁড়েছিল, বলেছিল—এখানে জটামায়ের পুজোতে মায়ের নামে কারণের যে ঘটা দেখছি তাতে আর ঠাকুরপোর কথা তুলো না।

—না না। জটা নিজে ওসব খায় না।

—ভালো।

গঙ্গাধর কথা চাপা দিয়ে চলে গিছলেন।

কাদম্বরী বলেছিল—খুব সাবধান মনু বাবা, খুব সাবধান!

মন্মথ অস্বস্তিতে পড়েছিল। বুঝতে পারে নি কি বলবে।

কাদম্বরী একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—এত বড় গুরুবংশ তোমাদের—এই তোমাদের খাতির। শিষ্যরা বলে, এ গুরুর কাছে দীক্ষা পেলে মন্ত্র আপনি সিদ্ধ হয়। গুরুর ভক্তিতে শিষ্য উদ্ধার পায়। সেই বংশের তোমরা। এখন কি দশায় পড়েছ দেখ। তোমার কাকা দালালি করে কেনা বেচা করে টাকা করে কি করেছে দেখ। তোমার বাবাকে লোকে বলে বড়ভটচাজমশাই, আর ঠাকুরপোর নাম হল ছোটবাবু ভটচাজ মশাই! তোমাকে বাবা, লেখা-পড়া শিখে এম.এ., বি. এ. পাস করে বিদ্যে থেকে টাকা রোজগার করে এই বড়ভটচাজবাড়িকে বড় বাড়ি করতে হবে। দেখো বাবা, যেন তোমার ওই যে ভাইটা হয়েছে ওকে যেন ওই তোমার ছোটকাকার ছেলের কাছে চাকরি করতে না হয়—জটামার পুজো করে খেতে না হয়।

বিরক্ত হয়েছিল মন্মথ, বলেছিল—ছোটমা, তা' ওকে খেতে হবে কেন? এ কথাটা তুমি বলছই বা কেন বল—

কাদম্বরী বলেছিল—সাধে কি বলি বাবা মনু! কথা হয়েছে তাই বলছি। শুনলাম চক্রবর্তীরা বলেছে—বড়ভটচাজের ছোটবউয়ের কোঁথ তো ফলল। তারপর—? তা' ওই কিশোরী সিং বলেছে শুনলাম—তা' হয়ে যাবে চক্রবর্তীমশায়। আমার কত্তার জটামা রয়েছেন—

ওইখানেই হয়ে যাবে। কেউ শাঁকে ফুঁ কেউ উনোনে ফুঁ দেবে আর কি! আর তোমার জন্যে বলেছে—মন্মথ মাস্টারি করবে বলে এখানে এম. ই. ইস্কুল করছেন বাবু! তোমাকে কথাটা আমরা বলি নি। তোমার বাবার বারণ। শিবতুল্য মানুষ তো। উনি ঝগড়া ভালবাসেন না! আমাকে বলেছেন—খবরদার নতুনবউ, ও-কথা মনুকে শুনিয়ো না। আমার শাঁখের করাত, আসতেও কাটে যেতেও কাটে। ভাইয়ের নাম করে বলেন—"মনুর মা ওকে ধরে পিটত; মায়ের মতো মানুষ করেছিল। আমিও ব্যাকরণ পড়াতে ওকে কম মারি নি। ওর কথাতেই মনুকে আমি কলকাতায় পাঠিয়েছি। ঝগড়ার কাজ ও করছে করুক। আমি পারব না করব না।"

এর পর মন্মথ ক'দিন অনেকটা বাউণ্ডুলের মতো গ্রামের চারপাশটা সমস্ত গ্রামখানা ঘুরে বেড়ালে। সকালে বেরিয়ে মাঠে মাঠে একলাই ঘোরে—আবার বিকেলেও তাই। বকুলতলার আড্ডার ওখানে একবার গিয়েই একটু বসেই, চললাম বলে উঠে যেত, এবং খানিকটা ঘুরে বাড়ি ফিরে চুপচাপ গোবিন্দের দাওয়ায় বসে থাকত।

সে মনে মনে নানান কল্পনা করত। লেখাপড়ায় যে সব পরীক্ষায় ফার্স্ট হবে। এন্ট্রান্স এফ. এ. বি. এম. এ. স'য়ে। এর পর রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ। তারপর—?

কখনও ভাবত—সরকারী চাকরি নেবে, ডেপুটী হবে। মুন্সেফ হবে। সাবজজ হবে। আবার ভাবত—না। চাকরি করবে না। না। ইংরিজী লেখাপড়া শিখেও সে ইংরেজ রাজার চাকরি করবে না। রাজা হলেও ওদের, আমাদের শাস্ত্রে বলে ম্লেচ্ছ। ও উকিল হবে, নয়তো অধ্যাপক হবে। না—উকিল। জ্যোতিপ্রসাদবাবুর মতো; কি, তার থেকেও বড় উকিল হবে। এই গ্রামখানাকে সে গোটা কিনে ফেলে ভেঙে গড়বে। জটাজননীর মন্দির নাটমন্দিরের পাশেই তুলবে গোবিন্দ মন্দির। এম. ই. স্কুল গড়ছে কাকা, সে ওই এম. ই. ইস্কুলকে হাই ইংলিশ ইস্কুল গড়ে তুলবে। আরও অনেক কিছু করবে। রাত্রে তার ঘুম পর্যন্ত কমে গেল।

এরই মধ্যে বিচিত্রভাবে তার একটা সংসার জীবনের কল্পনা এসে উঁকি মারত।

বড় মধুর লাগত।

একটি তরুণী তার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসত।

সে মালতী।

এরই মধ্যে সেদিন সকালে, বেলা তখন ন'টা সাড়ে ন'টা, একসঙ্গে দু'খানা টেলিগ্রাম এসে হাজির হল। চুঁচড়োর টেলিগ্রাফ অফিস থেকে ওদের পিয়ন নিয়ে এলো। একখানা করেছেন কে একজন জ্ঞানপ্রকাশ, অন্যখানা করেছে এক পিসীমা—"তুমি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছ। অভিনন্দন নাও। শীঘ্র কলকাতা এস।"

জ্ঞানপ্রকাশ, মনে পড়ল—মালতীর বাবার নাম। সুতরাং এ টেলিগ্রাম করেছে মালতী কিন্তু দ্বিতীয়খানার প্রেরক পিসীমাকে তা' ধরতে পারলে না মন্মথ। সেটা বুঝতে পারলে বিকেলবেলা। কলকাতা থেকে পাথুরেঘাটার মুখুজ্জে বাড়ির একজন কর্মচারী এসে হাজির হল। সে মুখুজ্জেবাবুর বিধবা ভগ্নীর চিঠি নিয়ে এসেছে; ও বাড়িতে তিনিই পিসীমা। পাথুরেঘাটার মুখুজ্জেবাড়ির পিসীমা! পাথুরেঘাটার মুখুজ্জেবাবুর মেয়ে চিন্ময়ী হরচন্দ্রবাবুর পুত্রবধূ।

মন্মথর মুখ লাল হয়ে উঠল। মনে পড়ল হরচন্দ্রবাবুর বাড়িতে সেই দিনের কথা। যেদিন হরচন্দ্রবাবুর ছোটপুত্রবধূ চপলা চিন্ময়ী শ্বশুরের সঙ্গে ঝগড়া করেছিল সেই দিনের কথা। যে-ঝগড়া করতে করতে মধ্যপথে চিন্ময়ী বারান্দা থেকে তাকে দেখতে পেয়েছিল এবং তার

উপরে সব রাগটা ফেলে দিয়েছিল সেই দিনের। মনে পড়ল, একটি সুন্দরী বিলাসিনী বিধবা পরিণতবয়স্কা যুবতী চিন্ময়ীর সঙ্গে এসেছিলেন এবং হরচন্দ্রবাবুকে খুব মিষ্টি মিষ্টি করে হুণ্ডির টাকার জন্যে তাগিদ দিচ্ছিলেন। চিন্ময়ীকে মানুষ করেছিলেন তিনি। তাঁর নিজের ছেলে-মেয়ে নেই। বিয়ে হয়েছিল রাজবাড়িতে রাজার ছেলের সঙ্গে। অকালে বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি এসে বাস করছেন, সঙ্গে নিয়ে এসেছেন কয়েক লক্ষ টাকা। চিন্ময়ীর পিসীমাকে মনে পড়ল। পরনে শান্তিপুরে ফিতেপাড় ধুতি, গায়ে কনুয়ের নিচে পর্যন্ত হাতওয়ালা লেসদেওয়া টাইট জামা। খুব পরিপাটি করে এলোখোঁপায় চুল বাঁধা, হাতে একগাছি করে সোনার চুড়ি, গলায় সোনার হার। পিসীমাকে তার মনে পড়ে গেল।

হ্যাঁ, তাই বটে। তিনিই পিসীমা।

চিঠির খামখানা খুলে তার মধ্যে থেকে দু'খানা চিঠি পেলে সে। একখানা চিঠির কাগজ রঙিন। সুন্দর গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—'গঙ্গাজল।' চিঠিখানা সে তাড়াতাড়ি খুলে ফেললে। সর্বপ্রথম সে দেখলে নাম। এখানে লিখেছে তোমার গঙ্গাজল চিন্ময়ী। উপরে লিখেছে—'ভাই গঙ্গাজল', পিসীমার নাম দিয়া টেলিগ্রামে জানাইয়াছি তুমি পরীক্ষায় ফার্স্ট হইয়াছ। লোকে ধন্য ধন্য করিতেছে। আমার সৎশাশুড়ী আমাকে খুব গালি দিতেছেন—শ্বশুরও খুব কড়া কড়া কথা বলিতেছেন। আমি মনে মনে হাসিতেছি। তাহারা জানে না মা গঙ্গাকে সাক্ষী করিয়া তুমি আমার গঙ্গাজল হইয়াছ; আমার সব দোষ গঙ্গার জলে ধুইয়া গিয়াছে। পিসীমা সব জানে। তাই পিসীমার নামে টেলিগ্রাম করিয়াছি। তাহার পরও লোক পাঠাইতেছি। কেন জান? আগামী ১৬ই জ্যৈষ্ঠ দশহরা মা গঙ্গার পুজো। ওই তারিখে তোমাকে আসিতেই হইবে। আসিতেই হইবে। আসিতেই হইবে। তুমি না আসিলে আমার ব্রত পণ্ড হইবে। তোমার পরীক্ষায় সময় আমি এখানে কালীঘাটে মা কালীর কাছে মানত করিয়া পুজো দিয়াছিলাম। সাত দিন মায়ের চরণে বিল্বপত্র দেওয়া হইয়াছে। প্রথম দিনই পুষ্প এবং বিল্বপত্র তোমার মদন মিত্তির লেনের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। পাণ্ডা গিয়া দিয়া আসিয়াছিল। তুমি পাইয়াছিলে? পরীক্ষার পর আমার সেই ঝিকে পাঠাইয়াছিলাম—তোমাকে ধরিয়া লইয়া আসিবে। জগন্নাথঘাটে দেখা করিব, কিন্তু দাসী ফিরিয়া আসিয়া বলিল—সে বাড়ি চলিয়া গিয়াছে।

একটু যেন চমকে উঠল মন্মথ।

পরীক্ষার ঠিক আগের দিন সন্ধ্যাবেলা—সে বাসায় তখন ছিল না—গিয়েছিল কাকার বাড়িতে কাকা কাকীমা এবং গোপীনাথ পণ্ডিত মশায়কে প্রণাম করতে। পরীক্ষা দিতে যাবে—সকলের আশীর্বাদ না নিলে হয়! বাবা চিঠিতে একথা লিখেওছিলেন। এমন কি, রাধাশ্যামের সঙ্গেও সে খুব মিষ্টি ব্যবহার করে বলেছিল—মনে যেন রাগটাগ রাখিস নে ভাই রাধাশ্যাম।

রাধাশ্যামও অনেকটা পথ তার সঙ্গে এসেছিল। বাসায় আসতেই স্বয়ং মাধববাবু তাকে ডেকে বলেছিলেন—ওহে মন্মথকুমার! এই দেখ, কালীঘাট থেকে মা কালী তোমার জন্য নির্মাল্য পুষ্প পাঠিয়েছেন হে!

অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। এবং সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিল—আমার জন্যে পুষ্প পাঠিয়েছেন?

মাধববাবু বলেছিলেন—হ্যাঁ। পাণ্ডা একজন এসেছিল নির্মাল্য প্রসাদী সিন্দুর চরণোদক কিছু প্রসাদী মিষ্টি নিয়ে। বললে—মন্মথবাবু কে আছেন—তাঁর নামে পুজো দিয়ে এই নিয়ে এসেছি। কাল থেকে তাঁর পরীক্ষা। বললে—তাঁর নামে পুজো দিয়ে একটি সধবা মেয়ে—এই উনিশ বিশ বছরের মেয়ে—সাক্ষাৎ মা, সর্বাঙ্গে গয়না, পুজো দিয়ে

আমাকে টাকা দিলেন, বললেন—মদন মিত্তির লেনে মন্মথবাবু থাকেন—আমার আপনার জন—পরীক্ষা দেবেন কাল থেকে, এই পুষ্প প্রসাদ আজই পৌঁছে দিতে হবে। মদন মিত্তির লেনে মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। তা' আমি নিয়ে রেখে দিয়েছি ভাই। নাও।

সে তখনও তাঁর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। মাধববাবু বলেছিলেন—কি হল? এমন করে তাকিয়ে রয়েছ কেন?

মন্মথ বলেছিল—কে, আমি তো ধরতে পারছি না।

মাধববাবু হেসে বলেছিলেন—এত খোঁজে তোমার দরকারই বা কি? মাকে পুজো দিয়ে পুষ্প পাঠিয়েছেন যিনি তাঁকেসুদ্ধ প্রণাম কর মনে মনে—বাস্। এমন ক্ষেত্রে খুঁজো না খোঁজ করতে যেয়ো না। কে বলবে যে মা নিজেই তোমাকে পাঠান নি আশীর্বাদ!

পোড়া মুখুজ্জে ছিল উঠোনে দাঁড়িয়ে। সে 'জয় কালী জয় কালী' বলে মা কালীর জয়ধ্বনি দিয়ে উঠেছিল।

তার বাক্সের মধ্যে সেই বেলপাতা আর গোটা দুই অপরাজিতা এবং একটি রাঙা জবা ওর আজও রাখা আছে। শুকিয়ে গেছে, মধ্যে মধ্যে বেলপাতা মাখানো সিঁদুর থেকে একটুআধটু দাগ লাগে কাপড় বইয়ে; সে বিরক্ত হয়ে ভাবে যে ফেলে দেবে এগুলি; একটু একটু বিশ্রী গন্ধও হয়েছে; কিন্তু তবু সে ওগুলি ফেলতে পারে না। যতবার নাড়াচাড়া করে ততবারই মাথায় ঠেকিয়ে আবার যত্ন করে বাক্সের একটি কোণায় রেখে দেয় কাগজে মুড়ে।

সে নির্মাল্য পাঠিয়েছিল হরচন্দ্রবাবুর ছোটপুত্রবধূ—সেই ধনীর দুলালী মেয়ে—সেই পাথুরেঘাটার মুখুজ্জেবাড়ির আধা ব্রাহ্ম আধা হিন্দু সেই দাম্ভিকা উগ্রস্বভাবের মেয়েটি!?

আরও একটা রূপ তার মনে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

গঙ্গার ঘাটে, হাওড়া ব্রিজের পাশে জগন্নাথঘাটে তার সামনে দাঁড়ানো সেই আয়ত টলোমলো জলভরা চোখ—থরথর করে অল্প কাঁপা দুটি ঠোঁট নিয়ে সেই যে মেয়েটি তার হাতে গঙ্গার জল দিয়ে বলেছিল—আজ থেকে তুমি আমার গঙ্গাজল। এই গঙ্গাজল দিয়ে তোমার সব দুঃখ যেন ধুয়ে মুছে যায়। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

তারপর আর তার সঙ্গে দেখা হয় নি। সেও তার কথা খুব মনে করে নি। তাকে ভোলবার কথা তার নয়। কিন্তু স্মরণ তাকে করে নি। তার সঙ্গে এটাও ঠিক যে, তার মনে সেদিনের সেই লাঞ্ছনার তিক্ত স্মৃতির একটুও তাকে পীড়িত করে না।

আজ আশ্চর্য আনন্দ হল তার! ওঃ! তার পরীক্ষার কথা মনে রেখে মা কালীর চরণে পুজো দিয়ে পাণ্ডার মারফত পুষ্প পাঠিয়ে দিয়েছে। তারপর পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে লোক পাঠিয়েছিল। সেই ঝি মেয়েটিকে পাঠিয়েছিল। দেখা হলে কি ভালোই না হত।

একখানা শোনা গান তার মনে পড়ে গেল।—"নৈহাটির ঘাটে বসে পৈঠের পাটে খেলা করেছি ফুল ভাসিয়ে জলে, গঙ্গা কেমন চলে চলে!" একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে।

পাথুরেঘাটার মুখুজ্জেবাড়ির কর্মচারীটি সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেল, তার থাকবার সময়ও নেই হুকুমও নেই, তাকে আজকের রাত্রি দশটার মধ্যে ফিরে গিয়ে পৌঁছতে হবে চন্দননগরে; সেখানে মুখুজ্জেবাবুদের একঘর বড় খাতক আছে। তার একখানা দলিল তামাদি আছে; দলিলখানা নির্দিষ্টরূপে পিসীমার। সেই দলিল পালটে সুদে আসলে এক করে নতুন দলিল হচ্ছে, সেই দলিল নিয়ে কাল সকালের ট্রেনেই খাতকেরা কলকাতা যাবেন—সঙ্গে এই

কর্মচারীকেও যেতে হবে। তাই সে চলে গেল। গঙ্গাধর অবশ্য তাকে জল খাওয়ালেন, আশীর্বাদ করলেন এবং মুখুজ্জেবাড়ির পিসীমা যিনি এত আগ্রহ করে টেলিগ্রাম এবং তার পরও লোক পাঠিয়ে খবর পাঠিয়েছেন তাঁকে অনেক নমস্কার জানালেন। বললেন—বলবেন আমার ভগ্নীটিকে, আমি দরিদ্র ভাই—আমার তো পুণ্যবল ছাড়া কোনো বল নেই। তা' পুণ্য আমার থাকলে তাঁদের মঙ্গল হবে।

লোকটি চলে গেলে গঙ্গাধর বললেন—কই রে মনু, তুই তো এই মুখুজ্জেবাড়ির পিসীমা বলিস যাঁকে তাঁর কথা বলিস নি?

মন্মথ বললে—মনে হয় নি বাবা।

আশ্চর্য হলেন গঙ্গাধর—মনে হয় নি? সে কি রে—এত হিতৈষিণী—ওরে বাপ রে—তার করেছেন, তার পরে লোক পাঠিয়েছেন। এর কথা ভুল হলে যে অকৃতজ্ঞ হতে হবে বাবা।

চুপ করে রইল মন্মথ। তার হাতের মধ্যে গঙ্গাজল চিন্ময়ীর পত্রখানা মুঠো করে ধরা ছিল—সেখানা গঙ্গাধর দেখতে পান নি। মন্মথ সেখানাকে আরও গুড়িয়ে মুড়ে হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে লুকিয়ে ফেললে। পরের দু'দিনে ছ'সাতখানা চিঠি এলো মন্মথর নামে। আরও একখানা টেলিগ্রামও এলো। টেলিগ্রামখানা বিভূতির। চিঠি ক'খানা লিখেছেন হেডমাস্টার মশায়, রমেশ স্যার, মাধববাবু, দ্বিজু মুন্সী, জ্যোতিপ্রসাদবাবু এবং সত্য দু'জনে একসঙ্গে।

সত্য এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ছাত্রদের মধ্যে থার্ড হয়েছে।

সত্যর চিঠির মধ্যেই এক লাইন লিখেছে মালতী "টেলিগ্রাম করিয়াছেন বাবা। আমরা খুব খুশী হইয়াছি। কবে আসিবেন? ইতি মলি।"

এর পর এলো পণ্ডিতমশায় গোপীনাথ ভট্টাচার্য এবং রাধাশ্যামের চিঠি। সবশেষে কাকা জটাধরের পত্র।

কাকার ছেলের সর্দিজ্বর হাম হয়েছিল। কাকা লিখেছেন—"বড়ই বিব্রত ছিলাম। যাহা হউক তুমি পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছ, বংশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। তোমার ভাইদের ভবিষ্যৎও ভালো হইবে, তার পথ হইল। তোমার খুড়ীমা খোকনকে দিনরাত্রি শুনাইতেছেন—খোকন, তোমার দাদা ফার্স্ট হইয়াছে—তোমাকেও ফার্স্ট হইতে হইবে। জটাধর মায়ের কাছে মানত করিয়া রাখিলেন—খোকন ফার্স্ট হইলে মায়ের নাটমন্দির মন্দিরের বারান্দায় মার্বেল বসাইয়া দিবেন।"

নতুনমা সেদিন তখন গোবিন্দজী এবং লক্ষ্মীজনার্দনের ভোগের পায়েসের হাঁড়িতে খুন্তি নাড়ছিল, হাতের খুন্তিটা হাঁড়িতে রেখে সরে এসে বললে—বাবা মনু, তোমার প্রথম রোজগারের টাকা থেকে তোমাকে আমাদের গোবিন্দজীর পুরনো ঘর ভেঙে নতুন করে দিতে হবে।

গঙ্গাধর বাইরে থেকে বাড়ি ঢুকছিলেন, তিনি বলতে বলতেই ঢুকলেন—দেখ, ভোগ রাঁধতে রাঁধতে এমন করে কথা কইতে নেই। মুখের আব পড়ে। তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

কাদম্বরী কিন্তু রাগ করলে না, বললে—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ঠাকুর গুরুরা পেঁতে আওড়াতে পেলে আর কিছু চায় না। চোখ মেলে তাকায়ও না। আমি ভোগের হাঁড়ি ছেড়ে তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে মুখ খুলেছি ঠাকুরমশাই।

গঙ্গাধর অপ্রস্তুত হলেন। বললেন—যা কাল হয়েছে গো! আচারবিচার সব বিসর্জনে গেল। বুঝছ না, তুমি তো হাল আমলের মেয়ে, ভয় হয়—

কাদম্বরী বললে—বাবা বাবা! এত করেও পুরনো আমলের হতে পারলাম না! বল

তো কখন কোন্ অনাচার দেখেছ আমার ?

গঙ্গাধর কথাটাকে পালটে দিলেন, বললেন—দেখ, মনু এত ভালো করে পাস করেছে, ফার্স্ট হয়েছে, জষ্টিমাস, আম-কাঁঠাল-তরমুজ নানান ফলের সময়, খুব ভালো করে ভোগ দাও গোবিন্দজীর।

কাদম্বরী বললে—কেবল গোবিন্দজী লক্ষ্মজনার্দনের ভোগ দিলে হবে না। ওবাড়িতে জটাধরজননী চক্রবর্তীবাড়িতে দুর্গা মায়ের ঠাট রয়েছে, গ্রামদেবতা বুড়োশিব, বুড়ীকালী—সব থানে পুজো দিতে হবে। বুঝেছ মনু, তুমি যখন লেখাপড়া শেষ করে রোজগার করতে আরম্ভ করবে—পকেট ভরে ভরে টাকা মোহর নিয়ে আসবে তখন এইসব ঠাকুরদের স্থানের উন্নতি করে দিতে হবে তোমাকে। বুঝলে ?

খুব ভালো লাগছিল মন্মথর। জেগে বসে বসে এমন একটি সুস্পষ্ট সুন্দর স্বপ্ন আর কখনও দেখেছে বলে তার মনে হল না। এবং স্বপ্ন বলেও মনে হল না। সব যেন সত্য হবে বলে মনে হল। গোবিন্দজীর একটি সুন্দর মন্দিরকে সে যেন চোখে দেখলে। মন্দিরের চূড়ায় পিতলের কলসগুলি রোদের ছটায় ঝকমক করে উঠল।

সামনে একটি নাটমন্দির।

গঙ্গাধর বললেন—জনাইয়ের মুখুজ্জেবাড়ির নাটমন্দিরের মতো নাটমন্দির করবে বাবা। তবে ও'রা লক্ষপতি ধনপতি রাজালোক—ও'দের বড়, তুমি ছোট মতো করবে!

কাদম্বরী বললে বুড়োশিব আর বুড়ীকালীর কথা—বুড়ো বুড়ীর পানে কেউ তাকায় না মনু। অথচ ও'রাই হলেন গ্রামদেবতা। এই গ্রামকে রক্ষা করছেন—জল ঝড় বজ্রাঘাত কলেরা বসন্ত, এই তো ম্যালেরিয়া জ্বর—শেষ করে দিলে দেশ। আমাদের গ্রাম কেমন মরতে মরতে থেকে গেল দেখ!

মন্মথ শুনেই যাচ্ছিল। এবং মোটামুটি ওদের ওই কল্পনার সঙ্গে নিজের কল্পনাকেও মিলিয়ে দিচ্ছিল। ওরা যেখানে থামছিল সেখান থেকে ওর স্বাধীন যাত্রা শুরু হচ্ছিল।

কাকা জটাধরের নায়েব যে কথাটা বলেছে সেটা ওর বুকে খুব বেজেছে। কাকা এম. ই. ইস্কুল করবে, বলেছে সেটা মন্মথর জন্যই করছে, মন্মথ ওখানে হেডমাস্টার হবে। মন্মথ কল্পনা করে, সে গোবিন্দপুরে হাই ইংলিশ ইস্কুল করবে।

গোবিন্দপুর এম. কে. হাই ইংলিশ ইস্কুল।

বাবার নামে করবে স্মৃতি আর ন্যায় পাঠের টোল।

তার মায়ের নামে করবে মেয়েদের ইস্কুল।

আর চ্যারিটেবল্ ডিসপেনসারী। ওটারও নাম হবে—ওটাও তার নামেই হবে। এম. কে. চ্যারিটেবল্ ডিসপেনসারী। আর ? আর ? মনে পড়ে যায় নতুনমা কাদম্বরীর কথা। তার নামে কি করবে ? অভাব হয় না কল্পনাবস্তুর। একটা লাইব্রেরী করবে। গোবিন্দপুর কাদম্বরী লাইব্রেরী।

ওই খাঁয়ের দীঘির বকুলতলার সামনেই একটা ফুটবলের মাঠ হবে।

হঠাৎ কাদম্বরী জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা আমরা কোথায় থাকব ?

গঙ্গাধর বলেন—আমরা কোথায় আবার থাকব ? কেন, এখানেই !

—কেন ? কলকাতায় বাবামণির বাসায় ?

গঙ্গাধর ধমকে ওঠেন—বাসা কেন ? নিজের বাড়ি করবে মন্মথ ! কিন্তু সেখানে আমরা থাকব কেন ? মনু ! মনু রে !

হঠাৎ গঙ্গাধরের মনে হয়, মনু যেন তাঁদের কথা শুনছে না ! গঙ্গাধরের ডাকে চকিতভাবে সজাগ হয়ে মন্মথ বললে—আজ্ঞে ?

—কি ভাবছিস বাবা বল তো ?

হঠাৎ ওই প্রশ্নে চমকে উঠেছিল মন্মথ ; ভাবছিল সে গঙ্গাজলের কথা আর মালতীর কথা। নতুনমা এবং বাবার ওই সব পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে তার মন চলতে চলতে কখন যে ও'দের পরিকল্পনার সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে আলাদা চলতে শুরু করেছিল তা' ঠিক সেও ধরতে পারে নি। কিন্তু মন চলতে শুরু করেছিল এটা ঠিক। ঠাকুরদেবতা, এ-অঞ্চলের লোকজনের জন্য ইস্কুল, ডিসপেনসারী, মেয়েদের ইস্কুল, লাইব্রেরীর এলাকা থেকে বেরিয়ে তার মন নিজের বাড়িঘর তৈরি করতে শুরু করেছিল।

একটা বিরাট বাড়ি তৈরি করবে—এখানেও করবে কলকাতাতেও করবে। মাটি-কাদা দিয়ে গেঁথে ওই পাতলা ইটের সেকেলে দালানকোঠা নয়, এ-আমলের সুন্দর জানালা দরজাওয়ালা বাড়ি, সামনে প্রশস্ত বারান্দা, গোল-গোল লম্বা থাম—মাথায় কারুকার্য থামের মাথার সঙ্গে কাঠের ঝিলিমিলি। নিচের দিকে লোহার রেলিংয়ের বেড়। আর ঘরগুলি সব বড় বড় ঘর—আলো বাতাসে ঝলমল কববে। একটা বেশ জমকালো গাড়িবারান্দা থাকবে। ওয়েলার জোড়া ঘোড়া গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকবে সেখানে। কলকাতায় থাকবে পালকিগাড়ি, ল্যান্ডো, ফিটন। জোড়া ঘোড়া। এখানেও থাকবে। এখানে একটা ঘোড়া। এক ঘোড়ায় টানা পালকিগাড়ি, আর একখানা টমটম। এখানকার রাস্তাগুলিকে নিজের খরচে পাকা করবে। কাকা যা কবেছে তাকে পাকা রাস্তা বলে না। নামেই পাকা। লোকে ঠাট্টা করে বলে—ডগপাকি ফলারের মতো ডগপাকি রাস্তা। মাটির গাদার উপরে ভাঙাচোরা বাড়ির ভাঙা ইট ফেলে দুরমুশ করে দিয়েছে। সে ইটের সোলিং পেড়ে তার উপরে ইটের খোয়া দিয়ে গরুটানা লোহার রোলার চালিয়ে পাকা করবে। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডকে টাকা দেবে। গ্রাম থেকে চুঁচড়ো পর্যন্ত, আর ওদিকে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত। পুজোর সময় ছুটিছাটাতে গোবিন্দজীর উৎসবে কলকাতা থেকে আসবে সে ; এই পাকা রাস্তায় তার গাড়ি স্টেশন থেকে এখানে পেঁছুবে। সে নামবে।

মেয়েরা নামবে।

সেই মেয়েদের মধ্যে থেকে বিচিত্রভাবে বেরিয়ে আসে মালতী। বেরিয়ে আসে গঙ্গাজল। গঙ্গাজল আজ তার কাছে এক আশ্চর্য মেয়ে। যেন রহস্যরূপিণী। সে যেন কোনো ছম্ম-বেশিনী দেবী। যেমন আশ্চর্য এবং আগুনের শিখার মতো জ্বলে ওঠা ক্রোধ, তেমনি কি শান্ত শীতল আশ্বিনের ভরা গঙ্গার জলের মতো তার স্নেহ তার ভালবাসা! গঙ্গাজল! গঙ্গাজল আসবে না তার বাড়ি দেখতে ?

নিশ্চয় আসবে।

গঙ্গাজল চপলা—ডাকনাম তার চপলা—ভালো নাম তার চিন্ময়ী।

গঙ্গাজল চপলা চিন্ময়ী। গঙ্গাজল তার পরীক্ষার ভালো ফলের জন্য মা কালীর পুজো করিয়ে পুষ্প পাঠিয়েছিল। এত বড় হিতার্থিনী তার কে ? হঠাৎ সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল সেই শ্রীমানী বাজারের সামনে ফুটপাতের উপর যে পাগলা সাধুটা বসে থাকে আর বলে—আ হো শুনো তো শুনো তো। তুমহার ললাট তো জেরা দেঁখে দেঁখে, তেরা হাত ভী দেঁখে! সাধুটা একটা কথা বলেছিল—সে ভুলে গিয়েছিল। আজ মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল নয়, গঙ্গাজল চপলা চিন্ময়ীই তাকে মনে পড়িয়ে দিলে লোক পাঠিয়ে। সাধু বলেছিল—তোমার খুব সৌভাগ্য এবার বাবু! তোমার জিন্দিগীমে এক আওরৎ আতি হ্যায়। বহুত মঙ্গল করেগী তুমহারা।

সে বলেছিল—দূর!

পাগলা বলেছিল—একটা ফুলের নাম কর তার মনে এসেছিল মালতী নামটা। কিন্তু

মালতী নাম সে বলে নি। সামনে চামেলী তেল বিক্রি করছিল একজন ফেরিওয়ালা। সেই হাঁক শুনে সে বলেছিল—চামেলী!

পাগলা বলেছিল—বাবুজী, ও যো আওরৎ তুমহারা মঙ্গল করেগী লছমীরূপিণী হোগী উনকে নাম চ অক্ষরওয়ালী হোগী।—হাঁ।

আশ্চর্য সেদিন বারেকের জন্যও মনে হয় নি গঙ্গাজলের কথা।

চপলা—চিন্ময়ী!

ক'দিন পরই দশহরা—গঙ্গাপুজা। গঙ্গাজল পিসীমার নাম করে লোক পাঠিয়েছে—আসতেই হবে।

তাই ভাবছিল মন্মথ।

বাবা তাকে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—কি ভাবছিস বাবা বল তো?

মন্মথ একটু চমকে উঠে বললে—ভাবছি কলকাতা যেতে হবে। কলেজে ভর্তি হতে হবে।

গঙ্গাধর বললেন—হ্যাঁ। তা' যেতে হবে বই কি। আর যাবিই যখন, তখন তোর পাথুরেঘাটার পিসীমা যখন দশহরার আগে যেতে বলেছে তখন আগেই যাওয়া ভালো।

কাদম্বরী বললে—তাহলে ভোগটোগগুলি কাল পরশুতেই দিয়ে দাও। বারোটি ব্রাহ্মণ নেমন্তন্ন কর!

গঙ্গাধর বললেন—আর কি বলে, মনুর দু'চারজন বন্ধুটন্ধু।

কাদম্বরী বললে—সধবাও তাহলে বলতে হবে বাপু।

গঙ্গাধর বললেন—যা হয় কর। আমি তো উদ্যুগ করে দিয়ে খালাস। হাঁড়ি ঠেলতে তো আমি যাব না। যা করবে সেই হিসেব করে কর। তখন যেন মরলাম মরলাম ডাক ছেড়ো না।

কাদম্বরী তাতে পিছু হটলে না। বললে—সে ভার আমার। না হয় ও গাঁ থেকে বিরজাঠাকুরঝিকে বলে পাঠাব। পেটে দুটো খাবে—একটু লুচির ছাঁদা নেবে। বুক দিয়ে খেটে হেঁশেল তুলে দিয়ে বাড়ি যাবে।

তাই হল। বেশ একটু সমারোহই হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত হুগলী থেকে তিন টাকার রসগোল্লা কাঁচাগোল্লা আনানো হল এবং নিমন্ত্রিতদের পাতে দেওয়া হল। মন্মথর ভারী ভালো লাগছিল। তাকে কেন্দ্র করে এই উৎসব আনন্দ হচ্ছে, এর থেকে সুখের বুঝি আর কিছু নেই। খরচা বেশী হল দেখে সে কুণ্ঠিত হয়েছিল।

কিন্তু বাবা বললেন—তুমি আমার কুল উজ্জ্বল করা ছেলে। তোমার জন্যে এটুকু করব না? কিন্তু গিয়ে এবার উঠবে কোথায় বল দেখি? কাকা তোমার লিখেছে—

—না। তাহলে কিন্তু আমি মাথা কুটব। কাদম্বরী ফোঁস করে উঠল।

—ছোটমা ঠিক বলেছে বাবা। ও ঠিক হবে না।

—না। গঙ্গাধর বললেন—ওখানে থাকতে বলছি না। বলছি, ওখানে উঠে তারপর যেখানে—। মানে মাধববাবু যদি বলেন—এখানেই থাক—

মন্মথ বললে—না, বাবা; আমি এবার আর কারও বাসায় থেকেটেকে মানে পরের ভাত খেয়ে পড়ব না। আমি স্কলারশিপ পাব, কলেজে মাইনে লাগবে না, দরকার হলে মাধববাবুকে ভাগবত শোনানোর কাজটা রাখব, তাহলেই চলে যাবে।

—উঠবে কোথায় গিয়ে?

—উঠব?

—হ্যাঁ। সেই জন্যেই তো কাকার কথা বলছিলাম।

মন্মথ বললে—না। আমি বরং পাথুরেঘাটায় পিসীমা চিঠি লিখেছেন—ওঁর ওখানে গিয়ে উঠব।

কাদম্বরী খুশী হল। গঙ্গাধর বললেন—দেখ বাবা, শুধু তো অন্ন বস্ত্র অর্থের জন্যে মানে দারিদ্র্যের জন্যে নয়, মানসম্ভ্রমের জন্যেও বটে। আমাদের আগে কত মানসম্মান ছিল বাবা! সে দিন চলে গিয়েছে। সংস্কৃতের মান নেই—ব্রাহ্মণ হয়েছে বামুন। পুজুরী বামুন আর রাঁধুনী বামুন। শাঁখে ফুঁ আর উনুনে ফুঁ।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—তুমি যেদিন কলকাতা যাবে বলেছিলে প্রথম, সেদিন তোমাকে বলেছিলাম—বাবা, যমকে নচিকেতা বলেছিল রাজসিংহাসন রাজ-ঐশ্বর্য মণিমুক্তা স্বর্ণ রৌপ্য সুন্দরী নারী এ সব দিয়ে মৃত্যুকে রোধ করা যায় না। বিত্ত দিয়ে মানুষকে তর্পণ করা যায় না। কলকাতা মহানগরী; সেখানে যমের এই সব ঐশ্বর্য চারিদিকে থরে থরে সাজানো রয়েছে। তুমি সেখানেই যাচ্ছ বাবা, দেখো যেন এ সবের কাছে নিজেকে হারিয়ে ফেলো না।

একটু চুপ করে থেকে বললেন—আজকে আর বলতে পারছি না যে বিত্ত চাইনে। বিত্ত চাই। বিত্ত না হলে জীবন চলে না।

তিন দিন পর মন্মথ কলকাতা রওনা হল।

শুভ দিন ছিল। সর্বশুদ্ধা ত্রয়োদশী। তার উপর 'মঙ্গলে ঊষা বুধে পা'। এ ছাড়া সম্মুখেই আর দু'দিন পর দশহরা। গঙ্গাধর বললেন—পাথুরেঘাটায় উনি যে করে যেতে লিখেছেন আর ব্রত আছে যেখানে সেখানে তো যেতেই হবে।

তাই হল। গরুর গাড়ি করে গ্রাম থেকে চুঁচুড়া রওনা হয়ে গেল। গ্রামের প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় গ্রামের অর্ধেক লোক তাকে বিদায় দিতে এলো। চুঁচুড়ায় গিয়ে ট্রেন ধরবে।

ভটচাজবাড়ির বড়ভটচাজের বড়ছেলে আশ্চর্য ছেলে। দিগ্বিজয়ী ছেলে—সে চলেছে কলকাতায় কলেজে পড়তে। দেখতে অনেক লোকই এলো। গোবিন্দ মন্দির থেকে প্রণাম শুরু করে জটাধরজননীতলা হয়ে চক্রবর্তীদের দুর্গাবাড়িতে প্রণাম করে বুড়োশিব বুড়ো-কালীতলায় প্রণাম করে গ্রামপ্রান্তে গ্রামের জ্যেষ্ঠদের পায়ের ধুলো নিয়ে গাড়িতে উঠল। সকলে হাত তুলে আশীর্বাদ জানালে।

জীরেটের মুখুজ্জেদের গঙ্গাধর ডাক্তারের ছেলে আশুতোষ এবার এম. এ. তে ফার্স্ট হয়েছে। ল' পড়ে সে উকিল হবে। গুরুদাস বাঁড়ুজ্জে সব পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে উকিল হয়েছে। রাসবিহারী ঘোষ সেও এক আশ্চর্য উকিল। চারিদিকে নাম। তেমনি একজন হবে গঙ্গাধরের ছেলে মন্মথ।

কাদম্বরী গঙ্গাধর গ্রামের প্রান্তে দাঁড়িয়ে বিদায় দিলেন। গঙ্গাধর বললেন—মন দিয়ে পড়বে। মানসম্মান জাতধর্ম এই ক'টি বজায় রেখো। অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ো না। আর কি বলে—। বুঝেছ না—। ধর্মকে বাঁচিয়ে চলো।

কাদম্বরী মাথায় ঘোমটা একটু ফাঁক করে আশীর্বাদ করে বললে—পুজোর সময় যেন এসো।

মন্মথ ছোটমায়ের কোলে ছোট্ট শিশুটিকে একটু আদর করে বললে—আসব। আর খোকনটার জন্যে একটা মখমলের জামা জরিদেওয়া টুপি তার সঙ্গে ছোট্ট জুতো আনব।

কাদম্বরী কোলের ছেলেকে আদর করে তার দিকে চেয়ে চেয়েই বললে—কিন্তু ওকে তুমি বলে যাও ভালো ছেলে হতে। ওকে তোমার মতো হতে হবে। কি রে! হবি তো? না গরু চরাবি?

গঙ্গাধর বললেন—ওঠো ওঠো গাড়িতে ওঠো। যাত্রার সময়টা পার হয়ে যাবে। ওঠো। মন্মথ গাড়িতে উঠল।

হাওড়া স্টেশনে নেমে সে একটা ঝাঁকা মুটে করে নিয়ে বেরিয়ে এলো স্টেশনের বাইরে। এবং হঠাৎ একটু থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বললে—দাঁড়া রে বাবা একটু দাঁড়া।

সে ভেবে নিলে কোথায় যাবে!

কোথায় যাবে?

পাথুরেঘাটা যেতে তার কেমন লাগছে। গঙ্গাজল লোক পাঠিয়ে ডেকেছে, তবুও যেন কেমন লাগছে। তবে কি মাধববাবুদের ওখানে?

না।

হঠাৎ মনে হল দ্বিজু মুন্সীর কথা। ঠিক কথা। দ্বিজু মুন্সীর বাড়িই যাবে। একটু হাঙ্গামা হবে। খাওয়া দাওয়ার একটা হাঙ্গামা। ওদের কায়স্থ বাড়ি—ওদের রান্না ওরা খেতে দেবে না। মন্মথ খেতে চাইলেও ওরা তা' কিছুতেই দেবে না উনুন ধরিয়ে রান্নার উদ্যুগ করে দিয়ে বলবে—নাও চড়িয়ে নামিয়ে করে কর্মে নাও।

তাই করবে! উপায় কি?

দু' তিন দিনের মধ্যেই সে চলে যাবে কোনো একটি ভালো মেসটেস দেখে। সেই ভালো। তারপরই মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগল—কোথায় আগে যাবে? কার সঙ্গে আগে দেখা করবে? মালতীর সঙ্গে? না পাথুরেঘাটায় গঙ্গাজলের খোঁজে আগে যাবে?

কার কাছে?

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥

শঙ্করবাঈ

"দুনিয়া খুদাতায়লার, এ দুনিয়া পয়দা হয়েছে তাঁরই হুকুমতে তাঁরই ইচ্ছায়। দিন দুনিয়ার মালিক তিনি। শয়তানও তাঁরই পয়দা তাঁরই সৃষ্টি। কিন্তু শয়তান দুনিয়ার মানুষের উপর খোদার মালিকানি ঘুচিয়ে দিয়ে নিজে মালিক হতে চায়। সেইজন্যে সে মানুষের আত্মাকে কেনে। বাবুসাহেব, আগের কালে গুলাম বিক্রী হত। বান্দা-বান্দী নিয়ে কারবারীরা হাটে আসত—বেঁধে নিয়ে আসত বান্দার দল, বাদীর দল। দড়িতে বেঁধে আনত ছাগলের মত ভেড়ার মত গরুর মত। বাজারে আসত গৃহস্থ থেকে আমীর নবাব বাদশাহের লোক। তারা কিনে নিয়ে যেত জবরদস্ত দেখে গোলাম বান্দা—খুবসুরতী নওজোয়ানী দেখে বান্দী। লেকিন, বাবুসাহেব, তাতেও তাদের আত্মা বিক্রী হত না। বান্দা-বান্দীরা দেহে মালিকের কাছে কেনা ছিল—আত্মা ছিল তাদের স্বাধীন। খুদার বিচারে বান্দা বাদশাহ নাই—সে বিচারে এক বান্দা সে হয় বেহেস্তের অধিবাসী আর তার যে মালিক—তাকে যে আশরফি কি রুপেয়া দিয়ে কিনেছিল সে যায় নরকে—দোজখে। কিন্তু শয়তান এই খুদাতায়লার দুনিয়ায় মানুষের আত্মাকে কেনে। যে দাম সে চায় সেই দামই দেয়। এ দুনিয়ার যে কোন দুর্লভ বস্তু হোক। তার বদলে শয়তানের কাছে খত্ লিখতে হবে। লিখতে হবে—মানি না, দয়া না প্রেম না ক্ষমা না সত্য না কুরান না—সব কিছুর মূল বলে যাকে মানুষ মানে সেই খুদাকেও না। ঝুট্ বিলকুল ঝুট্। খুদা ঝুট্ ঈশ্বর ঝুট্—মানি না।"

বলেছিলেন এক ফকীরসাহেব।

দিল্লীতে নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগায় গিয়েছিলাম। সেখানে আকস্মিকভাবে এই বৃদ্ধ ফকীরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এবং আলাপও হয়ে গেল।

১৯৬০ সাল থেকে আমাকে কর্মসূত্রে দিল্লীতে গিয়ে মধ্যে মধ্যে কিছুদিন থাকতে হত। কাজ খুব বেশী ছিল না। অবসরই ছিল বেশী। এই অবসরের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে শখ জেগেছিল হারিয়ে যাওয়া পুরনো কালের ইতিহাস আর ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি দেখে বেড়ানো। কুতবমিনার, তার পাশে অসমাপ্ত মিনার আলাই দরওয়াজা দেখেই খুশী হয়নি মন—সুলতানা রিজিয়ার কবরস্তান খুঁজে খুঁজে দেখে এসেছিলাম। তোগলকাবাদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ঘুরে বেড়াতাম। সেই পুরনো বাজারের দু'পাশের কুলুঙ্গির মত ঘরগুলোর কোন একটাতে বসে সিগারেট ফুঁকেছি আর নানান উদ্ভট কল্পনা করেছি।

বিকৃতমস্তিষ্ক অথচ বিপুল পাণ্ডিত্যের অধিকারী বাদশাহ মহম্মদ তুগলকের কথা ভেবেছি; চামড়ার পিতলের চাকতি খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েছি যা নাকি বাদশাহ সোনা রুপার মোহর সিক্কার বদলে মোহর সিক্কা বলে চালাতে চেষ্টা করেছিলেন। অনেক ইরানী তুরানী নারীদের কল্পনা করেছি। তারা অবশ্যই সেই ডবল বেণী ঝুলানো কৃপাণহস্তা ভীমা ভয়ংকরী নয়—তারা অবশ্যই কোমলাঙ্গী সলজ্জ আয়তনয়না চকিত ভীরু দৃষ্টি গোলাপপুষ্পবর্ণা কুঞ্চিতকেশবতী নূপুরচরণা বীণাদণ্ডমণ্ডিতভুজা দুর্লভা বরনারী। ফিরোজ কোটলা লালকেল্লার ভিতরে ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম স্বপ্নাবিষ্টের মত। কেবল হজরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার সমাধিস্থলে গিয়ে অভিভূত হয়ে যেতাম। নির্বাক হয়ে থাকতাম কিছুক্ষণ।

স্থানটি বড় পবিত্র।

সারা মুঘল আমলের শ্রেষ্ঠ ফকীর এখানে সমাধির অভ্যন্তরে ধ্যানমগ্ন। সারা মুঘলবংশের শ্রেষ্ঠ রুপসী এবং মহীয়সী কন্যা জাহানআরা বেগম এখানে সমাধির তলে শান্তিনিদ্রিত। তার সমাধির উপর মর্মরের আচ্ছাদন নেই, আছে সবুজ ঘাসের আস্তরণ। নিজেকে তিনি দীন জাহানআরা বলে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর নাকি এক আশ্চর্য রুপ

ছিল—তার মধ্যে জাগতিক সৌন্দর্য ছাড়াও আরও এমন কিছু ছিল যার জন্য সর্বভুক যে আগুন সে-আগুন তাঁর দেহের আতরমাখানো ভাঁজে ভাঁজে জড়ো-করা সূক্ষ্ম মসলিনে লেগে জ্বলে উঠে সারা দেহটা পুড়িয়ে তাঁর মুখের সামনে এসে থেমে গিয়েছিল, নিভে গিয়েছিল আপনি। তাঁর সমাধির সামনে এসে যখন দাঁড়াতাম তখন যেন কেমন হয়ে যেতাম আমি।

সারা মুঘল সাম্রাজ্যের কালের শ্রেষ্ঠ কবি মির্জা গালিব এখানে শায়িত আছেন। তাঁর সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে কতদিন চোখে জল এসেছে। মনে মনে বলেছি—"আমার এই হৃদয়, এ হৃদয় ইটেরও নয় পাথরেরও নয় কাঠেরও নয়। মানুষের এই হৃদয় আশ্চর্য। 'রুয়েঙ্গে হম হাজারোবার মুঝে কোই মানা না কিয়ো।' কাঁদতে দাও। আমি কাঁদব—হাজারোবার কাঁদবো—আমাকে কাঁদতে তোমরা কেউ মানা করো না। আমাকে কাঁদতে দাও।"

এর অল্প একটু দূরেই বাদশাহ হুমায়ুনশাহের সমাধি। বাদশাহ নিজের জন্য প্রশস্ত এবং বিশাল সমাধি নির্মাণ করিয়েছিলেন। তিনি জানতেন না যে তাঁর বংশের যাঁরা ভাগ্যহত তাঁরা মৃত্যুর পর তাঁরই সমাধির পাশে এসে স্থান নেবেন। শাহবুলন্দ ইকবাল শাহজাদা দারা শিকো এখানে শায়িত আছেন। হিন্দু মুসলমানের প্রেম এবং ঐক্যের দ্বারা অভিষিক্ত এক নূতন শস্যসম্পদে সমৃদ্ধ হিন্দোস্তান তিনি রচনা করতে চেয়েছিলেন।

দিল্লীর শেষ বাদশাহ—কবি বাদশাহ বাহাদুরশাহ জাফরশাহের ছেলেদের ফাঁসি দিয়েছিল ফিরিঙ্গীরা, খুনী দরওয়াজায় তাদের দেহ লটকানো ছিল তিন দিন, তারপর সেই শাহজাদাদের দেহ পচল গন্ধ উঠল—তখন তাদের এনে এখানেই আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল।

দিল্লীর এই অঞ্চলে একটা আশ্চর্য মোহ আছে। অন্ততঃ আমার জন্য আছে। এই কারণে মধ্যে মধ্যে আসতাম এখানে। ফুল নিয়ে আসতাম, আগরবাতি নিয়ে আসতাম, বাতি নিয়ে আসতাম। ওখানে গাইডদের মধ্যে আফজল বলে একজন লোক আছে। আফজলকে আমি টাকা দিয়েছি—সে আউলিয়া সাহেবের দরগাহে বেগমসাহেবার সমাধির পাশে এবং মির্জা গালিবের সমাধির ধারে ইসলামী পর্বে একটি করে চেরাগ জেলে দিত। এই আফজলই আমাকে এই ফকীরসাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

আফজল বাঙালী মুসলমান এবং আমার জেলা বীরভূমের লোক সে। নলহাটী তার বাড়ি ছিল। লীগ আমলে একজন লীগ নেতার সঙ্গে এসেছিল দিল্লী। ছিল তাঁর খানি-সামান মানে খানসামা; পরে লীগের ভাগ্যপরিবর্তনের সময় সকলে চলে গেল পাকিস্তান, সে এখানে থেকে গেছে। পাকিস্তানেও যায়নি, দেশেও ফেরেনি, এখানেই থেকে গেছে। মুসলমান যাঁরা তাঁদের কাছে অনেকটা পাণ্ডাগিরি করে। নিজে বাতি লাবান আগরবাতি ফুল রাখে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখায়, অমুসলমানদের গাইডের কাজ করে। উর্দু ভালই বলে, ইংরিজীও বলে ভাঙা ভাঙা।

Hazrat Nizamuddin Aulia—Fakir Sab—great Fakir—not dead but sleeping only. He talks in dream when you sleep, understand. Ask anything not me—him; ask in mind and he will say answers in dream.

আমার সঙ্গে কিন্তু সে উর্দু বা ইংরিজীতে কথা বলেনি—আমার পরনে কাপড় ফ্লানেলের পাঞ্জাবি আলোয়ান বিশেষ করে কোঁচার ঢঙ দেখে সোজাসুজি বাংলায় বলেছিল—আসেন বাবুজী, আসেন; আমি সব দেখাব বাবুজী—আপনি বাঙালী আমি বাঙালী—সব জানি আমি; আসেন।

সেই মুহূর্তে 'আ মরি বাংলাভাষা' গানটি গুঞ্জন করে উঠেছিল তা মনে পড়ছে এবং তাকেই গাইড নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগার দিকে যেতে

যেতে যে কটা কথাবার্তা হয়েছিল তারই মধ্যে তার নাম আফজল শেখ বাড়ি বীরভূম জেলার নলহাটীর পাশেই এবং আমার নাম আমার বাড়ির ঠাঁই ঠিকানা পরস্পরের কাছে জানা হয়ে গিয়ে আমি হয়ে গিয়েছিলাম তার 'দাদাবাবু', সে হয়ে গিয়েছিল 'আফজলভাই'। তাই মর্যাদাটা কতটা খাঁটী কতটা মেকী বা মৌখিক সে বিচার করবার মত পরীক্ষা কোনদিন আসেনি। এটাকে আমি সৌভাগ্যই মনে করি। তবে আফজলের একটি ইজ্জতবোধ এবং রাজধানীর একটি শিক্ষা তাকে মর্যাদা দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। বীরভূমের নলহাটী অঞ্চলের এই মুসলমান তরুণটি তার আঞ্চলিক সেই বিচিত্র টানযুক্ত ভাষার বাড়ি কুথা হে তুমার ? —আমার বাড়ি ?' প্রশ্ন দুটিকে অতি সুন্দর সুমানান করে 'জনাবকা দৌলতখানা আর মেরি গরীবখানা' বলে যখন উপস্থিত করত তখন কানে বা মনে এতটুকু হুঁচোট খেতো না। এবং মোটামুটি ইতিহাস ও কাহিনী তার সঙ্গে সমাধি-মন্দিরগুলির গঠনবৈশিষ্ট্য এ সবই আয়ত্ত করেছিল।

এই আফজল আমাকে আবার দেখালে এই ফকিরসাহেবকে। ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী মাস। সারা ভারতবর্ষে তখন আকস্মিক সংঘটনে একটা আলোড়ন জেগে উঠেছে। চীন ভারতবর্ষের উত্তর সীমান্তের বিরাট পার্বত্য অঞ্চল দখল করে নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি আরও অনেক অংশ দাবি করেছে যাতে হিমালয়ের প্রাচীরটাকে নিজের সীমানার মধ্যে পুরে হিমালয়ের পাদদেশে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করে সমতল ভারতবর্ষকে অনায়াসে লেহন করতে করতে নিঃশেষিত করতে পারে। নেফা অঞ্চলে বাঁধ ভেঙে চীনা সৈন্যবাহিনী জলস্রোতের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে পড়তে থমকে গেছে। ভারতবর্ষের মুখ কালো হয়ে গেছে তার নিজের অক্ষমতার জন্য। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তখনও জীবিত ছিলেন। তিনি চেষ্টা করেছিলেন গোটা জাতটাকে অক্ষমতার এই লজ্জা থেকে বাঁচাতে। আহ্বান দিয়ে সকলকে কাছে ডাকছিলেন। সে আহ্বানে আলোড়ন জেগেছিল। সে-আলোড়নে যেন রাতারাতি সারা হিন্দুস্তানের মানুষ বদলে গিয়েছিল। দিল্লীতে দূরদূরান্ত থেকে লোক আসছিল তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ দান দেবার জন্য। নেফার যুদ্ধে নিহত এক পাঞ্জাবী বীরের স্ত্রী এসেছিলেন তাঁর একমাত্র ষোল বছরের ছেলেকে নিয়ে—যুদ্ধে পাঠাবেন। এক রাজপুত চাষী এসেছিল তার দুই নাতিকে নিয়ে—তাদের দেবে নেহেরুজীর হাতে, তারা লড়বে দুশমনের সাথে। এক অন্ধ সন্ন্যাসী এসেছিল তার একখানি মাত্র দামী কম্বলখানি দেবার জন্যে ; হিমালয়ের উপরে দারুণ শীতে হিন্দুস্তানের জোয়ানদের একজনও গায়ে দিতে পারবে। মা বাপকে সঙ্গে নিয়ে এক বারো বছরের লেড়কী এসেছে—তার সব অলংকার সে দিয়ে দেবে লড়াইয়ের জন্যে। দিল্লীতে দান নেবার জন্যে নানাস্থানে আপিস খোলা হয়েছে। রিক্রুটিং আপিস বসেছে। ১৯৬৩ সালের শীত ছিল দুরন্ত শীত। দিল্লীতে তাপমান হিমাঙ্কে এসে ঠেকতে চাচ্ছিল। তার মধ্যেও জীবন হয়ে উঠেছিল সক্রিয় সতেজ।

জানুয়ারীর ২০।২১।২২।২৩ পার্লামেন্টের একটা অধিবেশন হয়েছিল। বোধহয় ২৪ পর্যন্ত। নেহেরুজী সামরিক অবস্থা সম্পর্কে বিবৃতি দিয়েছিলেন এবং পার্লামেন্টের সভ্যদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন।

এই উপলক্ষে আমিও গিয়েছিলাম। এবং একদিন গিয়েছিলাম নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগায়। সেইখানেই আফজল বললে এই ফকীর সাহেবের কথা।

সে সময় আমার দেহ এবং মন দুইই একেবারে প্রচণ্ড আঘাতে আহত, বিপর্যস্ত। '৬২ সালের অক্টোবরে আমার বড়জামাই মারা গেছেন। আমার বিধবা কন্যা এবং তার ছেলেমেয়েরা তখন মুহ্যমান। তার উপর ছেলেটির হয়েছে কঠিন অসুখ। আমি নিজে পড়েছি ভেঙে।

আমার সেদিনের সে চেহারা দেখে আফজল চমকে উঠে বলেছিল—এ কি চেহারা হয়েছে আপনার দাদাবাবু !

বিষন্ন হেসে দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সংক্ষেপে বিবরণটুকু বলতেই আফজলও যেন মুহ্যমান হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। তারপর সেই বললে—এক পীরসাহেব—পীর বোঝেন তো, সিদ্ধ ফকীর, এখানে এসেছেন, রয়েছেন। দেখা করবেন দাদাবাবু ? তাঁর 'দোয়া' হলে সব ভাল হয়ে যাবে এ একেবারে নির্ঘাৎ।

আমি চুপ করে রইলাম। কি বলব ? শান্তির (আমার জামাই) অসুখের সময় সাধু সন্ন্যাসী দেবতা গোস্বামী জপ হোম মানসিক এ তো কম হয়নি। আমার গৃহিণী তো বাকী রাখেননি !

আফজল বললে—এইখানেই আছেন। খুব ভালো লোক ! হাসলাম। লোক ভালই হোক আর মন্দই হোক জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব যেখানে সেখানে দুইয়ের দামই যেন সমান ; বিধাতা কাউকেই কোন দামই দেন না, ভালকেও না মন্দকেও না ; দিলে একেও একটা কানাকড়ি ওকেও একটা কানাকড়ি দিয়ে পথের ধারে ফেলে দিয়ে যান। তবু শেষ পর্যন্ত দেখা করলাম। 'দেখা করলাম' বলা ঠিক হল না—দেখতে গেলাম। এদেশের মানুষ তো।

দেখে অনুশোচনা হল না। সত্যই চোখে যেমন ভাল লাগল তেমনি ভাল লাগল কথাবার্তা বলে। সংসারে একধরনের মানুষ আছে যাদের কথাবার্তার আসল মানে হয়তো আবোলতাবোলের সামিল কিন্তু ভারী ভাল লাগে শুনতে। কারণ সে আবোলতাবোলে তোমার এতটুকু ক্ষতি হবে না। তবে বলনেওয়ালা হিসেবে সাচ্চা মানুষ। উনিই বললেন—দুনিয়াতে শয়তান মানুষের আত্মাকে কেনে। সেই আদিকাল থেকে কিনে চলেছে। কি তার হিসাব ? না—কিনতে কিনতে কিনতে একদিন সে তামাম মানুষের আত্মাকে কিনে ফেলবে। বাস—আল্লাহতায়লার সঙ্গে লড়াই ফতে। দুনিয়ার সব মানুষ যখন তার কেনা তখন দুনিয়ার মালিক আর খুদা নন—দুনিয়ার মালিক সে।

—"কভি কভি কার-কারবারকা মৌকা আতা হ্যায়। যেইসা বরখামে পানি হোতা হ্যায়, বসন্তমে ফুল হোতা হ্যায়—"

বাবুজী, ঠিক তেমনিভাবে মানুষদের মধ্যেও আসে এক-একটা সময়। দেখছ না বাবুজী কি সাড়া পড়েছে তামাম মুলুক ভর ? লোকে নিজেকে দেবার জন্যে যেন তৈয়ার—লেও জী লে লেও হামারা সবকুছ—হামারা বিলকুল—মেরা জান ভি জিন্দিগী ভি লে লিজিয়ে। লে লেও বাবা ! এ-সময় শয়তান আসবে। ঠিক আসবে। এসে বলবে—কেন ? এমনি দেবে কেন ? আমি তোমাকে দাম দেব। বল কি দাম চাই ? বল ? দেব নিশ্চয় দেব। জরুর দুংগা ! আওরৎ শরাব সোনে চাঁদি জহরৎ—যো কুছ মাংতা। লো — ।

তারই খোঁজে আমি বেরিয়েছি বাবুজী ! তারই খোঁজে ! সে বের হবে এই সময়ে। এমনই সময়ে সে বের হয়।

এমনি সময় দুঃসময় যখন আসে তখনই সে তার দোকান খুলে বসে। যে মানুষের মুখ দেখে বুঝতে পারা যায় এই মানুষটা বুকের ভিতরকার কোন তাপে জ্বলছে তাকেই ডেকে বলে—কি সাহেব তোমার ভিতরের দুখটা বেচবে ? আমি সুখ দিয়ে কিনব।

যে বেচতে রাজী হয় সে সুখ যখন পায় তখন দেখে বুকের সেই দুঃখের সঙ্গে তার আত্মাকেও সে বেচে দিয়েছে।

জীবনের সুখকে বেচা যায় দান করা যায় কুরবানি করা যায় কিন্তু দুঃখ দর্দ—এ বেচা যায় না। আত্মার সঙ্গে আলগ্ করা যায় না। ভারী একটি মজার কথা বলেছিলেন ফকীর। একালে এই ধরনের কথা মানুষেরা বলে না; কথাটা মনের মধ্যে আমার গেঁথে রয়েছে। বলেছিলেন—দেখ বাবুজী সব ফলের দেখতে পাবে তিনটে ভাগ। উপরের খোসা তারপর শাঁস তারপর আঁটি নয় বীজ। আম ধর না বাবুসাহেব। ওর আঁটি হল আত্মা—শাঁস হল তার দুঃখ দর্দ—আর খোসা হল তার সুখ। খোসাটা কেবল বর্মের মত বাঁচায়। দুঃখের শাঁস থেকেই বীজ আঁটি বাড়ে ডাঁটো হয়। আঁটি থেকেই হয় গাছ বাবুজী। শাঁস তো অন্যের খাবার জন্যে নয়—ওটা তৈরী হয়েছে আঁটির জন্যে। আমরা জবরদস্তিতে খেয়ে নিই। বীজ আঁটি বরবাদ হয় তার জন্যে।

দুঃখ আর দর্দ এ বেচলেই শুধু দুঃখ দর্দই যায় না তার সঙ্গে আত্মাও চলে যায়। হঠাৎ হেসে ফেলেছিলেন ফকীরসাহেব; বলেছিলেন—আমি কাল রাত্রে এখানে এসেছি। আজ এই সকালে না এসে যদি সন্ধ্যেবেলা আসতে তাহলে দেখতে পেতে বাবুজী বড়ে বড়ে আদমী আমীর উজীর আজকালের মিনিস্টার লোক এসে ভিড় জমিয়েছে। আমার কাছে আসে। কি? না বহুত্ ডর্ লাগছে। কেন? না এমন কাম করে ফেলেছে যে মনে হচ্ছে জান খতম না করলে আর পার নেই। কেউ এমন আওরতের পাল্লায় পড়েছে যে—। এর আর শেষ নেই বাবুসাহেব। কেউ কেউ আসে আমার কাছে রুপেয়া দিয়ে দুখের বদলে সুখ কিনতে। ছোট মিনিস্টার থেকে বড় মিনিস্টার করে দাও। আমি ফিরিয়ে দি। তারা কিন্তু মানে না। তারা অহরহ খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই বিচিত্র বানিয়াকে যে আত্মার মূল্য নিয়ে দুঃখের বদলে তাকে সুখ দেয়। সে ছদ্মবেশে তাদের পিছন পিছন ফেরে—হঠাৎ কোন নির্জনে পিছন থেকে পিঠে আঙুল ঠেকিয়ে ইশারা দিয়ে বলে—এই আমি আছি। এস। বল কি চাই? বল! সে কারবার অহরহই চলছে দুনিয়ায়। গোপন কারবার। অত্যন্ত গোপন। কিন্তু এই সময়ের মত সময় আসে যখন কারবার চলে প্রকাশ্যে। আফজল বলছিল তুমি দেহাতের মানুষ। বাবুজী, দেহাতে দুর্যোগের রাত্রে 'ডাকাইতি' দেখেছ? ডাকাইতরা মশাল হাতে নিয়ে আসমান আর ধরতিকে কাঁপিয়ে হল্লা তুলে গাঁওয়ে ঢুকে পড়ে?

বাবুজী, হিন্দুস্তানের উত্তর তরফে হিমালয় পাহাড়ের মত পাহাড়ের উপরেও জমীন নিয়ে হামলা হচ্ছে। চীনা লোকেরা এসেছে জবরদস্তি ছিনিয়ে নিতে। এই কালের সঙ্গে দেহাতের বর্ষার রাতের ডাকাইতি হামলার তফাৎ কি বল?

এমন রাত হিন্দুস্তানে তো কম আসেনি বাবুজী! অনেক অনেক। কিতাবে লেখা আছে। মানুষেরা পুরুষানুক্রমে শুনে শুনে মনে করে রেখেছে। আমার উমর কম হল না বাবুজী—কমসে কম তো পঞ্চআশী হয়ে গেল। এই তো ক'বছর আগে মিউটিনির শও বরিষ পুরা হল। বচপনে সেই কথাই শুনেছি। সে সময় শুনতাম খুদ শয়তান নাকি মানুষের ভিড়ের মধ্যে মিশে মশাল আর তলোয়ার হাতে ছুটে বেড়াত। কানপুরে নানাসাহেব ইংরেজদের বাত দিয়ে বাতের খেলাপ করে গুলি করে মেরেছিল। আমার দাদো বলত—নেহি। নানাসাহেবকে জোর করে এই বাতখেলাপী গুনাহ করিয়েছিল সেই শয়তান। দাদো আমার সিপাহীদের দলে ছিল। সে নিজে চোখে দেখেছিল নানাসাহেবের পাশেই এক ঘোড়সওয়ার ছিল। তার পা দুটো মানুষের পা ছিল না। খুব হুঁশিয়ারির সঙ্গে ঢেকে রাখত। দাদো হঠাৎ দেখে ফেলেছিল। সে দাদোকে অনেক টাকা সোনা রুপা দিতে চেয়েছিল। দাদো তা নেয়নি। রাত্রের অন্ধকারে ছাউনি ছেড়ে চলে এসেছিল। জানোয়ারের পায়ের মত পা—খুব যত্ন করে ঢাকা, বাকীটা একেবারে মানুষের মত। যেমন তেমন মানুষ নয় বহুৎ জোলুসী মানুষ, কথাবার্তায় আগুন জ্বালিয়ে দেয়—হা-হা হেসে হাওয়া কাঁপিয়ে

দেয়—সে গান করলে নেশা ধরে, নেশার তেষ্টা পায়। আওরতের পায়ে ঘুঁঘট বাজতে থাকে, দেহ দুলতে থাকে, বাবুজী, শয়তান যত জবরদস্ত তত সে চতুর জাদুগর। জীবনে জাদু লাগিয়ে দেয়।

॥ দুই ॥

বেশ লাগছিল শুনতে। তাছাড়া ফকীরসাহেব খুব ভাল বলনেবালা। ফকীরসাহেব খুব পড়াশুনা করা বিদ্বান মৌলভী নন, খুব গোঁড়া মোল্লাও নন। অথচ শক্তিসম্পন্ন মানুষ। নিঃসন্দেহে শক্তিসম্পন্ন মানুষ। আমাকে দেখেই বলেছিলেন—"বাবুজী, তুমি তো হালে এক বড়াভারী চোট খেয়েছ দেখছি! তোমার উপর আরও ঘা আসছে। তোমার নিজের উপর। হুঁশিয়ার থেকো বাবুজী। আদমী হিসেবে তোমাকে ভাল লেগেছে তাই বলছি।"

এইটুকু বলার জন্যই ফকীরকে শক্তিশালী মানুষ বলছিনে—বলছি অন্য কারণে। তাঁর এই যে শয়তান গুনাহ নসীব কিসমৎ ইত্যাদি সম্পর্কে বিশ্বাস—সে যত সস্তা পুরনো এবং অসারই হোক না কেন, অন্যের কাছে তাঁর কথায় তাঁর বিশ্বাসে তাই অনন্যসাধারণ হয়ে উঠত।

তর্ক করে তাঁর অন্ধবিশ্বাসকে কেটে ফেলা যেত বা যেত না জানিনে কারণ সে তর্ক আমি করিনি—তবে এটা বলতে পারি তাঁর বিশ্বাসকে তাঁর মন থেকে টলাবার শক্তি কারুরই ছিল না।

দিল্লীতে জুমা মসজিদের উত্তর-পূর্বদিকের ময়দানে সারমাদ নামে এক ফকীরের সমাধি আছে। মোল্লা মৌলবীদের জিন্দাপীর বাদশাহ ঔরংজেব তাঁকে কাজীদের বিচারমত মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। সারমাদের অপরাধ ছিল—তিনি উলঙ্গ থাকাকেই শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং নিজেও উলঙ্গ থাকতেন। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে সারমাদ এতটুকু ভীত বিচলিত হননি—তিনি জহ্লাদের কুড়ুলের নীচে পাথরের উপর মাথা রাখবার সময় রুবাই রচনা করে গেয়ে উঠেছিলেন—"আ—আজ আমার প্রিয়তম এলেন আমায় বুকে নিতে উদ্যত নগ্ন তরবারির বেশে।" আজও দলে দলে মানুষ তাঁর সমাধিস্থলে আসে—মাথা ঠেকিয়ে যায়; চেরাগ ধূপ-লাবান জেলে দিয়ে যায়।

মৃত্যুবরণ করেও সারমাদ উলঙ্গ থাকাই শ্রেষ্ঠ পন্থা একে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি কিন্তু জিন্দাপীর বাদশাহ ঔরংজীবের দণ্ড এই সত্যকে তাঁর জীবনে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারেনি।

এই ফকীরসাহেবের নিজের সত্য তেমনি সত্য। তা কোন তর্কে পরাজিত হবার নয়। কোন ব্যঙ্গে মিথ্যা হয়ে যাবে না। তাঁর সত্য—শয়তানের পা দুটো জন্তুর মত এবং সে দেহাতে বর্ষার দুর্যোগরাত্রির মত কাল যখন দেশে আকস্মিকভাবে আসে তখন সে ওই জন্তুর মত পা নিয়ে দুর্যোগে বিভ্রান্ত মানুষদের মধ্যে ফলাও কারবারের গদি খুলে বসে এবং বড়াভারী ওকীলদের মত ওকালতি করে ডাকে মানুষকে।

—বিলকুল সব ঝুট হ্যায় ধোঁকাবাজি হ্যায়—ধরম ঝুটা ইমান ঝুটা বেহেস্ত ঝুটা; খুদা ঝুটা। সাচ্চা হ্যায় জিন্দিগী। এই জিন্দিগীর জন্যে সুখ নিয়ে যাও।

আমি অবাক হয়ে শুনেছিলাম।

সেবার এই পর্যন্ত। সেদিন চলে এসেছিলাম—বেলা অনেকটা হয়ে গিয়েছিল। দিন তিনেক পর আবার একবার গিয়েছিলাম কিন্তু ফকীরসাহেবের দেখা আর পাইনি। আফজল আমাকে বলেছিল ফকীরসাহেব সেই দিন রাত্রেই চলে গেছেন।

সে বিস্ময়কর অবিশ্বাস্য কথা বলেছিল এরপর। বলেছিল—রাত তখন দশ ঘড়ি বাজছে—ফকীরসাহেব জপের মালা নিয়ে জপ করছিলেন, হঠাৎ জপ থামিয়ে চিৎকার করে উঠেছিলেন—নেহি নেহি নেহি—! নেহি হো সক্তা। আফজল—! আফজল!

আফজল ছুটে এসেছিল। ফকীরসাহেবও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। নিজের ঝোলাটা আর কম্বলখানা তুলে নিয়ে বলেছিলেন—আমি চললাম আফজল, আমি চললাম। শয়তানের কুত্তাটা লাশটা টেনে উপরে তুলছে। না না না। কভি নেহি হো সক্তা!

আফজল বলেছিল—রাত্রেই চলে গেলেন। মথুরা লাইনে—মথুরার টিকিট কিনে দিয়েছি আমি।

এরপর দেখা হল আর একটা আলোড়নের সময়।

সে আলোড়নের জাত আলাদা।

সমস্ত দেশ তখন চোখের জলে ভাসছে। সারা হিন্দুস্তান ভারতবর্ষ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। স্বাধীন ভারতবর্ষের আদিপর্বের উজ্জ্বলতম প্রাণময় পুরুষ জওহরলাল নেহেরু মারা গেছেন।

পার্লামেন্টের বিশেষ অধিবেশন বসবে বেলা এগারটায়। প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষের প্রাণময় পুরুষ বিবৃতি দেবেন চীন সীমান্ত সম্পর্কে। ইতিমধ্যে সীমান্তের দিকে নানা বিপর্যয় ঘটেছে—নানান অন্তর্ঘাতী হীন কর্মের ফলে ভারতবর্ষের অন্তর্দাহ এবং আত্মগ্লানির শেষ নেই; সেই সম্পর্কে প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে ঝড় উঠবে। অব্যবহিত পূর্বে এই মহিমময় পুরুষ হৃদ্‌পিণ্ডের ধমনী ছিন্ন হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। বুকের রক্ত নিভৃতে বুকের মধ্যে ঢেলে দিয়ে আত্মবলি দিলেন। এর ফলে আকস্মিক আঘাতে বেদনায় মুহ্যমানতায় দেশ মুহ্যমান হয়েছিল তা মানুষ ভোলেনি। সেই সময়।

পণ্ডিতজীর অন্ত্যেষ্টির পর।

দিল্লী থেকে রওনা হয়েছিলাম আর দিল্লী আসব না মনে করে। ফেরার পথে নেমেছিলাম প্রথম মথুরায় তারপর আগ্রায়। কয়েক দিন আগ্রায় থেকে মোটামুটি শেষবারের মত ভেবে ভাল করে দেখে নিচ্ছিলাম অঞ্চলটা। তাজমহল আগ্রা কেল্লা ইত্‌মাদউদ্দৌলা সেকেন্দ্রা ফতেপুর সিক্রী দেখছিলাম।

সেকেন্দ্রায় গিয়ে আবার দেখা হয়ে গেল ফকীরসাহেবের সঙ্গে।

এবারও সেই আফজল হল যোগসূত্র। না-হলে ওই একবারমাত্র দেখার স্মৃতিতে আমারও ফকীরসাহেবকে চিনতে পারার কথা নয়; তাঁরও নয়। আফজলই চিনলে আমাকে এবং ব্যগ্র এবং উৎসুক প্রীতিশ্রদ্ধার সঙ্গে বললে—দাদাবাবু?

আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। চিনতে দেরি হল। কারণ এবার সে দাড়ি রেখেছে। ফকীরদের মত একটা আলখাল্লা ঢঙের লম্বা পাঞ্জাবি বা জামা পরেছে। চিনতে দেরি হচ্ছিল দেখে সে নিজেই বললে—আমি নলহাটীর আফজল। সেই দিল্লীতে হজরত নিজাম-উদ্দিন আউলিয়া সাহেবের—

—আ—ফ—জল! মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠেছিলাম আমি।

—হ্যাঁ দাদাবাবু। আমি ফকীরসাহেবের চ্যালা হয়েছি। সেই—সেই ফকীরসাহেবকে মনে আছে তো? সেই আপনাকে বলেছিলেন শয়তানের করণের কথা মতলবের কথা!

এক কথাতেই মনে পড়ে গেল। বললাম—তাঁর শিষ্য হয়েছ তুমি?

—হ্যাঁ দাদাবাবু।

—আচ্ছা—! একটু হাসলাম আমি।

—দেখলেন তো কি ঘটালে?

—কি বলছ?

—শয়তান কি ঘটালে দেখলেন? নেহেরুজীকে জানটা দিতে হল! দেখলেন তো!

বেশ একটু বিস্ময় উদ্রিক্ত হল। সে বিস্ময় বোধ করি আমার দৃষ্টিতে খুব স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। আফজল তা অনুভব করেই বললে—গুরু মানে ফকীরসাহেব আমাকে বলেছিলেন।

—বলেছিলেন? কি বলেছিলেন? নেহেরুজী মারা যাবেন—বলেছিলেন তিনি?

—না। নেহেরুজী বলেন নাই। বলেছিলেন—আফজল আব তো বেটা বড়াভারী এক কুরবানি হোগা। কুরবানি হোগা তো হিন্দুস্তান বাঁচেগী—নেহি হোগা তো শয়তানকে রাজকে লিয়ে হামলা লড়াই শুরু হো যায়েগা! নেহেরুজীর ইন্তেকালের খবর হল রেডিয়োতে, ফকীরসাহেব বললেন—শয়তান হঠল আফজল। বড়াভারী কুরবানি রে!

ফকীরসাহেবের সেই গল্পগুলো মনে পড়ছিল। মানুষের সঙ্গে মিশে শয়তান ঘুরে বেড়ায়। মানুষের মনের বাসনা বুঝে পিঠে হাতের আঙুলের টিপের ইশারা দিয়ে ডাকে—এস—বল কি চাও? যা চাও তাই পাবে। বল!

খুব সতর্ক দৃষ্টিতে খুঁজলে দেখতে পাবে সুন্দর সুপুরুষ একজন মানুষ—চমৎকার সাজপোশাক কিন্তু পায়ের দিকটা জন্তুর মত। সেই—সেই জেনো সে।

আফজল বলে—আমি চোখে দেখলাম দাদাবাবু একটা কুকুর—ভয়ংকর কুকুর। এই কা—লো। এই বড়। মিশকালো রঙের মধ্যে দুটো চোখের মণি আগুনের মত জ্বলে। আর চোখ দুটোর বাইরে কালোর উপর সাদা রঙের গোল বেড়। কবর খুঁড়ে একটা মানুষের মাথা তুলে নিয়ে গেল। ফকীরসাহেব অনেক কষ্টে তার পিছনে পিছনে গিয়ে কেড়ে আনলেন সেটা। তখনই বললেন গুরু—আফজল, বেটা, বড়াভারী এক কুরবানি হোগা! বড় ভারী কুরবানি!

—হ্যাঁ বাবুজী। আফজল ঝুট বাত বলেনি। বলেছে সত্যি। একটা কুকুর একটা মানুষের মাথা কবর খুঁড়ে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি ছিনিয়ে এনেছি।

—বাবুজী, আফজল দেখেছে সে মাথাটা। মনে নিচ্ছিল কি তাজা কোতল করা গর্দানা—টপটপ করে খুন যেন ঝরছিল। আর দুটো চোখ নেই—চোখ দুটোকে কুঁরে তুলে নিয়েছে নাকটা কেটে নিয়েছে, কান দুটো তাও নেই। সব জায়গায় কাঁচা জখমী গদগদ করছে। আফজল ডরকে মারে চিৎকার করে উঠেছিল। উসকে বাদ বেহোঁশ হোকে গির গিয়া।

চোখ দুটো তাঁর বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল—স্থির নিষ্পলক বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ ফকীর বললেন—শোচকে দেখিয়ে কি করিব এক শ-ও আশী বরিষ পহেলে—

আন্দাজ একশো আশী বছর আগে এই মুণ্ডটাকে ধড় থেকে পৃথক করা হয়েছিল। জহন্নামের এক কোণে কাটেনি। দুর্দান্ত মানুষ—বিশালকায় জোয়ান—বৃষস্কন্ধ পুরুষ। শয়তানের সঙ্গে কারবার করেছিল। নিজের আত্মাকে বিক্রি করেছিল সে। শয়তানের জাদুতে আর জালিয়াতিতে, জানোয়ারের হিংসায় সারা হিন্দুস্তানের নসীবে আগুন ধরিয়ে

দিয়েছিল। বাদশাহীকে খতম করে দিয়েছিল সেই। বাদশাহ শাহ আলমের বুকে বসে চোখ দুটো ছুরি দিয়ে তুলে নিয়ে—তার হাতে পায়ে বেঁধে ফেলে রেখে দিয়েছিল দিল্লীর ধুপের মধ্যে লালকিল্লার খোলা ময়দানে। বাদশাহকে কেউ যেন পানি না দেয়—তার জন্যে সাজার ভয়ে খাড়া করেছিল তিনজন বাদশাহী নোকর আর দুজন পানিবরদারকে জখম করে ফেলে রেখে। বাবুজী, বাদশাহী হারেমের বালবাচ্চা জেনানী শাহজাদা শাহজাদী বেগম সব কোইকে উপোষ করিয়ে রেখেছিল—বাচ্চারা দুধ পায়নি, কেউ এক দানা খানা পায়নি। চার রোজের বাদ মরতে লাগল তারা। বাবুজী, দুজন বাদশাহী বেগম না খেয়ে শুকিয়ে মরে গেল, একুশজন শাহাজাদা শাহজাদী মরল। তাদের কবর পর্যন্ত দিতে দেয়নি। দিল্লীর ধুপে লাশ পচল।

শয়তান তাকে করালে।

শয়তানের কাছে নিজের আত্মাকে বিক্রি করেছিল সে। পরে তার মাসুল সে দিয়েছিল। কিন্তু মরবার সময় আমার গুরুর গুরুকে বলেছিল—হুজরত, এতটুকু মেহেরবানি আপনার কাছে চাইব আমি! আমার মুণ্ডুটা ধড় থেকে কেটে ফেলে দেবে—হয়তো বাদশার কাছে পাঠাবে। হুজরত, আমার এই মুণ্ডুটা আপনি নিজে হাতে কবর দেবেন। দেখবেন যেন কোনমতে আমার মুণ্ডুহীন দেহটার সঙ্গে এটাকে কেউ জুড়ে দিতে সুযোগ না পায়! আমি জানি হুজরত আমার মুণ্ডহীন দেহটা নিয়ে যাবে সে। শয়তান। নিজেকে আমি বেচেছিলাম হুজরত। তার মাসুল এই। মরেও নিষ্কৃতি নেই। সে আমার কাটামুণ্ড আর ধড় মিলিয়ে দেবার সুযোগ পেলে আমার নিস্তার থাকবে না। প্রেত হয়ে আমাকে শয়তানের সিপাহ-সালার হতে হবে। হিন্দুস্তানে যখনই খুন-খারাবী লড়াই দাঙ্গা হবে তখন শয়তান এসে আমার মুণ্ডু খুঁজে বেড়াবে।

পঁচাশী বছর বয়সের ধর্মান্ধতার সংস্কারে সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষটির কথায় বিশ্বাস করতে পারা কঠিন—কিন্তু আগেই বলেছি এই বৃদ্ধ ফকীর একজন কাহিনী বোলনেবালা বটে।

বৃদ্ধ বলেই চলছিলেন।—মিউটিনির সময়, আমার গুরুর আমল তখন। গুরুর গুরু দেহ রেখেছেন। মরবার সময় তাঁর শিষ্যকে বলে গিয়েছিলেন—ভার দিয়ে গিয়েছিলেন, শিষ্যকে। বলেছিলেন—হিন্দুস্তানে খুনখারাবী লড়াই দাঙ্গার সময় হুঁশিয়ার বেটা। তখনই সে আসবে এই মুণ্ডুর খোঁজে। ধড়টা সে নিয়ে গেছে।

হঠাৎ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে বলেছিলেন— কি, বিশ্বাস করতে পারছ না বাবুসাহেব? তা পারবে না। একালের আংরেজী জানা আধা-ফিরিঙ্গী তোমরা—বিশ্বাস করা কঠিন—কিন্তু খয়রুদ্দিন সাহেবের হকিকৎ ইতিহাস পড়ে দেখো। তাতে সে লিখে গিয়েছে। গোলাম কাদেরের মুণ্ডুহীন ধড়টার পায়ে বেঁধে বাদশাহী সড়কের পাশের একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়েছিল—পা দুটো ওপরের দিকে কাটা গর্দানটা নীচের দিকে—তার থেকে রক্ত ঝরছিল টপটপ করে। সিন্ধিয়ার হুকুমে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গোলাম কাদেরের গর্দান গেছে। লোকে হঠাৎ দেখলে একটা আশ্চর্য কুকুর এল কোথা থেকে। এই এত বড়। ঘন কালো রঙ—চোখের তারা দুটো যেন আগুনের আংরা আর সেই চোখের বেড়ে গোল সফেদ একটা দাগ। সে এসে বসল ওই মুর্দা যেখানে ঝুলছিল ঠিক তারই নীচে। টপটপ করে রক্ত পড়ছিল আর কুকুরটা তার লম্বা লকলকে জিভ বার করে সেই রক্তের ফোঁটাগুলি ধরে ধরে নিয়ে খাচ্ছিল। সে মুর্দাকে আর নামানো যায়নি বাবুজী। খয়রুদ্দিন সাহেবের কিতাব তুমি দেখো—তাতে লেখা আছে বাদশাহ সিন্ধিয়াকে হুকুম পাঠিয়েছিল—গোলাম কাদেরের ধড় পাঠাও। কিন্তু ওই কুত্তার ভয়ে কেউ কাছে যেতে সাহস করেনি। শেষে ওই কুত্তা লাফ দিয়ে উঠে ওই লাশের দড়ি দাঁতে কেটে নীচে ফেলে

মুখে করে তুলে নিয়ে কোথায় চলে গেল কেউ জানে না। বাবুজী, সে ধড়কে শয়তান এখনও রেখে দিয়েছে—এমনি যখন ডামাডোলের বাজার হয়—যখন দাঙ্গা বাধে লড়াই বাধে মুলুকে তখন সে খোঁজে ওই মুণ্ডুটা। ওটাকে এনে জুড়ে দিলেই গোলাম কাদের প্রেত হয়ে উঠবে। সর্বনাশ হয়ে যাবে সাহেব। গোলাম কাদের অনেক দুঃখে পড়ে বেচেছিল তার আত্মাকে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা অধ্যায়ের কথা মনে পড়ে গেল। বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীরের মৃত্যুর পর—পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর বিপর্যস্ত হিন্দুস্তান। আফগানিস্তানে আমেদশাহ আবদালী মারা গেছে—পাঞ্জাব টুকরো টুকরো হয়েছে—দক্ষিণে মারাঠারা আবার মাথা চাড়া দিচ্ছে—ওদিকে ভরতপুরে জাঠদের পালায় খানিকটা ছেদ পড়েছে—জবাহির সিং জাঠ খুন হয়েছে, গাজিউদ্দিন উজীর হার মেনে দিল্লীর এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা রোহিলা পাঠান মেয়ের হাতের ছুরি খেয়ে শেষে সারা দেহে পচ ধরে তিলে তিলে মরেছে।

বাংলা মুলুকে পলাশীতে সিরাজউদ্দৌলা নবাব হেরেছে; মীরজাফরের শয়তানের মত বেটা মীরন তাকে খুন করিয়েছে; তারপর মীরন নিজে বজ্রাঘাতে মরেছে; মীরজাফরেরও নবাবী গেছে; মীরজাফরের পর মীরকাসেম আলি খাঁও তার নবাবীর পালা শেষ করেছে। দিল্লীর জুমা মসজেদের সিঁড়িতে খুন হয়েছে ছুরি খেয়ে। ফিরিঙ্গী কোম্পানি দেওয়ানী নিয়েছে বাংলার।

গোটা হিন্দুস্তান তখন ছিঁড়ে টুকরা টুকরা হয়ে গেছে।

ফকীরসাহেব বললেন সেদিন—সবকুছ ওহি শয়তানকে মতলবসে হুয়া বাবুজী। বিলকুল—।

রোহিলা পাঠান—এই এতবড় পাথরের মত ছাতি—একটা শালগাছের গুঁড়ির মত শক্ত মানুষ—শেরের মত আদমী ছিল খান-ই-খানান নবাব নাজিবউদ্দৌলা। দিল্লীর বাদশাহের সিপাহসালার। তার ছেলে নবাব জবিতা খান। তার ছেলে গোলাম কাদের।

বাবুসাহেব, সেই ডামাডোলের বাজারে এই গোলাম কাদের বেচেছিল তার আত্মাকে।

॥ তিন ॥

বাবুজী, 'বামনউলী' নামে একটি গাঁও আছে। দিল্লী শহরের উত্তর-পূর্ব দিকে। সেই গ্রামে নট ব্রাহ্মণের একটা পাড়া ছিল।

নট ব্রাহ্মণ জান বাবুজী? নট ব্রাহ্মণদের পুরানো কালে ধর্ম কি ছিল পেশা কি ছিল তা জানি না—তবে সেই মুঘল আমল থেকে এই সেদিন পর্যন্ত গানা-বাজানা-নাচনা নিয়ে থাকত। সাধারণ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে চলত্ এদের ছিল না, তারা তাদের শুধু নট বলত, 'গন্ধর্বী'ও বলত। এদের ধরম-করম সবই ছিল এই গান। বড় বড় উস্তাদ এদের বংশে জন্মেছে। বড় বড় বাঈ জন্মেছে এদের বংশে। এরা জন্মায় গলায় গানের সুর নিয়ে আর মগজে গান-বাজনার জ্ঞান নিয়ে আর অন্তরে গানবাজনার জন্যে এক আকুল তৃষ্ণা নিয়ে।

মাণ্ডুর বাজবাহাদুর পাঠান সুলতানের পিয়ারী রুপমতীর নাম শুনেছ বাবুজী—সে গানবাজনায় সিদ্ধ বাঈ ছিল—সে দীপক গাইলে আগুন জ্বলত মল্লার গাইলে বর্ষা নামত; সে বাঈ বাজ-বাহাদুরকে এমন ভালবেসেছিল যে তার মৃত্যুর পর মুঘল আমীর তাকে যখন তার পিয়ারী হতে তাজাম পাঠালে—হরেক কিসমের দৌলত পাঠালে—হীরামতি পান্না

সোনে রূপা, তখন রূপমতী বাঈ জওহরের 'শরবত পিয়ে' শুয়ে আছে—চোখের পাতা জুড়ে আসছে। সে সময়েও এই খেলাত দেখে তার মুখ বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, বলেছিল—'হঠাও—পায়ের কি পয়জার মারকে হঠাও।'

শাহবুলন্দ ইকবাল শাহজাদা দারা শিকোর নাম তো নিশ্চয় জান বাবুজী। শাহজাদা দারা শিকো এমনি এক গন্ধর্বীর বেটীকে শুধু ভালই বাসেননি সাদী করেছিলেন—তার নাম ছিল 'রানাদিল'। দিল্লীর চাঁদনী চওকের পাশে বাঈমহল্লার এক ছোটিসে গলিতে থাকত; তার ভাই ঢোলক বাজাত—তার মা সঙ্গে থাকত আর সে গান গেয়ে পথে নাচত। গান শেষ করে লোকের কাছে সালামত জানিয়ে তার ওড়নার আঁচল মেলে ধরত—"মেহেরবানি হো যায় আমীর!"

শাহজাদা দারা শিকো তার রূপ দেখে তার গান শুনে দেওয়ানা হয়ে গেলেন। রানাদিলের খোঁজে পাঠালেন তাঁর বিশ্বাসী আদমীকে। নোকর সে—তলবানা সে নেয় কিন্তু শাহজাদাকে সে মনিব ভাবে না, ভাবে আরও কিছু—ভাবে ফেরিস্তা, ভাবে দেবদূত—দেবতার অংশ।—নিয়ে এস ওই রানাদিলকে—আমি এক রাত্রির জন্য তাকে ওজন করে আশরফি দেব।

রানাদিল গন্ধর্বীর মেয়ে। সে বলেছিল—আমি নাচি গান করি—পথের উপর নাচি—মানুষের পায়ের ধুলো আমার গায়ে লাগে—দৃষ্টি দিয়ে তারা আমাকে ভোগ করে তবু আমি ভোগ্যা নই। আমি ভোগ্যা তারই যে আমাকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দেবে। আমি পরস্তার হব না বাঁদী হব না—আমি হতে হলে রানী হব নয় বেগম হব—কোন গৃহস্থের ঘরের বহুজী হব কোন মুসলমানের ঘরের বিবি হব কিন্তু সোনা রুপোর জন্যে নিজেকে বিক্রি করব না।

রানাদিলকে শাহজাদা দারা শিকো শেষ পর্যন্ত সাদী করেছিলেন। বিয়েতে বাদশাহ্ সাজাহানের হুকুম করাবার জন্যে শাহজাদা খানাপিনা বন্ধ করে মরব বলে সংকল্প করেছিলেন। বাদশাহ্ এক পথের নাচনেবালীকে শাহবুলন্দ ইকবাল শাহজাদার বেগমের অধিকার দিতে চাননি। কিন্তু গন্ধর্বী ব্রাহ্মণের মেয়ে টলেনি। শেষ পর্যন্ত হুকুম দিতে হয়েছিল বাদশাহকে।

গন্ধর্বী নাচনেবালী এই রানাদিল তার দাম দিয়েছিল। নিজের নাম রেখেছিল। বাবুজী ঔরংজীব বাদশাকে গোঁড়া মোল্লা মৌলবীরা বলে জিন্দাপীর; আমীর ওমরাহরা বলত পাথরের কলিজাবালা মানুষ—সে দারা শিকোকে জহ্লাদের হাতে দিয়েছিল—সে তার মুণ্ডুটা এনে 'সোনেকা থালিকে পর' রেখে সামনে রেখে দিয়েছিল। সে কাটামুণ্ডু দেখে ঔরংজীব একবার চোখ বন্ধ করে নি। শুধু পরখ করে দেখেছিল কাটামুণ্ডু কথা বলে কি না! সেই ঔরংজীব চেয়েছিল রানাদিলকে—বড়ভাইয়ের বেওয়াকে। ফিরিঙ্গী মেয়ে উদিপুরী বাঈ ঔরংজীবের পরস্তার হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে এক ডাকে। লেকিন রানাদিল না। সে বললে—কেন, আমাকে নিয়ে কি করবে নতুন বাদশা! বাদশা বলে পাঠালে—পিয়ার করব। তোমাকে ভারী ভাল লাগে। রানাদিল বলে পাঠালে—কি ভাল লাগে আমার? বাদশা বলে পাঠালে—তোমার ওই কাল রেশমের মত চুল। এমন চুল আমি দেখিনি। এ কথার উত্তরে রানাদিল তার সেই অপরূপ চুলের রাশি কেটে বাদশাহকে পাঠিয়ে দিয়ে বলে পাঠালে এই চুল বাদশাহকে নজরানা পাঠালাম। বাদশাহ এবার বললে—শুধু কি চুল? ওই অপরূপ রূপ? শুনে রানাদিল ধারালো ছুরি দিয়ে মুখখানাকে ক্ষতবিক্ষত করে একখানা মসলিনে সেই ক্ষতের রক্ত মাখিয়ে পাঠিয়ে দিলে। বলে পাঠালে—এই রক্তের সঙ্গে আমার সব সৌন্দর্যকে বের করে দিয়েছি—আমার মুখ ক্ষতবিক্ষত—বাদশাহ দয়া করে আমার খুব-সুরতির জৌলুসের কথা ভুলে যান। বাদশাহ ঔরংজীব হার মেনেছিল এই গন্ধর্বীর

বেটীর কাছে।

বাবুজী, এদের ভালবাসা বারণ। মহব্বতিতে এদের অধিকার নেই। নিয়ম হল বাবুজী, এরা কুমারী থেকে গান-বাজনা করবে নাচবে ; দুনিয়ার মানুষের দিল এরা নেবে কিন্তু নিজের দিল কাউকে দেবে না। সেই সঙ্গে দেবে না নিজের জওয়ানী। নিজের দেহ। কিন্তু তা হয় না বাবুজী—এদের দেহের জন্যে পুরুষমহলে কাড়াকাড়ি পড়ে। শয়তান এসে চুপিচুপি শল্লা দেয়—বেচো। সোনা রুপো জওহরত নাও—নিয়ে বেচো। রুপেয়া লেও রূপ বেচো—দৌলত লেকে দেহ বেচো। কিন্তু নিজেকে বেচো না। এই কারবারের আড়ালে লুকিয়ে থাকে সে—সেই শয়তান! বামুনউলীর নট ব্রাহ্মণ পাড়ার আনাচেকানাচে গলিঘুঁচির মধ্যে বাসা ছিল এই জানবারের পায়ের মত পাওয়ালা কারবারীর ; একটি গোপন আস্তানা ছিল বাবুজী। সেই গোপন গদিতে এই কারবারের শুরু হল।

তখন বামুনউলীতে এই গন্ধর্বীদের বাড়িতে এক অপরূপ সুরতবালী বেটী ছিল ; সবে সে তখন কিশোরী। জওয়ানী তখনও তার পুরা হয়নি। জওয়ানী তখন তার সর্বাঙ্গে সবে সাড়া দিতে শুরু করেছে। তাকে তার মা তালিম দিচ্ছে গানে বাজনায় নাচে। এই মহল্লার গুরু ছিলেন এক ফকীর। গানবাজনায় এরা ছিল এই ফকীরের ঘরওয়ানা। গজল থেকে ভজন সব তিনি শেখাতেন। বড় বড় তাল মান সেও ছিল তাঁর বিশেষ ঢঙের। ফকীর পাঁচবক্ত নামাজ পড়তেন আবার ভজন গেয়ে মীরাকে প্রভু গিরিধারী নাগরকেও বন্দনা করতেন। গ্রামের শুদ্ধ ব্রাহ্মণরাও ফকীরকে খাতির করতেন, কোন ঝগড়া ছিল না। শিউজীর মন্দিরের বাইরে দাওয়ায় বসে ফকীরসাহেব গান করতেন আর ওই পুরোহিতজী সঙ্গত করতেন ; বেবাক গাঁওয়ের লোক বসে শুনত সারারাত।

বাবুজী, এই ফকীর আমার গুরুর গুরু। খুদাতায়লার ধ্যানে জপে মশগুল মানুষ—পয়গম্বর রসুলের খাদিম, তবু মোল্লা মৌলভীরা তাঁকে বলত ভ্রষ্ট ফকীর। শাহানশাহ জালালুদ্দিন আকবরশাহকে যারা বলত দজ্জাল এরা তারাই—এরা এই ফকীরসাহেবকে বলত ভ্রষ্ট।

তা বলুক বাবুজী, আমার গুরুর গুরু এই ফকীরসাহেব যখন গালে বাঁ হাত রেখে ডান হাত আকাশের দিকে তুলে 'খোদা মেহেরবান' বলে তান ছাড়তেন তখন সে তান নিশ্চয় গিয়ে পোঁছুত খুদার দরবারে। মীরার ভজনও যখন তিনি গাইতেন—যখন 'প্রভুজী' বলে সুরে তিনি ভজন ধরে ডাকতেন তখন পথলের প্রভুজীর মুখও যেন ঝকমক করে উঠত। রহিমশাহ ছিলেন সিদ্ধ ফকীর—তামাম লোকে তাঁকে বলত মুনিসউল-আরওয়া (আত্মার সান্ত্বনাদাতা)—এই গন্ধর্বীদের আর মুসলমান বাঈদের তিনি পীর ছিলেন। হিন্দুস্তানের বাঈ আর গন্ধর্বীদের বড় বড় যারা তারা সবাই ছিল তাঁর 'মুরিদা'।

বাবুজী, এই লেড়কী এই কিশোরী শক্করবাঈ গুলবদনী সেও তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিল। ধর্মেও বটে সংগীত-শাস্ত্রেও বটে। তার মায়ের নাম ছিল চন্দ্রমুখী। সেও ছিল খুব কলাকী মেয়ে। একজনকে ভজেই তার জীবন। গুরু রহিমশাহের ভরসা ছিল এই মায়াবতীর গানে একদিন খুদাতায়লার দয়া নিয়ে ফিরিস্তাকে আসতে হবে। পয়গম্বর রসুল মহম্মদ আশীর্বাদ করবেন।

এই চৌদ্দবছরের মেয়েটির ডাকনাম ছিল 'শক্কর'। মানে বোঝে তো বাবুজী? বাংগালীরা তোমরা 'চিনি' বল। মানে মেয়েটা আগাগোড়া মিঠা। তার মধ্যে ওই মিঠারস ছাড়া কিছু নেই। আর ভাল নাম 'গুলবদনী'। এ নিশ্চয় বোঝো। গোলাপবদনী! হাঁ বাবুজী গুলাবের মতই ছিল সে। তেমনি রঙ তেমনি নরম। গুরু বলতেন মায়াবতী।

॥ চার ॥

এগারশো পঁচাশী হিজরার পর। হয়তো দু এক বছর পর হতে পারে। বাবুজী, বাদশাহ শাহ আলমের ফৌজ তখন বাদশাহী হুকুমের অপেক্ষায় বসে আছে—মির্জা নজফ আলি বাদশাহী হুকুমৎ পেলেই রোহিলখন্ড আক্রমণের জন্য রওনা হবে।

রোহিলখণ্ডে নবাব জবিতা খাঁ—রোহিলা নবাব—খান-ই-খানান নাজিবউদ্দৌলার পুত্র এবং সারা রোহিলখণ্ডের রোহিলা পাঠান আমীর এবং নবাবদের মধ্যে প্রধান—তার বিরুদ্ধে হবে অভিযান।

বাদশাহ শাহ আলম প্রাণপণে নিজেকে দমন করে রেখেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি দেখবেন। অনেক দেখেছেন তিনি—আরও একবার দেখবেন। না দেখে তাঁর উপায় নেই। বাদশাহ জানেন তাঁর বাদশাহীর শক্তি কত। হয় রোহিলা নয় মারাঠা নয় অযোধ্যার নবাব নয় জাঠ —এই চার যষ্টির কোন একটা যষ্টি ছাড়া দিল্লীর বাদশাহীর সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই।

পানিপথে আফগান বাদশাহ আবদালী সারা দেশের বুকে আগুন জ্বালিয়ে ছাই করে দিয়ে গেছে—লুঠ করে ফকীর করে দিয়ে গেছে—খুন করে সারা দেশের মাটি রাঙা করে দিয়ে গেছে। দিল্লীর বাদশাহের উজীরি দাবি করে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা লক্ষ্ণৌয়ে নবাবী করছে।

নিজেকে দিল্লীর বাদশাহের মীরবক্সী সিপাহসালার বলে ঘোষণা করে নবাব নাজিবউ-দ্দৌলার ছেলে এই জবিতা খাঁ রোহিলখণ্ডে নাজিবাবাদ ঘাউসগড়, পাত্থলগড়, জেলা সাহারানপুর, জেলা জালালাবাদ থানা ভাওয়ান লুহারী নিয়ে সমস্ত মুল্লুকটা দখল করে বসে আছে। আবদালী যখন দিল্লীতে এসে দিল্লী মথুরা জাঠদের বল্লভগড় পর্যন্ত তামাম এলাকা লুঠ করে নিয়ে যায় তখন নাজিবউদ্দৌলা সে লুঠে ভাগ বসিয়ে সম্পদ জমা করেছে তার তিনচার গড়ের মধ্যে। গড় নাজিবাবাদ ঘাউসগড় পাত্থলগড়ের এলাকায় সে চেপে বসে তার এলাকাকে আলিগড় মীরাট পর্যন্ত বিস্তৃত করে রেখেছে।

শুধু দেশ লুঠ করা সম্পদ নয়, এই দিল্লীর বাদশাহী মহল লুঠ করা দৌলত নিয়ে সে তার দরবার সাজিয়েছে। বাদশাহের মনে পড়ে আহমদশাহ আবদালী তাঁকে শাহজাদা হিসেবে পাঠিয়েছিলেন সুবাদারদের কাছে বাকী খাজনা আদায়ের জন্য। তিনি অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে বাংলা মুলুকের জন্য লড়তে গিয়ে বক্সারে ফিরিঙ্গীর কাছে হেরেও শেষ পর্যন্ত বহু কষ্টে ইজ্জত রক্ষা করেছিলেন। দশ বৎসর দিল্লী ফিরতে পারেননি। পারেননি এই জবিতা খানের জন্য।

শেষ পর্যন্ত বহু কষ্টে দিল্লী ফিরেছেন ফিরিঙ্গী আর বর্গীদের সাহায্য নিয়ে। জবিতা খাঁ পালিয়েছে। কিন্তু আজও পর্যন্ত সে তার বাপের মৃত্যুর দরুন খারিজান নজরানা দেয়নি খাজানা দেয়নি। একবার একটা সুলেনামা করে সে নিয়েছিল; তারই শর্ত অনুযায়ী তার ছেলে গোলাম কাদেরকে জিম্মা রেখেছে সে বাদশাহের দরবারে। তবু সে তার শর্ত পালন করেনি। খাজনা দেয়নি। নজরানা দেয়নি।

এবার উজীরের স্থলাভিষিক্ত আবদুল ওহাদ তার ভাই আবদুল কাসিমকে পাঠিয়েছিল ফৌজ সঙ্গে দিয়ে বাদশাহী খাস তালুক যা নাজিবউদ্দৌলার সময় থেকে ভোগ করে আসছে ভাই জবিতা খাঁর হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্য। কিন্তু জবিতা খাঁ জিতেছে, আবদুল কাসিম লড়াইয়ে হেরেছে মরেছে। তার দেহ নিয়ে এসেছে বাদশাহী সিপাহীরা। কবর হয়ে গেছে। আবদুল ওহাদ লোক পাঠিয়েছে শেষবার জবিতা খাঁয়ের কাছে। শেষ সুযোগ

দেওয়া হয়েছে জীবিত থাকে। তোমার ছেলে আছে এখানে জিম্মাদারিতে। হুঁশিয়ার!

গোটা মুল্লুকটার হাওয়া থমথমে হয়ে উঠেছে। ঝড় উঠবে উঠবে মনে হচ্ছে।

তবে ঝড় আর নেই কখন, নেই কবে? সেই নাদিরশাহের পর থেকে একাল পর্যন্ত আজ কমপক্ষে পুরো চালিশ বরিষ চলেছে একটানা একটা কাল যার মধ্যে ঝড় ছাড়া দিন নেই। যুদ্ধ নেই লুঠতরাজ নেই খুনখারাবী কবে নেই? বলো কবে নেই?

বামনউলীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গন্ধর্বপাড়ার কুঁইয়া; অনেক কালের পুরানো কুঁইয়া। বামনউলীর এক নটী মেয়ে ছিল অমৃত কুমারী; সে সেই ফরুকশের বাদশাহের সময় সৈয়দ ভাইয়াদের আমল; ঠিক জাহান্দারশাহী আর লালকুয়রের আমলের পর। অমৃতকুমারী দিল্লীতে গিয়েছিল এই বামনউলীর এই পাড়া থেকেই। আর দশ বছর মাত্র বেঁচে ছিল—তার মধ্যে রোজগার করেছিল রাজার ঐশ্বর্য। নবাবের দৌলত। তখন দেশে অঢেল দৌলত। নাদিরশাহ তখনও সোনা রুপা হীরা জহরতে শ'য়ে শ'য়ে অনেক শ' ও ক্রোড় টাকা লুটে নিয়ে যায়নি; আহমদশাহ আবদালী চার চার বার লুট করে আরও শও শও ক্রোড় নিয়ে যায়নি। তখনও দৌলতওয়ালা মানুষেরা লুটের ভয়ে মাটির তলায় কুয়োর মতন গভীর গুপ্ত ধনাগার বানিয়ে তার মধ্যে রেখে পাথর চাপা দেয়নি। জাঠ গুজর ডাকাতেরা তখন শের না-থাকা জঙ্গলের বেপরওয়া নেকড়ের দলের মত ছুটে ছুটে বেড়াতো না।

অমৃতকুমারী লাখো লাখো টাকা রোজগার করে গাঁয়ে কীর্তি করেছিল; এই কুয়ো প্রতিষ্ঠা করেছিল এই পাড়ায়; আরও দুটো কুয়ো করেছিল আর দুই পাড়ায়—একটা শুদ্ধ ব্রাহ্মণপাড়ায় আর একটা আর সব জাতের জন্যে। আর ওই যে কুয়োর সামনে শিউজীকে মন্দির—পাথরের মন্দির, ও মন্দিরও করে দিয়েছিল অমৃত কুমারী। শিউজীর নামই হয়ে গেছে 'অমৃতেশ্বর'।

অমৃতকুমারী জমি কিনে দিয়ে গেছে শিউজীর সেবা পুজার জন্যে; ওপাড়া থেকে পুরোহিত ব্রাহ্মণ মহারাজ রোজ ভোরবেলা আস্নান করে তিলক কেটে বেলপাতা আর ফুল, আতপচাল আর গঙ্গাবারি নিয়ে এসে বম-বম ধ্বনি তুলে মন্ত্র পড়ে গাল বাজিয়ে পুজা করে যান। গন্ধর্বীপাড়ার যারা বুড়া হয়েছে বুড়ী হয়েছে তাদেরও দু চারজন এসে ঘরে ঢুকে দু চারটে বেলপাতা চাপিয়ে যায়। বাকীরা সব প্রণাম করে।

গন্ধর্বী মেয়েদের মধ্যে যারা পুণ্যবতী যারা ভাগ্যবতী যারা জন্মান্তরের পুণ্য নিয়েই জন্মায়, তাদেরই এমন সৌভাগ্য হয়। তারাই গন্ধর্ববিদ্যা—নাচ গানবাজনা—তার দৌলতে রোজগার করে মন্দির গড়ে ভগবানকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করে যায়, আপনজন মানুষদের কল্যাণে কুয়া প্রতিষ্ঠা করে জলদান করে। পথের ধারে মাঠের মধ্যে গাছ প্রতিষ্ঠা করে ছায়াদান করে। অমৃতকুমারীর বহুৎ পুণ্য। বহুৎ নাম।

গুলবদনীর সম্পর্কেও সেই আশাই করে গন্ধর্বীপাড়ার লোক। ব্রাহ্মণপাড়ার পুরোহিত মহারাজ বলেন—দেবীর মত ললাট! মসৃণ, টাটকা ফোটা গোলাপের পাঁপড়ির মত। সেদিন বেশ ভাল করে দেখে বৃদ্ধ পুরোহিত বলেছিলেন—শঙ্কর, তোর ওই দুর্লভ দেহের বাগিচায় এবার যে বসন্তবাহারের ধরতাই এল রে! শীসাতে নিজের মুখখানা দেখিস?

শঙ্কর মুচকে মুচকে হেসেছিল।

মহারাজ বলেছিলেন—দেখ্ শিউজীর পায়ের তলায় আস্নান করে একটা ত্রিপত্র ফেলে দিস নমঃ শিবায় বলে। হাঁ! বলিস ভগবান দেখো তোমার কপালের আগুন যেন ধ্বক করে জ্বলে না ওঠে। আঁ?

মনে মনে মহারাজ আরও কিছুটা বলেছিলেন—বলেছিলেন যেন তোর দেহের এই বসন্ত-

বাহারকে সে আগুনে পুড়িয়ে ছাই না করে দেয়।

থাক বাবুজী! সেদিন বামনউলীর গন্ধর্বীপাড়ার ওই শিবমন্দিরের সামনে কুয়োতলায় জল নেবার জন্যে এসেছিল যত যুবতী মেয়েরা। পরনে নানান রঙের ঘাঘরা আর চুস্ত পাজামা তার উপর ওড়না; একহাত করে রুপার সে আমলের মোটা মোটা ঢঙের গহনা, গলায় হাঁসুলী আর কণ্ঠী, নাকে বেসর নথ, পায়ে এক এক গোছা সরু মোটা মল। মাথায় কাপড়ের বিঁড়ের উপর কলসী। কেউ চাপিয়েছে ভর্তি করে; কেউ খালি কলসী নামিয়ে ভর্তি করে নেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। যারা চলে যাচ্ছে তারা গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে। যারা দাঁড়িয়ে আছে প্রতীক্ষা করে তারা গল্প করছে; গল্প একটাই নয়, দুজনে মিলে এক একটা গল্প এবং আলোচনা।

আলোচনা করছিল বুড়ীরা বয়স্করা—বামুনপাড়ার পাণ্ডেজী ফিরেছে কাল মীরাট থেকে। বাদশাহী ফৌজ তৈয়ার। তারা ঘাউসগড় পাত্থলগড়ের উপর হামলা করবে—ভারী ভারী তোপ নিয়ে আসছে বাদশাহের মীরবক্সী মিরজা নজফ। আগ্রার দিক থেকে আসছে সিন্ধিয়ার বর্গী সওয়ারের দল। দরকার হলে তোপ দেগে উড়িয়ে দেবে ঘাউসগড়। মজলিস বসেছে—বর্গী সওয়ারদের জুলুম থেকে বাঁচব কি করে? রোহিলাদের উপর তাদের ভারী রাগ।

হাঁ হাঁ। পানিপথের লড়াইয়ের সময় ভাওসাহেবের তাঁবু লুঠ করে তাদের জেনানাদের এনে কলমা পড়িয়েছে। তারা তো বেঁচে আছে।

—তা নিয়ে আমাদের কি? আমরা রোহিলা পাঠানও নই—আমরা কোন জন্মে পল্টনে কাজ করিনি। আমরা নটী গন্ধর্বী।—তাছাড়া ভাওসাহেবের তাঁবু লুটে জেনানী লুটেছে সে কমসে কম বারো বরিষ; পুরা যুগ হয়ে গেছে। এর মধ্যে কবার যে নাজিবউদ্দৌলা আর জবিতা খাঁয়ের সঙ্গে হাত মেলাতে হয়েছে তার ঠিক আছে? দূর দূর।

—তবে তুমি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও!

—তা ছাড়া কি? আর হয়ই যদি, করব কি? আজ দাঙ্গা কাল লড়াই—পরশু ফিন লড়াই—তারপরদিন বাদ দিয়ে ফের আবার। মানুষ মরেও শেষ হয় না, মানুষ মারাও ছাড়তে পারে না মানুষ। বেশ তো মারুক। মরব। তা নিয়ে ডর করব কত?

—তবে তুমি নাচো।

—নাচবই তো। আন না ঘুঙুর আন, নেচে দেখিয়ে দি! বলে সে বুড়ী সত্যিই গান ধরে দিল—মরতেই যদি হয় লো সখী তবে পেট ভরে পকৌড়ি খেয়ে নি আয়। আর সারা রাত জেগে আমার জোয়ানের বুকখানা আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকি। কেউ তোরা ডাকিসনে। কেউ তোরা বকিসনে। বলিসনে আমি বেশরমী! বলিস তো বলগে যা—আমি তাই আমি বেশরমী। আমার জোওয়ান—তুমি ঢোলক বাজাও আমি নাচি ঝমর ঝমর করে। ভাল না লাগে তো এই ঘাসের উপরেই তুমি শুয়ে পড়ো আমি তোমার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি বিলের জলের বুকে হাঁসের মত।

সমস্ত দলটিই সরস কৌতুকে কিছুটা উচ্ছল হয়ে উঠল। গায়িকা প্রৌঢ়া একসময় নটীগিরি করে এসেছে, মীরাট শহরে ছিল সে, একবার সে বৃন্দাবন গিয়েছিল জাঠরাজা রতন সিংয়ের নিমন্ত্রণে—সেখানে ব্রজমণ্ডলের রাজা সেজে রতন সিং চার হাজার নটী নাচবলী নিয়ে রাসমণ্ডল করেছিল। সে পোশাক পেয়েছিল, ঝুটা মতির মালা পেয়েছিল, তা ছাড়া

চাঁদির টাকা সিক্কা দু মুঠো পেয়েছিল দু হাতে—তাতে পঞ্চাশ টাকার উপর হয়েছিল।

হঠাৎ একজন বলে উঠল—দেখ দেখ! ধুলো উড়ছে দেখ!

সকলেই চকিত হয়ে ফিরে তাকাল—ঘোড়সওয়ার! ধুলোর ঝড় উড়িয়ে আসছে! দেখেছ?

—হ্যাঁ। বহুৎ জোর ছুটেছে ঘোড়াটা। আরে বাপরে—!

—এমন করে কেন ছুটছে বল তো? এত জোরে?

—নওজোয়ান। মরণের পরওয়া নাই। ছুটেই আরাম।

এক বুড়ী কিন্তু বললে—নেহি।

—নেহি? তো কিস লিয়ে—কহো?

—জান বাচানে কো লিয়ে। মরণে নেহি মাংতা!

—কিন্তু কি হল বল তো?

—কি হল?

—কই ধুলোর ঝড় ওড়ানো সওয়ার কই?

—ওই তো ঘোড়া—

—হ্যাঁ। ঘোড়া তো বটে। খিন্তু সওয়ার কই?—

একটা সওয়ারহীন ঘোড়া দুরন্তবেগে ছার্তক চালে ধুলো উড়িয়ে চলে আসছে—এই আসছে—এই আসছে। কিন্তু সওয়ার কই?

—সওয়ার পড়ে গেছে—হয়তো মরে গেছে।

—ওই দেখ আবার ধুলো—ওই দেখ এবার ধুলো কত! ও হোঃ। এ যে অনেক।

—এক দল সওয়ার।

—পল্টন। চল্ চল্ ঘর চল্।

ছুটল মেয়েরা ঘরের পানে। ছুটে এসে গ্রামে ঢুকে কলরব তুললে। পুরুষেরা কয়েকজন এসে গ্রামের বাইরে দাঁড়াল। তাদের পিছনে পুরুষেরা এদিকে ওদিকে লুকিয়ে রইল। মেয়েরা গ্রামের উল্টো দিকে পথ থেকে দূরে সরে গিয়ে আখের খেতির মধ্যে লুকিয়ে রইল। গঁহুর সময় ক্ষেতভরা গঁহুর মধ্যে লুকোনো বিপদ। সরষের ক্ষেত তা থেকে ভাল। সরষের মুল্লুক। দেখতে দেখতে গ্রামটাকে গ্রামটা যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রায় এক ঘড়ি বাদ নাকাড়া বাজল। বিপদ কেটে গেছে। মেয়েরা ফসলভরা ক্ষেত থেকে বেরিয়ে এল।

—কি খবর?

—বাদশাহী ফৌজ খুঁজে বেড়াচ্ছে রোহিলা নবাব জবিতা খাঁয়ের বেটাকে; গোলাম কাদের তার নাম, ষোলা বরিষ এমনি উমর; সে বাদশাহের কাছে নবাবের তরফ থেকে জিম্বা হয়ে ছিল। জবিতা খাঁয়ের সঙ্গে লড়াই বাধে বাধে। গোলাম কাদের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে পালিয়ে এসেছে বাদশাহী ছাউনি থেকে।

আ!

তাহলে ওই ঘোড়াটা সেই গোলাম কাদেরের! কিন্তু সে কোথায় গেল?

—তাকে খুঁজছে। তাই পিছনে চলে গেল বাদশাহী সিপাহীরা।

—খুঁজলেই পাবে। কোথাও হাত পা ভেঙে জখম হয়ে পড়ে আছে!

—হয়তো মরেই গেছে!

—কিন্তু তোর হল কি শঙ্কর?

কিশোরী শঙ্কর যেন কেমন হয়ে গেছে। গোলাপের মত রঙ তার যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। দৃষ্টিতে যেন কি ফুটে উঠেছে।

শঙ্কর একখানা ঘন-ফসল-ভরা ক্ষেতের মধ্যে লুকিয়েছিল। বাইরে আগন্তুক সওয়ারদের হল্লা যত বেড়েছিল ততই একদল মেয়ে ভয়ে ফসলের নীচে হামাগুড়ি দিয়ে সরে যেতে চেষ্টা করেছিল কোন একটি নিরাপদ গভীরে খুব গোপনতার মধ্যে।

বাবুজী, তখনকার দিনে ঔরতের কাছে সিপাহী মানেই বেইজ্জতি; তবে সে আমলে ঔরৎরা এ জুলুমবাজি সহ্য করেছে কিন্তু হার মানেনি। বাবুজী আমেদশা আবদালী যখন আসে সেই আমলে পাঞ্জাবে ছিল একজন সুবাদার—সে আড়াইশো তিনশো পাঞ্জাবী শিখ হিন্দু তার সঙ্গে দু চারজন মুসলমান ঔরৎ ধরে এনে কয়েদ করে রেখেছিল; তাদের দিয়ে কয়েদীদের মত চাকিতে গম ভাঙাতো ডাল ভাঙাতো—ভারী ভারী কাম করিয়ে নিত—আবার ইচ্ছে হলে তাদের উপর জবরদস্তি জানওয়ারী কামও চালাতো। বলেছিল—ধরম ছাড়লে রেহাই; সব মেয়ের ভাল ঘরে সাদী করিয়ে দেবে। কিন্তু তারা তা করেনি। গম পিষে ডাল ভেঙে দেহের উপর জবরদস্তি সহ্য করেও তারা কয়েদী হয়েই ছিল কম দিন নয়—ছ' মাস আট মাস। তারপর একদিন তাদের মর্দানারা নাঙ্গা তরোয়াল আর বর্শা নিয়ে এল—সুবাদারকে তখন পেট চিরে মেরে ফেলেছে। এসে সব মেয়েকে খুলে দিয়ে নিয়ে চলে গেল। তারা গুরুর নাম নিয়ে একটা উপোষ করে গঙ্গাজীমে আস্নান করে নিলে; বাস হয়ে গেল; কোন পাপ নাই কোন গ্লানি নাই। এ সেই আমল বাবুসাহেব। মেয়েরা বেইজ্জতির ভয়ে করে তবু তাদের সাহস আছে—লড়তেও পারে মরতেও পারে। রোহিলাদেরই মেয়ে—সর্দার হাফিজ রহমতের এক বেটীকে লুটে নিয়ে গিয়েছিল অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা। সে বেটী নবাবকে বুকে ছুরি মেরে নিজেও মরেছিল। ছুরিতে বিষ ছিল—নবাবের সারা দেহ পচে পচে খসে গিয়ে তবে মরেছিল।

ঔরৎরা সে-কালে ভয়ও খুব করত না। তারা অনেকে ফসলের নীচে লুকিয়েও ফসল ফাঁক করে দেখতেও চেষ্টা করছিল—কি হচ্ছে। সতর্ক হয়ে কান পেতে শুনতেও চেষ্টা করছিল, হাল্লর মধ্যে কি কথাগুলি ধ্বনিত হচ্ছে! শঙ্কর মিষ্টি মেয়ে—শঙ্কর ফুলের মত নরমও বটে কিন্তু একটা আশ্চর্য সরল সাহস আছে শঙ্করের। বেশ সহজভাবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে প্রশ্নাতুর ভ্রূ তুলে বলতে পারে—কেন? কেন এমন অন্যায় করবে? কেন? গায়ে জোর আছে বলে?

উত্তরে, তার মুখোমুখি দুর্দান্ত ভয়ংকর কেউ, 'হ্যাঁ' বললেও সে দমে না।

তাতে সেই চিরন্তন—কেন? বাঃ তা কেন হবে? গায়ে জোর আছে বলে অন্যায় তুমি করবে নাকি—এমন প্রশ্ন বা এমন কথাও সে বলতে পারে। তার উপর কিশোরী বয়স। চৌদ্দ পার হচ্ছে—পনেরোতে পড়েছে; চপলতা এ বয়সের ধর্ম। একে এই দেশ, যে দেশে বারো-বছরের মেয়ে সন্তানবতী হয়—তার উপর নটী গন্ধর্বীর ঘরে ভবিষ্যৎ-উজ্জ্বল সুন্দরী মেয়ে, সে মনের দিক থেকে বেড়েছেও একটু বেশী। এবং আদরে একটু বেশী আবদেরে এবং প্রগল্‌ভাও হয়ে উঠেছে। সেই প্রগল্‌ভতার সঙ্গে একটি দুঃসাহসিকতা বর্ষা ঋতুর রৌদ্রের টানে মেঘের মত এসে জীবনের আকাশময় ঘোরাফেরা করে, সময়মত ঘনঘটারও সৃষ্টি করে। এই রূপসী দুঃসাহসিনী মেয়েটি সব থেকে এক প্রান্তের অর্থাৎ পথের দিকের একখানা জমির মধ্যে ঢুকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল ক্ষেতের আলের দিকে। সেখান থেকে দেখবে কি হচ্ছে। ফসলের মধ্যেই জমিতে শুয়ে ফসলের ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করবে।

তখন হল্লা উঠছিল খুব। মনে হচ্ছিল গ্রাম থেকে সওয়ারেরা বেরিয়ে এই সব ক্ষেতে

ঘেরাও করতেই আসছে। ক্ষেত ঘেরাও করে তাড়া দিয়ে তাদের জানোয়ারের মত নির্যাতন করবে।

ফকীরসাহেব বলেছিলেন—বাবুজী, তোমরা কিতাব পড়েছ। শুনেছি কিতাবে আজকাল সে আমলের বিলকুল সবকুছ খবর পুরা ঠিক ঠিক ছাপা হয়েছে। আজমীঢ়ে আমাদের আস্তানা—এক মুসলমান উলেমা কালিজে ভারী চাকরি করে। সে বলছিল সে আমলে আবদালী যখন এসেছিল তখন আবদালী নিজে বাদশাহের হারেম থেকে পাঁচ সাত শাহজাদী নিয়ে গিয়েছিল—তার সঙ্গে বাঁদী গিয়েছিল শও দুই শও। আর সিপাহীরা দড়ি দিয়ে বেঁধে বকরী কি গাইয়ার মত নিয়ে গিয়েছিল এ দেশের আওরত। পথে তারা এক একটা করে মরত আর সেটাকে ফেলে দিয়ে তারা এগিয়ে যেত। দিল্লী থেকে আটক পর্যন্ত পথের দু' ধারে শুধু জমেছিল হাড্ডি—তার মধ্যে জানোয়ারের মানে ঘোড়া উট বয়েল খচ্চরের চেয়ে মানুষের হাড় বেশী—মানুষের হাড়ের মধ্যে আবার ঔরতের হাড় বেশী।

সেইজন্য হল্লা শুনে ক্ষেতির ফসলের মধ্যে বড় বড় বাগিচার মধ্যে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ঔরতেরা ভয় পেয়েছিল বেশী, তারা হল্লার সঙ্গে সঙ্গে ওই ফসল কি জঙ্গলের ভিতরে ভিতরে দূরে দূরে সরে যেতে চেষ্টা করছিল।

দু-চারজন বুড়ী যাদের সাহস আছে তারা এবং তার সঙ্গে ওই কিশোরী মেয়েটি এগিয়ে যেতে চেয়েছিল ক্ষেতের শেষ প্রান্তের দিকে, যেখান থেকে চোখে দেখতে পাওয়া যাবে কি ঘটছে।

শঙ্কর হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। সন্তর্পণে নিঃশব্দে। হঠাৎ তার কানে এল একটু শব্দ। কাতরানির শব্দ। কেউ যেন কাতরাচ্ছে। কান পেতে শুনে সে বুঝতে চেষ্টা করেছিল।

না। জন্তুজানোয়ারের কাতরানি নয়।

মানুষের। হ্যাঁ মানুষের কাতরানি।

স্থির হয়ে সে সেইখানেই হামাগুড়ি দিয়ে চতুষ্পদের মত অপেক্ষা করে থেকেছিল। শুধু ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে চেয়েছিল শব্দটা কোন্ দিকে উঠছে। পিছন দিক সম্পর্কে সে খানিকটা নিশ্চিন্তই ছিল কারণ সেই দিক থেকেই সে এসেছে। শব্দটা মধ্যে মধ্যে উঠছিল—সর্বক্ষণ নয়। সম্ভবতঃ কোন আহত স্থানে নতুন করে কোন কিছুর সংঘর্ষ হলেই তখনই শব্দটা আপনি মুখ থেকে বেরিয়ে আসছিল এবং আধখানা বের হতে হতে চুপ হয়ে যাচ্ছিল। সামনের দিকেই যেন ঘন সরষের গাছগুলি দুলছে। হ্যাঁ। সামনের দিক থেকেই।

হঠাৎ একসময় ঠিক সামনাসামনি অল্প খানিকটা দূরে ওই সরষেগাছের ডালপালার মধ্যে দিয়েই নজরে পড়েছিল একটি মানুষের দুটো হাত, মুখখানার খানিকটা। এলোমেলো পিঙ্গল চুল, রক্তাক্ত কপাল, দুটি আশ্চর্য চোখ। তীক্ষ্ম উজ্জ্বল তারা দুটি পিঙ্গলাভ, সে চোখ দুটোতে যত ভয়, ভয়-চাপা মরিয়া বুকের সাহস তত; সেই পরিমাণে আরও অনেক কিছু।

হঠাৎ তার চোখ পড়েছিল শঙ্করের দিকে, একটা চকিত চমক খেলে গিয়েছিল চোখের দৃষ্টিতে; ঠিক যেমন ভাবে একটা দমকা বাতাসে আলোর শিখা চমকে উঠে কেঁপে ওঠে তেমনিভাবেই কেঁপে উঠে আবার স্থির নিষ্পলক হয়ে উঠেছিল। সে দৃষ্টিতে সংশয় ছিল, প্রশ্ন ছিল, ক্রোধ ছিল, ভয়ওছিল।

চমকে শঙ্করও উঠেছিল। প্রথমটা সন্দেহের মধ্যেও ধারণা হয়েছিল ওদিককার আগন্তুক এই গ্রামেরই কেউ। হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে যাবে। সংশয়ের মধ্যে এ কৌতুকের প্রত্যাশাও ছিল। কিন্তু এ যে অপরিচিত একজন পুরুষ। তরুণ যুবা। এবং সুপুরুষ ; রূপ আছে ; বেশভূষা ধুলো কাদায় ময়লা মলিন হলেও মনে হচ্ছে—মনে হচ্ছে অভিজাত ঘরের কেউ। তখনও গোলাম কাদেরের নাম শোনেনি। গলায় মুক্তার মালা রয়েছে। কপালে রক্ত ঝরছে। শঙ্কর স্থির হয়ে বসেই রইল।

লোকটি কিছুক্ষণ তাকে দেখে যেন একটি প্রসন্ন আশ্বস্ততায় আশ্বস্ত এবং খানিকটা নির্ভয় হয়ে উঠল। সে এবার হাতজোড় করে একটু সকাতর হেসে মিনতি করে ঘাড় নাড়লে।

সে ইঙ্গিতের অর্থ সুস্পষ্ট—আমাকে বাঁচাও। আমাকে দয়া কর। আমাকে ধরিয়ে দিয়ো না।

নিজের অজ্ঞাতসারেই শঙ্করের মুখে একটি নীরব অভয়ের হাসি ফুটে উঠেছিল ঠোঁটে এবং ইঙ্গিত ফুটে উঠেছিল তার দৃষ্টির মধ্যে।

—নিশ্চিন্ত থাক। ভয় নেই। না না না।

তার দৃষ্টির সম্মুখে তার ক্লিষ্ট কাতর আহত রক্তাক্ত মুখখানি সে দেখতে পাচ্ছিল। এ ছাড়া আর কোন্ উত্তর তার থাকতে পারত ?

বল বাবুজী ! আর কোন্ জবাব শঙ্করের মুখে চোখে ঠোঁটের ভঙ্গিতে ভেসে উঠতে পারত ?

এর পরেও সে তার ডানহাতখানি তুলে বার দু তিন নেড়ে জানিয়েছিল—ভয় নেই। থাক থাক !

এবার চাপা গলায় একটি কথা বলেছিল সে—দোহাই তোমার ! এই মুক্তার মালা—।

শঙ্করও চাপা গলায় বলেছিল—না। খুদা কসম। কোন ভয় নেই তোমার !

বাদশাহী সিপাহীরা চলে গেলে সকলে যখন গ্রামে ফিরল এবং সমস্ত বিবরণ শুনলে তখন শঙ্কর বুঝতে পারলে না সে কি করবে ! সে কি বলে দেবে ? বলবে—সেই রোহিলা পাঠান নবাবের ছেলে যার নাম বলছ গোলাম কাদের—সেই পনের ষোল বছরের নওজোওয়ান ওই সরষের ক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে আছে !

বুকের ভিতরটা কেমন করছিল।

ফকীর বলেছিলেন—বাবুজীসাহেব, তখনকার দিনে হিন্দু হোক মুসলমান হোক কেরেস্তান হোক, শহরবাসী হোক গাঁইয়া হোক পাহাড়িয়া হোক তারা দিল্লীর বাদশাকে বড় খাতির করত ভালবাসত। এক দক্ষিণ ছাড়া বাবুজী। হিন্দুস্তানের গঙ্গাজী যমুনাজীর দুই পাশে যে ইলাকা, তাদের কাছে বাদশাহ ছিল দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা। আকবর শাহের সময় থেকে এই কথা মানত হিন্দুরা—মুসলমানেরা বলত শাহ-ইন শাহ—সারা দুনিয়ার বাদশা হিন্দুস্তানের বাদশা। সে খাতির বামনউলীর বালক বৃদ্ধ যুবা সবাই করত। বাদশাহের অনিষ্ট যাতে হয় তা করার নামই ছিল ইমান নষ্ট করা বে-ইমানি করা। বেইমানির মত বেধরম নাই।

শঙ্কর ভাবছিল—বেইমানি করবে সে ? গুনাহগারীর দায় হবে তার। বাচ্চা লেড়কী বাবুজী।

তার মুখের গুলাবের মত মিঠা রঙ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল দুর্ভাবনায়।

বলেই বা দেবে কি করে সে ? কানে যে এখনও বাজছে সে নিজে বলে এসেছে—খুদা কসম, কোন ভাবনা নেই তোমার।

এয় খোদা—! শঙ্কর কি করবে বলে দাও।

যদি ধরা পড়ে তাহলে হয়তো কোতল করবে তাকে। আহা—পনের ষোল বছরের নওজওয়ান—কি সুন্দর দেখতে ! কচিবয়সের দেওদার গাছের মত ; ছিপছিপে লম্বা—কি সুন্দর ঈষৎ পিঙ্গলাভ চুলগুলি—কি উজ্জ্বল দুটি তীক্ষ্ণ চোখ !

এই সুন্দর নওলকিশোর—

ভজনগানের কলি মনে পড়েছিল তার—মীরাকে প্রভু গিরধারী নাগর—!

ভাবতে ভাবতে চোখের কোল ভিজে উঠেছিল। হঠাৎ তার মনে পড়ে গিয়েছিল পুরোহিত মহারাজের কথা !

হ্যাঁ পুরোহিত মহারাজ তাকে বাৎলে দিতে পারবেন সে কি করবে !

সন্ধ্যাবেলা মহারাজ এসেছিলেন অমৃতেশ্বর শিউজীর মন্দিরে আরতি করতে।

আরতি শেষ করে মহারাজ শিউজীর মন্দিরের দরওয়াজা বন্ধ করছেন—যারা আরতি দেখতে এবং শিউজীকে প্রণাম করতে এসেছিল তারা সকলে চলে গেছে ; আকাশে সেদিন তখন চাঁদ ছিল—শুক্লপক্ষ। মন্দিরের বাইরে বামনউলীর চাষের মাঠের ফসলের উপর এমন জ্যোৎস্না ছিল যে শীতের বাতাসে ক্ষেতভরা গম ও সরষের গাছগুলি দোল খাচ্ছিল তাও দেখতে পাচ্ছিলেন মহারাজ। পাশেই ছিল মন্দিরেরই একটা বাগিচা—তার মধ্যে ছিল ভাল কলমের পেয়ারার গাছ ; তার মধ্যে মহারাজ দেখতে পেলেন একটি ছোট মেয়ে বেরিয়ে আসছে। সম্ভবতঃ এতক্ষণ গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। সে এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল—গোড় লাগি মহারাজ বলে সে প্রণাম করলে।

সবিস্ময়ে মহারাজ বললেন—কে ? আরে ? তু—শঙ্কর ?

—জী হাঁ মহারাজ। আমি শঙ্কর।

—তুই আমরুদের বাগিচার গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলি ?

—হাঁ মহারাজ—আপনার সঙ্গে দেখা করব বলে লুকিয়ে ছিলাম।

হেসে মহারাজ বললেন—কেয়া ? তু রাধা প্যারী আর আমি বাঁশুরিয়া কৃষ্ণ কানাইয়া ? মহব্বত ? আঁ ?

এই পিতামহের বয়সী রসিক পুরোহিত মহারাজ এই ধরনের রসিকতা করতেন এই গন্ধর্বপাড়ার মেয়েদের সঙ্গে। দু চারজন রূপসী নটী কন্যার সঙ্গে ছত্রি জমিদার সর্দার রাজার সঙ্গে গন্ধর্ববিবাহও তিনি দিয়ে দিয়েছেন।

লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠত না কেউ তাঁর কথায়। শঙ্কর কাতরকণ্ঠে বলেছিল—না মহারাজ—আমি যে বড় বিপদে পড়েছি। কি করব তুমি বলে দাও। বাতা দিজিয়ে মহারাজ, কি করব আমি ?

—কেন, তোর আবার বিপদ কি হল ?

—বেইমানির গুনাহ থেকে বাঁচবার পথ আমাকে বলে দাও !

—বেইমানি—?

—হ্যাঁ মহারাজ !

সেই মন্দিরের দাওয়ার উপর বসে শঙ্কর সমস্ত কথা মহারাজকে খুলে বলে জিজ্ঞাসা করেছিল—বল, আমি কি করব ?

—তুই 'খুদা কসম' বলেছিস ?

—হাঁ জী মহারাজ !

—তাহলে তো তোকে সে কসম রাখতেই হবে রে!

ঠিক সেই সময়ে কিছুটা দূরে ক্ষেতের ফসলের ভিতর থেকে মাথা তুলে চারিদিক ভাল করে দেখে নিয়ে গোলাম কাদের উঠে দাঁড়িয়েছিল।

শীতের কাল, সন্ধ্যার পর ঠাণ্ডা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাটির বুকে ধোঁয়ার মত বাষ্পপুঞ্জ জমতে থাকে—রাত্রির গাঢ়তার সঙ্গে ধীরে ধীরে উপরের দিকে ওঠে। গোলাম কাদের সেই বাষ্পপুঞ্জের মধ্যে যেন ঢেকেই যাচ্ছিল। তবুও তাকে দেখিয়ে শঙ্কর বলেছিল—ওই দেখ সে দাদাজী মহারাজ।

দাদাজী মহারাজ শঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। গোলাম কাদেরকে দেখে বলেছিলেন—নবাবজাদা, এই লেড়কী তোমার কাছে খুদার নামে কসম খেয়ে বলেছে ভয় নেই তোমার। সে যখন বলেছে তখন আমিও বলছি। কিন্তু কতটুকু আমাদের জোর বল? বামনৌলির আর কেউ তোমাকে দেখে খুশী হবে না। আমি বলি কি তুমি এবার চলে যাও এখান থেকে।

গোলাম কাদের বলেছিল—তাই আমি যাব। কিন্তু এই শীতেও আমার বড় তিয়াস পেয়েছে। পানি পিইতে চাই। আর ভুখা অনুভব করছি। কিছু খাদ্য দাও আমাকে। আর একটা ঘোড়া যোগাড় করে দাও। আমি দাম দিচ্ছি।

দাদাজী বলেছিলেন—সে হবে। আগে এস, ওই কুঁইয়ার ধারে এস। ওখানে পানি তুলে দেব—তুমি মুখ হাত ধোও, সুস্থ হও, শঙ্কর কিছু খাবার আমি তোকে দোব তুই নবাবজাদা সাহেবকে এনে দিবি। খাওয়াবি। এর মধ্যে আমি ঘোড়ার ব্যবস্থা একটা করছি। দাম তোমাকে লাগবে—কিছু বেশী লাগবে। মোহর হলে বিশ মোহর দাম লাগবে—আমাকে পাঁচ মোহর দিয়ো—সিক্কা রুপেয়া নেব না নবাবজাদা।

কুয়ো থেকে জল তুলে মহারাজ নিজে তাকে হাত মুখ ধুইয়ে কিছুটা জল পান করিয়ে, ওই শিউজীর মন্দিরের পাশের যে বাগিচায় গুলবদনী লুকিয়েছিল সেইখানে তাকে অপেক্ষা করতে বলে, গুলবদনীকে নিয়ে গ্রামে ফিরে যাবেন বলে পা বাড়িয়েও থমকে দাঁড়িয়ে নবাবজাদাকে ডেকে বলেছিলেন—নবাবজাদা, এক বাত তোমাকে আমি বলব। আর তার জবাবে তোমার কাছে চাইব তোমার জবান।

গোলাম কাদের বলেছিল—বল জী কি তোমার বাত। কি জবান তুমি আমার কাছে চাও?

—দেখ আমি গ্রামে গিয়ে এই শঙ্করকে দিয়ে তোমার জন্যে কিছু খাবার পাঠাব।

—তোমার মেহেরবানি চিরকাল মনে থাকবে আমার।

—না সাহেব। মেহেরবানি কিছু নয়। তুমি মুসাফের। তুমি বিপন্ন। তুমি ক্ষুধার্ত—তোমাকে সাহায্য করা তোমাকে খেতে দেওয়া মানুষের কাজ। গৃহস্থীর ধর্ম। কিন্তু এমন মুসাফের তুমি যে বাদশার সঙ্গে তোমার লড়াই চলছে। দিল্লীর বাদশার সঙ্গে যার দুশমনি তাকে আশ্রয় তো গ্রামে কেউ দেবে না। আমরা হিন্দু; রাজদ্রোহ আমাদের কাছে পাপ। কিন্তু শঙ্কর খুদার নামে কসম খেয়ে তোমাকে অভয় দিয়েছে। এখন বাত আমার এই যে আমি ঘোড়া আনতে যাব পাশের গাঁয়ে—আমার ভাইয়ের ঘোড়া আছে। আর শঙ্কর আসবে তোমাকে খানা দিতে। এবার তোমার জবান আমি চাই নবাবজাদা কি কোন অনিষ্ট তুমি করবে না!

—অনিষ্ট? কি অনিষ্ট?

—কোন অনিষ্ট নবাবজাদা! যে কোন অনিষ্ট! এই লেড়কী আসবে তোমাকে খানা দিতে, একলা আসবে, বল তুমি—। জবান চাই তোমার। তোমরা নবাবের ছেলে রাজার

ছেলে জমিদারের ছেলে—তোমাদের চৌদ্দ পনর বছর উমর হলেই বাপ মায়ে ছোকরী বাঁদী কিনে দেয়। শঙ্কর তা নয়।

পুরোহিতের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নবাবজাদা বলেছিল—দিলাম জবান!

—দিলাম জবান নয়। বল—জবান দিচ্ছি লেড়কীর কোন অনিষ্ট করব না!

—না। করব না।

—খুদা কসম।

—খুদা কসম।

—খুদা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি ওই গাছতলায় ওই যে ছায়া পড়েছে ওইখানে অপেক্ষা কর। এখানে মহাদেব আস্তানে কারুর না আসারই কথা তবুও কেউ এসে পড়তে পারে।

শঙ্করকে মানে গুলবদনীকে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন পুরোহিতজী। বাড়িতে গিয়ে কয়েকখানা রুটি আর দুধ মিষ্টান্ন এই দিয়ে গুলবদনীকে পাঠিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—গন্ধর্বীর বেটী তুই শঙ্কর। চোদ্দ পনের বছরে গৃহস্থীঘরে মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি যায়—ছেলেরা মা হয়। তুই সব বুঝিস। নবাবজাদা জমিদারের বেটা রাজার ছেলে আমীরের লেড়কা—এরা বড় লুচ্চা হয়। তুই কিন্তু হুঁশিয়ার হয়ে থাকবি।

গুলবদনী মাথা নীচু করে বলেছিল—হাঁ মহারাজ।

পুরোহিতজী যখন ঘোড়া নিয়ে ফিরেছিলেন তখন শীতের রাত দু পহর পার হয়ে গেছে; শুক্লপক্ষের চাঁদ তখন পশ্চিম দিগন্তে ডুবেছে—তার শেষ ছটাটুকুও ক্রমশঃ যেন কালো হয়ে আসছে।

অমৃতেশ্বর শিউজীর মন্দিরের মাথার কলসগুলোও কালো হয়ে রাত্রির অন্ধকারের দেখা যাচ্ছে না।

পুরোহিত ডাকলেন—নবাবজাদা, সাহেব, জনাবআলি!

কেউ কোন উত্তর দিল না। অন্ধকার আকাশের মধ্যে যেন একটা সন্‌সন্‌ শব্দ উঠছে—সে শব্দ রাত্রিকালে ওঠে; সম্ভবতঃ গাছপালার মধ্যে পত্রপল্লবের মৃদু আন্দোলনে এ শব্দের সৃষ্টি হয়। একটানা একটা সন্‌সন্‌ শব্দ; মধ্যে মধ্যে এই শব্দকে চিরে বাদুড়ের ডাক এবং পাখার আন্দোলনের শব্দ ওঠে।

পুরোহিতজী কারও কোন সাড়া না পেয়ে যেন বিস্ময় এবং অদ্ভুত জিজ্ঞাসার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ এমনি একটা উড়ে যাওয়া বাদুড়ের পাখার শব্দে এবং তার কর্কশ ডাকে সচকিত হয়ে নিজেকে ফিরে পেলেন। এবং উচ্চকণ্ঠে ডেকে উঠলেন—সা—হে—ব—জা—দা—! জ—না—ব আলি! তারপর ডাকলেন—শ—ঙ্ক—র! শ—ঙ্ক—র!

চারিদিকে তখন ওই কুয়াশা মাটি থেকে মানুষের মাথা পর্যন্ত ঠেলে উঠেছে। কিছুই দেখা যায় না। ভয় হয়ে গেল পুরোহিতের। —হে শিউজী রক্‌সা কর প্রভু লেড়কীকে। হায় এ কি করেছে সে!

পরদিন সকালবেলা—বেলা তখন আধ প্রহর গড়িয়ে গেছে তখন খোঁজ পাওয়া গেল শঙ্করের।

শঙ্কর রক্তাক্তদেহে, খানিকটা দূরের একটা বাগিচার মধ্যে প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে ছিল। কচি কুঁড়িধরা একটি সবুজ নরম লতাকে কেউ যেন থেঁতলে দিয়ে গেছে। ফকীর

বলেছিলেন—বাবুজী, ফুলের মত লেড়কী একদম বেহোশ, সারা শরীরে কাপড়েচোপড়ে রক্ততে ধুলায় একেবারে যেন দু হাত দিয়ে পাঁক মাখিয়ে দিয়েছিল।

॥ ছয় ॥

পশুর মত অত্যাচার করেই ছেড়ে দিয়ে চলে যায়নি। তার পাঁজরার পাশে একখানা ছোরা বসিয়ে দিয়ে চলে গেছে। বোঝা যায় মেরেই ফেলতে চেয়েছিল। তবু মেয়েটার নসীব বাবুসাহেব—সে বাঁচল। ছোরাটা মেরেছিল কিন্তু কলেজা থেকে দু তিন আঙুল পাশে বসেছিল ছোরাটা, তাই শেষ পর্যন্ত যুঝে যুঝে কোনরকমে বেঁচে উঠল।

বাঁচালেন আমার গুরুর গুরু যাঁর কথা বলেছি তিনি। হজরত রহিমশাহ। গন্ধর্বী আর বাঈ তয়ফাবালীদের পীর। বাবুজী, শঙ্কর বেঁচে উঠে গুরুকে যা বললে তাই তোমাকে আমি বলছি। বিশ্বাস তুমি না কর না করবে। তাতে নিরাকার ঈশ্বরের মত যে দৃষ্টির অগোচর অদৃষ্ট বিচিত্র সত্য তা মিথ্যা হয়ে যাবে না।

শঙ্কর বাঁচল নসীবের জোরে আর রহিমশাহের মেহেরবানিতে তাঁর করুণায়। এ কথা বলেছি; কেন বলেছি শুনুন বাবুজী। আফজল আমাকে বলেছে আপনি সাচ্চা রইস আদমী; আপনি এটা বুঝবেন। দুইয়ে দুইয়ে চার হয় তিন একে চার হয় কিন্তু এক এক এক একে চার হয় এইটেই হল ঠিক হিসেব। এ বুঝবার মত এলেম থাকা চাই।

শঙ্করকে সকালবেলা পাওয়া গেল 'আধা কোশ' দূর এক বাগিচার মধ্যে। লোকে তাকে নিয়ে নিয়ে এল ঘর। সারা গাঁওয়ের লোক ভেঙে এল। এ কি কাণ্ড! কোন্ শয়তান এমন জঘন্য নিষ্ঠুর কাজ করে গেল?

পুরোহিত কোন কথা প্রকাশ করে বলতে পারেনি। দায় হবে তার। এত কাণ্ড ঘটবার পর বুঝতে পেরেছিল কতবড় ভুল সে করে ফেলেছে। সে ভুল খানিকটা শঙ্করের জন্যে মমতাবশে খানিকটা আবার দশখানা মোহরের জন্যেও বটে। সুতরাং ভুলের জায়গায় নিজের লোভের জন্য আপসোসের আর সীমা ছিল না তার।

নবাবজাদাকে সোজাসুজিই বলেছিল যে, ঘোড়া কিনে এনে সে দেবে—এই রাত্রেই দেবে কিন্তু দাম লাগবে বিশ মোহর; তা ছাড়া সে নেবে পাঁচ মোহর। বকশিস নয় মজুরি। আর তার মনে মনে ছিল—আর তাই সে নিয়েওছিল; আরও চার মোহর সে নিয়েছিল যার দশ মোহরের ঘোড়া বিশ মোহরে বেচে দিচ্ছিল তার কাছ থেকে। এই লোভটা তার মধ্যে বড় হয়ে না উঠলে সে কখনই সেই রাত্রে ঘোড়া কিনতে যেত না এবং শঙ্করকে ওই নবাবজাদার সামনে একলা যেতে দিত না। ব্যাপারটা চেপে গিয়ে সে বলেছিল—শঙ্কর তার বাড়ি এসে রাত্রে থাকবে বলেছিল—পণ্ডিতজীর কাছে মহাভারত শুনবার জন্যে প্রায়ই আসত; এক একদিন বুড়ী ব্রাহ্মণ দিদিয়ার কাছে কাহিনী শুনবার জন্য একটু পাশেই বিস্তারা বিছিয়ে শুতো। সেদিনও এসেছিল এবং কিছুক্ষণ পরই সে চলে গিয়েছিল—বলেছিল তার তবিয়ৎ আচ্ছা মালুম হচ্ছে না। সে ঘর যাচ্ছে। এর পর আর তো সে কিছু জানে না!

এইসব কথাবার্তা হচ্ছে বাবুজী এমন সময় বামুনওলী গাঁয়ের শিউজীথানের দিক থেকেই গ্রামে এসে পেঁছে গেলেন গন্ধর্বীদের গুরুজী আর হিন্দু মুসলমান সব লোকের আশ্বাস-সান্ত্বনা-দাতা মুনিস্-উল-আরওয়া হজরতসাহেব। বলুন তো বাবুজী, রহিমশা কেন কি করে এলেন ওই দিনটিতে—ওই সকালটিতে? ফকীরসাহেবের শিষ্য অনেক—সারা রোহিলখণ্ড অযোধ্যা আবার এদিকে গোয়ালিয়র পর্যন্ত ছড়ানো। আস্তানা তিনিই গেড়ে

গিয়েছিলেন আজমীঢ়ে। এক মাহিনা দেড় মাহিনার কম তো আসাই হত না তাঁর—সময়-সময় দু মাহিনাও হয়ে যেত। বিশেষ করে বর্ষার সময় আর পুরা শীতের সময়। তাছাড়া দাঙ্গা লড়াই এ তো আছেই। সেবার এই ঘটনার মোট কুড়ি দিন আগে গুরু রহিমশাহ থেকে চলে গিয়েছেন, যাবার সময় বলে গিয়েছিলেন ওই গুলবদনীকে—"বেটী, এবার আসতে আমার থোড়া দেরি হবে—তুমি যেন হুঁশিয়ারির সঙ্গে যে রাগিণী দিয়ে গেলাম তা পুরা দুরুস্ত করে রাখবে।"

সেই রহিমশাহ আপনা আপনি—কোন খবর ছিল না, কোথাও থেকে হঠাৎ সকালে এসে হাজির হবেন কেন?

তখন সবে পাশের গাঁও থেকে বুড়া কবিরাজজী এসে বসে তার নাড়িটি ধরেছেন—পানি গরম করা হচ্ছে—আগুনের আঙঠায় গনগনে কাঠের আগুন করা হয়েছে। অজ্ঞান লেড়কীর গর্দা ধুয়ে দিয়ে ওই আঙঠার আগুন থেকে কি কি পাতা বাঁধা পুঁটলির সেঁক দেওয়া হবে। এই নিদারুণ অত্যাচার—দুর্দান্ত পশুর মত দাঁত দিয়ে নখ দিয়ে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে—তার উপর এই দুরন্ত শীতের রাতের হিমবর্ষণ হয়েছে ছিন্নবাসা কন্যাটির দেহের উপর। অসাড় নিস্পন্দের মত পড়ে ছিল। সবে সুরযদেওজী আসমানে উঠেছেন—তাঁর রোশনির সঙ্গে তাপ এসেছে—ঠিক এই সময়েই এসে পেঁছুলেন ফকীরসাহেব।

যাচ্ছিলেন অন্যদিকে; হঠাৎ কাল সকালে কেমন মেজাজ হয়েছে বামুনওলী হয়ে যাবেন তাই এসে পড়েছেন। ইচ্ছা ছিল কাল সন্ধ্যার আগে এসে পেঁছুবেন কিন্তু তা পেঁছুতে পারেন নি। ফকীরসাহেব নিজে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ রাত্রি দুপ্রহরের সময় ঘুম ভেঙে উঠে পড়ে আর ঘুমুতে পারেননি—সারারাত ছটফট করেছেন। ঘড়ি ঘড়ি চেলাকে জিজ্ঞাসা করেছেন—দেখ তো পুরব তরফে আঁধিয়ার হালকা হয়ে এল কি না? দেখ তো শুকতারা কোথায়?

ভোর হতে হতে উঠে পড়ে চলে আসছেন।

বাড়িতে তখন কান্নাকাটি পড়ে গেছে। ব্রাহ্মণদের আর লালাদের বুড়া বুড়ীরা গন্ধর্বী জাতটাকেই দুষছে।

ফকীরসাহেব বাড়ি ঢুকে কাউকে কোন কথা না বলে বেহোঁশ ওই গুলবদনীর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

কবিরাজজী বলে উঠেছিলেন—বাস—আবার কি—আর কুছ ডর নেহি। ফকীরসাব জীওনদাতা এসে গিয়েছেন। জরুর বেঁচে যাবে শক্কর।

ফকীরসাহেব বলেছিলেন—বাবুজী, এই হিসেবেই হল এক এক এক আর এক জুড়ে চার। তিন একে চার, দুই আর দুই চার এ সবই আছে ওই হিসেবের মধ্যে। ওর চেয়ে সরল সহজ কিছু নাই। ওকে আর সহজ করে ভাঙা যায় না। গুলবদনীর নসীব এক—দুনিয়াতে পুণ্যের জোর এক—আর গুরু রহিমশাহের ওই লেড়কীর উপর স্নেহ সেও এক আর গুরু রহিমশাহ শয়তানকে রুখনেওয়ালা চিরকাল সে এক—এই নিয়ে চার বাবুজী। একটু ঘুরিয়ে বল দেখবে এক এক আর দুই এই নিয়ে চার হয়ে যাবে। গুরু রহিমশাহ হবেন দুই—তাই বা কেন পুণ্যের জোরের এক সেও রহিমশাহের সঙ্গে মিশে গিয়ে তিন হয়ে যাবে। বলতে পারবে তিন একে চার। গুলবদনীকেও পুণ্যের এক দিতে পার—তাতে দুই দুইয়ে চার হবে।

যাক কি হয়েছিল শোন। দুনিয়ার বাইরে যা ঘটে তার একটা চেহারা আছে কিন্তু

ভিতরে আর একটা চেহারা আছে। সেই দুনিয়ার প্রথম দিন থেকে শয়তানের সঙ্গে আল্লাহ-তায়লার সিপাহীদের লড়াই।

আমাদের গুরু রহিমশাহজী ছিলেন আল্লাহতায়লার সিপাহী।

শয়তান সে সময় সারা হিন্দুস্তানে ফলাও কারবার ফেঁদে বসেছে; তামাম হিন্দুস্তানে লড়াই কামড়াকামড়ি খুনখারাবী বেইমানি চুরি ডাকাতির সঙ্গে হিংসাবিদ্বেষের ঝড়ো হাওয়া বইছে—শরাব আফিংয়ের নেশায় মানুষেরা বুঁদ হয়ে থাকে; ঔরৎ দেখলেই বেটাছেলে—সে ছেলে থেকে বুড়ো পর্যন্ত—কুত্তি দেখে কুত্তার মত পাগলা হয়ে যায়।

বামনুওলীর এক লেড়কী গন্ধর্বীর বেটী। নাচগান করা দেহ বেচা তাদের বৃত্তি। এ তারা করে আসছে। হঠাৎ তাকে দরকার কার হল তা বলতে পারি না। শয়তানের না আল্লাহতায়লার সিপাহী যারা শয়তানের সঙ্গে লড়াই করে তাদের না আমাদের গুরু রহিম শাহের তা বিচার করে বলা শক্ত।

ফকীরসাহেব বলেছিলেন—তুমি শোন। বিচার করে বলো শুনব।

শঙ্কর পাঁচ পাঁচ দিন বেহোঁশ হয়ে ছিল। সারা গায়ে চড়া তাপ আর তার সঙ্গে প্রলাপ। বুখারের মধ্যে গুলবদনী চিৎকার করছিল—নেহি নেহি নেহি। ছোড়ো মুঝে জী ছোড় দে মুঝে। তারপরই আর্তস্বরে চিৎকার করত—হজরত হজরত বাঁচাইয়ে—মুঝে বাঁচাইয়ে।

রহিমশাহ কপালের উপর হাত রেখে মনে মনে কোরান আবৃত্তি করতেন। আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে আসত গুলবদনী।

দুদিনের দিন গুলদনীর দেহের তাপ সহজ হয়ে এল—হোঁশ ফিরল। সকালবেলা তখন তখন, গুরু রহিমশাহ তানপুরা নিয়ে ভজনগান করছেন।

বলেছি তো বাবুজী আমাদের গুরু ছিলেন আজমীঢ়ের হজরত আবদুল কাদের জিলানীর সঙ্গে এক মতের মানুষ যাতে দুনিয়াতে হিন্দু কেরেস্তান ইহুদী মুসলমান কারুর সঙ্গে কোন ঝগড়া ছিল না। বলতেন—বেহেস্তের ফটক সব পুণ্যবান মানুষের জন্যে খোলা আছে, খোলা থাকবে। যে নামেই খুদাকে ডাকুক সে ডাক ঠিক মালিকের পায়ের তলায় পৌঁছে যায়। এক শয়তান এই ফটকে ঢুকতে পায় না। তার সঙ্গে শয়তানকে ভজে যারা তারা। •বলেছি তো গোঁড়া মোল্লা মৌলভীরা ফকীরসাহেবকে গালিগালাজ করত। তা করলেও তিনি গ্রাহ্য করতেন না। পাঁচওয়াক্ত নামাজ তিনি পড়তেন, আবার সকালে সন্ধ্যায় ভজনগান করতেন—'মীরাকে পরভু গিরধারীলাল বনশীবালা'—। আর রাধা প্যারী তাঁর বড় প্রিয় ছিল।

বাবুজী, আমারও প্রিয়। আমিও থোড়াকুছ গানাবাজনা জানি। অবসর মিললে তোমাকে শোনাব। থাক—। এখন গুলবদনীর কথা বলি শোন। সেদিন সকালে গুরু যখন ভজন গাইছিলেন তখনই কখন যে গুলবদনীর হোঁশ ফিরেছে, চোখ মেলেছে, সে কেউ দেখেনি। ভজনের মধ্যে সব মানুষগুলির মন বাংলা মুল্লুকের রসের মিঠাইয়ের মত রসের কড়াইয়ে ভাসতে ভাসতে একেবারে পুরা ভিজে তলায় ডুবে গিয়েছে। চোখ গুরুজীরই পড়ল; এবং যখন পড়ল তখন গুলবদনীর মুখে ক্লান্ত বিষণ্ণ হাসি আর চোখের জলে সারা মুখখানা ভিজে চকচক করছে।

গুরু রহিমশাহের চোখের সঙ্গে চোখ মিলতেই গুলবদনী আবার কেঁদে উঠেছিল; দুই চোখের ধারায় যেন গঙ্গাজী আর যমুনাজীর তুফান নেমে এসেছিল। গুরুজী নিজের হাতখানি তার কপালের উপর রেখে বলেছিলেন—মৎ রোনা। ন ন ন। রোতি কিঁউ বেটী!

গুরুর নিজের চোখেও আঁসু এসেছিল বাবুজী।

গুলবদনী বলেছিল—শয়তান গুরুজী উ—উ—।

গুলবদনী বলেছিল সে রাত্রের কথা। 'সেদিন বলতে পারেনি, পরে বলেছিল।

পুরোহিত মহারাজের বাড়ি থেকে রুটি মিষ্টান্ন আর কিছু রাবড়ি নিয়ে সে একরকম লুকিয়ে লুকিয়ে এসে উঠেছিল অমৃতেশ্বর শিউজীর মন্দিরের উঠানে। এসে দেখতে পায়নি তাকে।

চাঁদনী রাত—মাটির বুক ঘেঁষে কুয়াসা জমেছে—পেঁজা তুলো যেন ছড়িয়ে পড়ে আছে ; বাতাস ভারী ছিল ঠাণ্ডাতে ; গালের উপর নাকের ডগায় যেন কনকনে একটা কিছু বারবার ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। একটা গন্ধও পাচ্ছিল সে কিছুর। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে তাকে দৃষ্টি দিয়ে খুঁজতে খুঁজতেই সে মৃদুস্বরে ডেকেছিল—জনাবআলি ! সা—হে—ব !

হঠাৎ পেয়ারা বাগিচার ও-মাথা থেকে সাড়া এসেছিল—আসছি। একটা ঘনপল্লব পেয়ারাগাছের তলা থেকে নবাবজাদা গোলাম কাদের সাহেব বেরিয়ে এসে চাঁদনির মধ্যে দাঁড়িয়েছিল।

—থোড়া কুছ ঘাবড়ে গিছলাম আমি হুজরত। সে একা ছিল না—তার সঙ্গে আরও একজন লোক ছিল। সে লোকটা দেখতে কেমন, নোকর কি আমীর কি দেহাতী কি কোন্ জাতের লোক—হিন্দু না মুসলমান এর কিছুই তখনও দেখতে পাইনি বুঝতে পারিনি, তবু যেন বুকের ভিতরটায় কেমন ধড়ফড় করে উঠল। ভয় লাগল।

ডর মালুম হুল হুজরত। সে সাধারণ 'ডরানা'র মত 'ডরানা' নয়। তার জাত যেন আলাদা। কেমন একটা 'বয়' গন্ধ আসছিল বাতাসে। তার সঙ্গে আর কিছু ছিল যা শরীরে লেগে সারা শরীরটাকে যেন ভয়ে অবসন্ন করছিল।

তবু আমি বললাম হুজরত—কিছু খানা এনেছি জনাবআলি—

সাহেবজাদা এগিয়ে এলেন, এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—তুমি আমাকে বাঁচালে। যে ভুখ আমার লেগেছে তাতে দুনিয়া আমার কাছে তিতা হয়ে গেছে। গাছে পেয়ারা খুঁজলাম, আমার নসীব মন্দ—একটা পেয়ারাও নেই। দাও। কি এনেছ দাও।

মন্দিরের দাওয়ায় বসে হাত বাড়ালেন সাহেবজাদা। রুটি আর শক্কর ছিল একটা পাতাতে আর একটা মাটির ভাঁড়ে ছিল থোড়া রাবড়ি—নামিয়ে দিলাম। সাহেবজাদার চোখ দুটো চকচক করে উঠল। আমাকে বললেন—বস তুমি মেরী প্যারী বস।

আমি ভয় পেলাম চমকে উঠলাম ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল পুরোহিত মহারাজকে জবান দিয়েছেন নবাবজাদা—তার সঙ্গে কসম পর্যন্ত খেয়েছেন—বলেছেন—খুদা কসম।

আমি বললাম—জনাবআলি, আপনি একটা মুলুকের মালিক, লাখো লাখো মানুষের রক্ষাকর্তা দণ্ডদাতা অন্নদাতা—আপনি হাত উঠালে মানুষের ধড় থেকে গর্দান খসে পড়ে যায়। আপনি সামান্য অনুগ্রহ করলে গরীবগুলোর ভাগ্য ফিরে যায়। আমি আপনার থোড়া সেবা করতে পেরে ধন্য হয়ে গিয়েছি—আমি আপনার বাঁদী দাসী।

সাহেবজাদা ওয়া ওয়া করে উঠলেন। শিউজীতলার শান্ত স্থির জ্যোৎস্না চমকে গেল সে আওয়াজে—গাছের মধ্যে থেকে বাদুড় উড়ে গেল পাখা ঝটপট করে—কাছে আশেপাশে কয়েকটা বড় ঝিঁঝিঁ পোকা একটানা কটকটে ডাক ডেকেই চলেছিল তারা চুপ করলে। আমি চমকে উঠে বললাম—চুপে চুপে কথা বলুন জনাবআলি ! গাঁয়ের কেউ যদি শুনতে পায় !

তিনি বললেন—ঠিক বাত প্যারী। কিন্তু আমার ভুল হয়ে যাচ্ছে। এই চাঁদনীতে

বসরাই গুলাবের আধফোটা ফুলের মত তুমি, আমার সামনে দাঁড়িয়ে ; আর চারপাশে এই সুন্দর হালকা কুয়াসা ; এই নির্জনতা আমাকে মাতাল করে দিচ্ছে। আর এই আরক্‌। মনে হচ্ছে গজল তৈরি করি।

একটা ছোট শিশি বের করলেন তিনি। ছিপি খুলে খানিকটা খেয়ে মুখ মুছলেন। তার ঝাঁঝ এসে আমার নাকে ঢুকল, বহুত তেজী আরক, আমার সারা শরীর যেন কেমন করে উঠল।

সাহেব বললেন—তাছাড়া এখন আমি একা নই প্যারী। আমার এক দোসর এক জবরদস্ত সিপাহী এসে গেছে। আমাকে ছেলের মত পেয়ার করেন বাদশাহের হারেমের নাজির মনজুর আলি সাহেব—তিনি এক সর্দার পাঠিয়ে দিয়েছেন এক ঘোড়াও পাঠিয়েছেন, সে থাকতে ভয় আমি করি না প্যারী ! কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন—তুমি বস।

শঙ্কর বলেছিল সে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল ভয় পেয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছিল যে তার গন্ধর্বী কুমারী মনে এক নয়া রাগের আমেজ তৈরি করে দিয়েছিল।

কিছুটা বুঝি সবটা বুঝি না—খানিকটা ধরা যায় বাকীটা যায় না—কেমন অস্বস্তি লাগে—সব যেন গোলমাল হয়ে যায় এমনিতরো একটা অবস্থা।

সেই অবস্থার মধ্যে কিশোরী গুলবদনী নবাবজাদাকে বলেছিল—আমি যাই জনাবআলি। বাড়িতে দেখতে না পেলে আমার খোঁজে লোক বেরিয়ে পড়বে।

তখন আরকের নেশায় নবাবজাদার মেজাজ খুব শরীফ হয়ে উঠেছে। নবাবজাদা বলে উঠেছিলেন—না কুঁয়র (কুমারী) তুমি মৎ যাও। তুমি যেয়ো না। তুমি গেলে আসমানে ওই যে চাঁদ রয়েছে ও চাঁদ কালো মেঘ এসে ঢেকে দেবে—আঁধিয়ারায় বিলকুল সব কালো হয়ে যাবে। তুমি আমার জান বাঁচিয়েছ কিন্তু সে জান আমার ছিনিয়েও নিয়েছ। প্যারী, তোমার মত অপরূপ সুন্দরী আমি কখনও দেখিনি। তোমাকে আমি ভালোবেসেছি। তুমি যেয়ো না। লোক যদি আসে তো আসুক—তারা আমাকে মেরেই ফেলুক। কি হবে আমার বেঁচে যদি তোমাকে না পাই ?

পাকা গন্ধর্বিনী বাঈ হলে সে হয়তো মনে মনে হাসত। হয়তো সেও আরও বানিয়ে বানিয়ে ভাল কথা বলত। কিন্তু এ মেয়ে কিশোরী মেয়ে। এখনও পর্যন্ত যে ব্রতধারিণীর মত গুরুর কাছে গানবাজনা শেখে—গন্ধর্বীদের যে পাপপুণ্যের হিসাব নিকাশ আছে নীতিকথা ধারাপাত আছে তাই শেখে ; শেখে জীবনের প্রথমেই একজনের সঙ্গে তার মালাবদল হবে বক্কসর হবে। এবং সেই হবে তার প্রিয়তম জন। তার নাম বলতে নেই ; তার সঙ্গে লোকজানাজানি করে দেখা করতে নেই ; তার কাছে কোন কিছু দাবি করতে নেই, এক গোপন প্রেম ভালবাসা ছাড়া। তার বুকের উপর পড়ে দুনিয়ার সবকিছু ভুলে যেতে হয়।

কিশোরী গন্ধর্বিনী কুমারী শীতশেষের উতলা বাতাসে অশথগাছের পাতার মত ভিতরে বাহিরে থরথর করে কাঁপছিল।

ঠিক এই সময়েই সেই লোকটি একটা ঘোড়ার লাগাম ধরে এনে সামনে দাঁড়িয়েছিল। কালো হাবসী একজন। মসলিনের মত মিঠি জ্যোৎস্নায় তার প্রকাণ্ড মিশকালো মুখখানার মধ্যে সাদা দুটো চোখ আর সাদা ধারালো দুপাটি দাঁত শুধু ঝকঝক করছিল। লোকটা হাসছিল। গুলবদনী তাকে দেখে আতঙ্কে চমকে উঠে অস্ফুট আর্তনাদ করে জড়িয়ে ধরেছিল গোলাম কাদেরকে। ভীরু পাখীর মত সে কিশোর নবাবজাদার বুকের তলায় আশ্রয় নিতে চেয়েছিল। আরও ভয় পেয়েছিল সে একটা কুকুরের ভয়ংকর আওয়াজে। দূরে কুকুরটা দাঁড়িয়ে শিউজীর মন্দিরের দিকে তাকিয়ে ক্রমাগত একটা চাপা গর্জন করে চলেছিল।

চাপা গলায় লোকটা ফিসফিস করে নবাবজাদাকে বলছিল—হাঁ, এই ছোক্‌রী ? আঁ ?

—হাঁ।

—আ—চ্ছা !

—আচ্ছা নয় ? তোমাকে বলিনি ?

গ্‌ুলবদ্‌নী লোকটার ম্‌ুখের দিকে তাকিয়েছিল। কালো হাঁড়ির মত বড় ম্‌ুখের মধ্যে অল্প দাড়ি গোঁফ এখানে ওখানে—দ্‌ুচারগাছা ছাড়া দাড়ি গোঁফ নেই বললেই হয়। মাথায় কোঁকড়া মোটা চুল থগা বেঁধে রয়েছে। লোকটাকে দেখে মনে হয় ওর মধ্যে দিল নাই কলিজা নাই—চোখে ওর জল নাই—লোকটা যেন পাথরে গড়া। দেখলে যেন শরীর হিম হয়ে যায়। সে বললে—বহ্‌ুৎ আচ্ছা সাহেবজাদা ! তোমার নজর ভাল—তোমার নসীব ভাল। এ ছোকরী আরও ভাল। এ তো ন্‌ুরবাঈয়ের মত সারা দিল্লী পাঞ্জাবকে মাতাল করে দেবে পাগল করে দেবে।

চমকে উঠেছিল শঙ্কর। ন্‌ুরবাঈ ? ন্‌ুরবাঈয়ের কথা সে শ্‌ুনেছে বইকি ! বাদশাহ মহম্মদশাহের আমলে ন্‌ুরবাঈ ছিল দিল্লীর শ্রেষ্ঠ বাঈ। দেওয়ানী আমের সামনে আসর পেতে ন্‌ুরবাঈয়ের ম্‌ুজরা হত। সারা দিল্লীর লোকের চোখে খোয়াব নামত।

ইরানের বাদশাহ শাহ নাদের পর্যন্ত ন্‌ুরবাঈয়ের র্‌ুপে গ্‌ুণে গানে নাচে এমন মোহিত হয়েছিলেন যে ময়্‌ুরতক্ত কোহিন্‌ুরের সঙ্গে তাকে ইরান নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সে খবরে সারা দিল্লী কাঁদতে বসেছিল। কিন্তু ন্‌ুরবাঈ হতে সে পারবে না। না। সে নবাবজাদার আরও কাছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল—নেহি নেহি নেহি ! তুমি খ্‌ুদা কসম বলেছ —খ্‌ুদার নামে কসম খেয়েছ নবাবজাদা—

—আঃ— ! একটা বিরক্তিস্‌ুচক চিৎকার যেন একটা বিস্ফোরকের মত ফেটে পড়েছিল সেই ম্‌ুহ্‌ুর্তে ; হাবসী সিপাহী বা সর্দারটি সজোরে ডান পা ঠুকে চিৎকার করে উঠেছিল। লোকটি সিপাহী নয়—পোশাকে যেন সম্ভ্রান্ত

কি কারণে তা ব্‌ুঝতে পারেনি গ্‌ুলবদ্‌নী। কিন্তু চমকে উঠে জড়িয়ে ধরেছিল নবাবজাদাকে। নবাবজাদা তার উচ্ছিষ্টহাতেই ম্‌ুখের আহার ফেলে দিয়ে তাকে ব্‌ুকে টেনে নিয়ে চেপে ধরে ছিল। এবং অভয় দিয়ে বলেছিল—পিয়ারী মেরী পিয়ারী—। আমার আঁখোকি রোশনি—আমার দিলবাগিচার ব্‌ুলব্‌ুল। ডর কিসের ? 'কালাশের' খানিকটা পাগল মেজাজের মান্‌ুষ ! তবে ও যার সিপাহী দ্‌ুনিয়াতে তার কোন দ্‌ুখ হয় না—কোন ডর হয় না। ওরই দৌলতে আজ আমি বাদশাহী কয়েদখানা থেকে পালাতে পেরেছি—ওরই দৌলতে আজ পিছনের সিপাহী-দের হাত থেকে ফসকে যেতে পেরেছি। ওই আমাকে বের করে ঘোড়ার উপর সওয়ার করে দিয়ে বলে দিয়েছিল—পালাও। যদি বাদশাহী ফৌজ পিছে ধাওয়া করে তবে কোন ফসলভরা ক্ষেতের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ল্‌ুকিয়ে পড়ো ; তার আগে ঘোড়ার পিঠের উপর ছ্‌ুরি দিয়ে খানিকটা চিরে দিয়ো। তাহলে ঘোড়া বেসওয়ারী হয়েও ছ্‌ুটবে। তুমি ল্‌ুকিয়ে থেকো ক্ষেতির ফসলের মধ্যে। তুমি ভয় করো না—আমি বাদশাহী সিপাহীর সঙ্গে থাকব। যেখান থেকে তুমি নিখোঁজ হবে সেখানেই আমি ঠিক গিয়ে হাজির হব। কালাশের ঠিক জবান রেখেছে তার। সে ঠিক এসেছে। ওকে তুমি ভয় করো না। ও আমার ধরমবাপ মনজ্‌ুর আলির দোস্ত। তার ডান হাত।

চুপ করে গ্‌ুলবদ্‌নী সব শ্‌ুনেই যাচ্ছিল। সে একটা বিচিত্র অবস্থা তখন তার। সামনে দাঁড়িয়ে কালাশের হাবসী, তাকে দেখে একটা ভয় তাকে একদিকে আচ্ছন্ন করছিল অন্যদিকে চৌদ্দ পনের বছরের কিশোরী গন্ধর্বী কুমারী ওই তর্‌ুণ কিশোরের আলিঙ্গনের মধ্যে যেন একটা আগ্‌ুনের উত্তাপ অন্‌ুভব করছিল যে উত্তাপে সে বিগলিত হয়ে যাচ্ছিল।

নবাবজাদা অকস্মাৎ তার ঠোঁটের উপর ঠোঁট রেখে একটি চুম্বন এঁকে দিয়ে বলেছিলেন—হাঁ পিয়ারী জবান আমি দিয়েছি কসম আমি খেয়েছি ; তার ইমান আমি ভাঙব না। চল তোমাকে নিয়ে আমি এখান থেকে এখুনি রওনা হয়ে যাই। ওই ঘোড়ার উপরেই তোমাকে তুলে নেব—আমার পিঠের সঙ্গে বেঁধে নেব। চলে যাব ঘাউসগড় পাখলগড়—কালই মসজেদে গিয়ে খুদার নাম নিয়ে তোমাকে সাদী করব। কালাশের—নূরবাঈ নেহি নূরমহল হবে আমার পিয়ারীর নাম। আমি জরুর একদিন বাদশাহ হব। আমার পিয়ারী হবে বেগম নূরমহল—

—নে—হি! একটা ক্রুদ্ধ গর্জন করে এগিয়ে এসেছিল কালাশের। আতঙ্কে এবার সচেতন হয়ে উঠেছিল গুলবদনী। নবাবজাদাও যেন ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। এবং ভয়ার্তভাবেই বলেছিল—কালাশের!

কালাশের বলেছিল—আমি তোমার বান্দা নই তোমার আমি গোলাম নই। তুমিই নিজে বল কি বলেছিলে? বল?

—তুমি আমাকে বাঁচাও—আমি তোমার কেনা হয়ে থাকব।

—আমি তোমাকে বাঁচিয়েছি কি না? বাতাও?

—হ্যাঁ বাঁচিয়েছ।

—তুমি তাহলে আমার কেনা কি না?

—হ্যাঁ। তাই হয়। কিন্তু—

—কিন্তু কিছু নেই নবাবজাদা। যতক্ষণ তোমাকে বাঁচিয়ে যাব রাখব ততক্ষণ তুমি আমার কেনা। শুনো। তোমাকে বাঁচিয়ে রাখব—তোমাকে আরামে রাখব—তোমাকে বাদশাহের বাদশাহ করব; তোমাকে শ্রেষ্ঠ ঔরৎ দেব; সব সব দেব যা চাইবে। শুধু এক কড়ার হ্যায়। এক কড়ার! খুদাকে মানবে না ইমানকে মানবে না, জবানের কোন দাম নেই—তা রাখবে না। এ লেড়কীকে সাদী তুমি করবে না। এ হবে তোমার হাতিয়ার। এই ছোকরীকে সামনে রেখে শিকার করবে শাহ আলম বাদশাহের শাহজাদাদের।

এবার চিৎকার করে উঠেছিল গুলবদনী! —নে—হি!

সে চিৎকার তার পুরা শেষ হয়ে গলা থেকে বেরিয়ে যেতেও পারেনি—সে ভয়ে চোখ বুজে থরথর করে কেঁপে মাটিতে বসে পড়েছিল।

গুলবদনী ফকীর গুরুকে বলেছিল—হজরত আমি তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম—দেখছিলাম তার কালো বড় মুখটার মধ্যে সেই হিংস্রতায় ঝকঝকে চোখ দুটো, বড় বড় সাদা দাঁত দুপাটি; ভয়ে একসময় চোখ ফিরিয়ে নিতে চাইলাম। চাইলাম সামনের দিকে—দেখলাম সাদা কুয়াশায় ভরে গেছে—যেন ধরিত্রির বুকের ভেতর আগুন লেগেছে, তার ধোঁয়া উঠে সব ভরে দিয়েছে—সে দেখেও ভয় লাগল—আমি মাটির দিকে তাকালাম। হজরত!

দুই হাতে মুখ ঢেকে শঙ্কর হজরত রহিমশার সামনে বসেও কেঁপে উঠেছিল।

হজরত তাকে বলেছিলেন—ভয় কি বেটী? কি ভয়? আমি রয়েছি।

গুলবদনী বলেছিল—হজরত, দেখলাম সেই 'কালাশের' হাবসী সিপাহীর পায়ের পাতা দুটো মানুষের পায়ের মত নয়। জানোয়ারের পায়ের মত। আমি আতঙ্কে চিৎকার করে উঠে অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

গুলবদনীর জ্ঞান ফিরেছিল একটা বিচিত্র নিষ্পেষণের যন্ত্রণার মধ্যে। তখন উপরে পাশে সব অন্ধকার। চাঁদনীর আলো নেই; অমৃতেশ্বর শিউজীর মন্দিরের চূড়া নেই

মন্দির নেই কুয়ো নেই। সব অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারের মধ্যে একটা অসহায়া মৃতপ্রায় হরিণীকে যেমন বাঘে ছিঁড়ে খায় তেমনি নৃশংসভাবেই তাকে কেউ ছিঁড়ে খাচ্ছিল। জানোয়ারের মত কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করেছিল তাকে, তার নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছিল তার কাঁচুলি তার সমস্ত আবরণ।

গভীর অন্ধকারের মধ্যে সে এক মর্মন্তুক স্মৃতি।

সে কয়েকবার মিনতিভরে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিল—খুদা কসম—নবাবজাদা জানবআলি কসম খুদাকি—শাহজাদা—

যতবার বলেছে ততবার বাঘ যেমন থাবা মারে তেমনি ভাবে থাবা মেরেছে তার মুখের উপর। আর চাপা গলায় গর্জে গর্জে উঠেছে—চুপ্ চুপ্ চুপ্ রহো! আঃ—চুপ!

কালাশেরের কোন সাড়া পায়নি। একবার হঠাৎ সেই মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যে তাকে সে দেখতে পেয়েছিল; কালাশের একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল; দেখছিল নয়, দুটো জ্বলন্ত চোখ দিয়ে যেন গিলছিল।

পাশে ছিল তার সে কুকুরটা। মাঝে মাঝে সেটা গর্জাচ্ছিল—অঁ অঁ শব্দ করছিল।

কথা বলেছিল কালাশের, শেষকালে; পূর্ণোদর বাঘের মতই যখন নবাবজাদা গোলাম কাদের তাকে ছেড়ে দিয়ে সরে যেতে চাচ্ছিল—তখন। সেই মুহূর্তে কালাশের বলেছিল—খতম্ কর দো সাব! শেষ করে দাও ওকে শেষ করে দাও। কি হবে ওকে রেখে। আমি বলছি তোমাকে, এ লৌণ্ডি খুদার নাম ভুলবে না। রহিমশার মুরিদা। ও ডাকছিল তাকে—শুনতে পাওনি তুমি? তাকে ও ডাকছিল। না হলে ও তোমাকেও শেষ পর্যন্ত ভজাতে চাইবে জপাতে চাইবে। আর বাঁচলে ও তোমাকে ভুলবে না। দাও ওকে শেষ করে দাও।

পরক্ষণেই গুলবদনী একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করেছিল পাঁজরার নীচে।

॥ সাত ॥

সেকেন্দ্রার সামনের খোলা জায়গায় যে বাগিচা, সেই বাগিচার একটি গাছের ছায়ায় বসে বৃদ্ধ ফকির আমাকে গল্প বলছিলেন। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। পাশে বসে ছিল আফজল। ফকীরসাহেবের আরও দু তিনজন মুরিদও বসে ছিল।

ইতিহাসের কথা আমি জানি। বাদশাহ শাহ আলমের জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী ইতিহাসে পড়েছি। সেই সময়ে হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা আমার মনের মধ্যে আলাদা দুটো চোখের সামনে ভাসছিল।

হিন্দুস্তান ফেটে চৌচির হতে চাচ্ছে; জল শুকিয়ে যাওয়া মজা পুকুরের তলার মত ফাটলের দাগে দাগে যেন সীমানাবন্দীর জরীপের শিকলের দাগ আঁকা হয়ে গেছে। গোটা দক্ষিণ আলাদা; পানিপথের পর বর্গীদের শক্তি ভাগ হয়ে পাঁচ টুকরো হয়েছে। পেশোয়া নামে মারাঠাদের নেতা। সিন্ধিয়া হোলকার গাইকোয়াড় নাগপুরে ভোঁসলা এরা সব আলাদা। ওদিকে হায়দ্রাবাদে নিজাম। রাজস্থানে রাজপুত রাজারা। পাঞ্জাব ছিনিয়ে নিয়েছিল আমেদশা আবদালী। আবদালীর পালা শেষ হল। শিখেরা উঠেছে সেখানে। আফগান নবাবেরা খামচে খামচে মাটি তুলে দখল করে বসেছে। রোহিলখণ্ড পুরা ছিল বাদশাহের খাস এলাকা—সে এলাকা দখল করেছিল রোহিলা আফগানেরা—এই গোলাম কাদেরের পিতামহ ইতিহাসবিখ্যাত নবাব নাজিবউদ্দৌলা, হাফিজ রহমৎ; এ ছাড়া

জালালাবাদে 'ওয়াক্‌জাই' পাঠান এলাকা গড়ে উঠেছে; লোহারীতে আফ্রিদি পাঠানেরা ঝাণ্ডা গেড়েছে; ঘাউসগড়ে নবাব নাজিবউদ্দৌলার আপন স্বজন 'উমরখেল' পাঠান বসেছে। ওদিকে ফারাক্কারবাদে নবাব বাঙ্গাশ; সুবা অযোধ্যা দখল করে বসে আছে নবাব সফদরজঙ্গের উত্তরাধিকারী নবাব সুজাউদ্দৌলা; নবাব সুজাউদ্দৌলাই দিল্লীর বাদশাহের উজীর। নবাব শাহজাদা আলিগহরকে সঙ্গে নিয়ে বক্সারে ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করে হেরেছে। তারপরও নবাব শাহজাদাকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিল। এখনও সুজাউদ্দৌলা বাদশাহ শাহ আলমের অসম্মান করে না বটে কিন্তু কোন খাজানা অযোধ্যা থেকে আসে না। উজীর সুজাউদ্দৌলা লক্ষ্ণৌএ বসে শরাব আর ঔরৎ নিয়ে মশগুল হয়ে আছে। ওদিকে বাংলা বিহার উড়িষ্যা আসাম চলে গেছে ইংরেজ ফিরিঙ্গীর হাতে। শাহ আলম আটাশ লক্ষ টাকায় ইংরেজকে দেওয়ানী দিয়েছেন।

দিল্লীতে লালকেল্লায় বাদশাহী তক্ত এগার বছর শূন্য হয়ে পড়ে ছিল। বাদশাহ শাহ আলম দিল্লী ঢুকতে পাননি। তাঁর মা জিনতমহল আর তাঁর বড়ছেলে শাহজাদা জোয়ান-ভক্তকে নজরবন্দীর মত আগলে রেখে বসেছিল এই নবাব নাজিবউদ্দৌলা।

জাঠরা তখন একরকম খতম হয়ে এসেছে।

দিল্লীতে বাদশাহী নেই। জলুস নেই। আছে শুধু বাঈপাড়ায় নাচ গান হল্লা; রাত্রে গলিঘুজিতে খুন; কখনও কখনও কোন মনসবদার কি সর্দারের ইনকিলাব। বাকী তলবের জন্যে বাজার হাট লুঠ। কোন মহল্লায় আগুন লাগানো। আর সারা দিনে দশ বিশটা খবর আসে, মাহাদজী সিন্ধিয়া তার বর্গী ফৌজ নিয়ে আগ্রা এসে পেঁাচেছে। কখনও খবর আসে গুজর ডাকাতেরা মীরাট থেকে আলিগড়, আলিগড় থেকে নাজিবাবাদ পর্যন্ত এলাকায় লুঠ চালিয়ে বেড়াচ্ছে। চণ্ডু গুজর লুঠ করেই নিরস্ত থাকে না আগুন জ্বালিয়ে সব ছাই করে দেয়। ওদিকে পাঞ্জাবে শিখেরা এক এক সর্দারের অধীনে জমায়েত হয়ে লুঠ চালাচ্ছে। টাকা লুঠ হয়, ঘর পুড়ে যায়, মা বোন বেটী কেড়ে নিয়ে যায়। শুধু তাই বা কেন? তখন ধর্মের নামে জাঠরাজা রতন সিং ব্রজমণ্ডলে চার হাজার কসবী ভাড়া করে এনে রাসযাত্রা করেছিল। নবাব সুজাউদ্দৌলা হাফিজ রহমতের বেটীকে লুঠে এনেছিল।

ফকীরসাহেব বললেন—না বাবুজী আমি আরও কিছু আগের আমলের কথা বলছি। বলছি কালাশেরের জন্মকালের কথা। নাদিরশাহ তখনও আসেনি। তখন দিল্লীর রাজার চৌক হাট ঘাট একেবারে রোশনাইয়ে ঝলমল; শরাবের ঢেউ বইছে। ব্যভিচারের আর শেষ নেই। সে আমল একটা বিশ্রী কাল,বড় খারাপ আমল। শহরে বাজারে বাবুজী ভোরবেলা দেখা যেত একটা কি দুটো সদ্যোজাত মরা ছেলে ন্যাকড়া ঢাকা পড়ে আছে। গৃহস্থীদের মধ্যে এমন পুরুষ অনেক ছিল যারা বিয়ে করা বউ বেচে দিত; পথে ছেড়ে দিয়ে আসত; বড় বড় ঘরের আমীরেরা রাজারা হারেমে অন্দরমহলে দু পাঁচ শো ঔরৎ রাখত। কেউ বেগম কেউ বাঁদী। এক একজনের আবার বিচিত্র শখ ছিল—তারা নানান জাতের বাঁদী কিনত। ঘরে রাখত। বাবুজী, এক হিন্দু সর্দারের এমনি শখ ছিল। সেই শখে সে কিনেছিল কাফ্রী বাঁদী। আর সে বাঁদী ছিল তার বড় পিয়ারী। এর পেটে হয়েছিল এক কালো ছেলে। দুর্দান্ত আর বদমাশ। আমীরের ছেলেতে মেয়েতে কম করে ছিল তিরিশ বত্রিশ জন। এক বিয়ে করা স্ত্রীর পেটের এক কন্যা ছিল। অপরূপ সুন্দরী। আর দুর্ভাগ্য যে বিয়ের পরই হল বিধবা। বিধবা বেটী এল বাপের ঘর। এরপর সেই বিধবা বেটী আর এই কালো বেটা একদিন ঘর ছেড়ে পালাল।

বাবুজী, বিয়ে করা স্ত্রীর পেটের মেয়ে আর রক্ষিতার ছেলে—সম্পর্কে ভাই বোন;

তারা পালাল বাবুজী। পালাল কামার্ত হয়ে। তাই বলছিলাম বাবুজী সে আমলটা ছিল বড় বিশ্রী কাল ; বড় খারাপ আমল। মানুষ যখন জানোয়ার বনতে যায় তখনই এমন হয়। যাক বাবু—এখন যা হল তাই বলি। এরা পালাল দেহের তাড়ায়। কিন্তু আমীরের মাথায় খুন চড়ল। বললে মাথা আন। এরা ঘর থেকে বেরিয়ে পালিয়ে প্রাণের ভয়ে ছুটতে লাগল। আজ এখান কাল ওখান। কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলে না। ওই মেয়েটা রূপসী ছিল। আর এই কাফ্রী বাঁদীর ছেলেটার ছিল না কোন মায়ামমতা। এই মেয়েটাকে সে বেচে দিল এক গোলামের কারবারীকে। মেয়েটার পেটে তখন এই 'কালাশের' এসে গেছে। মেয়েটা এসে পেঁছে গেল দিল্লী শহরে এক কসবীবালীর ঘরে। পেটে বাচ্চা নিয়ে বাঁদী কিনলে পেটের বাচ্চাটাকে বিনা পয়সায় গোলাম মেলে। কিন্তু ঔরৎ কিনে যারা কসবী করায় তারা তা কেনে না। কিন্তু মেয়েটার সুরত দেখে সেই ঘাঘী কসবীবালী কিনতে পিছোয়নি। সে তাকে কিনেছিল। লেড়কা হলে গোলাম করে বিক্রি করবে। লেড়কী হলে তার নিজের কারবারে লাগাবে।

মাসকতক পরে এই বাচ্চা পয়দা হল বাবুজী, পাদুটোই নীচের দিকে দুমড়ানো মোচড়ানো এ বাচ্চা কে নেবে? নিয়ে কি করবে? মেরে ফেলতে চেয়েছিল কসবীবালী। কিন্তু তার পা জড়িয়ে ধরে ওই মাটার বুকচাপড়ানি কান্নার জন্যে তা পারেনি। ভেবেছিল —ঠিক আছে। ওকে খোজা করে বিক্রি করবে। বাচ্চাটা শত অযত্নে মরল না বাবুজী— দু তিনবার বেমারী হল বাবুজী, একবার খুব খারাপ ধরনের হাম হয়েছিল—তাতে লেড়কারা বাঁচে না—সে হাম হয়েও বাঁচল কালাশের।

কালাশের তো মরবার জন্য পয়দা হয়নি বাবুজী। কালাশের পয়দা হয়েছিল খোদার দুনিয়াকে জবরদখল করে নেবার জন্যে। দুনিয়া থেকে খুদার নাম ইমানের দাম ধরমকে নিশান সব মুছে দেয় উপড়ে দেয়—জিন্দিগীর আওয়াজ পুরা বদলে দেয়। ওই যে কালাশের গোলাম কাদেরকে বলেছিল—তোমাকে আমি বাঁচিয়েছি, বাঁচাব ; তোমাকে দুনিয়ার সেরা ঔরৎ দেব—সোনা দেব দানা দেব—বাদশার বাদশা বানাব—কিন্তু তুমি খুদাকে মানতে পাবে না ইমানকে রাখবে না জবানের দাম দেবে না ধরমের নিশানকে নামিয়ে ছিঁড়ে দেবে ; ওরই জন্যে ওর পয়দা হয়েছিল। ও মরবে কেন? এক বাপের ছেলে আর মেয়ে, মা ভিন্ন—এরা দুনিয়ার সব জায়গায় ভাই বহেন। ভাই বহেন বাবা বেটী লেড়কা মা এসব জানবারে বাছে না বাবুজী। দুনিয়ার সেই প্রথম কাল থেকে আজ এ চলে আসছে সারা দুনিয়া জুড়ে ; জানবার পয়দা হচ্ছে জানবার মরছে ; তবুও সেই দিন-রাত হচ্ছে— খুদা সেই মালিক আছেন দুনিয়ার। কিন্তু মানুষের মধ্যে এ কানুন বদল হয়ে গেল। মানুষই বদল করলে। জানবারের খুদা ছিল না। মানুষ খুদাকে পেলে, আল্লাহতায়লার ফিরিস্তা এসে পয়গম্বরকে ডাক দিয়ে বলে গেলেন। দিয়ে গেলেন মানুষের কানুন। পয়গম্বরই মানুষকে দিয়ে গেলেন ইমান আর জবান। জানবার যা করে মানুষ তা করে না—তার উলটো করে বলেই মানুষ মানুষ। জানবার পরের খানা কেড়ে খায়—মানুষ মুখের খানা আর একজনকে দেয়। তাই সে মানুষ।

তামাম মানুষেরা যে বিলকুল পয়গম্বরের হুকুমৎ মেনে চলে, তা চলে না। তার খেলাপ তারা করে। তছরুপও করে। খুদাকেও ভোলে ইমানও রাখে না জবানও খেলাপ করে। বাবুজী, দুনিয়াতে আদমী আর ঔরৎ মিলেও মানুষের কানুন খেলাপ করে—ভাই বহেন, বাপ বেটী পর্যন্ত পাপ করে গুনাহ করে বাবুজী। এ করে বাবুজী। লাখ লাখ এমন গুনাহ হয় দুনিয়াতে—কিন্তু ওই যে মানুষ মনে মনে মানে খুদাকে, মানে ইমানকে ধরম্ নিশানকে খাড়া রাখে, রাখতে চায় তাতেই পাপ হেরে যায়—

তাতেই দুনিয়াতে খুদার রাজ কায়েম থেকে যায়। কিন্তু এমন কালও আসে জনাব—এমন আমলেরও পর্দা ওঠে বাবুসাহেব যে-যুগে যে-কালে 'কালাশের' এসে আওয়াজ তুলে সওয়াল করে—কি হয়? ভাই বহেন যদি মিলেই যায় তাতে কি হয়? কি হয় মানুষের জান নিলে? খুন করলে? কি হয় শরাব খেয়ে পাগল হয়ে গেলে? কি হয় খুদাকে না মানলে? কি হয় জবানের দাম না দিলে? তখনই বুঝতে হয় বাবুজী দুনিয়া ওলটাচ্ছে। দুনিয়ার মানুষের দুনিয়া মরছে—মানুষ জানোয়ার বনছে। তখন বাবুজী পানির চেয়ে শরাব ভাল লাগে বেশী। শরাব চলে বেশী। তখন বাবুজী রোটির চেয়ে আওরতের খোঁজে মানুষেরা ছুটে বেড়ায় বেশী। তখন আর কোন চিন্তা থাকে না—আর কোন সাধ থাকে না খেদ থাকে না ঔরতের সাধ ঔরতের খেদ ছাড়া। মেয়েদেরও তাই হয়। তার ছেলে ফেলে দেয়—খোঁজে পুরুষ। তারা বাপ ছাড়ে মা ছাড়ে সব ছাড়ে—খোঁজে পুরুষ। বাবুজী, সারা দেশে তুমি জনে জনে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর—খেদ কিসের? ক্ষোভ কিসের? দেখবে, ঔরৎ বলবে পুরুষের—পুরুষ বলবে ঔরতের!

তা না হলে বাবুজী শাহ নাদের যখন ঢুকল হিন্দুস্তানে— আটক পার হল তখন হিন্দুস্তানের পাঠান মুঘল রাজপুত জাঠ সিপাহী সিপাহসালার আমীর উজীর খান-ই-খানান থেকে খুদ বাদশা মহম্মদশা তক নুরবাঈয়ের নাচে গানে এমন মশগুল যে সিপাহীদের তৈয়ার হবার জন্যে হুকুম দিতে ফুরসত পর্যন্ত মিলল না।

বাবুজী, তামাম হিন্দুস্তান তখন ব্যাভিচারে অতৃপ্তির খেদ নিয়ে গানা গাইছে ইনিয়ে বিনিয়ে। পচ ধরে গেছে তখন দেশ জুড়ে; পচতে আরম্ভ করেছে পনের আনা মানুষ। সেই সুযোগ পেয়ে নাদিরশাহ এসে দিল্লী শহরে খুন খুসরোজ খেলে চলে গেল। লালকিল্লার পাশে ইরানী ইরাকী পাঠান সিপাহীরা আমীর রাজা থেকে গৃহস্থী গরিবের ঔরতদের বকরীর মত বেঁধে টেনে নিয়ে গিয়ে তামাম রাতভর ওই গোলাম কাদের যেমন বাঘের মত গুলবদনীকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছিল তেমনিভাবে তাদের টুকরো টুকরো করে ছিঁড়েছিল। আর তাদের চিৎকারে দিল্লীর আকাশ ভরে গিয়েছিল।

এসব তুমি জান বাবুজী আমি জানি। কিতাবে পড়েছি। আমাদের গুরুর গুরু রহিমশাহ এ আপনা আঁখসে দেখেছিলেন বাবুজী।

এই সময়েই বাবুজী দিল্লীর বাঈমহল্লার সামনের রাস্তা এক হাঁটুভর রক্তের কাদায় ভরে গিয়েছিল। দিল্লীর সেই কসবীবালীর বাড়ি থেকে সেই লেড়কা 'কালাশের' সেই খুনী রাতে নিপাত্তা হয়ে গিয়েছিল। সেই ভীষণ রাত্রে দিল্লীর সেই আঁধারের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে দিয়েছিল।

নাদিরশাহী খুন আর লুঠ আর ঔরৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা সে দুই চোখ ভরে দেখেছিল। আর বিচিত্রভাবে ওই ইরানী সিপাহীদের কাছে বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠে সে সারা কসবীপাড়ার ঔরৎ আর দৌলতের খবর তাদের জানিয়েছিল।

তার মালকিন কসবীব্যবসাবালীকে যখন খুন করে তখন সে দাঁড়িয়ে ছিল—দেখে হেসেছিল। বাড়ির মেয়েগুলোকে তার সঙ্গে তার মাকেও যখন ইরানী সিপাহীরা ভেড়ীর মত দড়িতে বেঁধে নিয়ে যায় তখনও সে ছিল তাদের সঙ্গে।

ফিরেছিল সে পাঞ্জাবের মাঝপথ থেকে। তার বেমারী হয়েছিল বলে ইরানী সিপাহী তাকে পথের ধারে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল কিন্তু সে মরেনি। কোনরকমে ভাল হয়ে উঠেছিল এবং কিছুদিন পর সে আবার দিল্লী ফিরে এসেছিল। তখন সে খোজা হলেও কারুর কেনা গোলাম নয়। সে মুক্ত।

দিল্লীর সেই কসবীবাজারের পাশে সে পেতেছিল তার জীবনের বাসা। পেশা করেছিল

সেই কসবীপাড়ার খরিদ্দার ধরা। তার সঙ্গে কড়া নেশার দালালি।

তখন থেকেই কালাশের বলত—ঝুট বাত, ঝুট হ্যায়। খুদা ঝুট ইমান ঝুট জবানের দাম ঝুট বেহেস্ত ঝুট—সব ঝুট। পানির চেয়ে শরাব আর রুটির চেয়ে আওরত সস্তা করে দাও—বেহেস্ত তৈরী হয়ে যাবে এই মাটির দুনিয়ায়।

নাদিরশাহের পর আমেদশাহ আবদালী। একবার নয় বারবার। তারপর বর্গী জাঠ। এরই মধ্যে সে বড় হল বাড়ল; পানিপথে যখন বর্গীদের সঙ্গে আবদালীর লড়াই হল তখন সে পুরো জোয়ান। বয়স তখন তিরিশের কাছে। শাহ আবদালীর সিপাহীরা দিল্লী থেকে মথুরা গোকুল পর্যন্ত লুঠ করে আগুন ধরিয়ে মানুষকে কেটে মুর্দা আর মুণ্ডুর পাহাড় বানিয়ে মুলুকটা শ্মশান করে দিয়ে যখন যায় তখন কালাশের তাদের সঙ্গে ছিল।

কারবার তখন তার জমাট হয়ে উঠেছিল। আপনাআপনি হয়ে ওঠেনি নিজের এলেমে সে জমিয়ে তুলেছিল।

লাহোর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল সে শাহ আবদালীকে তসলীম দিতে, কুর্নিশ জানাতে। শাহ আবদালীর ধরমবেটী মুঘলানি বেগমের সঙ্গে তার আঁতাত আগে থেকেই ছিল। দিল্লীর বাদশাহী হারেমের আর বাদশাহ গোষ্ঠীর কার ঘরে কেমন খুবসুরত নওজওয়ানী বেটী আছে, কার ঘরে কত দৌলত আছে এসব খবর সে মুঘলানি বেগম মারফৎ শাহ আবদালীর কাছে পৌঁছে দিয়ে ইনাম পেয়েছিল। যেখানে আফগান সিপাহীরা দৌলতের জন্যে বাড়িঘর ভেঙেছে খুঁড়েছে সেখানে সে থেকেছে এবং শেষ পর্যন্ত কুড়িয়ে বাড়িয়ে একটা ভাগ নিয়েছে। মথুরা পর্যন্ত এলাকায় প্রথম দফায় আবদালশাহী পল্টন এসেছে বাঘের সঙ্গে নেকড়ে বাঘের মত; তারা চলে গেলে তার পিছনে এসেছিল নাজিবউদ্দৌলা রোহিলা পল্টন নিয়ে শেয়ালের পালের মত। তাদেব মধ্যে মিশে কালাশের ঘুরেছে; বাঘ নেকড়ে শেয়ালের দলের পাশে সে ঘুরত হিন্দুদের শ্মশানের মড়া খাওয়া কুকুরের মত। পচা আধখাওয়া লাশগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতো; হাড়ে কঙ্কালে লেগে থাকত যে মাংস তাই চেটে চেটে তুলত।

শ্মশান-কুকুরেরা যেমন চিতার কয়লা নখে করে খুঁড়ে খুঁড়ে দেখে তেমনি করেই কালাশের ঘুরে ঘুরে দেখত পুড়ে যাওয়া অঞ্চলের ঘরবাড়ির ছাই সরিয়ে পচে যাওয়া মুর্দাগুলিকে নেড়ে চেড়ে। পেতো বইকি কিছু কিছু। কিছু কিছু কেন মধ্যে মধ্যে অসামান্য দুর্লভ বস্তু পেয়েছে। ছাইয়ের মধ্যে পেয়েছে গলে যাওয়া সোনার টুকরো, জহরত; পচা মুর্দার গায়ে থেকে পেয়েছে গয়না; আংটি, হার, কানের আভরণ, নাকের আভরণ। দু একটা পোড়া বাড়ির মধ্যে অভাবিতভাবে মোহরের হাঁড়িও পেয়েছে। মরা মানুষের পোশাক থেকে পেয়েছে দামী জরি তার সঙ্গে জহরত।

এরপরই সে হল পাকা রকমের কারবারী। লালকিল্লার মীনাবাজারে সে খুলে বসল এক দোকান। বেচত সে হরেক রকমের জিনিস। প্রধান ছিল পোশাক। মসলিন রেশম পশম; বানারসের রেশম বাংলার মসলিন কাশ্মীরী শাল পশম; তার সঙ্গে বেচত ফিরিঙ্গীদের তৈরী শরাব কড়া আরক খাঁটি আফিং—আরও হরেক রকমের জরিবুটী সে রাখত। আর কিনত সে বাদশাহের হারেমের এবং বাদশাহের জ্ঞাতগোষ্ঠীর বাড়ির পুরানো পোশাক; যে পোশাক থেকে সে পেত সোনা রুপোর জরি মুক্তা পান্না পোখরাজ হীরার কুচি, যা বসানো থাকত জরিদার নকশার সঙ্গে।

বাদশাহের হারেম থেকে বাদশাহের জ্ঞাতগোষ্ঠী যারা কেল্লার বাইরে চৌক অঞ্চল থেকে কেল্লার আশেপাশে আপন আপন হাবেলীতে থাকত, পুরানো কিল্লাতে থাকত তাদের অবস্থা তখন সাধারণ গৃহস্থীদের থেকেও শোচনীয়। বাদশাহী দপ্তর থেকে তাদের মাসোহারা মিলত না নিয়মিত; মধ্যে মধ্যে রসদ পর্যন্ত আসত না। তারা তখন এই সব পুরানো

পোশাক লুকিয়ে রাখা গয়না বের করে বিক্রি করত, কিনত কালাশের।

তাছাড়া বাদশাজাদাদের জোওয়ানীর শখ ছিল। বাঈজীপাড়ায় যাবার জন্যে টাকার দরকার হত!

বেগমদের অনেকের গোপন দান ছিল; দেনাও ছিল।

কালাশের কারবার খুলেছিল এই খরিদ্দারের বাজার নিয়ে। বাদশাহ থেকে উজীর নাজীর আমীর সকলের সঙ্গে তার তখন আলাপ হয়েছে। পুরানো বাদশাহ ছোটা আলমগীরের সে প্রিয়পাত্র ছিল।

বুড়ো ছোটো আলমগীর ত শরাব ছুঁতো না আফিং খেতো না, কোরান পড়ত, সব কিছুতে নকল করত আসল আলমগীরকে; কিন্তু বুড়োর ছিল ঔরতের ভুখা। বুড়ো বাদশা হয়েই ক্ষেপেছিল মহম্মদশাহের বেটী ষোলো বছরের মেয়ে হজরত বেগমকে বিয়ে করবে বলে। শেষ হজরত বেগম বিষ খাবে বলে ভয় দেখিয়ে রেহাই পেয়েছিল কালাশের হজরত বেগমকে ফেলে দিয়েছিল আমেদশা আবদালীর হাতে। ভারী মজা লেগেছিল কালাশেরের! কালাশের আলমগীর বাদশাকে ছোকরী বাঁদী যুগিয়েছে।

নতুন বাদশাহ শাহ আলমেরও প্রিয়পাত্র সে।

বাদশাহ শাহ আলম শরাব খান না আফিং খান। সে আফিং সে যোগায়।

কড়া তেজী আফিং তার। আফিং ভিন্ন বাদশার নেশা জমে না।

মধ্যে মধ্যে খুবসুরত বাঁদী পেলে বাদশাহের সামনে হাজির করে। বাদশাহকে ঠিক ব্যাভিচারী বলা চলে না। বাদশাহ ধর্মের আইন মেনে বেগম রাখেন। সেই আইনমত পরস্তার রাখেন।

আরও একটা কারবার তার আছে। অল্পবয়সী বাদশাজাদাদের সে ছোকরী যুগিয়ে থাকে। বাঈ নয় কসবী নয়। পথে যারা ভিক্ষে করে, গরিব, তাদের মধ্যে ছোকরী দেখে দেখে তাদের এনে কিল্লার একটা গোপন অংশ তাদের যোগান দেয়।

পয়সা টাকার জন্যে নয়, এটা ছিল তার শখ তার আমোদ।

বাদশাহী হারেমের নাজীর খোজাসর্দার মনজুর আলির সঙ্গে তার জমাট দোস্তি এই নিয়ে।

ফকীরসাহেব বললেন—বাবুজী, আমার গুরুর গুরু সিদ্ধফকীর আমাদের সাক্ষাৎ পীর হজরত রহিমশাহের দুটো চোখে ছাড়া আরও একটা চোখ ছিল। সেই চোখ দিয়ে তিনি দেখতে পেতেন আদমীর ভিতরে যে আসলে আদমী তাকে, দুনিয়ার মধ্যে যে আর এক দুনিয়া আছে সেই দুনিয়াকে; নিশুত রাতে কি জনহীন নির্জনে শুনতে পেতেন বাতাসের মধ্যে যে কথা ভেসে যায় ভেসে আসে সেই সব কথা। এমন কি দিন আর রাত যে পায়ে পায়ে পায়ে পায়ে সকাল থেকে সন্ধ্যে এবং সন্ধ্যে থেকে সকালের দিকে চলে তার আওয়াজও তিনি শুনতে পেতেন।

তিনি গুলবদনীর মাথার শিয়রে বসে তার কথা শুনছিলেন—গুলবদনী কথা শেষ করে বললে পাঁজরায় যন্ত্রণা অনুভব করে সে অজ্ঞান হয়ে গেল। ওই নবাবজাদা তাকে ছুরি মেরেছিল ওই কালাশেরের হুকুমে। সে তখন, খুদা মেরি জান বাচাও! হে ভগবান! বলে অজ্ঞান হয়ে যেতে যেতে যেন শুনেছিল দূর থেকে রহিমশা হজরতের গলার আওয়াজ।

হজরত রহিমশা শুনে বলেছিলেন—হাঁ বেটী তোর ওই ডাক আমার কাছে মালিক

আল্লাহতায়লা পেঁছে দিয়ে বলেছিলেন—সাড়া দাও রহিমশা। আমি ঘুমোচ্ছিলাম—উঠে বসেছিলাম। সারা রাত্রি আর ঘুমোইনি। ভোর ভোর উঠে চলে আসছি। বিপদ কেটেছে বেটী। আর ডর নেই।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলেন—তোর বুকের উপর আমার দেওয়া তাবিজ ছিল। সেই তাবিজের জন্যেই ছুরি পাঁজরায় বসবার সময় কলেজার থোড়া পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে। ওই তাবিজের জন্যেই বেটী, খুদা ভগবানে তোর মতির জন্যেই কালাশের তোকে খুন করতে বলেছিল নবাবজাদাকে।

নবাবজাদা গোলাম কাদের কালাশেরের কাছে নিজেকে বেচেছে বেটী। তার হুকুম তাকে শুনতেই হবে।

একটুকরো বিচিত্র এবং বিষন্ন হাসি ফুটে উঠেছিল হজরতের মুখে। বলেছিলেন—বেটী, শুনে তোর দুখ হল ?

চুপ করেই শুয়ে ছিল গুলবদনী। ওই কটি কথায় সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। হজরত যেন কথা কয়টার ধাক্কায় ওই পনের ষোল বছরের মেয়েটির ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিলেন।

তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে হজরত আবার বললেন—মৎ রোও বেটী। কেঁদো না। না না। ভুলে যাও বেটী। ওকে তুমি ভুলে যাও। গোলাম কাদেরকে ভুলে যাও। ওর রূপ যাই হোক—ওর দুরন্তপনা ওর দুঃসাহস যতই হোক—ও নওজোয়ান তোমাকে প্রথম জোয়ানীর স্বাদ দিয়েছে, তা দিয়ে যাক ; ওকে তোমাকে ভুলতেই হবে।

গুলবদনীর চোখের জল কিছুতেই বাগ মানছিল না। হজরতের পায়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সে শুয়ে ছিল, এবং চোখ থেকে ধারা গড়াচ্ছিল। এ ছাড়া বাবুজী, লেড়কীর সমস্ত শরীরে কোন নড়াচড়া ছিল না, এমন কি শ্বাসা পর্যন্ত মালুম হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল কি মাখনের মত নরম ফুলের মত খুবসুরত ওই লেড়কী যেন পাথর বনে গিয়েছে।

হজরত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—বেটী, আমার কথা বিশ্বাস কর। 'কালাশের' তো মানুষ নয়—মানুষের দেহে ও খুদ্ শয়তান।

সভয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেছিল গুলবদনী।

গুরু বলেছিলেন—আমি তো ঝুট বলি নে মা। আর তোমরা যা দুনিয়াতে দেখতে পাও না, পয়গম্বর রসুলের মেহেরবানিতে খুদাতায়লার দয়াতে তাও আমি দেখতে পাই। আমি কালাশেরকে দেখেছি। তার ভিতরের শয়তানকে দেখেছি। বেটী, তখন ওর বচপন—একেবারে বাচ্চা ছেলে। ওই কসবীবালীর বাড়িতে ওর তখন ভারী বেমার। মরে মরে। তখনই ও মরল আর শয়তান ওর ভিতরে ঢুকল। দুনিয়াতে শয়তান এমনি করেই এক একটা মানুষের দেহ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বাবুজী, এ নিয়ে তকরার করলে আমি নাচার। তবে এইটুকু বলতে পারি এর থেকে সত্য কথা আর হয় না বাবুজী। এ কথা আমার নয়। খুদ গুরুর গুরু হজরত রহিমশাহ বলে গেছেন !

॥ আট ॥

—এক একটা জিন্দগী আসে বাবুজী যে আমলে মানুষেরা আওয়াজ তোলে—খোদা মুর্দাবাদ ভগবান মুর্দাবাদ। তখন শয়তান শতরঞ্জির ছক পেতে বসে খোদাকে ডেকে বলে—তোমার সঙ্গে শতরঞ্জি খেলব—এস। যে জিতবে দুনিয়া তার।

ফকীর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—তোমাদের মহাভারতে এমন এক

পাশাখেলা আছে শুনেছি। যে খেলায় শয়তানী জাদুতে গড়া হাড়ের পাশা হুকুম শুনেছিল শয়তানের মুরিদের। হেরে গিয়েছিল ভগবানকে যারা মানে তারা। তুমি জরুর জান বাবুজী।

হেসে বললাম—জরুর জানি।

—এও তাই একরকম বাবুজী। শয়তানের শতরঞ্জির ছক থেকে বাদশা উজীর ফিল ঘোড়া নাও সিপাহী সব ঘুঁটি শয়তানের জাদুতে তৈরী। দুনিয়ার দাবিদারি নিয়ে যে শতরঞ্জ খেলা তার ছক হল এই ধরত্রীর বুক আর ঘুঁটি হল মানুষ। এই মানুষকে প্রথম শয়তান কেনে। যেমন বাজারে গিয়ে আমরা বান্দা কিনি বান্দী কিনি বোকরা বোকরী কিনি তেমনিভাবে সে কেনে।

বাবুজী, দিল্লী শহর আর চারপাশের এলাকাই তখন শতরঞ্জির ছক হয়ে উঠেছে। এক দান খেলা উঠছে আবার নতুন দানের খেলার ঘুঁটি সাজানো হচ্ছে। শয়তান প্রতিদানেই নতুন নতুন ঘুঁটিগুলোকে ছকের উপর এনে বসিয়ে চালাচ্ছে। নতুন দানের বেলায় গোলাম কাদের নিজেকে বিক্রি করে শয়তানের ঘুঁটি হয়ে উঠেছিল সেই দিনই। সেই দিন সকালেই।

সেই দিন সকালেই বাদশাহের হাত থেকে গোলাম কাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছিল এই কালাশের। না হলে বাদশাহ হয়তো গোলাম কাদেরের গর্দানই নিয়ে বসতেন। নাজিবউদ্দৌলা শাহজাদা আলিগহরের দুশমনি করে শাহজাদাকে এগার বছর দিল্লী ঢুকতে দেয়নি। বাদশাহ আলমগীরকে গাজিউদ্দিন খুন করলে; তক্ত খালি হল; সারা হিন্দুস্তান জানলে বাদশাহ হলেন শাহজাদা আলিগহর; তাঁর নাম হল শাহ আলম। কিন্তু তক্ত খালি রইল। বাদশা রইলেন এলাহাবাদ কেল্লায়। ফিরিঙ্গীর সিপাইরা তাঁকে পাহারা দেবার নাম করে ঘিরে আটকেও রইল। ওদিকে মীরবক্সী নাজিবউদ্দৌলা দিল্লী দখল করে বসে রইল; বাদশাহের মা জিনতমহল, বাদশাহের ছেলে জোয়ানভক্তকে দিল্লীতে নজরবন্দী করে রাখলে; কিন্তু বাদশাহ শাহ আলম ঢুকতে পেলেন না দিল্লী। দেয়নি ঢুকতে নাজিবউদ্দৌলা—গোলাম কাদেরের বাবার বাবা।

নাজিবউদ্দৌলা দুর্দান্ত রোহিলা আফগান। শাহ আলম দিল্লীর তক্তে বসে কাফের বর্গী আর জাঠদের ডেকে এনে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে বলে সন্দেহ ছিল তার। আর উজীর অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার তাঁবেদারীর কথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখত না। উজীর সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে বক্সার গিয়ে ফিরিঙ্গীর সঙ্গে লড়াইয়ে হেরেছে। উজীর সুজাউদ্দৌলার কথায় উঠছে বসছে। সেই সুজাউদ্দৌলা রোহিলা আফগানদের সব থেকে বড় দুশমন। সুতরাং নাজিবউদ্দৌলা শাহ আলমকে দিল্লী ঢুকতে দেয়নি।

দীর্ঘ এগার বছর পর খবর এল নাজিবউদ্দৌলা 'গুজর' গেলেন।

বাদশা শাহ আলম তখন এলাহাবাদ কিল্লায় বাস করছেন। খুশী হয়েছিলেন বাদশাহ। যাক এবার দিল্লী যাবেন যেতে পারবেন। তিনি নাজিবউদ্দৌলার ছেলে জবিতা খাঁকে মীরবক্সীর নোকরীনামা তার সঙ্গে দামী পোশাক পাঠিয়ে বলেছিলেন—মীরবক্সী হলে তুমি, এবার তোমার বাদশাহের দিল্লী যাবার বন্দোবস্ত করো।

খান-ই-খানান জবিতা খাঁ নাজিবউদ্দৌলার পরে বাদশাহের মীরবক্সী। রোহিলখণ্ডে সাহারানপুর নাজিবাবাদ গড় ঘাউসগড় গড় পাখলগড় থেকে মীরাট আলিগড় পর্যন্ত বাদশাহী খাস মুল্কের জায়গীর মনসবভোগী জবিতা খাঁ—শহর দিল্লীর মালিক হয়ে বসে আছে জবিতা খাঁ—সে বাহালী খতখানা নিয়েছিল মীরবক্সীর পোশাকও নিয়েছিল। পোশাকটা পরে কয়েকটা তোপও দেগেছিল কেল্লার বুরুজ থেকে। তারপর বাদশাহের লোককে গিধ্‌ড় উল্লুক বলে মজা মস্করা করে তাড়িয়ে দিয়েছিল দিল্লী থেকে।

হিন্দুস্তানের নতুন মীরবক্সী খান-ই-খানান জবিতা খানের সে কাছাইরীতে 'কালাশের' উপস্থিত ছিল। সে সাবাস দিয়েছিল খান-ই-খানানকে। জবিতা খাঁকে কালাশের ভাল লাগত। জবিতা খাঁ নামে মুসলমান কিন্তু কাজে সে কোন ধরমকে মানত না। পয়গম্বর রসুল এমন কি খুদাতায়লার নাম নিয়ে ঝুটা বলতে তার বাধত না। ভালবাসত শরাব ভালবাসত ঔরৎ; তার সঙ্গে খেতো আফিং। কালাশের তাকে এই তিন ফরমায়েশ মিটিয়ে যেতো। বাবুসাহেব, জবিতা খাঁ বাদশাহের বহেন খয়রুন্নিসা বেগমের দিকে হাত বাড়িয়েছিল। কালাশের মনজুর আলি তাকে সুবিধা করে দিয়েছিল। কিন্তু এর পরই দান উলটে গেল।

—বাবুজী, কিতাবে তুমি নিশ্চয় পড়েছ যে এবার পাশার দান উলট্ গিয়েছিল। জবিতা খাঁ বেচারা বাদশাহের দূতের অপমান করে তাড়িয়ে দিয়ে ভাল করেনি। এর ফল হয়েছিল উলটো। বাদশাহ শাহ আলম কড়া আফিং খেয়ে বেগমমহলে বসে যখন আপসোস করছিল —আরও কখনও বা বলছিল আমি এবার নিজের হাতেই খুন হয়ে যাব নয়তো জওহর খাব আর বেগমরা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল তখনই একজন বান্দা এসে খবর দিয়েছিল মারাঠা মুল্ক-এর সিন্ধে মহারাজের কাছ থেকে চিঠ্ঠি নিয়ে এক সওয়ার এসেছে। সে চিঠ্‌ঠি খুদ বাদশাহ ছাড়া আর কারু হাতে দেবে না। হুকুম নেই। মাহাদজী সিন্ধিয়া! মারাঠা এলাকায় মাহাদজী সিন্ধিয়া সব থেকে ছিল শক্তিমান বাবুজী। বাদশাহ বান্দার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন কি লিখেছে সিন্ধিয়া? কি লিখতে পারে?

টাকা? এই এলাহাবাদ কেল্লায় তাকে একান্ত অসহায় অবস্থায় পেয়ে তার কাছে টাকা দাবি করেছে?

বিশ্বাস তো নেই! হায় নসীব! হায় কিসমৎ! হায় দিল্লীর বাদশাহী!

তবু ফিরিয়ে দেবার উপায় নেই। ফিরিয়ে দেওয়া উচিত নয়। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—কে এসেছে নিশান নিয়ে?

—এক মারাঠা ব্রাহ্মণ। রামজী রাও।

—কে সে? মারাঠা দরবারে কি মাহাদজী সিন্ধিয়ার দপ্তরে কোন কাম করে? ছোট নোকর? না বড় নোকর কেউ?

—আমীর আদমী জাঁহাপনা।

—হুঁ। খান-ই-খানান হাসমউদ্দিন সাহেবকে খবর দাও, নজফ কুলিকেও খবর দাও। সৈফুদ্দিনকেও খবর দাও।

—জাঁহাপনা, ব্রাহ্মণ রাওসাহেব বলছেন তিনি গোপনে চিঠি আপনার হাতে দেবেন। থাকতে থাকবে শুধু আপনার দেহরক্ষী।

—মিরজা নজফ খাঁকে ডাকো। সেই থাকবে আমার দেহরক্ষী হয়ে।

খুদা মেহেরবান, পয়গম্বর রসুলের অযাচিত করুণা, মাহাদজী সিন্ধিয়া টাকা দাবি করে নাই, কোন বদমতলব করে খত সে লেখেনি। সে বাদশাহকে লিখেছিল—"দিল্লীর বাদশাহের বাদশাহী হিন্দুস্তানের কোন লোক অস্বীকার করে না। হিন্দুস্তানের হিন্দুরা শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ জালালউদ্দিন আকবরশাহকে বলত জগদীশ্বরের প্রতিনিধি, দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা। মারাঠারা বাদশাহের দুশমনকেই হঠাতে চায়। বাদশাহকে তারা শ্রদ্ধা করে—তারা তাঁকে সারা হিন্দুস্তানের মালিক বলে মানে। যতদিন বাদশাহ হিন্দু এবং মুসলমানকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন ততদিন তাদের কোন প্রতিবাদ নাই।

"বাদশাহকে সাহায্য করবার জন্যই বর্গী সৈন্য নিয়ে আমরা উত্তর ভারতে ছাউনি গেড়ে বসে আছি।

"আফগানিস্তানের আফগানেরা বাদশাহী মুল্ক দখল করেছে, রোহিলখণ্ডের পাঠানেরা

বাদশাহী খাস ইলাকা দখল করে আছে, বাদশাহ হিন্দুস্তানের মালিককে দিল্লীতে ঢুকতে দেয় না—এ বর্গীরা বরদাস্ত করতে পারে না।

"জাঁহাপনা মালিক হয়েও আজ এক যুগ দিল্লী থেকে অপরাধীর মত নির্বাসিত হয়ে রয়েছেন। এক রোহিলা পাঠানেরা ছাড়া হিন্দুস্তানের কেউ এ পছন্দ করে না—এ তারা বরদাস্ত করতে পারছে না। মালিক ছাড়া মুল্ক—সে মুল্কের কোন ইজ্জৎ নেই। এ হিন্দুস্তানের মানুষের কাছে লজ্জার কথা।

"আমি মারাঠা ফৌজ নিয়ে শাহানশাহকে দিল্লীতে নিয়ে গিয়ে তখ্‌ত্‌নাসীন করতে তৈয়ার আছি।

"শাহ-ইন-শাহের সম্মতি পেলেই এক সপ্তাহের মধ্যে দিল্লী দখল করবে বর্গী ফৌজ বাদশাহের নামে। তারপর বাদশাহকে আমরা নিয়ে গিয়ে দিল্লীর তখ্‌তে বসিয়ে সকল কাজে বাদশাহের সাহায্য করব।"

বাদশাহ বলেছিলেন—ইয়া খুদা মেহেরবান!

মাহাদজী সিন্ধে মিথ্যে আস্ফালন করেনি। সে সাত দিনের মধ্যে না হোক বাদশাহের সম্মতি পাওয়ামাত্র দিনকয়েকের মধ্যে দিল্লী দখল করে লালকিল্লা থেকে রোহিলাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। বর্গী ফৌজ আর এক দফা দিল্লী লুঠ করলেও দিল্লীর বাসিন্দারা বলেছিল—এও ভাল। এবার বাদশা আসবেন। বাদশাহ এলে দিল্লীর নসীব ফিরবে। মালিক না থাকলে মুল্কের দাম কিছু নেই। বেওয়া ঔরৎ বিধবা মেয়ে আর মালিকহীন মুল্ক দুইয়ে কোন ফরক নেই।

দিল্লী এতদিন স্বামীপরিত্যক্তা মেয়ের মত ম্লানমুখী মলিনবসনা হয়ে ছিল। এবার দিল্লীর মালিক ফিরছে—এবার সে সাজবে, পেশোয়াজ পরবে, কাঁচুলি গায়ে দেবে, ওড়না চড়াবে, কেশবন্ধন করবে সিঁথিতে সিঁথিপাটী পরবে—নীলা মুক্তা হীরা পোখরাজ ঝলমল করবে। পায়ে পরবে পায়জোর, হাতে পরবে কঙ্কণ বাজুবন্ধ—হাতে বীণা নিয়ে গীত শুনাবে মালিককে।

দিল্লীর লোকেরা খুশী হয়ে উঠেছিল। কালাশেরের তাতে কিছু এসে যায়নি। জবিতা খাঁ গেল, শাহ'আলম আসছে বাদশাহ হয়ে—সে বাদশাহীতে তার আমল বজায় থাকলেই হল। তার কদর থাকলেই হল। সে বাদশাহকে খুশী করবার জন্য তৈয়ার হল। কড়া আফিং যোগাড় করে রাখলে। আর ভাল ঔরৎ খুঁজতে লাগল যে ভাল গীত গাইতে পারে।

বাবুজী, কালাশেরের ভাবনা বিশেষ ছিল না।

কিসের ভাবনা তার? হিন্দুস্তান জাহান্নামে চলেছিল এ তো ঠিক। জাহান্নামেই কালাশেরের জায়গীর। জায়গীর কেন তার সাম্রাজ্য।

সে দিল্লী থেকে এগিয়ে গিয়েছিল দিল্লীর মারাঠা ফৌজ আর লালকিল্লার খাস বাদশাহী সিপাহীদের দলের সঙ্গে। সে দলের সঙ্গে ছিল শাহজাদা জোয়ানভক্ত আবদুল আহাদ আর কালাশেরের দোস্ত বাদশাহী হারেমের নাজির খোজাসর্দার মনজুর আলি সাহেব।

ওদিকে বাদশাহ সরাসরি এলাহাবাদ থেকে দিল্লী রওনা হয়ে পথে ডাইনা তরফ ভাঙলেন। উত্তর-পশ্চিমে ফারাক্কাবাদ। আহম্মদ খাঁ বাঙ্গাশের ফারাক্কাবাদ। বাঙ্গাশ এই এগার বছর বাদশাহী খাজনা দেয়নি। আহম্মদ খাঁ বাঙ্গাশের ইন্‌তেকাল হয়েছে, বাদশাহী

কানুন মত তার সব সম্পত্তি সম্পদ বাদশাহের—বাদশাহ তার জন্যে একটা নজরানা পান—খারিজান নজরানা ; সে নজরানা বাঙ্গাশের ছেলে দেয়নি। বাদশাহ সেই খাজানা আদায়ের জন্য ঘুরলেন। তখন বাদশাহী কিসমতে জলুসের পালা এসেছে।

সিন্ধিয়ার ফৌজ ছাড়া বাদশাহী ফৌজের প্রধান মিরজা নজফ আলি আরও সিপাহী পল্টন যোগাড় করেছে। তা ছাড়া তুকোজী হোলকার এসেছে তার ফৌজ নিয়ে, তার সঙ্গে এসেছে বিশ্বজীকৃষ্ণ। লক্ষ্ণৌএর নবাবও ফৌজ দিয়েছে সঙ্গে। বাদশাহী ফৌজ ফাররাকাবাদে বাঙ্গাশ নবাবের কাছে পাওনা আদায় করে দিল্লীর মুখে ঘুরতে গিয়েও ঘুরল না।

বাদশাহ হুকুম দিলেন—চলো রোহিলখণ্ড। জবিতা খাঁয়ের সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ করে তবে দিল্লী ঢুকব।

ফকীরসাহেব বললেন—বাবুজী, কালাশেরের মেজাজ খুশ ছিল লড়াইয়ের জন্যে। লড়াই হচ্ছে আদমী মরছে ; খুন ঝরছে ; মাটি ভিজছে ; একদল বাঘের মত হাঁক ছাড়ছে আর একদল ঘাড়ভাঙা হরিণের মত পড়ে কাতরাচ্ছে, বাকী সব ছুটে পালাচ্ছে। যারা জিতছে তারা শহরে গিয়ে ঢুকছে—ঘরে ঘরে হানা দিচ্ছে—টাকা-পয়সা লুঠ করছে ; জোওয়ানী সুরতওয়ালী ঔরৎ দেখছে তো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে ; তার গায়ের কাপড় টেনে ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে ; মুখে হাত চাপা দিয়ে তার চিৎকার বন্ধ করে তাকে ভোগ করে ছেড়ে দিচ্ছে। তারা কাঁদছে—এয় আল্লা ! এয় খোদা ! হে ভগবান ! হে রাম ! হে গোবিনজী ! কালাশেরের তত আনন্দ এতে।

একে একে জবিতা খাঁয়ের ঘাঁটি পড়তে লাগল।

সুকরতাল পড়ল।

জবিতা খাঁ একটা হাতী নিয়ে সিরফ চাল্লিশ সওয়ার সঙ্গে নিয়ে পালাল। বাকী বিলকুল বাদশাহী ফৌজের কাছে ধরা পড়ল।

কালাশের এ সুযোগ ছাড়লে না, সে গুজরদের যোগাড় করে লুঠলে পোড়ালে সুকরতাল।

বাদশাহী ফৌজ মারাঠা ফৌজ ছুটল পাথলগড়ের মুখে পাথলগড় পাথরের কেল্লা। সে কেল্লাও পড়ল।

দু পুরুষের মজুত দৌলত আর তামাম রোহিলা পাঠান আমীরদের ছেলে মেয়ে মা বহেন জরু ধরা পড়ে গেল।

বাদশাহী ফৌজী লোকেরা তাদের হাতে ধরে টেনে বের করে নিয়ে গেল তাদের তাঁবুতে। তার সঙ্গে ধরা পড়ল জবিতা খাঁয়ের বেগম আর বেটা ; সেই ছেলে এই গোলাম কাদের।

—বাবুজী ! ফকীরসাহেব বললেন।—বাবুজী, কালাশের এই খবর শুনে ছুটে গিয়েছিল পাথলগড়।

লুঠ ! লুঠ চলছে সেখানে ! রোহিলা আমীরের আমীরদের জেনানীরা কাঠের বাক্সে লোহার বাক্সে হীরা জহরত পুরে তার সঙ্গে ইট পাথর ভরে ফেলে দিয়েছে 'গড়খাইয়ের' জলে। ডুবুরী দিয়ে সেই সব বাক্স ওঠানো হচ্ছে। আর আমীরদের বেটী বহেন জরু জেনানী কয়েদ হয়েছে বাদশাহী তাঁবুতে।

এ খবরের পর বাবুজী কালাশের কি বসে থাকতে পারে ? সে ছুটে গেল।

হঠাৎ থেমে গিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন ফকীর—হজরত রহিমশা বলতেন, দিল্লী থেকে সে যে এত দূর এসেছিল বাবুজী সে এসেছিল এরই জন্যে !

বাদশাহকে খুশী করবার জন্যে ঠিক নয়। শয়তান যখন খেল শুরু করে তার আগে নকশা ছকে নেয় বাবুজী! শতরঞ্জ খেলার কিস্তির পর কিস্তির ছকে ফেলে সে যা ঘটাতে চায় তাই ঘটায়।

কালাশের তাই ভেবেছিল। বহুৎ খুশী হয়ে ছুটে দেখতে গিয়েছিল কেমনভাবে দৌলত লুট হচ্ছে, শহরে পুড়ছে, দেহাত পুড়ছে, আওরৎ ছিনিয়ে নিচ্ছে—জবরদস্তি লুটে নিচ্ছে ঔরতের জিন্দিগীর যথাসর্বস্ব। মায়ের সামনে বাচ্চা কেড়ে নিয়ে টেনে ফেলে দিচ্ছে—বাপের কাছ থেকে বেটী কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে; মরদের কাছ থেকে তার জেনানী নিয়ে যাচ্ছে; বাপ বুক চাপড়াচ্ছে; স্বামী মাথা ঠুকছে; মেয়েরা চিৎকার করছে—খুদা বাচাও! ভগবান বাচাও! যারা কেড়ে নিচ্ছে তারা হাসছে।

তার সঙ্গে সেও হাসবে, এই মতলব নিয়েই সে ছুটে গিয়েছিল পাথলগড়।

দু চারটে বহুৎ খুবসুরত নওজোওয়ানী যোগাড় করবারও মতলব ছিল। শাহ আলম বাদশাহ ধর্ম মেনে চলত কিন্তু তার পরস্তারে ঝোঁক ছিল।

আর ওই কিল্লার 'গড়খাতে'র মধ্যে ফেলা কৌটাবন্দী হীরা জহরতে তার লোভও ছিল। কিন্তু সব থেকে বড় লোভ সে ওই দেখে আমোদ পাবে।

গিয়ে সে দেখলে এক বুড়ী ঝাড়ুদারনী ডোমনীকে। পাথলগড় ঢুকতেই সে দেখলে, তখন সকালবেলা বাবুজী—দেখলে এক বুড়ী ডোমনী ময়লার গামলা মাথায় করে বেরিয়ে আসছে শহর থেকে।

আপনমনে বোধহয় আপনাকেই শুনিয়ে বলছে—খুদাসে বড়া মেহেরবান নেহি হ্যায়—পয়গম্বরসে বড়া কদরদান নেহি হ্যায়। ভগবান থেকে বড় বিচার করনেবালা নাই। কখনও যেন বিশ্বাস না হারাই। যদি হারাই তবে আমার মাথায় বিনা মেঘে তুমি বিজলি ফেলে দিয়ো। আমাকে পুড়িয়ে ঝলসে দিয়ো!

ঘোড়ায় লাগামটা টেনে ধরে কালাশের বলেছিল—কিরে বুড্‌ঢী খুদা তোকে কি মেহেরবানি করলে? আঁ? তোর মাথায় ওই ময়লার গামলা তুলে দিলে? তোর কোন্ কদর করলে সে? গড়খাত থেকে জহরতভরা কৌটো পেয়ে গেছিস বুঝি? তাহলে আমাকে দে—আমি তোকে ঠিক ন্যায্য দাম দেব।

বুড়ী থমকে দাঁড়িয়ে বললে—নেহি আমীর জনাবআলি খান-ই-খানান আমীরউল, ওসব নয়। জবরদস্ত লুঠেরা রোহিলা নবাব নাজিবউদ্দৌলার বেগমরা আজ পথে দাঁড়িয়ে কাঁদছে, ওদের হারেমের ছোকরীদের হাতে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বাদশাহী সিপাহীরা—সেই দেখে আমার দিল খুশিতে ভরে গিয়েছে গরিব পরবর অন্নদাতা। তাই খুদাকে বলছি তোমার থেকে মেহেরবান নেই, তোমার থেকে বিচারক নেই।

ঘোড়াটা চালিয়ে আরও দু কদম এগিয়ে এল কালাশের। মন যেন পিছনে চলে যাচ্ছে কি যেন্ কাকে যেন মনে হচ্ছে। কাকে মনে হচ্ছে তা ঠাওর হচ্ছে না—তবু মনে হচ্ছে এর কথার মধ্যে এর এই বার্ধক্যজীর্ণ দেহের মধ্যে চেনা কেউ যেন লুকিয়ে আছে।

বুড়ীকে দেখে মনে হয় না এ ডোমনী কি ঝাড়ুদারনী। এককালে এর রূপ ছিল; এখন দাঁত ভেঙেছে দেহের মুখের চামড়া কুঁচকেছে চুল সফেদ হয়েছে। যেন একটা বুড়ো গোলাপের গাছ কি কাঞ্চনফুলের গাছ, গাঁটে গাঁটে ভর্তি হয়ে উঠেছে—নতুন ডাল নেই কচি পাতা নেই কুঁড়ি নেই ফুল নেই। বাতাসে ভাল করে দুলতেও পারে না। কিন্তু কে?

আওরত সে অনেক দেখেছে। খুবসুরত আওরত নিয়ে তার কারবার। বুড়ো হয়ে যাওয়া খুবসুরত আওরতও সে অনেক দেখেছে। মহম্মদশাহ বাদশাহের বেওয়া বেগম মালকাইজমানি সাহেবাইমহলকে দেখেছে। আলমগীর বাদশাহের বেগম এই বাদশাহের মা

জিনতমহলকেও দেখেছে—এ মেয়ে অনেকটা সেই রকমের। এককালে সুরত ছিল অনেক!

তার নীরবতা লক্ষ্য করে বুড়ী বললে—সালাম জনাবআলি। চলি আমি হুজুর। মাথায় ময়লার গামলা; বদ বয় উঠছে; আপনার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে বে-আদবী হবে। আপনি যান না, দেখুন না, বড়া নবাবের বড়ী বেগম আজ খুদাকে ডাকছে। বলছে বাচাও। বিচার করো। মাথার বুরখা খুলে গেছে। চোখে আঁসু ঝরছে গঙ্গা যমুনার মত। হুজুরআলি, একদিন আমারও ঝরেছিল—ঝরিয়েছিল ওই বড়ী বেগম। তাই বলছি। আজ আমি ডোমনী হয়ে গেছি। কিন্তু ডোমনী তো আমি নই। জনাব, আমি ছত্রির ঘরের লেড়কী—আজও আমার সুরতের যেটুকু আছে তাতে যে দেখবে সেই বলবে আমি ডোমনী নই। বোলিয়ে হুজুর আলি আপ বোলিয়ে!

একটু বিষণ্ণ হাসি তার মুখে ফুটে উঠল। বললে—জনাবআলি, শুধু সুরত নয় এককালে দিল্লীর মতিবাঈয়ের ঠুংরী শুনবার জন্যে আমীর-উল-উমরারা মাইফেল বসাতো শখ করে। নসীব জনাবআলি নসীব! খুদার বিচার। আজ আমি ময়লার গামলা বয়ে বেড়াচ্ছি।

চমকে উঠেছিল কালাশেরের মত ঠাণ্ডামেজাজবালা শয়তান। ঘোড়াটার উপর থেকে নেমে তার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে দেখতে বলেছিল—উ তো মর গয়ি! দিল্লী কসবীমহল্লার মতিবিবি—ঠুংরী গাইত—সে তো নাদিরশাহী দোজখের সময়—

—আপনি তাকে জানতেন জনাবআলি?

—নাম শুনেছিলাম। সে তো মরে গেছে।

—না জনাব। আমি মরিনি আমি লুঠ হয়েছিলাম। ইরানীরা লুঠ করেছিল। জনাবআলি, বেঁচেছিলাম গানের জন্যে। নাচের জন্যে। জনাবআলি, ইরানীদের তাঁবুতে সারারাত রেহাই ছিল না—আগুন জেবলে তার সামনে গান গেয়েছি নেচেছি। একদিন এই রোহিলা নবাব নাজিবউদ্দৌলা আমার নাচগান শুনে আমাকে সিপাহীদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল। জনাব, নসীবকে বহুত বহুত সালামত দিয়েছিলাম যে বেঁচে গেলাম। হুজুর, এই নবাবকে বলেছিলাম—জনাবআলি তুমি আমার সব। আমার পয়গম্বর তুমি—আমার খুদা তুমি—আমার মালিক তুমি—আমার অন্নদাতা তুমি। মেহেরবান তুমি যদি কখনও বাঁদীর উপর নারাজ হও তবে মেরে ফেলো আমাকে। কিন্তু পথে ফেলে দিয়ো না। কিন্তু তাই করলে নবাব। না—তার থেকেও ছোটা কাম করলে। আমাকে দিয়ে দিলে এক ডোমকে। এক ঝাড়ুদারকে। জনাবআলি, কসুর ছিল। কিন্তু সে কসুর আমার নয়। আমি কি করব—আমি তো কসবী আমি তো বাঁদী! নবাবজাদা জবিতা খাঁ আমার উপর নজর দিলে। আমি কি করব? সেই কসুরের জন্যে আমাকে দিলে ডোমের হাতে। এই পাথলগড়ে আমি ঝাড়ুদারনীর কাম করেছি আর এতদিন ধরে খুদাকে সেকায়েৎ করেছি গাল দিয়েছি। আজ খুদাকে বলছি মেহেরবান। ময়লার ঝুড়ি মাথায় করেও বলছি এ আমার যোগ্য সাজা তুমি দিয়েছ। আমার গুনাহ তো কম নয়। আমার গুনাহ মেপে শেষ করা যায় না। জনাব-আলি, হিন্দু ঘরের বিধবা মেয়ে—বাপের রক্ষিতার ছেলে—সে আমার বলতে গেলে ভাই—জোওয়ানির জবালায় তারই সঙ্গে পালিয়ে এসেছিলাম। এ সাজা আমার ঠিক সাজা। কিন্তু যে গুনাহের জন্যে নবাব আমাকে ডোমের হাতে দিয়ে সারা জিন্দগীর মত ময়লার ঝুড়ি তুলে দিলে সে গুনাহ তো আমার নয়। সে গুনাহ নবাবজাদার। এখানকার নবাব জবিতা খাঁয়ের। তার বিচার আজ যখন নিজের চোখে দেখলাম তখন খুদাকে মেহেরবান কদরদান দুনিয়ার সব থেকে বড় বিচারকরনেবালা বলছি!

ফকীর বললেন—বাবুজী, শয়তানের বানানো নকশার ছক ধরেই ময়লা মাথায় এই

ডোমনী এসে দাঁড়াল কালাশেরের চোখের সামনে। কালাশের পাথর বনে গেল। তার মুখে কোন জবাব বের হল না। চুপ করে সে দাঁড়িয়ে রইল। ব'বুজী, এ ডোমনী—এককালের মতিবিবি—সে হল কালাশেরের মা।

—সালাম! বহুৎ বহুৎ সালাম খোদারবন্দ; আপনার হুকুম হলে আমি চলি!

উত্তর দিতে পারলে না কালাশের। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ঘোড়ার লাগাম ধরে।

বুড়ী চলে গেল।

হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল কালাশের। তাকিয়ে দেখলে বুড়ী ওই চলছে। সদর রাস্তা ছেড়ে মাঠের পথে চলছে। ঝুড়ির ময়লা ফেলতে যাচ্ছে। লাফ দিয়ে সে চড়ে বসল তার ঘোড়ায়। ঘোড়াটাকে ছোটালে মাঠের পথে।

বুড়ীর সামনে এসে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল। বললে—বুড়িয়া, এ জিন্দগী তোর কেমন লাগছে? তিতা না মিঠা?

বুড়ী তার দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে বললে—এ বাত কেন বলছ হুজুরআলি?

—তোর আজও বাঁচতে সাধ আছে?

—সাধ নেই হুজুর কিন্তু মরতে যে বড় ভয় জনাব!

—সে ভয় আমি তোর ঘুচিয়ে দেব।

—নেহি খোদাবন্দ! নেহি নেহি। হুজুর, মরতে আমি পারব না।

—তোর একটা লেড়কা ছিল?

অবাক হয়ে সে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কালাশের বললে—তুই নাম রেখেছিলি শের খাঁ। দিল্লীর কসবী মোকামবালী বলত 'কালাশের'। কসবীপাড়ায় সে কালাশেরই হয়ে গিয়েছিল।

—তুমি—তুমি সেই কালাশের?

—আমি তোর মরণের ভয় ঘুচিয়ে দোব।

—তুই আমার সেই বাচ্চন—আমার শের খাঁ! —বুড়ীর ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছিল। চোখের পাতা ভিজে উঠেছিল।—তুই আজ আমীর বনে গেছিস বেটা! খোদা মেহেরবান বহুত মেহেরবানি তোমার!

বলতে বলতে তার হাত যে কখন অবশ হয়ে গিয়েছিল সে জানতে পারেনি। ময়লার ঝুড়িটা খসে পড়ে গিয়েছিল—ময়লায় তার সমস্ত শরীর ভিজিয়ে দিয়েছিল। সে এক বীভৎস মূর্তি। কালাশেরের মা হয়ে তার দিকে দুই হাত বাড়িয়ে তাকে ডেকেছিল—আমার বেটা আমার শের খাঁ!

কালাশেরের তলোয়ার তার বুকে বিঁধে গিয়েছিল মুহূর্তে।

কালাশের বলেছিল—ভয় করিসনে। মা কোন ভয় নেই। কিন্তু দোহাই খোদার নাম নিসনে।

ছটফট করেছিল বুড়ী। সে ছটফটানি কালাশের দাঁড়িয়ে দেখেছিল। বারংবার জিজ্ঞাসা করেছিল—বল্ কোন সাধ থাকলে বল্, বলে যা আমাকে। বল্।

ফকীরসাহেব বলেছিলেন—বাবুসাহেব, শয়তান দোস্তি করে বুকে জড়িয়ে ধরে পিঠে ছুরি মারতে পারে। খুদা যখন রঞ্জ হয়ে ওঠেন তখন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হয়। নাদেরশা আমেদশা ফৌজ নিয়ে এসে লড়াই করে লাখো আদমী মারে। খুদা রঞ্জ হয়ে একদিকে ধরতিকে কাঁপিয়ে দেয় তো বড় বড় শহর তাসের ঘরের মত শুয়ে যায়; লাখো লাখো আদমী ঘর চাপা পড়ে মরে—ধরতির ফাটলে কোথায় হারিয়ে যায়।

শয়তান বেওকুফ বনে যায়।

বেওকুফ বনে কিন্তু হার মানে না।

॥ নয় ॥

ফকীরসাহেবের এ দর্শন পুরনো কালের বিশ্বাস ; এর সঙ্গে পরিচয় অল্পবিস্তর একাল পর্যন্ত প্রায় সকল লোকেরই আছে। মানুক বা না মানুক এ ধরনের অনেক ব্যাখ্যা শুনেছে। শুনে নতুন কালের মানুষেরা হাসে। হাসিরই কথা। খুদা আর শয়তানের যুদ্ধের কথা অবাস্তব হলেও ভালো আর মন্দের যুদ্ধের কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। তবে ভালই বা কোন্‌টা আর মন্দই বা কোন্‌টা এ নিয়ে তকরার ওঠে। সে থাক।

ইতিহাসের কালে মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ হল শাহ আলমের বাদশাহী।

বাদশাহী তখন ফাটলধরা মজা দীঘির পঙ্কশয্যার মত। মানুষের অজ্ঞতা, অন্ধতা, ধর্মের গোঁড়ামি, বিদ্বেষ, ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘর্ষ, ন্যায়ে নীতিতে বিশ্বাসহীনতা সারা ভারতবর্ষকে নামিয়ে দিয়েছিল আকণ্ঠগভীর ওই পঙ্কআস্তরণের মধ্যে।

হয়তো ভারতবর্ষের মধ্যযুগের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিই ছিল এই। কিছুক্ষণ আগে ফকীরসাহেব একটা ভারী ভাল কথা বলেছিলেন। দুই আর দুইয়ে চার এক আর তিনে চার এ সত্য কেউ অস্বীকার করতে পারে না, কিন্তু এক এক এক আর এক জুড়ে চারের হিসাবটাই সব থেকে বড় সত্য বেশী সত্য। চমৎকার কথা। মুঘল সাম্রাজ্যের ওই সময়ের অবস্থার যে বর্ণনা ফকীরসাহেব দিলেন সেইটেই এক এক এক আর একে চারের মতই সত্য।

কালাশেরের মত কোন অপবিত্র-জন্ম কুৎসিত দেহ ও মনকে আশ্রয় করে খুদ শয়তান সে সময় ঘুরে বেড়িয়েছিল এ কথা স্বীকার না করলেও বা সে না ঘুরে বেড়ালেও ঠিক যা ঘটেছে তাই ঘটত।

তার সঙ্গে এ কথাও সত্যি যে সেই কালের গন্ধর্বী আর বাঈ তওয়াইফদের গুরু হজরত রহিমশাহের এ সবই দিব্যদৃষ্টিতে দেখা সেকালের এক আশ্চর্য সত্য।

এ সত্য, প্রত্যক্ষ সত্যের চেয়েও বড় সত্য। শুধু রহিমশাহই নন সেকালে আরও অনেকজনে এ সত্য প্রত্যক্ষ করেছেন।

ফকীরসাহেবই কথাটা অন্যভাবে আমাকে বলেছিলেন। জুন মাস তখন। প্রধানমন্ত্রী জওহরলালজীর শেষকৃত্য হয়ে গেছে কিন্তু আকাশে-বাতাসে তখনও তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনির সাড়া মিলিয়ে যায়নি।

এ-কাল সে-কাল নয়। সাম্রাজ্যবাদ নয় গণতন্ত্রবাদের কাল। একালে সেকালের শয়তান নেই, ঈশ্বর বা খুদা নেই। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থ রাজনৈতিক শক্তি নিয়ে কাড়াকাড়ি এ সত্য আশ্চর্যভাবে সেকালের মতই সত্য হয়ে আছে। এক একটি রাজনৈতিক দলের এক একটি আদর্শ আছে তার ঝাণ্ডার সঙ্গে দাঁড়িয়ে ; এক দলের আদর্শের সঙ্গে অন্য দলের আদর্শের পার্থক্যও আছে তবুও আদর্শের চেয়ে দলাদলিটা বড়। মানুষের কল্যাণের চেয়ে পরস্পরের হিংসেটাই বড় তাতে সন্দেহ নেই।

ফকীরসাহেবের মত চোখ থাকলে অনায়াসে শয়তান এবং শয়তানিকে খুঁজে বের করা যায়। কিন্তু সে থাক। তবে আশ্চর্যের কথা এই যে ফকীরসাহেবের গল্পের মধ্যে ইতিহাসের এদিক ওদিক হয়নি।

ফকীরসাহেব বললেন—বাবুজী, বুড়ীর কবর হয়নি। তাকে কেউ পোড়ায়ওনি ; তাকে

শেয়াল শকুনেও খায়নি। তখন মুর্দা তো চারিদিকে বাবুসাহেব। লড়াই হয়ে গেছে। মানুষ মরেছে। পড়ে আছে; কিছু গোর দেওয়া হয়েছে। মারাঠারা নিজেদের মুর্দা নিয়ে কিছু পুড়িয়েছে বাকী তো পড়ে আছে। এ বুড়ীটার গর্দামাখা দেহ খেলে একটা কুত্তা। কোথা থেকে এল একটা কালোরঙের কুত্তা—চোখ দুটো তার খয়রা রঙের, রাত্রের অন্ধকারে জ্বলে; আর চোখ দুটোকে ঘিরে দুটো সাদা রঙের ঘের। দেখলে গা ছমছম করে। ডাক ছাড়ে যখন তখন সাধারণ মানুষের প্রাণ চমকে ওঠে।

কুকুরটাকে শিকল দিয়ে বাঁধলে কালাশের। সে ওই দেহটা দেখতে যেত। কুকুরটাকে বেঁধে ফিরবার সময় বললে—মনে রাখব তোর কথা। গোলাম কাদের তোকে দুটো দশটা মিষ্টি কথা বলেছে—তার উপকার আমি করব।

বুড়ী মরবার সময় বলেছিল—বলবার কথা কিছু নাই আমার। তবে জবিতা খাঁয়ের ছেলে গোলাম কাদের আমাকে দু দশটা মিঠা বাত বলত কালাশের; সে দেখলাম বাদশাহী ফৌজের হাতে গিরিপ্তার হয়েছে। তুমি দেখো বেটা, তাকে একটু দেখো।

বুড়ীর কথা রেখেছিল কালাশের।

লালকেল্লার নাজির খোজাসর্দার তার দোস্ত মনজুর আলির হাতে গোলাম কাদেরকে দিয়ে বলেছিল—আলিসাহেব, জবিতা খাঁয়ের এই বাচ্চাটাকে তোমার ধরমবেটা করে নাও। বাদশাহ জবিতা খাঁয়ের উপর চটে আছে। দিল্লীর মুঘলিয়া আমীরেরা রোহিলাদের উপর খুশী নয়। উজীর আবদুল আহাদও রোহিলাদের উপর বহুৎ অখুশী। হিন্দুস্তানে এসে বাস করেছে কিন্তু হিন্দুস্তানের উপর কোন দরদ নেই। আফগানিস্তানের আফগানেরা তাদের আপন। কাবুলের বাদশা তাদের বাদশা। হিন্দুস্তানের নিমক খেয়েও তারা সে নিমকের ধার ধারে না।

বাদশাহ পাথলগড় দখল করার পর জবিতা খাঁ বাদশাহের কাছে হার মেনে স্বীকার করেছিল সে তার খাজনা নিয়মিত পাঠাবে; বাদশাহী হুকুম তামিল করবে; বাদশাহের দরবারে তার প্রতিনিধি হিসেবে থাকবে তার বেটা গোলাম কাদের। নাজিবাবাদের নবাব নাজিবউদ্দৌলা বাদশাহের মীরবক্সীর প্রতিনিধি হিসেবেও বটে আবার তার জামিন হিসেবও বটে।

ফকীর বললেন—বাবুজী, বাদশাহ শাহ আলম ছিল বড় কৃপণ—বহুৎ ভারী কঞ্জুস। নেশা ছিল স্রিফ আফিং। জেনানীতে ঝোঁক মরদ হলেই থাকে বাবুসাহেব—তবে তাকে যারা নিজের কব্জায় আনতে পারে তারা সাধু আর সন্ত ফকীর আর দরবেশ। ঝোঁক তারা ফেলে দুনিয়ায় যা মেলে না তারই উপর; কিন্তু তার নেশা এমন যে সে-নেশায় বুঁদ হলে চোখ বুজেই জিন্দগী ফুরিয়ে যায়। শাহ আলম ফকীর ছিল না সন্ত ছিল না, কঞ্জুস ছিল আর আওরতের ঝোঁকটা তার নিজের বেগমদের মধ্যেই বন্ধন করে রেখেছিল। বাদশাহ সুকরতাল আর পাথলগড় দখল করে যে দৌলত নিয়ে গেল সে দৌলত হিন্দুস্তানে পরে আর কেউ দেখেনি।

বাবুজী, কাবুলের দুরানী বাদশা শাহানশাহ আবদালী কোমরুদ্দিন ইন্তিজামউদ্দৌলার বাড়ির উঠানের নীচে কুঁইয়ার মত দৌলতখানা থেকে বের করে নিয়ে এসেছিল এক এক আফগান জোয়ানের মত লম্বা সোনার বাতিদান—মন দু মন ওজন তার; তাই নাকি দু তিন শও মিলেছিল। এমন দৌলত নাজিবউদ্দৌলাও লুঠেছিল। সারা পাঞ্জাব দিল্লী

মথুরা রাজা সুরজমলের বল্লভগড় আর তামাম রোহিল লুটে সেই দৌলত পাথলগড়ে সে গেড়ে রেখেছিল। তার প্রায় বারো আনা উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে বাদশা লালকিল্লায় কোন এক গোপন জায়গায় পুঁতে রেখেছিল। তার হদিস কেউ জানতে পারেনি। বাদশাহী হারেমের নাজির খোজা মনজুর আলি সাহেবও না।

কালাশেরের নজর পড়েছিল সেই দৌলতের দিকে।

বাদশাহ পাথলগড় থেকে দিল্লী এল ; সঙ্গে নিয়ে এল জবিতা খানের ছেলে গোলাম কাদেরকে ; জিম্বা জামিন রইল। এরপর জবিতা খাঁ সাল সাল বাদশাহী মালগুজারী দাখিল না করলে নবাবজাদা কাদেরকে কয়েদখানায় ঠেলে দেবে। ওর চেয়ে বেশী কিছু করলে নবাবজাদা কাদের সাহেবের গর্দান পর্যন্ত সাজা পেঁছুবে।

কালাশেরের মা—যে সারা গায়ে গর্দা মেখে আর নিজের রক্ত মেখে মরেছিল—সে কালাশেরকে এই জন্যেই বলেছিল—বেটা, এই নবাবজাদাকে তুমি বাঁচাতে চেষ্টা করো। বাঁচিয়ো। জবিতা খাঁ কখনও তার বাত্ রাখবে না। খেলাপ করবেই। এই লেড়কা আমাকে মিঠা বাত বলত। আমি তার বাপের জন্যে ঝাড়ুদারনী এক ডোমের বাঁদী। আমাকে সে মিঠা বাত বলেছে। কোই না বেটা, কেউ বলোন। ও বলেছে।

কালাশের মুখে কিছু বলেনি, কিন্তু মনে মনে বলেছিল সে-কথা সে রাখবে।

—বাবুসাহেব! হজরত রহিমশাহ সেদিন গুলবদনীর মাথার শিয়রে বসে তার মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন—তুই বেঁচে গেছিস বেটী—তু বচ গয়ী, সেই সময়ে তুই যে নিজের আত্মার বুক ফাটিয়ে চিৎকার করে ডেকেছিলি তা আমার কানে পেঁছে দিয়েছিলেন খুদা আর পয়গম্বর রসুল। আমাকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন—রহিমশা তোর মুরিদা রোতি হ্যায় —তুই যা। জল্দি যা। তাই আমি এসেছি ছুটে। কবচটা ছিল বুকে তাই কলেজায় ছোরাটা বেঁধেনি। তুই বেঁচে গিয়েছিস।

ওই নবাবজাদাকে তুই ভুলে যা, 'পসর যা'। ও আর মানুষ নয়, ইনসান আর নয় গোলাম কাদের,—তার ইনসানিয়াত্ সে বেচে দিয়েছে কালাশেরের কাছে। কালাশের মানুষ নয়, কালাশের খুদ শয়তান।

বেটী, কালাশের নবাবজাদা গোলাম কাদেরকে তার মায়ের কথাতে সাহায্য করত।

বাদশা তাকে জামিনদার হিসাবে দিল্লী নিয়ে এসেছিল। নবাব জবিতা খাঁ যা কিছু বে-আদবী যা কিছু হুজ্জৎ হামলা করবে তার জন্যে জামিন তার বেটা ওই গোলাম কাদের।

বাচ্চা ছেলে বাবুজী। তবে নবাবের ছেলে—আর রোহিলা নবাব খান-ই-খানান নজিবউদ্দৌলার নাতি—নবাব জবিতা খানের বেটা। সিপাহীর ঘোড়ার থেকেও জবরদস্ত আর দুঃসাহসী। সে অল্পে চমকাতো না। ভয় খেতো না। বাদশাহের ফৌজের সঙ্গে একটা বড় ঘোড়ায় চড়ে সে গিয়েছিল ; তারই মধ্যে কালাশের সুবিধে করে নিয়ে ঠিক তার ঘোড়ার পাশেই নিজের ঘোড়াটা এনে সঙ্গে সঙ্গে যেতে শুরু করেছিল আর বলেছিল—কোন ভয় নাই তোমার নবাবজাদা। ঘাবড়াইয়ে মৎ। আমার নাম 'কালাশের'—আমি তোমার সহায় থাকব।

নবাবজাদা বলেছিল—কালাশের! তুমি এত বদসুরত আদমী কেন ?

হা-হা করে হেসে উঠেছিল কালাশের। বলেছিল—আমার আসল সুরত তুমি দেখতে পাচ্ছ না নবাবজাদা। আমার আসল সুরত এমনি সাদা চোখে কেউ দেখতে পায় না।

সবিস্ময়ে নবাবজাদা তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিল। কালাশের বলেছিল—এক জাদুর সুর্মা আছে নবাবজাদা যে সুর্মা চোখে পরলে তবে সে-সুরত তুমি দেখতে পাবে।

এমনিতে পাবে না। সে সুর্মায় সারা দুনিয়ার রঙ বদল হয়ে যায় নবাবজাদা। ওয়তের বুকের ভিতর ফুল ফোটা দেখতে পায়, কালো রাতে লাখো লাখো আলো জ্বলে ওঠে।

নবাবজাদার দুই চোখ বড় বড় চোখ—সে চোখ আরও বড় হয়ে উঠেছিল। বুঝতে সে পারেনি। কিছুক্ষণ পর সে জিজ্ঞাসা করেছিল—তোমার কাছে সে সুর্মা আছে?

—জরুর আছে। তুমি সে সুর্মা পরতে চাও?

—চাই। দাও।

—সবুর কর না জনাবআলি, খোদাবন্দ্, আমার পেয়ারের মালিক। হবে। দেব। তোমাকে সে সুর্মা চোখে পরিয়ে দেব আমি। সে-সুর্মাপরা চোখে যখন তুমি যে কোন নওজোয়ানীর দিকে তাকাবে তখনই সে নওজোয়ানী তোমার জন্যে দেওয়ানা হয়ে যাবে। সে সুর্মা পরে দুনিয়ার দিকে তাকালে দেখতে পাবে মানুষের মধ্যে থেকে জানোয়ার উঁকি মারছে। কেউ শের কেউ সাপ কেউ নেকড়ে কেউ বোকরা কেউ গিধ্‌বড় কেউ খচ্চর। লেকিন—

—কি? লেকিন কেয়া?

—নবাবজাদা মেরে পেয়ারে মালিক খুদাবন্দ্ হুজুরআলি, সে সুর্মা পরবার আগে যে বলতে হবে আর মানতে হবে কি, খুদা নেহি হ্যায়। পয়গম্বর রসুলকে মানি না। ইমান ঝুট হ্যায়।

নবাবজাদা কাদের জবিতা খাঁয়ের ছেলে নবাব নাজিবউদ্দৌলার নাতি হয়েও চমকে উঠেছিল। জবিতা খাঁ নাজিবউদ্দৌলা খুদাকে মানত, পয়গম্বর রসুলকে মানত কিন্তু ইমানকে মানত না। আর খুদাকে পয়গম্বরকে নামেই মানত কিন্তু কোন হুকুমত মানত না। নবাবজাদা কাদের এদের বংশধর হয়েও চমকে উঠেছিল। কিছুক্ষণ কালাশেরের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল—তোমার মত কুৎসিত বদসুরত আদমী আমি কখনও দেখিনি।

কালাশের সে কথা যেন শুনতেই পায়নি; সে বলেই গিয়েছিল—নবাবজাদা, সে সুর্মা চোখে পরলে তুমি দুনিয়াকে শুধু আর এক রঙেই দেখবে না আরও 'বহুৎকুছ হোগা' হুজুরআলি। তুমি দেখবে তোমাকে দুসরা কোন শক্তিমান রক্ষা করছে। তোমাকে তার শক্তিতে শক্তিমান করে তুলেছে। নবাবজাদা, এই যে বাদশাহ শাহ আলম পাত্থলগড়ে তোমার মা বহেনকে পথে টেনে বার করে বেইজ্জতি করলে—এই যে পাত্থলগড়ের মেঝে খুঁড়ে দেওয়াল ভেঙে দৌলত লুঠ করে হাতী উট বয়েলগাড়ি বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছে, এ সমস্ত কিছুর শোধ হয়ে যাবে। খুনের বদলা খুন মিলেগা, নখের বদলা নখ, চোখের বদলা চোখ, একের বদলে দুই। বে-ইজ্জতির বদলায় তুমি তাদের দুনো বে-ইজ্জতি করতে পারবে।

চিৎকার করে উঠেছিল গোলাম কাদের—সত্যি বলছ কালাশের?

কালাশের বলেছিল—চুপ।

পাশের সিপাহীরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল—কি হয়েছে?

কালাশের বলেছিল—নবাবজাদা বাচ্চা লেড়কা, হয়তো এমন অবস্থার ফেরে পড়ে মগজে কুছ গড়বড় হয়ে থাকবে।

চুপিচুপি নবাবজাদাকে বলেছিল—থোড়া হুঁশিয়ারিসে হুজুরআলি মেরে পেয়ারে নবাবজাদা! চুপসে মালিক।

নবাবজাদা বলেছিল—যা বলবে তাই মানব। দাও সুর্মা পরিয়ে। শোধ আমার চাই। বদলা আমার চাই।

—দিল্লীতে চলিয়ে হুজুরআলি। দিল্লীতে।

ফকীরসাহেব বললেন—বাবুজী, তাবারিখ হল দুসরা চিজ। তাবারিখকে তোমরা বল ইতিহাস। তাবারিখে থাকে বাইরে যা ঘটে তাই। তাবারিখের যারা বুজরুখ পণ্ডিত তারা এইসবগুলো মানে না। বাবুজী, ঔরংজীব বাদশার সময় শিব্বা মহারাজ গুরুর বলে যোগবলে উধাও হয়ে গেল আর তাবারিখবালারা লিখলে কি শিব্বা মহারাজা মিঠাইয়ের ঝুড়ির মধ্যে লুকিয়ে চলে গেল। আরে বাপ—এতবড় একটা বীর সে মিঠাইয়ের ঝুড়ির মধ্যে লুকোবে কি করে? যোগবলে গুরুর কৃপায় সে ছোট্ট হয়ে গেল। এবং ঢুকে গেল মিঠাইয়ের ঝুড়িতে।

তাবারিখে আছে দিল্লীতে নবাবজাদা গোলাম কাদেরকে এক হাবেলী দেওয়া হল। তার তনখা আসত বাদশাহের খাজাঞ্চিখানা থেকে। তার নোকর গোলাম বান্দা বান্দী বাবুর্চী তারও ব্যবস্থা করলেন বাদশা। গোলাম কাদের আটক রইল। কিন্তু কালাশেরের কোন কথা তাবারিখে নেই বাবুজী। ওইখানেই সব কিছু ভুল হয়ে গিয়েছে ছুট, হয়ে গিয়েছে। কেমন জান বাবুজী?

এই যে এই যে সেকেন্দ্রা—এই যে ইমারত, ধর, তোমার ফতেপুর সিক্রী আগ্রা—ইমারতগুলো তো কেবল পাথর আর পাথর আর কাঠ আর ইঁট দিয়ে তৈরী করা ইমারত। এর শুধু ইমারতী বাহারই আছে আর তো কিছু নাই। পিঁজরা বাবুজী। সোনেকা পিঁজরা—সোনার জিঞ্জিরও আছে কিন্তু চিড়িয়া নাই বাবুজী। চিড়িয়ার অভাবে সব ঝুটা হয়ে গিয়েছে।

বাবুজী গোলাম কাদেরকে একটা হাবেলী দেওয়া হয়েছিল বাদশাহী দপ্তর থেকে; মজা দেখ বাবুজী, হাবেলীটা মৃত বাদশাহ মহম্মদশাহের দুই বেগমসাহেবার হাবেলীর একদম গায়ে। মালকাইজমানী আর সাহেবাইমহল। বাবুসাহেব, এই সাহেবাইমহলের বেটীই ছিল হজরতমহল যার সুরত ছিল বেহেস্তের হুরীর সুরতের মত। যার শরীরে রক্ত চলতে দেখতে পাওয়া যেত। মহম্মদশাহের ছেলে ছিল আহম্মদশাহ; এ ছেলে হয়েছিল একটা হিন্দু নাচওয়ালীর পেটে। আহম্মদশাহ বাদশাহ হয়েছিল মহম্মদশাহের মৃত্যুর পর। এই আহম্মদশাহকে অন্ধ করে দিয়েছিল উজীর গাজিউদ্দিন। এবং তাকে হটিয়ে বাদশা হয়েছিল বুড়া দুসরা আলমগীর। এই শাহ আলমের বাবা।

এই হাবেলীতেই কালাশের একদিন নবাবজাদাকে খাওয়ালে কড়া এক পাত্র আরক আর চোখে পরিয়ে দিলে সেই সুর্মা। নবাবজাদা গোলাম কাদের বললে—খুদা নাই, বিশ্বাস করি না; পয়গম্বর রসুলকে মানি না; ইমান বলে কিছুকে স্বীকার করি না। ন্যায় বলেও কিছু নেই নীতি বলেও নেই; সব মানুষের তৈরী করা। ঝুট! একদম ঝুট! বিলকুল ঝুট! কানুনের কোন দাম নাই! আইনের কোন মানে নাই! পাপের কোন শরম নাই, পুণ্যের কোন নিশান নাই! দুনিয়ায় যার জোর আছে তামাম মুল্কে তারই দখল তারই এখতিয়ার। হিন্দুস্তানের দৌলত এসে জমেছিল দিল্লীতে, আমার বাপের বাপ জোরের দাবিতে লুটে নিয়ে গিয়েছিল পাথলগড়ে। বাদশা শা আলম মারাঠার সঙ্গে

জুটে জবরদস্তি সে দৌলত আবার লুটে আনলে দিল্লী। গেড়ে রাখলে তোশাখানায়। আমি হলফ নিলাম এ দৌলত সুদসমেত হিসাব করে দামড়ী ঢেবুয়া পর্যন্ত শোধ করে তুলে ফের নিয়ে যাব পাত্থলগড় ঘাউসগড়।

কালাশের বলেছিল—সাবাস জী আমার মালিক! আজ থেকে আমি তোমার সিপাহসালার তুমি আমার বাদশাহ। তোমার জন্যে আমি জান দিয়ে লড়ব; লড়াই জরুর ফতে করব। পাত্থলগড়ে দৌলতই শুধু ফিরিয়ে পাবে না তার সঙ্গে ফিরে পাবে তোমার বংশের ইজ্জত। এই মুঘল বাদশাহী বংশের ইজ্জতকে তুমি তোমার পায়ের জুতোর তলায় মাড়িয়ে দেবে। পিয়ো আমার মালিক এই আরক পিয়ো। আর চোখে পর সুর্মা। দেখো, দুনিয়ার কেমন রঙ বদলাচ্ছে। বল নবাবজাদা—কালাশের আমার জিন্দগী তোমার। তুমি আমাকে লড়াইয়ে জেতাবে। তার বদলা নিজেকে তুমি আমার কাছে বেচলে, বলো।—

হজরত রহিমশাহ গুলবদনীকে বলেছিলেন—বেটী, এতকাল পর কালাশেরর খেল শুরু হয়েছে। জবিতা খাঁ বাদশাহী মনসবদার আবদুল কাসিম আলির ফৌজকে হারিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছে—কাসিম আলি নিজে খতম্ হয়েছে। বাদশাহী ফৌজ কাসিম আলির লাশ নিয়ে দিল্লী ফিরেছে।

বাদশাহ শাহ্ আলম শোধ নিতে পাঠিয়েছে মিরজা নজফ খাঁকে। ওদিকে হুকুম দিয়েছিল নিয়ে এসো জবিতা খানের ছেলে গোলাম কাদেরকে। তার জান জামিন আছে।

কালাশের তাকে খিড়কি দিয়ে বের করে মালকাইজমানীর বাড়ির বান্দার পোশাক পরিয়ে দিল্লী শহরের পাঁচিলের ভাঙা জায়গা দিয়ে বের করে দিয়েছিল। বলেছিল—কুছ ডর নেহি নবাবজাদা। ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছ—তুফানের মত ছুটিয়ে চলে যাও। মনে রেখো আমার মালিক, যাবার পথে যদি কারও কাছে সাহায্য নিতে হয়—সে যদি তোমার পরিচয় জানতে পারে তবে সাহায্য নিয়ে তাকে বেকসুর খুন করে চলে যাবে। মনে রেখো খুদার ডর নাই ইমানের দাম নাই—দুনিয়াতে তুমি সব। তোমার জানের জন্যে দুনিয়া কুরবানি করা যায়। পথে যেতে যাকে দেখবে সে তোমার গোলাম—ঔরৎ হলে সে তোমার বাঁদী। তোমার জেবে রাখবে এই আরক। এই আরক খেয়ে তর্‌র্ হয়ে থাকবে। মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করবে। কিছু ডর করো না নবাবজাদা—কালাশের তোমার পিছনে রইল।

শঙ্কর—আমার বেটী! তোকে আর শিউজীর পুরোহিত মহারাজকে হাত জোড় করে কাম নিয়েছিল গোলাম কাদের। তারপর—

—তারপর বেটী কালাশের এল। তার আরকে সে তর্‌র্ হল। তাকে পেয়ে—। হায় রে বেটী! তুই তাকে দেখে ভুলেছিলি। এখনও তোর সে নেশার ঘোর লেগে আছে। তোর চোখের চাউনিতে আমি বুঝতে পারছি। তোর কান্নার ফোঁপানিতে আমি বুঝতে পারছি। তোকে ছুঁয়ে আমি বুঝতে পারছি এখনও তোর সারা শরীরে নবাবজাদার জন্যে তিয়াস ফুটে রয়েছে। মেঘের পানির জন্যে জমিনের তিয়াসের মত সে তিয়াস নওজোয়ানীকে দেওয়ানা করে দেয়। কিন্তু না বেটী। তা হয় না। না। বেটী, আমি রহিমশাহ—

আমি গুরুর কৃপায় ভূত প্রেত জিনের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে পারি কিন্তু কালাশেরের কাছে নিজেকে যে বেচেছে—যে তার তৈরি আরক খেয়েছে—তার সুর্মা চোখে পরেছে তাকে বাঁচাতে পারব না। আর যে ঔরৎ তার নেশায় পড়বে তাকে বাঁচাতে পারি না। তুই তাকে ভুলে যা বেটী। তাকে ভুলে যা।

কিন্তু গন্ধর্বী নটীর ঘরের মেয়ে গুলবদনীর কান্না থামেনি। কান্না তার বেড়েছিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হুজরত রাহিমশাহ তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন নীরবে।

॥ দশ ॥

সারা রোহিলখণ্ড জুড়ে যুদ্ধ লেগে গেল। বাদশাহী ফৌজ এসে ছড়িয়ে পড়ল রোহিলখণ্ডে। জবিতা খাঁ শিখ সর্দারদের সঙ্গে হাত মেলালে। রোহিলখণ্ডের অন্য রোহিলারা সরে থাকতে চেয়েছিল। জবিতা খাঁকে তারা বারণও করেছিল। শোনেনি জবিতা খাঁ।

দিল্লীতে বাদশাহী শক্তি তখন আবার একবার জমে উঠে শক্ত হতে শুরু করেছে। কালটাও সেদিক থেকে খানিকটা অনুকূল। স্রোতের টানের উপর বাতাসের দাক্ষিণ্যের মত।

১৭৭৬।৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ইতিহাস মনে পড়ল আমার।

শক্তিসামর্থ্যের ভাঙা হাটে দাঁড়িয়ে বাদশাহ শাহ আলম আর একবার খাড়া হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছিলেন।

পাঁচবক্ত নামাজ পড়ে খুদার দরবারে মনে মনে প্রার্থনা জানিয়ে বলতেন—আর একবার দয়া কর মেহেরবান দিন দুনিয়ার মালিক! পয়গম্বর রসুল তোমার খাদিমকে তুমি রক্ষা কর সাহায্য কর। সারা হিন্দুস্তানে তোমার হুকুমৎ আমি জারি করব।

আবার ভাবতেন—মনে মনে সংকল্প করতেন—না—ধর্ম নিয়ে ঝগড়াকে হিন্দুস্তানে আর প্রশ্রয় তিনি দেবেন না। জালো জমিতে যেমন জলো ঘাসের আগাছার শিকড় এতটুকু পড়লে সারা জমি ছেয়ে ফেলে তেমনিভাবেই হিন্দুস্তানে ধর্মের ঝগড়ার এতটুকু দেখতে দেখতে বিপুলবিস্তার হয়ে ওঠে। ওকে আর প্রশ্রয় দেবেন না।

আবার ভাবতেন—জিন্দাপীর বাদশাহ আলমগীর মহীউদ্দিন ঔরংজীব যেমন মদ আর গানবাজনা তার সঙ্গে ঔরৎ নিয়ে বিভ্রমকে সারা মুল্ক থেকে দূর করতে চেয়েছিলেন তিনিও তাই করবেন। জাহান্নমে গেল গোটা মুল্ক। মদে ভেসে গেল—ঔরতের ভুখায় গোগ্রাসে ব্যাভিচার করে ক্ষয়রোগের মত রোগেভুগে চললো কবরখানায়।

আফিং খেতেন আর নানান কল্পনা করতেন। যেদিন নেশা খুব চড়া হত সেদিন কথাবার্তা অসংলগ্ন হয়ে উঠত।

আবদুল কাসিমের মৃতদেহ এসে পৌঁছুল--বাদশাহ দাঁড়িয়ে দেখে বললেন—কবর দাও। যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে কবর দিয়ো। আর বললেন—উজীর আহাদ এবং মিরজা নজফ তোমরা আমার সঙ্গে দেখা কর।

গোটা দিল্লীর বাজারে সেদিন হইহল্লা উঠেছিল। নাজিবউদ্দৌলার ছেলে জবিতা খাঁ রোহিলা উজীর আবদুল আহাদ খাঁর সহোদর ভাই মনসবদার আবদুল কাসিম খাঁকে লড়াইয়ে হারিয়ে তাকে জানে খতম করে দিয়েছে। বাদশাহী ফৌজ হেরে গেছে রোহিলখণ্ডে। এবার হয়তো জবিতা খাঁ রোহিলা পাঠান সিপাহী নিয়ে দিল্লী আসবে। পাথলগড়ের শোধ নেবে।

বেলা দুপহরের পর খবর রটল জবিতা খাঁয়ের বেটা জামিনদার গোলাম কাদের—যার

বয়স পনের কি ষোল—সে বাদশাহী পিঁজরা থেকে উড়েছে। পালিয়েছে সে। ফৌজও ছুটেছিল তার পিছনে।

বাদশাহ আহাদ খাঁ উজীরকে বললেন—উজীর, তোমাদের ঝগড়া মুলতুবী রাখো। তোমার সঙ্গে মিরজা নজফের ঝগড়ার কথা জানি আমি। সে বুঝাপড়া তোমরা পরে করো। এখন জবিতা খানের দিল্লগীর জবাব দাও। তোমার মায়ের পেটের ভাই—তার মৃত্যুর শোধ নাও।

মাহাদজী সিন্ধেকে ডেকে বললেন—মাহাদজী সিন্ধে, তোমার কি মনে নেই পানিপথের লড়াইয়ে মারাঠারা হেরেছিল—ভাওসাহেবকে কেটেছিল আর তার তাঁবু থেকে শও দরুনে মারাঠা আওরৎ লুঠেছিল যারা তাদের মধ্যে প্রধান জন ছিল রোহিলা নবাব নাজিবউদ্দৌলা? সে কথা ভুলে গেছ? তোমরা তার শোধ নাও।

মিরজা নজফকে ডেকে তাকে খেলাত দিয়ে বললেন—তুমি আজ থেকে হলে দিল্লীর বাদশাহের মীরবক্সী। বেইমান জবিতা খাঁকে বেঁধে হোক মেরে হোক আমার কাছে হাজির করো।

বাদশাহী ফৌজ দিল্লী থেকে রওনা হল রোহিলখণ্ডের দিকে। লড়াই ছড়িয়ে পড়ল সারা রোহিলখণ্ডে।

ফকীরসাহেব বললেন—বাবুজী, পুরা এক বছর লড়াই চলল। জবিতা খাঁ শেষ পর্যন্ত হারলে। আবার ঘাউসগড় পাত্থলগড় পড়ল—দখল করলে বাদশাহী ফৌজ। গোটা রোহিলখণ্ডের রোহিলা পাঠানেরা সমতল অঞ্চল ছেড়ে পাহাড়ের কোলে বন অঞ্চলের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে রইল। জবিতা খাঁ পালিয়ে গেল শিখদের সঙ্গে।

—তুমি তো জান বাবুজী সে আমলের কথা। সে আমলে টাকায় সব হত।

হেসে বললেন ফকীর—কোন্ আমলেই বা হয় না বাবুসাহেব! টাকা সব আমলেই হয়কে নয় করে নয়কে হয় করে, দোস্তকে দুশমন করে, আবার দুশমন দোস্ত হয়; টাকার জন্যে মানুষ ছেলে বিক্রি করে ঔরৎ বিক্রি করে বেটী বিক্রি করে; বাবুজী, নিজেকে বিক্রি করে; দেশের আজাদী তাও বিক্রি করে। সে আমলে টাকার দাম সব থেকে বেশী চড়েছিল বললেই ঠিক বলা হবে; পাঁচ সাতটা ছেলে থাকলে দশ বিশ টাকায় একটা বেটা দিব্যি হাসিমুখে বেচে দিত। শিখরা টাকা নিয়ে জবিতা খানের হয়ে লড়তে এসেছিল। কিন্তু বাদশাহী ফৌজের কাছে হারলে; রোহিলারা পালাল তরাইয়ের জঙ্গলে; শিখেরা পালাল নিজেদের মুলুকে উত্তর পাঞ্জাবে। সাহারানপুর জালালাবাদ ঘাউসগড় পাত্থলগড় ছেড়ে দিয়ে জবিতা খাঁ কর্নাল জেলায় সর্দার গজপৎ সিংহের কাছে গিয়ে জান বাঁচালে। সঙ্গে নিজের ফৌজ না সিপাহী না শুধু দশ পনের জন পাঠান নিয়ে গিয়ে উঠল।

বাবুজী, জবিতা খাঁয়ের সঙ্গে দুসরা পায়জামা ছিল না কুর্তা ছিল না শিরপেঁচ ছিল না। হীরা না মতি না সোনা না দানা না—একদম ফকীরের মত গিয়ে পোঁছুল মাথা হেঁট করে।

শিখ সর্দারেরা তাকে আশ্রয় দিলে। বললে—হাঁ ওর বাপের কাছ থেকে আমরা টাকা অনেক পেয়েছি একসময়।

জবিতা খানের মুন্সী মনসুখ রায় তার সঙ্গে ছিল—সে কথাটা মনে পাড়িয়ে দিল সর্দার গজপৎ সিংকে। আরও বললে বাদশাহী ফৌজকে হটিয়ে রোহিলখণ্ড ফিরিয়ে দাও সর্দারজী

—নবাব জবিতা খান জরুর তোমাদের দেনা শোধ করবে।

জবিতা খাঁ মাথা হেঁট করে বসে ছিল। সে ভাবছিল তার জ্ঞাতিদের কথা। সারা রোহিলখণ্ডের রোহিলা পাঠান নবাবদের কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। হাফিজ রহমৎ পর্যন্ত না! তার নাজিবাবাদ ঘাউসগড়ের উমরখেল পাঠানেরা পর্যন্ত এ বিপদে ঘাউসগড় ছেড়ে ঘরসংসার নিয়ে যে যার পালিয়েছে। ঘাউসগড় থেকে সে বারবার অর্থসাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছে কিন্তু তার বেগম আর ছেলে দেয়নি। বড়ীবেগম আর বড়ছেলে গোলাম কাদেরের বুকের মধ্যে রাগ আর ক্ষোভ জোড়া সাপের মত ফুঁসছে। তা ছাড়া—।

তা ছাড়া এই সহায়সম্বলহীন অবস্থায় যদি এই শিখেরা কাল মিরজা নজফ আলির ফৌজের ভয়ে কি টাকার লোভে তাকে বাদশাহী ফৌজের হাতে দিয়ে দেয় ?—তা হলে ? এয় খোদা—!

সে সর্দার গজপৎ সিংকে বললে—সর্দার গজপৎ পাইজী, তোমাদের শিখধর্ম উদার। তোমাদের গুরুই বোধহয় দুনিয়ার শেষ পয়গম্বর। খুদার হুকুমৎ—

—খুদার নয় খানসাহেব—"অলখ নরঞ্জনের"।

—হাঁ। অলখ নরঞ্জন আর খুদা এ দুয়ে ফরক নেই।

—না। অলখ নরঞ্জনই সব।

—তাই মানব সর্দারজী। ভাইসাব, আমি শিখ হয়ে যাব। আমি তোমাদের একজন হয়ে থাকব তোমাদের মধ্যে। তোমরা আমাকে যেন পরিত্যাগ করো না।

বাবুজী, আরও কিছুদিন পর। পুরাপুরি গুলবদনী জিন্দগীর সেই যে একটা কালারাত এসেছিল—আর এক জ্যোৎস্না কুয়াসাভরা রাত—সেই দিন থেকে প্রায় এক বছর পর।

তখন সারা মুল্কটা হয়ে উঠেছে অনিশ্চিত আর ভয়ে ত্রস্ত। রোহিলখণ্ডের জবিতা খাঁ নবাবের ওদিক থেকে লোকজন পালিয়ে আসছে। কোথায় কার আপন জন আছে মেহমান আছে তাদের কাছে এসে মাথা গুঁজে থাকছে। বিশেষ করে জবিতা খাঁয়ের ফৌজ কি দপ্তরের সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ ছিল তারা পালিয়ে আসছে। বাদশাহী ফৌজ ঢুকলে তাদের খুঁজবে আগে।

ঘাউসগড় পড়তে আর দেরি নাই।

এবার ঘাউসগড় পড়লে বাদশাহের হুকুম—জবিতা খাঁ আর তার বেটা গোলাম কাদেরকে শিকল দিয়ে বেঁধে এনে হাজির করো। কিংবা তাদের শির কেটে বর্শার উপর বসিয়ে নিয়ে এসো। ঘাউসগড় থেকে দিল্লী পর্যন্ত পথের দুধারের হিন্দুস্তানীরা দেখুক মুঘল-এ-আজম শাহ আলম এখনও হিন্দুস্তানের জান জমিনের মালিক, বাদশাহ গাজী পীর। মীরবক্সী হয়েছে মিরজা নজফ। তার হাতে হুকুমনামা সহি করে দিয়েছে বাদশাহ। মিরজা নজফ ইরানী খানদান ঘরের ছেলে। জবরদস্ত জঙ্গী জোয়ান সে। তাদের সঙ্গে আছে মাহাদজী সিন্ধের বর্গী ফৌজ।

সেদিনও সন্ধ্যেবেলার দিক। সেই অমৃতেশ্বর শিউজীর মন্দিরের চত্বর। একটা ভিড়

জমে উঠেছিল ; দুটো ডুলি এসে নেমেছে সেখানে। বাতে পঙ্গু এক প্রৌঢ়া এসেছে—তার সঙ্গে এসেছে এক মধ্যবয়সী বিধবা আর তাদের সঙ্গে এসেছে এক নওজওয়ান আর এক বুড়া রাজপুত।

তারা স্বপ্ন দেখেছে বামনওলী গাঁয়ের অমৃতেশ্বর শিউজী মহারাজ দয়া না করলে এই ব্যাধি সারবে না। স্বপ্ন হয়েছে এইখানে থেকে প্রতিদিন ওই চত্বর মার্জনা করতে হবে তবে সারবে।

বুড়া পুরোহিত মহারাজ দাঁড়িয়ে আছেন। আরও লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েরা দূরে দাঁড়িয়ে আছে ; তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে গুলবদনী। পশ্চিমমুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। পশ্চিম আকাশ তখন সন্ধ্যার মুখে রাঙা হয়ে উঠেছে। শীতের আমেজ তখনও রয়েছে। রাঙা আলোয় গুলবদনী যেন ঝলমল করছে নতুন ফুলধরা লতার মত।

হজরত রহিমশাহ বলতেন—লেড়কীটা এক বছরের মধ্যে যেন হু-হু করে বেড়ে গেল। মেয়েদের এমনি একটা বয়স আছে যখন তারা বর্ষার নদীর মত, বসন্তকালের ফুলধরা লতার মত ভরে ওঠে, ফুলন্ত হয়ে ওঠে। ছ মাস এক বছর না-দেখার পর দেখলে ঠিক যেন চেনা যায় না। চেনা গেলেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না যে এ-মেয়ে সেই মেয়ে। হালকা রোগা ছিল-হিলে মেয়ে নওজওয়ানীর বাহার জলুস সর্বাঙ্গে মেখে দাঁড়িয়েছিল। পশ্চিমের লাল রঙের ছটায় সত্যিই ঝলমল করছিল।

বুড়া রাজপুত সর্দার কথা বলছিল পুরোহিত মহারাজের সঙ্গে। আর মাঝবয়সী রাজপুত বিধবাটি এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েদের কাছে। হঠাৎ এগিয়ে এসেছিল শঙ্করের সামনে। জিজ্ঞাসা করেছিল—তুমি কে বেটী?

লজ্জায় রাঙা হয়ে সে বলেছিল—আমি—আমার নাম গুলবদনী।

—হ্যাঁ। গুলাবের মতন বদন তোমার বটে! কিন্তু—কার মেয়ে তুমি?

গুলবদনীর মা এগিয়ে এসেছিল বিধবার সামনে—আমার মেয়ে।

—তোমার মেয়ে?

গুলবদনীর মা এর উত্তর দিতে পারেনি। সে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিল। অনেকক্ষণ পর বলেছিল—তুমি—তুমি?

ছত্রী বিধবাটি বলেছিল—হ্যাঁ আমি—কিন্তু চুপ কর। আমরা তোমার খোঁজেই এসেছি। খুব চুপিচুপি বলেছিল রাজপুত বিধবা। অন্য কেউ শুনতে পায়নি।

বাবুজী! ওই রাজপুত সর্দার হল নবাব নাজিবউদ্দৌলার একজন পেয়ারের সর্দার। ঘাউসগড় থেকে কিছু দূরে এক গাঁওয়ের মধ্যে ছিল তার মাটির কিল্লা আর চার পাঁচখানা গাঁ নিয়ে ছিল তার জায়গীর। খাস ঘাউসগড়ের এলাকার দক্ষিণ দিক ঘিরে চারখানা গ্রামের সর্দার ছিল—ঘাটোয়ালের মত ঘাঁটি আগলদার। দুশমন এলে প্রথমেই লড়াই হত তার সঙ্গে। পুব পশ্চিম আর উত্তরে ছিল আরও তিনজন সর্দার। তারা সকলেই ছিল উমরখেল পাঠান সর্দার। আজ বাদশাহী ফৌজের তোপ আর বন্দুকের মুখে ঘাউসগড়ের চারিপাশের গ্রামের সব ঘাঁটি পড়ে গিয়েছে। পাঠান সর্দারেরা জেনানী লেড়কা লোকলস্কর নিয়ে পাহাড় জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়েছে। বুড়ো রাজপুত সর্দার শেষ ঘাটোয়াল। সে তার পঙ্গু স্ত্রী বিধবা পুত্রবধূ আর পৌত্রকে নিয়ে চলে যাচ্ছিল বামনওলীর পাশ দিয়ে যে সড়ক গিয়েছে সেই সড়ক ধরে। তারা দিল্লীর দিকেই চলেছিল। জাবিতা খাঁ পশ্চিম দিকে কর্নালে পালিয়েছে;

সেখানে সে ইসলাম পরিত্যাগ করে শিখ হয়েছে—নাম নিয়েছে ধরম সিং ; এ সংবাদের পর গোটা ঘাউসগড় ভেঙে গেছে। জবিতা খাঁয়ের বড়ীবেগম আর বড়বেটা গোলাম কাদের পাগলের মত হয়ে গেছে। বুড়া সর্দার চান্দ সিং তার নাতি মনিয়ার সিংকে নিয়ে তাদের সঙ্গে থাকবে সংকল্প করে বুড়ী সর্দারনী আর বিধবা পুত্রবধূকে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখবার জন্যে বেরিয়েছে শেষরাত্রে।

জবিতা খাঁয়ের শিখ হওয়ার খবরটা এসেছে কাল সন্ধ্যেতে। ঘাউসগড়ের ভিতরে যারা আছে তারা বিদ্রোহ করেছে জবিতা খাঁয়ের স্ত্রী পুত্রের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে রোহিলা পাঠানেরা দলে দলে উত্তরমুখে তরাই জঙ্গলের মুখে ছুটেছে। বাদশাহের ফৌজের হাতে পড়লে জান যাবে ইজ্জৎ যাবে দৌলত যাবে। জবিতা খাঁকে আঁকড়ে থাকলে ধর্ম যাবে ইনসানিয়াত যাবে। তার থেকে অরণ্য ভাল। জঙ্গল ভাল।

জঙ্গলে হয়তো সর্দার চান্দ সিংও যেতে চাইত। কিন্তু বৃদ্ধা স্ত্রী আর বিধবা পুত্রবধূকে জঙ্গলে ফেলে ফিরে আসার কল্পনা করতে পারেনি। লোকালয় মানুষ আত্মীয়স্বজন স্বধর্মীর কথাই মনে হয়েছে।

নবাব নাজিবউদ্দৌলার পাশে পাশে থেকেছে সর্দার চান্দ সিং।

নবাব নাজিবউদ্দৌলার সঙ্গে তার কয়েকটা শর্ত ছিল। এ শর্ত কখনও মুখোমুখি কথা বলে হয়নি। আপনাআপনি হয়ে গেছে।

নবাব নাজিবউদ্দৌলা যখন মথুরা লুঠ করবার জন্যে আমেদশা আবদালীর ফৌজের সঙ্গে জাঠদের বল্লগড়ের যুদ্ধের পর রওনা হয়েছিল তখন চান্দ সিং নবাবের হুকুম না নিয়েই ফিরেছিল তার রাজপুত সিপাহী নিয়ে।

নবাবসাহেব ইঙ্গিতে পরে জানিয়েছিল তাতে নবাব অখুশী হয়নি। তখনকার দিনে এর বেশী আপোষ দরকার হত না বাবুজী। স্রিফ দেওতার মন্দিল ভাঙা, দেওতা ভাঙা, বাস্। না হলে বাবুজী হিন্দুর বাড়ি হিন্দুর ঔরৎ হিন্দুর দৌলত এ লুঠতে হিন্দুর এতটুকু আপত্তি ছিল না—তারা অনেক লুঠেছে। বর্গী সিপাহীরা হিন্দু মুসলমান বেছে লুঠ করেনি। মুসলমান ঔরতের চেয়ে হিন্দু ঔরৎ লুঠের উপর ঝোঁক ছিল বেশী। শুধু মন্দিল আর দেওতা। এ যখন লুঠ হত ভাঙা হত তখন চান্দ সিং সরে আসত। আগেই সরে আসত। নবাব তাতে আপত্তি করত না। ষোল সতের বছর বয়স থেকে নবাব নাজিবউদ্দৌলার নোকরি নিয়েছিল। জাঠ রাজপুতের ছেলে লাঙল আর লাঠি ছেড়ে হাতিয়ারবন্ধ্ হয়ে সিপাহী হয়েছিল। সিপাহী থেকে মনসব পেয়েছে, জায়গীর পেয়েছে। ছোট মনসব ছোট জায়গীর। তা হোক। বুড়া চান্দ সিং কখনও বেইমানি করেনি। আজও সে তা করতে পারবে না। তার একমাত্র ছেলে গণপৎ সিং একবার এক পথের নাচনেবালী নওজওয়ানীকে নিয়ে পাগলা হয়েছিল ; খুদ নবাবসাহেবের এক ভাতিজার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল সেই ঔরৎকে নিয়ে। নবাবসাহেব বিচার করে বলেছিলেন—এ ঔরৎ পাবে গণপৎ। এ ছোকরী ভালবাসে গণপৎকে। গণপৎও ভালবাসে এ ছোকরীকে। আমার ভাতিজা হলে কি হবে সচ বাত বলতে হবে—তার স্রিফ ঔরতের ভুখা। ভুখার খানা বহুৎ মিলবে।

ষোল বছর আগের কথা। পানিপথের লড়াইয়ে গণপৎ মরেছে। তখন সে লেড়কী চান্দ সর্দারের বাড়িতে ছিল। গণপতের মৃত্যুর পর চান্দ সর্দার তাকে বিদায় করে দিয়েছিল। কিছু টাকাকড়ি দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল তার বাড়ি। তখন তার কোলে ছিল ছোট এক লেড়কী। ওদিকে তখন নবাবসাহেবের ভাতিজা তাকে নতুন করে পাবার জন্য ক্ষেপেছে। কিন্তু লেড়কী পথের নাচওয়ালী জাতগন্ধর্বী নটীর বেটী হলে কি হয়, সে গণপতের মৃত্যুর পর বেওয়ার মতই থাকতে চেয়েছিল। গণপৎ ছিল মর্দানার মধ্যে শের

মর্দানা। তাকে যে একবার ভালবেসে পেয়েছে সে তাকে ভুলতে পারে না। নটী মেয়েটাও পারেনি। চান্দ সর্দার একদিন রাত্রে তাকে ডুলিতে চড়িয়ে নিজে পাহারা দিয়ে এনে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল এই বামুনওলীর এই অমৃতেশ্বর শিউজীর মন্দিরচত্বরে। সে মেয়েও ছিল নটীর মেয়ে। কিন্তু এ গ্রামের নটীর মেয়ে নয়। বামুনওলীর নটীপাড়ার খ্যাতি ছিল অমৃতকুমারী বাঈয়ের জন্যে। অমৃতেশ্বর শিউজীর জন্যে। আর এ গ্রামের বাসিন্দাদের জন্যে। একটা খ্যাতি ছিল যে বামুনওলীতে আশ্রয় নিলে তার অনিষ্ট কেউ করতে পারে না। হজরত রহিমশাহের শাসন এখানে। অন্যদিকে এ গ্রাম ছিল খুদ বাদশাহের এলাকা।

এত কাল পর—ষোল বৎসর পর; আত্মীয় বন্ধুর সন্ধানে চান্দ সিং নাতি মনিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে দুই ডুলিতে বুড়ী স্ত্রী আর বিধবা পুত্রবধূকে চাপিয়ে দিল্লীর দিকে রওনা হবার কথা ভেবেছিল; দু চারজন আত্মীয়ের কথাও মনে হয়েছিল। কিন্তু তাতেও ছিল অনেক বিপদ।

বাবুজী, তখনকার কালের কথা তো পড়েছ। বড়লোক আমীর সর্দার রাজা নবাবের বাড়ি ঔরৎ পাঠালে সে ঔরৎ বুড়ী হলে ফিরত, কুৎসিত হলে ফিরত। কিন্তু খুবসুরত আর নওজওয়ানী হলে বড় একটা ফিরত না। বাবুজী, জাঠরাজা সুরজমলের বাড়িতে এক সুন্দরী সধবা মেয়ে—একটি ছেলের মা সে, ছেলে কোলে করে এসেছিল রাজার অন্দরে মেহমান হিসেবে। বাস্ রাজার চোখে পড়ে সে ওই অন্দরে থেকেই গেল। সে একলা থাকল না, ছেলেও থাকল; আর পরে সে রাজা সুরজমলের ছেলে হয়েই রাজার সিংহাসনে বসল রাজা হল

চান্দ সিংয়ের অন্দরেও এমন মেয়ে না-থাকা নয়। আছে। তাদের দাম কিছু নেই তার কাছে। যে-ঔরৎকে নিজের স্বামী নিজের জনের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা হল সে ছিনিয়েলেনেবালার বাড়িতে বেঁচে থাকে, হাসে; সে মেয়ের দাম কি? তার কাছ থেকে অন্যের কাছে গেলেও সে ঠিক এমনি করেই হাসবে গাইবে নাচবে খাবে বেঁচে থাকবে। তাই তাদের কথা ভেবে মাথা খারাপ করেনি চান্দ সিং! আর তারা তো কম নয়। তারা অনেক। ভাবনা তার বিধবা পুত্রবধূ মনিয়ারের মা আর বুড়ী স্ত্রী গণপতের মাকে নিয়ে।

পথে বের হবার মুখে মনে পড়েছে বামুনওলীর কথা। বামুনওলী! বামুনওলীর নটীপাড়ায় এক নটী পুত্রবধূকে চান্দ সর্দার রেখে এসেছিল। হাঁ সে নটীও বটে সে তার বেটার বউও বটে।

নবাবের ভাতিজা তখন জায়গীর পেয়েছে দৌলত পেয়েছে, তার মর্দানা সুরতও ছিল ভাল, তবু নটীর বেটী গণপৎকে ভোলেনি।

এক নটীর মেয়ে ছিল রানাদিল; শাহজাদা দারা শিকোর বেগম। সে হিন্দু সতীর মত বিধবা হয়েই ছিল জিন্দগীর শেষ পর্যন্ত; বাদশাহের বেগম হতেও সে চায়নি। এ নটীর মেয়ে চন্দ্রমুখীর সে কান্না দেখে চান্দ সিং সেকালে একদিন রাত্রে এই বামুনওলীতে এসে তাকে রেখে গিয়েছিল। দিয়ে গিয়েছিল হজরত রহিমশাহের কাছে। পরিচয় দেয়নি। বলে গিয়েছিল—হজরত, আপনি নটীদের গন্ধর্বীদের গুরু। আপনি হজরত। এ বেটী নটীর বেটী। কিন্তু আমার বিধবা পুত্রবধূ। নবাবজাদার হাত থেকে একে বাঁচানোর সাধ্য আমার নাই। এ ছত্রীর মেয়ে হলে আমি লড়তাম। নটীর মেয়ে। বিয়েও লোক-দেখানো হয় নাই। তবু চন্দ্রমুখী বিধবা সেজেই থাকতে চায়। তাই এখানে দিয়ে গেলাম। আমার পরিচয় আপনি নিশ্চয় বুঝবেন। আপনি সব জানেন। কিন্তু আপন মুখে আমি

বলব না। এ যদি কোনদিন নিজে থেকে বিয়ে করতে চায় কাউকে—কারুর কাছে নিজেকে বেচতে চায় সে করবে। তার বিচার করবেন খুদা ভগবান। কেউ যেন জবরদস্তিতে ওর বিধবাধরমকে বরবাদ করে দিতে না পারে।

এতকাল পর আশ্রয়ের সন্ধানে পথে বেরিয়ে হঠাৎ চান্দ সিংয়ের মনে পড়ল চন্দ্রমুখীর কথা, বামুনওলীর কথা।

স্ত্রীকে এবং পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করল—দেখব একবার বামুনওলী গিয়ে ?

—কি দেখবে ?

—দেখব চন্দ্রমুখী আজও সেই চন্দ্রমুখী আছে কি না ? তার বেটী—

—ছি !

—ছি-র কথা নয় গণপতের মা। যদি লজ্জাশরমের কিছু দেখি তো চলে যাব। আর যদি দেখি—।

—যদি দেখ—। কি দেখ ?

—যদি দেখি আজও তাকে বলতে পারি গণপতের প্যারী, মহব্বতের ভালবাসার ঔরৎ তাহলে ওখানেই বাড়ি ভাড়া করে রেখে আমরা ফিরব ধাউসগড়। সিরফ এমন একজনকে পাবে যাকে আপন জন বলতে পারবে। দরিয়ার তুফানে যখন ভেসে যায় মানুষ তখন খড়ের কুটোগাছটাকেও আঁকড়ে ধরে সর্দারনী। তার বেশী কিছু না।

—কিন্তু—কি পরিচয় দেবে ?

—পরিচয় দেব—স্বপন পেয়ে এসেছি। তোমার বাত বেমার ভাল হবে অমৃতেশ্বরের মন্দির ঝাড়ু দিলে।

স্বপ্নের কথার অজুহাতটা এমনই সত্য—সত্যের চেয়েও অধিকতর সত্য যে কেউ কোন কথা খুঁজে পায়নি।

মনিয়ার সিং নওজওয়ান বাবুজী। সে সমস্তক্ষণ চুপচাপ বসে দাদোর কথা শুনছিল আর লড়াইয়ের কথা ভাবছিল। সে হঠাৎ বলে উঠেছিল—আর বেশী তকরার করো না দিদিয়া। চল—বেরিয়ে পড়। না হয় তো চুপ হয়ে যাও। ঘুমিয়ে যাও। যখন সব পড়বে—আমরা পড়ব ঘোড়া থেকে মাটিতে—কেল্লার দরওয়াজা পড়বে মুখ থুবড়ে তখন জওহর করে কুঁইয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ো।

বুড়ী নাতির দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেছিল—সেই ভাল। কোথায় যাব—সেই বামুনওলী সেই কোন্ নটীর বাড়িতে ? যদি দেখি—।

মনিয়ার বলেছিল—না দিদিয়া তা হবে না। আমার মনে পড়ছে সেই ছোটি মাঈজীকে। হাঁ বাপজী আমাকে বলত—বেটা ও তোমার ছোটি মাঈজী—ওই ছোটিসি বাচ্চি ও তোমার বহেন। ছোটি মাঈজী ভাল ছিল দিদিয়া। তুমি চল।

বাবুজী !

ফকীরসাহেব বলেছিলেন—এই বাচ্চনদের একটা বোধ আছে। তারা ভাল মন্দ বুঝতে পারে। বাবুজী, আগুন গরম—আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে, সাপে কাটলে মানুষ মরে এ তারা জানে না এ বাত ঠিক কিন্তু একটা খারাপ মানুষের কাছে দাও ছেলেকে—সে যাবে না তার কাছে থাকবে না কিছুতে—কাঁদতে শুরু করবে।

মনিয়ার সেই বোধ থেকে বলেছিল।

ফকীরসাহেবের সঙ্গে আমার মতে মেলেনি। মনিয়ারের তরুণ মনে একটা আবেগ জেগে

উঠেছিল। সেই শৈশবে যে একটি স্নেহময়ী নারীকে সে 'ছোটি মাঈজী' বলত যে তাকে সস্নেহে কোলে টেনে নিত, তার কথা সেদিন হঠাৎ মনে পড়ে একটি আবেগের সৃষ্টি করেছিল।

সে আবেগ তার মিথ্যা হয়নি।

গুলবদনীর মুখে দেখতে পেয়েছিল তার বাপের মুখের আদল।

চন্দ্রমুখীকে দেখতে পেয়েছিল বিধবার বেশে।

মনিয়ারের মা বলেছিল—চুপ কর। আমরা তোমার খোঁজেই এসেছি।

॥ এগার ॥

"দুনিয়াতে যে সব ঘটনা ঘটে সে সবই একটার সঙ্গে আর একটার বাঁধনে বাঁধলে লক্ষ বাঁধনে কোটি বাঁধনে বাঁধা। একটা ঘটে তাই আর একটা ঘটে, ছকে ছকে পাশার গুটির মত। আর দান ফেলেন যিনি সব ঘটান তিনি। কখনও কখনও পাশা তাঁর হাত থেকে চলে যায় —পাশার হাড় তিনখানা গিয়ে পড়ে শয়তানের হাতে। মানুষেরা তাদের কর্মফেরে তুলে দেয় ভাগ্যের পাশা তিনখানা সেই শয়তানের হাতে।"

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন ফকীরসাহেব। সেকেন্দ্রার সামনে বাদশাহী সড়কের উপরে এতক্ষণে দু চার জন লোক দেখা যাচ্ছে। দু চারখানা লরী যাওয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু সে সব যেন চোখে পড়েও চোখে ঠিক পড়ছিল না। সমস্ত পৃথিবীটাই যেন অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল মনের কাছে। আধুনিক কালের যা কিছু চিহ্ন পরিচয় সবই বিচিত্রভাবে অর্থহীন হয়ে পড়েছিল। বাদশাহী সড়কটা এখনকার কালে পিচ দেওয়া—তার উপর ট্রাক মোটরগাড়ি ছুটছে এবং এক ধার ঘেঁষে একসারি উট চলছে—কয়েকটা গরুর গাড়ি দুটো ঘোড়া চলে গেল—এর মধ্যে বিচিত্রভাবে রাস্তার ধুলো যা উড়ল তাই যেন চোখে পড়ল, রাস্তার উপর পিচের কালো দাগ ঠিক চোখে পড়ল না—তেমনিভাবেই উটের সারি বয়েল গাড়ি ঘোড়া ঘোড়সওয়ারই চোখে পড়ল—মোটর কার এবং মোটর ট্রাক বিচিত্রভাবে আড়াল পড়ে গেল। দেখলাম তবু তারা ছায়া ফেলে গেল না।

ফকীরসাহেব সেই নির্জন উত্তপ্ত অপরাহ্নে তাঁর কাহিনী বলার ভঙ্গির মধ্য দিয়ে আমাদের মনের চোখের সামনে এ-কালের বাস্তবের প্রকৃতির বুকে সে-কালকে পরিস্ফুট করে তুলেছিলেন। সামনে প্রান্তরের মধ্যে দূরে দিকচক্রবালে ধূলিধূসরতার মধ্যে মনে হচ্ছিল হয়তো জাঠ ফৌজ কি বর্গী ফৌজ কি বাদশাহী ফৌজ বা দুর্ধর্ষ গুজর ডাকাতদের ঘোড়াগুলি মাটির সঙ্গে সমান্তরাল ভঙ্গিতে দেহখানাকে টান করে ছুটে চলেছে। ফকীরসাহেব বলছিলেন,—

প্রথমেই তো বলেছি বাবুজী, দুনিয়াতে মানুষের পয়দা হবার পর থেকেই শুরু হয়েছে খোদার দুনিয়াকে তাঁর মালিকানি থেকে ছিনিয়ে নেবার লড়াই। শয়তান লড়ছে বাবুজী। শতরঞ্জি খেলার ছকে মানুষকে গুটির মত বসিয়ে লড়াই চলছে। জমিনের মালিকানি ঔরতের মালিকানিই হল শয়তানের দুনিয়া। আছে—আরও কিছু আছে। আছে কড়া আরক, শরাব। বিশেষ করে সে-কালে যখন আমীর উজীর মনসবদার জায়গীরদার নবাব সুলতান রাজা মহারাজা বাদশাহরাই দুনিয়ার সব তখন মুল্কের মালিকানা আর ঔরতের সুরত আর জোওয়ানিই ছিল সব থেকে বড় লোভের সামগ্রী, সব থেকে বড় টোপ। এ টোপ শয়তানের টোপ। মেছুড়ে যেমন পচা গন্ধওয়ালা খাবার জলে ফেলে দেয় তারপর বঁড়শিতে টোপ গেঁথে ছিপ ফেলে তেমনিভাবেই সে হিন্দুস্তানের দীঘিতে চার করে ছিপ

ফেলে বসেছিল।

সেকালে যত লড়াই যত হামলা হয়েছে তা শুধু মুল্ক নিয়ে লড়াই কোথাও হয়নি। সব লড়াইয়েই আগে আছে দৌলত আর ঔরৎ। নাদিরশাহ যাবার সময় জমিন নিয়ে যায়নি, ও নিয়ে তো যাওয়া যায় না, নিয়ে গিয়েছিল সোনা রুপা দৌলত আর নওজোওয়ানী সুরতবালী জেনানী। কম না বাবু লাখো দরুনে। তাবারিখ দেখো তুমি।

পাঞ্জাবে শিখে মুঘলে আফগানে হামলা হয়েছে—লুঠ হয়েছে ঔরৎ আর দৌলত। শিখেরা জবরদস্ত জাত—ওদের জাত সহজে যায় না। ওরা মুসলমানকেও শিখ করে নেয়। ছিনিয়ে নেওয়া জেনানী ছিনিয়ে নিয়ে আসে। হিন্দুর মত ফেলে দেয় না। থাক বাবু, এখন যা হয়েছিল শোনো।

রোহিলখণ্ডের লড়াই তখন চরমে উঠেছে। দনাদ্দন কামানের গোলা গিয়ে পড়েছে পাথলগড়ের উপর। পাথলগড়ে আট আটটা ভারী জবর কামান ছিল। সেগুলো কিন্তু গর্জাচ্ছিল না। কারণ কি বাবুজী যে, তখন ঘাউসগড় পাথলগড় ছেড়ে রাতের পর রাতে কয়েকটা গোপনপথে রোহিলারা পালাচ্ছে তরাইয়ের দিকে। পাথলগড় ঘাউসগড় থেকে সিপাহী কমে এসেছে। সিপাহী মরেছে সিপাহী জখম হয়েছে সিপাহী পালিয়েছে কিন্তু নতুন সিপাহী আর আসেনি। ভারী কামানগুলো দাগবার জন্যে গোলন্দাজ ছিল ফিরিঙ্গীরা। ফিরিঙ্গীরা গতিক দেখে পালিয়েছে। রোহিলা যারা কামান দাগতে পারত তারা তাদের জায়গায় এসে মরেছে। জখম হয়েছে। নতুন লোক তৈরী হয়নি যারা দাগতে পারে সে কামান। তাই কামানগুলো চুপ।

ওদিক থেকে বিপুল গর্জন করে উঠছে বাদশাহী কামান। দেখতে দেখতে সশব্দে ভারী গোলা এসে পড়ছে কেল্লার গায়ে।

ঘাউসগড় পাথলগড় পড়বে, রোখা যাবে না।

গোলাম কাদের সেই দিনই স্থির করেছে রাখবে না কেল্লা, রাখবে না শহর। রাখবার দরকার নেই।

কি দরকার কেল্লা রেখে রুখে? জবিতা খাঁ ইসলাম ছেড়ে শিখধর্ম গ্রহণ করেছে। জবিতা খাঁয়ের নবাবী সুলতানী রাখার কোন জরুরৎ নেই। বরবাদ হয়ে যাক জবিতা খাঁ। কিন্তু নিজের গর্দান বাঁচবে কিসে? শুধু গর্দান নয়, তার সঙ্গে গোলাম কাদেরের চাই জবিতা খানের নবাবী—তার রোহিলখণ্ড। তাই বা হাতে আসবে কিসে?

—বাবুজী! ফিস্ ফিস করে কানের কাছে সে পরামর্শ যুগিয়ে দিল কালাশের।

কালাশের বাদশাহী ফৌজের ছাউনি থেকে শলাহ পাঠালে। শলাহ পাঠাবার কায়দা ছিল তার অনেক। কবুতর বহুৎ পুরানো কায়দা বাবুজী। সারা দুনিয়া ভর্ এ কায়দার চল ছিল। আরও ছিল অনেক কায়দা। ছোকরী ছোকরা ফকীর সন্ন্যাসী এরা যেত আসত। কালাশেরের এক কায়দা ছিল বাবুজী—সে পাঠাতো কুত্তা।

সেই যে কুত্তা, যে-কুত্তাকে গুলবদনী দেখেছিল ওই অমৃতেশ্বরের চত্বরে সেই রাত্রে—সেই কুত্তা। কুত্তাটার রং ছিল মিশকালো আর তার চোখ দুটো ছিল বিল্লীর মত কি শেরের মত নেকড়ার মত বলতে পার। যেন জ্বলত। আর সেই চোখ দুটোর চারিপাশে ছিল দুটো সাদা গোল ঘের। বড় বড় লোম ছিল সে ভয়ংকর কুত্তাটার। সেই লোমের ভেতর নিশান লিখে বেঁধে পাঠিয়ে দিত কালাশের। সে কুত্তাকে আর কেউ ধরতে পারত না—ধরতে পারত এক নবাবজাদা গোলাম কাদের।

কালাশের, বাবুজী, খুব শয়তান। হজরত রহিমশা নিজে বলেছেন। সে কথা মিথ্যা হতে পারে না। আর মিথ্যাই যদি হবে তাহলে কালাশের এ শলাহ দেবে কেন? কালাশের

লিখে পাঠালে—"নবাবজাদা, জলদি করে গড় খুলে দাও। না হলে জান চলে যাবে। মিরজা নজফ খাঁ পরওয়ানা এনেছে তোমার গর্দান পাঠাতে হবে বাদশাহী দরবারে। এখনও সময় আছে। তুমি ভেট ভেজো। তোমার গড়ের অন্দরে তোমার বাবার হারেমের এক বাঁদী আছে যাকে তোমার বাবা বলত 'আঁখো কি রৌশন'—হিন্দুস্তানী নয়নতারা। লোকে বলে সে নাকি পরস্তারও ছিল জাবিতা খাঁয়ের। তা হোক। যে-আদমী নিজের ধরম ছাড়ে—ইসলাম ছেড়ে শিখ হয় সে-আদমী বরবাদ হয়ে যাক। ওই বাঁদীর নাম নাকি পরভীনবাঈ; ওই পরভীনবাঈকে সঙ্গে দিয়ে দামী দামী ভেট পাঠাও। ফিরিঙ্গীদের তৈরী শরাব খাঁটি আরক আর দামী কিছু জহরত। তার সঙ্গে আশরফির তোড়া। পাঠাও। মনজুর আলি সাহেবের সঙ্গে শলাহ করেই তোমাকে এ মতলব পাঠালাম। কিন্তু দেরি আর করো না। আর ডরও করো না নবাবজাদা। দৌলত আর ঔরৎ দিয়ে যা মেলে সারা জিন্দগী ফকিরী করে কি তপস্যা করে তা কেউ পায় না। জলদি করো।"

গোলাম কাদের না বলেনি। বলবে কি বাবুজী সে তো নিজেকে তখন বিক্রি করে রেখেছে কালাশেরের কাছে। এ শলাহ তার খুব ভাল মনে হল। আচ্ছা শলাহ।

তার বাপের ওই বাঁদী পরভীন, বহুৎ পেয়ারের বাঁদী। সুরত যেমন তেমনি তার গান তেমনি তার চোখের চাউনি। একটু তেরচা করে চাইলে মনে হয় কলেজায় একটা দমকা হাওয়া এসে লাগল, কি একটা ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল।

পরভীনের বয়স তার থেকে বেশী। বাইশ চব্বিশ হবে। কাশ্মীরের মেয়ে। লুট হয়ে এসে পড়েছিল লাহোরের বাঁদীর হাটে। সেখান থেকে গিয়েছিল কাবুল; শাহ আবদালীর হিন্দুস্তানী বেগম হজরতমহলের বাঁদী হয়েছিল। সেখানেই শিখেছিল নাচ আর গান। সেখান থেকে এসেছিল দিল্লী। হজরতমহল তাকে পাঠিয়েছিল তার দুই মা বাদশাহ মহম্মদশাহের বেগম মালকাইজমানি আর সাহেবাইমহলের কাছে। পরভীনকে নিয়ে বিপদ হয়েছিল হজরতমহলের। মেয়েটা ছিল বাবুজী এক সর্বনাশী মেয়ে। পুরুষের মধ্যে যেমন কিছু পুরুষের ঔরৎ নিয়ে একটা লালস থাকে, লোভীর লোভের মত লালস, মেয়েদের মধ্যেও তেমনি মেয়ে আছে যাদের পুরুষের লালস থাকে। এই পরভীনের এই লালস ছিল এবং লালসটার ঢঙ ছিল আরও বিচিত্র। সে পুরুষ নিয়ে খেলা করতে ভালবাসত। ধরা দিতে চাইত না কিন্তু খেলা করত।

মহীউদ্দিন ঔরংজীবের মত জবরদস্ত মানুষ তার মাসীর বাগানে বেড়াচ্ছিলেন—তাঁকে দেখে একটা হিন্দু বাঁদী হীরাবাঈ—সে লাফ দিয়ে উঠেছিল গাছ থেকে ফুল পাড়বার ছল করে। তাই দেখে ঔরংজীব, শাহজাদা তখন তিনি, একেবারে বেহোঁশ হয়ে গিয়েছিলেন।

বাবুসাহেব, আবদালী বাদশাহের চার বেটাকে নিয়ে পরভীন বাঁদী সেই খেলা খেলতে শুরু করেছিল। বিব্রত হয়ে উঠেছিল হজরতবেগম। মেয়েটার জীবনের ভয় পর্যন্ত ছিল না।

শাহ আবদালীর তখন জীবনের শেষ দিক। তখন তাঁর দেহ ভেঙেছে, রোগ ধরেছে, নাকের ভিতর দুরারোগ্য ঘায়ের আরম্ভ হয়েছে। নাক ফুলেছে। সেই দেহেই আমেদশা আবদালী হিন্দুস্তানে এসে ঢুকলেন। হিন্দুস্তানে বাদশাহী ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছে; প্রথমেই পাঞ্জাবে শিখেরা তখন দলে দলে মিলে একটা বড় দল হয়ে উঠেছে; ওদিকে দক্ষিণে আবার মারাঠারা উঠে দাঁড়িয়েছে; জাঠ রাজপুত এরাও তখন আর মুঘল বাদশাকে মানতে চায় না। ওদিকে বাংগাল মুল্কে ফিরিঙ্গীরা দেওয়ানী নিয়ে চেপে বসেছে। শা আলম বাদশা এলাহাবাদে বসে বসে আফিং খাচ্ছে আর ঝিমুচ্ছে। কিন্তু দুরিদুরানী শাহ আবদালীও মানুষ। দেহখানা তাঁর রক্তমাংসের; সে রক্তমাংসের দেহ তাঁর ভাঙা, তার

উপর নিজের আফগান ফৌজ আর সে ফৌজ নাই। সে ফৌজও ভিতরে ভিতরে ভেঙেছে। হিন্দুস্তানে বাদশা নাই। বাদশার মা বহেন বেটাকে আগলে বসে আছে নাজিবউদ্দৌলা। সে নাজিবউদ্দৌলাও তখন জাঠরাজা জবাহির সিংয়ের সঙ্গে লড়াই করে জখম হয়ে গেছে। তারও কোন হিম্মৎ অবশিষ্ট নেই। এক সেই নাজিবউদ্দৌলা ছাড়া আর কেউ দুরানী বাদশাকে সালামৎ জানাতে এল না। বাদশা আবদালীরও শক্তি হল না সাহস হল না যে তাঁর ফৌজ নিয়ে আর একবার সরহিন্দ থেকে বাংলা পর্যন্ত সমস্ত হিন্দুস্তান ঠেলে হিন্দুস্তানের ভিতরে ঢুকে লুঠে জ্বালিয়ে ছাই করে দিয়ে যান।

বরং হিন্দুস্তানে এসে যেন বিপদে পড়েছেন তিনি। তাঁর চারিদিকে শিখেরা নেকড়া বাঘের মত লুকিয়ে লুকিয়ে রয়েছে; ওত পেতে রয়েছে। প্রতিরাত্রে আফগান তাঁবুর উপর লাফিয়ে পড়ে একখাবলা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে যায়। শাহ আবদালী পাঞ্জাবে ছাউনি ফেলে তাকিয়েছিলেন দিল্লীর দিকে। এমনটা বুঝতে পারেননি দুরানী বাদশা। বুঝতে পারেননি যে—

ফকীরসাহেব আমাকে বলেছিলেন—আবদালী বাদশাহ লড়াই অনেক করেছেন লুঠ করেছেন বহুৎ খুন করিয়েছেন হাজারো হাজারো লাখো লাখো জান বরবাদ করেছেন; ঔরতে তাঁরও লালস ছিল। তবু বাবুজী আল্লাকে মানতেন—শয়তান বনে যাননি। তিনি দেখতে পেলেন আল্লা নারাজ। আরও দেখলেন হিন্দুস্তান গুনাহে গুনাহে শয়তানকে ডেকে এনেছে। এখানে গেলে সর্বনাশ হবে। আল্লা নারাজ!

তিনি ফিরবেন ঠিক করলেন। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন বেগমদের মধ্যে হিন্দুস্তানের বেটীরা। তুমি জরুর জান বাবুজী নাদিরশাহের বেটার সঙ্গে সাদী হয়েছিল এক শাহজাদীর; সে শাহজাদী বিধবা হলে তাকে নিকাহ করেছিল আবদালী বাদশা—আর মহম্মদশাহের বেটী হজরতমহল। এরা সঙ্গে এসেছিল। এদের আপনজনেরা এল বেগমদের সঙ্গে দেখা করতে। হজরতমহলের সঙ্গে দেখা করতে এলেন বাদশাহ মহম্মদশাহের দুই বেগম মালকাইজমানি আর সাহেবাইমহল।

মালকাইজমানি বাবুজী ফরুকশের বাদশাহের বেটী। তার শলাহ নিয়ে মহম্মদশাহ কামকাজ করতেন। তিনি এসে তাঁবুতে ঢুকেই দেখলেন এই পরভীনকে। সে পাংখা নিয়ে খড়ী ছিল, মাতাজী বেগমসাহেবাকে বাতাস দেবে। চোখ দুটো তার ঝকমক করছিল।

ফকীরসাহেব থেমে গেলেন হঠাৎ। একটু হাসলেন। যেন এমন কিছু হঠাৎ মনে হয়েছে তাঁর যাতে এ হাসি আপনি ফুটেছে তাঁর মুখে। নিজেই বললেন—বার দুই তিন বেশ ঘাড় নেড়ে উপভোগ করে বললেন—বাবুজী, দুনিয়ায় এখানে ওখানে সেখানে আজ কাল পরশু যা ঘটে যাচ্ছে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছড়িয়ে—যা মনে হচ্ছে কিছুর সঙ্গে কিছুর সম্বন্ধ নাই তা যদি বেশ হুঁশিয়ারির সঙ্গে পরের পর ছকে ছকে গেঁথে সাজিয়ে যাও বাবুজী তাহলে দেখবে একটার সঙ্গে একটা আলগ নয়, সবগুলো একসঙ্গে গাঁথা। বাবুজী, ধূপ হল তাই বরখা এল—বরখা এল পানি এল হাওয়া হল। ফসল হল। শীত এল। মানুষের জিন্দগীতেও তাই। নাদিরশা এল তাই আবদালী এল; বরগীরা লাফ দিল। হিন্দুস্তান জখম হল—বাদশাহী খানখান ফাটা বর্তনের মত হয়ে গেল।

কপালে হাত ঠেকিয়ে ফকীর বললেন—এ লেড়কীও ঠিক তেমনিভাবে সেদিন নসীবের এক ছকে দাঁড়িয়ে ছিল। আর মাল কাইজমানি তাঁবুতে ঢুকে তাকে দেখেই ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

হজরতবেগম বললেন—ও একটা বাঁদী। পরভীন ওর নাম।

পরভীন মুচকে হেসে হেঁট হয়ে দুসরাবার কুর্নিশ করলে।

মালকাইজমানি বললেন—হাসলি কেন বেয়াদপ বাঁদী কোথাকার!

—কসুর হয়েছে হুজুরাইন। হাসছিলাম নসীবের আক্কেল দেখে। নসীব যে কাকে নিয়ে কি করে কখন!

হজরতবেগম বললেন—ওর তরিবৎ আদপ খারাপ বটে। বার বার সাবধান করে দি। বলি গর্দান যাবে। তবু ওর ভয় নাই। বলে ভুলে যাই। কখনও বলে গর্দান গেলে একবারই যাবে। শাহজাদাদের নিয়ে ওর খেলার শখ।

—ওকে যেতে বল্ এখান থেকে।

বাঁদী পরভীনকে সরিয়ে দিয়ে মালকাইজমানি হজরতমহলকে বলেছিলেন—কোথায় পেলি? কাদের মেয়ে?

—কাশ্মীরী মেয়ে। বাপ-মায়ের খবর জানি নে।

—জরুর কোন তওয়াইফের মেয়ে। নাচ গান ভাল জানে, না?

—হাঁ। সেই গুণেই আজও ওর গর্দান যায়নি। বাদশাহ দুরিদুরানী ওকে বলেন কুত্তি। বাদশাহের চার ছেলেকে ও সমানে টানে। নজরা মারে। আমি ওকে তবু রেখেছি, বাদশাহের পরে যদি কাজে লাগে! আবার ডরও লাগে।

—আমাকে ওকে দিবি?

—কি করবে?

—খেলব।

—খেলবে?

—হাঁ। খেলবার সময় হয়েছে। শাহ আলমকে হটিয়ে—

—বাঁকাকে?

—হাঁ। মহম্মদশাহ বাদশাহের বেগম আমি, আহম্মদশাহ আমার নিজের বেটা নয়—উধমবাঈয়ের বেটা হলেও মহম্মদশাহের বেটা। আহম্মদশাহকে অন্ধা করে ঠেলে দিয়ে আজিজুদ্দিন আলমগীর মসনদ নিয়েছিল। লালকেল্লা থেকে আহম্মদশাহের বিধবা আর শাহজাদা বাঁকাকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছি। সামান্য হাবেলীতে দিন কাটছে। তনখা সময়মত মেলে না। এখন শাহজাদা বাঁকাকে সামনে করে লালকেল্লায় ঢুকবার আর একবার চেষ্টা করব। এ বাঁদীকে তালিম দিলে ও শয়তানকে বশ করে আনবে। পুরুষের লালস এই ধরনের ঔরতের ওপর বেশী। তোর বাপের মন মালকাইজমানি ফরুকশের বাদশার বেটীতে জমেনি। সাহেবাইমহল তোর মা—তার রূপ তো দেখেছিস। তাতে ভোলেনি। এক হিন্দু নাচওয়ালীর বেটী উধমবাঈ—তাকে দেখে বাউরা হয়ে গেল। বেটী, আহম্মদশা আমার বেটা হলে কি সাহেবাইমহলের বেটা হলেও এমন করে অন্ধা হয়ে ধুলোয় লুটিয়ে মরত না। মরল উধমবাঈয়ের বেটা বলে। উধমবাঈ হয়ে গেল বাদশাহের মা। নাচনেবালীর মগজ নিয়ে কি বাদশাহী চালানো যায়? হায় রে হায় রে মুঘলবাদশাহীর নসীব!

একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—উধমবাঈ মরেছে। আহম্মদশা মরেছে—আহম্মদশাহের বেগম এনায়েৎপুরী বেগম বেঁচে আছে আর আছে শাহজাদা বাঁকা। তারা এখন আমার কব্জায়। দৌলত হীরা জহরত আর টাকাকড়ি যা, তা আমাদের দুই সতীনের। আমরা নইলে উপোস থাকতে হয়। আর বাঁকাকে আমি ভালবাসি। তাকে মসনদে বসাতে পারলে সে আমার কথায় চলবে। আমি একবার দেখতে চাই। ওই বাঁদীকে আমাকে দে। ওর মধ্যে শয়তান আছে রে—সে সব কাম হাসিল করে দেয়।

হজরতবেগম দিয়েছিল তাই।

পরভীনও খুশী হয়ে এসেছিল। গর্দান যাবার ভয়েও তার যে-স্বভাব বদলায়নি সে-স্বভাব ভয়ের সামনে থেকে সরে যেতে বহুৎ খুশী হয়ে উঠেছিল। ছায়ার আওতা থেকে রৌদ্রে এসে ফুলের গাছ যেমন হেসে ওঠে গাঢ় সবুজ হয়ে ওঠে ফুলে ভরে ওঠে, তেমনি-ভাবে হেসে গাঢ় সবুজ ফুলন্ত হয়ে উঠেছিল।

সারা হিন্দুস্তানের রাজধানী দিল্লী। দিল্লীতে শয়তানের খাস বাগিচা। দিল্লীর জমিনে দিল্লীর পানিতে দিল্লীর হাওয়াতে তখন শয়তানের জাদু শয়তানের ভেলকি চলছে ; সেখানে এসে পরভীন যেন ঝাঁপির সাপ গর্তের মধ্যে ঠাঁই পেলে, পুকুরের মছলি যেন দরিয়ায় ছাড়া পেলে।

শাহজাদা 'বাঁকা' শাহের রাতের মজলিস গুলজার হয়ে উঠল। বুড়া নাজিবউদ্দৌলা নাদিরশাহী জিন্দগীর নওজওয়ান—আবদালশাহী আমলের মর্দানা—সে শরাব খেতো না, ঔরতেও ঝোঁক ছিল না। ঝোঁক ছিল মুল্কের মালকানিতে, লোভ ছিল সোনায় রুপায় জহরতে, আর নেশা ছিল লড়াইয়ে। কিন্তু বেটা জবিতা খাঁয়ের জিন্দগী আলাদা। সে জিন্দগী কালাশেরের জিন্দগী। একই বয়স দুজনের। তার উপর আবদালীর ডানহাত হিন্দুস্তানের মীরবক্সী নাজিবউদ্দৌলার বড় বেটা সে, দিল্লীতে তখন বাদশাহের বেটা জোয়ান-ভক্তের চেয়েও তার খাতির বেশী। শরাব আর ঔরৎ নিয়ে তার রাত দিন কাটত।

মহম্মদশাহের শাহীবেগম মালকাইজমানি ফরুকশের বাদশাহের বেটী—মহম্মদশাহের বেগম—যে মহম্মদশাহ নওজোওয়ানিতে সৈয়দ ভাইদের খতুম্ করেছিল।

সে এ বাঁদীকে ঘরে রাখেনি। শাহজাদা বাঁকা তখন বড় হয়েছে। পরভীন তাকে পাকড়াবার আগেই জবিতা খাঁয়ের হাতে দিয়ে বলেছিলেন—জবিতা খাঁ, তোমাকে ভালবাসি। ভালবাসি তোমাদের বংশকেই। কেন জান ? নবাব নাজিবউদ্দৌলা বাদশা আবদালীর সব থেকে বড় ভরসা হিন্দুস্তানে। নবাবসাহেবের হিম্মতেই দুশমন শয়তান উজীর গাজিউদ্দিনকে দিল্লী ছেড়ে পালাতে হয়েছে। গাজিউদ্দিন আহম্মদশাহ বাদশাকে অন্ধা করেছে—মহম্মদ-শাহের বংশকে লালকেল্লা থেকে দূর করেছে। আর সেই মসনদে বসেছিল আজিজুদ্দিন আলমগীর—তারপর এখন আলিগহর শা আলম নাম নিয়ে এলাহাবাদে জানের ডরে লুকিয়ে আছে। দিল্লীর বাদশাহী তক্ত খালি। নাজিবউদ্দৌলা নবাবসাহেব বলে—আমি বুড়ো হয়েছি—বাদশাহী—এ নামকে ওয়াস্তে যে বাদশাহী তাই নিয়ে আর খুনোখুনি করতে পারি না। বাত ঠিক জবিতা। কিন্তু এ বাত জরুর বুঢ্ঢা আদমীর বাত।

ঠিক এই সময়েই পরভীন এসে দাঁড়িয়েছিল ঘরের দরওয়াজায়—হাতে ছিল তার পান আতরের থালি ; আর তার পিছনে ছিল আর দুই বয়সওয়ালী বাঁদী। সারেঙ্গী আর তবলা বাঁয়া ঘরে রাখাই ছিল, তারা এসে তার সামনে বসল। পরভীন এসে দাঁড়াল জবিতা খাঁয়ের সামনে।

হাঁটু গেড়ে বসে কুর্নিশ করে থালাখানা সামনে নামিয়ে দিয়ে একটু হাসলে। সে হাসি চমকে ফুটে ওঠে বিদ্যুতের মত এবং তেমনিভাবেই মিলিয়ে যায়।

ফকীরসাহেব বললেন—মালকাইজমানি জানতেন যে জবিতা খাঁয়ের কাছে কোরান কি ইসলামের কোন দাম নেই। শুধু জবিতা খাঁ কেন সে সময়ে অধিকাংশ মানুষই ওইরকমের ছিল। তবুও মালকাইজমানি তাকে কোরান ছুঁয়ে হলফ করিয়ে নিয়েছিলেন যে, মীরবক্সী হয়ে জবিতা খাঁ শাহজাদা বাঁকাকে মসনদে বসাবে।

সেই হলফ করিয়ে পরভীনকে দিয়েছিলেন জবিতা খাঁকে। বলেছিলেন—মসনদে বসালে দশ লাখ রুপেয়া আমি দেব। তুমি পাবে।

একখানা একরারনামাও তৈরী হয়েছিল।

গোপনে ডেকে পরভীনকে বলেছিলেন—দেখ্‌ রোহিলা পাঠানের বাচ্চা—জবরদস্ত বটে দুর্দান্তও বটে কিন্তু বুরবক আর বেওকুফ; দিল ওদের নাই। তোকে বাত দিচ্ছি শাহজাদা বাঁকা মসনদে বসলে তোকে ফিরিয়ে আনব। বাদশাহের পরস্তার করে দেব। যেমন ঔরংজীব বাদশার ছিল উদিপুরীমহল। বল—তুই ওকে কব্জায় এনে এই কাম করাবি।

পরভীন কুর্নিশ করে বলেছিল—কিসের কসম খাব বলুন বেগমসাহেব!

মালকাইজমানি বলেছিলেন—খুদা কসম।

ও ছাড়া কসম খুঁজে তিনি পাননি।

পাওয়া যায় না বাবুসাহেব। যদি কসম কি হলফের কিছু দাম থাকে তবে খুদার নামেই তার দাম তার বাইরে কোন দাম নেই।

এ বাঁদী সেই বাঁদী। পরভীন। জবিতা খাঁ তাকে নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে গিয়েছিল। শরাব নাচা আর গানা। তার জন্যে মজলিস লাগে না। ফরাশ লাগে না। বাবুজী, তখন দিল্লীর আর হিন্দুস্তানের হালৎ এমনি হয়েছে যে আমীর নবাবের মজলিস চলেছে তো চলেছে—এক দিন দু দিন সেইখানেই খানা সেইখানেই পিনা সব সেইখানে। সে ঘরে চলেছে বাগবাগিচায় চলেছে, যমুনার উপর বজরায় চলেছে, আবার বাবুজী যমুনার কিনারায় বালির উপর বসেছে শরাব নিয়ে। হল্লা করেছে—তরবুজা খরবুজার ক্ষেত হয় যমুনা কিনারে—সেই তরবুজা খরবুজার ক্ষেত লুঠ করেছে হারেমের বিবিরা—আমীর মেজাজ খুশ্‌ করেছে। জবিতা খাঁ এই পরভীনকে সকলের উপর টেক্কা দিয়েছিল।

বাবুজী, খোজা সিপাহী আর তাতারনী ঔরৎ সিপাহী পাহারার মধ্যে জবিতা খাঁ আর এই বহুৎখুবসুরতী নওজোওয়ানী পরভীন পুরা নাঙ্গা হয়ে পড়ে থাকত নেশায় বেহোঁশ হয়ে।

নবাব নাজিবউদ্দৌলা বেশী দিন বাঁচেননি। বাঁচলে বেটার সঙ্গে ঝগড়া বাধত।

এ ঔরৎ সেই ঔরৎ—পরভীন বাঁদী। জবিতা খাঁ ওকে আদর করে বলত আঁখো কি রোশন—হিন্দুস্তানী নয়নতারা।

ঘাউসগড় তখন পড়োপড়ো। দনাদ্দন কামানের গোলাগুলো গিয়ে পড়ছে শহরে কেল্লার পাঁচিলে গড়খাতের জলে; ভাঙছে—কিছু ভেঙেছে; শহরের লোকেরা প্রায়ই ভেগেছে; শহরের বস্তি বাজার পুড়ছে; রোহিলা সিপাহীরাই লুটছে। এরই মধ্যে ঔরৎ চিল্লাচ্ছে। টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে সিপাহীরা। এরই মধ্যে শহরে ঢুকল সেই কালো কুত্তাটা। যেটাকে দেখলে লোকে ভয় খায়। যার চোখ দুটো ধ্বকধ্বক করে আঙরার মত। যার সর্বাঙ্গে ঘন কালো রঙের বড় বড় রোঁয়া। আর ওই ধ্বকধ্বকে চোখ দুটো আশ্চর্য দুটো সাদা গোল ঘের দিয়ে ঘেরা। শহর থেকে ঢুকল গিয়ে কেল্লার ভিতরে।

তারই রোঁয়ায় বাঁধা ছিল চিঠি।

গোলাম কাদের সেই চিঠি পড়লে। কালাশের চিঠি লিখেছে।—

"নবাবজাদা গোলাম কাদের, জলদি করে গড়ের দরজা খুলে দাও। মিরজা নজফ খাঁ বাদশাহী পরওয়ানা এনেছে কি গড় দখল করে তোমার গর্দান নিয়ে বাদশাহের কাছে পাঠাতে হবে। কিন্তু কোন ডর নাই। আমি আছি। দোস্ত মনজুর আলি আছেন। এক কাম

করো। তোমার বাপের হারেমের এক বাঁদী আছে যাকে তোমার বাবা বলত আঁখো কি রোশন—হিন্দুস্তানী নয়নতারা। পরভীন বাঈ। লোকে বলে সে নাকি তোমার বাপের পরস্তার ছিল। তা হোক। যে আদমী ধর্ম ছাড়ে তার সঙ্গে সম্বন্ধ নাই। আর তার পরস্তার—তার সঙ্গেই বা সম্বন্ধ কি? নবাবজাদা দুনিয়াতে, দুটো জিনিসের নামে জিন্দিগী চলে। দৌলত আর ঔরৎ। জহরত আর ওই ঔরৎ পরভীনকে ভেট ভেজো। এক কাম করো। জনাব লতাফৎ খাঁ উজীর আবদুল আহাদ সাহেবের মুখতার ও মুন্সী। উজীরের তরফ হয়েই সে এসেছে। সে খোজা। তার উপর আমীর গানাবাজনার এলেমদার লোক লতাফৎ খাঁ। সুতরাং পরভীনকে তার কাছে পাঠালে এমন কোন বদনামী তোমার হবে না। জলদি করো! ডর করো না। আমি জরুর বাঁচাব তোমাকে!"

গোলাম কাদেরের বয়স তখন সবে ষোল সতের।

বাবুজী, ওই যে বামুনওলী গাঁওয়ে সেই গুলবদনীকে অসহায় মুগ্ধ অবস্থায় পেয়ে তার উপর সেই যে হরিণের উপর বাঘের ঝাঁপ দেওয়ার মত ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল তার বছর খানেক পর। বছর খানেক ঘাউসগড়ে থেকে সে কেল্লা রেখেছে, সারা ঘাউসগড়ের কেল্লাদারি করেছে। বয়স সতের হলেও সে মনে মনে বেড়েছে। সে এ শলাহকে আচ্ছা শলাহ বলে আঁকড়ে ধরলে। হুকুম দিলে—ভেট সাজাও।

পরভীনকে ডেকে বললে—আপনার যা আছে গুছিয়ে নাও। তোমাকে যেতে হবে মুঘল ছাউনি।

পরভীন খানিকটা চুপ করে থেকে বললে—বহুৎ আচ্ছা। যাব। কিন্তু ও খোজার কাছে পাঠাচ্ছ কেন?

কাদের বললে—খোজা লতাফৎ খাঁয়ের তাঁবু থেকে মীরবক্সী মিরজা নজফের তাঁবু তো দূর নয়: আর লোক আছে—ওখান থেকে সে তোমাকে মীরবক্সীর হারেমে পেঁাছে দেবে।

—আচ্ছা। কাম কি? নজফ আলিকে খুশী করে ঘাউসগড় খালাস করতে হবে, নবাবজাদাকে ফরমান দেওয়াতে হবে?

—আরও কিছু আছে।

—ফরমাইয়ে।

—মিরজা নজফই আজ দিল্লীর বাদশাহীর সব থেকে বড় খুঁটো—খুঁটোটা বহুৎ জবরদস্ত। মজবুদ। ওটাতে ঘুণ ধরাতে হবে। ঔরতে শখ নেই, শরাব ছোঁয় না। লোকটা কোরান মাথায় দিয়ে নিদ যায়।

ঘাড় বেঁকিয়ে মুচকে হেসে পরভীন বলেছিল—মিরজা নজফকে জহান্নমে পাঠাতে হবে?

—হাঁ।

—কি বকশিস মিলবে?

—নজফ খানের কলেজা।

তার দিকে আঙুল দেখিয়ে সেই অপরূপ মোহময়ী মেয়েটা বলেছিল—তুমি যখন রোহিলখণ্ডের মালেক হবে তখন আমি ফিরে আসব—তখন তোমাকে আমি চাইব নবাবজাদা।

গোলাম কাদেরও ভয় পেয়েছিল এ কথায়।

মেয়েটা হেসে উঠেছিল।

শুধু তাই নয় বাবুজী।—ফকীরসাহেব বললেন—সে ঔরৎ ঔরৎ নয়, শয়তানী—সে সেই দিনই গোলাম কাদেরকে জহান্নমের মুখে রওনা করে দিয়ে বলেছিল—বন্দেগী নবাবজাদা, আমি যাব। আর তোমার কাম আমি হাসিল করে দেব।

॥ বারো ॥

আপত্তি করেছিল গোলাম কাদেরের মা। বলেছিল—ইজ্জৎ চলে যাবে। এ হয় না।

গোলাম কাদের বলেছিল—একটা বাঁদীর জন্যে ইজ্জৎ যায় না। সে পরস্তার হলেও যায় না। ইসলামের জিন্দাপীর ঔরংজীব বাদশা তার মাসীর খসম মেসোর পরস্তার বাঁদী-বেগম হীরাবাঈকে দেখে দেওয়ানা হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত নিজের এক পরস্তার ছত্তরবাঈকে মেসোকে বদলা দিয়ে হীরাবাঈকে হারেমে এনেছিল। মৌসীর সতীন ছিল হীরাবাঈ। এ দেশের কাফেররা তো তাকে মৌসীই বলে। তাতে ঔরংজীবের গুনাহ হয়নি—ছত্তরবাঈকে মেসোকে বদলা দিয়েছিল বলে ইজ্জৎ যায়নি। জিন্দাপীর শাহানশাহ আলমগীর বাদশাহের চেয়ে বড় ইজ্জৎ রোহিলাদের নয়। এ হতেই হবে। পরভীন যাবে।

মা অবাক হয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিল।

গোলাম কাদের আবার বলেছিল—আমি তাকে পাঠাচ্ছি উজীরের মুখতিয়ার-ই-মুশীর খোজা লতাফৎ খাঁ সাহেবের কাছে। তারপর সে যদি কাউকে বেচে কি খেলাত দেয় সে কথা আলাদা।

মা এতক্ষণে কথা বলেছিল—নজফ খাঁ মানবে?

—মানবে।

বাবুসাহেব!

নজফ খাঁ মেনেছিল। মানতে হয়েছিল তাকে। ঘাউসগড় থেকে যখন ভেট এসে পৌঁছুল তখন উজীরের মুখতিয়ার-ই-মুশীর লতাফৎ খাঁ আর মীরবক্সী মীর নজফ খাঁ বসেছিল লতাফৎ খাঁর তাঁবুতে। বান্দা আর বাঁদীরা খুঞ্চিপোষ দিয়ে ঢাকা পরাতগুলি সামনে ধরে দিল, বান্দাদের সর্দার একে একে খুঞ্চিপোষগুলি তুলে সরিয়ে নিল। সোনার কামদার বানারসী, ঢাকাই মসলিন, কাশ্মীরী গালিচা, মখমল, চন্দনকাঠের বাক্সে জহরত, মখমলের থলিতে আশরফি—একটা একটা করে খুলে দেখাচ্ছিল সে। এমন সময় তাঁবুর দরজায় লাগল এক মখমলে ঢাকা ঝালরদার পালকি। তার দুই দিকের দরজা ধরে জনকতক বাঁদী। তারাও নওজোওয়ানী। তারাই পালকির দরজা খুলে দিল। পালকি থেকে বেরিয়ে এল পরভীন। সূক্ষ্ম ওড়নায় ঢাকা মুখ। যেন কুয়াসায় ঢাকা মনে হচ্ছে। কিন্তু মুখখানা এমন আশ্চর্য উজ্জ্বল গোলাপী যে কুয়াসার মত সফেদ সূক্ষ্ম ওড়নার আবরণকে ভেদ করেও ফুটে উঠেছে তার গোলাপী জৌলুস।

লতাফৎ খাঁ আর মিরজা নজফ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল এই আশ্চর্য মেয়েটির দিকে। মেয়েটি তার ওড়নাটিকে ঈষৎ ফাঁক করে একবার তাকালে লতাফতের দিকে, একবার তাকালে মিরজা নজফের দিকে।

তারপর সেই আশ্চর্য ঔরৎ বাবুজী এগিয়ে এসে দুই বাদশাহের দুই আমীরের সামনে অল্প নীচু হয়ে কুর্নিশ করে আস্তে তার ওড়নাখানা মাথার উপর তুলে দিয়ে হেসে বললে—জনাবআলি উজীরসাহেবের মুখতিয়ার আমীর লতাফৎ খাঁসাহেব আর মীরবক্সী খান-ই-খানান নজফ খান আমীর-উল-উমরা জনাবআলি—এ বাঁদীর নাম পরভীন বেগম। নবাবসাহেব জবিতা খান সর্দারজীর আমি পরস্তার বেগম। আমি এসেছি ঘাউসগড়ের তরফ থেকে।

এই সময়েই এসেছিল কালাশের। বাদশাহী হারেমের নাজির খোজা মনজুর আলি সাহেবের খাস মুন্সী হিসেবে সে এখানে মোতায়েন ছিল।

বাব্‌জী, পরীভিন চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল রানীর মত ; এতটুকু দিল্লগী তার তরিবতের মধ্যে দেখা যায়নি। শুধু তাকিয়েছিল সে নিঃসংকোচে একবার এর দিকে একবার ওর দিকে।

সবাই চুপ হয়ে গিয়েছিল।

পরভীন আবার বলেছিল—এই সামান্য ভেট পাঠিয়েছেন নবাবজাদা আপনাদের জন্যে। এ সব কেবল আপনাদের জন্যে। জনাবআলি—। চোখের দৃষ্টি নামিয়ে পরভীন বলেছিল—জনাবআলি, আমিও ভেট। এককালে নবাবসাহেব জবিতা খানের পরস্তার ছিলাম ; আজ ঘাউসগড় পড়বে ; ঘাউসগড়ের কেল্লার হারেমে রোহিলখণ্ডের নবাব নাজিবউদ্দৌলা সাহেবের বুড়ী বেগম থেকে বেটা বহু অনেক আছে। তাদের ইজ্জতের দাম হিসেবে আমি এসেছি—আমিও ভেট।

ঘাউসগড়ের কেল্লার মধ্যে রোহিলা নবাবসাহেবের বেগম বেটা বেটী মেহমানদের জান ইজ্জত এর জন্যে আমি এসেছি। আমার দাম।

বলে আবার সে কুর্নিশ করেছিল।

হঠাৎ যেন নজফ খানের চমক ভেঙেছিল। মিরজা নজফ খাঁ যেন একটা নেশা থেকে কি একটা ঘুমের ঘোর থেকে কাটিয়ে উঠে একটু নড়েচড়ে বসেছিল। তারপর বলেছিল—বাদশাহের কাছে সওয়ার পাঠিয়ে মত নিতে হবে খানসাহেব। আর এ ঔরৎকে নিয়ে আমরা কি করব ?

লতাফৎ কিছু বলবার আগেই পরভীন বলেছিল—জনাবআলি খান-ই-খানান আমির-উল-উমরা মীরবক্সী খানবাহাদুর আরও কিছু বলবার আমার আছে। আমি হাটে কেনা বাঁদী। কিন্তু আমি নাচগান জানি—দিল খুশ করতে পারি। আমি জনাবআলির কথা জানি।

নজফ আলি উঠে চলে গিয়েছিল বাবুজী।

মিরজা নজফ আলি খাঁ আপনার দেমাকে উঠে চলে গিয়েছিল। তা তাকে সাজত বাবুজী। তেমনি শক্তপোক্ত সাফা মানুষ ছিল নজফ আলি। ইরানী আমীরের ঘরের ছেলে—এদেশে বচপনে এসেছিল। বড় গরীব ছিল। হিন্দুস্তানে মুরুব্বী কেউ ছিল না। তার মা বলে দিয়েছিল—মরুব্বী দুনিয়ায় একমাত্র পয়গম্বর রসুল। তাঁর হুকুমৎ কোরানের কানুন মেনে চললে পয়গম্বর খুশী হয়ে খুদাতায়লার কাছে পেশ করেন তার জন্যে আর্জি। বলেন—মালিক ফলানা ইনসান বহুত গরীব কিন্তু তবু কোরানের কানুন মেনে চলে। এর নসীব বদলানো উচিত। খুদা হুকুমৎ জারি করেন—নসীব বদল্ যাক। নসীব বদলে যায়।

নজফ আলি খাঁ হিন্দুস্তানে এসে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার কাছে নোকরি নিয়েছিল। কিন্তু নবাব সুজা ছিল শরাব আর ঔরতে আসক্ত। সেখান থেকে নজফ গিয়েছিল বাংলা মুলুক। নবাব কাসেম আলি খাঁর পল্টনে কাজ নিয়েছিল। তাবারিখ তুমি তো জান বাবুজী। ইতিহাসে তো সব খুলে লেখা আছে—বাংলা মুলুকে প্রথম পত্তন হল ফিরিঙ্গীশাহীর। মীরজাফর খাঁ বেইমানি করেছিল নবাব সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে। তারপর মীরজাফরকে ঠেলে নবাব হল মীরকাসেম আলি খাঁ। সে-ই প্রথম আর সে-ই শেষ চেষ্টা করলে ফিরিঙ্গীকে হঠাবার জন্যে। মকসুদাবাদ থেকে নবাবী মসনদ উঠিয়ে নিয়ে গেল মুংগেরে। নতুন ধাঁচে নয়া ছাঁচে পল্টন তৈয়ার করলে।

তখন সারা হিন্দুস্তানে ফিরিঙ্গীরা চমক লাগিয়ে দিয়েছে। ফিরিঙ্গী ফৌজী কানুন কুচকাওয়াজ কায়দা যেমন চোখ ধাঁধায় তেমনি মজবুদ তাদের কায়দা—তার সঙ্গে তাদের নতুন

বন্দুক তাদের কামান তাদের বারুদ গোলা। হিন্দুস্তান জুড়ে মুল্কে মুল্কে সাড়া পড়ে গিয়েছে ফিরিঙ্গী সিপাহসালার মীরআতীশ গোলন্দাজ রাখবার। তারা নয়া কায়দায় ফৌজ তৈয়ার করছে। মীরকাসেম আলি খাঁ এনেছিল দুজন ফিরিঙ্গীকে—আর্মানী ফিরিঙ্গী সমরু আর গুরগিন দুই ভাই এসে কাসেম আলির পল্টন তৈরি করছিল। মীর নজফ আলি তখন নওজওয়ান—সবে বিশ-বাইশ বছর বয়স হয়েছে—সে কাসিম আলির নোকরি নিয়ে এই কায়দা দেখলে এই কায়দা শিখলে। আর ঘরে ছিল তার এক বড়ীবহেন খাদিজা সুলতানা—সে ঔরৎ হয়েও ছিল ফকীর। সাদী করেনি। তসবী জপত আর ভাই মীর নজফের জন্যে ডাকত পয়গম্বর রসুলকে।

গোঁড়া মুসলমান মীর নজফকে পয়গম্বর মেহেরবানি করলেন। খুদার হুকুমে তার নসীব বদলাল। বক্সারের লড়াইয়ে মীরকাসেম সুজাউদ্দৌলা শাহজাদা আলিগহর ইংরেজ ফিরিঙ্গীর কাছে হারল, মীরকাসেম পালাল : সুজাউদ্দৌলা ফিরে গেল লক্ষ্নৌ ; শাহজাদা আলিগহর ইংরেজকে বাংলার দেওয়ানী দিয়ে এলাহাবাদের কেল্লাতে বসে রইল ; ইংরেজ তাকে আটকেও রাখলে। ওদিকে দিল্লীতে নাজিবউদ্দৌলা জবিতা খাঁও চাইলে না যে বাদশা শাহ আলম ফিরে আসুক। তখন মীর নজফ এসে নোকরি নিলে বাদশাহের।

মীর নজফ ফারাক্কাবাদে বাঙ্গাশ নবাবের কাছে পেশকস আদায় করে পথলগড় দখল করে বহু দৌলত আসবাব নিয়ে দিল্লী গিয়েছিল। সে দৌলত সে আসবাব দিল্লীর লাল-কেল্লায় দিল্লীর ওমরাহদের হাবেলী মঞ্জেল থেকেই লুঠে আনা। তারপর এই ক'বছরে জাঠ রাজাদের গুজর জমিদার রাজাদের সঙ্গে লড়াই করে বাদশাহী অধিকার কায়েম করেছে। সঙ্গে সঙ্গে খাজনা আদায় করেছে। এই তিন চার বছরে দিল্লীর বাদশাহীর যেন পোশাক বদলেছে ঢঙ বদলেছে, সেই পুরানো ছেঁড়া পোশাক আর গরীবানি তাজ যেন বদলেছে।

বাবুজী, মারাঠা বর্গীরা যদি বাদশাহের আয় না শুষতো তাহলে বাদশাহীর হাল এরই মধ্যে সত্যিই ফিরে যেত। সিন্ধিয়া মাহাদজী তার পল্টন নিয়ে দিল্লী থেকে মথুরা আগ্রা ওদিকে রাজপুতনা পর্যন্ত ছাউনি করে বসে ছিল—তারা বাদশাহকে রক্ষা করত।

নজফ আলি বর্গীদের হটিয়ে দিল্লী বাদশাহীর পুরা ভার তখনও নেয়নি। নিতে হয়তো পারত। যদি উজীর আবদুল আহাদ তার সঙ্গে দুশমনি না করত। উজীর আবদুল আহাদ আর মিরজা নজফ খাঁর ভিতরে ভিতরে দুশমনির সীমা ছিল না। উজীর আর মীরবক্সীর দুটো দল তখন বেশ দানা বেঁধে উঠেছে।

বাবুজী, হজরত রহিমশা বলেছিলেন আমার গুরুকে, তাঁর মুরিদকে,—দেখ বেটা, যখন আমার পরমাত্মা তোমার পরমাত্মার সঙ্গে মিলতে চাইবে তখন জানবে এ জিন্দিগীর মালিক খুদা মহম্মদ তাঁর পয়গম্বর রসুল। মানুষের মনে হিংসা আছে বেটা, দুশমনি থাকে তার মনে, ও নিয়েই জন্মায় ; ওই দুশমনি খুদার জিন্দিগীতে হার মানে। আর যখন দুশমনি তুফান হয়ে ওঠে তখন বুঝো জিন্দিগী শয়তানের। দুশমনি আর শয়তানি দুইয়ে মিলে এক হয়ে গিয়েছে বাতাস আর আগুনের মত, ঝড় আর বাদলের মত, নদীর বানের মত। বেটা, বেমারী মানুষের হয় আবার আরামও হয়। কিন্তু বেমারী আর মৃত্যু এক হলে যা হয় তাই হয় দুশমনি আর শয়তানি এক হলে। মানুষের উপর তখন শয়তান ভর করে।

রহিমশা বলেছিলেন এই দুশমনির মধ্যে দিয়ে নজফ খাঁ শয়তানের হাতে পড়ল। যে পরভীনকে দেখে সে মুখ ফিরিয়ে চলে এসেছিল সেদিন সেই পরভীনকেই সে তার হারেমে নিয়ে এল নিজে উপযাচক হয়ে।

একেই বলে শয়তানের খেল !

*

মীর নজফ খাঁ ঘাউসগড় ফতে করলে পরের দিন ভোরবেলা। শহর পড়ল। নজফ খাঁয়ের ফৌজ গিয়ে শহরে ঢুকল; লতাফৎ খাঁয়ের ফৌজেরাও ঢুকল—লুঠল শহর। দু দিন পর পড়ল কেল্লা।

তখন মাহাদজী সিন্ধে এসেছে তার বর্গী পল্টন নিয়ে। নজফ খাঁয়ের ফৌজ গড়ের মধ্যে ঢুকে বিলকুল সব তছনছ করে লুঠে নিলে। মাটি মেঝে খুঁড়ে ফেললে। দৌলত বের হল। তার সঙ্গে জবিতা খাঁয়ের বেগম আর বেটাদের বন্দী করলে। তারই মধ্যে মেয়ে সিপাহীরা হারেম থেকে বোরখাপরা জঙ্গী আফগান সর্দার আফজল খাঁকে টেনে নিয়ে এল।

মীরবক্সী মিরজা নজফের সামনে এনে তার বোরখা খুলে তার বড় বড় কাঁচাপাকা দাড়ি গোঁফওয়ালা মুখখানাকে দেখিয়ে বললে—ইয়ে দেখিয়ে খুদাবন্দ ক্যায়সা এক খুবসুরতি রোহিল বেগমসাব! এমন খুবসুরতি হুরী আমরা আমাদের জিন্দগীতে কখনও দেখিনি।

হাসির হুল্লোড় পড়ে গিয়েছিল।

রোহিলা মেয়েরা পর্যন্ত লজ্জায় মাথা হেঁট করেছিল।

তাদের একটু দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল গোলাম কাদের। সেও লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। সে হঠাৎ এসে বলেছিল—আমার গর্দান নেবার পরওয়ানা আছে শুনেছি—আমার গর্দান নিয়ে মেহেরবানি করুন মীরবক্সী।

হয়তো তাই হত। কিন্তু কালাশের এসে নজফ আলিকে চুপিচুপি কিছু বলেছিল। মীরবক্সী নজফ আলি তাকে সসম্মানে তাঁবুতে পাঠিয়ে দিতে বলেছিল।

কালাশেরেরা কখনও লোভ দিয়ে ভোলায় কখনও কাম দিয়ে ভোলায়; কখনও রাগ দিয়ে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলে কাম হাসিল করে শয়তান। আর এসবের পিছনে দেমাক তো আছেই বাবুজী!

মীরবক্সীকে কালাশের চুপিচুপি বলেছিল—জনাবআলি, গর্দান গেলে ওর পেটের মধ্যে যে কথাগুলো আছে সেগুলো হাওয়ার সঙ্গে হারিয়ে যাবে। ঘাউসগড়ের দৌলতখানার খবর যদি নিতে হয়—।

এর বেশী সে বলেনি—তাতেই এই হুকুম হয়ে গিয়েছিল।

নজফ খাঁ ঘাউসগড় থেকে হাতি উট ঘোড়া কামান বন্দুক গাড়ি গাড়ি তাম্বু শামিয়ানা এমনকি তামা লোহার পিতলের বর্তন পর্যন্ত লুঠে নিয়ে এসেছিল। আটটা বড় ভারী কামান এনেছিল—যা ছিল এককালে বাদশাহী ইজ্জৎ—পরে নাজিবউদ্দৌলা সেগুলোকে এনে ঘাউসগড়ের বুরুজে বসিয়ে রোহিলা ইজ্জৎ গড়ে তুলেছিল।

বাবুজী, এরই মধ্যে কেমন করে শয়তানের খেল চলে তা বুঝুন।

একটু হেসে ঘাড় নেড়ে নেড়ে ফকীরসাহেব বললেন—বহুৎ আচ্ছা খেল। বড়া ভারী মজাদার।

সন্ধ্যেবেলা মীরবক্সী মিরজা নজফ আলি আপনার তাঁবুতে বসেছে—ঘাউসগড় লুঠে করা সোনার শামাদানে বাতি জেলে রোশনাই করা হয়েছে, এমন সময় আফ্রাসিয়াব খাঁ মিরজা নজফের মনসবদার পেয়ারের তাঁবেদার, সে এসে বললে—ওই লুচ্চা উজীর আবদুল আহাদের ওই খোজা মুনসী না মনসবদার লতাফৎ খাঁ জনাবআলিকে অপমান করে কথা বলবে আর তাই আমাদের শুনতে হবে?

দপ্ করে জবলে উঠল নজফ খাঁ।—কি? কি বলেছে? বেইজ্জতি করে কি বলেছে?

—জনাবআলি হুকুম দিলে তবে বলতে পারি। বহুৎ বেইজ্জতির কথা।

—বল এখনি বল।

—বলেছে দেখো বাবা খুদার হিস্যা ভাগ। আমার মালিক উজীরসাহেবের জন্যে পরভীন বেগম আর মিরজা নজফের জন্যে দাড়ি গোঁফওয়ালা আফজল খাঁ বেগম। সূক্ষ্ম বিচার। কেন জান? মিরজা নজফ হিজরা!

মিরজা নজফ যেন বারুদে আগুন লেগে জ্বলে উঠল।

তার তলোয়ারখানা খোলা অবস্থায় তোলা ছিল। সেখানাকে টেনে বের করে নিয়ে হনহন করে বেরিয়ে পড়ল। নাঙ্গা তলোয়ার হাতে মিরজা নজফ হাঁক মারলে—কোথায়? কোথায় সেই খোজাটা! কোথায়—?

তার সঙ্গে ছুটল আফ্রাসিয়ার খাঁ। সঙ্গে সঙ্গে দশ বিশ নাশাকচি (সিপাহী) ছুটল। মিরজা নজফ তাদের দিকে ফিরে বললে—দূরে দাঁড়িয়ে থাক। একটা খোজা গোলাম—তাও সে এক লুচ্চার গোলাম—তার সঙ্গে লড়তে দুসরা আদমীর সাহায্য দরকার যার হয় সে মর্দানা নয়। বলেই ঢুকে গেল লতাফৎ খাঁয়ের খাস তাঁবুতে।

তাঁবুর দরজায় পাহারা পড়েছিল। খোজা লতাফৎ তখন আর গোলাম নয়, সে তখন আমীর। পাঁচ হাজার মনসবের মালেক; খুদ উজীরসাহেবের একান্ত বিশ্বাসী কর্মচারী। কিন্তু মীর নজফ খাঁ তখন মুঘলিয়া দরবারে ভয়ের মানুষ। তাকে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে দেখে তারা শোরগোল তুললে কিন্তু বাধা দিতে সাহস করলে না। নজফ খাঁ তাঁবুর ভারী পর্দা ঠেলে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল।

তাঁবুর ভিতর সে এক দুরন্ত ভয়ের জায়গা। তাঁবুর ভিতর ঢুকলেই চারিদিকে পাঁচিল উঠে গেল। আর তাঁবুর গায়ে গায়ে যদি সিপাহী থাকে তবে খতম্ হয়ে গেল যে ঢুকল সে। রাগের মাথায় এসেও এ হুঁশ এবং হুঁশিয়ারি তার ছিল; সে তাঁবুর দরজার মুখেই থমকে দাঁড়াল।

তাঁবুর মধ্যে একটা নিভৃত আসর পড়েছিল। একটা গালিচার চারিপাশে চারটে মানুষ-ভর উঁচু বাতিদানে মোটা মোমবাতি জ্বলছে। চারটে বাতিদানে চার রঙের কাচের ফানুস। চার রঙের আলো মিশে সে এক রঙের মায়া সৃষ্টি করেছে। তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে মদের নেশায় ঢুলু ঢুলু চোখে চেয়ে অর্ধউলঙ্গ পরভীন। এবং তাকে হাতে ধরে টানছে পলায়নপর লতাফৎ খাঁ। পরভীন যেন পালাচ্ছিল না—পালাতে চাচ্ছিল না; সে ফিরে দেখছিল এ দরজায় যে ঢুকছে তাকে।

বাবুজী! ফকীরসাহেব বললেন—আপনার মনে-মনে তসবীর এঁকে নিন। শিরাজীর নেশা আর নওজোওয়ানীর খোওয়াব একসঙ্গে মিশে তার এই বড় বড় চোখ দুটো ঢুলুঢুলু করে দিয়েছে; রেশমের মত চুল তার সে সময় বাঁধা ছিল না; তাজা গোলাপের পাঁপড়ির মত তার রঙ আর তেমনি তার চামড়া মাখনের মত নরম এ দেখলেই বোঝা যায়; তার মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত যা ঢাকা ছিল ওড়না পাঞ্জাবি সব খোলা। বাবুসাহেব, এই যারা খোজা হত সেকালে তাদের সম্বন্ধে ভুল ধারণা আছে লোকের। খোজাদের মধ্যে অনেক আমীর ছিল খানখানান ছিল বড় বড় মনসবদার ছিল সর্দার ছিল। তারা বাবুজী সাদী পর্যন্ত করত। বাড়িতে ঔরৎ রাখত। বাদশাহী নবাবী হারেমে এরা অনেক কেলেংকারি করেছে।

ফকীরসাহেবের একটা কথা আমার খুব ভাল লেগেছিল সেদিন। তিনি বলেছিলেন—বাবুজী, কেলেংকারি আর কি? মর্দানা আর জেনানা, পুরুষ আর মেয়ে এ যার ইচ্ছাতে

দুনিয়ায় হয়েছে তারই পরওয়ানা জারি করা আছে কি মর্দানা ঔরৎকে চাইবে, ঔরৎ মর্দানাকে চাইবে। ও চাওয়াতে দোষ কিছু নেই। দোষ ওখানে নাই। কি করবে ওই খোজারা? আমীর সুলতান বাদশাহেরা নিজের গরজে এই খোজা কিনত। তাদের বুকের ভিতর তো বাবুজী মর্দানার সাধ আহ্লাদ থাকত। কি করবে তারা?

লতাফৎ খাঁ ছিল খোজা—সে আপনার এলেমের জোরে গোলামী থেকে খোলসা পেয়ে হয়েছিল উজীরসাহেবের ডান হাত। আমীরের দৌলত ছিল তার, ক্ষমতা ছিল তার। তা যখন ছিল তখন সে সাধ করবে না কেন বল।

সেদিন ঘাউসগড় ফতে হয়েছে। লড়াই শেষ। লুঠ হয়েছে তার বখরা পেয়েছে, তার উপরে সে পেয়েছে ভেট।

ভেট যা এসেছিল তার মধ্যে যা ছিল হীরা মতি পান্না নীলা জহরত—যা ছিল সোনা রুপা সে সব বাদশাহী মালেকানায় গিয়েছে। নজফ খাঁ ওগুলো ছাড়েনি। কিন্তু খানাপিনার চিজবিজ কড়া আরক ফিরিঙ্গী মুল্কের শরাব এসব নিয়েছে লতাফৎ খাঁ; তার সঙ্গে ভেটের শ্রেষ্ঠ সামগ্রী ওই ঔরৎ—ও কাশ্মীরী নওজওয়ানী ওই পরভীন বেগম। নজফ খাঁ তাকে মুখ ফিরিয়েছে—কদর বোঝেনি কিন্তু খোজা লতাফৎ তার কদর বুঝেছে। সে তাকে পাঠাবে উজীর-উল-মুল্ক আবদুল আহাদের কাছে। তার আগে যতটুকু তার শক্তি আছে ততটুকু সে ভোগ করে নিতে চেয়েছিল।

শিরাজী খেতে শুরু করেছিল সন্ধ্যে থেকে।

পরভীন নিজে বীন বাজিয়ে গান শোনাচ্ছিল। সেই ঢেলে দিচ্ছিল ফিরিঙ্গী মুল্কের শরাব। লতাফৎ খাঁ প্রথমেই সে শরাবের পাত্র তুলে ধরছিল পরভীনের মুখে।

পরভীন হেসে কিছুটা খেয়ে ঠেলে পাত্রখানা এগিয়ে দিচ্ছিল লতাফৎ খাঁর মুখের কাছে।

বাবুজী, হজরত রহিমশা তাঁর মুরিদকে বলেছিলেন—রহমৎ, খুদ শয়তান তখন সেই তাঁবুর মধ্যে এসে তার গদ্দি পেতেছে। সেই গদ্দির উপর বসে বসে যেমন করে বাদশাহ রাজারা জাদুর খেল দেখে, যেমন করে নাচবালীদের নাচ দেখে তেমনি করে এই মাতোয়ালী নওজোয়ানী আর এই খোজার বেশরমী জানোয়ারী খেল দেখছিল আর হাসছিল। হজরত রহিমশা বলেছিলেন—তখন আপনার তাঁবুতে এই কালাশের সে দারু পিয়ে একেবারে বেহোঁশ মুর্দার মত পড়ে ছিল।

লতাফৎ খাঁ ঔরৎকে নিয়ে দিল্লগী করতে করতে তাঁবুর বাইরে হল্লা শুনে চমকে উঠেছিল। চিৎকার করে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিল—কি হয়েছে? ক্যা হুয়া রে? মামলা ক্যা রে?

উত্তর কেউ দেয়নি। কিন্তু তাঁবুর পর্দা ঠেলে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে মিরজা নজফ দাঁড়িয়ে বলেছিল—মামলা আমি এনেছি রে খোজা! কি বলেছিস তুই? মিরজা নজফ খাঁ মর্দানা নয়?

লতাফৎ খাঁর চোখ দুটো এমনি বড় গোল হয়ে উঠেছিল, শরাবের নেশায় সে চোখ রাঙা দেখাচ্ছিল আর একটা কোন জন্তু-জানোয়ারের মত ভয়ার্ত হয়ে উঠেছিল। সেও অর্ধ উলঙ্গ হয়েই বসে ছিল; একটা ভয়ার্ত চিৎকার করে সে হামাগুড়ি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। এ ঔরৎ বাবুজী শয়তানী ঔরৎ। এদের ভয়ডর থাকে না, শরম ইজ্জতের পরওয়া করে না; রাত্রে এরা আগুনের খাপরা মাথায় করে কবরখানার চারিপাশে নাঙ্গা হয়ে নেচে বেড়ায়। খিলখিল করে হেসে সারা হয়। পরভীন সেই আধানাঙ্গা হয়ে শরাবের গেলাস হাতে নিয়ে মিরজা নজফের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল।

লতাফৎ খাঁ যেতে যেতেও হেঁকেছিল—এ—পরভীন!

পরভীন খানিকটা থুতু ফেলে বলেছিল—ভাগ্ কুত্তা কাঁহাকা ! ময় নেহি যাউঙ্গী !

বলেই সে এগিয়ে এসে মীর নজফ খাঁ সাহেবকে কুর্নিশ করে বলেছি—বাঁদীর তশরীফ পঁহুছে জনাবআলি খুদাবন্দ।

বাবুজী, নজফ খাঁ আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি। সে খুব রাগ করেই ওই ঔরৎকে ছিনিয়ে আনতেই গিয়েছিল—আরও ইচ্ছে ছিল লতাফৎ খাঁকে কিছু শিক্ষা দেয়। কিন্তু লতাফৎ খাঁ হামাগুড়ি দিয়ে সত্যিসত্যিই কুত্তার মতই পালিয়েছিল। তাকে ছুটে গিয়ে ধরে লাঞ্ছনা করতে আর ইচ্ছে হয়নি মীর নজফ খাঁর। এদিকে ওই মদের গেলাস হাতে আধানাঙ্গা আশ্চর্য রূপসী ওই কাশ্মীরী মেয়েটি এগিয়ে এসে তাকে কুর্নিশ করতেই সে আর থাকতে পারেনি, তখন শয়তান তার নিশ্বাসের হাওয়ার মধ্যে দিয়ে বুকে ঢুকতে আরম্ভ করেছে ; নজফ খাঁ তখন ওই ঔরতের গায়ের আতরের খুসবু পাচ্ছে—মাথার চুলের তেলের মসল্লার গন্ধ পাচ্ছে—তার সঙ্গে পাচ্ছে তার হাতে ধরা গেলাসের শরাবের গন্ধ ! নজফ খাঁ ওই ঔরৎকে দু হাতে চেপে ধরে বলেছিল—তোমাকে আমি লুঠে নিলাম। ময় তুঝে লুঠ লিয়া !

শরাবের গ্লাসটা ফেলে দিয়ে দু হাত বাড়িয়ে নজফ খানের গলা জড়িয়ে ধরে বারবার তার ঠোঁটের উপর নিজের ঠোঁট রেখে বলেছিল—আমাকে তুমি লুঠে নাও। লো মুঝে লুঠ লো !

হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে বলেছিল—নিজেকে লুটিয়ে দিতেই তো চাই জনাব-আলি ! তুমিই তো মুখ ফিরিয়ে চলে গিছলে। আমি তো তোমার।

শয়তান জিতে গেল বাবুজী। কালাশের ঘুম ভেঙে উঠে বসেছিল নিজের তাঁবুতে। শরাবের গেলাস আর বোতল টেনে নিয়ে বসেছিল। বহুৎ মজাদার খোয়াব দেখেছে সে।

॥ তেরো ॥

হজরত রহিমশাহের কথা কখনও তো মিথ্যা নয় বাবুজী। আগেই তাঁর কথা বলেছি তুমি শুনেছ। সব সময়েই ভাল আর মন্দ সাচ্চা আর ঝুটা শয়তানি আর ইনসানিয়াতির মধ্যে লড়াই চলে। চলছেই। খুদা বসে বসে দেখেন। পয়গম্বর রসুলের হুকুমৎ যতক্ষণ মানে মানুষ ততক্ষণ ইনসানিয়াতির জিত। এক একটা কালে ইনসানেরা পয়গম্বর রসুলকে মানতে চায় না ; তখন শয়তান সুবিধে পায়, তখন সেই হয়ে বসতে চায় মানুষের মালিক দুনিয়ার মালিক। শয়তান একটা কৌশল জানে বাবুজী—আচ্ছা কৌশল। সে মানুষের কাছে এসে বলে—তুমি মালিক তুমি সব—আমি তোমার গোলাম তোমার বান্দা। আমি তোমাকে হুকুম করি না তোমাকে শলাহ দি।

ওতেই মানুষের সর্বনাশ হয়। সে তখন সব বরবাদ করে দেয়। খোদাকে পর্যন্ত।

ওই যে মীর নজফ খাঁ যে চল্লিশ বছর বয়স হতে হতে হিন্দুস্তানের বাদশার মীরবক্সী হয়ে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিল সে মানুষটাকে শয়তান-ভরকরা এই ঔরৎ দু বছরের মধ্যে একদম দানা কি ফলের শুকনো খোসা করে ছেড়ে দিলে বাবুজী। ওই শয়তানভরকরা পরভীন তার ভিতরে পোকার মত ঢুকে কুরে কুরে সব শাঁসটুকু খেয়ে তাকে শুকনো খোসা করে ছেড়ে দিলে।

দু বছরের মধ্যে নজফ খাঁ একদম দেউলিয়া হয়ে গেল নিজে—দেউলিয়া করে দিলে

বাদশাহীকে। দিল্লীর বাদশাহের সিপাহীরা তলব না পেয়ে চিৎকার করতে লাগল ; বাদশাহের হারেমে শাহজাদা শাহজাদীদের বান্দা বান্দীদের পর্যন্ত পুরা বাদশাহী খানার খরচা মিলল না। শাহজাদী বেগমসাহেবাদের 'তনখা' বাকী পড়ল। হারেম থেকে বাদশাহের কাছে দরখাস্ত এল কি যমুনার ঘাটের দরওয়াজা খুলে দিতে হুকুম হোক। আমরা জানানারা সকলে একসঙ্গে যমুনার জলে ঝাঁপ খেয়ে পড়ে ডুবে মরব। শয়তান হাসতে লাগল বাবুসাহেব।

দু বছরে নজফ খাঁ এসেছে জহান্নমের কিনারায়।

হাতে ধরে টেনে এনেছে ওই ঔরৎ। ওই কাশ্মীরী মেয়ে পরভীন। এই দু বছরে মিরজা নজফের দুশমন উজীর আবদুল আহাদ খতম্ হয়েছে। নজফ খাঁ সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছে বাদশাহী দরবারে কিন্তু বাদশাহী খাজাঞ্চীখানা ফতুর হয়ে গেছে, বাদশাহের হারেমের খরচা চলে না। মিরজা নজফ নিজে জহান্নমে গেছে—ব্যাধিতে সে জীর্ণ হয়ে গেছে।

সকালবেলা থেকে শরাব আর শরাব। গান নাচ আর গান। পরভীন বসে থাকে পাশে, সামনে কেনা বাঁদীরা নাচে আর গায়। গায় আর নাচে। বাড়িতে মজলিস হয়, বাগিচায় মজলিস হয়, বজরায় মজলিস বসে। যমুনার কিনারায় বালির চড়ার উপর আসর বসে। লতাফৎ খাঁ এখন চব্বিশ ঘণ্টার সঙ্গী নজফ খানের। লতাফৎ খাঁ আর আবদুল আহাদের আদমী নয়। আবদুল আহাদকে নজফ খাঁ আটক রেখেছে কেল্লার মধ্যে। নজফ খাঁই এখন উজীর মীরবক্সী সব। সর্বেসর্বা। লতাফৎ খাঁও এখন নজফ খানের লোক। সেদিন এই বেশরমী খোজা আধানাঙ্গা অবস্থায় হামাগুড়ি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল তাঁবু থেকে। তারপর সেই এসে নজফ খাঁয়ের পায়ে গড়িয়ে পড়েছিল নজফ খাঁয়ের কাছে।

পরভীন বলেছিল—ওকে মাফ করে নিজের কুত্তা করে নাও গো মেরে পেয়ার! কুত্তা তোমার অনেক কাম দেবে। উজীর আহাদ খাঁকে খতম করতে ওই কুত্তার চেয়ে বেশী কাম তোমাকে কেউ দেবে না।

তা ছাড়া আরও কাজে এসেছিল লতাফৎ খাঁ। জবিতা খাঁয়ের সঙ্গে নজফ খাঁয়ের একটা মিটমাট করে দিয়ে গোটা রোহিলখণ্ড সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত করেছিল।

চব্বিশ ঘণ্টার সঙ্গী হয়েছিল লতাফৎ খাঁ।

খানাপিনা দারু ঔরৎ এর বেবাক বন্দোবস্ত করত সে আর নজফ খাঁয়ের পাশে বসে খেত। গোগ্রাসে গিলত।

যমুনার কিনারায় তরমুজ খরমুজের ক্ষেতির পাশে নাচগানের আসর পড়ত। নাচগান হতে হতে হঠাৎ নাচগান থামত ; বাঁদীরা নাচনেবালীরা পাঁয়জোর বাজিয়ে কাঁকন বাজিয়ে খিলখিল হাসির তুফান তুলে ছুটে গিয়ে পড়ত সেই ক্ষেতিতে—সেখান থেকে তরমুজ খরমুজ নিয়ে এসে জমা করে দিত নজফ খাঁয়ের সামনে। নজফ খাঁ খুশী হয়ে পরভীনকে বলত—তুমি খুশী?

সে বলত—বহুৎ খুব।

সারা দিল্লীর হালও এমনি। কাফিখানায় কাফিখানায় মস্তান আর গুণ্ডাদের আড্ডা—

খিস্তি আর খেউড়ের তুফান—দারুখানায় শরাবের দরিয়া বইছে। কসবীপাড়ায় চোদ্দ পনের বছরের ছোকরা থেকে জোওয়ান থেকে আশী বছরের বুঢ্‌ঢা পর্যন্ত ভিড় জমাচ্ছে। লাল-কিল্লায় আফিংখোর শাহ আলম ঝিমচ্ছে আর তসবীমালা জপছে, আর গাল পাড়ছে নজফ খাঁকে। মধ্যে মধ্যে এক এক বার ঘুরে ফিরে দেখে আসছে মাটির নীচে তার পুঁতে রাখা দৌলত ঠিক আছে কি না।

দৌলতের লোভে বাদশাহ শকুনের মত হয়ে গিয়েছিল বাবুজী। হুজরত রহিমশা বলতেন—বাংগাল মুল্ক থেকে ফিরিঙ্গী কোম্পানির ক্লাইভ সাহেবকে দেওয়ানীর ফরমান দিয়ে কম দৌলত আনেনি বাদশাহ। তা ছাড়া এই পাথলগড় ঘাউসগড় দু দুবার লুটে নাজিব-উদ্দৌলার দৌলত সেও অনেক। সে সব সে মাটির নীচে গেড়ে রেখেছিল। তার এক দামড়ী কি এক সিক্কা কখনও বের করত না।

বাবুজী, দিল্লীর কেল্লার মধ্যে আটকখানায় যত শাহজাদা শাহজাদী বেওয়া বেগম তারা তনখা দূরে থাক দুবেলা পোড়া রুটি পর্যন্ত পেত না; তারা চিড়িয়াখানায় ভুখার তাড়ায় জানবারেরা যেমন করে চেঁচায় তেমনি করে চেঁচাত।

বাদশাহ গাল দিত নজফ খাঁকে। হররোজ বলত—আজ যদি কেউ খানাপিনা করে তো সে হারামখোর। যাও সব লোক মিলে যাও। ধরনা লাগাও ওই নজফ খাঁয়ের হাবেলীতে। শয়তান দুনিয়াকে হিন্দুস্তানকে জহান্নমে দেবার হুকুম জারী করেছে। শয়তানের পিয়াদা ওই নজফ খাঁ। হিন্দুস্তানকে ওই দেবে জহান্নমে।

কখনও কখনও পাগলের মত চিৎকার করে বলত—এয় খুদা মেহেরবান আমার জান খতম্ করে দাও! জিন্দগী শেষ করো। এ আর সইতে পারছি না। কবরের মাটির সঙ্গে আমাকে মিশিয়ে দাও।

এরই মধ্যে বাদশাহের মনে শান্তি মিলত—সান্ত্বনা পেত এক বুড়া হিন্দু ফকীর আর তার এক মুরিদা লেড়কীর গানে।

পথে যারা খুদার নাম করে ভিখ মেঙে মেঙে বেড়ায় তাদেরই দুজন।

এ মেয়ে হল সেই শঙ্করবাঈ বাবুসাহেব।

'শঙ্করবাঈ মানে গুলবদনী, সেই নটী গন্ধর্বীর বেটী? বামুনওলী গাঁওয়ের যে বেটীকে সেদিন—'

কথাটা আমি প্রশ্ন করেছিলাম। শঙ্করবাঈকে যেন ভুলে গিছলাম। ওই পরভীন মেয়েটা এসে শঙ্করকে যেন নিজের ছায়ার অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছিল। কিংবা লাল মশালের কালির এবং ধোঁয়ার পুঞ্জ বিকীর্ণ করা আলোর মধ্যে একটি ঘিয়ের প্রদীপের শান্ত শুভ্র শিখাটির মত দৃষ্টির বাইরে চলে গিছল।

ফকীর বললেন—হাঁ বাবুজী। এ সেই গুলবদনী। সেই মোমের বাতির আলোর মত গুলবদনী—সে আলো দেয় আর সেই আলোর তাপে নিজে গলে গলে পড়ে; যা তৈরী হয় বাবুজী ফুলের মধু রাখবার জন্যে যে মৌচাক তার থেকে। এ সেই মেয়ে।

তার কথা এবার বলি বাবুজী।

সেই যেদিন দিল্লী থেকে পালাবার পথে গোলাম কাদের এই ফুলের মত লেড়কীকে বাগিচার মধ্যে অন্ধকার রাত্রে দাঁতে ছিঁড়ে চিবিয়ে হাতে দলে পিষে বুকে ছুরি বসাতে গিয়ে খানিকটা পাশে ছুরি বসিয়ে চলে গেল, তার এক বছর পরে তাদের গাঁও বামুনওলীতে

এল ছত্রী সর্দার চান্দ সিং আর তার স্ত্রী আর বিধবা পুত্রবধূ আর নাতি মনিয়ার সিং। মনিয়ার সিংয়ের বাপ গণপৎ সিংয়ের বেটাই হল গুলবদনীর বাপ।

বাবুসাহেব, ঘাউসগড় পড়ল। গোলাম কাদের আর জবিতা খাঁয়ের বেগমেরা বেটীরা এক ওই শয়তানী পরভীন ছাড়া সব বন্দী হল। তারপর মিটমাট হল নজফ খাঁয়ের সঙ্গে জবিতা খাঁয়ের। জবিতা খাঁ এল—হাতে রুমাল বেঁধে বাদশাহের কাছে হাজির হয়ে মাথা হেঁট করে খাড়া রইল; বাদশা তাকে মাফ করলেন, খেলাত দিলেন।

ছাড়া পেলে গোলাম কাদের। কিন্তু সে এল না জবিতা খাঁয়ের কাছে। জবিতা খাঁ শিখ হয়েছিল—তার ধরম গিয়েছে জাত গিয়েছে; রোহিলখণ্ডের নবাবী গদি ইসলামের খাদিম নবাব নাজিবউদ্দৌলার গদি; কাফের আর শিয়াদের দাবিয়ে শাসন করে আফগানশাহী এই গদি—এ গদিতে যে ইসলাম ছেড়ে শিখ হয়ে ধরম সিং নাম নিয়েছিল—লা ইলাহা ইল্লালার বদলে অলখ্ নরঞ্জন বলে ডেকেছিল তার কোন এক্তিয়ার নাই। দুসরা দফে কলেমা পড়লেও নেই।

বাবুজী, আরও একটা কারণ ছিল।

জবিতা খাঁয়ের এক বেটীকে সাদীও করেছিল নজফ খাঁ। গোলাম কাদের সন্দেহ করেছিল কি জবিতা খাঁ গুজর গেলে পর নবাবী যাবে, নজফ খাঁয়ের শালার হাতে কি খুদ নজফ খাঁ এসে জেঁকে বসবে রোহিলখণ্ডের মসনদে।

পরভীন বেগম কালাশেরকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিল—ভয় করো না নবাবজাদা; খতম করো তুমি জবিতা খাঁকে; নজফ খাঁয়ের জন্যে নিশ্চিন্ত থেকো; পরভীন আছে এখানে। পরভীন জাদু জানে। সে তাকে সামলে রাখবে। তুমি নবাব জবিতা খাঁয়ের হিসাব চুকাও। ভয় আমার তাকে। পরভীনকে পেলে সে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবে। তুমি আমাকে পাঠিয়েছ নজফ খাঁয়ের কাছে।

গোলাম কাদের তখন সবে নওজওয়ানী পেয়েছে।

বয়স তখন আঠারো পার হয়েছে। সাহারানপুর নাজিবাবাদের এলাকা ছাড়িয়ে গিয়ে তরাইয়ের জঙ্গলে সে আড্ডা গাড়লে।

নটী গন্ধর্বীদের বেটী জন্ম থেকেই কিছু বে-শরমী হয় বাবুজী। হয়তো বা ওদের রক্তেই থাকে।

শক্করবাঈ গুলবদনী বাপের সম্পর্ক ধরে মনিয়ার সিংকে বলেছিল দাদাজী।

মনিয়ারের ভাল লেগেছিল তার এই গন্ধর্বী বহেনকে। সেকালের ছত্রীদের সমাজ—সে সমাজে গন্ধর্বী বা নটী পিয়ারীর জন্যে যেমন কোন লজ্জা ছিল না তেমনি বাড়িঘরের আত্মীয়স্বজনেও এতে দোষের কিছু দেখত না। সম্পত্তি কিছু থাকলেই তার সঙ্গে নানান আসবাবের মত উপপত্নীও একরকম আসবাব ছিল। দাসী বাঁদী কেনারও রেওয়াজ ছিল। মনিয়ারের বাপের আরও কেনা বাঁদী ছিল—তাদেরও চার ছেলে আছে। তারা সব লোক ভাল নয়। তারা চলে গেছে পাঞ্জাবের দিকে। শিখ হয়েছে দুজন। শিখ সর্দারদের নোকরি নিয়েছে। দুজনের একজন ডাকাতি করে ফেরে। একজন চলে গিয়েছে তরাইয়ের দিকে—হাফিজ রহমৎ খাঁ সাহেবের নোকরি করে। তার মা ছিল মুসলমানী। সে মুসলমান। তাদের ভারী রাগ এই মনিয়ারের উপর।

ফকীরসাহেব বললেন—হবেই বাবুজী। মনিয়ার সিং সাদীকরা তিন বউয়ের এক লেড়কা। বাকী দুই বউয়ের একজনের আছে লেড়কী—সে চলে গেছে শ্বশুরবাড়ি। তারও

মনিয়ারের উপর ভারী রাগ। একজনের ছেলেপুলে হয়নি। সে মনিয়ারের বাপের সঙ্গে চিতায় পুড়ে মরেছে। সতী হয়েছে। সে খুব সুন্দরী ছিল। মনিয়ার তার জীবনে তার একটি ভাই বা বহেন পায়নি যাকে সে ভালবাসতে পারে; সে তাকে সত্যি সত্যি ভালবাসে। এখানে এই বামুনওলীতে এসে ওই শঙ্করকে বহেন পেয়ে সে বর্তে গিয়েছিল।

শঙ্কর তখন নওজওয়ানী হয়ে উঠেছে। মনিয়ারও নওজওয়ান। পরিচয়-না-থাকা ভাই বহেন। সে পরিচয় প্রায় একদিনেই পুরনো হয়ে গেল—জানপহছান ছিল না একথা মনেই হল না।

দুটো নদী বাবুজী, যতদিন পৃথক থাকে ততদিন এর জলের ওর জলের রঙে ফারক থাকে স্বাদেও ফারক থাকে কিন্তু দুই নদীতে মিশে গেলে রঙে স্বাদে মিশে একাকার হয়ে যায় তখন আর আলাদা করা যায় না। ঠিক তাই হল—

শঙ্কর জেনে নিলে তার দাদাজীর কোন পিয়ারী আছে কি না? তার দাদো তাকে ক'টা বাঁদী কিনে দিয়েছিল, তাদের উমর কত ছিল, দেখতে কেমন ছিল? তারা গীত গায় কেমন। তারা বীন কি সেতার বাজাতে পারে কি না? এবং কয়েক দিনের মধ্যেই বলে ফেললে এই নটীর মেয়ে—দাদাজী, আমি নটীর মেয়ে—মা নটী, বাবা রাজপুত। নটীর ধরমে বলে গন্ধর্বমতে সাদী হতে হয় একজনের সঙ্গে। সারাজীবনে সে নটী যেখানে থাক যাই তার পেশা হোক—সে নাচওয়ালী পেশাই হোক আর কোন রাজা বাদশাহের হারেমে তার পিয়ারীগিরিই হোক আসলে সে সেই গন্ধর্বমতে বিয়ে করা লোকেরই স্ত্রী। সেখানেও হিন্দু মুসলমান জাতবিচার নেই। মহম্মদশাহ বাদশাহের নটী বেগম ছিল উধমবাঈ, তার বেটা আহম্মদশা বাদশা হয়েছিল। দাদাজী! তাহলে আমার জীবনে কি হবে বল?

মনিয়ার তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—হাঁ তা কি হয়েছে?

—বুঝতে পার না?

—না।

—দাদাজী, বেটাছেলেদের এদিকে থোড়াথুড়ি বুদ্ধি মোটা হয়। ঔরৎ না হলে ঔরতের এ ধাঁধার উত্তর দিতে পারে না। আমার ইজ্জত জবরদস্তি করে ছিনিয়ে নিয়েছে নবাবজাদা গোলাম কাদের!

—হাঁ। আপসোসের কথা শঙ্কর, আমরা সেই নবাবজাদাদের নোকর তাঁবেদার। তাদের দেওয়া জমিন ক্ষেতখামার পাঁচ পাঁচ গাঁওয়ের জমিদারি জায়গীরদারের মত ভোগ করি। কি করে শোধ নেব তাই ভাবছি। তুমি আমার বহেন এ কথা তো ভুলতে পারব না আমি!

শঙ্কর বলেছিল—দাদাজী, রাক্ষস বিবাহ মতে নবাবজাদা জবরদস্তিতে আমার ইজ্জৎ নিয়ে আমার স্বামী হয়ে গিয়েছে। যায়নি? তুমি বল?

অনেক ভেবে মনিয়ার সিং বলেছিল—এর জবাব আমি তো দিতে পারব না শঙ্কর। এ জিজ্ঞাসা করতে হবে পণ্ডিতজীলোককে। তোমাদের গাঁওয়ের পুরোহিত মহারাজকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। আর জিজ্ঞাসা করতে হবে দাদোকে।

—সে তুমি জিজ্ঞাসা করো।

জিজ্ঞাসা করেছিল মনিয়ার। কিন্তু পুরোহিত মহারাজ আর দাদোর সঙ্গে মতভেদ ঘটেছিল। এর মাঝখানে এসে পড়েছিল বুড়ী দিদিয়া। সে এসে এককথায় মীমাংসা করে দিয়েছিল। বলেছিল—তোমরা দুজনেই কিছু জান না। তোমাদের কারুর মত চলবে না। লেড়কীকে তোমরা জিজ্ঞাসা করলে না তোমার ইজ্জতের সঙ্গে তোমার দিলও কি সে জবরদস্তি করে কেড়ে নিতে পেরেছে কি না। তা যদি পেরে থাকে তা হলে? তা হলে কি হবে?

মহারাজ বলেছিল—কিন্তু শাস্ত্রে পুরাণে তো এমন কথা লিখা নাই।

—হায় হায় হায় শাস্তর তোমার মহারাজ! রাজা রাবণ তিন ভুবনকে লেড়কী জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে এল, জবরদস্তিতেই তার সঙ্গে সাদী হয়ে গেল। তারা লঙ্কার সোনার পুরীর মহলে মহলে দিব্যি সুখে থেকেছে। এক সীতামাঈয়ের ইজ্জৎ রক্‌সা করলেন দেওলোক। আর সীতামাঈয়ের দিল ভুলল না রাবণ রাজার বিশ বিশ হাত দশ দশ মুণ্ডু সোনার পুরী দেখে, তাই তিনি বাঁচলেন। তিনি বাঁচলেন রাবণ মরল। শাস্তর তুমি কিছু জান না মহারাজ!

চান্দ সিং কিছু বলতে গিয়েছিল কিন্তু বুড়ী তাকে কিছু বলতেই দেয়নি। ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল—বুড়োয়া, ধরম রাখবি কি রাজপুত ইজ্জৎ রাখবি তো তোর এই বেটার গন্ধর্বী জরুর পেটের লেড়কীকে পেঁছে দিয়ে আয় গোলাম কাদের নবাবজাদার ঘরে। বেটীটা ইজ্জতের সঙ্গে তাকে দিলও দিয়ে দিয়েছে। মহারাজা মানসিংহের ফুফি গিয়েছিল আকবরশাহের অন্দর—বহেনের সঙ্গে সাদী হয়েছিল জাহাঙ্গীর বাদশার। কোন্‌ বাদশাহের রাজপুত বেগম কি পরস্তার নেই! এ তো তোর বেটার নটী পিয়ারীর বেটী। তোর জাত ও মেয়েকে তোরা দিসনি। ওরা সেই নটীই থাকল। কিন্তু তোদেরই রক্ত তো ওদের শরীরে! যা পেঁছে দে ওকে তার কাছে যে ওর কুমারীত্ব নিয়েছে।

॥ চৌদ্দ ॥

বাবুজী, গোলাম কাদের নবাবজাদা আগ্রা কেল্লা থেকে খালাস পেয়ে ঘাউসগড় এল না —সে চলে গেল তরাই জঙ্গলে—তার বাপের সঙ্গে লাগল ঝগড়া। যে বাপ মুসলমান হয়ে ইসলাম ছেড়ে শিখ হয়েছিল তাকে সে মানবে না। তাকে বাপ বলবে না। সে নিজেই বললে—সেই হল নাজিবউদ্দৌলার ওয়ারিস। জবিতা খাঁ নয়।

চান্দ আর মনিয়ার খাঁ গেল গোলাম কাদেরের কাছে—চান্দের বুড়ী স্ত্রী আর মুনিয়ারের বিধবা মা রইল বামুনওলীতে। রইল শঙ্করের মা চান্দের বেটার নটী পিয়ারীদের কাছে। তারা তাদের দেওতার মত যতন করে রাখলে। কিন্তু খোদার কি মর্জি তা তো মানুষ বোঝে না।

বাবুজী, হয় খুদাতায়লার মর্জি নয়তো শয়তানের শয়তানি—একদিন ধরতি কাঁপল। খুব জোর কাঁপল বাবুজী।

বাদশা শাহ আলম বলেছিল—এ শয়তানের চক্রান্ত! তাবারিখ ইতিহাস পড়ে দেখো বাবুজী। এগারশো আটান্ন উনষাট হিজরাতে শয়তানের চক্রান্তে হিন্দুস্তানের আর বাদশাহের দুর্ভাগ্যের আর শেষ ছিল না। বাদশা শা আলম অনেক জলুস করে অনেক ধুম করে বেটা শাহজাদা আকবরের সাদী দিলে—তার জন্যে চার পাঁচ মাস যোগাড়যন্তর করেছিল। বাবুজী, সাদী হয়ে গেল যেদিন, তার ঠিক চার দিন বাদ শাহজাদা ফারকান্দভক্ত মিরজা জাহান গুজর গেল। কি সে বেমারি এর হদিস কোন হাকিম ঠিক করতেই পারলে না; সারাদিন ভুগে সন্ধ্যেবেলা শাহজাদা মারা গেল; আর সেই রাতেই আরও মারা গেল মিরজা জাহানের এক বাচ্চা লেড়কী। ওই একই বেমারী বাবুসাহেব। তার এক মাস পর দিল্লী শহর তার আশপাশ—বলতে গেলে আধা পাঞ্জাব রোহিলখণ্ড জুড়ে বয়ে গেল এক আঁধির তুফান। আঁধি নিশ্চয় জান বাবুজী—ধুলো আর ঝড় একসঙ্গে; পশ্চিম উত্তর দিক থেকে আসমান জমিন সব কিছু ধুলোর একটা ঝাপটায় ঢেকে দিয়ে বয়ে যায়। থাকে

আধাঘাঁড়, তারপর দু চার ফোটা পানি—ব্যাস্। ওতেই ঠাণ্ডা পড়ে যায়। ঝড় থামে। কিন্তু সেবারের ঝড়ের মত ঝড় এর আগেও কেউ দেখে নাই; হজরত রহিমশা তাই বলেছিলেন। তার পরেও আজ অবধি এমন আঁধি হয় নাই।

পাঞ্জাব রোহিলখণ্ড মুলুকে বড় বড় গাছ তামাম উপড়ে পড়েছিল। গাঁওগাঁওলার খাপরার চাল বিলকুল উড়ে গিয়েছিল; বড় পাকা ইমারত হাবেলী মঞ্জিল কেল্লা এ সবও রেহাই পায়নি—কোথাও মিনার ভেঙেছিল কোথাও পাঁচিল ভেঙেছিল শহর বাজারের—খাস দিল্লী আগ্রার বড় বড় মোকাম সুদ্ধ সে আঁধির ধাক্কায় ভেঙে পড়েছিল। মাঠে পথে যে সব মানুষজন ছিল তাদের উড়িয়ে আসমানে তুলে গাছের ডালে ধাক্কা লাগিয়ে গেঁথে দিয়েছিল। ঘরে মাটিতে জমিনের উপর মানুষ তুলে যেন আছাড় মেরে ছেঁচে দিয়েছিল। হাতী উট ঘোড়া বড় বড় জানোয়ার পর্যন্ত মরেছিল বাবুজী—গাছ চাপা পড়ে, অন্ধকারে পাগলার মত ছুটে গিয়ে কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লেগে কিংবা দম বন্ধ হয়ে মরেছিল। দরিয়ার পানি যমুনার জল লালকেল্লার উল্টো পাড়ে ঝড়ের ধাক্কায় উপচে উঠে বেবাক বস্তি দেহাত সব ভাসিয়ে দিয়েছিল।

তারপর বাবুজী, ক'মাস পরই একদিন হল ভূমিকম্প; ধরতিমাঈ কাঁপল। শীতের কালের সময়, মানুষজন ঘরের মধ্যে শুয়ে আছে, হঠাৎ একটা গোঁ গোঁ শব্দ উঠল। যেন ধরতিমাঈয়া কলেজার যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল। সে গোঙানি তোমরা বিহারের ভূমিকম্পের সময় শুনে থাকবে। তারপরই থরথর করে কাঁপতে লাগল ধরতি। ঘরবাড়ি পড়তে লাগল তাসের ঘরের মত। মাটি চড়চড় করে ফাটল—সেই ফাটল দিয়ে গরম পানি উঠল; দরিয়ার পানি বিলকুল মাটির তলায় চলে গেল; তামাম হিন্দুস্তান জুড়ে একটা কান্না উঠল, ঠিক বাচ্চা ছেলেতে যেমন দুরন্ত ভয় পেলে পুকার দিয়ে কেঁদে ওঠে তেমনি কান্না।

যখন থামল কম্পন তখন খতম হয়ে গেছে আধা মুলুক। বাড়ি ঘর ভেঙে পড়েছে—বড় বড় ইমারত কোনটা আছাড় খেয়ে পড়েছে কোনটা আধখানা পড়েছে কোনটা ফেটেছে চৌচির হয়ে; কোন কোনটা দু'ভাগ হয়ে ফেটে গিয়ে পড়তে পড়তে সামলেছে—আবার এসে জুড়ে গেছে, আছে শুধু ফাটলের দাগ—এমনও হয়েছে। কত মানুষ যে মরেছিল তার হিসাব কেউ করতে পারেনি। মানুষদের সৎকার হয়নি। কবরও না পোড়ানোও না। যে ভাঙা ঘরের তলায় চাপা পড়েছিল সেইখানেই চাপা পড়ে রইল, পচল, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেল।

বাবুসাহেব, গোটা বামুনওলী গাঁওটাই একরকম ভেঙে মাটি আর খাপরার ঢিপি হয়ে গেল। নটীপাড়াটা একেবারে শেষ। অমৃতেশ্বর শিউজীর মন্দিরটার চূড়া ভাঙল—মন্দিরটা ফাটল—সামনের কুয়োটা আশ্চর্যভাবে ভিতর থেকে বালু আর কাদা উঠে ভর্তি হয়ে গেল। উপরের চত্বরের কোন চিহ্ন রইল না।

পুব পাড়ায় নটী ছাড়া অন্য জাতেরা দু চার দশ বিশ জন বাঁচল এই পর্যন্ত। বাবুজী, নটীপাড়ায় বাঁচল শুধু গুলবদনী। শঙ্করবাঈ। কি করে বাঁচল কেন বাঁচল তা কেউ বলতে পারবে না।

হজরত রহিমশাহ তখন হজে গিয়েছিলেন। তিনি এখানে ছিলেন না। হজ থেকে ফিরে এসেও গুলবদনীর কোন পাত্তা পাননি। পরে পাত্তা যখন পেয়েছিলেন তখন আসমানের দিকে হাত তুলে বলতেন—কি করে বাঁচল লেড়কী সে ওই ওপরের মর্জি।

নইলে একই ঘরে শুয়ে ছিল চারজন। চান্দ সর্দারের পঙ্গু স্ত্রী, তার বিধবা পুত্রবধূ মনিয়ারের মা, শঙ্করের মা আর শঙ্কর—এই চারজনের মধ্যে লেড়কী শুধু বাঁচল আর কেউ বাঁচল না।

আর যারা বেঁচেছিল বাবুজী তাদের মধ্যে ছিল ওই অমৃতেশ্বর শিউজীর যে পুরোহিত

মহারাজ—সেই। বুড়ো মহারাজের নসীব—বুড়োর ঘর চাপা পড়ে তার স্ত্রী মরল বেটা মরল বেটার বউ তার ছেলে মেয়ে সব মরে গেল, রইল ওই বুড়া। বুড়া মাথায় চোট খেয়েছিল। কিন্তু সে চোট সে সামলে উঠেও বাঁচল। কিন্তু তার দুটো চোখ প্রায় অন্ধা হয়ে গেল।

ভূমিকম্পের পরের দিন শঙ্কর কান্নাকাটি করে ছুটে বেড়িয়েছিল আশ্রয়ের জন্যে। কোথায় মিলবে আশ্রয়? শীত সেবার ভীষণ বাবু। পানিতে সকালবেলা জ্বাল দেওয়া দুধের সরের মত ঠাণ্ডা বরফের পাতলা সর জমে। সে পাড়াতেও সেবার কম লোক মরেনি। তাছাড়াও বাবুজী তখন মানুষদের মধ্যে বদমাশ যারা তারা বের হয়েছিল খাবারের জন্যে ভাঙা বাড়িঘর লুঠের জন্যে ঔরতের জন্যে।

গুলবদনীর সুরত ছিল—সে সুরত নওজোওয়ানীর ছোঁয়াচে তখন নতুন ফুলধরা চামেইলী গাছের মত ঝলমলে হয়ে উঠেছে—খুসবু দিয়ে যেন ভরিয়ে দিয়েছে বাতাবরণ। ভোরবেলা হতেই সে ভাঙা ঘরে চাপাপড়া মা, সর্দার দিদিয়া, সর্দার মাঈ সকলের মৃতদেহ দেখে খানিকটা কান্নাকাটি করে ছুটে এসেছিল ব্রাহ্মণপাড়ায় ওই মহারাজজীর সন্ধানে। মহারাজজী ওই কপালের আঘাত নিয়েও বেঁচে গেছেন—বুক চাপড়ে চাপড়ে কাঁদছিলেন আর ওই ভাঙা অমৃতেশ্বরের মন্দিরের দিকে তাকিয়ে তাকেই গাল দিচ্ছিলেন।

—পাখল—পাখল—তু পাখল! ঝুট বিলকুল ঝুট! এরই মধ্যে শঙ্কর গিয়ে তাকে ডেকেছিল—মহারাজজী!

মহারাজজী তার দিকে তাকিয়ে দেখে বলেছিলেন—শঙ্কর?

—হাঁ মহারাজ! আমি বেঁচেছি আর সব মরে গেছে মহারাজজী! সবাই। কিন্তু তোমার মাথায় যে এ ভারী চোট লেগেছে মহারাজজী!

নিজের দোপাট্টা থেকে ন্যাকড়া ছিঁড়ে তাঁর কপাল বেঁধে দিয়েছিল। আর দুজনে পরামর্শ করে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল অমৃতেশ্বর শিউজীর মন্দিরের মেঝের তলায় মাটির ভিতর গোপন একখানা ঘর ছিল ওই ঘরের মধ্যে। তারপর বাবুজী মহারাজজীর যখন চোট ভাল হল সঙ্গে সঙ্গে চোখ গেল তখন দুজনে পরামর্শ করে বামুনওলীর ভাঙা গাঁও ছেড়ে রওনা হল দিল্লী।

সারা দেশ জুড়ে অরাজক। হিন্দুস্তানে বাদশা থেকে দেহাতের সামান্য চাষী সামান্য মজদুর পর্যন্ত বলছে পয়গম্বরশাহী শেষ হয়ে শয়তানশাহী কায়েম হতে চলেছে। পুরানা জমানার শেষ। এরপর একটা এমন কিছু হবে যাতে সমস্ত মন্দির মসজিদ বিলকুল ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

আর একদল বলে—না—মানুষেরা বিশেষ করে হিন্দুস্তানের মানুষেরা পাপে পাপে একেবারে জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত হাওয়া পানি মাটি, মানুষের মন দিল মগজ ছয়লাপ করে দিয়েছে, সেই কারণে খুদাতায়লার রোষ হয়েছে—এবার শয়তানের শয়তানি খতম হবে। মানুষের বুকের মধ্যে শয়তান বাসা গেড়েছে বলে মানুষেরাও তামাম মরবে।

বাদশাহ দরবারে তখন নজফ খাঁয়ের উজীরির শেষ আমল—বাদশাহী খাজাঞ্চীখানায় সোনা রুপা দূরের কথা তামা সীসাও নেই। সুবার মধ্যে বাংলা থেকে ইংরেজরা খাজনা পাঠায়—আর কোন সুবা থেকে দামড়ী আসে না। নজফ খাঁ রোহিলখণ্ড থেকে লতাফৎ খাঁয়ের সঙ্গে দোস্তি করে পরভীনকে নিয়ে শরাব আর নাচগান ঔরৎ নিয়ে নিজে জহান্নমে গেল সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহীকেও দেউলে করে জহান্নমে দেবার ব্যবস্থা করেছে। মারাঠারা আপনাদের চৌথ নিয়ে দিব্য বসে আছে। বাদশাহী হারেমে চিৎকার উঠছে। বেগমরা শাহজাদীরা বলছে তারা আঁচলে আঁচলে গিঁঠ বেঁধে চুলের বেণীতে বেণীতে বাঁধন দিয়ে

যমুনায় ঝাঁপ খাবে—তারা মরবে। এ অভাব তারা সইতে পারছে না। বাচ্চারা পর্যন্ত কাঁদে। শাহজাদারা বাদশাহের মরণ কামনা করে। আটক বাদশাহবংশের ছেলেরা জানওয়ারের মত রুটি! রুটি! রুটি! বলে চিৎকার করে। বাদশাহের বান্দা গোলামেরা বাঁদীরা পেট পুরে খেতে পায় না। লালকিল্লার লালপল্টন তলব পায় না। তারা বাদশাহকে গাল দেয়। সারা দিল্লীর বাজারে বানিয়া মহাজনদের কাছে বাদশাহের দেনার আর শেষ নাই। আসল দূরের কথা তারা সুদ পায় না। তারা নতুন ধার দিতে নারাজ। খুদ বাদশাহের দুই পায়জামা এক কামিজ এক কুর্তা সম্বল হয়েছে। দুসরা নেই।

বাদশাহ গাল দিত নজফ খাঁকে, বলত—শয়তান ওই নজফ খাঁ হল খুদ শয়তানের পিয়াদা। সারা হিন্দুস্তানকে জহান্নমে দেবার ব্যবস্থা পাক্কা করছে। শয়তানের পরওয়ানা জারি করতে এসেছে।

যাও তার কাছে—দেখবে কোন বাগিচায় নয়তো যমুনা-কিনারায় বালুর উপর তাঁবু ফেলে শরাবে চুর হয়ে আওরৎ নিয়ে নাঙ্গা হয়ে পড়ে আছে। দিল্লীর গলিতে গলিতে ফের দেখবে তাড়িখানা কাফিখানা কসবীখানায় মেলা বসে গেছে। পাপ পুরা হয়ে আসছে। বেমার গেছে। আঁধি গেছে। ভূমিকম্প গেছে। এবার শেষ হবে। এবার খতম্। তৈয়ার থাকো! সব তৈয়ার থাকো!

মাথার চুল ছিঁড়ত বাদশা। আর কৌটো থেকে আফিং বের করে মুখে ফেলত। আর ফুরসির নল নিয়ে টানত। সে তামাকে আগের বাদশাহী তরিবৎ ছিল না। শুধু ধোঁয়া, একরাশ ধোঁয়া বাদশাহের কলিজাকে ফুসফুসকে ভরে দিত।

এরই মধ্যে বাদশাহের কানে এসে একদিন পোঁছেছিল গান। পুরুষ আর মেয়ের মেলানো গলায় গান গাইছিল। লালকিল্লার পূর্বদিকে যমুনা নদীর কিনারা বরাবর গান গেয়ে চলেছিল। বাদশাহ শাহ আলম লালকিল্লার বুরুজের উপর থেকে সেই গান শুনতে পেলে। সেদিন তারা গাইছিল দরবেশ দেওয়ানা শয়র মীর তকীর গজল; মীর তকী তখনও বেঁচে।

> হালৎ তো ইয়ে হ্যায় মুঝকো ঘমো সে নহি ফরাঘ্
> দিল সোজিসে দরুনীসে জ্বলতা হ্যায় চু চুরাঘ
> সিনা তামাম চাক হৈ সারা জিগর হৈ দাঘ
> হৈ নাম মজলি সোঁ মে মরা মীরে বে-দিমাঘ।

বেঁচে থাকার বাস্তব অবস্থা হল দুঃখ; দুঃখ থেকে রেহাই নেই। বুকের ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছে—জ্বলছে জ্বলন্ত প্রদীপ চেরাঘের মত। সমস্ত বুকটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল। আমি হলাম বে-দেমাক মীর সাহেব। মীর তকী।

শাহ আলম নিজেও কবি ছিল বাবুজী। সেকালে রাজা বাদশাহ এরা রাজা বাদশাহ হয়ে সুখ পেত না, তারা কবি হত। শাহ আলমের গজল আছে, রুবাই আছে। বাদশাহের ভাল লেগেছিল—"দিল সোজিসে দরুনীসে জ্বলতা হ্যায় চু চুরাঘ। সিনা তামাম চাক হৈ সারা জিগর হৈ দাঘ।" অন্তরের ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছে; ঠিক জ্বলন্ত প্রদীপের মত নয়, না তা নয়; জ্বলছে তেল দিয়ে ভেজানো বিছানার মত; সারা বুকটা জ্বলে পুড়ে দগ-দগে ক্ষতে ভরে গেল। ঠিক বলেছে কবি মীর তকী!

বাদশাহ ওই হিন্দু সন্ন্যাসীকে ডেকে আনিয়েছিল। কিল্লার ভিতরে নয়, বাইরে ওই যমুনার কিনারায় এসে তারা দাঁড়িয়েছিল—বাদশাহ বলেছিল—কিছু খুদার নাম শোনাতে পার ফকীর? যে দুখ আর যে জ্বালার কথা বললে তা তো দিনরাত পোড়াচ্ছে। আর কিছু শোনাতে পার?

তারা ভজন শুনিয়েছিল।

বাদশাহ তৃপ্তি পেয়েছিল। কিছু ভিক্ষা দিয়েছিল। আর বলেছিল—উজীর মীরবক্সী নজফ খাঁয়ের কুঠিতে যেতে পার? তাকে শুনিয়ে আসতে পার খুদার নাম? ওই মীর তকীর গজল শুনিয়ে বলতে পার আমরা চোখে দেখে এলাম বাদশা ঠিক এই চেরাঘের মত পুড়ছে—শুধু বাদশা কেন তামাম হিন্দুস্তান পুড়ছে। এ গুনাহ বিলকুল নজফ খাঁ তোমার।

বাবুজী, বামুনওলীর অন্ধা পুরোহিত আর গুলবদনী বাদশাহের কথা অমান্য করেনি।

তা সেকালে বাদশাহী নোকর ওই সৈয়দভাইয়া গাজিউদ্দিন অযোধ্যার নবাব রোহিল-খণ্ডের নাজিবউদ্দৌলা জবিতা খাঁ মারাঠা সরদার রাজপুত রানা শিখ সর্দার ছাড়া হিন্দুস্তানের লোকেরা কখনও করত না। চোরে না ডাকাইতে না চাষীরা না মজদুরে না—কেউ না বাবুজী কেউ না। ভয়ের কথা নয়। ভয় নয়। ভয় করত ঔরংজীব বাদশার আমলে—তারও আগে, তারও পরে কিছুদিন। কিন্তু তারপর না বাবুজী। তারপর যত তারা দুর্বল হয়ে এসেছে, উজীর নাজির সিপাহসালার মনসবদার সুবাদার জায়গীরদার রাজা নবাব সুলতান আমীর ওমরাহেরা যত বে-খাতির করেছে তত তাদের ভালবেসেছে হিন্দুস্তানের লোকে।

তোমাদের রামায়ণে আছে লছমনজী সীতামাঈয়ের পায়ের পাঁয়জের ছাড়া আর কোন গহনা চিনতে পারেন নি। তার মানে এই হয় বাবুজী, যে পায়ের দিক ছাড়া আর কোন দিকে চেয়ে দেখেননি লছমনজী। হিন্দুস্তানে সাধারণ মানুষে বাদশাহী জেনানাদের দিকে ঠিক তেমনি করেই তাকাত। মুখের দিকে চাইত না, কখনও চোখ তুলে চেয়ে দেখত না।

মহারাজজী আর গুলবদনী তারাও বাদশাহের হুকুম তামিল করতে এসেছিল। কিন্তু মীর নজফ খাঁ সাহেবের দেখা মিলল না। নজফ খাঁ তখন শয়তানী মজলিসের মধ্যে মশগুল হয়ে বসে আছে না-হয় বেহোঁশ হয়ে পড়ে আছে না-হয় কোন আওরৎকে বুকে জড়িয়ে ধরে আছে না-হয় খানা খাচ্ছে গোগ্রাসে দারু পান করছে—শরাবের গেলাস মুখে তুলে দিচ্ছে পরভীন। পরভীন তার পাশে বসে থাকত বাবুজী শরাবের গেলাস হাতে; এক পালংকে তার পাশে শুয়ে থাকত, আবার দুসরা ঔরৎকে এনে ওই পালংকে তার পাশে শুইয়ে দিয়ে সে বেরিয়ে যেত ঘর থেকে। বাইরে থাকত লতাফৎ খাঁ—কখনও কখনও হঠাৎ এসে হাজির হত কালাশের; তাদের সঙ্গে তার মজলিস বসত। কখনও কদাচিৎ সে চলে যেত মালকিনইজমানির মঞ্জেলে, তারাই তাকে পেয়েছিল বেটী হজরতমহলের কাছে—আবার তারাই তাকে দিয়েছিল জবিতা খাঁকে। দিল্লীর মসনদে বসাতে হবে আহম্মদশাহের ছেলে শাহজাদা বাঁকাকে, বাবুজী তাবারিখের কেতাবে তার ভাল নাম হল শাহজাদা বিদরভক্ত। মালকিনইজমানির বড় রাগ আজিজুদ্দিন আলমগীরের ছেলের উপর। আজিজুদ্দিনের জন্যে মহম্মদশাহের বংশের বাদশাহী গিয়েছে। মালকিনইজমানি সাহেবাইমহল অনেক লাঞ্ছনার মধ্যে লালকেল্লা ছেড়ে এসেছে। তাদের দৌলত এখনও মাটির নীচে পোঁতা আছে। পরভীনবানু—এই কাশ্মীরী ঔরৎ, বাবুজী, সেই সব ঔরৎ যারা ঠিক সেই সব পুরুষদের মত ব্যাভিচারী—যাদের ভুখা দুনিয়ার সব ঔরতের উপর। মালকিনইজমানির কাছে যখন ছিল তখন পরভীনের বয়স সবে ষোল—বিদরভক্ত তার থেকে কিছু বড়; তখনই সে

শাহজাদা বাকার প্রেয়সী হতে চেয়েছিল—সেদিকে হাত বাড়িয়েছিল। আজও তার আশা যদি শাহজাদা বিদরভক্ত কোন দিন মসনদে বসে তবে পরভীন তার বেগম হয়ে বসে হিন্দুস্তানের মালকিন হতে পারবে।

শাহজাদা বিদরভক্ত পুরুষ হিসেবে তার মত মেয়ের কাম্য ঠিক নয়। দুবলা দুবলা চেহারা একেবারে মাখনের মত নরম। গুলাবের পাঁপড়ির মত চামড়া। আর পড়ে শুধু কেতাব।

সেদিক দিয়ে ওর যোগ্য মর্দানা জঙ্গী জওয়ান গোলাম কাদের নবাবজাদা। এই ছাতি লালচে পাথর কেটে গড়া মূর্তির মত শক্ত, এই মাথায় উঁচু জবরদস্ত দেওদার গাছের মত সিধা! সে তার থেকে বয়সে ছোট—চার পাঁচ বছরের ছোটই হবে। নবাব জবিতা খাঁয়ের পরস্তার হওয়ার আগে সে যখন বাঁদী তখন থেকে সে এই বাচ্চা শেরের দিকে তাকিয়ে কেমন হয়ে যেত। গোলাম কাদেরও বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু নবাব জবিতা খাঁ তাকে পরস্তার বাঁদী-বেগম করে নিয়ে গোলাম কাদেরের কদম রুখে দিয়েছিল।

সে লোভও তার আছে। নবাবের বেগম না হোক গোপন প্রেয়সী। কোনটার আশাই সে ছাড়েনি। কিছু ছাড়া তার অভ্যাস নয়। সে বাঘিনী। ঔরংশের। সে সব খাবে। একটুকরা হাড় কি মাংস সে ছেড়ে দিতে রাজী নয়।

মালকিনইজমানির কাছে সে যেত। বলে আসত নজফ খাঁয়ের অবস্থা। নজফ খাঁ গেলেই বাদশাহী ভেঙ্গে পড়বে। টাকা ঠিক করে রাখো মালকিন—রোহিলা আফগান দিয়ে দক্ষিণী বর্গীদের ভাগিয়ে দাও। তারপর টেনে নামিয়ে দাও শাহ আলমকে।

এমনি একদিন বাবুজী!

কুছ রোজ ফিরে গিয়েছে ওই বুড়ো মহারাজজী আর ওই গুলবদনী ; হিন্দু সন্ন্যাসী আর তার মুরিদা। খুদাতায়লার নাম নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে নজফ খাঁয়ের হাবেলীতে—আর ভিতর থেকে হুকুম জারি হয়েছে জেনানীর গলার আওয়াজ—"চুপ করতে বলো। এইসব গানা গাইতে বারণ কর!

মন্ন গুলাম মন্ন গুলাম মন্ন গুলাম তেরা—
তু দেওয়ান মেহেরবান—নাম তেরা সেরা—
মন্ন গুলাম—।

বন্ধ করো। ভিখ দিয়ে দাও।"

ভিক্ষা এরা নিত না। পাহারাদার নাশাকাচি বলত—ভিখ নেবে না।

—ভিখ নেবে না তো ভাগাও। ভাগা দেও।

পাঁচ সাত রোজ দোর থেকে ফিরেছে ; কোন কোন রোজ ফটকে শুনেছে খান-ই-খানান সাববাহাদুর হাবেলীতেই নেই। লতাফতের হাবেলীতে কি বজরায় কি কোন বাগিচায় কি যমুনাকিনারায় তাঁবু ফেলে আমোদ করতে গেছে। এমনই ভাবে বেশ কিছুদিন পর এক রোজ বাবুজী মিরজা নজফ খাঁ হাবেলীতে ছিল একা। লতাফৎ খাঁ কালাশের ছিল লতাফতের বাড়িতে। পরভীন গিয়েছিল মালকিনইজমানির বাড়িতে। মিরজা নজফ বেহোঁশ হয়ে পড়েছিল শরাবের ঘোরে। আর তার বিছানায় রেখে গিয়েছিল পনের ষোল বছরের এক নতুন কেনা বাঁদী।

ফকীর বললেন—হজরত রহিমশাহ বলেছিলেন আমার গুরু তাঁর মুরিদকে, বলেছিলেন—বেটা, কভি কভি এইসা হোতা হ্যায় কি, কখনও কখনও এমন হয় যে শয়তানেরও ভুল হয়ে

যায়। শয়তানের চেয়ে হিসাবী আর কেউ নয় বেটা। হিসাবের গিঁঠে গিঁঠে সে এমন করে বেঁধে যায় যে একটা পিঁপড়া কি একটা মক্ষিও তার ভিতর দিয়ে গলতে পারে না। হিসাবে এমন যদি হয় যে বহুৎ ভুখার সময় খানা মুখের কাছে ধরেছে কিন্তু সে-খানায় নিমক নাই; খেয়ে তার সর্বনাশ করলে নিমকহারামি হবে না তা হলেও সে মুখের খানা সে ছেড়ে দিয়েছে বেটা। এখানে নজফ আলিকে শরাব খাইয়ে ওই এক কচি লেড়কীকে তাকে দিয়ে তারা বেরিয়ে গেল। গেল গেল হাবেলী ছেড়ে বাইরে চলে গেল। বেটা, নজফ খাঁ শরাব খেয়ে হোঁশ হারিয়ে জানোয়ার বনে গিয়েছিল, ওই বাচ্চি লেড়কী কেঁদেছিল। সেই কাঁদার জন্যে সে তার মুখে থাপ্পড় মেরেছিল—বাচ্চি চিৎকার করে উঠেছিল এবার। নজফ খাঁ তার গলা টিপে ধরেছিল—চুপ!

চুপ করাতে চেয়েছিল। তা চুপ হয়েছিল লেড়কী। সারা জিন্দগীর মত চুপ হয়ে গিয়েছিল। মরে গিয়েছিল হতভাগিনী।

বেটা, হতভাগিনী হয়তো নয়। হতভাগ্যের মন্দনসীবের জুলুম থেকে সে লেড়কী খালাস পেয়েছিল। দুনিয়া তো ছিল তার কাছে তন্দুরের মত—সেখানে সে পুড়ছিল; মুর্গীর বাচ্চার মত সে তো সেদ্ধ হচ্ছিল। তার থেকে সেই জবলন্ত উনোনে পড়ে ছাই হয়ে গেল—সে খালাস হয়ে গেল।

ফকীরসাহেব বললেন—বাবুজী, শয়তানের চুক হল। নজফ খাঁয়ের হাতে লেড়কী মরল সঙ্গে সঙ্গে হিসাবের চুকের মধ্যে দিয়ে কে তাকে ডাক দিলে!—এ কি হল? একি করলি নজফ খাঁ?

বাবুজী, হজরত বলতেন—সঙ্গে সঙ্গে তার চোখেরও ভ্রম এল কিংবা যে শয়তানী সুর্মা সে পরেছিল সেটা মুছে গেল। চোখের আঁসুতে ধুয়ে গেল। নিজের তার ছিল চোদ্দ-পনের বছরের বেটী—তার মুখ আর এই লেড়কীর মুখ যেন এক হয়ে গেল। মিরজা নজফ আল্লার নাম নিয়ে আফসোস করে উঠল, বললে—লা ইলাহি ইল্লালা মহম্মদে রসুলাল্লা, এ আমি কি করলাম!

সে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল ওই কামরা থেকে।

ঠিক সেই সময়েই এই পুরোহিত আর গুলবদনী নজফ খানের হাবেলীর সামনে কাশ্মীরী ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে ভিখ মাঙছিল। উজীর কোমরুদ্দিন ইন্তিজামউদ্দৌলার হাবেলী নজফ আলি কিনে বাস করত বাবুসাহেব। কাশ্মীরী ফটকের আশপাশে এখন সব ময়দান হয়ে গেছে; পুরানো হাবেলীগুলো ভেঙেছে। নজফ আলি জীবনের জবালায় ছুটে বেরিয়ে এসেছিল; এসেই শুনলে গান—

পি-ই লে প্যায়লা, হো মাতোয়ালা
প্যায়লা নাম অমিরসকা রে!
বাচপনা সব খেলি গোঁয়ায়া
ভয়া নারী বশকা রে।
বৃদ্ধ্ ভয়া কফ্-বায়নে ঘেরা,
খাট পড়া ন জায় খসকা রে।

ফকীর বললেন—এ হল সন্ত কবীর সাহেবের ভজনগান বাবুজী। হজরত রহিমশাহের খুব প্রিয় গান। আচ্ছা গান। হা হা রে। রে মাতোয়ালা পিয়ালা ভরে নামের অমৃতরস পান করে নে রে। সমস্ত বচপন মানে ছেলেবেলা তো কাটিয়েছিস সকাল থেকে সন্ধ্যেতক খেলা করে। তারপর হলি ঔরতের বশ। জোওয়ানীকালের পুরাটা ঔরতের নেশাতেই

কাটে। তারপর বুড়ো হয় বাতে ধরে। হাঁপানি হয়।

বাবুজী, নজফ খাঁ একেবারে চমকে উঠেছিল। কেন কি ওর এই দুটো বছর কেটেছে শরাবের ঘোরে আর ঔরতের পর ঔরতের জোওয়ানী ভোগ করে করে ; ওতে আর ছেদ পড়তে দেয়নি পরভীন।

পরভীন শয়তানের পিয়ারী। তার সঙ্গে ওর মহব্বতি। সে জানত এ ভুখাকে জিইয়ে রাখতে হলে নতুনের পর নতুন আওরৎ আনতে হবে ; তাই সে আনত। সময়মত নিজেকে দিত। তারপরই নিজে সরে এসে নতুন কাউকে এগিয়ে দিত। এই জালিমী করে তার এই বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বছর বয়সেই সে নিজেকে খরচ করে ফেলেছিল। জোওয়ান বয়সেই বুড়ো হয়ে পড়েছিল—সঙ্গে সঙ্গে ধরেছিল বেমারিতে।

হাঁপানি বাত। তার সঙ্গে আরও অনেকরকম। দেহের কষ্টের বাকী ছিল না। কিন্তু জখম হওয়া বাঘ যেমন নিজের দেহের জখ্‌মী ঘা তার করকরে জিভে চেটে ওই ক্ষত থেকে ঝরা নিজের রক্ত খেয়ে সুখ পায় তেমনিভাবেই সে এই দিনরাত্রি ব্যভিচারে আর মাতোয়ারিতে সুখ পেত। তারই মধ্যে দিয়ে সে চলেছিল জহান্নমের পথে মরণের পথে। কিন্তু সে বুঝবার ফুরসৎ তার মিলত না। এরা দিত না।

নজফ খাঁ শেরের মত মর্দানা ছিল। ইমানও তার ছিল। সে চেষ্টাও করছিল বাদশাহীকে খাড়া করতে। এলাহিবাদে সে শাহ আলমের কাছে কোরান হাতে করে কসম খেয়েছিল হলফ করেছিল —সে তা রাখতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু পরভীন লতাফৎ কালাশের এরা তা দেয়নি। দেবে কি করে বাবুজী, দেবার উপায় কি ? ইমান বাঁচলে ইসলাম বাঁচলে ইনসানিয়াত বাঁচলে সে মুল্ক তারা চোর বনে যায়—শেষে তারা মরে যায়। তারা শয়তানের সিপাহী। পয়গম্বর রসুলের শাহী বরবাদ করে শয়তানশাহী কায়েম করবার জন্যে তারা চেষ্টা করছিল। কিন্তু খুদার মর্জি আর ইনসানিয়াতির কানুন—তা হয় না। যে পানি বাবুজী নীচের দিক ছাড়া চলে না চলতে পারে না তাই সূর্যের তাপে মেঘ হয়ে আকাশে ওঠে।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন ফকীরসাহেব।—তারপর চিৎকার করে হেঁকে উঠল—একেবারে পাগলের মত চিৎকার করে উঠল—নিয়ে আয়—ওই গীত গাইছে যারা তাদের নিয়ে আয়। নিয়ে আয়।

সেই দিনই নজফ খাঁ ছুটে এল সন্ধ্যার সময় লালকেল্লায়। বাদশাহ তখন দু চারজন দেউলে-পড়া আমীরের সঙ্গে বসে আপসোস করছিল, আর নিজের তৈরী বয়েৎ আওড়াচ্ছিল। আফিংয়ের নেশায় বাদশাহী বয়েৎ খুব জমে উঠেছিল। সামনের থালাতে পানের খিলি আতর মসলা ছিল বাবুজী—তবে সে নেহাতই অল্প।

হিন্দুস্তানের বাদশাহী হল ফকীরশাহী ; তখন খুদা বললেন —আজ থেকে ফকীরি নিলে আমাকে মিলবে না। মিলবে শয়তানকে। বাদশা শাহ আলম বলে—আমি বাদশাহী ছাড়তে পারছি না—ফকীরিতে আমার লোভ নেই। খুদা, তোমাকে চাইবার আমার ভরসা নাই—শয়তানকেও ভয় করি না কিন্তু তাকেও চাই না। আমি চাই কিছু দৌলত কিছু ইজ্জৎ কিছু ভাল খানা কিছু কড়া আফিং আর শান্তি।

ঠিক এই সময় নাশাকচি এসে খবর দিলে খানখানান মীর নজফ খাঁ এসেছে—বাদশাহের সঙ্গে দেখা করবে। একেবারে একা আসবে। তার সঙ্গে কোন হাতিয়ার নাই। বাদশাহের সঙ্গে তার গোপন কথা আছে।

একেবারে বাদশাহের সামনে উপড়ে হয়ে পড়ে পায়ের উপর মুখ রেখে নজফ খাঁ কেঁদেছিল বাবুজী। পুরো একঘড়ি ধরে কেঁদেছিল আর মাফ চেয়ে বলেছিল—শাহানশাহ জাহানপনা গোলামকে মাফ্ করুন। আমার কসুরের শেষ নাই আমার গুনাহের অবধি নাই পার নাই। আমি শয়তান আর শয়তানীর হাতে পড়েছি জনাব। আমি দেখতে পাচ্ছি খুদা আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। বিমুখ হয়েছেন খুদা। পয়গম্বর রসুল ক্রোধ করেছেন। আমার সারা দেহ ব্যাধিতে জর্জর হয়েছে তবু এর উপর গুনাহে গুনাহে মাতোয়ারা হয়ে রয়েছি। আমি জাঁহাপনাকে বহুৎ নুকসান করেছি। আমার শরমের আর শেষ নাই।

নিজেও তখন দেউলিয়া হয়ে এসেছে নজফ খাঁ। তবু সেদিন সে এক থলি মোহর বাদশাহকে দিয়ে এসেছিল।

নজফ খাঁয়ের কান্না দেখে বাদশাহের চোখেও জল এসেছিল।

বাদশাহ বলেছিল—নজফ খাঁ, তুমি আর একবার খাড়া হয়ে ওঠো। বাঁদী পরভীনকে ছাড়ো লতাফৎকে ছাড়ো। কালাশেরকে বাড়ি ঢুকতে দিয়ো না। হাকিম দেখাও, কবিরাজ দেখাও, নয়তো ফিরিঙ্গী ডাগডর দেখাও। খাড়া হও।

এতে আরও কেঁদেছিল নজফ খাঁ।

বাদশাহের পায়ের উপর চুম খেয়ে কদমবুসি করে কাঁদতে কাঁদতেই বাড়ি ফিরেছিল। বলে এসেছিল—জাঁহাপনা, মানুষ হয়ে জন্মেছিলাম—ইরান থেকে হিন্দুস্তানে এসে শুধু নিমককে মেনে ইমানকে মাথায় করে বুকের সাহস আর তলোয়ারের জোরে হিন্দুস্তানের বাদশাহীর সব সব থেকে বড় আমীর হয়ে শেষ শয়তানের ফেরে হারালাম। আমার জিন্দগীকে পুরা বরবাদ করেছি আমি। আমার আর দিন নেই জনাবআলি।

বাড়ি ফিরে এসে নজফ খাঁ বান্দাদের হুকুম করেছিল—সমস্ত বাড়ি সাফাই করো। ধুয়ে ফেল। নাচওয়ালীদের বিদায় করো। শরাবের বোতল ভেঙে দাও। ধুপ লাবান জেবলে দাও। মৌলভীকে ডাকো—কোরানশরীফ পড়বেন। আরও ডাকো সেই বুড়ো হিন্দু সন্ন্যাসীকে আর তার সেই মুরিদাকে। ভজনগান শুনব। বহুৎ মিঠা। ময় গুলাম ময় গুলাম ময় গুলাম তেরা—তু দেওয়ান মেহেরবান—নাম তেরা সেরা।—ডাকো তাদের। কোথায় গেল তারা?

কোথায় গেল তারা? নজফ খাঁ তাদের বসিয়ে রেখেই গিয়েছিল। সে ঠিক করেই গিয়েছিল সে সব ছাড়তে চেষ্টা করবে। তার জন্য এই গান তাকে শুনতে হবে।

বান্দারা নজফ খানের হাতে নাঙ্গা তরোয়াল দেখে ভয়ে কবুল করলে—পরভীন বেগম ফিরে এসে সব শুনে ওই বুড়োকে আর তার মুরিদাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। সঙ্গে ছিল তার কালাশের।

একরকম ধরেই নিয়ে গিয়েছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে পরভীন। নাঙ্গা তলোয়ার হাতে নজফ খাঁ গিয়েছিল লতাফৎ খাঁর হাবেলী।

লতাফৎ খাঁর হাবেলীতে লতাফৎ খাঁ শরাবের বোতল নিয়ে বসে—তিনটে রাস্তার নাচওয়ালী সারেঙ্গীদার আর দুটো বাজীগর নিয়ে সে এক মাইফেল জুড়ে দিয়েছিল।

পরভীন কোথায় সে-খোঁজ সে জানত না। জানবার ফুরসৎ ছিল না; এই তিন ছোকরী নাচনেওয়ালীকে নিয়ে এসেছে সে খানখানানের বাড়ি থেকে ফিরবার পথে। পরভীন ডুলি চড়ে গিয়েছিল মালকিনইজমানির বাড়ি সে এই পর্যন্ত জানে। এর বেশী তো জানে না।

—জানবার তো কথা নয় খান-ই-খানান! খোজা লতাফৎ খাঁ জবিতা খাঁয়ের তালাক

দেওয়া পরস্তারকে সাদী করেছিল জবিতা খানের দামাদ খান-ই-খানান মীর নজফ খানের জন্যে। এ কথা তো সারা হিন্দুস্তানে ছাপি নেই। আর হিন্দু ফকীর আর তার মুরিদরা—তাদের কথা তো লতাফৎ কিছু জানে না।

তবে হ্যাঁ। কালাশের জানতে পারে!

খান-ই-খানানের বাড়ি থেকে বের হবার সময় লতাফৎ বলেছিল—মালকিনইজমানির বাড়ি কেন? কোন মতলব?

পরভীন বলেছিল—মেহমান এসেছে আমার। কালাশের খবর দিয়েছে। মালকিনই-জমানির বাড়িতে তার সঙ্গে মুলাকাত হবে।

সে-মেহমান কে—নতুন কেউ—মানে শাহজাদা বিদরভক্ত কিনা সন্দেহ করে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—পরভীনবানু কি এবার বাদশাহীর দিকে হাত বাড়াচ্ছে?

হেসে পরভীন বলেছিল—হাঁ পরভীনের নসীবই তাই। ভাগ্যে জবিতা খাঁ জুটল তো সে খেলাৎ ভেজে দিলে। দিলে দিলে, দিলে এক খোজা খান-ই-খানানকে। পরভীন বেগমের কেরামৎ আর তার এলেম—সে পাকড়ে নিয়েছে খান-ই-খানান মীর নজফ খানকে। কিন্তু এখানেও পরভীনের নসীব; লোকটার ঔরতের ভুখা হাজার ঔরতে মেটে—এক ঔরৎ—সে পরভীনবানুর মত ঔরৎ হলেও মেটে না! ফের সে যদি কোন নতুন নাগরই পাকড়ায় তবে কি সে ওই দুবল দুবলা কিতাব পড়নেবালা মাক্কনের (মাখন) মত নরম, ফুলের গাছের মত এক ঝটকায় পড়ে যায় যে নাগর তাকে পাকড়াব? দুসরা মেহমান জী! বহুৎ জবরদস্ত জঙ্গী জওয়ান।

—খান-ই-খানান, আপনি তো জানেন এই বেশরমী ভেলকিবালী পরভীনকে। নাঙ্গা তলোয়ার আপনি নামান উজীরসাব। বসুন। তসরীফ রাখতে হুকুম হোক। এই পথের নাচওয়ালীরা আশ্চর্য জনাবআলি। যেমন নাচ তেমনি গান তেমনি জাদুগরের জাদু—ভেলকি—

না—। বলে বেরিয়ে আসছিল নজফ খাঁ। ভাবছিল পরভীন হয়তো এতক্ষণ তার বাড়িতে ফিরে থাকবে।

ঘোড়াতে সওয়ার হবার জন্যে রেকাবে পা দিয়েছে নজফ খাঁ আর সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সেই লহমাটিতেই বাবুসাহেব এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। রাত্রি তখনও প্রথম প্রহর পার হয়নি। লালকেল্লার ঘড়ি নিয়মিত আজকাল বাজে না তবুও এখানে ওখানে দু চার জায়গায় বাজে। তা বাজেনি। কাশ্মীরী ফটকের থেকে কসবীপাড়া খুব দূরে নয়। কাছেই। সেখানে তখন খুব বাজনা গান চলছে আলো জ্বলছে। বাজারের দোকানে দোকানে তখনও কেনাবেচা চলছে পুরাদমে। কাফিখানার তাড়িখানায় হাসির হুল্লোড় উঠছে—মধ্যে মধ্যে কথাকাটাকাটি চলছে। মুশকিল আসান ফকীরেরা চেরাগ আর চামর হাতে গৃহস্থ-পাড়ায় ফিরছে। হঠাৎ একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। সারা আসমান যেন সবুজ আলোয় এমন আলো হয়ে উঠল যে মনে হল একটা নয় দুটো নয় একসঙ্গে আসমানে দশ দশ সবুজ আলোওয়ালা সূর্য উঠল। আর সে সূর্য আকাশের সমস্ত তারাকে চাঁদকে তার নিজের আলোর আড়ালে ঢেকে দিয়ে এপাশ থেকে ওপাশে এ দিগন্ত থেকে ও দিগন্তের দিকে ছুটে গিয়ে তার আড়ালে হারিয়েই গেল অথবা নিভে গেল।

সারা দিল্লী চমকে উঠল। একটা কলরব করে সকলে চিৎকার করে উঠল।

সে চিৎকারের মধ্যে খুদ শয়তানও যে শয়তান সেও চেঁচিয়ে উঠল—খুদা আল্লা জান বাঁচাও!

* * *

হে ভগওয়ান প্রাণ রাখো !

তাবারিখে দেখো বাবুজী—এ ফকীর তোমাদের মত ইংরিজীওলা নয় কিন্তু ঝুট বাত সে বলছে না—দেখো তোমাদের ইতিহাসে নিশ্চয় থাকবে—ওই সালে ওই হিজরাতে প্রথমে বেমারি তারপর আঁধি তারপর ভূমিকম্প—সবশেষে বাবুজী আসমান থেকে এক তারা খসে পড়েছিল। সে আলো শুধু দিল্লীর লোক নয় সারা হিন্দুস্তানের লোক দেখেছিল। হিন্দুস্তানের আসমান আলো হয়ে উঠেছিল।

হজরত রহিমশাহ বলতেন—লোকে এর মানে বুঝতে পারেনি। আজমীঢ় শরীফে রোগা শরীর নিয়ে আমি জানতে পেরেছিলাম গুলবদনী শঙ্করবাঈ সে চলে গেল আসমান আলো করে দিয়ে। শয়তানকে খতম করে দিয়ে। খুদ শয়তান কালাশেরকে খুন করেছিল গুলবদনী। গুলবদনীকে খুন করেছিল পরভীনবানু।

পরের দিন দুটো লাশ পড়ে ছিল যমুনার ওপার থেকে যে পথটা শাহদারা হয়ে চলে গিয়েছে সেই পথের ধারে একটা প'ড়ো মন্দিরের চত্বরে।

তার পাশে হতভম্ব পাগলের মত বসে ছিল অমৃতেশ্বর শিউজীর সেই বুড়ো মহারাজজী।

॥ পনের ॥

বাবুজী, হজরত রহিমশাহ আরও বলতেন—ওই সবুজ আলো সারা আসমান জমিন আলো করে চলে গেল—আমি বুঝতে পারলাম। কিছু করবার সময় তখন আর ছিল না। শঙ্কর ভুলে গিয়েছিল—আমাকে ডাকতে ফুরসৎ পায়নি। সে আমাকে তাই বলেছিল।

হজরত গুরু বলতেন—আলোটা মিলিয়ে গেল—আমি বহুৎ দুঃখের মধ্যে বসে রইলাম। দেহে অসুখ ছিল—বাত হয়েছিল; এক মুরিদের বাত ভাল করে দিয়ে সে বাতরোগ নিজে নিয়ে তাকে হজম করছিলেন। সেই বাতের যন্ত্রণায় ঘুম আসেনি। বাকী মুরিদরা সব ঘুমিয়ে গিয়েছে। তখন কে যেন ডাকলে—বাবাসাহের হজরত !

গলা চেনা মনে হল—তারপরই সে মিঠি আওয়াজ চিনলাম—সে আওয়াজ শঙ্করের। চমকে উঠলাম। শঙ্করের আত্মা তো আলোর তুফান তুলে চলে গেল। তবে কি ভুল হল আমার !

শঙ্কর বললে—না হজরত আপনার কি ভুল হয়, না, হতে পারে। —আপনি ঠিক দেখেছেন। আমি যেতে যেতে হজরতের কাছে এসেছি—আমার শেষ আরজি পেশ করতে এসেছি।

অশরীরী শঙ্করবাঈ, নটীর মেয়ে গুলবদনীরই আত্মা পরলোকে যেতে যেতে নাকি ফিরে এসে হজরত রহিমশাহকে বলে গিয়েছিল কি হয়েছিল আর পেশ করে গিয়েছিল তার আরজি। কে মেরেছিল কালাশেরকে—কে মেরেছিল গুলবদনীকে।

পরভীন লতাফৎ খাঁকে বলেছিল তার মেহমান এসেছে মালিকনইজমানির বাড়ি। সে মেহমান গোলাম কাদের। রোহিলখণ্ডে ঘাউসগড়ে জবিতা খাঁ শেষ শয্যায় শুয়েছে। আর

খ্ব বেশী দিন নেই তার। গোলাম কাদের তরাই থেকে নেমে এসেছে। জবিতা খাঁয়ের পর সে হবে রোহিলখণ্ডের নবাব। তার ভাইদের জন্যে সে চিন্তিত নয়, সে চিন্তিত ছিল ভগ্নীপতি নজফ খানের জন্যে। বাদশাহের মীরবক্সী উজীর একসঙ্গে নজফ খাঁ। সে হাত বাড়ালে শক্ত হবে। কিন্তু নজফ খাঁয়ের সব খবর সে জানত। তাই এসেছিল পরভীনের কাছে। এবং মালকিনইজমানির কাছেও। জবিতা খাঁয়ের সঙ্গে একটা কথা মালকিনইজমানির হয়েছিল। শাহজাদা বিদরভক্তকে মসনদ দিতে পারলে মালকিনইজমানি জবিতা খাঁকে বলেছিল এগার লাখ টাকা মিলবে তোমার। তার সাক্ষী পরভীন। সেটা সে নতুন করে বলে নিতে এসেছিল।

কথাবার্তা বলে পরভীন কালাশেরকে নিয়ে নজফ খানের বাড়িতে এসে দেখেছিল নজফ খাঁ নাই। শ্নেছিল নজফ খাঁ পাগলের মত ছ্টে গিয়েছে বাদশাহের কাছে। আর দেখেছিল শঙ্করবাঈ এবং মহারাজজীকে। নজফ খাঁ বলে গেছে এরা থাকবে। ফিরে এসে খাঁ গান শ্নবে এদের কাছে। খবর শ্নেছিল শরাবের বোতল ফেলে দিতে হ্কুম হয়েছে। বাইরের তরফটা সাফা হচ্ছে। যার ঢেউ চলে গেছে হারেম পর্যন্ত, নজফ খাঁয়ের দিদি খাদিজা স্লতান পর্যন্ত চকিত হয়ে উঠেছে। তখন পরভীন কালাশেরকে বলেছিল—কি দেখছ? ব্ঝতে পারছ না কি হয়েছে?

কালাশের বোকা নয়। সে ব্ঝেছিল। এবং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। পরভীনকে সঙ্গে নিয়ে পালাবার সময় সে ওই মহারাজ আর ওই শঙ্করকে জবরদস্তি করে ডুলির মধ্যে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু কোথায় যাবে? পরভীন বলেছিল—চলো রোহিলখণ্ড। খবর পাঠাও গোলাম কাদেরকে যে সে যেন এখ্নি বেরিয়ে পড়ে। নজফ খাঁ বাদশাহের কাছে থেকে ফিরে একবার হয়তো শেষবারের মত তলোয়ার ধরে শোধ নিয়ে যেতে চাইবে। আমাদের জান যাবেই, কাদেরের খবর পেলে সে তাকেও ছাড়বে না।

যম্না পার হয়ে শাহদারা হয়ে চলে গিয়েছে শেরশাহী সড়ক; সেই সড়ক ধরে তারা এসে পেঁছেছিল এক মন্দিরের ধারে। প'ড়ো মন্দির। সামনে বাঁধানো চত্বর। সেইখানে এসে ডুলি নামিয়ে তারা অপেক্ষা করছিল গোলাম কাদেরের। রাস্তায় দ্ দ্জন সওয়ার রেখে দিয়েছিল পরভীনের নিশান দিয়ে যারা নিয়ে আসবে গোলাম কাদেরকে সেখানে।

কালাশের শয়তান।

তার রাগ শয়তানের রাগ।

নিদার্ণ আশাভঙ্গে সে বাঘের মত হিংস্র হয়ে উঠেছিল। সেই মন্দিরচত্বরে ঘ্রে বেড়াচ্ছিল অস্থির পদক্ষেপে। শঙ্কর দেখছিল তার সেই জানোয়ারের মত পা দ্খানা। বাঁকা মোচড়ানো। তাতে চামড়া কেটে জড়ানো। তাই তার জ্তোয় খটখট শব্দ ওঠে। মধ্যে মধ্যে এসে দাঁড়াচ্ছিল ওই মহারাজ আর ওই শঙ্কর মেয়েটির সামনে। হাতে পায়ে বাঁধা ছিল তারা। চত্বরের উপর ফেলে রেখেছিল। পড়ে ছিল পাহারার মধ্যে। অকস্মাৎ কালাশের এসে শঙ্করকে টেনে তুলে বাঁধন খ্লে টেনে ছেঁচড়ে এনেছিল খানিকটা এপাশে।

কালাশের খোজা।

তব্ তার লালসার শেষ নেই। শঙ্করের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল হিংস্র জন্তুর মত।

চিৎকার করেও উঠেছিল শঙ্কর।

হজরত রহিমশাহ বলেছিলেন—আমি শ্নতে ঠিক পাইনি বেটা। সে ডেকেছিল ব্ড়ো মহারাজকে—কিন্তু হাত পা বাঁধা অন্ধা ব্দ্ধ কি করবে? শঙ্কর যদি ভগবানকে ডাকত খ্দাকে ডাকত তাহলে আমি শ্নতে পেতাম বেটা। শঙ্কর তা ডাকেনি। ডেকেছিল

ওই বুড়ো মহারাজকে—তারপর ডেকেছিল নবাবজাদা গোলাম কাদেরকে।

গোলাম কাদের ঠিক সেই মুহূর্তে এসে নেমেছিল ঘোড়া থেকে সেই চত্বরের উপর। শঙ্কর তাকে দেখে চিনেছিল এবং তাকেই ডেকেছিল।

হজরত রহিমশা বলেছিলেন—তাই ডাকে। ঔরতে তাই ডাকে—যাকে ভালবাসে যাকে সে নিজেকে দিতে চায়, তাকেই সে ডাকে। খুদাকেও মনে পড়ে না পয়গম্বরকেও না গুরুকেও না। কাউকেই না। সে চায় ওই ভালবাসার মানুষই তাকে বাঁচাক। এই হল দুনিয়ার কানুন। বড় মিঠা কানুন।

কালাশেরও খুশী হয়ে উঠেছিল গোলাম কাদেরকে দেখে। সে বলেছিল—নবাবজাদা, একদিন বামুনওলীর বাগিচায় বলেছিলাম লেড়কীকে ভোগ করলে হয়ে গেল—এবার ওকে শেষ করে দিয়ে যাও। এ লেড়কী দিয়ে কাজ হবে না। এ হল রহিমশায়ের মুরিদা। আর এর মনের ভেতর একটা কিছু আছে। ও পোষ মানবে না। খুদার নাম ভুলবে না। তুমি ছুরি বসিয়েছিলে কিন্তু ঠিক কলিজায় বসাতে পারনি। আজ তোমাকে বসাতে হবে। পহেলে ওকে ভোগ করো। নাঙ্গা করো। সবার সামনে।

গুলবদনী শঙ্করবাঈয়ের আত্মা বলেছিল—হজরত গুরু, নবাবজাদা গোলাম কাদের নিজের প্রাণের জন্যে একদিন কালাশেরকে বলেছিল—আমার জান বাচাও আমি তোমার কেনা হয়ে থাকব।

কালাশের তাকে হলফ করিয়ে নিয়েছিল। কড়া আরক খাইয়েছিল, চোখে আশ্চর্য সুর্মা পরিয়ে দিয়েছিল। জানও বাঁচিয়েছিল।

নবাবজাদাও কালাশেরের আরক খেয়ে খেয়ে তৈয়ারী হয়েছে। তবু নবাবজাদা মানুষ —নবাবজাদা তখন নওজোয়ান। যখন মহব্বতির জন্যে মানুষ জান দেয়। নবাবজাদা সেই বামুনওলীর বাগিচার মধ্যে ওই কালাশেরের আরকের ঝোঁকে তারই আশকারায় ইমান নষ্ট করে আমার ইজ্জৎ নষ্ট করেছিল। তারই মধ্যে হজরত সে আমাকে ভালওবেসেছিল।

হজরত, আমি ভালবেসে ফেলেছিলাম সে তো তুমি জানো, তোমার কাছে তো ছাপি নাই হজরত। সে কথা আমার দাদাজী মনিয়ার সিংকে দিয়ে নবাবজাদাকে জানিয়ে আরজি করেছিলাম—নবাবজাদা, এই নটীর বেটীর নটীধরম অনুসারে তুমিই আমার স্বামী।

মনিয়ার সিং যাওয়ার পর ভূমিকম্প হল—আমরা নিরুদ্দেশ হলাম, এলাম দিল্লী। তবু মনিয়ার দাদাজী নিশ্চয় তাকে বলেছিল এই গন্ধর্বীর কথা। তাই বলছি। তাই নবাবজাদা কালাশেরের কথা শুনে আমার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠে বলেছিল—এ কৌন? কে তুমি?

আমি বলেছিলাম—জনাবআলি, আমি শঙ্কর। তোমার বাঁদী—

নবাবজাদা বলেছিল—বামুনওলীর নওজোয়ানী?

হজরত—!

অশরীরী শঙ্কর বলেছিল—হজরত, আমি হঠাৎ এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলাম নবাবজাদাকে।

কালাশের হা-হা করে হেসে উঠে বলেছিল—আচ্ছা আচ্ছা! প্রথমে ওকে তুমি ভোগ কর নবাবজাদা—হাঁ! তারপর—।

বলে সে ছুটে এসে আমার ওড়নার মোটা চাদরখানা টেনে কেড়ে নিয়ে ফেলে দিয়ে চেপে ধরেছিল আমার কামিজ, দুই হাত দিয়ে টেনে ফালি করে ছিঁড়ে আমাকে নাঙ্গা করে দিতে চেয়েছিল।

আমি নবাবজাদার পা চেপে ধরে বলেছিলাম—আমি তোমার বাঁদী—আমার শরম বাঁচাও। আমার রুস্তম! আমার কিষণজী! আমার রামচন্দর!

কালাশের একটা নিষ্ঠুর চিৎকার করে চেপে ধরেছিল আমার চুল। গালে মেরেছিল চড়, বীভৎস সে চিৎকার !

সঙ্গে সঙ্গে গোলাম কাদের নবাবজাদা দপ্ করে যেন জ্বলে উঠল—আওয়াজ করে যেন বারুদের বোমা ফেটে গেল। সেও একটা চিৎকার করে ঠাস করে চড় মারলে কালাশেরকে !

কালাশেরও চমকে উঠল। কিন্তু সে চমক এক লহমার জন্যে। তারপরই সে চেপে ধরলে নবাবজাদার গলা।—তুমি নিজে বেচেছ আমার কাছে—তোমার মনে নাই ?

হুজরত, আমার নজরে পড়ল নবাবজাদার কোমরবন্ধে গোঁজা রয়েছে ছোরা। আমার কি হল জানি না—আমি টেনে সেই ছোরা বের করে নিয়ে বসিয়ে দিলাম কালাশেরের কলিজায়।

হুজরত গুরু, তুমি হয়তো সে সময় আমাকে বল যুগিয়েছিলে, খোদা মেহেরবান, গরীবানের 'ভরোসা' পয়গম্বর রসুল দুর্বলের বল ; আমার বুকে সাহস এল—হাতের কব্জিতে বল এল কোথা থেকে—ছোরাটা বসে গেল ঠিক কলেজার মাঝখানে। একটা চিৎকার করে পড়ে গেল কালাশের। তার সে জানোয়ারের মত বাঁকাচোরা অদ্ভুত পা দুখানা জন্তুর মতই সে ছুঁড়তে লাগল।

হুজরত আমি দেখছিলাম। গোলাম কাদের কাঠের মত দাঁড়িয়ে ছিল, কালাশের তাকে বললে—এ খুনের বদলা আমি নেব। তোমার খুন। দেনা আমার শোধ চাই।

হুজরত, নবাবজাদা গোলাম কাদের কালাশেরের আরক খেয়ে আর মানুষ নয় জনাব—সে পুরা জানোয়ার হয়ে গেছে—জনাব, সে তার আত্মাকে বেচেছে শয়তানের কাছে—সে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েই রইল। এরই মধ্যে হঠাৎ আমার বুকে একটা নিষ্ঠুর যন্ত্রণা অনুভব করলাম, হুজরত, এবারও খোদাকে মনে পড়ল না, পয়গম্বরকে মনে পড়ল না—গুরু, তোমাকে মনে পড়ল না। পড়ল নবাবজাদাকে। নবাবজাদাকেই ডেকেছিলাম আমি। তারপর পড়ে গেলাম।

হুজরত, পরভীন বিহ্বল হয়ে পড়েছিল।

সে-বিহ্বলতা কাটতেই সে উঠে তার নিজের ছোরা খুলে বসিয়েছে আমার বুকে।

হুজরত, আমি বেঁচে থাকলে পরভীন নবাবজাদা গোলাম কাদেরকে নিয়ে খেলতে পারবে না।

ঠিক সেই মুহূর্তেই সারা আসমান আলোয় আলোয় যেন তুফান বইয়ে দিয়েছিল।

আমার আত্মা দেখলে একটা 'টুটতা সিতারা', শিহার। আসমানের এক তরফ থেকে আর এক তরফ পর্যন্ত ছুটে চলে গেল।

হিন্দুর শাস্ত্রে মুসলমানের শাস্ত্রে সব শাস্ত্রেই বলে এমন উল্কাপাত একটা ভীষণ বিপদের ইশারা।

হুজরত, পরকালের সীমানার এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখছি সে বিপদ আসছে। কালাশের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত ঘষছে। সে শোধ নেবে।

আমার আরজি হুজরত, আমার দেহটা পড়ে আছে শাহদারার ধারে—আপনি আমার কবরের ব্যবস্থা করবেন। আর যেদিন নবাবজাদা গোলাম কাদের তার দেনা শোধ করবে, করতে তাকে হবে হুজরত—সে আপনি জানেন, সেদিন ওই কবরেই তাকে আমার পাশে শুইয়ে দেবেন। যেন জন্মজন্মান্তরেও কালাশের তাকে গোলাম বানিয়ে না তুলতে পারে। তার আত্মার মুক্তির ব্যবস্থা তুমি করো তোমার মুরিদার এই আরজি।

ফকীরসাহেব বললেন—বাবুজী, সেই কবর হল এই আগ্রা থেকে অল্প দূরে। মথুরা পার হয়ে। হজরত রহিমশাহের একটা আস্তানা ছিল সেখানে। তিনি তাঁর মুরিদার আরজি মঞ্জুর করেছিলেন।

বাবুসাহেব, তাবারিখে ইতিহাসে আছে—তুমি এসব আমার থেকেও ভাল জান—ক'বছর পর গোলাম কাদেরের দুই চোখ প্রথম উপড়ে নেওয়া হয়—তারপর কাটা হয় নাক কান তারপর আঙুল তারপর গর্দান। দুই চোখ, দুই কান, নাক, আঙুল একটা ঝাঁপির মধ্যে পুরে পাঠানো হয়েছিল বাদশাহ শাহ আলমের কাছে। বাদশাহের হুকুম ছিল। কেটে পাঠিয়েছিল মাহাদজী সিন্ধিয়া। মারাঠা সর্দার। বাদশাহ শাহ আলমও তখন অন্ধ। দুই চোখ ছিল না। ছিল দুটো বীভৎস গর্ত। বাবুসাহেব, সেও তুলে নিয়েছিল ওই গোলাম কাদের। কালাশের তখন ছিল না কিন্তু শয়তান ছিল। শয়তানের পরস্তার ছিল পরভীন; সেই ছিল গোলাম কাদেরের সব।

সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছিল। শাহানশাহ বাদশাহ জেলালুদ্দিন আকবরশাহের সমাধিস্থল সেকেন্দ্রার এক কোণে বসে বৃদ্ধ ফকীর গল্প বলে চলেছিলেন। দর্শকের ভিড় বাড়ছিল। মোটরের আনাগোনা বেড়েছে। ইলেকট্রিক হর্নের আওয়াজ ইঞ্জিনের শব্দ বাল্ব হর্নের ষাঁড়ের চিৎকার পেট্রোলের গন্ধে এতক্ষণ ধরে যে একটি অবাস্তব প্রাচীন অপ্রাকৃত সংস্কার-সম্ভূত বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে তোলা এই সেকেন্দ্রার মত একটা পুরনো প্রাসাদের স্বপ্ন দেখছিলাম তা ভেঙে গেল।

আফজল ধূপদানিতে লাবান ধূপ জেবলে দিচ্ছিল। মুসলমানেরা সন্ধ্যার নামাজ পড়ছিল। ফকীরসাহেবও উঠে দাঁড়ালেন। নামাজ পড়বেন। আমি সরে এসে বসলাম। শুনে যাব, শুনেই যেতে চাই বাকীটা।

ইতিহাসের কথা জানি।

বাদশাহ শাহ আলম, জবিতা খাঁ, গোলাম কাদের, মীর নজফ খাঁ, খোজা মনসবদার লতাফৎ খাঁ, আবদুল আহাদ, মাহাদজী সিন্ধিয়া, খোজা নাজির মনজুর আলি, মালকিন-ইজমানি—সবাই সত্য। পরভীন, নামটি বাদে ওই শয়তানী নারী সেও সত্য। ইতিহাসে আছে—The serpent that caused Nazaf Khan's fall was Latafat Ali Khan a a eunuch general and a brother Shia. This man introduced to Nazaf Khan's notice a woman of bewitching fascination but abandoned character whom Latafat had wedded; and entering Nazaf Khan's private wine parties as a handmaid in attendance soon made herself his mistress and the minister of his pleasure in respect of other woman.

ফকীর তার নাম বললেন পরভীন।

পরভীন তাঁর কাছে শয়তানের সহচরী। শয়তান কালাশের। শয়তানের কথা সেকালের মানুষেরা শুধু নয় সেকালের ইতিহাস যারা লিখেছে তারাও স্বীকার করেছে। খয়রুদ্দিন বলে গেছে—বলে গেছে গোলাম কাদের শয়তানের কাছে নিজের আত্মাকে বিক্রি করেছিল।

শয়তান তাকে তার পথে চালিয়ে নিয়ে চলেছিল। সে চলেছিল। এক মুহূর্তের জন্য

থমকে দাঁড়ায়নি।

ফকীর বলেছেন—গুলবদনী শঙ্করের আত্মা হজরত রহিমশাকে বলেছিল—হজরত, একবারের জন্য এই নটীর বেটী এই গন্ধর্বী কুমারী শঙ্করবাঈয়ের জন্যে গোলাম কাদের থমকে দাঁড়িয়েছিল। সে ভালবেসেছিল এই গন্ধর্বিনীকে। আর সেই গন্ধর্বিনীও তাকে ভালবেসেছিল। সে ছোরা মেরে খুন করেছিল কালাশেরকে। যদি তা না করত তাহলে হয়তো গোলাম কাদেরকে এমন করে চোখ কান নাক আঙুল কেটে দিয়ে গর্দান দিতে হত না। শয়তান হয়তো তাকে মসনদে বসাতো।

মসনদের খুব কাছে এক হাত দূরে গিয়ে হাজির হয়েছিল গোলাম কাদের। হাজির করে দিয়েছিল শয়তান। আর সাক্ষাৎ শয়তানই হয়েছিল সে।

ফকীরসাহেব বললেন—ওই পরভীন অসামান্য রূপবতী কলাবতী লীলাবতী কাশ্মীরী কন্যা তাকে কড়া আরকে আর তার যৌবনরসের নেশায় প্রমত্ত করে রেখেছিল।

ইতিহাসেরও কোন প্রতিবাদ নেই। গোলাম কাদের যৌবন মদমত্ত নারীবিলাসী ব্যাভিচারী এবং মদ্যপ ছিল। জাবিতা খাঁয়ের পরিত্যক্ত শুষ্ক রিক্ত রোহিলখণ্ডে মেঝে খোঁড়া ঘাউসগড় পাত্থলগড়ে বসে মদ আর নাচ গান ও নারীবিলাসেই তৃপ্ত ছিল না, মনের মধ্যে বুকের মধ্যে সেই সনাতন অনির্বাণ প্রতিশোধ কামনার আগুন জেলে রেখেছিল—এবং ঘাউসগড়ের পাত্থলগড়ের রিক্ততার দিকে তাকিয়ে তাতে আহুতির পর আহুতি দিয়ে তাকে আরও বেশী জ্বালিয়ে তুলতে চেয়েছে।

তারপর এল সুযোগ।

ছিন্নবিচ্ছিন্ন হিন্দুস্তান। শত সহস্র দ্বন্দ্বে কলহে বিদীর্ণ এবং ভিন্ন। স্বার্থের দ্বন্দ্ব ধর্মের দ্বন্দ্ব, মর্মের দ্বন্দ্ব, হিংসার ফলে প্রতিহিংসার দ্বন্দ্ব—দ্বন্দ্বের আর শেষ কোথায় ছিল তখন।

একালের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিসম্পন্ন ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসকে বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর বিচার করে একে বলেন মানবসভ্যতায় একটি বিশেষ স্তর থেকে নূতন স্তরে উত্তরণকালের স্বাভাবিক অবস্থা; একটা বিশাল পুরাতন প্রাসাদের কালক্ষয়ে ক্ষয়ে ফাটলে ফাটলে ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়া। এখন অপেক্ষা শুধু একটি কম্পনের বা একটি ঝড়ের বা একটি প্লাবনের বা একদল শস্ত্রপাণি মানুষের আবির্ভাবের।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় নবাব রাজা রানারা শিখ সর্দারেরা রাজপুতেরা জাঠেরা বর্গীরা শিয়ারা সুন্নীরা আফগানেরা মুঘালিয়ারা তখন স্বপ্ন দেখছে এক একটি ছোট স্বাধীন রাজ্যের এবং সেখান থেকে যাত্রা করে সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যের।

বাদশাহের দরবারে উজীরী নিয়ে ষড়যন্ত্র।

ওমরাহদের মধ্যে দুটো ভাগ তিনটে ভাগ চারটে ভাগ।

মিরজা নজফ খানের মৃত্যুর পর।

মিরজা নজফ ওই রোগ থেকে সারেনি। খাড়া হওয়া তার হয়নি। বাদশাহের পায়ে মুখ রেখে কেঁদে এসেই যতটুকু প্রায়শ্চিত্ত হয় করেছিল। তারপরই সে মারা গেল। পরভীনকে অভিসম্পাত সে দিক—তার মত মনোহারিণী সর্বনাশীর অভাবে সে যে দীর্ঘনিশ্বাস এবং চোখের জল ফেলেছিল তার কিছুটা কাব্যে সে গাঁথতে চেয়েছিল।

তার নিদর্শন কিছু নেই। ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কিন্তু সে-কালে সম্পন্ন হলেই মানুষেরা কবি হতে চাইত। বাদশাহ আলমের গজল রুবাই আছে—মিরজা নজফেরও ছিল নিশ্চয়। হয়তো নজফ লিখেছিল—তৈরী করতে চেয়েছিলাম একখানি সুখের ঘর, অর্জন করতে চেয়েছিলাম পুণ্য, প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম দেবতার আসন কিন্তু হায় নসীব আর

হায় কুহকিনী নারী তুমি যা বললে তাই করলাম—যখন শেষ হল তখন দেখলাম তৈরি করেছি কবর, অর্জন করেছি পাপ, তৈরি করেছি শয়তানের আসর। আর ঠিক তখনই তুমি সকল মোহ টুটিয়ে দিয়ে কি ভয়ংকর হাসি হেসেই না ছুটে পালিয়ে গেলে!

থাক। কল্পনা করে কি হবে? মানুষেরা আজ একশো সাতাত্তোর আটাত্তোর বছর ধরে বাস্তব সত্যের উপর তো কম কল্পনার রঙ চড়ায়নি। অবশ্য সব কিছুকেই কল্পনা বললে ভুল হবে গোঁড়ামি হবে। সুতরাং থাক।

মিরজা নজফের মৃত্যুর পর বাদশাহের দরবারের সর্বেসর্বা কে হবে এ নিয়ে বিরোধ বাধল অবশ্যম্ভাবীরূপে। মিরজা নজফের ধর্মপুত্র হিসেবে এল মহম্মদ সাকী—তার সঙ্গে অন্য দিক থেকে আফ্রাসিয়াব খাঁ নজফ কুলী খাঁ। থাক। সে অনেক কথা। বাদশাহের দরবারের কলহের সুযোগে চারিদিকে উঠল বহু জন বহু শক্তি; শিখ রোহিলা রাজপুত—যেন আগুন জ্বলে উঠল। বাদশাহ শাহ আলম বেগম সমরুর পল্টন নিয়ে নিজে বের হলেন। মাহাদজী সিন্ধিয়া দুর্বল হয়ে পড়ল। সুযোগ মিলল গোলাম কাদেরের। মাহাদজী সিন্ধিয়া শত্রুতা ছেড়ে সন্ধি করতে চাইলে। কিন্তু বাদশাহের হারেমের নাজির খোজা মনজুর আলি গোপনে বারণ করে লোক পাঠালে।—খবরদার, তোমাকে শিখদের সঙ্গে লড়াইয়ে ঠেলে দেবে। নিজে দিল্লীতে সর্বেসর্বা হয়ে বসে থাকবে। সিন্ধেকে হঠতে হল। মনজুর আলি চক্রান্ত করে বাদশাহকে বললে—শাহানশাহ, এবার নাজিবউদ্দৌলার নাতি গোলাম কাদেরকে ডেকে মীরবক্সী করুন। সে নওজোয়ান—পিতামহের মতই জঙ্গী আর তারই মত ইমানদার হয়ে উঠেছে। মুঘলাই বাদশাহী কাফের বর্গীর তাঁবেদারিতে থাকে এর থেকে বদনামী আর কি হবে? গোলাম কাদেরই একমাত্র বাঁচাতে পারে।

বাদশাহ ভুললেন। গোলাম কাদেরের কাছে পাঠালেন খেলাত। মীরবক্সীর বাহালনামা আর পোশাক তার সঙ্গে ঘোড়া আর হাতিয়ার।

বাদশাহ শাহ আলমশাহের বিশ্বাসের পাত্র ছিল দুজন—এক নাজির খোজা মনজুর আলি আর ছিল বাদশাহের হারেমের রসদ যোগানদার মুদী রামরতন বানিয়া।

রামরতন বানিয়াও সায় পুরেছিল মনজুর আলির কথায়।

গোলাম কাদের দিল্লী এসে ঢুকল। মাহাদজী বর্গী ফৌজ নিয়ে তার আগেই সরে গেছে। গোলাম কাদের দিল্লী ঢুকল।

সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের আগুন জ্বলল। কালাশের ছিল না। কিন্তু পরভীন ছিল। সে বলে দিলে—বদলা নাও কাদের, ভুলো না। ভুলো না ঘাউসগড় লুঠের কথা। ভুলো না মালিকনইজমানির সঙ্গে কি কথা হয়েছে। শা আলমকে নামিয়ে বিদরভক্তকে মসনদে বসাও। মালিকনইজমানির অনেক দৌলত। এগার লাখ কি আরও অনেক পাবে, বাদশা আলম ঘাউসগড়ের দৌলত গেড়ে রেখেছে—ওই বুড়ো কঞ্জুসকে কবুল করাও।

হয়তো সে এক গ্লাস পুরা কালাশেরী কড়া আরক তাকে খাইয়েছিল। তার সঙ্গে কানে কানে ফিসফাস করে পরামর্শ দিয়েছিল খোজা মনজুর আলি—বাদশাহের অতি বিশ্বাসের পাত্র—লালকেল্লার হারেমের নাজির।

মালিকনইজমানির কাছে নিজে গিয়েছিল পরভীনবানু। মালিকনইজমানি পাকা কথা নিলেন দিলেন।

ইতিহাসে আছে গোলাম কাদের যে অত্যাচার করেছিল যেভাবে লালকেল্লা লুঠ করেছিল, তেমন ভাবে লুঠ নাদিরশাহ আমেদশাহ আবদালীও করে নাই।

প্রথমেই দখল করেছিল সেই আটটা কামান যা বাদশাহ ঘাউসগড় থেকে এনে লালকেল্লার বুরুজে চড়িয়েছিলেন।

জনপ্রবাদ, কাদের কড়া আরকের নেশায় লাল চোখে দেখতে পেয়েছিল নবাব নাজিব-উদ্দৌলাকে, বাপ জবিতা খাঁকে। তারাও বলেছিল—বদলা লেও। বদলা।

শাহ আলমকে মসনদচ্যুত করে তাকে হাতে পায়ে বেঁধে দেহ্‌ড়ি-ই-সালাতিনএ পাঠিয়ে দিয়েছিল। এখানেই মরেছিল ফরকশের, এখানেই মরেছিল জাহান্দারশাহ, এখানেই মরেছে অন্ধ আহম্মদশাহ। বাদশারা বন্দী হলে এখানেই থাকে। বাদশার সঙ্গে সঙ্গে লালকেল্লার হারেম থেকে টেনে এনে পুরে দিয়েছিল বাদশাহের বেগমদের বাঁদীদের শাহজাদীদের শাহজাদাদের। আর লুঠ চলেছিল সারা হারেম জুড়ে।

কোথায় আছে দৌলত। কোথায় আছে ঘাউসগড় লুঠ করা আসবাব—সেইসব বর্তন সেইসব তাঁবু শামিয়ানা, বের কর টেনে। গোলাম কাদেরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে নাজিবউদ্দৌলার আত্মা। বের কর। টেনে বের কর।

খোঁড়ো মেজে। খুঁড়ে তছনছ করে দাও জয়পুরী সাদা পাথর। ফিরিঙ্গীস্তানের দামী মার্বেল। খোঁড়ো খোঁজো।

তারপর গোলাম কাদের এসে দাঁড়িয়েছিল বাদশা শাহ আলমের সামনে। বলেছিল—কুরসি আন। ফুরসি আন। তামাকুল আন।

কুরসিতে বসে ফুরসির নল মুখে দিয়ে টানতে টানতে বাদশাহের গলা জড়িয়ে তাঁর মুখে ধোঁয়ার সঙ্গে থুতু দিতে দিতে বলেছিল—বলো—বাতাও কোথায় আছে দৌলত লুকনো? বলো!

তারপর বাদশাহকে বসিয়ে দিয়েছিল দিল্লীর শাওন ভাদোর সূর্যের নীচে। বারণ করে দিয়েছিল—এক দানা খানা না। এক বুঁদ পানি না।

বাদশাহ বলেছিলেন—যা ছিল তা তোমরা খুঁড়ে বের করেছ। আর নেই। কোথা পাব।

কাদের বলেছিল—আছে। নিশ্চয় আছে। বল কোথায় আছে।

—নাই। থাকলে আমার পেটে আছে। আর কোথা থাকবে?

কাদের বলেছিল—তাহলে ওরে বুড়ো তোর পেট কেটেই দেখব আমি।

এসব কল্পনা নয়। ইতিহাসের সত্য।

দাঁড় করিয়ে রেখেছিল দিল্লীর শ্রাবণ মাসের রৌদ্রে। শুধু বাদশাহ নয়। তার সঙ্গে তার উনিশজন শাহজাদা তার বেগম শাহজাদাদের বেগম শাহজাদীদের বাঁদীদের। সকলকে।

কড়া হুকুম—এক দানা খানা না। এক বুঁদ পানি না। দিলে—।

তিনজন বান্দাকে ডেকে তাদের বুকে সোজা তলোয়ার বসিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল কি হবে।

হুঁশিয়ার!

এক দিন নয়। দু দিন তিন দিন চার দিন।

এক দানা খানা না। এক বুঁদ পানি না।

বাদশাহের নাতি মল পাঁচজন। বাদশাহের দুই সৎমা আজিজুদ্দিন আলমগীরের দুই বেগম মরল পানি পানি রব করে। শাআলমের নিজের এক বেগম মরে গেল। সে মরে গেল ভয়ে। একুশ দিন ছিল গোলাম কাদেরের উজীরশাহী সিপাহসালারশাহী—তার মধ্যে বাদশাহের বাড়ির ছেলে মেয়ে বেগম মা সব মিলিয়ে একুশজন মরেছিল।

গোলাম কাদের তখন উন্মত্ত।

ফকীরসাহেব নামাজ সেরে এসে আবার শুরু করেছিলেন, বলেছিলেন—শোন বাবুজী।

গোলাম কাদের তখন উন্মত্ত হবেই।

কালাশের এসে তার সামনে দাঁড়িয়েছে। তাকে সে আরকখাওয়া মগজে সুর্মাপরা চোখে দেখতে পেত। সে বলত—লেও বদ্‌লা লেও।

বাবুজী, দুনিয়ায় শয়তানের জায়গীর তিন জায়গীর। যাকে তোমরা বল কাম ক্রোধ লোভ। ওর সঙ্গে আছে বাবু এই বদলা নেওয়ার প্রতিহিংসা।

বাবুজী, সেই প্রতিহিংসায় সে শেষ বাদশাহের বুকে চড়ে বসল। আর হুকুম করলে—ডেকে আন্ দরবারের যে তসবীর আঁকে তাকে। তার সামনে সে ছুরি দিয়ে বাদশাহের চোখ উপড়ে নিলে। আর ওই চিত্রকরকে বললে—এ ছবি আঁকো। নাম দিও প্রতিহিংসা। বদ্‌লা। ঘাউসগড়ের বদ্‌লা।

বাবুজী, তার পর লোভের কথা শোন বাবুজী।

মালিকনইজমানিকে হুকুম পাঠালে—দাও বারো লাখ টাকা—মসনদে বসাচ্ছি বিদরভক্তকে।

মালিকনইজমানি বললে—টাকা নেই। টাকা তুমি অনেক লাখ পেয়েছ লালকেল্লা লুঠে।

হা-হা করে হাসলে কাদের।

তারপর মালিকনইজমানিকে আর সাহেবাইমহলকে এনে কেল্লার উপর সব মানুষের সামনে বোরখা খুলে দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললে—নিকালো রুপেয়া!

তারপর বাবুজী—মনজুর আলি।

মনজুর আলি বলেছিল—কাদের, আমি তোমার ধরমবাপ।

কাদের বলেছিল—এরে খোজা তু হারামজাদ! সাত লাখ রুপেয়া তোকে দিতে হবে। তুই দে। কালাশেরের পাওনা। কালাশের বলছে। ওই সে দাঁড়িয়ে! নিকাল!

তারপর বাবুজী ওই পরভীন ঢুকেছিল দেহ্‌লি-ই-সালাতিনে। চোখ তুলে নেওয়ার পর অন্ধ বাদশা তখন কাঁদছে বুক চাপড়ে; খোলা জায়গায় পড়ে আছে বাদশাহের হারেমের দুজনের মুর্দা। ফেলে রেখে দেওয়া হয়েছিল। কবর দিতে মানা ছিল।

পরভীন হারেমে ঢুকে টেনে এনেছিল দুজন শাহজাদীকে।—চলো।

সুন্দরী অপূর্ব সুন্দরী তারা।

তাদের নিয়ে গেল সে রাত্রে গোলাম কাদেরের সামনে। গোলাম কাদের কড়া আরক খেয়ে আধানাঙ্গা হয়ে বসে আছে তাদের জন্যে।

হঠাৎ এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল।

এক নওজোওয়ানী পরভীনের সামনে দাঁড়াল। চমকে উঠল পরভীন। ভয়ে সে কেঁপে উঠল। এ কে?

এ যে সেই শক্করবাঈ।

শক্করবাঈ বললে—বদলা নিতে এসেছি।

বাবুজী গোলাম কাদের তাকে দেখলে না। গোলাম কাদের দেখলে মনিয়ার সিংকে। চান্দ সিংয়ের নাতি—শক্করের দাদাজী। মনিয়ার সিং। মনিয়ার সিং গোলাম কাদেরের জবরদস্ত মনসবদার। সেনাপতি।

তাকে ডেকে এনেছিল ওই শক্করের আত্মা। বাবুজী, মরেও সে মহব্বত ভুলতে পারেনি। পবিত্র তার আত্মা। হজরত রহিমশাহের মুরিদা ছিল সে, সে নটী গন্ধর্বী হলেও পবিত্র। সে এসেছে তার পিয়ার নবাবজাদাকে গুনাহ থেকে বাঁচাতে। মনিয়ারকে সেই ডেকে এনেছে।

মনিয়ার সিংকেই দেখলে নবাবজাদা।

মনিয়ার বললে—নবাবজাদা, এ গুনাহ করো না !

নবাবজাদা হয়তো মানতে চাইতো না। কিন্তু পরভীনের ভয়ার্ত চিৎকারে সে চমকে উঠল। পরভীন ছুটল, ভয়ে ছুটল।—নবাবজাদা, সেই শঙ্করবাঈ—নবাবজাদা মুঝে বাঁচাও !

কিন্তু নবাবজাদার জন্যে অপেক্ষা করলে না। সে ছুটল। এক উন্মাদিনী একটা ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল।

বাবুজী, এতক্ষণে কাদের দেখতে পেলে শঙ্করবাঈকে। কাদেরও চমকে উঠল।

—শঙ্কর।

শঙ্করের আত্মা বললে—হ্যাঁ।

বাবুজী শঙ্করের আত্মাকে কাঁদতে দেখেছিল গোলাম কাদের। মহাগুনাহ সেদিন সে আর করেনি। শাহজাদীদের ছেড়ে দিয়েছিল। আর শঙ্করের আত্মা তাকে বলেছিল—নবাবজাদা, তুমি পালাও। তুমি মরবে। কালাশের তোমার কাছে তার পাওনা আদায় করবে। তোমার চোখ নেবে কান নাক নেবে আঙুল নেবে। শেষ তোমার গর্দান যাবে। কালাশেরের সেই কুকুর সেই কালো কুকুর—চোখের চারিপাশে সাদা দাগ—সে এসে তোমার লহু চেটে চেটে খাবে। তুমি পালাও। পালাও। পালিয়ে গিয়ে হজরত রহিমশার পায়ে গিয়ে পড়, ফকীরী নাও—তুমি পালাও।

নবাবজাদা কাদের পালিয়েছিল বাবুজী। কিন্তু কোথায় পালাবে ? একদিকে বাদশাহের সাহায্যে তখন আবার বর্গীরা এগিয়ে এসেছে—ওদিকে তার রোহিলা সিপাহীরা তাকে ধরে রেখেছে।

দিল্লী থেকে পালাল তার পরের দিন।

পালাল সিপাহীদের সঙ্গে। পরভীনবানুকে খুঁজে পায়নি বাবুজী। লালকেল্লার সিপাহীরা তাকে আটকাতে পারেনি—তারাও ভয় পেয়েছিল। সে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল লালকেল্লার ফটক দিয়ে।

ফকীরসাহেব বললেন—বাবুজী, বলেছি তো নবাবজাদা কাদেরকে কালাশেরের দেনা শোধ করতে হয়েছিল। কালাশেরই তাকে ঘাউসগড়ের বদলা নিতে বল যুগিয়েছিল, সেই বলেছিল তাকে বাদশার চোখ তুলে নাও, ওদের না খাইয়ে মার বেইজ্জতি কর। শয়তান তো ওতেই খুশী বাবুজী। এর জন্যে গোলাম কাদেরকেও দিতে হল তাকে নিজের চোখ কান নাক আঙুল গর্দান। আর তার রক্ত।

নবাবজাদাকে বর্গীরা তাড়িয়ে নিয়ে শেষে তাকে গেরেপ্তার করলে সেই বামনওলীতে। সেই ভাঙা অমৃতেশ্বর শিউজীর মন্দিরের চত্বর থেকে। বাদশাহী সিপাহীর ভয়ে পালাচ্ছিল গোলাম কাদের। আঁধিয়ারা রাত। পথে নবাবজাদার ঘোড়া সঙ্গীদের সঙ্গ ছেড়ে পাগলা হয়ে ছুটেছিল। মাঝখানে একটা গর্তের মধ্যে ঘোড়াটার পা ঢুকে পা ভেঙে পড়ে গেল। নবাবজাদা পড়ল ছিটকে। পায়ে চোট লাগল। কিছুক্ষণ পর উঠে চলতে লাগল উত্তর দিক ঠাওর করে। উত্তর দিকে ঘাউসগড়। কিন্তু নসীবের খেল। সে এসে উঠল বামনওলীতে। সেই মন্দিরের ধারে সেখানে ছিল কে জান ? ছিল সেই বুড়ো অন্ধা মহারাজ। নসীবের খেল দেখো। নবাবজাদা ভাঙা মন্দির ভাঙা গ্রাম দেখে বামনওলীকে ঠিক চিনতে পারেনি। আর এমনি মগজের গড়বড় হয়েছিল যে অন্ধা পুরোহিতকেও চিনতে পারেনি।

তাকেই সে বললে—বুড়ো, একটা ঘোড়া আমাকে যোগাড় করে দিতে পার ? তোমাকে অনেক মোহর বকশিস দেব।

নবাবজাদা চোখ নিয়েও চিনতে পারেনি। কিন্তু অন্ধা মহারাজ তার গলা শুনে তাকে

চিনলে। এক লহমায় চিনলে।

চিনবেই বাবুসাহেব—'কি'উ কি' (কারণ) নবাবজাদা ঠিক সেই কথাগুলিই বলেছিল—যা সে বলেছিল সেই প্রথম দিন যেদিন সে দেখেছিল শঙ্করকে।

নবাবজাদাকে বসিয়ে অন্ধা মহারাজ লোক পাঠিয়েছিল কাছেরই একটা বর্গী ছাউনিতে।—গোলাম কাদেরকে আটকে রেখেছি। জলদি এসো।

এল তারা—তারা তাকে ধরলে। তখন নবাবজাদা বেঘোরে ঘুমিয়ে ছিল।

তারপর বাদশাহ চেয়ে পাঠালে—বদ্‌লা পাঠাও। সিন্ধিয়া তুমি বদ্‌লা পাঠাও।

দিতে হল বদ্‌লা। চোখের জন্যে চোখ। তার সুদ নাক কান আঙুল। আর কালাশেরের দেনার জন্যে গর্দান। তারপর লাশটা বাবুজী পায়ে বেঁধে গাছের উপর থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হল আগ্রা থেকে মথুরা হয়ে দিল্লী যাবার পথের ধারে। বাদশাহের কাছে ঝাঁপিতে করে গেল নাক কান আঙুল চোখ। নাক কান চোখ না-থাকা সেই মুণ্ডটার জন্যে সেদিন সিন্ধিয়ার তাঁবুর বাইরে রহিমশা অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। গর্দান যখন গেল ছিটকে পড়ল মুণ্ডুটা তখন হজরত এসে চাইলেন সেই মুণ্ডুটা। লাশটা টাঙানো রইল গাছে।

শঙ্করের আত্মা হজরতকে বলেছিল ওর ওই মুণ্ডটা যেন আপনি আমার কবরের মধ্যে রেখে দেবেন। আমার কঙ্কালের বুকে। শয়তান আমার বুক থেকে কাড়তে পারবে না! তাই দিয়েছিলেন হজরত রহিমশাহ।

আমি মিথ্যা বলি নাই বাবুজী। খয়রুদ্দিন তাবারিখ লিখে রেখে গেছে। পড়ে দেখো। লাশটা নিয়ে গেছে কালাশেরের শয়তান।

খয়রুদ্দিন লিখেছে—গাছে টাঙানো হল লাশ। রক্ত ঝরতে লাগল। সকলে দাঁড়িয়ে দেখছে এমন সময় কোথা থেকে এল এক ভীষণ কালো ভয়ংকর কুকুর। চোখ দুটো তার কটাসে। আর চোখের চারিপাশে আশ্চর্য সাদা ঘের। সে এসে ডেকে উঠল ভারীগলায়। যেন সাবধান করে দিলে সকলকে। তারপর ওই ঝরা রক্ত সে চেটে চেটে খেতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে গর্জাতে লাগল। মানুষদের তাড়া করে ছুটল।

দল বেঁধে মানুষরা তাড়াতে এল। কিন্তু তাকে তাড়ানো গেল না। দিনভর সে রইল জিভ পেতে। রাত্রেও। ভোরবেলাতেও। তারপর একসময় দেখলে কুকুরও নেই লাশও নেই।

হজরত রহিমশা বলতেন—সেটা নিয়ে গেছে কালাশের। কুকুরটা তার পিছনে পিছনে গেছে। সে খুঁজে বেড়ায় গোলাম কাদেরের মুণ্ডুটা। সেটা কবর দেওয়া আছে নটীর বেটী শঙ্করবাঈয়ের কবরে তার বুকের উপর।

হজরত রহিমশা তার উপর দরগা বানিয়ে আস্তানা করেছিলেন। আমরা যারা হজরত রহিমশাহের মুরিদের মুরিদ, আমাদের উপর হুকুম আছে এখানে আসতে হবে, চেরাগ জ্বালতে হবে। খোদার নাম নিতে হবে। আর বাবুজী ভজন গাইতে হবে।

বিশেষ করে হিন্দুস্তানে যখন দেখবে জীবনে তুফান উঠবে তখন খুব হুঁশিয়ার। দেখো কালাশেরের মত পায়ের চেহারা নিয়ে শয়তান ঘুরছে। হয়তো সব সময় পা এমন নাও হতে পারে। তখন সে এসে ঘুরে বেড়াবে সারা হিন্দুস্তানময়। শয়তানের জিন্দগী কায়েম করবার জন্যে। তখন সে এই কবর খুঁজে কাদেরের মুণ্ডুটা ছিনিয়ে নিতে চাইবে। যদি পারে তবে সেই লাশটার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে তাকে ছেড়ে দেবে। সে বেঁচে উঠবে। এবার আমার ভয় হয়েছিল বাবুজী।

কিন্তু খুদা মেহেরবান। না। তা হবে না। গন্ধর্বীর বেটীর হাতের বন্ধন বহুৎ জোর। সে আঁকড়ে ধরে আছে। ছাড়বে না।

আরও এক আশ্চর্যের কথা আছে বাবুজী। এক পাগলী ওই দরগার কাছে থাকবেই। একজন মরে আর একজন আসে। প্রথম যে এসেছিল হজরত রহিমশা তাকে দয়া করে রুটি দিতেন। সে কাঁদত। এখনও আমাদের পাগলী থাকলে রুটি দিতে হয়।

আমি ফকীরকে শ্রদ্ধার সালামৎ জানিয়ে ফিরলাম আগ্রায়। মনের মধ্যে ঘুরছিল খয়রুদ্দিনের লেখা থেকে উদ্ধৃত ইতিহাস।

Khairuddin tells us a gruesome tale of how, when his headless trunk was hung upside down from a tree, a black dog with white rings around its eyes sat below it and lapped up the blood dripping from the neck··· and after two days both corpse and dog disappeared never to be seen again.

According to popular belief his infernal Master to whom he had sold his soul···গোলাম কাদেরের আত্মাকে কিনেছিল কালাশের সাক্ষাৎ শয়তান। সে শুধু তার মুণ্ডহীন ধড়টা পেয়েছে।

থাক শয়তানের কথা থাক।

থাক নবাবজাদা গোলাম কাদেরেরও কথা থাক।

নটীর বেটী শঙ্করবাঈ। ভারী মিষ্টি নাম। শঙ্কর মানেই চিনি। শঙ্করবাঈ ভারী মিষ্টি নাম।

হজরত রহিমশাহকে সেলাম। তিনি বলে গেছেন এ কাহিনী তাঁর মুরিদ মুরিদদের।

ইতিহাস ও সাহিত্য

আমি ইতিহাসের পণ্ডিত নই। আমি লেখক, প্রধানত সমসাময়িক কালের, আমার চারপাশের, আমার দেশের মানব-জীবনের কথা বলে, আমার বোধমত সেই জীবনকে সাধারণের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছি। তারই সঙ্গে চেয়েছি সেই খণ্ড কালের ও পৃথিবীর এক অংশের মানব-জীবনে সর্বকালের সার্বভৌম সনাতন মানব-জীবনের মূল বৃত্তিকে, সংস্কারকে এবং মৌল আবেগকে ধরে রাখতে। সব কালের সব দেশেরই লেখক-কবিদের এই কাজ। লেখক-কবির চারিপাশের জীবন, যার তিনি নিজেই একটি অংশে, তাকেই লেখক দেখেন দূর থেকে দর্শকের মত, আবার নিজেই তার অংশ গ্রহণ করে অংশীদার হয়ে, এক কথায় চারিপাশের চলমান যে জীবনস্রোত তাতেই অবগাহন করে লেখক তাকেই আপনার রচনার উপজীব্য বিষয় করেন।

ইতিহাসকারও সেই কাজ করেন। তবে তাঁর কর্মের ক্ষেত্র ভিন্ন, পদ্ধতিও পৃথক। তিনি বিগত কালের মূল কেন্দ্রবিন্দুটিকে ও জীবনধারাকে তৎকালীন রচনা থেকে খুঁজে খুঁজে আবিষ্কার করেন। সে কাজে কোন্ তথ্যটি সত্য কোন্ তথ্য ভ্রান্ত তা তাঁকে যাচাই করে নিতে হয়। মিথ্যাকে অর্ধসত্যকে পাশ কাটিয়ে সত্য তথ্যের উপর ভিত্তি করে সেই কালের সত্য রূপটিকে তিনি ধীরে ধীরে গড়ে তোলেন।

কৌতুকের কথা তাঁর এ কাজে সাহিত্যও কম সহায়ক হয় না, স্বল্প সাহায্য দেয় না। কারণ তথ্যকে আবিষ্কার করবার জন্য তৎকালীন সাহিত্যের কাছেও তাঁকে দ্বারস্থ হতে হয়। এ প্রসঙ্গে এ কথা বোধ হয় বলা চলে যে একটি কালের জীবনধারার সঠিকতম স্বরূপটি সে কালের সাহিত্যসৃষ্টি থেকে যতটা আভাসিত হয় ততটা বোধ হয় আর কিছুতে প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নয়। কোন বিশেষ কালের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জীর বিবরণ বা কোন বিশিষ্ট বা অবিশিষ্ট সাধারণ ব্যক্তির রোজ নামচা বা তৎকালীন সংবাদপত্র ইতিহাস-দেহের মূল কাঠামো বা তার অস্থিসজ্জাকে ইতিহাসকারের সামনে তার স্পষ্ট রূপে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে; কিন্তু সেই অস্থিসজ্জাকে যদি প্রাণবান বিগ্রহমূর্তিতে মেদ-মাংস-মজ্জা ও প্রাণযুক্ত করে স্থাপন করতে হয় তা হলে সে কালের সাহিত্যের কাছে যেতে হবেই। তারই মধ্যে তৎকালীন জীবনযাত্রার লক্ষণ ও মুদ্রাদোষ দুই-কেই পাওয়া যাবে। বিশিষ্ট যুগলক্ষণ ও তার বিচিত্র বিশিষ্টতা সব কিছুরই মূল খনি বোধ হয় সেখানে। এক কালে যা চলমান জীবনের কাহিনী বর্ণনা করে সাহিত্য হয়েছে, সে কালের মানুষ নিজের জীবনকে সেই আয়নায় দেখতে পেয়েছে তাই আবার, পরবর্তীকালে যখন সেই জীবন বিগত, জীবনের সে শোভাযাত্রা স্থির তখন তাই একদিকে যেমন সাহিত্য হিসেবে ক্লাসিক তেমনি অন্যদিকে তা সেই কালের ইতিহাসের উপকরণের অন্যতম উৎস-স্থল। এইখানেই ইতিহাসকার বোধ হয় পরম আনন্দে সাহিত্যের কাছে ঋণ স্বীকার করেন।

সাহিত্যের কাছে ইতিহাসের এ সনাতন ঋণ। এবার ইতিহাসের কাছে সাহিত্যের ঋণের কথা বলি। লেখক বিশেষের এমন প্রবণতা থাকতে পারে যিনি বর্তমানের চলমান জীবনযাত্রা থেকে রচনার উপকরণ সংগ্রহ না করে নিজের বর্তমান কালকে পরিত্যাগ করে উজান বেয়ে পিছনের কালে গিয়ে রচনার উপকরণ সংগ্রহ করেন। এ সব ক্ষেত্রে হয়তো এমনটি ঘটে যে নিজের কালের জীবন লেখকের কল্পনাকে ও কবি-শক্তিকে উদ্দীপ্ত করতে

পারে না। পিছনের কোন একটি কালের ধ্যানে তিনি যেমনি নিমগ্ন হন অমনি তাঁর কবিশক্তি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। সেই বিগত কালটি তৎকালীন ইতিহাসের কাঠামোকে অবলম্বন করে ধীরে ধীরে বিগ্রহমূর্তি লাভ করে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে লেখকের কল্পনায়। এর বিখ্যাত দৃষ্টান্ত হাতের কাছেই আছে। ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের গত দু শতাব্দীর আত্মিক পরিচয়ের কল্যাণে সে আমাদের ঘরের খবর হয়ে আছে। স্কটের নাম করতে পারি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশের লেখকটি কালের উজান বেয়ে শিল্প-বিপ্লবের ও ফরাসী বিপ্লবের তৎকালকে পরিত্যাগ করে, ফিরে গেলেন মধ্যযুগে যখন জীবন অনেক পরিমাণে প্রাকৃত ছিল, যখন জীবনের আদর্শ ও মূল্যমান ভিন্নতর ছিল। সেই বিগত কালের ইংলণ্ডকেই তিনি আপনার বিপুল পরিমাণ রচনার মধ্যে আবার ফিরিয়ে এনে প্রাণবন্ত করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ফরাসী লেখক আলেকজান্ডার ডুমার নামও অনায়াসে উল্লেখ করতে পারি। তিনিও আপনার রচনায় বিগত কালের ফ্রান্সকে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

এ ছাড়া ভিন্নতর উদাহরণও আছে। সে তালিকা শুধু দীর্ঘতরই নয়, উজ্জ্বলতরও। প্রথমেই উজ্জ্বলতম স্রষ্টার নাম করি। তিনি সেক্সপীয়ার। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি ও রোমান-বিষয়ক নাটকগুলির মধ্যেই সাহিত্যের ইতিহাসের কাছে মহার্ঘতম ঋণের কাহিনী লেখা আছে। 'এ্যানটনি ক্লিয়োপেট্রা', 'জুলিয়াস সীজার' প্রভৃতি নাটকের সঙ্গে প্লুটার্কের নাম আর ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস অবলম্বন করে তাঁর নাটকের যে দীর্ঘতালিকা তার সঙ্গে হলিনশেডের নাম অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

নিজের দেশ, আমার বাংলা দেশের সাহিত্যের দিকেই একবার তাকিয়ে দেখি না কেন? প্রথমেই তো মনে পড়বে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথের নাম। মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী'র জন্য তো তাঁকে রাজস্থানের ইতিহাসের কাছেই হাত পাততে হয়েছিল! বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টির একটি বিপুল অংশ অতি উজ্জ্বল ভাবে ইতিহাসের ঋণকে নিজের অন্তর্লোকে মণিদীপ্তির মত ধারণ করে আছে। বঙ্কিমের প্রতিভার ও কবি-কল্পনার এমনই একটি বিশিষ্টতা ছিল যা ইতিহাসের সহায়তাতেই সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল। ইতিহাস তাঁর হাতে পড়ে, তাঁর কবি-কল্পনার সঙ্গে মিশে তাঁর কবি-কল্পনাকে উদ্দীপ্তই শুধু করেনি তাকে যেন তার বাঞ্ছিত পূর্ণতাও এনে দিয়েছে। 'দুর্গেশনন্দিনী' 'আনন্দমঠ' 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'-য়ে ইতিহাসের যে অংশ তা সামান্য, কিন্তু সে আছে। আর 'রাজসিংহ' ও চন্দ্রশেখরে' ইতিহাস তার অনেকখানি শক্তি নিয়ে মহৎ রচনা দুটিকে পরিব্যাপ্ত করে আছে। আর কোন্ বাঙালী রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'কে ভুলে যাবে। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন কালের ইতিহাসের যে অনুপম ঐশ্বর্য এক একটি কবিতায় স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে আছে তার প্রমাণ তার আস্বাদে। সেখানে বৌদ্ধযুগ, মুগলযুগ, খণ্ড খণ্ড মূর্তিতে খণ্ড খণ্ড কালের ইতিহাসে যেন স্থির পূর্ণতায় প্রকটিত।

এরপর বাংলা নাটকের কথা। গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ ইতিহাস থেকে কত সম্ভার, কত উপকরণ গ্রহণ করেছিলেন তা এ কালের যাঁরা তরুণ, যাঁরা ছাত্র তাঁদের অজানা থাকতে পারে, কিন্তু যে বাঙালীর বয়স আজ চল্লিশ কি তার উপরে তাঁদের কাছে এ সত্য অগোচর নেই। বাঙলা নাটকের একটা কালই ছিল যখন মধ্য যুগের ভারতীয় ইতিহাস থেকে নাটকের আখ্যানভাগ গ্রহণ করা হত। এক পক্ষে রাজপুত অপর পক্ষে মুঘল এই দুই প্রতিপক্ষ রচনা করে ইতিহাসের পটভূমিকায়, ইতিহাস থেকে মূল ঘটনাগুলি নিয়ে আখ্যানের টানাপোড়েনে নাটকের বুনোন তৈরী হত। তার একটি বিশিষ্ট হেতু ছিল। তখন দেশে পরশাসন প্রচলিত। ইংরেজ রাজত্বের তখন যত শক্তি তত মহিমা। সেদিন

দেশাত্মবোধ প্রকাশের মাধ্যম ছিল একমাত্র ইতিহাস। ঐতিহাসিক কাহিনীই স্বদেশপ্রেমকে পরোক্ষভাবে জাগ্রত রাখত নাটকের মধ্যে।

এবার নিজের কথা বলি। তখন ১৯২২ থেকে ১৯২৬ সালের মধ্যের কোন একটা সময়। তখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে একদফা আন্দোলন হয়ে গিয়েছে। পরাধীন দেশের তরুণ, পরাধীনতার বেদনা অনুভব করি। সে আন্দোলনের উত্তাপ আমাকেও স্পর্শ করেছিল, তাতে অংশও গ্রহণ করেছিলাম। আবার অভিনয়ও ভাল লাগে, নাটক রচনা করি। সে রচনা অবশ্য তখন Solitary Pride এর সামিল আমার কাছে। মধ্যে মধ্যে জমজমাট নাট্যমঞ্চে অভিনয় করি। দেশপ্রেম, নাটক রচনা ও অভিনয় স্পৃহা এই তিনের সম্মিলিত ফল এক সময় দাঁড়াল একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাম 'মারাঠা তর্পণ'।

নাটকের বিষয়বস্তু তৃতীয় পাণিপথ যুদ্ধ। একদিকে মারাঠা অন্যদিকে ভারত আক্রমণকারী আফগান শক্তি, মাঝখানে দিল্লীর মুঘল বাদশাহী। নাটকখানিতে আজও যতদূর মনে পড়ে চরিত্র ছিল পেশোয়া বালাজী বাজীরাও, দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীর, আফগান সম্রাট আমেদশা আবদালী আর এই তিন নায়কের পিছনে সারি বেঁধে এসেছে পাত্রের দল। তাদের কেউ ঐতিহাসিক চরিত্র, কেউ বা কাল্পনিক। আর ছিল রোহিলা নবাব নাজিব-উদ্দৌলা। স্ত্রী চরিত্র মাত্র তিন চার।

মনে পড়ে নাটকখানি একাধিকবার আমাদের গ্রামের নাট্যমঞ্চে (আমাদের গ্রামে সেই সময়েই কলকাতার মত পূর্ণ সজ্জিত পাকা নাট্যমঞ্চ ছিল) অত্যন্ত সার্থকভাবে অভিনীত হয়েছিল। ইতিহাসের মানুষগুলির মনের চেহারা সঠিক কেমন ছিল কে জানে, কিন্তু আমি আমার নাটকে প্রায় প্রতি জনকেই কোন না কোন রকম চারিত্রিক স্পষ্টতা ও বিশিষ্টতা দিয়েছিলাম, দিতে পেরেছিলাম। কিন্তু আজ পরিণত বয়সে মনে হয় ঘটনাগুলির অনেকগুলি বেশ নাটকীয় হওয়া সত্ত্বেও অবাস্তবতার স্পর্শদোষে দুষ্ট ছিল। কল্পনার অসঙ্গতি ছিল এইখানে।

নাটকটি রচনা করবার সময় আমার সম্বল ছিল গ্র্যাণ্ট ডাফের মারাঠা ইতিহাসের তিনখণ্ড। লাল রঙের মলাট-বাঁধানো বইগুলি আমার মাথার কাছে ছোট্ট আলমারীটিতে থাকত। যখন তখন উল্টে পাল্টে দেখতাম। তখনও আচার্য যদুনাথের সুমহৎ কীর্তি প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানি না। বোধ হয় হয়নি। আর যদিও বা প্রকাশিত হয়ে থাকে তবুও তা আমাদের আয়ত্তের বাইরে এবং শ্রুতির অগোচর ছিল। আরভিংয়ের যে Later Mughals তিনি সম্পাদনা করেছিলেন তার সংবাদও তখন আমাদের কাছে পৌঁছয়নি। অন্য সব গবেষণার কথা তো দূরের ব্যাপার।

পরবর্তী কালে, বোধ হয় আজ থেকে দশ বার বছর আগের কথা, ওই নাটকটির আখ্যানটি নূতন করে নাটকাকারে লিখেছিলাম। তখন যথা সম্ভব তথ্য আধুনিকতম ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করেই নাটকটি রচনা করেছিলাম। 'যুগ বিপ্লব' নামে সেটি কলকাতার এক নাট্যমঞ্চে অভিনীতও হয়েছিল।

এর পর বেশ কিছু কাল কেটে গেল। ইতিহাস নিয়ে আর কিছু লেখার কথা মনে হয়নি। অবশ্য মুঘল আমলের ইতিহাস আমার কাছে বড় রুচিকর। বিশেষ শেষ মুঘলদের কাহিনী।

বছর কয়েক আগে আবার ইতিহাস নিয়ে কিছু লেখার কথা মনে এল। এই সময়ে বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস নিয়ে উপন্যাস রচনার একটি প্লাবন এসেছিল যেন। আজ থেকে বছর কয়েক বেশ কিছু উপন্যাস লেখা হল ইতিহাস নিয়ে। সেগুলি কতটা ঐতিহাসিক উপন্যাস বা সেগুলি ঐতিহাসিক উপন্যাস কি না তা বিচার করার জন্য সমালোচকরা আছেন।

তাঁদের কাজ তাঁরা করবেন। বোধ হয় একই জীবন নিয়ে নাড়াচাড়া করে গল্প রচনা করতে সাহিত্যিকদের ক্লান্তি এসেছিল, পাঠকরাও বোধ হয় রুচি বদল চাইছিলেন। তারই ফলে সৃষ্টির এই নূতন মরশুমের আবির্ভাব।

আমি এই সময় শেষ মুঘলদের কাহিনী থেকে আখ্যানাংশ নিয়ে রচনা করলাম একখানি উপন্যাস। নাম 'গন্নাবেগম'। মুঘল রাজত্বের সন্ধ্যাকাল। এক কবি আর এক গায়িকার কন্যা গন্না বেগম। আখের মত মধুর চরিত্রের সেই কন্যাটি সামান্য জায়গীরদারের কন্যা হয়েও বাদশাউজীরদের পাশে ইতিহাসে আপনার স্থান পেয়েছে। তাকে বিবাহ করেছিল বাদশার উজীর ইমাদ-উল-মুলক। সেই আশ্চর্য সুন্দর কবি-গায়িকা কন্যাটির মর্মান্তিক বেদনাময় জীবনের কাহিনী। মুঘল ইতিহাসের আসন্ন চিররাত্রি নেমে আসাব মুখে ভয়াল রক্ত সন্ধ্যার পটভূমিতে সেই আশ্চর্য সুন্দর তরুণীটির জীবন কথা লিখতে বড় বেদনা ও তৃপ্তি অনুভব করেছিলাম। সেই কালের ঐশ্বর্য, দুঃখ বেদনা সবই লিখবার সময় বড় আপন মনে হয়েছিল।

আমার আরও একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস 'অরণ্য বহ্নি'। ১৮৫৫।৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ। এর ভৌগোলিক পটভূমি সংকীর্ণ। এর পতন অভ্যুদয়ের সনাতন লীলায় একটি অংশ সাম্প্রদায়িক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এর মধ্যে ভারতবর্ষের অতীত কালের সেই আর্য অনার্য সংঘাতের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া প্রচ্ছন্ন আছে এবং তারই মধ্যে ভাবীকালের একটি প্রচণ্ডতর সংঘাতের সম্ভাবনাকে যেন অনুমান করা যায়। যার ভিত্তি আছে ও নাই-এর চিরন্তন দ্বন্দ্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আজ জীবনের শেষাংশে পদার্পণ করেছি। বর্তমান কালের জীবন কথা নিয়ে আজও সাধ্যমত সাহিত্য রচনা করে চলেছি। সে দিন দূরে নয় যে দিন আমি ও আমার কর্ম-জীবনের ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন শোভাযাত্রা আর চলমান না থেকে স্তব্ধ স্থির হয়ে যাবে। সেই দিন আমার রচনার কিয়দংশ হয়তো ইতিহাসের গ্রন্থের পাশে জায়গা পাবে। এ কাল যখন বিগত, যখন এ কালের সত্য স্বরূপকে খুঁজবার জন্য আগামী কালের কোন ইতিহাসকার সন্ধানী দৃষ্টি ফেরাবেন চারিদিকে, তখন একালের ইতিহাস তিনি যেমন খুঁজবেন ইতিহাসের ও ঘটনার সত্যমূর্তিকে আবিষ্কারের জন্য, তেমনি আমার রচনাতেও হয়তো তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি পড়বে এ কালের জীবনের ভাবরূপটিকে জানবার জন্য। ইতিহাসের সত্যমূর্তির যে কাঠামো তিনি রচনা করবেন তাতে এই ভাবমূর্তি সংযোজন করে একালের পূর্ণমূর্তিটি তিনি গড়ে তুলবেন। তাঁরই হাতে এ কালের ইতিহাস ও এ কালের সাহিত্য দুই সমবয়সী প্রাচীন সহোদরের মত পাশাপাশি আসন পাবে।

গ্রন্থ-পরিচয়

শতাব্দীর মৃত্যু

'শতাব্দীর মৃত্যু' তারাশঙ্করের মৃত্যুর পর প্রকাশিত উপন্যাসের মধ্যে প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসটির রচনাকাল আশ্বিন ১৩৭৬ সাল—ভাদ্র ১৩৭৮। দীর্ঘ দুই বৎসর ধরে এই বিখ্যাত উপন্যাসটি তারাশঙ্কর রচনা করেন। তারাশঙ্কর ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্য আশ্রয়ী রচনায় সুনিপুণ। ইতিহাস-নির্ভর রচনায় এক মাত্র তাঁর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনাও আলোচনা চলে। বর্তমান কালে অবশ্য প্রমথনাথ বিশী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও বিমল মিত্রের নাম উপেক্ষণীয় নয়। ইতিহাস-নির্ভর রচনায় তারাশঙ্কর সামান্য উপকরণ ও সূত্র থেকে বৃহৎ উপন্যাসের বিস্তৃত ও বৃহৎ পটভূমি রচনা ও বয়ন করে চলেন।

কিন্তু 'শতাব্দীর মৃত্যু' উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্ব এই যে—সুদূর কালের কাহিনীকে আশ্রয় করে এ রচনা নয়। এই রচনা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েক দশকের—এই উপন্যাসের নায়কের জন্ম ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এবং তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৫৫। অর্থাৎ কাহিনীর বিস্তার উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ২৫-৩০ বৎসর। এবং বিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল উত্তীর্ণ হবার পরে—এ কাহিনীর যবনিকার পতন ঘটে। তা অবশ্য প্রথম খণ্ডের আলোচ্য নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ২৫-৩০ বৎসর অবিভক্ত বাংলায় ও ভারতবর্ষে বহু ক্রান্তিদর্শী ঘটনা ঘটেছে। এই যুগটাকে ক্রান্তিকাল বলা চলে।

পূর্বেই বলেছি 'শতাব্দীর মৃত্যু'র প্রথম খণ্ড কিন্তু শেষ হয়েছে আগত নতুন শতাব্দীর আগমনের একেবারে কোল ঘেঁষে। নায়ক মন্মথনাথের এন্ট্রাস পরীক্ষায় পাশ করবার পরেই প্রথম খণ্ড শেষ হয়। তখন বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হ'তে আর মাত্র কয়েক বৎসর বাকী। তখন স্যার গুরুদাস সকল পরীক্ষায় প্রথম হয়ে ওকালতি শুরু করেছেন। জিরাট বলাগড়ের গঙ্গাধর মুখুজ্জের ছেলে আশুতোষ সদ্য এম. এ. পাশ করে আইন বিভাগে ভর্তি হয়েছেন ওকালতি করবেন বলে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিনদশকের কথা এই বিখ্যাত কথাকার অতি সুনিপুণ ভাবে চিত্রায়িত করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর হাসি ও কান্না সুখ ও দুঃখ একেবারে চোখের ওপরে ভেসে ওঠে। প্রবীণ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক তারাশঙ্করের এ ক্ষমতা ছিল। 'মন্বন্তর' উপন্যাসের সমালোচনা প্রসঙ্গে সুবিখ্যাত সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন—'মন্বন্তর'-এর ঘটনা স্রষ্টা তারাশঙ্কর একেবারে সংবাদপত্রের পাতা থেকে তুলে এনেছিলেন।

'শতাব্দীর মৃত্যু' উপন্যাসটির গ্রন্থ-আকারে প্রথম প্রকাশ—প্রথম সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮। ডবল-ডিমাই সাইজ, ত্রিবর্ণ রঞ্জিত প্রচ্ছদ—প্রচ্ছদ-শিল্পী: খালেদ চৌধুরী। পৃ. ৪+১+১৯+৩৪৮। প্রকাশক: শ্রীসুনীল মণ্ডল, মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯। কোনো উৎসর্গ পত্র নেই। রচনাকাল: আশ্বিন ১৩৭৬—ভাদ্র ১৩৭৮।

'শতাব্দীর মৃত্যু' প্রথম সংস্করণের পরে আরো তিনটি মুদ্রণ হয়—দ্বিতীয় মুদ্রণ: ২৯ ভাদ্র ১৩৮০, তৃতীয় মুদ্রণ: আষাঢ় ১৩৮৫ ও চতুর্থ মুদ্রণ: শ্রাবণ ১৩৯১। বক্ষ্যমাণ রচনাবলীতে চতুর্থ মুদ্রণ থেকে পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে।

'প্রারম্ভ' বা 'উপক্রমণিকা'য় অর্থাৎ প্রথম ১৯ পাতার মধ্যে কাহিনীর সূত্রপাত এবং অনেক প্রাক্তন পুরনো কথা বলে নেওয়া হয়েছে। উপক্রমণিকার শেষে আরম্ভ হয়েছে উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের প্রথম পর্ব।

'শতাব্দীর মৃত্যু' প্রথমখণ্ডের প্রথমভাগের যবনিকা উত্তোলিত হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে হুগলীজেলার অতি দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ পরিবারকে নিয়ে। এই ভট্টাচার্য্য পরিবার দরিদ্র বটে—কিন্তু দান ধ্যান ও যাজনে এবং বিদ্যার চর্চ্চায়—সমগ্র অঞ্চলের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। গৃহে লক্ষ্মী-জনার্দন ও রাধা-গোবিন্দের খড়ো মন্দির। খড়ো মন্দিরেই প্রতিদিন লক্ষ্মী জনার্দন শিলা ও রাধা গোবিন্দের সেবা এবং ভোগ ও অর্চনা করেন স্বয়ং গৃহস্বামী গঙ্গাধর। গৃহস্বামী অতি অল্প বয়সেই পিতৃমাতৃহীন হন কনিষ্ঠ ভ্রাতা জটাধরকে নিয়ে। তখন কুলীনের মধ্যে অল্প বয়সেই বিবাহের রীতি ছিল। তৎকালীন রীতি অনুযায়ী দশম বর্ষীয়া বালিকা নয়নতারাকে বিবাহ করেন। নয়নতারা কোলে পিঠে করে দেবর জটাধরকে মানুষ করেন। শাশুড়ীর মৃত্যুর পরে নয়নতারা দ্বাদশবর্ষীয়া হয়েও ঘটনাচক্রে সংসারের কর্ত্রী হন। গঙ্গাধরও পারিবারিক বিগ্রহসেবা-পূজাঅর্চনা এবং শিষ্য ও যজমানদের পূজো করতেন ও মন্ত্র দিতেন।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা জটাধরের টোলের পড়া ভালো লাগতো না। জটাধর ছেলেবেলা থেকেই ছিল দুরন্ত ও দুঃসাহসী। সে যৌবনের প্রথমেই তার জমি-জমার অংশ বিক্রী করে দিয়ে গৃহত্যাগী হয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে।

বাড়ী থেকে গৃহত্যাগ করবার ছয় বৎসরের মধ্যে জটাধর ব্যবসায়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। এখন আর সে ছোট দোকানী নয়, 'মার্চেন্ট ও অর্ডার সাপ্লায়ার্স'। কিন্তু তার মনে দুঃখ এখনো স্ত্রী কৃষ্ণভামিনীর ক্রোড়ে কোনো সন্তান আসেনি।

জটাধরের গ্রাম পরিত্যাগ করবার পরে তার সম্পর্কে অনেক গুজব রটেছিল বলে স্বয়ং গঙ্গাধর তাকে পত্র দিয়েছিলেন। অতি সন্তর্পণে দ্বিধান্বিত ও ভীতচিত্তে সে এসেছে গোবিন্দপুর গ্রামে জ্যেষ্ঠভ্রাতা গঙ্গাধরের সঙ্গে দেখা করতে। পেছনে দুই গাড়ী বোঝাই জিনিসপত্র। কিন্তু প্রথমে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হোলেও পরে সব ভুলের নিরশন হয়। দাদার ছেলেটিকে দেখে জটাধর মুগ্ধ হয়। কিন্তু কেমন যেন স্বাভাবিক নয়। স্বাভাবিক আচার-আচরণও নয় ওই তিনবছর আট মাসের শিশুটির। জটাধর কিন্তু এই ছেলেটি কালে খ্যাতিমান ও যশস্বী হবে বলে এবং গঙ্গাধরকে তার দেবোত্তর সম্পত্তির নিজের অংশ লিখে দিয়ে চলে যায়।

আরো আটবৎসর পরে এক পৌষ মাসের শেষের দিকে জটাধর সস্ত্রীক গ্রামে ফিরে আসে। সে এসেছিল স্ত্রী কৃষ্ণভামিনীকে নিয়ে। কৃষ্ণভামিনীর প্ররোচনায় বলতে গেলে। পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন পৌষলক্ষ্মীর পূজো করবে বলে সে এসেছিল লক্ষ্মীর ভাগ নিতে।

ইতিমধ্যে গঙ্গাধরের গৃহেও অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। গঙ্গাধরের পত্নী নয়নতারা মৃতা। একটি পুত্র সন্তান প্রসব করতে গিয়ে সে মারা যায়। আরো আগে প্রমথ বলে আরো একটি পুত্র সন্তান হয়েছিল—বড় ছেলে মন্মথের পরে। সে এখন সাত বছরের—সেই ছেলেটি এবং বড় ছেলে মন্মথকে নিয়ে এখন গঙ্গাধরের সংসার। জটাধর ও কৃষ্ণভামিনীকে বিপত্নীক গঙ্গাধর যথাসাধ্য ও যথোচিত সম্বর্ধনা করলেন। কৃষ্ণভামিনী ভাসুরের প্রীতি ও স্নেহের পাত্রী হয়ে উঠেছিল সহজেই।

গঙ্গাধরের বড় ছেলের অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে। একটি মরণাপন্ন কঠিন অসুখের পরে তার তন্ময়তা ও জড়তা সেরে যায়। সে প্রথম থেকেই রূপবান বালক ছিল। এখন বুদ্ধির দীপ্তিতে সে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। মাইনর স্কুল থেকে সে জেলার মধ্যে তৃতীয় হয়। তার ইচ্ছে সদর বা কলকাতায় গিয়ে সে ইংরেজি স্কুল-এ ভর্তি হয়। এক সময় কাকার কাছে সে কথা বলেও ফেলে। কাকা জটাধর তাকে আশ্বাস দেন—তাকে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে কলকাতার স্কুল-এ ভর্তি করে দেবেন।

সামান্য ৫ টাকা মাইনের কয়লাখনির কেরানী থেকে কোটীপতি হয়েছেন। সেখানেও বিচিত্র সব মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। তবে সবচেয়ে বিচিত্র মানুষ বোধহয় স্বয়ং মাধবলালবাবু।

মাধবলালবাবু চরিত্রটি তারাশংকর তাঁর নিজের জীবন থেকে নিয়েছেন। মাধবলালবাবুকে এঁকেছেন—তাঁর স্বগ্রাম লাভপুরের ব্যবসায়ী জমিদার যাদবলালবাবুর চরিত্রটিকে নিয়ে। এই যাদবলাল বাবু অত্যন্ত দরিদ্র ঘরের সন্তান ছিলেন। নিজের চেষ্টায় বাইরে বেরিয়ে পুরুষকার ও ভাগ্যের বলে লক্ষ্মীলাভ করে ক্রোড়পতি হয়ে দেশে ফিরে আসেন। গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেছেন হাই-স্কুল। বাড়ীতে রাধা-গোবিন্দের বিগ্রহ। দেবস্থানকে পুনরুদ্ধার করে লাভপুরের দেবী ফুল্লরার ভগ্ন মন্দিরের সংস্কার করে পুনর্নির্মাণ করে দিয়েছেন। এসব তারাশংকরের আত্মজীবনী মূলক বচনা 'আমার কালের কথা'র ৪০১—৪০২ পাতায় পাওয়া যাবে।*

আরো পাওয়া যায় মন্মথনাথের হিন্দু স্কুল-এর পরিবেশের মধ্যে। তারাশংকর লাভপুর স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ-এ ভর্তি হয়েছিলেন। সেসময় থাকতেন বোধহয় কোনো আত্মীয়েব বাড়ীতে এণ্টালী-বেনিয়াপুকুর এলাকায়। সে সময় এসব অঞ্চল দেশী খৃষ্টান ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান-এ ভর্তি। তারাশংকরের 'অভিযান' (১৯৪৬), 'সপ্তপদী' (১৯৫৮), 'কীর্তিহাটের কড়চা' (১৯৭৬) প্রভৃতি বিভিন্ন বইয়ে দেশী-খৃষ্টানদের বিচিত্র চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবত তাঁর কিশোর বয়সে দেখা এই সব বিচিত্র চরিত্রের নর-নারী ও তাদের বিচিত্র জীবন যাত্রা তাঁকে গভীর ভাবে আকর্ষণ ও প্রভাবিত করেছিল।

কিশোর বয়সী স্কুল-বালকদের নিষিদ্ধ চিত্র দেখা তারাশংকরের অন্যান্য প্রথম দিকের বইতেও পাওয়া যায়। তাঁর প্রথম দিকের বিখ্যাত রচনা 'আগুন' (১৯৩৭)-এ বাল্য বন্ধুদের মধ্যে প্রায় এই ধরণের চিত্র দেখাব ব্যাপার আছে। সেখানেও তিনবন্ধু, নরেশ ও হীরু এবং চন্দ্রনাথ। বড়লোকের ছেলে হীরু কাশ্মীর থেকে বেড়িয়ে এসে একান্তে বাল্যবন্ধু নরেশকে কাশ্মীর রূপসীর ছবি দেখিয়েছিল। অনুমান করতে পারি—লাভপুরের মতো ধনী ও জমিদার-প্রধান গ্রামে তারাশংকরের স্কুল-জীবনে এমন ঘটনা ঘটে থাকবে। ('তারাশংকর-রচনাবলী', পঞ্চম খণ্ড, 'আগুন', পৃঃ ১৯)।

গৃহদেবতার অংশ ও পূজা নিয়ে আত্মীয়-বিরোধ তারাশংকরের বহু গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঁর আত্মজীবনী মূলক রচনা 'আমার কালের কথা'তেও তার নিদর্শন আছে। কুলদাপ্রসাদ-বাবুর সঙ্গে দৌহিত্রী বংশের এক অর্বাচীনের পাঠাবলি নিয়ে অহেতুক ঝগড়া। গঙ্গাধর ও জটাধরের বিরোধ তারাশংকরের প্রত্যক্ষ চোখে দেখা কাহিনী। ('তারাশংকর-রচনাবলী', দশম খণ্ড, 'আমার কালের কথা', পৃঃ ৪২৯)।

তারাশংকরের বিচিত্র মেস-জীবনের কাহিনী অন্যান্য গ্রন্থেও আছে। তারাশংকর উদীয়মান সাহিত্যিক জীবনে দীর্ঘকাল বউবাজারের একটি মেস-বাড়ীতে বাস করেছিলেন। 'আগুন' (১৯৩৭) উপন্যাসে এই মেস-বাড়ীর উল্লেখ আছে। তারাশংকরের 'আমার সাহিত্য জীবন' (১৯৫৩) এর প্রথম খণ্ড থেকে কিছু অংশের উদ্ধৃতি দিয়ে এ প্রসঙ্গে ইতি টানব : "বউ বাজারের মেসটি ছিল একটি বিচিত্র স্থান। এমন বিচিত্র সংস্থান কদাচিৎ ঘটে জীবনে। বাড়ীটি কলেজ স্ট্রীট এবং সেণ্ট্রাল অ্যাভিন্যুর মধ্যে বউবাজার স্ট্রীটের উত্তর দিকের ফুট পাথের উপর। সামনেই একটি গির্জা আছে। এবং উত্তর দিকের ফুটপাথের বাড়িটার ঠিক

* তারাশংকর রচনাবলী', দশম খণ্ড, পৃঃ ৪০১—৪০২

একখানা বাড়ির পরেই আছে ফিরিঙ্গী-কালী। চীনেম্যান, দেশী ক্রীশ্চান, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, মুসলমান নিয়ে পাড়াটা। শুধু তাই নয়, বড় বড় বাইজীদের বাসা এখানে।…”

“চারখানা চারখানা আটখানা ঘরে চারটে মেস। দুখানা ঘর এক একটি মেস। এক-এক ঘরে দশ-বারো জন থাকে, যাত্রার আর ধর্মশালার যাত্রীই বলুন—যা বলবেন উপমায় বেমানান হবে না। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা, বরিশাল, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম—লোক সব জায়গারই আছে। আমি যে মেসটায় গিয়েছিলাম, সে মেসটা ছিল লাভপুরের নির্মলশিব বাবুদের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মেস।” (‘আমার সাহিত্য-জীবন’, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৯৯-২০০)।

তারাশংকরের ‘শতাব্দীর মৃত্যু’ প্রথম খণ্ড একটি সুখপাঠ্য ইতিহাস-নির্ভর উপন্যাস। পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি এবং নাটকীয় বয়সের তীব্রতা ও পরিশীলিত রচনা-রীতি—উপন্যাসটিকে একটি বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে বাংলা সাহিত্যে।

শঙ্করবাঈ

তারাশংকর পরিণত সাহিত্যিক-জীবনের একেবারে শেষ দিকে দীর্ঘ উপন্যাস রচনার মাঝে মাঝেই বেশ কয়েকটি ছোট উপন্যাস বা ‘নভেলেট’ লিখেছিলেন। সেগুলির কয়েকটি মধুর স্নেহরসে সিক্ত আবার কোনো কোনোটি হৃদয়ের গূঢ় ব্যথা ও বেদনার অশ্রুসিক্ত কাহিনী রূপে প্রতিভাত।

তারাশংকরের ‘বিপাশা’, ‘বিচারক’, ‘সপ্তপদী’, ‘জঙ্গলগড়’, ‘নিশিপদ্ম’, ‘একটি চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে’ ইত্যাদি এ-ধরণের রচনা।

এ ধরণের ছোট উপন্যাসের মধ্যে ‘শঙ্করবাঈ’কেও তারাশংকরের একটি বিশিষ্ট রচনা বলে চিহ্নিত করা যায়। একটি ভীরু কিশোরী মেয়ের অশ্রুঘন প্রেমের করুণ-কাহিনী বর্ষীয়ান সাহিত্যিক রূপায়িত করেছেন—এই ছোট উপন্যাসটির মধ্যে। ‘শঙ্করবাঈ’-এর করুণ প্রেমের কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে এঁকেছেন ভারতের এক মহা সংকট কাল—মরণ ও সংহার লীলার চিত্র।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংরেজ পূর্ব-ভারতে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। বাদশাহ শাহ আলমের কাছ থেকে লর্ড ক্লাইভ বাংলা-বিহার-ওড়িষ্যার দেওয়ানী কিনে নিয়েছেন। সারা ভারতে তখন দারুণ সংকট কাল চলছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমেই ১৭০৭ খৃীঃ দেহত্যাগ করেছেন সম্রাট আওরঙ্গজেব। তারপর কিছুদিন বাদে বাদেই একের পর এক মোগল সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে বসেছেন—আর নামছেন—এবং ‘দেহরী-ই-সালাতিন’ নামে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হচ্ছেন অথবা গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হচ্ছেন। সম্রাট আকবরের গঠিত বিশাল মোগল সাম্রাজ্য তাসের দেশের মত ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণের প্রবল মারাঠা শক্তি দিল্লীর আশ-পাশে আগলে আছে—তাদের বর্গী বাহিনী নিয়ে। এদিকে পূর্ব-ভারতে ইংরেজ ও উত্তর পশ্চিম ভারতে জাঠ রাজপুত শিখ শক্তি নড়ে চড়ে বসছে। মোগল শাসনের রজ্জু ছিঁড়তে বসেছে। তারপর পারস্যের নাদির শাহ ও আফগান সর্দার আহমদ শাহ আবদালীর বারংবার আক্রমণে মোগল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত ও ধুলোয় লুণ্ঠিত তার সম্মান ও প্রতিপত্তি। সম্রাট শাহ আলমের আমলে ভয়ংকর ও শোকাবহ অবস্থা। রোহিলা উজীর নাজীবউদ্দোলার ভয়ে তিনি দীর্ঘ ১১ বৎসর দিল্লীতে ঢুকতে পারেন নি। লালকেল্লাতে তখন ‘ময়ূর সিংহাসন’ না থাক—সম্রাটের তক্তেও বসতে

পারেন নি। রোহিলা পাঠান নাজিবউদ্দৌলা এবং তাঁর পুত্র জবিতা খাঁয়ের জন্যে ফিরিঙ্গী সৈন্যের আশ্রয়ে এলাহাবাদে তাঁকে বাস করতে হয়েছে।

দিল্লীতেও আর আগের অবস্থা নেই। নবাব আমীর ও ওমরাহ—সকলেই শরাব ও আওরৎ নিয়ে ব্যস্ত। ব্যভিচার ও অনাচার, ঘুষ গুপ্ত হত্যা তো আছেই—সেই সঙ্গে সকাল হলেই দেখা যায়—কম্বল চাপা দিয়ে পড়ে আছে সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ। কসবী ও কসবীওয়ালীদের মহল্লায় লুচ্চা ও বদমাইসের রমরমা। কাফিখানা ও তাড়িখানার জলুস দিন দিন বাড়ছে।

বহু কষ্টে মারাঠা ও রাজপুত ও ফিরিঙ্গীদের সহায়তা নিয়ে নাজিবউদ্দৌলার মৃত্যুর পরে সম্রাট শাহ আলম আবার দিল্লীর মসনদ দখল করেছেন। তাড়িয়ে দিয়েছেন পুত্র জবিতা খাঁকে। জবিতা খাঁ বিতাড়িত হয়ে রোহিল খণ্ডের এক বিরাট অংশ দখল করে আছেন। কিশোর পুত্র গোলাম কাদেরকে রেখে দিয়েছে প্রতিভূ হিসেবে দিল্লীর দরবারে—কিন্তু কোনো রাজস্ব পাঠায় নি রাজধানীতে।

ঠিক এই সময়েই কাহিনীর যবনিকা হয়েছে উত্তোলিত। প্রথমে সম্রাট দরবার থেকে জবিতা খাঁয়ের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরিত হয়েছিল—বড় বড় কামান ও বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে—সম্রাটের রোহিলা উজির আবদুল আহাদ খাঁয়ের ভাই—মনসবদার আবদুল কাসিম খাঁয়ের নেতৃত্বে। লড়াইয়ে হারিয়ে—জবিতা খাঁ আবদুল কাসিম খাঁকে মেরে ফেলেছে। বাদশাহী ফৌজ হেরে গেছে রোহিলা খণ্ডে—এমনও শোনা যাচ্ছে জবিতা খাঁ শীঘ্রই দিল্লী আক্রমণ করবে।

সম্রাট শাহ আলম এ অপমান সহ্য করলেন না। তিনি উজির আহাদ খাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে মীর বক্সী মির্জা নজফ মাহাদজী সিন্ধেকে পাঠালেন রোহিলখণ্ডে যুদ্ধের জন্যে।

এদিকে সম্রাট শাহ আলমের কাছে প্রতিভূ—জবিতা খাঁয়ের পুত্র গোলাম কাদেরের কৈশোর অতিক্রান্ত। তার সঙ্গে ভাব হয়েছে 'কালাশের' বা শের আলী খাঁর। শের আলী খাঁ, বা কালাশেরের সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তীর কথা বলেছেন ফকির সাহেবের মুখ দিয়ে স্বয়ং লেখক।

'কালাশের'-এর জন্ম অগম্যার সঙ্গে সহবাসে পশ্বাচারের মধ্যে দিয়ে কসবী খানায়। জন্মের থেকেই তার পা দুটো জন্তুর মত। তার শিশু বয়সে কঠিন রোগে প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায় এবং সেই দেহকে আশ্রয় করে স্বয়ং শয়তান।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা'র মধ্য দিয়ে ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত ও ভাঙাগড়া হয়—স্বয়ং শয়তান কালাশের তাতে প্রধান অংশ গ্রহণ করে।

এই ভাঙা গড়ার পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবে একটি নব প্রস্ফুটিত গোলাপ কুঁড়ির মত অনাঘ্রাতা কিশোরী মেয়ের প্রথম প্রেম ও ভীরু ভালবাসার কাহিনী প্রবহমাণ রেখেছেন লেখক।

শক্কর বা শক্কর্া অথবা চিনি নামের মেয়েটি চিনির মতই মিষ্ট স্বভাবের। দিল্লীর কাছে বামনউলী নামে গ্রামের মেয়ে শক্কর। সেই গ্রাম হোলো গন্ধর্বী বা নট ব্রাহ্মণের। মেয়েরা নাচ গান শেখে—কিন্তু ভালোবাসা বারণ। আর তারা গণিকা নয়—দেহ তারা বিক্রী করতে পারবে না—শত প্রলোভন এলেও।

সম্রাট শাহ আলমের সৈন্য বাহিনী যখন রোহিলা পাঠান জবিতা খাঁকে হারিয়ে দেয়—তখন জবিতা খাঁ আশ্রয় নেয় শিখ সর্দ্দার গজপৎ সিংহের কাছে। পুত্র গোলাম কাদের তখন দিল্লী থেকে পালিয়ে যায় কালাশের-এর সাহায্যে।

পথের মধ্যে বাদশাহী ফৌজের কাছে প্রায় ধরা পড়েছিল। গোলাম কাদের আহত হয়ে

পালিয়ে ছিল সরষে খেতের মধ্যে। বামনউলী গ্রামের মেয়েরা লুকিয়ে ছিল ঝোপে ও জঙ্গলে বাদশাহী সৈন্যের ভয়ে। সরষে খেতের মধ্যেও। সেখানে শঙ্করও ছিল। সে আহত গোলাম কাদেরকে দেখতে পেয়ে মুগ্ধ হয়ে যায়। শঙ্কর তাকে আশ্রয় দেয়। আহার্য এনে দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শয়তান কালাশের-এর পরামর্শে শঙ্করকে দৈহিক নির্যাতন ও নিগ্রহ ক'রে নির্মম ভাবে, বুকে ছোরা বাসিয়ে চলে যায় গোলাম কাদের।

শঙ্কর প্রথম দেখাতেই ভালোবেসেছিল গোলাম কাদেরকে। আবার নানা ঘটনা চক্রের মধ্যে দিয়ে শঙ্করের সঙ্গে দেখা হয়েছিল গোলাম কাদেরের। সঙ্গে কালাশের ও মোগল হারেম-এর রক্ষিতা পরভীনবানু ছিল। শঙ্কর গোলাম কাদেরের ছোরা দিয়েই হত্যা করে শয়তান কালাশেরকে। আবার পরভীনবানু হত্যা করে শঙ্করকে। শঙ্করের শেষ সময়েও আশা ছিল তার দয়িত গোলাম কাদের তাকে রক্ষা করবে।

পরবর্তী কালে গোলাম কাদের একুশদিন দিল্লীর সিংহাসনে বসে। সম্রাট শাহ আলমের চোখ খুবলে তুলে ফেলে। মোগল বেগম ও শাহজাদা ও শাহজাদীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করে। একুশদিনে একুশজন শাহজাদা ও শাহজাদী মারা যায়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে রাতের অন্ধকারে দিল্লী ছেড়ে পালাতে হয়। রাতের অন্ধকারে বামনউলীতে বর্গী সৈনাদের হাতে ধরা পড়ে। তারা গোলাম কাদেরের শিরশ্ছেদ করে। গর্দান কাটে। লাশটা ঝুলিয়ে দেয় গাছে। ধড়টা আলাদা রাখে। ফকির সাহের গুরুর গুরু রহিমশাহ সাহেব শঙ্করের কবরেই তার মুণ্ডটাকে কবর দেন। এখানেই কাহিনীর শেষ।

'শঙ্করবাঈ' ছোট উপন্যাস। এই ছোট উপন্যাসের মধ্যেও মহা সাহিত্যিক তারাশংকর তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের দিল্লী, আগ্রা, মথুরার অবস্থা—চিত্রকরের মতে বাস্তবোচিত ভাবে এঁকেছেন। দু'শো বৎসর পরেও দিল্লী নগরীর অবক্ষয়ের চিত্র যেন চোখের ওপরে ভেসে ওঠে। তারাশংকর ফকির সাহেবের মুখ দিয়ে কাহিনী শুনিয়েছেন। সেই সঙ্গে যুদ্ধ বিদ্রোহ গুপ্ত হত্যা এবং মোগল প্রাসাদের ষড়যন্ত্রের কথাও অবর্ণনীয় ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

'শঙ্করবাঈ' উপন্যাসটির গ্রন্থ-আকারে প্রথম প্রকাশ—প্রথম সংস্করণ: কার্তিক (রাসপূর্ণিমা) (১৩৭৪ (ইং নভেম্বর ১৯৬৭)। ডবল-ডিমাই সাইজ, ত্রিবর্ণ রঞ্জিত প্রচ্ছদ। বোর্ড বাঁধাই। পৃ, ৪+১৯২। প্রকাশক: শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯। বর্তমান রচনাবলীতে প্রথম সংস্করণ থেকে পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে।

ইতিহাস ও সাহিত্য

'ইতিহাস ও সাহিত্য' প্রবন্ধটি ১৯৬৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত একটি স্মরণিকাতে প্রকাশিত হয়।

চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়

॥ একবিংশ খণ্ড সমাপ্ত ॥